শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্টারী কৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১০ম বর্ষ, ১০ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা। | বৈশাখ। | ১৩১০ সাল, ১৮২৫ শকাব্দা।

মঙ্গলাচরণ।

নিবেদ্য হিন্দুশাস্ত্রাণাং
তত্ত্বং হিন্দু-হিতব্রতা।
হিন্দূনাং পরমারাধ্য-
শ্রীহরেরঙ্ঘ্রিনাশ্রিতা॥
চিরং জীবতু যুক্তাখ্যা
সেয়ং নো "হিন্দুপত্রিকা॥"

হিন্দুশাস্ত্র সমূহের তত্ত্ব নিবেদিয়ে,
হয়ে হিন্দুসমাজের হিতব্রতাত্মিকা।
হিন্দুর পরমারাধ্য-হরিপদাশ্রয়ে,
সুচিরজীবিনী হোক্ এ "হিন্দুপত্রিকা॥"

—:০:—

(নববর্ষারম্ভে নিবেদন।)

শুভ নববর্ষারম্ভের মঙ্গলাচরণে সর্ব্বমঙ্গলালয় শ্রীভগবানের শ্রীচরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক আমাদের নিবেদন এই যে, আজ দশবৎসর কাল যাঁহার কৃপাশ্রয়ে এই "হিন্দুপত্রিকা" হিন্দুধর্ম-তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা হিন্দুসমাজের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে; যাঁহার কৃপাবলে ইহার সহৃদয় গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক, পৃষ্ঠপোষক প্রভৃতি হিতৈষী বান্ধব-বর্গের সহানুভূতি ও শুভাশীর্ব্বাদে এই সুদীর্ঘ কাল ইহার ব্রত-সিদ্ধি ও সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি হইয়াছে, সেই কৃপাময় শ্রীহরির কৃপা-ভরসাতেই আবার আমরা এই নববর্ষাগমে নবহর্ষোদ্যমে হিন্দুপত্রিকার পরিচালনাদ্বারা হিন্দুসমাজের পরিচর্য্যায় পুনঃপ্রবৃত্ত হইলাম।

আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে হিন্দুপত্রিকার সুপরিচালন বিষয়ে যথাসম্ভব চেষ্টার শৈথিল্য নাই। বঙ্গের হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ সু-পণ্ডিত লেখকবৃন্দই হিন্দুপত্রিকার লেখক।

বিগত বিংশতি-শতবৎসর হইতে পরমশাস্ত্র-পারদর্শী শ্রীবৃন্দাবন পণ্ডিতপ্রবর বঙ্গসাহিত্য-সুরথী সুপ্রবীণ লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক হিন্দুপত্রিকায় লিখিতেছেন। আশাকরি, তাঁহার এই অনুগ্রহ অব্যাহত থাকিলে, হিন্দুপত্রিকার শাস্ত্রীয়তা-সমৃদ্ধি ও লিপি-বলবৃদ্ধির বিশিষ্ট সম্ভাবনা। এতদ্ব্যতীত এ বৎসর হইতে আরও কতিপয় শাস্ত্রজ্ঞ বঙ্গীয় সুলেখক যাহাতে হিন্দুপত্রিকার অঙ্গ-প্রসাধনে নিয়মিত লেখনীধারণে রত রহেন, তদ্বিষয়ে বিশিষ্ট চেষ্টা করা যাইবে। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ," সুতরাং হিন্দুপত্রিকার লিপি বিষয়ে প্রাচীনতা ও আধুনিকতা, এই উভয় ভাবের সহিতই শাস্ত্রীয়তা সহযোগে গদ্য পদ্য প্রবন্ধাদি সন্নিবেশের ব্যবস্থা আছে; নচেৎ পাঠকবর্গের বিভিন্ন রুচির পরিতর্পণ অসম্ভব। হয়ত শুদ্ধ প্রাচীনতাপ্রিয় পাঠকবৃন্দের আধুনিক সাহিত্য-সঙ্গত প্রধান প্রবন্ধাদিতে অপ্রীতি বা আপত্তি হইতে পারে। পক্ষান্তরে, আধুনিক সরল-সাহিত্য-রসিক পাঠকের নিরবচ্ছিন্ন বেদ-বেদান্তের বক্তব্যভাবী সংস্কৃত-বহুল প্রবন্ধ নিচয় অপ্রিয় বোধ হইতে পারে। অতএব উভয় দিক্ রক্ষা করার পক্ষেই হিন্দুপত্রিকার লক্ষ্য আছে ও থাকিবে। অপর, শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গের মধুর প্রসঙ্গ অধুনা সাময়িক সাহিত্য-তরঙ্গে দেশে দেশে প্রসারিত হইতেছে; সুতরাং হিন্দুপত্রিকারও প্রায় প্রতি প্রকাশেই হিন্দুর পরমাদর-গৌরবান্বিত সেই গৌর-প্রসঙ্গ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এতদ্ভিন্ন, এ বৎসর হইতে সংপূর্ণ নূতন অক্ষরে, উৎকৃষ্টতর কাগজে ও কালীতে বিশেষ যত্নের সহিত পত্রিকার মুদ্রণাদির ব্যবস্থা হইতেছে। অধুনা অস্মদ্দেশে হিন্দুধর্ম্মতত্ত্ব-প্রকাশিকা পত্রিকা আর প্রায় নাই বলিলেই হয়; এইজন্য আমরা হিন্দুপত্রিকাকে এ বৎসর হইতে যথাসম্ভব সর্ব্বসৌষ্ঠব-সুসম্পন্না করিবার ব্যবস্থা করিতেছি; কৃতকার্য্যতা অবশ্য ভগবৎকৃপা-সাপেক্ষ।

আর একটী নিবেদন, কখন কখন হিন্দু-পত্রিকায় প্রকাশিত কোন কোন প্রবন্ধ প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মভাবের বিরুদ্ধ ভাবিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিতে পারেন, কিন্তু হিন্দুপত্রিকার উদ্দেশ্য প্রতীত হইলে, বোধ হয় আপত্তির আর কারণ থাকে না। কতিপয় নির্দ্দিষ্ট হিন্দু-আচার-অনুষ্ঠান বা মতবাদের সঙ্কীর্ণ আয়ত্তির মধ্যেই হিন্দুশাস্ত্রালোচনা সীমাবদ্ধ করা হিন্দু-পত্রিকার উদ্দেশ্য নহে। মূলতঃ হিন্দু-শাস্ত্রকে অবলম্বন করিয়া, যিনি যে তত্ত্বের যেরূপ ব্যাখ্যা বুঝিয়া, সাধারণো বুঝাইতে চাহেন, তাঁহারই প্রবন্ধ (পরিপক্ক রচনায় রচিত হইলে) হিন্দুপত্রিকায় প্রকাশের উদার ব্যবস্থা অবারিত। আবার, শাস্ত্রীয়তা-সহযোগে সংরচিত তাহারই প্রতিবাদ-প্রবন্ধও হিন্দুপত্রিকায় সাদর-সম্প্রকাশ্য। ফলকথা, হিন্দুশাস্ত্রের মৌলিক অধীনতা অতিক্রম না করিয়া, স্ব স্ব স্বাধীন যুক্তি-যোগে যিনি যে তত্ত্ব যেরূপে বুঝাইতে চাহেন, হিন্দুপত্রিকার পরিচালক-পক্ষ হইতে তদ্বিষয়ে কোনও আপত্তির ভিত্তি নাই; তবে অবশ্য শাস্ত্রযৌক্তিকতা ও সুলিপি-কুশলতা, এতদুভয়ের সুসংযোগই পত্রিকায় প্রবন্ধ-প্রকাশ বিষয়ে সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। কোনও

হিন্দু-শাস্ত্রোক্তির তাৎপর্য্য, টীকা-ভাষ্যাদির সাহায্যে একজন যেরূপ বুঝিলেন ও বুঝাইলেন, অপরে হয়ত সেই শাস্ত্রোক্তির সেই টীকা ভাষ্য-প্রসূত তাৎপর্য্যই তাঁহার নিজ সংস্কারানুযায়ী হিন্দুমত-বিরুদ্ধ বলিয়া বুঝিতে ও বুঝাইতে পারেন। শাস্ত্র বুঝিবার ভেদে যে মতভেদ, তাহা বক্তৃতাদির বাগাড়ম্বর-বিচারে বা পত্রিকাদির পরিচিন্তিত প্রবন্ধ-প্রচারে সর্ব্বথা স্বাভাবিক। তারপর, হিন্দুমতের কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট বিশিষ্টলক্ষণ, দেশ ও সমাজ-ভেদ-নির্ব্বিশেষে স্থিরীকৃত হইতে পারেনা। আমাদের এই ক্ষুদ্র বঙ্গদেশেই প্রদেশ ও সমাজ-ভেদে হিন্দুমতের অনেক বিচিত্রতা ও হিন্দুশাস্ত্র তত্ত্ব-বোধের বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"। নানা মুনির নানা মত, ইহা আমাদেরই দেশের চিরপ্রচলিত প্রবাদবাক্য। এই জন্য, আমাদের "হিন্দুপত্রিকা" কোন দেশ, সমাজ বা সম্প্রদায়গত কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট আচার, অনুষ্ঠান বা মতবাদের অধীনতায় পরিচালিত নহে। ইহার সম্পাদক বা স্বত্বাধিকারী প্রভৃতি পরিচালক-পক্ষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা সংস্কারাদি দ্বারাও ইহার মৌলিক মত-বিধি (principle) শৃঙ্খলিত নহে। হিন্দুপত্রিকার ক্ষুদ্র কলেবর হিন্দুশাস্ত্রানুবর্ত্তী সকল লেখনীরই স্বাধীন-সঞ্চরণ-ক্ষেত্ররূপে উৎসর্গীকৃত। ফলে বিভিন্ন শিক্ষা-সংস্কার-সম্পন্ন শাস্ত্রজ্ঞ প্রবন্ধলেখকগণের বিচারগত অভিমত-নির্ব্বিশিষ্ট হিন্দুশাস্ত্রতত্ত্বের আলোচনাই হিন্দুপত্রিকার মুখ্য লক্ষ্য। ভারতে সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পুনরুন্নতি হিন্দু-পত্রিকার সমগ্র আশা ও আকাঙ্ক্ষার আলম্বন; এবং এই নষ্ট-ভ্রষ্ট-নিষ্পিষ্ট হিন্দু-সমাজের সঞ্জীবন, সংশোধন ও সমুন্নয়ন উদ্দেশে যথাসাধ্য ও যথাসম্ভব সময়োপযোগী সেবাই হিন্দুপত্রিকার একমাত্র জীবন-ব্রত।

জগৎপূজ্য হিন্দুশাস্ত্রের মহার্হ উক্তি-সমূহের সুযুক্তিসম্পন্ন সুব্যাখ্যা ও সুশিক্ষা প্রসারিত হউক; সুগূঢ় হিন্দুধর্ম্মতত্ত্বের বিভিন্ন অধিকারানুমত সত্য সুপ্রকাশিত ও সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হউক; শাস্ত্রবিরুদ্ধ অথবা শাস্ত্রের কুব্যাখ্যা-কলুষিত কুসংস্কার ও কদাচারাদি ক্রমশঃ অপসারিত হউক, এবং সমাজের অবিপ্লাবক স্বাস্থ্যকর শাস্ত্র-সঙ্গত সুসংস্কার ও সদাচারাদি পুনঃ সংস্থাপিত হইয়া, আমাদের জাতীয় মাতৃক্রোড়-তুল্য অবসাদিত সমাজকে নবজীবনে পুনঃ সঞ্জীবিত করুক, এ দীনপত্রিকার ইহাই আশা, উদ্দেশ্য ও প্রার্থনা।

উপসংহারে নিবেদন, আমরা হিন্দু-পত্রিকার উপরোক্ত উদ্দেশ্যাদির সাধনে যথাশক্তি যত্নবান থাকিব বটে, কিন্তু আমাদের সহৃদয় গ্রাহকবর্গের সানুগ্রহদৃষ্টিই তদ্বিষয়ে প্রধান অবলম্বন। সংসারে অর্থ ভিন্ন প্রায় সকল পুরুষকারই ব্যর্থ হয়। তাঁহাদেরই কৃপাশ্রিত এই হিন্দুপত্রিকার জীবন রক্ষার্থ বৎসরে দেড়টী মাত্র টাকা প্রদান বিষয়ে যদি সকলেই সানুগ্রহে একটু অবহিত থাকেন, তবেই তাঁহাদের গ্রাহকত্ব প্রকৃত অনুগ্রাহকত্বে পরিণত হইয়া, আমাদের সমস্ত প্রয়াস ও প্রত্যাশা সফল করিবে। ভগবৎকৃপায় বিগত নব বর্ষ যাবৎ অস্মদ্দেশীয় হিন্দুধর্ম্মানুরাগী আমাদের প্রিয় পাঠকসমাজে হিন্দুপত্রিকার প্রতি যেরূপ অনুরাগ,

অনুকম্পা—সম্ভবতঃ অনুকূলতার ভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে ভরসা করি, ভগবৎ-কৃপায় হিন্দুপত্রিকার কোনওরূপ সৌষ্ঠব-বিনাশ, সারত্ব-হ্রাস বা অনিয়মিত-প্রকাশ প্রভৃতি অযত্ন-প্রসূত অপায় ঘটিবেনা। অতএব হিন্দুর চির-হৃদয়ারাধ্য ভগবানের চরণে এই প্রার্থনা যে, "হিন্দুপত্রিকা" তাঁহার সনাতন হিন্দুধর্ম্মানুরাগী সন্তানগণের স্বধর্ম্ম-সেবার সাহায্য বিষয়ে উত্তরোত্তর অধিকতর উপযোগিতা লাভে অনুগৃহীতা এবং হিন্দুর গৃহে গৃহে গৃহ-পত্রিকারূপে গৃহীতা হউক; আর তাঁহারই চিরচরণাশ্রয়ে চিরজীবিনী হইয়া, হিন্দুসমাজ-সেবা-সর্ব্বস্ব তাহার এই ক্ষুদ্র পত্র-জীবন সার্থক করুক্।

ভগবদ্গীতা।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃপাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥

অন্বয়। হে সঞ্জয়, ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবঃ (যোদ্ধুমিচ্ছন্তঃ) মামকাঃ—(মৎ-পক্ষীয়াঃ) পাণ্ডবাশ্চ এব সমবেতাঃ (মিলিতাঃ) [সন্তঃ] কিম্ অকুর্ব্বত ॥ ১ ॥

বঙ্গানুবাদ ॥ ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়, ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী মৎপক্ষীয়-গণ ও পাণ্ডবগণ সমবেত হইয়া কি করিলেন?

এই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের ভিন্ন ভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা আছে; এতৎ সম্বন্ধে জাবাল উপ-নিষদে লিখিত আছে যে, "যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্ম সদনং ॥" শতপথ ব্রাহ্মণেও আছে—"দেবাঃ হবৈসত্রং নিষেদুরগ্নিরিন্দ্রঃ সমো মখো বিষ্ণু বিশ্বেদেবা অন্যত্রেবাশ্বিভ্যাম্, তেষাং কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমাস। তস্মাদাহুঃ কুরুক্ষেত্রং দেব-যজনম্" ইহার সংক্ষেপ-তাৎপর্য্যার্থ এই যে, দেবতারা এইস্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহাকে দেবতাদিগের যজ্ঞস্থান বলে। মহাভারতের বনপর্ব্বে ও অন্যান্য স্থানে কুরু-ক্ষেত্র মহাতীর্থ বলিয়া বর্ণিত আছে। ঐ বনপর্ব্বে কথিত আছে যে, উত্তরে সরস্বতী, দক্ষিণে দৃষদ্বতী, এই উভয় নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে কুরুক্ষেত্র বলে। মনুসংহিতায় ঐ ভূভাগ আর্য্যদিগের আদিম পুণ্যভূমি ব্রহ্মা-বর্ত্ত বলিয়া বর্ণিত আছে।

উপরোক্ত শ্লোকের শাঙ্করভাষ্য নাই। আনন্দগিরি, রামানুজ, শ্রীধরস্বামী, বলদেব, মধুসূদন সরস্বতী, নীলকণ্ঠ, বিশ্বনাথ চক্র-বর্ত্তী কৃত টীকা আছে; তন্মধ্যে রামানুজ-কৃত টীকায় ধর্ম্ম-ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র অর্থে "উভয়পক্ষের আদিপুরুষ কুরুনামা ব্যক্তির যজ্ঞক্ষেত্র বা ধর্ম্মভূমি" ইহা ব্যতীত ধর্ম্ম-ক্ষেত্রের ব্যাখ্যা আর কিছুই নাই। বলদেব এবং স্বামীকৃত ও নীলকণ্ঠের টীকায় কিছুই নাই বলিলেই হয়। আনন্দগিরির টীকায় "ধর্ম্মস্য তদ্‌বুদ্ধিশ্চক্ষেত্রমভিবৃদ্ধিকারণং

যদুচ্যতে কুরুক্ষেত্রমিতি” অর্থাৎ যে স্থানে ধর্ম্ম-বুদ্ধির বিকাশ বা ধর্ম্মবুদ্ধি পরিনন্দিত হয়, তাহাকে কুরুক্ষেত্র কহে, এই পর্য্যন্ত আছে। মধুসূদন এবং বিশ্বনাথ ঐ ধর্ম্মক্ষেত্রের ব্যাখ্যা কিঞ্চিৎ বিশদভাবে করিয়াছেন। তাঁহাদের টীকায় প্রকাশ যে, “যাবালোপনিষদ্ ও শতপথ ব্রাহ্মণোক্ত ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের স্থান-মহিমায় যদি ধার্ম্মিক পাণ্ডুপুত্রদিগের জ্ঞাতিবধে ধর্ম্মভীতি উপস্থিত হয় ও তদ্ধেতু তাঁহারা যুদ্ধকার্য্যে নিবৃত্ত হন, তাহা হইলে বিনা যুদ্ধে নিষ্কণ্টকে মম পুত্রগণ রাজ্যলাভ করিতে পারেন; পক্ষান্তরে যদি ঐ স্থান-মহিমায় আমার পুত্র দুর্য্যোধন প্রভৃতির ধর্ম্মবুদ্ধি উদিত হয় ও তদ্ধেতু তাহারা পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করে, তাহা হইলেও মঙ্গল; অতএব ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে উভয়পক্ষ যুদ্ধাভিলাষে সমবেত হইয়া কি করিতেছেন, ধৃতরাষ্ট্র এই প্রশ্ন সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; নচেৎ যুদ্ধাভিলাষে যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়পক্ষের সমবেত হওয়ার পর তাঁহারা কি করিতেছেন, এরূপ প্রশ্ন অসংলগ্ন”। তদ্ভিন্ন বিশ্বনাথ আর একপ্রকার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা ক্ষেত্রপদে কর্ষণভূমি বুঝায়; অতএব ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ঐ ক্ষেত্রের ধান্যস্থানীয়, ত্বদীয় সহায় শ্রীকৃষ্ণ ঐ ক্ষেত্রের কৃষকস্থানীয়, শ্রীকৃষ্ণকৃত নানাবিধ সাহায্য জলসেচন ও সেতুবন্ধনাদি স্থানীয় এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিনাশার্হ দুর্য্যোধনাদি ধান্যোৎপত্তির ও বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক স্বরূপ ধান্যাকার অসার তৃণস্থানীয়; এই অর্থে “ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র” প্রযুক্ত হইতে পারে।

ঐ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র ব্যতীত সঞ্জয় সম্বোধনের ও “মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চ” বাক্যের ব্যাখ্যা উপরোক্ত টীকাকারদ্বয় এইরূপ করিয়াছেন; যথা “সঞ্জয়েতি সম্বোধনং রাগদ্বেষাদি দোষান্ সম্যগ্ জিতবানসীতি কৃত্বা নিব্যাজমেব কথনীয়ত্বমেতি সূচনায়। মামকাঃ কিমকুর্ব্বত ইত্যেতাবদেব প্রশ্ননির্ব্বাহে পাণ্ডবাশ্চেতি পৃথক্ নির্দ্দিশন্। পাণ্ডবেষু মামকত্বাভাব প্রদর্শনেন দ্রোহম্ ভিব্যনক্তি।” ইহার তাৎপর্য্য এই যে, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি রাগ-দ্বেষাদিবর্জিত—অর্থাৎ কোন পক্ষের উপর অনুরাগ ও বিদ্বেষবুদ্ধি না থাকা হেতু প্রকৃত উত্তর দিবে, এইজন্য ধৃতরাষ্ট্র উহাকে ‘সঞ্জয়’ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন; এবং দুর্য্যোধন প্রভৃতিকে “মামকাঃ,” যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে “পাণ্ডবাঃ” শব্দ প্রয়োগ দ্বারা পাণ্ডবগণ তাঁহার আপনার নহে, এই বিদ্বেষ ভাব প্রকাশিত হইতেছে, ইত্যাদি। উপরোক্ত ধর্ম্মক্ষেত্রের ব্যাখ্যা ও টীকা কয়েকটী দ্বারা—১। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত; ২। ধৃতরাষ্ট্রের কুরুক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্র বলিবার অভিপ্রায়; ৩। ঐ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধেচ্ছুক (উভয় পক্ষ) কি করিতেছেন, এবম্বিধ প্রশ্নের উদ্দেশ্য; ৪। সঞ্জয় সম্বোধনের গূঢ় রহস্যোদ্ভেদ; “মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চ” এই পৃথক্ নির্দ্দেশক বাক্যের তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে।

আধুনিক বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ লেখক ৺বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভগবদ্গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের উনবিংশ শ্লোক পর্য্যন্তের বাঙ্গালা টীকা লিখিয়াছেন; তাঁহার কৃত গীতার উক্ত শ্লোকের টীকায় নূতন কিছুই প্রকাশ করেন নাই। পূর্ব্বতন পণ্ডিতদিগের উক্তি যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়া এবং ধৃতরাষ্ট্র

অন্ধ হেতু হস্তিনার রাজধানীতে থাকিয়া কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবৃত্তান্ত—অর্থাৎ যখন যাহা ঘটে, তৎক্ষণাৎ তাহা অবগত হইতে পারেন, তজ্জন্য মহর্ষি ব্যাসের নিকট বর প্রার্থনা করায়, ঐ মহর্ষির বরপ্রভাবে মন্ত্রী সঞ্জয় অন্ধরাজ সমীপে থাকিয়াও দূরস্থিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংক্রান্ত সমগ্র বিষয় দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইয়া, অন্ধরাজের প্রশ্নমতে উত্তর দিতে থাকেন, ইত্যাদি ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিয়া, এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে "দিব্যচক্ষুর কথাটী অনৈসর্গিক, পাঠকগণকে বিশ্বাস করিতে বলি না; গীতোক্ত ধর্ম্মের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। যে ধর্ম্মব্যাখ্যা গীতার উদ্দেশ্য, প্রথম অধ্যায়ে তাহার কিছুই নাই। কি প্রসঙ্গোপলক্ষে এই তত্ত্ব উত্থাপিত হইয়াছিল, প্রথম অধ্যায় ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম একাদশ শ্লোকে কেবল তাহারই পরিচয় আছে। গীতার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য এতদংশের কোন প্রয়োজন নাই; আমার যে উদ্দেশ্য, তাহাতে এতদংশের কোন টীকা লিখিবারও প্রয়োজন নাই; ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এতদংশ পরিত্যাগ করিয়াছেন" ইত্যাদি কয়েকটী কথা বলিয়া, উপরোক্ত শ্লোকের কোন টীকা লেখেন নাই বা তাঁহার নিজের আর কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই।

আমরাও ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যার প্রয়োজন বিবেচনা করি না; কেবল ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের একটী সহজ অথচ সর্ব্বকালোচিত এবং সার্ব্বজনীন্ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। তদ্রূপ ব্যাখ্যা করিলে, পাঠকদিগের বোধ হয় অপ্রীতিকর হইবে না, বিবেচনায়, নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা বা টীকা পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থিত করিলাম। যে স্থানে বিরোধী উভয়পক্ষের বা উভয় বিবাদীর মধ্যে কোন বিরোধীয় বিষয়ের মীমাংসা বা নিষ্পত্তি হয়, সেই স্থানে অথবা বিচার-গৃহকে ধর্ম্মালয় এবং যে আসনে বসিয়া বিচারক ঐ মীমাংসা বা নিষ্পত্তি করেন, তাহাকে ধর্ম্মাসন ও ঐ আসনস্থ বিচারককে ধর্ম্মের অবতার কহে। ইহাই ধর্ম্মালয় (ধর্ম্মক্ষেত্র) ধর্ম্মাসন ও ধর্ম্মাবতার পদের চলিত অর্থ।

যে স্থলে উভয় স্বাধীন রাজার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয় এবং যুদ্ধব্যতীত তাঁহাদের ঐ বিবাদ মীমাংসার অন্য উপায় না থাকে, সে স্থলে স্বয়ং ন্যায় বা ধর্ম্মের অবতার স্বরূপ যুদ্ধই (ন্যায় বা ধর্ম্মযুদ্ধ) তাহার বিচারক; ঐ যুদ্ধের ক্ষেত্রই ধর্ম্মক্ষেত্র।

প্রথমতঃ এই শ্লোকোক্ত ধর্ম্মক্ষেত্রই কুরুক্ষেত্র প্রমাণিত হইতেছে। কুরুক্ষেত্র থানেশ্বর নগরের দক্ষিণবর্ত্তী অম্বলানগর হইতে ২০ ক্রোশ উত্তরে। কুরুক্ষেত্র বা বর্ত্তমান পাণিপথ স্মরণাতীত অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র। ভারতের ভাগ্য অনেকবার ঐ ক্ষেত্রে নিষ্পত্তীকৃত হইয়াছে। ঐ কুরুক্ষেত্র পঞ্চযোজন দীর্ঘ এবং পঞ্চযোজন প্রস্থ, এই জন্য উহাকে সামন্তপঞ্চকও বলে। উপরের উল্লিখিত মত মহাভারতের বনপর্ব্বে কুরুক্ষেত্রের যে সীমা লিখিত হইয়াছে, তাহাই মনুসংহিতোক্ত বৈদিক কালের ভারতের আদিম আর্য্যনিবাস বা পুণ্যভূমি ব্রহ্মাবর্ত্ত। ঐ ব্রহ্মাবর্ত্ত বা কুরুক্ষেত্রে সুমেরুবাসী প্রাচীন আর্য্যকুলের আদি পুরুষগণের বংশোদ্ভূত প্রথম

শাখা সুরগণের বংশধরগণ প্রথম উপনিবেশ স্থাপন পূর্ব্বক অধর্ম্মের অবতার অনার্য্য রাক্ষস ও দৈত্য-দানব প্রভৃতিকে ধর্ম্ম-যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, ভারতে ধর্ম্ম-রাজ্যের প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। * তৎপরে ঐ প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মরাজ্য রক্ষার জন্য ঐ ধর্ম্মক্ষেত্রে যুদ্ধ রূপ বিচারক কর্ত্তৃক বহুবার ধর্ম্মাধর্ম্মের বিরোধ-নিষ্পত্তি হইয়াছে ; সুতরাং ঐ কুরুক্ষেত্র উপরোক্ত অর্থে প্রকৃত পক্ষেই ধর্ম্মক্ষেত্র, তাহার সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয়তঃ, সঞ্জয় শব্দের অর্থ রাগ-দ্বেষাদি-জিত হইতে পারে ; তদর্থে কবি, রাজমন্ত্রীর সঞ্জয় নামও দিতে পারেন ; কিন্তু ঐ রাজ-মন্ত্রী রাগদ্বেষাদিজিত, অতএব যুদ্ধঘটিত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর বিনা পক্ষপাতে দিবে, এইজন্য যে ধৃতরাষ্ট্র তৎকালে সঞ্জয় সম্বোধন করিলেন, ইহা সঙ্গত হইতে পারে না ; যেহেতু ঐ প্রশ্নের অনেককাল পূর্ব্ব হইতে ধৃতরাষ্ট্র মন্ত্রীকে সঞ্জয় বলিয়া সম্বোধন করিয়া আসিয়াছেন ও মহাভারতের আদিপর্ব্ব হইতে সর্ব্বস্থানেই ঐ মন্ত্রীও সঞ্জয় নামেই অভিহিত হইয়া আসিয়াছেন ; অতএব সঞ্জয় নামের যে অর্থই হউক, উঁহার প্রকৃত নামই সঞ্জয়।

তৃতীয়তঃ, ধৃতরাষ্ট্রের "মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চ" শব্দ ব্যবহারে নূতনত্ব কিছুই নাই। কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ প্রকৃত পক্ষে ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবের যুদ্ধই বুঝায়, এইজন্য বঙ্গের খ্যাত-নামা লেখক মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের এক স্থানে বলিয়াছেন যে, মহাভারতোক্ত যুদ্ধ প্রকৃত পক্ষে কুরু-পাঞ্চালের যুদ্ধ, কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ নহে। উভয় পক্ষই যখন কুরুবংশোদ্ভূত, তখন 'কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ' কথাটী আদৌ প্রযোজ্য নহে ; তাহা হইলে ধার্ত্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডবের যুদ্ধ কথাটী সঙ্গত হইত। যাহাহউক, ধৃতরাষ্ট্রের আপন পক্ষকে "মামকাঃ" এবং প্রতি পক্ষকে "পাণ্ডবাঃ" শব্দ ব্যবহার করাই স্বাভাবিক। উহার কোন টীকার আবশ্যক নাই।

চতুর্থতঃ, বঙ্কিমবাবু যে সঞ্জয়ের দিব্য-চক্ষুপ্রাপ্তির বিবরণটী অনৈসর্গিক বলিয়াছেন, তদ্বিষয় আমাদের এই শ্লোক ব্যাখ্যায়

* হিন্দুপত্রিকায় প্রকাশিত আমার কৃত "অবতারতত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধে সুমেরু পর্ব্বতে প্রাচীন আর্য্যবংশের আদিপুরুষ প্রজাপতিগণের আদি বাস। তথায় দক্ষ যজ্ঞের রহস্যোদ্ভেদ, একতা ভঙ্গ, প্রাচীন আর্য্যকুলের আদিবাস পরিত্যাগ, বহুশাখায় পরিণতি, তন্মধ্যে প্রথম শাখা সুরগণের হিমালয়ে বাস, পুনঃ একতাবন্ধন, সুর-শক্তির বিকাশ, দেবাসুরের যুদ্ধ, অসুর-বিজয়, বৈজয়ন্তধাম বা সুরপুরীর প্রতিষ্ঠা ; ঐ সুর-সন্তানগণের ব্রহ্মাবর্ত্তে উপনিবেশ, বৈদিককাল, অনার্য্যজয়, কর্ম্মভেদ-জাতিভেদ, ভারতে ক্ষত্রিয়-রাজ্য সংস্থাপন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিরোধ, পুনরায় পতনোন্মুখ আর্য্যশক্তির বিকাশ, রামাবতারে পুনঃ অনার্য্যশক্তি দমন, আর্য্যানার্য্য সম্মিলন, ভারতএকছত্রীকরণ ও সাম্রাজ্য-সংস্থাপন, পুনরেকতাভঙ্গ, খণ্ডরাজ্য, অধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থান, কৃষ্ণাবতারের প্রয়োজন, সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত-দমন, ধর্ম্মক্ষেত্ররূপ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ, অধর্ম্মের ধ্বংস, পুনর্ধর্ম্ম-রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, গীতোক্ত সার্ব্বজনীন বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রচার ইত্যাদি বিষদরূপে বর্ণিত হইয়াছে; তৎপরে বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ, (শেষ বর্ত্তমান গৌরাঙ্গ) পর্য্যন্ত জাতীয় ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত আছে ; ক্রমে প্রকাশিত হইবে, আশা করি।

সহিত কোন সংস্রব নাই। সঞ্জয় যে উপায়েই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবৃত্তান্ত জানিতে পারুন, তাহার সহিত যখন এই শ্লোকের কোন সংস্রব নাই, তখন গীতার ব্যাখ্যায় ঐ দিব্য চক্ষুর গল্পটীর আদৌ প্রয়োজনাভাব। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ হইলেও, প্রকৃত পক্ষে তিনিই রাজা; যুদ্ধক্ষেত্রে কখন কি ঘটনা সংঘটিত হইতেছে, তাহা জানা তাঁহার অতীব আবশ্যক এবং মন্ত্রীরও যে উপায়েই হউক, অবগত হইয়া, রাজাকে তাহার প্রকৃত সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য; অতএব উপরোক্ত প্রশ্নটি সময়োচিত এবং কুরুক্ষেত্রের বিশেষণ ধর্ম্মক্ষেত্র অতীব সুসঙ্গত।

(সঞ্জয় উবাচ।)

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥২॥

অন্বয়॥ সঞ্জয়ঃ উবাচ। পাণ্ডবানীকং (পাণ্ডব-সৈন্যং) ব্যূঢ়ং (ব্যূহরচনয়া ব্যবস্থিতং) দৃষ্ট্বা তু তদা রাজা দুর্য্যোধনঃ আচার্য্যম্ (দ্রোণম্) উপসংগম্য বচনমব্রবীৎ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন, পাণ্ডব-সৈন্য ব্যূহিত দেখিয়া, তখন রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্যসমীপে গমন করিয়া কহিলেন ॥২॥

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥৩॥

অন্বয়। হে আচার্য্য, তব শিষ্যেণ ধীমতা দ্রুপদপুত্রেণ (ধৃষ্টদ্যুম্নেন) ব্যূঢ়াং পাণ্ডুপুত্রাণাম্ এতাং মহতীং চমূং পশ্য ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ। হে গুরো, আপনার শিষ্য ধীমান্ দ্রুপদপুত্র কর্ত্তৃক ব্যূহিত পাণ্ডবগণের এই মহতী সেনা অবলোকন করুন ॥৩॥

ভগবান শঙ্করাচার্য্য ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত সমস্ত টীকাকারগণ উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়ের এবং প্রথমাধ্যায়ের সমস্ত শ্লোকের টীকা লিখিতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহাদের টীকায় উপরোক্ত শ্লোক দুইটীর ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, দুর্য্যোধন যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডবদিগের ব্যূহিত সৈন্যসমূহ দেখিয়া ভীত হইয়া, যুদ্ধগুরু দ্রোণাচার্য্যকে উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়া, তত্রত্য উভয় পক্ষের বীরগণের অবস্থান, শক্তি, পদ ও গৌরবাদি বর্ণন করিয়াছিলেন। অন্য সেনাপতির নিকট স্বয়ং গমনে রাজার ভীরুতা প্রকাশ পাইবে; কিন্তু আচার্য্যের নিকট স্বয়ংগমনে তদ্রূপ ভীরুতা প্রকাশ হইতে পারেনা; অথচ চিরশত্রু দ্রুপদপুত্রের বুদ্ধিমত্তা ও ব্যূহরচনাকৌশল ইত্যাদি স্মরণ করাইয়া দিয়া, বিপক্ষের উপর আচার্য্যের ন্যায় মহাযোদ্ধার ক্রোধ উদ্দীপন করিয়া দিতে পারিলে, পাণ্ডবদিগের উপর আচার্য্যের যে আন্তরিক স্নেহ ছিল, তাহা নষ্ট এবং উহাদিগকে পরাজয় করার ইচ্ছা ও জেদ প্রবল হইতে পারে, এই উদ্দেশ্য সাধন ও স্বকার্য্য সিদ্ধির জন্য আচার্য্যের নিকট যাওয়ার এবং উপরোক্ত উত্তেজক বাক্য বলার প্রয়োজন হইয়াছিল, ইত্যাদি। বঙ্কিমবাবু এই দুইটী শ্লোকের টীকায় কেবল দ্রোণাচার্য্যের পরিচয়, ব্যূহের অর্থ (যুদ্ধার্থে সৈন্য-সন্নিবেশ) এবং তাঁহার (দ্রোণের) বধার্থে দ্রুপদ রাজা যজ্ঞ করিয়া ধৃষ্টদ্যুম্নকে পুত্র লাভ করেন, জাত থাকিয়াও

তাহাকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। আচার্য্যের ধর্ম্মই বিদ্যাদান, ইহা স্বধর্ম্ম-পালন বুঝিবার উপযোগী, এই মাত্র প্রকাশ করিয়াছেন।

আমাদের বিবেচনায়, উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়ের কোন টীকার আবশ্যক নাই; তবে দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্রবিদ্যা দান যে তাঁহার স্বধর্ম্ম-পালন, ইহা আমাদের সম্পূর্ণ অনুমোদিত। ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইবে যে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম নহে। যদি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম স্বধর্ম্ম হইত, তাহাহইলে দ্রোণাচার্য্য স্বধর্ম্মচ্যুত বা ধর্ম্মভ্রষ্ট ছিলেন। যেহেতু যুদ্ধ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নহে, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য প্রভৃতি যদি স্বধর্ম্মচ্যুত বা ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতেন, তাহাহইলে তৎকালের সর্ব্বোপরি প্রধান রাজকুলে তাঁহারা আচার্য্য পদে বরিত ও সম্মানার্হ হইতেন না এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা গীতা-প্রণেতা ব্যাসদেব (যে গীতায় "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" আছে) কখনই ঐ ব্রাহ্মণদ্বয়কে কুরুকুলের যুদ্ধাচার্য্য পদের গৌরবে গৌরবান্বিত করিতেন না। ফলতঃ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম যে সর্ব্বত্র স্বধর্ম্ম, তাহা নহে; স্বধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে; এক্ষণে এই বুঝিলেই যথেষ্ট হইবে, মানবের প্রকৃতিগত অভ্যস্ত কর্ম্মই স্বধর্ম্ম।

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুন সমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥৪॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৫॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বএব মহারথাঃ ॥৬॥

অত্র (সেনায়াং) শূরাঃ মহেষ্বাসাঃ (মহাধনুর্দ্ধরাঃ) যুধি (যুদ্ধে) ভীমার্জ্জুন-সমাঃ যুযুধানঃ (সাত্যকিঃ), বিরাটশ্চ, মহারথঃ দ্রুপদশ্চ, ধৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ, বীর্য্যবান্ কাশীরাজশ্চ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজশ্চ, নরপুঙ্গবঃ (নরশ্রেষ্ঠঃ) শৈব্যশ্চ, বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ চ, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ, সৌভদ্রঃ (অভিমন্যুঃ) দ্রৌপদেয়াশ্চ (দ্রৌপদীতনয়াশ্চ) (এতে) সর্ব্বে এব মহারথাঃ। ৪।৫।৬॥

বঙ্গানুবাদ। এই সেনাদলে মহাবলশালী, মহাধনুর্দ্ধর, যুদ্ধে ভীমার্জ্জুন তুল্য যুযুধান (সাত্যকি) বিরাট, মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা, সৌভদ্র (অভিমন্যু) এবং দ্রৌপদী-তনয়গণ, ইঁহারা সকলেই মহারথ। ৪॥৫॥৬॥

উপরোক্ত শ্লোক কয়েকটীর ব্যাখ্যা পূর্ব্বোক্ত টীকাকারগণ এইরূপ করিয়াছেন যে, একমাত্র দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের ব্যূহ রচিত হইয়াছে, ইহাতে

ভয়ের কারণ কিছুই নাই, পাছে দ্রোণাচার্য্য এইরূপ মনে করিয়া, বিপক্ষের বল উপেক্ষণীয় বোধ করেন ও তদ্ধেতু বিশেষ সাবধান না হন, এই আশঙ্কায় দ্রোণাচার্য্যের নিকট পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের বল-বীর্য্যাদির এইরূপ পরিচয় দিতেছেন যে, উহাদের মধ্যে ধৃষ্টদ্যুম্নই একমাত্র প্রসিদ্ধ বীর, এমত নহে; আরও বহুতর বাণক্ষেপে মহান্ শূর ও ভীমার্জ্জুন তুল্য যোদ্ধা বর্ত্তমান আছেন; তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি মহারথ বীর্য্যবান মহাযোদ্ধার নাম নির্দ্দেশ করিয়া 'চ' শব্দ দ্বারা আরো অনেক বীরের বিদ্যমানতা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই বর্ণনা দ্বারা দ্রোণাচার্য্য উত্তেজিত হইয়া, সাবধানতার সহিত যুদ্ধ করিবেন, ইহাই দুর্য্যোধনের অভিপ্রায়।

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কেবল শ্লোকোক্ত বীরগণের পরিচয় মাত্র দিয়াছেন, যথা—যুযুধান যদুবংশীয় মহাবীর—সাত্যকি, ধৃষ্টকেতু চেদিদিগের অধিপতি, কুন্তিভোজ বসুদেবের পিতা শূরের পিতৃস্বসৃ-পুত্র,পুরুজিৎ-সম্বন্ধে পাণ্ডবের মাতুল, ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত শ্লোক কয়েকটীর এবং তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ব শ্লোকটী দ্বারা প্রাচীন আর্য্যগণ যে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যূহনির্ম্মাণ অর্থাৎ সৈন্যের ব্যবস্থাপন এবং উভয় পক্ষের বল পর্য্যালোচনা করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন ও যুদ্ধ-কৌশল উত্তমরূপ পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে।

'মহারথ' অর্থে যে বীর দশ সহস্র ধনুর্ধারীর সহিত যুদ্ধ করিতে সক্ষম এবং শস্ত্র-শাস্ত্রে প্রবীণ, তাঁহাকে বলে। ইহার অর্থ যে একজন ব্যক্তি দশহাজার সৈন্যের সহিত এককালে একাকী যুদ্ধ করিতেন, এরূপ নহে; তবে প্রাচীন আর্য্যদিগের প্রধান সেনাপতিগণ যুদ্ধ-শাস্ত্রে এরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং তাঁহাদের রণ-কৌশল এরূপ ছিল যে, বিপক্ষের দশ সহস্র সৈন্যের সম্মুখীন হইয়া রণ-কৌশল দেখাইতে সক্ষম ছিলেন।

বিগত উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের সুপ্রসিদ্ধ ফ্রেঞ্চ মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টির যুদ্ধ-কৌশল যাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট উপরোক্ত উক্তিটী অসম্ভব বলিয়া বোধ হইবেনা।

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমিতে ॥৭॥
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তথৈবচ ॥৮॥
অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানা শস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৯॥
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।

পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং
ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥১০॥ *

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমব-
স্থিতাঃ।

ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব
এব হি ॥১১॥

হে দ্বিজোত্তম, অস্মাকন্তু যে বিশিষ্টাঃ (প্রধানাঃ) মম সৈন্যস্য নায়কাঃ তান্ নিবোধ (অবগচ্ছ) তে (তব) সংজ্ঞার্থং (সম্যক্ জ্ঞানার্থং) তান্ ব্রবীমি ॥৭॥

হে দ্বিজোত্তম, আমাদের দলে যাঁহারা প্রধান, আমার সৈন্যের নায়ক (নেতা), তাঁহাদিগকে অবগত হউন, আপনার অবগতির জন্য বলিতেছি ॥৭॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ (যুদ্ধজেতা) অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিঃ তথৈব চ (সোমদত্তপুত্রঃ ভূরিশ্রবাঃ) ॥৮॥

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, সমরবিজয়ী কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ এবং ভূরিশ্রবাঃ ॥৮॥

মদর্থে ত্যক্ত জীবিতাঃ (মৎপ্রয়োজনার্থং জীবিতং ত্যক্তুমধ্যবসিতাঃ) নানাশস্ত্র-প্রহরণাঃ অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ [সন্তি] [তে সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ] ॥৯॥

আমার জন্য প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয়, নানা শস্ত্রধারী আরও অনেক বীর আছেন; তাঁহারা সকলেই রণপণ্ডিত ॥৯॥

তৎ (তাদৃশ) ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ অস্মাকং বলম্ অপর্য্যাপ্তং (অপরিমিতং অতএব অজেয়ং) ভীমাভিরক্ষিতম্ ইদং তু এতেষাং (পাণ্ডবানাং) বলং পর্য্যাপ্তম্ (পরিমিতং)।

[তাদৃশ বীরযুক্ত] ভীষ্ম কর্ত্তৃক রক্ষিত আমাদের সৈন্যগণ অপরিমিত, অতএব অজেয়। ভীম কর্ত্তৃক রক্ষিত এই ইহাদের (পাণ্ডবদিগের) সৈন্যগণ পরিমিত ॥১০॥

সর্ব্বেষু অয়নেষু (ব্যূহপ্রবেশ-দ্বারেষু) যথা ভাগম্ (বিভক্তং) স্বাং স্বাং রণভূমিম্ অপরিত্যজ্য) অবস্থিতাঃ [সন্তঃ] সর্ব্বে এব ভবন্তঃ ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্তু ॥১১॥

ব্যূহপ্রবেশ-দ্বারে আপনারা সকলে স্ব স্ব বিভাগানুসারে অবস্থান করিয়া ভীষ্মকেই রক্ষা করুন ॥১১॥

উপরোক্ত টীকা ভিন্ন প্রাচীন টীকাকারগণ কৃত ৭ম হইতে ১১শ শ্লোক পর্য্যন্তের উল্লেখযোগ্য টীকা নাই। বাবু বঙ্কিমচন্দ্র দুর্য্যোধনের পক্ষের দুই তিনটী যোদ্ধার সামান্য কিঞ্চিৎ পরিচয় মাত্র দিয়াছেন এবং শ্রীধর স্বামীর অনুকরণে অপর্য্যাপ্ত শব্দের অর্থ অসমর্থ এবং পর্য্যাপ্তের অর্থ সমর্থ

১০॥ * অপর্য্যাপ্ত ও 'পর্য্যাপ্ত' এই দুই শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। টীকাকারগণের মধ্যে শ্রীমদানন্দ গিরি 'অপর্য্যাপ্ত' শব্দের অর্থ অপরিমিত, অজেয়, এবং 'পর্য্যাপ্ত' শব্দের অর্থ পরিমিত, মনে করিয়াছেন। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণও অপর্য্যাপ্ত অপরিমিত এবং পর্য্যাপ্ত শব্দে পরিমিত অর্থ স্থির করিয়াছেন। শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী 'অপর্য্যাপ্ত' অর্থে যুদ্ধে অসমর্থ, 'পর্য্যাপ্ত' অর্থে যুদ্ধে সমর্থ স্থির করিয়াছেন। শ্রীমন্নীলকণ্ঠ পর্য্যাপ্ত শব্দের পরিবেষ্টিত অর্থ স্থির করিয়াছেন। শ্রীমৎ চক্রবর্ত্তী 'অপর্য্যাপ্ত' অপরিপূর্ণ অর্থাৎ যুদ্ধে অক্ষম, স্থির করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন বলদেব বিদ্যাভূষণ অপর্য্যাপ্ত অর্থে যে অপরিমিত বুঝাইতে চাহেন, তাহার কারণ দর্শাইয়াছেন; উহা আমাদের কৃত সমালোচনায় প্রকাশ পাইবে, এজন্য এস্থানে বিশদ ভাবে লিখিলাম না।

করিয়াছেন; কিন্তু ঐ অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না। ওরূপ অর্থ করিলে, পূর্ব্বাপর বাক্যের অসামঞ্জস্য এবং কর্ত্তার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায়ের সহিত অসংলগ্নতা হয়; কিন্তু আনন্দগিরি প্রভৃতি কয়েকজন টীকাকার অপর্য্যাপ্ত অর্থে অপরিমিত এবং পর্য্যাপ্ত অর্থে পরিমিত বলিয়া যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ঐ ব্যাখ্যাই সুসঙ্গত বোধ হয়; যেহেতু রাজা দুর্য্যোধন প্রথমতঃ পাণ্ডবদিগের প্রধান প্রধান সেনাপতির পরিচয় দিয়া, কিন্তু "আমাদিগেরও দলে যে সকল প্রধান প্রধান সেনাপতি আছেন, তাহাও অবগত হউন" এই বলিয়া আপনি দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজেতা কৃপ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সৌমদত্ত, প্রভৃতির কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়ায়, পাণ্ডবদিগের বল অপেক্ষা স্বীয় বল ন্যূন নহে, এই অভিপ্রায় প্রকাশ পায়, এবং স্বীয় পক্ষের ভীষ্মাভিরক্ষিত ও প্রতিপক্ষের ভীমাভিরক্ষিত বল (সৈন্য), এই উক্তি ভীষ্মের প্রাধান্য বা স্বীয় বলের গুরুত্বসূচক। বলদেবের টীকায় প্রকাশ যে, স্বীয় পক্ষের সৈন্যমণ্ডলী সুবিখ্যাত সূক্ষ্মবুদ্ধি অতিরথ অসামান্য বীর ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরিচালিত ও সুরক্ষিত, এবং পাণ্ডবদিগের সৈন্যসমূহ চপলচিত্ত সামান্যবুদ্ধি অপরিণামদর্শী হঠকারী ভীম কর্ত্তৃক পরিচালিত ও রক্ষিত, ঐ সকল বিষয় বিবেচনায়, স্বীয় বলের শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

তদ্ভিন্ন "অন্যেচ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। নানা শস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ" প্রভৃতি বিশেষণগুলি স্বীয় বলের শ্রেষ্ঠতাপ্রতিপাদক, সুতরাং উপরোক্ত বাক্য প্রয়োগের সহিত ভীষ্ম-রক্ষিত সৈন্য যুদ্ধে অসমর্থ, ও ভীম-রক্ষিত সৈন্য যুদ্ধে সমর্থ, এরূপ উক্তি কখনই সঙ্গত হইতে পারেনা। "মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ" অর্থাৎ আমার জন্য সৈন্য ও সেনাপতিগণ যুদ্ধে জীবন দিতে প্রস্তত; দুর্য্যোধনের এই উক্তি প্রাচীন আর্য্যজাতির অতীব শ্লাঘার বিষয়। নিজের প্রাণাপেক্ষা সমষ্টি-প্রজার প্রতিনিধি স্বরূপ রাজার বা রাজ্যের হিত যে গুরুতর, এই শিক্ষা বা জ্ঞান যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই জগতের শ্রেষ্ঠ। এই গুণেই আজ ইংরাজ জাতি পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসনে আসীন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কর্ম্ম ও চিত্রগুপ্ত।*

পুরাণে চিত্রগুপ্তের উল্লেখ আছে। তিনি প্রত্যেক হিন্দুসন্তানেরই পরিচিত। আমরা ইহ জীবনে যে সকল কর্ম্ম করি, তাহা তিনি লিপিবদ্ধ করেন, এবং তাঁহার

---

* ১। মহাভারত।
২। পদ্মপুরাণ।
৩। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।
৪। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।
৫। শ্রীযুত চন্দ্রশেখর বসু কৃত পরলোকতত্ত্ব।
৬। Astral plane.
৭। Secret doctrine.
৮। Psychometry and thought-transference.

সেই হিসাব অনুসারে আমাদিগকে দণ্ডিত বা পুরস্কৃত হইতে হয়; সুতরাং তাঁহার বিষয়ে আলোচনা বোধ হয় নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় নহে।

পুরাণে চিত্রগুপ্তের যেরূপ ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে। কিন্তু পুরাণাদি নানাবিধ অলঙ্কার ও অর্থবাদে পূর্ণ। কুকর্ম্মের বিভীষিকা-মূর্ত্তি অঙ্কণে ও নরক-যন্ত্রণার আতিশয্য প্রদর্শনে যেখানে যে অলঙ্কার ও অর্থবাদ সঙ্গত ও প্রয়োজনীয়, তাহাই পুরাণকে সুশোভিত করিয়াছে। অন্যথা চিত্র অঙ্গহীন হয় ও সাধারণের রুচিদায়ক ও চিত্তাকর্ষক হয় না। কিন্তু "অর্থবাদবাক্যানাং শাস্ত্রার্থং প্রামাণ্যং ন ভবতি।" অর্থবাদ শাস্ত্রবিচারে প্রামাণ্য নহে; অতএব অলঙ্কার ও অর্থবাদ বাদ দিয়া, চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধে আমরা কি উপদেশ পাইতে পারি, তাহাই আলোচিত হইবে।

"চিত্রগুপ্ত" শব্দটীর অর্থ বিশ্লেষণ করিলে, সাধারণবুদ্ধিতে আমরা ইহাই বুঝিতে পারি যে, "চিত্র" শব্দের অর্থ আলেখ্য বা প্রতিরূপ এবং "গুপ্ত" শব্দের অর্থ অদৃষ্ট বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অতীত। অর্থাৎ যে চিত্র বা আলেখ্য অদৃষ্ট, তাহাই চিত্রগুপ্ত বা গুপ্ত চিত্র।

আমরা দেখিতে পাই, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন পদার্থই ধ্বংসশীল নহে, কিন্তু শক্তির তারতম্যে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় মাত্র। আমরা যাহাকে বিনাশ বলি, সেই বিনাশ প্রকৃত পক্ষে অবস্থান্তর বা রূপান্তর বুঝিতে হয়, এবং তাহা যৌগিক পদার্থেরই পক্ষে ঘটিয়া থাকে। দুই, তিন বা ততোধিক মূল পদার্থের মিশ্রাংশ (component parts) সংযোগে যে পদার্থ উৎপন্ন হয়, সেই মূল পদার্থগুলি পুনরায় পৃথক্ হইলেই সেই উৎপন্ন পদার্থের বিনাশ বলিয়া থাকি।

এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থই মিশ্র (compound) পদার্থ। তাহারা শক্তি ও জড়ের সংমিলনের ফল বা পরিণতি। উভয়ই উভয়ের সাপেক্ষ-সম্বন্ধবদ্ধ। শক্তির অভাবে জড় পদার্থ থাকিতে পারেনা, জড়ের অভাবে শক্তিরও বিকাশ হয় না। শক্তির প্রধানতঃ যে দুই সত্তা—কেন্দ্রাভিমুখী (centripetal) ও কেন্দ্রাপসারিণী (centrifugal) আছে, তাহা কর্ত্তৃকই পরমাণুর সংযোগ ও বিয়োগ অহর্নিশ সংঘটিত হইতেছে। কঠিন পদার্থে কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি সমধিক প্রবল, সেইজন্য পরমাণুগুলি নিয়ত কেন্দ্রাভিমুখে আকৃষ্ট হওয়ায় স্বতঃই আকারবিশিষ্ট হয়; কিন্তু তরল পদার্থে এই শক্তি অপেক্ষাকৃত ন্যূন, তজ্জন্য তাহারা সেইরূপ আকার ধারণ করিতে পারে না। বায়ব পদার্থে এই শক্তি আরও কম। কেন্দ্রাভিমুখী শক্তির কার্য্য আকর্ষণ—(attraction) ও কেন্দ্রাপসারিণী শক্তির কার্য্য বিক্ষেপণ (repulsion)। কঠিন, তরল ও বায়ব পদার্থ যতই সূক্ষ্মাবস্থায় পরিণত হয়, ততই তাহাদের যোগাকর্ষণশক্তির হ্রাস ও বিক্ষেপণ-শক্তির বৃদ্ধি হয় এবং বিক্ষেপণ-শক্তির পরিমাণানুসারে গতিশীলতাও বর্দ্ধিত হয়। সেই কারণে কঠিন পদার্থ যেখানে রাখা যায়, সেই খানেই থাকে; তরল পদার্থ সেইরূপ থাকে না। আবার বায়ব অবস্থায় বিক্ষেপণ-শক্তি

অধিকতর প্রবল হওয়ায়, তাহারা কোন প্রকার আকার ধারণ না করিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সংক্ষেপতঃ কঠিনে বিক্ষেপণশক্তি অপেক্ষা যোগাকর্ষণ-শক্তি প্রবলতর; তরলে এই শক্তি সমতুল এবং বায়বে যোগাকর্ষণ-শক্তি অপেক্ষা বিক্ষেপন-শক্তি অধিকতর। কিন্তু পদার্থ যেরূপ অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তাহার পরমাণুর ধ্বংস হয় না। একসের জল উত্তপ্ত করিলে, উত্তাপের পরিমাণানুসারে জল কমিয়া যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জলের পরমাণু কিছুই নষ্ট হয় না; তাহা উত্তাপ সহকারে বাষ্পাকার ধারণ করে। আমরা যে জল দেখিতে পাই, তাহা আর্য্যশাস্ত্রোক্ত পঞ্চ ভূতান্তর্গত জলতত্ত্ব নহে। ইহা যৌগিক পদার্থ। রসায়ন মতে অম্লযানের (oxygen) এক অংশ এবং উদযানের (hydrogen) দুই অংশে জল উৎপন্ন হয়। বাষ্প বা বরফ হইলেও এই উভয় অণুর (molecules) পরিমাণ নষ্ট বা বা তাহার কোন ইতর-বিশেষ হয় না। এমন কি, জল বাষ্পাকার ধারণ করিলে ভারত্বেরও লাঘব হয় না। বিজ্ঞানে বলে, এক ঘনফুট জল বাষ্প হইলে, ১৭০০ ঘনফুট স্থল বিস্তৃত হইয়া পড়ে, কিন্তু এক ঘনফুট পরিমাণ জল ১০০০ আউন্স ভার হইলে; বাষ্প-অবস্থাতেও সেই ভারত্ব থাকে, এক রতি লঘু হয় না। তবে প্রভেদ এই যে, তরল অবস্থায় যে যোগাকর্ষণ-শক্তি থাকে, বায়ব অবস্থায় তাহার হ্রাস হয় ও গতিশীলতা (velocity) বর্দ্ধিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, শক্তির ইতর-বিশেষে জগতের প্রত্যেক পদার্থই অবস্থান্তরিত ও রূপান্তরিত হয়, কিন্তু কোন পদার্থই একেবারে বিনষ্ট হয় না। আমাদের কর্ম্ম, কায়িক বা বাচিক বা মানসিক, যেরূপই হউক না কেন, তাহাও একেবারে বিনষ্ট হয় না। তাহা সংস্কার (imprssion) রূপে মানস-ক্ষেত্রেই অঙ্কিত হউক অথবা মহাকাশেই বিলীন হউক, কোন না কোন রূপ অবস্থায় অবশ্য কোথাও অবস্থিতি করিবে। তাহা আমাদের অদৃষ্ট বটে, কিন্তু তাহার ফল কোন না কোন সময়ে অবশ্য ফলিবে। যেহেতু প্রত্যেক কার্য্যের কারণ আছে এবং প্রত্যেক কারণেরই তদনুরূপ ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে; ইহা বিজ্ঞান-সম্মত।

আর্য্যবিজ্ঞান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিরোধী নহে। "Nature never loses anything" এই মহাবাক্য আর্য্যশাস্ত্র সর্ব্বতোভাবে প্রতিপাদন করিতেছে। আর্য্য-শাস্ত্রের মূল তত্ত্ব এই যে, এ জগতের কোন পদার্থেরই একেবারে বিনাশ নাই, অথচ তাহারা এক ভাবেও নাই। তাহারা নিয়তই পরিবর্ত্তন ও গতিশীল; তজ্জন্য এই বিশ্বচরাচর "জগৎ" নামে উক্ত হয়। সাগর-জল বাষ্পাকার ধারণ করিয়া পুনরায় জল রূপেই পরিণত হয়। মৃত্তিকা হইতে লতা-গুল্মাদি উত্থিত হইয়া, জীববিশেষের উদর-পোষণাদি করিয়া মৃত্তিকাকারেই পরিবর্ত্তিত হয়। এ পরিবর্ত্তন অনাদি ও বিচিত্র।

আর্য্যশাস্ত্র মতে এই জগৎ-সৃষ্টির মূলে দুইটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে একটী মহাকাশ। ইহা সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বত্র বিদ্যমান। জগৎব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া

এই আকাশীয় তত্ত্ব অনবচ্ছিন্ন আণবিক স্রোত রূপে চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ, প্রত্যেক পদার্থে প্রবহমান রহিয়াছে। এমন কি, পদার্থের শ্বেত-কৃষ্ণাদি বর্ণ, শীতোষ্ণাদি স্পর্শ, তীব্র-মন্দ ইত্যাদি শব্দ এই আণবিক স্রোত কর্ত্তৃক বিকাশিত হয়।

শাস্ত্রে আকাশ, পবন, তেজ, অম্বু ও ক্ষিতি, এই পাঁচটীকে সূক্ষ্মভূত বা মহাভূত বা অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত বা তন্মাত্র কহিয়া থাকেন; কিন্তু এই পাঁচটী যে একেবারে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে। ফলে "আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।" আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে, ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। সুতরাং "যথাক্রমং কারণতামেকৈকস্যোপযাস্তিবৈ।" পূর্ব্ববর্ত্তী পরবর্ত্তীর কারণতা লাভ করায়, আকাশই এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের আদি উপাদান-কারণ। এই মহাকাশ হইতেই অনুলোম-ক্রমে বাষ্পীয়, তরল ও কঠিন পদার্থ সকল উৎপন্ন এবং বিলোমক্রমে ক্রম-পরম্পরায় আকাশেই পরিণত হয়।

এই পৃথিবীতে আমরা যাহা দেখিতে পাই, তাহা জড় পদার্থ। তাহা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত। কঠিন (solid) তরল (liquid) এবং বাষ্পীয় (gaseous); কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাষ্প (gas) আমরা দেখিতে পাই না ; শীতল বাতাস সংযোগে ঘনীভূত হইলেই তাহা আমাদের গোচরীভূত হয়। প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিৎ মিঃ ফারাডে (Mr. Fareday) বলেন, কঠিনাকারে পদার্থ কঠিন, অস্বচ্ছ ও নানা বর্ণবিশিষ্ট থাকে। তরলাকারে কঠিনের গুণাবলী মন্দীভূত হইয়া, তরল, স্বচ্ছ ও অপেক্ষাকৃত বর্ণহীন হয়। বায়ব অবস্থায় কঠিনের কঠিনতা ও তরলের তরলতা দূরীভূত হয়। এই অবস্থায় পদার্থের বর্ণ বিলুপ্ত ও স্থিতিস্থাপকতা গুণ বর্দ্ধিত হয়। পদার্থের প্রত্যক্ষীভূত সমুদায় গুণ দূরীভূত হইয়া, কেমন ঐ এক রকম অদৃশ্যাকারে অবস্থিতি করে। পদার্থের এই ত্রিবিধ অবস্থা ভিন্ন তিনি আর এক প্রকারে অবস্থার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পূর্ব্বোক্ত বায়ব পদার্থের পরাবস্থা যদি আমরা কল্পনা-পথে আনয়ন করিতে পারি, তাহা হইলে যাহা থাকে, তাহাই পদার্থের চতুর্থাবস্থা। এই অবস্থাপন্ন পদার্থকে তিনি (radiant matter) নামে অভিহিত করেন। প্রফেসর ক্রুকস্ (Prof. Crooks এই চতুর্থাবস্থাপন্ন পরমাণুর পরাবস্থা রূপে এক প্রকার আদি পরমাণুর অস্তিত্ব কল্পনা করেন। তাহাকে protyle বা original matter (তন্মাত্রা) বলা যায়। এই অনুমানের আর উচ্চ স্তরে উঠিতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ পারেন নাই। তাঁহারা বলেন "Is it possible, that behind this protyle, we may still trace growth and evolution"

যাহা হউক, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এক (Ether) "ঈথার"এর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া, জগতে অভিনব-কীর্ত্তি-বিস্তার ও মানবের মহা উপকার সাধন করিয়াছে। সাধারণতঃ আকাশকেই ঈথার কহা যায়। আপাতত

দৃষ্টিতে এই অনন্ত ও বিশাল আকাশ (ঈথার) কেবল শূন্য বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা শূন্য (অর্থাৎ কিছু না) নহে। অনন্ত কোটী সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু অনবচ্ছিন্ন ভাবে তাহাতে বিরাজমান রহিয়াছে।

"ঈথর" কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক গ্যানো Prof. Ganot বলেন—"It is imagined that all spaces, the interplanetary spaces as well as the interstices in the hardest crystal or the heaviest metal, in short, matter of any kind is permeated by a medium having the properties of infinite called ether" অর্থাৎ কি গ্রহ-নক্ষত্রাদির মধ্যস্থিত বিশাল ব্যবধান, কি কঠিন স্ফাটিকময় বা সান্দ্র ধাতব পদার্থের অণুমধ্যস্থ সূক্ষ্মতম অন্তর, সকল স্থানই এক সূক্ষ্মতম অসীম পদার্থরাশিতে পরিপূর্ণ। এই পদার্থেরই নাম ঈথার। সংক্ষেপতঃ—সকল স্থানেই এই ঈথার বিদ্যমান রহিয়াছে। পুনশ্চ "ঈথর কি ?" এ সম্বন্ধে বিজ্ঞানবিৎ মিঃ ম্যাকস্ওয়েল (J. Clark Maxwell) বলেন যে, "ঈথার সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা যতই আয়াসসাধ্য হউক না কেন, গ্রহ-নক্ষত্রাদির ব্যবধানস্থিত স্থান সকল যে, একেবারে শূন্য নহে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহা এক প্রকার সূক্ষ্মতম জড়পদার্থরাশিতে পরিপূর্ণ। কিন্তু তাহা এতাদৃশ বিশাল ও অবিচ্ছিন্ন যে, আমরা যতদূর বিশাল ও অবিচ্ছিন্ন পদার্থের সম্ভাবনা ধারণা করিতে পারি, তন্মধ্যে ইহার বিশালতা ও অবিচ্ছিন্নতা সর্ব্বাপেক্ষা গরীয়সী"। *

এই 'ঈথার' স্থিত পদার্থের বিস্তৃতি এতাদৃশ অধিক এবং তদন্তর্গত পরমাণুর সংখ্যা এতাদৃশ বিরল যে, তাহা পদার্থ বা পরমাণুময় না বলিয়া শূন্যও বলা যাইতে পারে। প্রফেসর ক্রুকস্ (Prof. Crooks) বায়ু-নিষ্কাষণ যন্ত্রদ্বারা এক পাত্রস্থ বায়ু যথাসাধ্য নিষ্কাষণ পূর্ব্বক পরীক্ষা দ্বারা পাত্রস্থ শূন্য স্থানের এক ঘন ইঞ্চি পরিমিত স্থানে কিঞ্চিদধিক ষোড়শ (সিক্‌স্‌টী লিওন) ১৬, ৩৮৬, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০) অণুর অস্তিত্ব স্থিরীকরণ করেন; কিন্তু আকাশমণ্ডলে কিঞ্চিদধিক ষোড়শ কোয়াড্রিলিওন (১৬, ৩৮৬, ০০০, ০০০, ০০০, ০০০) অণুর অস্তিত্ব অনুমান করেন। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, নিষ্কাষিত বায়ুশূন্য স্থানে পরমাণু যত, আকাশমণ্ডলে তাহার সংখ্যা লক্ষাংশের এক অংশ মাত্র, অথবা তাহার বিস্তৃতি শত সহস্র গুণ অধিক।

মিঃ ডেকার্টে বলেন, বিস্তৃতি জড়ের প্রধানতম ধর্ম্ম এবং জড়ই বিস্তৃতির অবশ্যম্ভাবী

---

* Whatever difficulties we may have in forming a consistent idea of the constitution of the ether, there can be no doubt that the interplanetary and interstellar spaces are not empty, but are occupied by a material substance or body, which is certainly largest and probably the most uniform body of which we have any knowledge. (J. Clark Maxwell.)

পরিণতি। দুইটী পদার্থ বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত দৃষ্ট হইলেও, তাহাদের ব্যবধান-স্থান একেবারে শূন্য নহে; এক প্রকার অবিচ্ছিন্ন জড় পদার্থ রাশিতে পরিপূর্ণ। তাহা অতি সূক্ষ্ম ও উভয়ের মধ্যে বাহন রূপে (medium) কার্য্য করিয়া থাকে।

জগদ্বিখ্যাত সার আইজ্যাক্ নিউটন তাঁহার আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ-শক্তিকে এই ঈথারের চাপের তারতম্য বশাৎ স্থির করিয়াছিলেন; কিন্তু পরীক্ষা ও অভিজ্ঞান দ্বারা এই বাহনরূপী ঈথরের গুণাগুণ স্থিরীকরণ করিতে পারেন নাই ও প্রাকৃতিক ঘটনা নিচয়ের উৎপত্তি বিষয়ে ইহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে অভিলষিত ফল পান নাই বলিয়া, তাঁহার এইমত প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু প্রাচীন মিশরবাসী পণ্ডিতগণ বলিতেন যে, জগদুদ্ভাবিনী অনন্ত ভাব-শক্তি (eternal ideas) ঈথারেই সমাহিত ছিল এবং সেই ভাবই শক্তি ও জড়রূপে পরিণত। এই মতের সহিত আমাদের আর্য্যমতের অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

অবশ্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের ঈথার ও আর্য্যশাস্ত্রোক্ত মহাভূত-আকাশ, এই উভয়ের মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরমাণুর ন্যূনাধিক্যে এক প্রকার পদার্থ নানাভাগে বিভক্ত হইলেও, সাধারণতঃ তাহা এক নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। প্রস্তর ও বালুকা উভয়ই কঠিন পদার্থ, জল ও তৈল উভয়ই তরল পদার্থ বলিয়া উক্ত হয়, কিন্তু প্রস্তর ও বালুকায়, জল ও তৈলে বিস্তর প্রভেদ। তাহাদের পরমাণুর ন্যূনাধিক্য আছে। যোগাকর্ষণেরও তারতম্য আছে ও ভারত্বের ইতর-বিশেষ আছে।

"থিয়সফী" গ্রন্থে আকাশ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ 'য়্যাষ্ট্রাল লাইট'এর প্রতিশব্দ রূপে, কেহ বা সূক্ষ্ম প্রকৃতি রূপে, কেহ বা সূক্ষ্ম ও স্থূলের মধ্যবর্ত্তী ঐ এক প্রকার পদার্থ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইদানীন্তন তাত্ত্বিকগণ (Theosophishts) আকাশ ও 'য়্যাষ্ট্রাল লাইট'এর পার্থক্য এইরূপ প্রদর্শন করেন যে, যদি বৈজ্ঞানিকগণের 'ঈথার'কে সসীম (bound ether) ও অসীম (free ether), এইরূপ দুই ভাগে বিভাগ করা যায়, তাহা হইলে "য়্যাষ্ট্রাল লাইট' ও আকাশের সহিত যথাক্রমে তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। স্বর্গীয়া ম্যাডাম্ ব্লাভট্স্কী এই "য়্যাষ্ট্রাল লাইট"কে আকাশের অপকৃষ্টাংশ বা স্থূলাকাশ রূপে বর্ণন করিয়াছেন এবং ভ্রম-প্রমাদ পরিহার জন্য দ্বিতীয় নীলাকাশ আখ্যা দিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষে আকাশের কোন বর্ণ নাই। জলবিহীন মরুভূমিতে যেমন জলভ্রম, বর্ণহীন আকাশের নীলত্বও তদনুরূপ। উক্ত মনীষিণী বলেন, এই নীলাকাশ মানবের জান্তব প্রকৃতির স্মৃতিপট। এই জড় জগতে যত প্রকার ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহা এই নীলাকাশে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। ইহা অতি নিগূঢ় সত্য, তৎ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

(ক্রমশঃ)

জনৈক জ্ঞান-ভিক্ষু।

আত্মজ্ঞান।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের শেষ।*)

(৮) পক্ষান্তরে, জীবাত্মার স্বয়ম্প্রকাশ আত্মপদে ব্রহ্মকে গ্রহণ না করিলে, স্বতঃসিদ্ধ রূপে ব্রহ্মের অস্তিত্বও প্রকাশিত হয় না। কেননা, ব্যবহারিক অবস্থায় জীবাত্মা, দেহ-মনাদি ঘটিত কর্তৃ-ভোক্তৃত্বের অভিমানী বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ মাত্র। তাদৃশ অভিমানী জীবের বুদ্ধিতে বড় উর্দ্ধ ব্রহ্ম কেবল তটস্থ লক্ষণে, সগুণ ভাবে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুরুষ-রূপে ফলদাতা দেবতার ন্যায় উপলক্ষিত হইতে পারেন। কিন্তু আত্মস্বরূপ প্রথম পুরুষরূপে, স্বরূপ লক্ষণে প্রকাশিত হন না। ফলে যখন জীবাত্মার আত্ম-আলম্বন স্বরূপ পরমাত্মার স্বয়ম্প্রকাশ জ্ঞানানন্দপূর্ণ করুণাজ্যোতিতে সর্ব্বপ্রকার জীবত্বাভিমানরূপ ধ্বান্তরাশি নিরস্ত হয়,তখন জীবাত্মা অনুভব করিতে পারেন যে, "আমার এই যে জ্বলন্ত জীবন্ত অহংপ্রত্যয়, ইহাত আমার সৃষ্ট নহে, অথবা আমি স্বয়ম্ভূও নহি; কিন্তু আমি দেখিতেছি, এক স্বয়ম্ভূ সার্ব্ব-ভৌমিক ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশক পরমাত্মজ্যোতিঃ আমার প্রতিষ্ঠাস্থানে অবস্থিতি করিয়া আমাকে আত্ম বুদ্ধিদ্বারা প্লাবিত করিয়া দিতেছেন; অতএব ঐ জ্যোতিই আমার আমিত্বরূপ অবলম্বন"। এইরূপে, মোক্ষাধিকারী জীবের আত্মরূপ নির্ম্মলকোষে পরব্রহ্ম স্বরূপলক্ষণে স্বয়ম্প্রকাশিত হন এবং অবিদ্যাচ্ছন্ন আত্মত্বের পরিবর্ত্তে জীবাত্মার মুখ্য আত্মপদস্থ প্রথম পুরুষরূপে প্রতিভাত হন। পরব্রহ্মের জ্বলন্ত ও জীবন্ত অস্তিত্বের মহাপ্রমাণ ও স্বরূপ-বোধ এই একমাত্র আত্ম-প্রত্যয়সার। অতএব আত্মজ্ঞান এক দিকে জীবের মোক্ষ, অন্যদিকে ব্রহ্মের স্বয়ম্প্রকাশ ও স্বরূপ লক্ষণ প্রতিপাদন করে; এবং মুক্তের স্বরূপ যে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, এই পরমগতি ও পরমলোক রূপ—উজ্জ্বল পরলোকতত্ত্ব ও অপুনর্ভবধ্রুব অমৃতত্বরূপ চরমসিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করে।

(৯) এযাবৎকাল উপনিষৎ, বেদান্ত ও আগম-প্রতিপাদ্য "ব্রহ্মজ্ঞান" ও "আত্মজ্ঞান" শব্দের বিস্তর অপব্যবহার ও অপসিদ্ধান্ত হইতে দেখাগিয়াছে। ব্রহ্মকে জীবের মুখ্যাত্মারূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা না করিয়া, স্বার্থপর ও অজিতেন্দ্রিয় লোকে স্বীয় সোপাধিক জীবাত্মাকে পরমাত্মারূপে ধরিয়া লইয়াছে এবং সেই ছল ধরিয়া, অনেক পরমহংস, সন্ন্যাসী ও বৈদান্তিক ও তান্ত্রিক ব্রহ্মজ্ঞানী-গৃহস্থ, নানা পাপাচার করতঃ আপনাদিগকে নিরপরাধী প্রমাণ করিবার নিমিত্ত পাপ-পুণ্যে আত্মার নির্লিপ্ততার উদাহরণ দিয়াছেন। এইরূপে তাদৃশ আত্মবাদী ও ভাক্ততত্ত্বজ্ঞানীগণ সুখ-দুঃখের অধীন অবিদ্যাঘনাচ্ছন্ন উপাধিজালজড়িত অনীশ জীবাত্মাকে সর্ব্বেসর্ব্বা ভাবিয়া মহানাস্তীতিবাদ-পঙ্কে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রের উদ্দেশ্য অতি মহান্। আত্মজ্ঞানের পথ ক্ষুরধারের তুল্য সূক্ষ্ম। অনাচারী ও দুশ্চরিত্র হইতে অবিরত ব্যক্তি উহার অধিকারী নহে। শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্মযোগানুষ্ঠান, শম-দমাদি সাধন, শ্রুতি-বেদান্ত অথবা পুরাণ ও আগম-প্রতিপাদ্য

*গত পৌষ-মাঘ মাসের হিন্দু-পত্রিকায় এই প্রবন্ধের পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশে ৩১২ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ পংক্তিতে "প্রলয়ের" শব্দের পরে "অতীত" শব্দ বসিবে।

ব্রহ্মজ্ঞানাঙ্গ উপদেশ সকল পাঠ বা শ্রবণ এবং সাধুসঙ্গ-প্রভাবে চরিত্র নির্ম্মল হইলে ও জীবধর্ম্মে বৈরাগ্য জন্মিলে, পরমাত্ম-দর্শন জন্য প্রার্থনা অর্থাৎ একাগ্রতৃষ্ণা জন্মে; এবং অবিলম্বে তাহার উত্তরসাধনার্থ সবিতৃজ্যোতি-প্রকাশবৎ পরমাত্মীয় স্বয়ম্প্র-কাশ জ্ঞানজ্যোতি অবতীর্ণ হইয়া, সাধকের আত্মধামে পুরাতন সম্পত্তিরূপ পরমাত্ম-জ্ঞানকে প্রকাশ করেন; অথবা ইহাই বল যে, তাদৃশ তীব্রতৃষ্ণা নিবারণার্থ পরমাত্মীয়া জ্ঞানলক্ষণা পরাভক্তিস্বরূপিণী ঘনঘটা অগৌণে অবিরলধারে শান্তিবারি বর্ষণ করতঃ সাধকের আত্মসম্পৎকে, চতুর্বেষ্টিত উপাধি-আবরণ রূপ মল ধৌত পূর্ব্বক, নির্ম্মল কান্তিতে প্রকাশ করিয়া দেন।

(১০) এই প্রকার উপাধি-কল্পনাশূন্য এবং সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়ালক্ষণবিরহিত যে আত্মজ্ঞান, তাহাই উপদেশ করিবার নিমিত্ত উপনিষৎশাস্ত্রের এবং তাহার মীমাংসা স্বরূপ বৈয়াসিকী শারীরক দর্শনের অভ্যুদয় এবং পরমারাধ্য সদাশিব তাহার কলাবতী, উগ্রতপা, আদরবতী, রসবতী, পূর্ণরসা, প্রভৃতি শ্রুতিগণকে পরম সমাদরে মনোহর ভাষায় স্বমুখোক্ত আগমশাস্ত্রে ব্যক্ত করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর অন্তিম মঙ্গলার্থে মহাদেবী পার্ব্বতীকে তাহা শ্রবণ করাইয়া-ছিলেন। এই আত্মজ্ঞান, উদ্দেশ্যতঃ ক্রিয়া-লক্ষণশূন্য হইলেও, কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ উহাকে ক্রিয়ার বিষয় ও অঙ্গরূপে গ্রহণ করিতে ত্রুটী করেন নাই। শারীরক দর্শনের (৩।৪। ১ অধিঃ) "পুরুষার্থোতঃ শব্দাদিতি বাদ-রায়ণঃ" প্রভৃতি সূত্রে ব্যাসদেব মীমাংসা করিয়াছেন যে, আত্মজ্ঞানের অর্থ "ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান"—ব্রহ্মকে আত্মারূপে জ্ঞান করা; অর্থাৎ, জীবাত্মার আপনাকেও নহে, দেহা-দিকেও নহে। কর্ম্মীরা দাবী করেন যে, ঐহিক স্থূলদেহ হইতে ব্যতিরেক করিয়া দেখিলে "ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিযুক্ত আত্মার" যে অস্তিত্ব অনুমিত হয়, তাহার নাম "আত্মজ্ঞান" এবং তাহা কর্ম্মের অঙ্গ। কেননা, মনুষ্য স্বীয় ও পিতা মাতার তাদৃশ আত্মার মঙ্গলার্থে ক্রিয়া করিয়া থাকেন। সুতরাং ঐ "আত্মা" রূপ জ্ঞানটী ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক এবং ক্রিয়ার সহিত তাহার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। কর্ম্মীদের কথার যদি বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া যায়, তবে তাঁহাদের পক্ষ হইয়া এইরূপ আরো কহিতে পারা যায় যে, "আত্মজ্ঞান" শব্দটি, ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিরহিত, কর্ম্মফলাদিশূন্য, কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বব্যতিরিক্ত কোন কৈবল্য বা ব্রহ্মজ্ঞানকে বুঝায় না, এবং সেরূপ নির্গুণ ভাবে কোন অবস্থায় আত্মা থাকিতে পারেন না। উক্ত অধিকরণে তাঁহাদের পূর্ব্বপক্ষ এইরূপে উক্ত হইয়াছে, যথা—

"আত্মনো দেহাদিব্যতিরেকজ্ঞানমন্তরেণ পরলোকগামিত্বানিশ্চয়াৎ জ্যোতিষ্টোমাদি প্রবৃত্তিরেব নস্যাদিতি ক্রতুষু প্রবর্ত্তকত্বেন ঔপনিষদমাত্মজ্ঞানং কর্ম্মাঙ্গমিতি"। অর্থাৎ আত্মা পার্থিব দেহ হইতে স্বতন্ত্র, এইরূপ ব্যতিরেক-জ্ঞান ব্যতীত জ্যোতিষ্টোমাদি ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি হয় না। অতএব দেহ-ব্যতিরিক্ত যে আত্মজ্ঞান, তাঁহা "কর্ম্মাঙ্গ"; উপনিষদে তাহারই উপদেশ করিয়াছেন; ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের নহে। এস্থানে প্রাসঙ্গিকরূপে

বক্তব্য এই যে, কর্ম্মিগণ তো এরূপ বলিতেই পারেন; কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রীয় কর্ম্মকাণ্ডের অনুরোধ রাখেন না, কেবল মাত্র ঈশ্বরচিন্তা বা বিদ্যানুশীলন করেন, তাঁহারা কি আত্মতত্ত্বকে কর্ম্মীদিগের ব্যাখ্যাত আত্মজ্ঞান অপেক্ষা সূক্ষ্মতর রূপে চিন্তা করিয়া থাকেন? অথবা চিন্তা করা উচিত বোধ করেন?।

(১১) যাহাহউক, শাস্ত্রাবলম্বী ব্রহ্মবাদী ঐ শাস্ত্রীয় পূর্ব্বপক্ষের উত্তর দিতেছেন।—

"দেহব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞানং দ্বিবিধং। একং পরলোকগামিকত্রাত্মজ্ঞানঞ্চ; দ্বিতীয়ং ব্রহ্মাত্মজ্ঞানঞ্চ।"। আত্মজ্ঞান দুই প্রকার। "অহংকর্ত্তা" এবং "অহং ব্রহ্মাস্মি।" ইহার প্রথমটী কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। দ্বিতীয়টী কর্ম্মের নিবর্ত্তক। কিন্তু এই বর্ত্তমান কালে "অহংকর্ত্তা" জ্ঞানই যেরূপ বিষয়কর্ম্মে, সেইরূপ নবীন অশাস্ত্র নিরাকার ঈশ্বরোপাসনাতেও বিরাজ করিতেছে। ব্রহ্মাত্মজ্ঞানের কথা শুনিতে পাওয়া যায়না।

অতএব উপনিষদুক্ত আত্মজ্ঞান মোক্ষস্বরূপ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান মাত্র। তাহা কর্ম্মাধিকারের অতীত, সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বশূন্য, ঐহিক পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার ফলপ্রার্থনাযুক্তউপাসনাবর্জ্জিত, এবং শুদ্ধ ঐহিক বা পারলৌকিক স্থূল শরীরের অতীত নহে; কিন্তু স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, এই ত্রিবিধ দেহেরই অতিক্রান্ত। আর তৎসমূহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ সকল ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মনোবুদ্ধি ও দেহবীজস্বরূপিণী প্রকৃতির অতিক্রান্ত। নতুবা, আত্মা এই স্থূলদেহ মাত্র হইতে স্বতন্ত্র, অথবা আত্মারূপ চৈতন্য উক্ত শরীরের ধর্ম্ম নহে, এই মাত্র জানার বা বিশ্বাসের নাম আত্মজ্ঞান নহে। কিম্বা আত্মা এ দেহ ত্যজিয়া, প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির সমষ্টি স্বরূপ সূক্ষ্ম শরীর নিবন্ধন পরলোকে কোনরূপ শুভাশুভ ভোগায়তন কলেবর লাভ করতঃ স্বকর্ম্মের ফল ভোগ করিবেন, এরূপ কোন বিজ্ঞানও আত্মজ্ঞান নহে।

(১২) সমস্ত মোক্ষশাস্ত্রেই আত্মজ্ঞানের উপদেশ। ব্রহ্মই পরমাত্মা। তিনি পরমাত্মা রূপে সকল জীবাত্মার ও সকল জগতের আত্মা। অবিদ্যার অধিকারে পড়িয়া, সেই আত্মজ্ঞানের অভাবে, দেহকে আত্মা ভাবিয়া জীবের জীবাত্মবোধ; অথবা মনোবুদ্ধিকে আত্মা জ্ঞান করিয়া জীবত্ব-অভিমান; এই অবিবেক জন্যই জীবের ঐহিক-পারলৌকিক সংসারবন্ধন ও শোক-মোহ। তাহা নিবারণ পূর্ব্বক নিত্য অমৃতত্বরূপ আত্মজ্ঞানই ঐ সকল শাস্ত্রের প্রয়োজন। সেই একই ব্রহ্মকে ও আত্মজ্ঞানকে নানা শাস্ত্রে নানাভাবে বুঝাইয়াছেন। কঠোপনিষদে তাঁহাকে জীবের শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিরহিত বিদেহ-পরলোকতত্ত্ব ও ধর্ম্মাধর্ম্মকৃত অকৃত, ভূতভবিষ্যদাদি সর্ব্বব্যবহারগোচরাতীতরূপে উপদেশ করিয়াছেন। ভগবদ্গীতাতে তাঁহাকে দেহ ও আত্মার পারমার্থিক ভেদবিবেকাত্মক বস্তুতত্ত্ব স্বরূপ সম্যক্খ্যাত স্বতঃসিদ্ধ সাংখ্যজ্ঞান ও শোক-মোহের সাক্ষাৎ বিনাশ-জীব রূপে উপদেশ করিয়াছেন। ঈশোপনিষদে তাঁহাকে আত্মভাবে পালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কেনোপনিষদে তাঁহাকে বস্তুতত্ত্ব-প্রত্যগাত্মারূপে;

প্রশ্নোপনিষদে জীবাত্মার প্রতিষ্ঠা ও মৃত্যুব্যথার শান্তিস্থানরূপে; মুণ্ডকোপনিষদে সর্ব্বতো-আত্মভূতরূপে; মাণ্ডুক্যে "অয়মাত্মাব্রহ্ম" ব্রহ্মই তুরীয় ও বিজ্ঞেয় আত্মারূপে; ঐতরেয়োপনিষদে "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" রূপে; তৈত্তিরীয়োপনিষদে তটস্থ ও স্বরূপলক্ষণের জ্ঞেয় রূপে; ছান্দোগ্যে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য দ্বারা জীবের মুখ্যাত্মারূপে; এবং বৃহদারণ্যকে "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যের মহালক্ষ্য আত্মজ্ঞান রূপে—আত্মার আত্মা রূপে বুঝায়াইছেন।

(১৩) শারীরক সূত্রে (৪।১।৩ সূঃ) পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন পূর্ব্বক এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।—

"যচ্ছাস্ত্রপ্রতিপাদ্যং ব্রহ্ম তৎ জীবেন জ্ঞাত্রা স্বব্যতিরিক্ততয়া গৃহীতব্যং দুঃখ্যদুঃখিনোর্জ্জীব ব্রহ্মণোরেকত্রবিরোধাদি পূর্ব্বপক্ষঃ।" যিনি শাস্ত্রপ্রতিপাদ্য ব্রহ্ম, তাঁহাকে জীব স্বীয় আত্মা রূপে গ্রহণ করিবে, কি স্বব্যতিরিক্ত (নিঃসম্পর্ক, স্বতন্ত্র, দ্বৈত,) আত্মারূপে জানিবে। অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ আত্মজ্ঞান উপার্জ্জন করিবে, কি তাঁহার নাম মাত্র "পরমাত্মা," এইরূপ জ্ঞানে তাঁহাকে স্বতন্ত্র দেবতার ন্যায় ভাবিবে; এইরূপ সন্দেহে দুঃখি-অদুঃখীরূপ জীব ও ব্রহ্মের একত্র হওয়া অসম্ভবহেতু জীব তাঁহাকে স্বব্যতিরিক্ত নিঃসম্পর্ক আত্মারূপে জানিবে; ইহা পূর্ব্বপক্ষ। অথবা প্রাকৃত বুদ্ধি-যুক্তি ধরিয়া, এমনও বলিতে পার যে, ঈশ্বর আমার আত্মার আত্মা নহেন এবং তিনি জীবাত্মা হইতে সম্পূর্ণ দ্বৈতভাবে স্বতন্ত্র এবং জীবাত্মার সম্বন্ধে তিনি কেবল অনুগ্রাহক দেবতারূপে বর্ত্তমান। কিম্বা ইহাও বলিতে পার যে, তিনি জীবাত্মার অন্তরাত্মা হইলেও, তাঁহাতে মুখ্য আত্মবুদ্ধি করার কোন কারণ বা প্রয়োজন নাই; কেননা জীবাত্মবুদ্ধি চির স্বতন্ত্র। উক্ত পূর্ব্বপক্ষের যে উত্তর নিম্নে দিতেছেন, তাহা এই সকল অশাস্ত্র-উক্তিরও উত্তর। যথা "ঔপাধিকোবিরোধোঽত আত্মত্বেনৈব গৃহ্যতাং"। দুঃখি-অদুঃখীরূপ যে বিরোধ, তাহা ঔপাধিক মাত্র। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, এই ত্রিবিধ দেহের মায়ায় আবৃষ্ট হইয়া জীব তৎসমস্তে আত্মবুদ্ধি ও মমত্ব জ্ঞান করিয়া বৃথা এক অভিমানাত্মক জীবাত্মজ্ঞানে বদ্ধ হইয়া আছেন। জ্ঞানোদয়ে ঐ সকল উপাধি নিরস্ত হইলে, জীব, ব্রহ্মকেই আত্মা বলিয়া গ্রহণ করেন। তখন আপনার মধ্যে বা সন্নিধানে আর কোন আকর্ষণ থাকে না, যাহাকে আত্মজ্ঞান বা মমত্বজ্ঞান করিবেন। কেবল স্বতঃসিদ্ধ পুরাতন পরমাত্মাস্বরূপ ব্রহ্ম মাত্র অবশিষ্ট থাকেন এবং তাঁহাতে জীবের চিরস্থায়ী আত্মজ্ঞান জন্মে। অতএব অবিদ্যা-ঘটিত যে দেহাত্মজ্ঞান, তাহা সরিয়া গেলেই জীবের ব্রহ্মাত্মজ্ঞান সিদ্ধ হয়। সুতরাং হৃদয়বাসী পুরাতন আত্মারূপ ব্রহ্মকেই জীব স্বীয় আত্মারূপে গ্রহণ করিবেন। অতএব মহর্ষি ব্যাসদেব শারীরকে নিম্নস্থ সূত্রের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলেন "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তিচ" ব্রহ্মকে আত্মারূপে গ্রহণ করিবেক ও করাইবেক। ভারতী তীর্থ মুনি স্বীয় "অধিকরণমালায়" কহিলেন "গৃহ্নন্ত্যেব মহাবাক্যৈঃ স্বশিষ্যান্ গ্রাহয়ন্তিচ"। ইহাতে সিদ্ধান্ত করিলেন—

"অতএব অহং ব্রহ্মাস্মি, অয়মাত্মাব্রহ্ম, ইত্যাদি মহাবাক্যৈঃ তত্ত্ববিদঃ আত্মত্বেন ব্রহ্ম গৃহ্ণন্তি তথা তত্ত্বমসীত্যাদি মহাবাক্যৈঃ স্বশিষ্যান্ গ্রাহয়ন্ত্যপি তস্মাৎ আত্মত্বেনৈব ব্রহ্ম গৃহীতব্যমিতি"। অতএব "অহং ব্রহ্মাস্মি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্য যোগে তত্ত্ববিদ্ সাধু স্বীয় আত্মারূপে ব্রহ্মকে গ্রহণ করিবেন। তথা "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্যের দ্বারা শিষ্যগণকে স্ব স্ব আত্মারূপে ব্রহ্ম গ্রহণ করাইবেন।

অতএব ঐহিক পারলৌকিক নির্ম্মলানন্দ ও মহামঙ্গলার্থ প্রত্যেক তত্ত্বজ্ঞানীর আত্মারূপে ব্রহ্ম গৃহীতব্য। ব্রহ্মকে স্বীয় আত্মারূপে জানাই জীবের আত্মজ্ঞান। তাঁহাকে স্বব্যতিরিক্ত নিঃসম্পর্ক আত্মা বা স্বর্গস্থ পরমাত্মারূপে জানিয়া রাখা আত্মজ্ঞান নহে, ব্রহ্মজ্ঞানও নহে। তাদৃশ জ্ঞান এক প্রকার পরোক্ষ দেবতাজ্ঞান মাত্র। তাহাদ্বারা নিখিল দেহাদিতে আত্মবোধ নিবারিত হয় না; সুতরাং শোক, মোহ ও মৃত্যুভয় রহিত হয় না। উক্ত ব্যাসসূত্রে কেবল ব্রহ্মাত্মজ্ঞানকেই মোক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ব্রহ্মকে জীবের স্বীয় আত্মপদে বরণ করিয়াছেন, যাহাতে ভেদবুদ্ধি নিবন্ধন উপাধিরূপ মৃত্যু জীবকে ব্যথা দিতে না পারে। বহিরঙ্গ সাধকগণের অধিকারে এ উপদেশ প্রদত্ত হয় নাই।

(১৪) ভগবান মনু বিধি-প্রণেতা হইয়াও সর্ব্ব কর্ম্মের উপরি আত্মজ্ঞানকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছেন।

"যথোক্তান্যপি কর্ম্মাণি পরিহায় দ্বিজোত্তমঃ। আত্মজ্ঞানে শমেচ স্যাদ্বেদাভ্যাসে চ যত্নবান্॥" বরং শাস্ত্রোক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও ব্রাহ্মণ আত্মজ্ঞানে, ইন্দ্রিয়সংযমে এবং প্রণবোপনিষদাদি বেদাভ্যাসে যত্ন করিবেন। ১২।৯২। অপরঞ্চ, "সর্ব্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতং। তদ্ধ্যগ্রং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ"॥ বেদাভ্যাসাদি সর্ব্ব কর্ম্মাপেক্ষা উপনিষদুক্ত পরমাত্মজ্ঞান প্রকৃষ্ট। কেননা তাহা হইতে সাক্ষাৎ মোক্ষ লাভ হয়। ১২।৮৫। "এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ। প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যোহি দ্বিজো ভবতি নান্যথা।" ১২।৯৩। এই আত্মজ্ঞান ও উপনিষদাদি বেদাভ্যাস দ্বিজাতিবর্গের জন্মসাফল্য-সম্পাদক। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণের পক্ষে উহা বিশেষ রূপে জন্মসাফল্যের হেতু।

(১৫) মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যও স্বীয় স্মৃতিতে আত্মজ্ঞানের প্রাধান্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

"ইজ্যাচারদমোহহিংসা দানং স্বাধ্যায় কর্ম্মচ। অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনং"। যজ্ঞ, আচার, দম, অহিংসা, দান, স্বাধ্যায়, এই সমস্ত ধর্ম্ম। কিন্তু যোগদ্বারা আত্মদর্শনই পরম ধর্ম্ম।

[১৬] তন্ত্রশাস্ত্রেও আত্মজ্ঞানের বিস্তর প্রশংসা দৃষ্ট হয়।

যথা কুলার্ণবে পঞ্চম খণ্ডে। "ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ কুর্য্যাদাত্মচিন্তনং। কোটি জন্মার্জ্জিতং পাপং তৎক্ষণাত্তস্য নশ্যতি"। ব্রহ্মই আমার আমিত্ব, এইরূপে যিনি ক্ষণমাত্র আত্মচিন্তা করেন, তাঁহার কোটিজন্মের পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়।

(১৭) মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা স্থাপনার্থে ঐ সমস্ত

উপনিষৎ, স্মৃতি ও তন্ত্রশাস্ত্রের আত্মজ্ঞান-প্রতিপাদক বচন সমস্তকে প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎসমস্ত তাঁহার গ্রন্থাবলিতে নানা স্থানে পাওয়া যাইবে। তদ্ব্যতীত কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ১৭৬৫ শকের ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যানে আত্মজ্ঞানের সাধনকে মুখ্য ব্রহ্মোপাসনা কহিয়াছেন।

যথা "পরমেশ্বরের উপাসনা অধিকারী-ভেদে চারি প্রকারে বিহিত হয়। তন্মধ্যে "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" 'অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য জীবাত্মা-পরমাত্মার যে অভেদ-চিন্তন, ইহা মুখ্য ব্রহ্মোপাসনা হয়"।

মহাত্মা রাজা মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"নামরূপউপাধিবিশিষ্টের উপাসনা করিয়া নিরুপাধি হইবার বাসনা কদাপি করিবেন না; যেহেতু আত্মজ্ঞান বিনা নিরুপাধি হইবার অন্য কোন উপায় নাই।

(১৮) মহাত্মা রাজা যে ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা আত্মজ্ঞানের সহিত সংযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহা না করিলে অশাস্ত্র হইত। ব্যাস একটী ছান্দোগ্য-শ্রুতির এই মীমাংসা স্থাপন করিয়াছেন।—

যথা শারীরক সূত্রে (৪।১।১৮) "যদেব বিদ্যয়েতি হি"। যে উপাসনা, বিদ্যা অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে যুক্ত হয়, তাহাই সাক্ষাৎ আত্মজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের হেতু। অন্যান্য উপাসনা তাহার গৌণ কারণ মাত্র। ফলে অশাস্ত্র-ব্রহ্মোপাসনা আত্মজ্ঞানের অধিকারোৎপাদক নহে। কেবল শাস্ত্রসিদ্ধ ক্রিয়াপর বা অক্রিয়াপর সগুণ বা নির্গুণ যে উপাসনা, তাহাই যথাধিকার পরম্পরা বা সাক্ষাৎ-রূপে জ্ঞানের কারণ। এতদুপলক্ষে শ্রীমৎ ভারতীতীর্থ মুনি স্বীয় "অধিকরণমালা" গ্রন্থে লেখেন, "কেবলং বীর্য্যবদ্বিদ্যাসংযুক্তং বীর্য্য-বত্তরং। ইতি শ্রুতেস্তারতম্যাদুভয়ং জ্ঞান-সাধনং"। উপাসনা মাত্রেই বীর্য্যবান; কিন্তু যে উপাসনা বিদ্যাসংযুক্ত, অর্থাৎ বিদ্যাতে যুক্ত, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বীর্য্য-বত্তর। শ্রুতিতে তারতম্য শ্রুত থাকায়, উভয় জ্ঞান-সাধক; অর্থাৎ আত্মজ্ঞানযুক্ত ব্রহ্মোপাসনা জ্ঞানসাধনের সাক্ষাৎ উপায়, আর অন্যান্য উপাসনা কালান্তর-ভাবী গৌণ উপায়।

(১৯) শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী সগুণ বা নির্গুণ-ব্রহ্মোপাসনা মাত্রেই অল্প বিস্তর আত্মবিদ্যাতে সংযুক্ত। প্রথম মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ডে একাদশ শ্রুতিতে একপ্রকার সগুণ-ব্রহ্মোপাসনার উল্লেখ আছে। সে অধিকারে উপাসকের এইরূপ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে।—"শান্তাবিদ্বাংসঃ" "জ্ঞানযুক্তাবানপ্রস্থাঃ" এবং "শান্তা উপরতকরণগ্রামা বিদ্বাংসো গৃহস্থাশ্চ-জ্ঞানপ্রধানা ইত্যর্থঃ"। এই সকল উপাসক বানপ্রস্থাশ্রমীও হইতে পারেন, গৃহস্থাশ্রমীও হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা "উপরত করণগ্রামা"মনোবুদ্ধিইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য হইতে শান্ত এবং বিদ্বাংসঃ—জ্ঞানপ্রধানাঃ" আত্মজ্ঞানযুক্ত উপাসক। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রেও পরব্রহ্মের সগুণোপাসনা ব্যবস্থা দিয়া কহিয়াছেন "পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা ব্রহ্মসাযুজ্যহেতবে"। ব্রহ্মেতে সাযুজ্য [অর্থাৎ একাত্ম] লাভের নিমিত্ত পরাভক্তি—কিনা জ্ঞানলক্ষণা ভক্তিযোগে তাঁহার পূজা করিবে। অতএব

একাত্মতারূপ মোক্ষলাভার্থ পরাভক্তিরূপ আত্মবিস্তার যোগে ব্রহ্মোপাসনা করিবেক, এইভাব।

[২০] ব্রহ্মোপাসনা অনেক প্রকার আছে এবং শাস্ত্রেতে তাহার বিধিব্যবস্থা ও নিদর্শন দৃষ্ট হয়। ফলে মনোবৃত্তিরূপ ও ক্রিয়ালক্ষণরূপ জ্ঞান ও ভক্তিযোগে যে উপাসনা, তাহা ন্যূনকল্পরূপে অভিহিত হয়। তথাপি সেই সর্ব্বপ্রকার ব্রহ্মোপাসনা শাস্ত্রবিহিতরূপে এবং শাস্ত্রোক্ত আত্মবিস্তার সংযোগে অনুষ্ঠিত হওয়া বিধেয়। অতঃপর ইহা মনে রাখা উচিত যে, কেবল অকত্রাত্মক ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনই মুখ্যকল্প-ব্রহ্মোপাসনা ও সাক্ষাৎ আত্মজ্ঞান-সাধন। রামমোহন রায়ের সময় হইতে এদেশে ব্রহ্মোপাসনার স্থাপিতপ্রণালী কোনরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে বিধায়, এখানে প্রসঙ্গক্রমে তৎসম্বন্ধে তাঁহার যাহা ব্যবস্থা ও শাস্ত্রের যাহা বিধান, তাহা নিবেদন করিলাম।

(২১) আত্মজ্ঞানই এই ভারতবর্ষে শ্রুতি, স্মৃতি, আগম, পুরাণ এবং গীতাসমস্তে প্রধান আসন গ্রহণ করিয়া আছেন। এই পৃথিবীর অন্য কোন বর্ষে ইহার তুলনা বা উপমা নাই। কর্ম্মযোগী, প্রাণায়ামযোগী, ব্রহ্মোপাসক, ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী, সকলেরই ইহা আদরণীয়। ধর্ম্মবিভাগে ইহা পরম ধর্ম্ম স্বরূপ এবং সর্ব্ব পাপের মহাপ্রায়শ্চিত্তস্থানীয়; জ্ঞানবিভাগে ইহা শোক-মোহ, জনন-মরণ, সম্পদ্-বিপদ এবং সুখ-দুঃখের উপশম-বীজ। ইহা কর্ম্মযোগীর হৃদয়ে বাসপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানে বৈষ্ণবী নিষ্ঠা প্রেরণ করে এবং জ্ঞানযোগীর হৃদয়স্থ হইয়া যথাধিকার ব্রহ্মোপাসনা ও লোকশিক্ষার্থ শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ ও দেবার্চনাদি ক্রিয়া কর্ম্ম সকল প্রচার করে।

(২২) এই ভারতবর্ষে আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষদিগের অসামান্য আদর। তৃতীয় মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে দশম শ্রুতিতে কহিয়াছেন—"তস্মাদাত্মজ্ঞং হ্যর্চ্চয়েদ্ ভূতিকামঃ"। "তস্মাৎ বিদুষঃ আত্মজ্ঞং পূজয়েৎ পাদপ্রক্ষালন-শুশ্রূষা-নমস্কারাদিভিঃ "ভূতিকাম" বিভূতিং ইচ্ছন্"। অতএব বিভূতিকাম জ্ঞানী জন, পাদপ্রক্ষালন, শুশ্রূষা, নমস্কারাদি দ্বারা আত্মজ্ঞানী পুরুষের সেবা করিবেন। এই প্রকার ভূতিকাম পুরুষ, সকল কামনা লাভ করেন। কিন্তু যাঁহারা বিভূতি-তৃষ্ণাবর্জ্জিত, তাঁহারা আত্মজ্ঞানীর পূজা করিয়া মোক্ষ লাভ করেন। "উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্ত্তন্তি ধীরাঃ" (৩ মুঃ ২ খঃ ১ শ্রু) "এবমাত্মজ্ঞং পুরুষং যে হি অকামাঃ বিভূতিতৃষ্ণাবর্জিতাঃ মুমুক্ষবঃ সন্তঃ উপাসতে তে শুক্রং নৃবীজং যৎ এতৎপ্রসিদ্ধং শরীরোপাদানকারণং অতিবর্ত্তন্তি অতিবর্ত্তন্তে অতিগচ্ছন্তি ধীরাঃ বুদ্ধিমন্তঃ ন পুনর্যোনিং প্রসর্পন্তি"। যাঁহারা বিভূতি-কামনা-বর্জ্জিত হইয়া ও মুক্তি ইচ্ছা করিয়া আত্মজ্ঞ পুরুষের উপাসনা করেন, তাঁহারাও জ্ঞানী হইয়া শরীরের উপাদানকারণস্বরূপ নৃবীজ অতিক্রম করেন, অর্থাৎ জন্ম-মরণ-প্রবাহ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন।

(সমাপ্ত।)

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।
২৩৩ বেচুচাটুর্য্যের ষ্ট্রীট্। কলিকাতা।

ষষ্ঠিতন্ত্র ও ষষ্ঠিপদার্থ।

সাংখ্যশাস্ত্র বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতের বক্ষে উচ্চতম সিংহাসনে সমাসীন হইয়া বিরাজিত আছে। কাল, জগতের অসামান্য পরিবর্ত্তনসম্পাদক ও সর্ব্বগ্রাসী। মহাকালের বিশাল কুক্ষিতে সংসারের অনেক অমূল্য রত্ন অদর্শনপ্রাপ্ত হইয়াছে। সাংখ্য শাস্ত্রের অনেক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নষ্ট হইয়াছে। ভাষ্যকার মহামহিম বিজ্ঞানভিক্ষু ও "কলা-বশিষ্ট" সাংখ্য-সুধাকরের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। পঞ্চশিখ প্রভৃতির প্রকৃষ্ট প্রতিভার পরিচয় স্বরূপ গ্রন্থরাজী আর ইহজগতে নাই, কেবল তৎসম্বন্ধে ভদ্রাভদ্র ভাবের নানা জল্পনা কল্পনা সমাজ পঙ্কিল করিতেছে। বিদ্বৎসমাজে স্বার্থসংরক্ষণ জন্য উচিত অনুচিত উভয়বিধ মতবাদই সমালোচনীয় ও পূজনীয় বিবেচিত হইতেছে। ভাস্করাচার্য্যের জলপূর্ণ ঘটিকাযন্ত্রের দোহাই দিয়া অনেক ব্যক্তি বর্ত্তমান কালীন ঘড়ী-রচনা-প্রণালী সম্বন্ধে ভারতের গভীর অভিজ্ঞতার পরিচয় দিতেও অনেক সময় কুণ্ঠিত হন না। বস্তুতঃ সত্যানুসন্ধান অপেক্ষা স্ব-মাহাত্ম্য-প্রখ্যাপন আবশ্যক বোধ হওয়ায়, সমাজ এই শোচনীয় অবনয়ন গ্রহণ করিতেছে।

ষষ্ঠিতন্ত্র ও সাংখ্যপ্রবচন একই গ্রন্থ, একথা "সাংখ্যদর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু" প্রবন্ধে স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই তিন বৎসরের মধ্যে কেহই ইহার ভ্রান্ততা বা কাল্পনিকতা প্রতিপাদনের জন্য প্রয়াস পান নাই। সম্প্রতি কেহ কেহ ইহার উপর কটাক্ষ করিয়া ষষ্টিপদার্থ শুনিতে চাহিয়াছেন। তাঁহাদের আগ্রহে প্রতিজ্ঞাত সময়ের পূর্ব্বে অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও ষষ্টিপদার্থ প্রতিপাদনের পরিচয় দিতে অগ্রসর হইতেছি। তাঁহাদের আগ্রহ আমার অধ্যবসায়ে পরিণত হউক। যদি সমাজে সত্যানুসন্ধানের প্রবৃত্তি ইহার দ্বারা জাগরিত হয়, আমি কৃতার্থ হইব। "কপিল-সেবক" নামে আমি "তত্ত্বসমাস" লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া, সেই প্রবন্ধে "সাংখ্য-দর্শন ও বিজ্ঞান ভিক্ষু" নিজের লিখিত বলিয়া স্বীকার করিয়াছি। ঐ প্রবন্ধের সকল সংখ্যায়ই আমার সম্পূর্ণ নাম মুদ্রিত হইয়াছে। আমাকে যাঁহারা 'কপিল-সেবক' শিরোনাম দিয়া পত্র লিখিয়াছেন, তাঁহারা পত্রে 'বিজ্ঞানভিক্ষু' প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং সেই প্রবন্ধে অনেক আপত্তি উত্থাপনও করিয়াছেন। যাঁহারা প্রবন্ধের শেষে মুদ্রিত লেখকের নাম পড়িবার অবকাশ পান নাই, অথচ লিখিয়াছেন "আপনার সম্পূর্ণ নাম না জানায় কপিলসেবক নামে পত্র দিলাম"; আমি গললগ্নীকৃতবাসে সেই সকল মহাশয়ের কাছে প্রার্থনা করি, অনুগ্রহপূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ মনোযোগ লইয়া এবারকার প্রবন্ধ পাঠ করিলে, আমার উপর অত্যধিক অবিচার করা হইবে।

প্রতিবাদকারী মহাশয়েরা খ্যাতনামা পণ্ডিতের মুদ্রিত পুস্তকে দেখিয়াছেন, 'ষষ্টি-তন্ত্র' অর্থ ষাটখানি গ্রন্থ। বলা বাহুল্য, ঐ পণ্ডিত এবং ঐ পুস্তক, উভয়ই এ দীনের স্বল্প পরিচিত; কিন্তু ঐ পুস্তক পাঠই আমার ষষ্টি পদার্থ প্রতিপাদন দেখাইবার প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়াছে। স্বপক্ষের প্রমাণ

"তেন চ বহুধাকৃতং তন্ত্রং"। বহুধা বলিলে যে ষাটখানি পুস্তক বুঝিতে হয়, ইহা আমি বিশ্বাস করিনা। 'ধা' প্রত্যয়ের অর্থ একটু স্থিরচিত্তে চিন্তা করা কর্ত্তব্য। পঞ্চশিখ বহু গ্রন্থ রচনা করেন এবং তাঁহার সময়ে সাংখ্যশাস্ত্র সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল, একথা আমি বারম্বার স্বীকার করিয়াছি; কিন্তু পঞ্চশিখ যে ষাট্‌খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, সেই গুলির নাম ষষ্ঠিতন্ত্র, ইহা আমি তীব্রপ্রতিবাদের বিষয় বলিয়া বিশ্বাস করি।

যে শ্লোকে ষষ্ঠিতন্ত্রের নাম আছে, সেই আর্য্যাটী এই—সপ্তত্যাং কিল যেঽর্থাস্তেঽর্থাঃ কৃৎস্নস্য ষষ্ঠিতন্ত্রস্য। আখ্যায়িকাবিরহিতা পরবাদবিবর্জ্জিতাশ্চাপি"। এই আর্য্যার এইরূপ অর্থ যে, সত্তর কারিকাত্মক এই পুস্তকে সমগ্র ষষ্ঠিতন্ত্রের পদার্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিন্তু আখ্যায়িকা সকল এবং পরবাদগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে"। "সাংখ্য-দর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু" প্রবন্ধে এ বিষয়ে লেখা হইয়াছে। সাংখ্যপ্রবচনের চতুর্থ অধ্যায় আখ্যায়িকাধ্যায় এবং পঞ্চম অধ্যায়ের নাম পরপক্ষনির্জ্জয়। এই দুই অধ্যায়ে যে সকল বিষয় বিবৃত হইয়াছে, কারিকায় তাহা নাই সত্য। আখ্যায়িকাযুক্ত সাংখ্যশাস্ত্রের অপর কোনও গ্রন্থ এপর্য্যন্ত কেহ দেখাইতে পারেন নাই, অগত্যা তাহার নামও শুনাইতে পারেন নাই। কেবল কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "উহা নষ্ট হইয়াছে।" আমি আখ্যায়িকাযুক্ত সাংখ্যপ্রবচনকে ষষ্ঠিতন্ত্র বলিয়াছি এবং এই প্রবন্ধে ষষ্ঠি পদার্থ ও তাহার প্রতিপাদন-প্রণালী প্রমাণ প্রয়োগ সহ দেখাইব। পরের কথায় চিরের বংশ নির্ব্বংশ করিয়া, ভ্রান্তি-বিশ্বাসে অপহৃত কাণের শোক সম্বরণ করার মত 'নষ্ট হইয়াছে' মতবাদ অশ্রদ্ধেয় মনে হয়। পঞ্চশিখের গ্রন্থ নাই যথার্থ, কিন্তু ষষ্ঠিতন্ত্র আছে; "আগে ভূত" করিবার আবশ্যক নাই।

যাটপ্রকার পদার্থ সাংখ্যপ্রবচনে প্রতি-পাদিত হইয়াছে, উহারই নাম ষষ্ঠিতন্ত্র। ষাট্‌প্রকার পদার্থ কি? তাহা দেখা যাউক্। মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র পূর্ব্বোক্ত কারিকা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া লিখিতেছেন—"তথাচ রাজবার্ত্তিকম্, প্রধানাস্তিত্বমেকত্ব-মর্থবত্ত্বমথান্যতা। পারার্থ্যঞ্চ তথানৈক্যং বিয়োগো যোগ এবচ॥ শেষবৃত্তিরকর্তৃত্বং মূলিকার্থাঃ স্মৃতা দশ। বিপর্য্যয়ঃ পঞ্চবিধস্তথোক্তা নবতুষ্টয়ঃ॥ করণানাং অসামর্থ্যং অষ্টাবিংশতিধা মতং। ইতি ষষ্ঠি পদার্থানাং অষ্টাভিঃ সহ সিদ্ধিভিঃ॥ ইতি। সেয়ং ষষ্ঠি-পদার্থী কথিতেতি সকল শাস্ত্রার্থকথনান্নেদং প্রকরণং অপিতু শাস্ত্রমেবেদং ইতি সিদ্ধং। একত্বমর্থবত্ত্বং পারার্থ্যঞ্চ প্রধানমধিকৃ-ত্যোক্তং, অন্যত্বং অকর্তৃত্বং, বহুত্বঞ্চেতি পুরুষমধিকৃত্য, বিয়োগো যোগশ্চ ইত্যুভয়-মধিকৃত্য বৃত্তিঃ স্থিতিরিতি স্থূল সূক্ষ্ম শরীর-মধিকৃত্যোক্তং।" এই সংস্কৃতাংশের বঙ্গার্থ সংক্ষেপতঃ এইরূপ—যথা, রাজবার্ত্তিক গ্রন্থে (ভোজরাজরচিত সাংখ্যবার্ত্তিক গ্রন্থে) উক্ত হইয়াছে 'প্রধানাস্তিত্ব, একত্ব, অর্থবত্ত্ব, অন্যতা, পারার্থ্য, অনৈক্য, বিয়োগ, যোগ, শেষবৃত্তি, অকর্তৃত্ব, এই দশটী মূলিকার্থ, পাঁচটী বিপর্য্যয়, নয় প্রকার তুষ্টি, করণাপাটব আটাইশ প্রকার, এবং অষ্টসিদ্ধি, এই ষষ্ঠি পদার্থ।' এই ষষ্ঠি পদার্থ কথিত হইয়াছে,

অতএব এই গ্রন্থ শাস্ত্রৈকদেশ-প্রতিপাদক প্রকরণগ্রন্থ নহে। একত্ব, অর্থবত্ত্ব, পারার্থ্য, প্রধান বিষয়ক। অন্যত্ব, অকর্তৃত্ব, বহুত্ব, পুরুষ সম্বন্ধে। বিয়োগ ও যোগ উভয়-বিষয়ক। স্থিতি স্থূল সূক্ষ্ম শরীর সম্বন্ধে, বুঝিতে হইবে।

প্রধানাস্তিত্ব হইতে অকর্তৃত্ব পর্য্যন্ত সাংখ্যশাস্ত্রের মৌলিক পদার্থ দশটী, বিপর্য্যয় পাঁচ, তুষ্টি নয়, অশক্তি আটাইশ, সিদ্ধি আট, এই ষাট্ পদার্থ। এই ষাট্ প্রকার পদার্থ প্রথমে তত্ত্বসমাসে দেখা যায়। "দশমূলিকার্থাঃ" 'পঞ্চবিপর্য্যয় ভেদাঃ' "তুষ্টি-র্নবধা" "অষ্টাবিংশতিধা অশক্তিঃ" "সিদ্ধি-রষ্টধা" (পুস্তক বিশেষে "সিদ্ধয়োঽষ্টৌ" এইরূপ সূত্র পাঠ দেখা যায়); এই সকল তত্ত্ব-সমাস সূত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সন্দেহ দূর হয়। এই ষাট্ প্রকার পদার্থের বিষয়ে পঞ্চশিখ ষাটখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এরূপ কোনও প্রমাণ প্রয়োগ কেহ উপস্থিত করে নাই। এই ষাট্প্রকার পদার্থের উপর ষাট্খানি গ্রন্থ লেখা দার্শনিকের চিরদিনই অসাধ্য; কল্পনাকুশল উচ্ছৃঙ্খল কবিরও সাধ্যাতীত। এপর্য্যন্ত পঞ্চশিখের পঞ্চদশ বা ততোধিক সূত্র সংগ্রহ করিয়াছি। বেদব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া, পরবর্ত্তী টীকাকার ও ভাষ্যকারেরা ইহার কতকগুলি সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও পাঠ করিয়াছি, কিন্তু ষষ্টিপদার্থের কোনও একটীর প্রতিপাদক সূত্র দেখিতে পাই নাই। অন্ধতা, ক্লীবতা, মূকতা, পঙ্গুতা লইয়া যিনি এক এক খানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারই রচিত সত্ত্বপুরুষান্যতা-খ্যাতি বিষয়ক সূত্র ব্যাখ্যা করিতে বেদব্যাস বহু কষ্টেও সহজতঃ সুগম করিতে পারেন নাই, এ বড় অদ্ভুত রহস্য। ক্লীবতা, অন্ধতা লইয়া পৃথক্ পৃথক্ কাব্য গ্রন্থ রচনা করাটা পঞ্চশিখাচার্য্যের মত ঋষির উপর আরোপ করিতে কষ্ট হয়। সকল টীকাকার—এমন কি, বেদব্যাসও "তথাচ পঞ্চশিখ-সূত্রং" বলিয়াই সূত্র উদ্ধৃত করিতেছেন; কখনও "পঞ্চশিখস্য প্রধানাস্তিত্বতন্ত্রে" বা "পারার্থ্য তন্ত্রে" বলিয়া কিছু লেখা দেখা যায় না। ঐ রূপ ভিন্ন গ্রন্থ, তাহাতে আবার এক খানি দুইখানি নয়, ষাটখানি গ্রন্থ থাকিতে এক "পঞ্চশিখসূত্র"ই উদ্ধৃত হইল; বেদ-ব্যাস প্রভৃতিও অন্য নাম লিখিতে পারিলেন না, এ বড় রহস্য! এরূপ অবস্থায় ঐরূপ নাম বা গ্রন্থের অস্তিত্ব বিনা প্রমাণে স্বীকার করিয়া, প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট এবং আখ্যায়িকা স্বরূপ অসাধারণ লক্ষণের দ্বারা চিহ্নিত ষষ্টিতন্ত্রকে অস্বীকার করা অপেক্ষা পর-সংস্করণে লিখিত লাইন্ কয়টি পরিত্যাগ করা সহজ কিনা, সাধারণে বিবেচনা করুন।

ষষ্টি পদার্থের নাম লিখিতেছি, ইহা আমার কপোলকল্পিত নহে। তত্ত্বকৌমুদীর প্রাচীন টীকাকার বোধারণ্য যতিশিষ্য শ্রীভারতী নামক যতিকৃত তত্ত্বকৌমুদী ব্যাখ্যায় মূলের অনুল্লিখিত নাম প্রদত্ত হইয়াছে। মূলিকার্থ দশটীর নাম কারিকায় ঈশ্বরকৃষ্ণ ও তত্ত্বকৌমুদীতে বাচস্পতি লিখিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, এই পঞ্চ বিপর্য্যয় সর্ব্বত্র উক্ত হইয়াছে, ইহা সকলেই জানেন। তত্ত্বকৌমুদীতে প্রকৃতি, উপাদান, কাল, ভাগ্য, এই চারিটী

আধ্যাত্মিকতুষ্টি এবং পার, সুপার, পারাপার, অনুত্তমাম্ভ; উত্তমাম্ভ নামক বাহ্য পঞ্চ তুষ্টি, এইরূপ নাম নির্দ্দেশ দেখা যায়। ঐরূপ সিদ্ধিরও ঐ গ্রন্থে নাম দেখা যায়, যথা—তার, সুতার, তারতার, প্রমোদ, মুদিত, মোদমান, রম্যক, সদামুদিত। অশক্তির নাম যথা, বাধির্য্য ১ কুণ্ঠিতা ২ অন্ধত্ব ৩ জড়তা ৪ অজিঘ্রতা ৫ মূকতা ৬ কৌণ্য ৭ পঙ্গুত্ব ৮ ক্লৈব্য ৯ উদাবর্ত্ত ১০ মুগ্ধতা ১১ প্রকৃতিবৈকল্য ১২ উপাদানবৈকল্য ১৩ কালবৈকল্য ১৪ ভাগ্যবৈকল্য ১৫ পারবৈকল্য ১৬ সুপারবৈকল্য ১৭ পারাপারবৈকল্য ১৮ অনুত্তমাম্ভবৈকল্য ১৯ উত্তমাম্ভবৈকল্য ২০ ভাববৈকল্য ২১ স্বভাববৈকল্য ২২ ভাবাভাববৈকল্য ২৩ বিবেকবৈকল্য ২৪ শুদ্ধিবৈকল্য ২৫ প্রমোদবৈকল্য ২৬ মুদিতবৈকল্য ২৭ মোদমানবৈকল্য ২৮। এই সকলের লক্ষণাদি তত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতি টীকাগ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। সাংখ্যপ্রবচনে বা ষষ্ঠিতন্ত্রে এই সকলের সংখ্যাগণন পরিদৃষ্ট হয়। পঞ্চশিখের কোনও সূত্রে এখনও ইহাদের নাম-চিহ্ন পাওয়া যায় নাই।

এখানে কেহ কেহ আব্দার করিয়া বলিয়া থাকেন—"কপিল পঞ্চবিংশতি বা চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত ষষ্টিপদার্থ ব অপর কিছু বলিয়াছেন, এরূপ বিশ্বাস হয় না।" তাঁহাদের কাছে জিজ্ঞাস্য, তাঁহাদের বিশ্বাসের অনুকূলে কোনও প্রমাণ আছে কি? তত্ত্বসমাস বা সাংখ্যপ্রবচন উভয়ত্র চতুর্ব্বিংশতি বা পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, সুতরাং ষষ্টিপদার্থ প্রতিপাদনে পাপ হয় নাই। তত্ত্ব সকলের উপদেশ প্রদান করিতে হইলে, ষষ্টিপদার্থ বিবেচনা অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। সাংখ্যমতপরিপোষক বিচারে এবং সাংখ্যমতানুযায়ী সাধনপ্রণালী ও সাধনপরিপন্থী পদার্থগুলিকে চিনিতে গেলে ষষ্টিপদার্থ আপনিই আসিয়া পড়ে। প্রকৃতিপুরুষবাদ ও তাহার সাধন সম্বন্ধে তর্ক করিতে গেলেই ষষ্টিপদার্থ প্রতিপাদন করিতে হয়; তাহা করিতে গিয়া যদি কপিল অন্যায় করিয়া থাকেন, তবে বেদব্যাসের অধ্যারোপন্যায়াদির বা অধ্যাসপ্রকরণাদির বিবেচনা বড়ই গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। অপরাপর দর্শন যে ভাবে পূর্ব্বে রচিত ও পরে গ্রথিত হইয়াছে, সাংখ্যদর্শনও তদ্রূপ, ইহাই আমার মনে হয়।

সাংখ্যপ্রবচনে ষষ্টিপদার্থ দেখাইবার পূর্ব্বে সাংখ্যপ্রবচন যে সাংখ্যদর্শন, এই কথিত কথার আর একটু আন্দোলন করিব। বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন "নন্বস্যাঃ ষড়ধ্যায্যাঃ তত্ত্বসমাসাখ্য সূত্রৈঃ সহ পৌনরুক্ত্যং ইতি চেৎ মৈবং সংক্ষেপ বিস্তররূপেণোভয়োরপৌনরুক্ত্যাৎ। * * * তত্ত্বসমাসাখ্যং হি যৎ সংক্ষিপ্তং, সাংখ্যদর্শনং তস্যৈব প্রকর্ষেণাস্যাং নির্ব্বচনং, বিশেষস্ত্বয়ং যৎ ষড়ধ্যায্যাং তত্ত্বসমাসোক্তার্থ বিস্তারমাত্রং"। তত্ত্বসমাসের বিস্তারই সাংখ্যপ্রবচন। উপদেশের বিস্তৃতি লাভ কেবল বিচারার্থই হইয়া থাকে। শিষ্য যদি তর্ক-বিচারাদির অনুসরণ করে, তবে উপদেশের বিস্তার সহকারে তাহার যুক্তিযুক্ততা বুঝাইয়া 'প্রবচন' প্রস্তুত করিতে হয়। কপিলদেব আসুরিকে উপদেশ দেন, ইহা জগৎপ্রসিদ্ধ। ভাগবতে 'প্রোবাচাসুরয়ে

সাংখ্যং' কারিকায় "মুনিরাসুরয়েঽনুকম্পয়া-প্রদদৌ" গৌড়পাদ ভাষ্যে "আসুরিগোত্রায় ব্রাহ্মণায়" ইত্যাদি উহার সাধারণ প্রমাণ। তত্ত্বসমাস রচনার পর পুনর্ব্বার প্রবচন রচনা কি জন্য? এ কথার কেহই উত্তর দিতে পারেন না, কাজেই সোজাবুঝ—"কপিল প্রবচনপ্রণেতা নহেন" বলিলে চুকিয়া যায়, ভাবেন। আমরা তত্ত্বপ্রদীপিকায় দেখিতে পাই, "ভূয়োঽয়মারব্ধঃ পঞ্চশিখার্থমীশ্বরস্য যৎ প্রবচনমিত্যাখ্যায়তে" এইজন্য বলিতে চাহি, কপিলদেবের পুনর্ব্বার "সাংখ্যপ্রবচন" রচনা পঞ্চশিখের জন্য। পঞ্চশিখ যে আসুরির শিষ্য, তাহা "আসুরিরপি পঞ্চশিখায়" এই কারিকাংশ হইতে জ্ঞাত হইতে পারি। আবার দেখা গিয়াছে, কপিলের পুনর্ব্বার সাংখ্যপ্রবচন রচনা পঞ্চশিখের জন্য; এই হেতু মনে হয়, পঞ্চশিখ আসুরির শিষ্য হইলেও, তাঁহার ভূয় আন্দোলন বা বিচার-জালের অনুরোধেই কপিলদেব "সাংখ্যপ্রবচন" লিখিতে প্রবৃত্ত হন। এরূপ অনুমান করিবার কারণ নিতান্ত 'পুতিকুষ্মাণ্ডায়িত' নহে।

সাংখ্যপ্রবচনে "অবিবেক নিমিত্তকো বা পঞ্চশিখঃ" এই ষষ্ঠ অধ্যায়ের সূত্রটী পঞ্চশিখের মত প্রকাশ করে। সাংখ্যপ্রবচনে যে পঞ্চশিখের মতামত বিবেচিত হইয়াছে, ইহাই তাহার সূচক। প্রবচন রচনা বোধ হয় কপিল ও পঞ্চশিখের বাদ-প্রতিবাদ হইতেই প্রথম উৎপত্তি লাভ করে। ইহা আমার অনুমান মাত্র, সুদৃঢ় প্রমাণ নাই। কপিল পঞ্চশিখের গুরু, আসুরির গুরুত্ব কথার কথা, ইহা কোথাও লিখি নাই। আসুরি পঞ্চশিখকে বুঝাইতে না পারিয়া, স্বগুরু কপিলের কাছে পাঠাইয়া দেন, একথা আমার প্রবন্ধে নাই। আসুরি বোকা ছিলেন কিনা, তাহা আমি বলিতে পারিনা, তবে 'তত্ত্বপ্রদীপিকা' হইতে বুঝিতে পারি, পঞ্চশিখের জন্য সাংখ্যপ্রবচন রচিত হয়। আমি ইহাতে অনুমান করি, পঞ্চশিখ বিচারদশার ব্যক্তি ছিলেন, আসুরি বিচার-দশার অতীত। পঞ্চশিখ বিচারার্থে কপিলের নিকট যান; আসুরি গুরু হইলেও, শাস্ত্রপ্রচার ও বিচার কার্য্যে পঞ্চশিখ তাঁহাকে সম্মুখে পান নাই, সম্প্রদায়-গুরু কপিলকেই পাইয়াছিলেন। আসুরি সাংখ্য-জ্ঞানসম্পন্ন সাধক এবং কপিলের শিষ্য ও পঞ্চশিখের সাংখ্যজ্ঞানোপদেষ্টা। কপিল পঞ্চশিখের সাক্ষাৎ গুরু না হইলেও, শাস্ত্র-প্রচার কার্য্যে পঞ্চশিখকেই সহকারী পাইয়াছিলেন, আসুরিকে পান নাই। পঞ্চশিখের সময়ে বোধ হয় কপিল ও পঞ্চশিখের কথোপকথন-প্রসঙ্গজাত সূত্রসমষ্টি একত্রিত হইয়া সাংখ্যপ্রবচন নাম ধারণ করে। কপিল, আসুরি, পঞ্চশিখ, সকলেই ব্রহ্মপুত্র। "সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ। কপিল-শ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা। ইত্যেতে ব্রহ্মণঃ পুত্রাঃ সপ্তপ্রোক্তা মহর্ষয়ঃ"। এই গৌড়পাদ-ভাষ্যধৃত বচনে জ্ঞাত হওয়া যায়, ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মার পুত্র। পঞ্চশিখ আসুরির শিষ্য, কিন্তু তিনি অত্যধিক প্রতিভাশালী বলিয়া মতপ্রচারে প্রবৃত্ত হন এবং কপিলের সহিত নানা প্রসঙ্গ করিয়া, সাংখ্যমতের দৃঢ়তা ও যৌক্তিকতা পরীক্ষা করিতে যান। কাজেই শাস্ত্র-যুক্তিভূষিত সাংখ্যপ্রবচন আবির্ভূত হয়।

এই সপ্তর্ষির মধ্যে সনন্দ বা সনন্দনও এই প্রচারকার্য্যে সহায়তা করেন বোধ হয়। "লিঙ্গশরীর নিমিত্তক ইতি সনন্দনাচার্য্যঃ" এই প্রবচনসূত্রে তাঁহার মত পাওয়া যায়। ঐ মতকে অনিরুদ্ধ ভট্ট "একদেশিমতং" বলিয়াছেন। পঞ্চশিখ-মতকে বিজ্ঞানাচার্য্য "এতদেব স্বমতং" বলিয়া কপিলের সহিত অভিন্ন মত রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, পঞ্চশিখ কপিলদেবের সাংখ্যপ্রবচন রচনার সময় কোনও না কোনও রূপে কপিলদেবের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আসুরি পঞ্চশিখকে পাঠাইয়াছিলেন, ইত্যাদি প্রত্যক্ষ আপত্তিজনক বিষয় আমার উপর আরোপিত হওয়া প্রতিবাদকারীর নিতান্ত অনমুগ্রহ।

এখন একটী কথা—ষষ্ঠিপদার্থ প্রতিপাদন। প্রথমতঃ কারিকায় দেখুন, টীকাকার ভারতীযতি বলিতেছেন "ভেদানাং পরিমাণাৎ ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ হেতুভিঃ প্রধানাস্তিত্বং কথিতং"। ভেদানাং পরিমাণাৎ ইত্যাদি ১৫তম ১৬তম কারিকায় প্রধানের অস্তিত্ব কথিত হইয়াছে। সাংখ্য প্রবচনে "ততঃ-প্রকৃতেঃ" "কার্য্যাৎকারণানুমানং তৎসাহিত্যাৎ" "অব্যক্তং ত্রিগুণাল্লিঙ্গাৎ" ইত্যাদি সূত্রে অব্যক্ত বা প্রধানের অস্তিত্ব অনুমানবলে সমর্থিত হইয়াছে।

ভারতী যতি আবার বলিয়াছেন "বিপরীতমব্যক্তং ইত্যনেন একত্বং" জনন-মরণানাং ইত্যাদি কারিকা "পুরুষবহুত্বং ব্যবস্থাতঃ" "জন্মাদি ব্যবস্থাতঃ পুরুষবহুত্বং" ইত্যাদি সূত্রে পুরুষ বিষয়ক বহুত্ব অর্থাৎ অনৈক্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। তদ্বিপরীত অব্যক্ত—সুতরাং এক, এই একত্ব প্রতিপাদন। প্রবচনেও "পারম্পর্য্যেঽপ্যেকত্র পরিনিষ্ঠেতি সংজ্ঞামাত্রং" এই সূত্রে কল্পনাপ্রবাহের একত্র বিশ্রাম করিবার কথা বলায় প্রকৃতির একত্ব বলা হইয়াছে।

অর্থবত্ব নিরূপণ প্রসঙ্গে ভারতী লিখিতেছেন—"প্রদীপবচ্চার্থতো বৃত্তিঃ" পুরুষার্থ হেতুকং ইত্যাদিষু অর্থবত্বং প্রধানস্য।" প্রবচনেও "বিমুক্ত মোক্ষার্থং স্বার্থং বা প্রধানস্য' এই সূত্রে প্রকৃতির অর্থবত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

"প্রধানস্য অন্যত্বং পরিণামতঃ সলিলবৎ ইত্যাদিনা।" এই রূপে ভারতীযতি প্রকৃতির অন্যতা দেখাইয়াছেন। বাচস্পতি কিন্তু "অন্যত্বং অকর্ত্তৃত্বং বহুত্বং চেতি পুরুষমধিকৃত্য" লিখিয়াছেন। উহাই সঙ্গত অর্থ। "শরীরাদি ব্যতিরিক্তঃ পুমান্" এই সূত্রে প্রবচনে, পুরুষে শরীর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃতি পর্য্যন্তের অন্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'সংঘাত পরার্থত্বাৎ' ইত্যাদি সপ্তদশতম কারিকার এবং "সংহত পরার্থত্বাৎ" এই প্রবচনসূত্রে প্রকৃত্যাদির পারার্থ্য কথিত হইয়াছে।

কারিকায় "সৈবচ বিশিনষ্টি পুনঃ" ইত্যাদি আর্য্যায় প্রধান সৎকার্য্য বিয়োগ এবং "পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগঃ" এই আর্য্যায় প্রকৃতি-পুরুষ সংযোগ উক্ত হইয়াছে। প্রবচনেও নর্ত্তকীবৎ প্রবৃত্তস্যাপি নিবৃত্তিশ্চারিতার্থ্যাৎ' ও "দোষবোধেঽপি নোপসর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ' এই সূত্রে পুরুষ-বিয়োগ বা সংসর্গ-নিবৃত্তি উক্ত হইয়াছে। আর "ন নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য তদ্‌যোগস্তদ্‌যোগাদৃতেঃ" এই সূত্রে প্রধান-পুরুষ-সংযোগ কথিত হইয়াছে।

শেষযুক্তি অর্থ অঙ্গভাব। "অন্যোন্যা-ভিভবাশ্রয়জননমিথুনবৃত্তয়শ্চ গুণাঃ' এই কারিকায় গুণসমূহের পরম্পরাঙ্গাঙ্গিভাব উক্ত হইয়াছে। এই অঙ্গভাব ভারতীযতি-মতে গুণসমূহের, বাচস্পতি-মতে স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের। শেষোক্ত মত যৌক্তিক এবং প্রমাণার্হ। পূর্ব্ব মত অর্থ অনাবশ্যক। প্রবচনসূত্রে "তদধিষ্ঠানাশ্রয়ে দেহে তদ্বাদাৎ তদ্বাদঃ" ও 'ন স্বাতন্ত্র্যাৎ তদৃতে ছায়াবৎ চিত্রবচ্চ'। এই সূত্রদ্বয়ে স্থূল সূক্ষ্ম শরীর কার্য্যার্থে পরম্পরাশ্রয় অঙ্গভাব অবলম্বন করে, উক্ত হইয়াছে।

কারিকায় "অকর্তৃভাবশ্চ" এই অংশ দ্বারা অকর্তৃত্ব এবং প্রবচনে "অহঙ্কারঃ কর্ত্তা ন পুরুষঃ" এই সূত্রে অকর্তৃত্বভাব কথিত হইয়াছে। এই দশবিধ মূলিকার্থ প্রদর্শিত হইল।

অপর, পঞ্চবিপর্য্যয়, নবতুষ্টি, অষ্টসিদ্ধি ও অষ্টাবিংশতি অশক্তির কথা "পঞ্চবিপর্য্যয়-ভেদাঃ" এই ৪৭ কারিকায়, 'আধ্যাত্মিকা-শ্চতস্রঃ' এই ৫০ কারিকায়, "উহঃ শব্দোহ-ধ্যয়নং" এই ৫১ কারিকায়, এবং "একা-দশেন্দ্রিয়বধাঃ" এই ৪৯ কারিকায় প্রদর্শিত আছে। "বিপর্য্যয়ভেদাঃ পঞ্চ" "অশক্তিরষ্টাবিংশতিধাতু" "তুষ্টির্নবধা' "সিদ্ধিরষ্টধা" এই সকল প্রবচনসূত্রে এবং "অবান্তরভেদাঃ পূর্ব্ববৎ" "এবমিতরস্যাঃ" "আধ্যাত্মিকাদি ভেদাৎ নবধা তুষ্টিঃ" "উহাদিভিঃ সিদ্ধিঃ" এই সমস্ত প্রবচন-সূত্রে ঐ সকল পদার্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

এখন বোধ হয় বলিতে বাধা নাই, ষষ্টিপদার্থ প্রতিপাদক ষষ্টিতন্ত্র সাংখ্যপ্রবচন। কারিকায় ষষ্টিতন্ত্রের ষষ্টিপদার্থ প্রতিপাদন আছে বলিয়া ঈশ্বর কৃষ্ণ যে গৌরব করিয়াছেন, তাহা সত্য। প্রবন্ধে অনেক কথার বিস্তৃত আলোচনা হইলনা, কারণ সময়াভাব। ভবিষ্যতে চেষ্টাকরা যাইবে। যে সকল মহোদয় সানুগ্রহে পত্র লিখিয়া ষষ্টি পদার্থ জানিতে চাহিয়াছেন, তাঁহারা কৃপা পূর্ব্বক এই সংখ্যা পাঠ করিবেন। পৃথক্ পৃথক্ প্রত্যুত্তর লেখা আমার সাধ্যাতীত; সে জন্য বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করি। "কপিল সেবক" নামে পরিচয় দিতে শান্তি পাই। আশাকরি, তাহাতে পাঠকগণের অসুবিধা হইবেনা। প্রতিবাদ থাকিলে, পত্রাকারে না হইয়া প্রবন্ধাকারে হইলে, লেখকের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করা হইবে। কিমধিকেন। ওঁতৎসত্।

কপিলসেবকস্য———কস্যচিৎ।

(যশোহর, বেদবিদ্যালয়।)

গোলোকের দৈববাণী।

(প্রেম ও নাম।)

——:o:——

প্রেম প্রেম প্রেম!
"জাম্বুনদ-হেম"!
নাই প্রেমের তুল্য।
নাই প্রেমের মূল্য॥
প্রেম কি চমৎকার!
প্রেমটি সারাৎসার॥
প্রেমটি আমি চাই।
প্রেমটি আমি খাই!
প্রেম যে আমার খাদ্য।
প্রেমেই আমি বাধ্য॥
প্রেম আমারি ভোগ্য।
আমিই প্রেমের যোগ্য॥
প্রেম পরশ-মণি।
প্রেম আনন্দ-খনি॥
প্রেম পরম রস।
প্রেমেই আমি বশ॥

প্রেমের বাঁধন শক্ত।
প্রেমে বাঁধে ভক্ত॥
প্রেম জিনিসটি খাসা।
প্রেমেই আমার বাসা॥
প্রেমেই আমি থাকি।
প্রেমামৃত মাখি॥
আমি প্রেমের পাখী।
প্রেম-পিঞ্জরে থাকি॥
প্রেম-সুধাফল চাখি।
প্রেমের বুলি ডাকি॥
প্রেম পরাণ মোর।
প্রেমেই আমি ভোর॥
আমি প্রেম-স্বামী।
প্রেমরূপী আমি॥
আমি প্রেমময়।
প্রেম আমা-ময়॥
প্রেমে মোর সত্ত,
এই সার তত্ত্ব॥
প্রেম কররে সবে,
এসে প্রেমের ভবে;
কি মজা তায় হবে!
এক মুখে কে কবে?
পঞ্চে পঞ্চানন
কৈতে শক্ত ন'ন!
চতুর্ম্মুখো বিধি,
মৌনই তাঁর বিধি।
অনন্তে অনন্ত
নাহি পা'ন অন্ত!
সরস্বতীর বীণা,
তাও এখানে দীনা!
বেদ এখানে স্তব্ধ!
বেদান্ত নিঃশব্দ!
তন্ত্র চমকিত!
পুরাণ স্তম্ভিত!
বিস্মিত বিজ্ঞান।
দর্শন অজ্ঞান॥
সুদূরে সাহিত্য,
কল্পনা-কবিত্ব॥
বর্ণনা বিফলা।
বক্তৃতা বিকলা॥
প্রেমের মহত্ত্ব,
প্রেম-রস-তত্ত্ব,
সুধু সে বুঝেছে,
প্রেমে যে মজেছে॥
বুঝিলেও ভক্ত
বুঝাতে অশক্ত।
অধিক বা আর
বলিব কি তার?
স্বয়ং আমি তায়,
হেরেছি গীতায়!
নিজে আমি বুঝি।
নিজে আমি মজি॥
ভক্তেরে বুঝাই।
ভক্তেরে মজাই॥
তাই বলি সবে,
মোর প্রেমে ভবে,
হইয়ে বিভোর,
নামে মজ মোর।
নাম-প্রেম সার
ভকত জনার।
প্রেমে নাম গাবে।
নামে মোরে পাবে॥
নামে আমি লভ্য,
জীব-সুখ-সেব্য।
নামে আমি সাধা।
নামে আমি বাঁধা॥
এক নাম-নামী।
নামই যে আমি!
আমিই যে নাম।
ভজ অবিরাম॥
গাও প্রেম-ভরে,
হরে কৃষ্ণ হরে!
গাও প্রেমে নাম,
হরে হরে রাম!
বল প্রাণ ভরি,
হরিবোল হরি!

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১০ম বর্ষ, ১০ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।	জ্যৈষ্ঠ।	১৩১০ সাল, ১৮২৫ শকাব্দা।

প্রাণ কাঁদে কি?

দেশের জন্য তোমার প্রাণ কাঁদে কি? তোমার সহস্র সহস্র অনক্ষর স্বদেশবাসী প্রত্যহ তোমার নেত্রপথে পতিত হইতেছে, তাহাদের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের জন্য কখন কিছু করেছ কি? স্কুল কর্‌ছো, কলেজ কর্‌ছো, মেল কর্‌ছো, কিন্তু ভেবে দেখ-দেখি, এগুলি কাদের জন্য কর্‌ছো? ভদ্রলোকের ছেলের জন্য। কিন্তু 'দেশ' বল্‌লে কি কেবল ভদ্রলোক বুঝায়? দেশ বল্‌লে কি কেবল ব্রাহ্মণ প্রভৃতি কয়েকটী উচ্চশ্রেণীর জাতি বুঝায়? দেশে যদি এক জন 'ভদ্রলোক' দেখা যায়, তাহা হইলে সহস্র অভদ্র লোক দেখা যায়। তুমি এক জন লইয়াই ব্যস্ত, কিন্তু সহস্রের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন! দেশের উন্নতি করিতে গেলে, একজনের মুখের দিক চাহিলেই চলিবে না, সহস্রের মুখের দিকে চাওয়া চাই। জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সমগ্র স্বদেশবাসীর উন্নতি কামনার জন্যে প্রাণ ব্যাকুল না হইলে কখনই এদেশের মঙ্গল নাই। কয়েকটী মাত্র ভদ্রলোক লইয়া কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কুচিত করিলে, এদেশ কখনও উন্নতিমার্গে আরোহণ করিতে পারিবে না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা স্বদেশবৎসল, তাঁহাদের স্বদেশবৎসলতা একদেশদর্শী, সঙ্কুচিত এবং অনেক সময় নিম্নবর্ণের উন্নতি-বিদ্বেষী। বর্ত্তমান উন্নত জাতিদিগের ইতিহাস পর্য্যালোচনা কর। আজ যে জাপান এত উন্নত, আজ ইংলণ্ড, জার্ম্মাণি যে এত উন্নত, তাহার কারণ কি জান? তাহার কারণ তাহাদের ইতর জাতিদিগের উন্নতি। জাপানবাসীদিগের মধ্যে শতকরা তিরাশী জন পুরুষ লেখা-পড়া

জানে; কিন্তু ভারতবর্ষে শতকরা দশজন লোক মাত্র লেখা পড়া জানে।

জাপানে শতকরা ৫৪ জন স্ত্রীলোক শিক্ষিতা, কিন্তু ভারতবর্ষে শতকরা ২ জন স্ত্রীলোক মাত্র লেখা পড়া জানে! ইহা দ্বারাই বোঝা যায়, জাপান বা কেন এত উন্নত, আর আমরাই বা কেন এত অবনত। গুটীকতক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও নবশাখ লইয়া যদি দেশটী হইত, তাহা হইলে বলা যাইত যে, দেশে কিছু শিক্ষা-বিস্তার হইতেছে। সমাজসংস্কারই বল, রাজনৈতিক সংস্কারই বল, আর ধর্ম্মসংস্কারই বল, যাহাদিগকে লইয়া সংস্কার করিবে, তাহারা যদি অশিক্ষিত রহিল, তাহা হইলে সংস্কার করিবে কাহাদের লইয়া? আমাদের জাতীয় জীবন যে এত ক্ষীণ, দুর্ব্বল, এবং নিস্তেজ, তার একমাত্র কারণ আমাদের অধিকাংশ লোক অশিক্ষিত। অশিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারই আমাদের এখন প্রধান কর্ত্তব্য। অনেক শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে এইরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা আছে যে, অল্প লেখা পড়া শেখা অপেক্ষা একেবারে না শেখা ভাল, কিন্তু তাঁহারা এটুকু বুঝিয়া দেখেন না যে, প্রথমে অল্প না হইলে অধিক হয় না। অল্প লেখা পড়া শিখিতে শিখিতেই অধিক লেখা পড়া শেখে। ইংলণ্ডের মুটে মুজুর গাড়োয়ান প্রভৃতি লেখা পড়া জানে এবং তাহারা রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্ম-বিষয়ক সর্ব্বপ্রকার আন্দোলনেই তাহাদের মতামত প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। তাহারা তাহাদের অধিকার প্রসারে যেরূপ ব্যস্ত, তদ্রূপ দায়িত্ব গ্রহণেও প্রস্তুত। স্বদেশের সম্মান ও স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। আমাদের দেশে স্বদেশবৎসলতা মুখের কথা মাত্র; কিন্তু ইংলণ্ড জার্ম্মাণ প্রভৃতি দেশে উহা মুখের কথা নয়, উহার জন্য প্রত্যহ শত শত লোক তাহাদের সর্ব্বস্বত্যাগ এবং প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেছে!

প্রাণশূন্য দেহ যেরূপ, স্বাধীনতাবিহীন জাতিও সেইরূপ, এবং তজ্জন্য এই স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে শিক্ষিত জাতিদিগের মধ্যে যে একতা, স্বার্থত্যাগ দৃষ্ট হয়, অশিক্ষিত জাতিদিগের মধ্যে তাহা কখনও হইতে পারে না। অশিক্ষা আত্মসঙ্কোচ এবং শিক্ষা আত্মপ্রসারের কারণ। শিক্ষার প্রসার হইলে, সমগ্র দেশবাসীদিগের মঙ্গলামঙ্গল পরস্পর সাপেক্ষ এবং একই সূত্রে গ্রথিত দৃষ্ট হয়। যদি যথার্থ দেশের মঙ্গল কামনা কর, তাহা হইলে অনুন্নত জাতিদিগের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার কর। যদি প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি আলস্যে কালযাপন না করিয়া, অবকাশ সময়ে স্বীয় স্বীয় অশিক্ষিত প্রতিবেশীগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা প্রদান করেন, তাহা হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে। যে সমুদায় শ্রমজীবীরা উদরান্নের জন্য দিবসে নানাবিধ কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তাহাদিগকে রাত্রি কালে অনায়াসে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। অশিক্ষিত শ্রমজীবীদিগের নিমিত্ত গ্রামে গ্রামে নৈশবিদ্যালয় হওয়া কর্ত্তব্য এবং উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় কার্য্যে রত থাকিয়াও বিনা বেতনে এই সমুদায় শিক্ষকতার কার্য্য

করিয়া দেশের পরম মঙ্গল সাধন করিতে পারেন। অনেকে বলেন যে, এদেশে যথেষ্ট বক্তৃতা হইয়া থাকে, আমি বলি যে, এদেশে আদৌ বক্তৃতা হয় না। বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলায় প্রায় ১৬ হইতে ২০ লক্ষ লোকের বাস, কিন্তু ইহার মধ্যে কয়জন লোক বৎসরের মধ্যে একবার মাত্রও বা কোন্ হিতকর্ম্ম বিষয়ের বক্তৃতা শুনিয়া থাকে?

দেশের সর্ব্বত্রই যে জলে লোকে স্নান করে, সেই জলই পান করিয়া থাকে; এই প্রথা অত্যন্ত দূষণীয় এবং ইহাই কলেরা রোগের প্রধান কারণ, ইহা কয়জন লোককে বুঝান হইয়া থাকে? নদীর মধ্যে মল-মূত্র পরিত্যাগ, অর্দ্ধ দগ্ধাবস্থায় শবাদি নিক্ষেপ ইত্যাদি কার্য্যের দ্বারা পানীয় জল দূষিত করিয়া আমাদের দেশের লোকেরা নানারূপ ব্যধিগ্রস্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়; তাহাই বা কয়জনকে বুঝান হইয়াছে? ঐ দেখ, বাঁশ, আম, গুপারি, কাঁটাল ইত্যাদি বৃক্ষের দ্বারা বাড়ী বেষ্টিত। বাটীর সম্মুখেই প্রকাণ্ড গর্ত্ত, তাহাতে পচা জল পরিপূর্ণ। বাটীতে বায়ুর সঞ্চালন মাত্র নাই ও রৌদ্র অতি সামান্য মাত্র লাগে, ; দিবসেও ম্যালেরিয়া-বিষ-সঞ্চারক মশকগুলি গায়ে আসিয়া পড়িতেছে; বাটীতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই জ্বরে ভুগিতেছে; গরীব গুলি সংক্রামক ব্যাধিতে এক একটী মরিয়া যাইতেছে; কিন্তু অজ্ঞ কৃষককে এই সব উপদ্রব নিরাকরণে কেহ কি কখনও সদুপায় বলিয়া দিয়া থাকেন? এমন জেলা নাই, যেখানে বারমাস কলেরা কোন না কোন স্থানে প্রাদুর্ভূত না হয়। কিন্তু কেহ কি আমাদের মধ্যে অশিক্ষিত লোকদিগকে এমন উপদেশ দিয়া থাকেন যে, তোমাদের পানীয় জল টক বগ্ করিয়া ফুটাইয়া গরম করাইয়া খাইও, তাহা হইলে কলেরার আশঙ্কা নাই। একটু কেরোচিন তেল খরচ করিলেই বাটীর সম্মুখস্থ ডোবাতে ম্যালেরিয়া বিষ সঞ্চারক মশক একেবারে ধ্বংস করা যায়, কিন্তু এ উপদেশ দেয় কে? দূষিত জল এবং দূষিত বায়ু যে আমাদের অকাল-মরণের কারণ, তাইবা কে বুঝাইয়া দেয়? ভাল উপদেশত দেইই না, বরং মন্দ উপদেশ দিতে আমরা বিলক্ষণ পটু! কুইনাইন— সিঙ্কনা নামক বৃক্ষের ছালের চূর্ণ, এই উদ্ভিদ্ পদার্থ ম্যালেরিয়া জ্বরের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। নিমের পাতা, নাটার বীজ, গুলঞ্চ প্রভৃতি ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎকৃষ্ট ঔষধ; ফলে কুইনাইনের ন্যায় কেহই নয়। কিন্তু আজকাল কতকগুলি হাতুড়িয়া কবিরাজ ও ডাক্তার একটা ধূয়া উঠাইয়াছে যে "কুইনাইন একটী বিষ, উহাতে জ্বর আটকাইয়া দেয়।" কোথায় কুইনানাইনের উপকারিতা ঘোষণা করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিবে, কিন্তু তাহা না করিয়া, উহার মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া উহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। দেশের জন্য যথার্থ যদি প্রাণ কাঁদে, তাহা হইলে এবম্বিধ কপটাচার পরিত্যাগ কর, যাহা উপকারী এবং যাহা সত্য, তাহাই সাধারণের মধ্যে ঘোষণা কর। মোকর্দ্দমা মামলায় সমুদায় দেশটী উচ্ছন্ন গেল, কিন্তু ইহার অপকারিতা কে বুঝাইয়া দেয়? কয়জন লোক এ বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া থাকেন? বড় বড় বিষয়ের বড় বড় বক্তৃতায় বিশেষ কোন লাভ নাই।

পল্লীগ্রামে প্রবেশ কর, দরিদ্র গৃহস্থের বাটীতে যাও, তাহার অভাব-দুঃখ-কষ্ট স্বচক্ষে দেখ এবং তাহার প্রতিকারের চেষ্টা কর। নিম্ন-শ্রেণীদিগকে ঘৃণা করিওনা; তোমার ধমনীতে যে শোণিত প্রবাহ বহিতেছে, তাহার শরীরেও সেই শোণিত প্রবাহ বহিতেছে। তাহাদের সুখ, দুঃখ, হর্ষ, বিষাদ তোমাদেরই ন্যায়; এক কথায়—তাহারা তোমারই ন্যায় মনুষ্য, তোমারই ভ্রাতা, একই পরম পিতা পরমেশ্বরের সন্তান; যে আত্মা তোমাতে বিরাজিত, সেই আত্মাই তাহাদিগেতে বিরাজিত; তাহাদিগকে ঘৃণা করিওনা, প্রেমালিঙ্গন দাও; তবেই তোমার মঙ্গল; তবেই তোমার স্বদেশের মঙ্গল; নতুবা চিরকাল পরপদদলিত ও পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। ঐ দেখ, পৃথিবীস্থ সমুদায় দেশ উন্নতির দিকে ধাবমান, কিন্তু ভারতবর্ষ নিশ্চেষ্ট নির্জীব মৃতবৎ পড়িয়া রহিয়াছে এবং উহার কারণ ভারতবর্ষ এখন অশিক্ষিত। শিক্ষার অভাবই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ এবং পুনরায় যদি ভারতবর্ষের অভ্যুত্থান কামনা কর, তবে আব্রাহ্মণ চণ্ডাল পর্য্যন্ত শিক্ষা বিস্তার কর। যদি দেশের জন্য প্রাণ কাঁদে, তাহা হইলে আমি এ জাতি, উনি ও জাতি, এ সব ছোট ছোট কথা ভুলিয়া যাও। সকল জাতির প্রতি সমদর্শী হও, আমিত্বের প্রসার কর, তবেই মঙ্গল, তবেই ভারতবর্ষ পুনরায় অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইবে। ইংরাজেরা তোমাদিগকে ঘৃণা করে বলিয়া, তোমাদিগকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করে না বলিয়া তোমরা কত ক্ষুণ্ণ—কত মর্ম্মপীড়িত!

ত্রান্সভালে, অষ্ট্রেলিয়ায় তোমরা সকল প্রকার অধিকার হইতে বিচ্যুত, নিগ্রোদিগের ন্যায় লাঞ্ছিত, ঘৃণিত ও পীড়িত বলিয়া কত দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাক, রাজদ্বারে কত আবেদন—কত অনুনয় বিনয় করিয়া থাক, কিন্তু তোমরা কি দেখনা যে, তোমরা আপনারাই তোমাদের নিম্নবর্ণদিগের প্রতি কত নির্দ্দয়, কত নিষ্ঠুর! যাহাদের উপার্জ্জনে তোমরা ধনবান, যাহাদের কঠোর শ্রমে তোমরা বিলাসী, তাহাদিগকে তোমরা কত প্রকারে নির্য্যাতন করিয়া থাক! তোমরা যদি তোমাদের স্বীয় বংশজ লোকদিগের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে পার, তাহা হইলে ভিন্নদেশবাসীরা তোমাদের প্রতি যে একটু অত্যাচার করিবে, তাহাতে তোমরা দুঃখিত হইবে কেন? মানবে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মফল অবশ্যম্ভাবী। যেরূপ বীজ বপন করিবে, সেইরূপ ফল ফলিবে। তোমরা যদি তোমাদের অনুন্নত স্বদেশবাসীদিগের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার কর, স্বার্থান্ধ হইয়া তাহাদের অহিত চেষ্টা কর, কিম্বা তাহাদের হিতের প্রতি উদাসীন থাক, তাহা হইলে তোমরা কখনই মঙ্গল সাধন করিতে পারিবে না। কিন্তু ভ্রাতৃজ্ঞানে তাহাদিগের মঙ্গল সাধন করিলে, তাহারা তোমাদের পৃষ্ঠপোষক হইয়া তোমাদিগকে বলীয়ান করিবে এবং তখন তোমরা অন্যান্য জাতির নিকটেও সম্মান্য হইয়া তোমাদিগের ন্যায্য অধিকার পরিচালনে সমর্থ হইবে।

একবার হৃদয় মনের সন্দিগ্ধভাব পরিত্যাগ করিয়া সকলকেই ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন দাও; দেখিবে, তোমাদের এ দুর্দ্দিন থাকিবে না। নিশান্তে দিবাগমন যেরূপ অবশ্যম্ভাবী, তাহা হইলে ভারতবর্ষের পুনরভ্যুদয়ও তদ্রূপ অবশ্যম্ভাবী হইবে।

শ্রৌত

প্রাণতত্ত্ব।

প্রাণই জগৎকেন্দ্র, প্রাণই বিশ্বকেন্দ্র। জগৎব্রহ্মাণ্ড এই প্রাণেই অবস্থিত। প্রাণ-তত্ত্ব অবগত হইলে শরীর ও মন সহজেই সংযত হয়।

শ্রুতি বলিয়াছেন "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ"। (তস্মাৎ তমঃপ্রধান বিক্ষেপশক্তি যদজ্ঞানোপহিতচৈতন্যাৎ) আকাশাদ্ বায়ুর্ব্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী যোৎপদ্যতে। সত্ত্বরজস্তমাংসি কারণগুণপ্রক্রমেণ তেষ্বাকাশাদিষুৎপদ্যন্তে। ইমান্যেব সূক্ষ্মভূতানি তথাত্রাণ্যপঞ্চীকৃতানি-চোচ্যন্তে। এতেভ্যঃ সূক্ষ্ম শরীরাণি স্থূল-ভূতানি যোৎপদ্যন্তে।"

তমোগুণপ্রধান বিক্ষেপশক্তিযুক্ত অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হয়। শ্রুতিতে এবম্প্রকারে সৃষ্টির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আকাশাদিকে অপঞ্চীকৃত পঞ্চ সূক্ষ্মভূত বা মহাভূত বলে। আকাশাদিতে কারণ-গুণের তারতম্য ক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ তারতম্য রাখিয়া উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই সকল সূক্ষ্মভূত হইতে সূক্ষ্মশরীর ও স্থূলভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

সূক্ষ্মশরীরাণি সপ্তদশাবয়বানি লিঙ্গ-শরীরাণি। অবয়বস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকং বুদ্ধি মনসী কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চকং বায়ু পঞ্চকঞ্চেতি। ইদং প্রাণাদি পঞ্চকং আকাশাদি-গত রজোহংশেভ্যো মিলিতেভ্য উৎপদ্যতে। ইদং প্রাণাদি পঞ্চকং কর্ম্মেন্দ্রিয়সহিতং সৎ— প্রাণময় কোষো ভবতি। অস্য ক্রিয়াত্মকত্বেন রজোহংশকার্য্যত্বং। প্রাণময়ঃ ক্রিয়াশক্তিমান্ কার্য্যরূপঃ।

সূক্ষ্ম শরীর সপ্তদশ অবয়ব মিলনে গঠিত হয়। পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও মন। পঞ্চপ্রাণ মিলিত-আকাশাদি পঞ্চ তন্মাত্রের রজোহংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। পঞ্চপ্রাণে রজোগুণের বাহুল্য লক্ষিত হয়। এজন্য প্রাণও ক্রিয়া-শক্তি প্রদান করে। সূক্ষ্ম শরীরের যেমন সপ্তদশ অবয়ব আছে, তেমনি ভিন্ন ক্রিয়া-ভেদে তিনটি আবরণ আছে। উঁহার নাম, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ ও বিজ্ঞান-ময় কোষ। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণে মিলিত হইলে, জীবের প্রাণময় কোষ উৎপন্ন হয়। জীব প্রাণময়ের আবরণে থাকিয়া ক্রিয়াশক্তি-মান্ ও কার্য্যরূপ হয়।

প্রাণই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে বরিষ্ঠ। সমস্ত ইন্দ্রিয়-মূলে প্রাণই কার্য্যশক্তি প্রদান করিতেছে।

প্রাণো বা আশায়া ভূয়ান্ যথাবা অরা-নাভৌ সমর্পিতা এবমস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং সমর্পিতং প্রাণঃ প্রাণেন যাতি প্রাণঃ প্রাণং দদাতি প্রাণায় দদাতি প্রাণোহ পিতা প্রাণো মাতা প্রাণো ভ্রাতা প্রাণঃ স্বসা প্রাণ আচার্য্যঃ প্রাণো ব্রাহ্মণঃ॥১।

স যদি পিতরং বা মাতরং বা ভ্রাতরং বা স্বসারং বাচার্য্যং বা ব্রাহ্মণং বা কিঞ্চিদ্ ভৃশমিব প্রত্যাহ ধিক্ত্বাস্ত্বিত্যে বৈনমাহুঃ

পিতৃহা বৈ ত্বমসি মাতৃহা বৈ ত্বমসি ভ্রাতৃহা বৈ ত্বমসি স্বসৃহা বৈ ত্বমস্যাচার্য্যহা বৈ ত্বমসি ব্রাহ্মণহা বৈ ত্বমসি ॥২॥

অথ যদ্যপ্যেনানুৎক্রান্ত প্রাণাচ্ছূলেন সমাসং ব্যাতি-সন্দহেন্নৈবৈনং ব্রূয়ুঃ পিতৃহাসীতি ন মাতৃহাসীতি ন ভ্রাতৃহাসীতি ন স্বসৃহাসীতি নাচার্য্যাহাসীতি ন ব্রাহ্মণহাসীতি ॥ ৩

প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি সবা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাতি বাদী ভবতি তঞ্চেদ্‌ব্রূয়ুরতিবাদ্যসীত্যতিবাদ্যস্মীতি ব্রূয়ান্নাপহ্নুবীত ॥ ৪

ইতি ছান্দোগ্যে পঞ্চদশ খণ্ডঃ ॥

ভাষ্যঃ—

নামোপক্রমমাশান্তং কার্য্য-কারণত্বেন নিমিত্ত নৈমিত্তিকত্বেন যোত্তরোত্তর ভূয়স্তয়াবস্থিতং স্মৃতি নিমিত্ত সম্ভাবমাশায়-শনাপাশৈর্ব্বিপাশিতং সর্ব্বং সর্ব্বতোবিম্বমিব তন্তুভির্যস্মিন্ প্রাণে সমর্পিতম্। যেন চ সর্ব্বতো ব্যাপিনা অন্তর্ব্বহির্গতেন সূত্রে মণিগণা ইব সূত্রেন গ্রথিতং বিধৃতঞ্চ। স এষ প্রাণো বৈ আশায়া ভূয়ান্। কথমস্য ভূয়স্তমিত্যাহ দৃষ্টান্তেন সমর্থয়ৎ তন্তূয়স্বং যথা বৈ লোকে রথচক্রস্যারা রথনাভৌ সমর্পিতাঃ সম্প্রতোঃ সম্প্রবেশিতা ইত্যেতৎ। এবমস্মিন্ লিঙ্গসঙ্ঘাতরূপে প্রাণে প্রজ্ঞাত্মনি দেহকে মুখ্যে যস্মিন্ পরা দেবতা নামরূপ-ব্যাকরণায়াদর্শাদৌ প্রতিবিম্ববজ্জীবেনাত্মনা প্রবিষ্টা। যস্য মহারাজস্যেব সর্ব্বাধিকারীশ্বরস্য। কস্মিন্ ন্বহমুৎক্রান্তে উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন্ বা প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি স প্রাণমসৃজতেতি শ্রুতেঃ। যস্যচ্ছায়েবানুগতঞ্চেশ্বরম্। তদ্‌যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতো নাভাবয়া অর্পিতা এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রাস্বর্পিতাঃ প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ। স এব প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মেতি কৌষীতকীনাম্। অতএব অস্মিন্ প্রাণে সর্ব্বং যথোক্তে সমর্পিতম্। অতঃ স এষ প্রাণোঽপরতন্ত্রঃ প্রাণেন স্বশক্তৈব যাতি নান্যকৃত গমনাদিক্রিয়া স্বস্য সামর্থ্যমিত্যর্থঃ। সর্ব্বং ক্রিয়া কারক ফলভেদ জাতং প্রাণ এব ন প্রাণাদ্বহির্ভূতমস্তীতি প্রকরণার্থঃ। প্রাণঃ প্রাণং দদাতি যদ্দদাতি তত্র আত্মভূতমেব। যস্মৈ দদাতি তদপি প্রাণায়ৈব। অতঃ পিত্রাদ্যাখ্যোঽপি প্রাণ এব। কথং পিত্রাদিশব্দানাং প্রসিদ্ধার্থোৎসর্গেণ প্রাণবিষয়ত্বমিতি। উচ্যতে সতি প্রাণে পিত্রাদিশব্দ প্রয়োগাত্তদুৎক্রান্তৌ চ প্রয়োগাভাবাৎ ॥১

কথং তদিত্যাহ। স যঃ কশ্চিৎ পিত্রাদীনামন্যতমং যদি তং ভৃশমিব তদননুরূপমিব কিঞ্চিদ্বচনং ত্বংকারাদিযুক্তং প্রত্যাহ তদেনং পার্শ্বস্থা আহুর্ব্বিবেকিনো ধিক্ত্বাস্তু ধিগস্তুত্বামিত্যেবম্। পিতৃহাবৈ ত্বং পিতুর্হন্তেত্যাদি।

অথৈনানেরোৎক্রান্ত প্রাণাংস্ত্যক্তদেহান্ অথান্যদপি শূলেন সমাসং সমস্য ব্যতিসন্দহেদেবমতিক্রূরমপি কর্ম্ম সমাস ব্যত্যাসাদি প্রকারেণ দহন-লক্ষণং তদ্দেহসম্বন্ধমেব কুর্ব্বাণং নৈবৈনং ব্রূয়ুঃ পিতৃহেত্যাদি। তস্মাদন্বয় ব্যতিরেকাভ্যামবগম্যতে এতৎ পিত্রাখ্যোঽপি প্রাণ এবেতি ॥৩

তস্মাৎ প্রাণো হ্যে বৈ তানি পিত্রাদীনি সর্ব্বাণি ভবন্তি চলানি স্থিরাণি চ। স বা

এব প্রাণবিৎ। এবং- যথোক্ত প্রকারেণ পশ্যন্ ফলতোঽনুভবন্নেবং সন্ধান উপপত্তি-ভিশ্চিন্তন্নেবং বিজ্ঞাননুপপত্তিভিঃ সংযোজ্যৈবমেবেতি নিশ্চয়ং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। মনন-বিজ্ঞানাভ্যাং হি সম্ভূতঃ শাস্ত্রার্থো নিশ্চিতো-দৃষ্টো ভবেৎ অতএবংপশ্যন্নতিবাদী ভবতি। নামাদ্যাশান্তমতীত্য বদনশীলো ভবতীত্যর্থঃ তে চেদ্‌ব্রূয়ুস্তং যদি এবমতিবাদিনং সর্ব্বদা সর্ব্বৈঃ শব্দৈর্ণামাদ্যা বর্ত্তমানং প্রাণমেব বদন্তি এবং পশ্যন্তমতিবদনশীলমতিবাদিনং ব্রহ্মা-দিস্তম্বপর্য্যন্তম্। তস্য হি জগতঃ প্রাণ আত্মাহমিতি ব্রুবাণং যদিব্রূয়ুরতিবাদ্যসীতি। বাঢ়মতিবাদ্যস্মীতি ব্রূয়াৎ নাপহ্নুবীতা-কস্মাদ্ধ্য সাবপহ্নুবীত যৎ প্রাণং সর্ব্বেশ্বর-ময়মস্মীত্যাত্মত্বেনোপগতঃ ॥৪

প্রাণ সর্ব্বাস্পদ। সুতরাং প্রাণের সর্ব্ব-প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইতে পারে। নামাদি আশা পর্য্যন্ত কার্য্য-কারণ রূপে প্রাধান্য ও নিমিত্ত নৈমিত্তিক হেতু প্রাধান্য প্রতি-পন্ন হইয়াছে। যেমন মৃণাল সকল নাল মধ্যে তন্তু দ্বারা সংযুক্ত আছে, সেইরূপ আশারূপ পাশদ্বারা সকলেই প্রাণে অবস্থিত আছে। যেমন মণিগণ সূত্রদ্বারা আবদ্ধ আছে, সেইরূপ অন্তর্ব্বহির্ব্যাপী সমুদায়ই প্রাণে অবস্থিত আছে। সেই প্রাণ আশা হইতে মহত্তর। যেমন রথচক্রস্থিত অর সকল রথনাভিতে প্রবিষ্ট থাকে, সেইরূপ জগৎও প্রাণেতে প্রতিষ্ঠিত আছে। এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মস্বরূপ ও এই প্রাণই লিঙ্গ-সঙ্ঘাতরূপ, অর্থাৎ লিঙ্গ-দেহগঠনে পরম সহায়। মুকুরাদিতে যেরূপ প্রতিবিম্ব পড়ে, তদ্রূপ এই প্রাণে পরমাত্মাদেব জীবাত্মা রূপে অনুপ্রবিষ্ট আছেন। মুখ্যপ্রাণই দেহরাজ্যের সর্ব্বাধিকারী মহারাজা। কাহার উৎক্রমণে আমি উৎক্রান্ত হইব, কাহার অবস্থিতিতে আমি অবস্থিত হইব, এতদ্বিধ আশঙ্কা নিরাসে প্রাণের সৃষ্টি হইয়াছে।—শ্রুতি বলিয়াছেন,—এই প্রাণ ছায়ার ন্যায় ঈশ্বরে অনুগত। যেমন রথস্থিত অর সমূহে নেমি অর্পিত আছে এবং যেরূপ সেই সমস্ত অরও নাভিতে অর্পিত আছে, সেইরূপ ভূত সকল প্রজ্ঞা মাত্রে অর্পিত এবং সেই প্রজ্ঞাও প্রাণে সমর্পিত আছে। সেই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা। প্রাণই যে এইরূপ সর্ব্বাশ্রয়, কৌষিতকী শ্রুতি তাহা সবিশেষ বুঝাইয়াছেন। অতএব প্রাণেতেই সমস্ত সমর্পিত। সেই প্রাণ অপরতন্ত্র। প্রাণ স্বীয় শক্তিতেই গমন করে। অন্যকৃত গমনাদিতে প্রাণের স্বীয় সামর্থ্যের অভাব সকল সময়েই আছে। সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়া ও কারক (অথবা কার্য্য ও কর্ত্তা) এর ফল-ভেদে প্রাণ বর্ত্তমান আছেন। প্রাণের বহির্ভূত থাকিয়া কোন ক্রিয়া এ পর্য্যন্ত নিষ্পাদিত হইতে পারে নাই, এবং কোন কর্ত্তাও প্রাণ ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন করিতে পারেন নাই। কার্য্যে প্রাণ বা সজীবতা না থাকিলে কোন কার্য্য কি নিষ্পন্ন হইতে পারে? প্রাণই প্রাণ দ্বারা গমন করে, প্রাণই প্রাণ প্রদান করে। যাহাকে প্রদত্ত হয়, তাহাও প্রাণ। প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভ্রাতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য্য এবং প্রাণই ব্রাহ্মণ। প্রাণ বিদ্যমান থাকিলে, পিতা, মাতা, ভ্রাতা,

ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ হইয়া থাকে। প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে, পিত্রাদি শব্দের অভাব হইয়া থাকে ॥১

যদি কোন ব্যক্তি পিত্রাদির প্রতি কোন অযুক্ত বাক্য বা হুংকারাদিযুক্ত বাক্য বা অসম্ভ্রম বা দুঃখজনক বাক্য প্রয়োগ করে, তাহা হইলে তাহার পার্শ্বস্থ বিবেকীগণ বলিয়া থাকেন "তোমাকে ধিক্, তোমাকে ধিক্, তুমি পিতৃহন্তা" ইত্যাদি ॥২

আর যখন পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আচার্য্য ও ব্রাহ্মণ, ইঁহাদিগের প্রাণ দেহ ত্যাগ করে, তখন যে তাহাদিগকে শূলাঘাত করিয়া দহনাদি ক্রূরকর্ম্ম করে, তখন কেহ তাহাকে পিতৃহা, মাতৃহা, ভ্রাতৃহা, স্বসৃহা, আচার্য্যহা, ব্রাহ্মণহন্তা বলিয়া তিরস্কার করে না। সেই হেতু অন্বয়-ব্যতিরেক প্রমাণে স্থির হয়, পিতা মাতা প্রভৃতি এবং-প্রকার আখ্যাপ্রাপ্ত সমস্তই প্রাণ ॥৩

এইরূপে স্থাবর ও জঙ্গমাত্মক সমস্ত বিশ্বই এক মহাপ্রাণ। যিনি প্রাণকে এবং-বিধরূপে জানেন, তিনিই প্রাণবিৎ। প্রাণবিৎ ব্যক্তিরা যথোক্ত প্রকারে দর্শন করিবেন। ফলতঃ অনুভব হইলে, ছয় প্রকার উপপত্তি দ্বারা নিশ্চিতার্থ বিজ্ঞাত হইবেন। মনন ও বিজ্ঞানের দ্বারা উদ্ভূত শাস্ত্রার্থ নিশ্চিতরূপে দৃষ্ট হইবে। নামাদি আশান্ত অতিক্রম করিয়া প্রাণতত্ত্ব এইরূপে পরিদর্শন করিলে, তাঁহাকেই অতিবাদী বলা যায়। নাম প্রভৃতি হইতে আশা পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া কথনশীলই অতিবাদী। ক্ষুদ্রতম স্তম্ব হইতে বৃহত্তম ব্রহ্ম পর্য্যন্ত নামাদি আশান্ত অতিক্রম করিয়া প্রাণমাত্র প্রতিপাদনেরও ন্যায় স্ব স্ব বিষয়ের প্রতিপাদককেও অতিবাদী বলা যায়। যিনি প্রতিপাদিত বস্তু আকীট ব্রহ্ম পর্য্যন্ত দর্শন করেন, যিনি বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থে প্রাণের সত্তা উপলব্ধি করেন, তিনি জগতের আত্মা, তাঁহার এই প্রকার বোধ জন্মে। তখন তাঁহাকে—নামাদি আশান্ত অতিক্রম করিয়া কেন প্রাণমাত্রকে প্রতিপাদন করিতেছ, এবংপ্রকার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি "বায়মস্মি" বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন এবং বলিয়া থাকেন, আমি কেবল প্রাণমাত্রকেই জানি; কাহা হইতে এই প্রাণের গোপন করিব? আমি সর্ব্বেশ্বরময় প্রাণ-স্বরূপ।

"প্রাণো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।
প্রাণাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
প্রাণেন জাতানি জীবন্তি।
প্রাণং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি।"

তৃতীয়োঽনুবাক্। (তৈত্তিরীয়।)

"প্রাণোবান্নম্। শরীরমন্নাদং৫ প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতং। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।"

(তৈঃ শ্রুঃ)

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত।

কামকলাতত্ত্ব।

——:০:——

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

প্রাণায়াম শিক্ষার সময় আহারাদির সংযম ও অনেক নিয়ম পালন করিতে হয়। আর লোকালয়ে কিম্বা বহুজনপূর্ণ সহরে থাকিয়া আদৌ প্রাণায়াম সাধন হইতে পারে না। যে সে ঋতুতে এবং যে সে স্থানে প্রাণায়াম ও যোগারম্ভ করিলে, তাহা দুঃখদায়ক হয়। কিরূপ স্থানে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়, দেখুন।—

"সুদেশে ধার্ম্মিকে রাজ্যে সুভক্ষ্যে নিরুপদ্রবে।
তত্রৈকং কুটিরং কৃত্বা প্রাচীরৈঃ পরিবেষ্টিতম্॥
বাপীকূপ তড়াগঞ্চ প্রাচীর মধ্যবর্ত্তি চ।
নাত্যুচ্চং নাতিনীচঞ্চ কুটীরং কীটবর্জ্জিতম্॥
সম্যগ্ গোময়লিপ্তঞ্চ কুটীরন্তত্র নির্ম্মিতম্।
এবং স্থানেষু গুপ্তেষু প্রাণায়ামং সমভ্যসেৎ॥"

(যোগশাস্ত্র)

রাজধানী কিম্বা লোকালয়ে প্রাণায়াম কিম্বা কোন প্রকার যোগসাধন আরম্ভ করিতে নাই, করিলে সিদ্ধিহানি হয়।

"দূরদেশে তথারণ্যে রাজধান্যৌ জনান্তিকে।
যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ সিদ্ধিহা ভবেৎ॥"

(যোগশাস্ত্র)

দূরদেশ অথবা অরণ্য এবং বহুলোকসমাকীর্ণ সহর, এই তিন স্থান যোগারম্ভের বিশেষ অন্তরায়।

"অবিশ্বাসং দূরদেশে অরণ্যে রক্ষিবর্জ্জিতম্।
লোকারণ্যে প্রকাশশ্চ তস্মাৎ ত্রীণিবিবর্জ্জয়েৎ।"

(যোগশাস্ত্র)

"দূরস্থানে বিপিনে চ রাজধান্যাং জনালয়ে।
যোগাভ্যাসং ন কুর্য্যাত্তু কৃতে চ যোগহা ভবেৎ॥"

(গোরক্ষ সংহিতা)

গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে যোগারম্ভ করিলে পীড়া হয়।

"যোগারম্ভং ন কুর্ব্বীত হেমন্তে শিশিরে মুনিঃ।
তথা গ্রীষ্মে চ বর্ষায়াং কৃতো যোগোহি রোগদ।"

(গোরক্ষসংহিতা)

এই চারি ঋতু বাদে শরৎ ও বসন্ত ঋতুতে যোগারম্ভ করিতে হয়।

"বসন্তে বাপি শরদি যোগারম্ভং সমাচরেৎ।
তদা যোগো ভবেৎ সিদ্ধো বিনায়াসেন কথ্যতে॥"

(যোগশাস্ত্র)

"বসুমতী" (১০) দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "যাহারা পাঁচ টাকা পাইলে, কলির মানবকে জীবাত্মা পরমাত্মার একত্র সমাবেশ দেখাইয়া দেন, এমন বুজরুকেরও ভারতে অভাব নাই।" বাস্তবিক কথা, ভারতে—বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে এমন বুজরুক যোগী আছেন, তাঁহারা গ্রীষ্ম, বর্ষা, প্রভৃতি যোগশাস্ত্রোক্ত উপরের লিখিত বিধি নিষেধ না মানিয়া, যখন তখন যে সে স্থানে পাত্রাপত্র অবিচারে প্রাণায়াম বা যোগ শিক্ষা দিয়া থাকেন। অবশ্য তাহার ফলও সেইরূপ হয়। আর

(১০) সন ১৩০৯ সাল ১লা শ্রাবণ তারিখের "বসুমতী" সংবাদ পত্রে "অদ্বিতীয় বুজরুক" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

সেই সকল শিক্ষা প্রকৃত যোগ নহে। বুজ-রুকী দেখাইয়া শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি ও নাম-জাহির এবং অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশ্য। সুতরাং যোগশাস্ত্রোক্ত বিধি ব্যবস্থা সেখানে কোল্‌কে পায় না!

যাহা হউক, প্রাণায়াম বা যে কোন প্রকার যোগসাধন করিবার সময়ে উপরোক্ত এবং অন্যান্য শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন করিতে হয়।

যোগ অনেক প্রকার আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য এক। কিন্তু যে কোন প্রকার যোগ শিক্ষার পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহের মধ্যে কোথায় কি আছে, তাহা অগ্রে উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত না হইলে, কোন প্রকারেই যোগ শিক্ষা হইবার কিম্বা যোগ সাধন করিবার উপায় নাই। শাস্ত্রে আছে যে,—

"ত্রিতীর্থং যত্র নাড়ীকস্ত্রিপুণ্যঃ পরমেশ্বরি।
স্বদেহে যো ন জানাতি স যোগী নামধারকঃ॥
নবচক্রং কলাধারং ত্রিলক্ষং ব্যোমপঞ্চকং।
স্বদেহে যো ন জানাতি স যোগী নামধারকঃ।।
(যোগস্বরোদয়)

দেহাভ্যন্তরস্থিত ঐ সকল বিষয় অজ্ঞাত ব্যক্তি 'যোগী' নামধারী মাত্র; প্রকৃত যোগী নহে। যে কোন যোগ বা প্রাণায়াম শিক্ষার পূর্ব্বে তিনটি নাড়ী ও নবচক্র (১১) সহস্রার প্রভৃতি অগ্রে উত্তমরূপে না জানিলে কোন প্রকারেই হইবেনা। মনে করুন, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা প্রকার দ্রব্যপূর্ণ একটি গৃহ আছে, সেই গৃহ আপনি কোন দিন চক্ষে দেখেন নাই। গৃহের দরোজা কোন্ দিকে এবং গৃহের মধ্যে নানা প্রকারের অসংখ্য জিনিষ কোথায় কি ভাবে আছে, তাহাও কখন দেখেন নাই এবং কখন শুনেন নাই; আপনি হঠাৎ একদিন ঘোর অন্ধকার রাত্রে অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত সেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কোথায় একটি আকবরী মোহর আছে, তাহা অন্ধকারে খুঁজিয়া আত্মসাৎ করিতে পারেন কি? তাহাও যেমন একেবারেই অসম্ভব, তেমনি দেহাভ্যন্তরস্থিত অবশ্যপ্রয়োজনীয় নবচক্রাদি কি কি, কোথায় কি ভাবে আছে, তাহা অগ্রে না জানিলে, প্রাণায়াম কিম্বা কোন প্রকার যোগশিক্ষাই হইতে পারে না, সাধনতো দূরের কথা। এই হেতু যোগশাস্ত্রে ব্যক্ত আছে এবং যোগী গুরুদেবেরা বলেন, যোগশিক্ষা করিতে নবচক্রাদি যোগের প্রয়োজনীয় যাহা যাহা আছে, তৎসমুদায় অগ্রে বিশেষরূপে জ্ঞাত না হইলে যোগ শিক্ষাই হয় না। আর বাহ্যবস্তু-দৃশ্যের ন্যায় দেহাভ্যন্তরে নবচক্রাদি অন্তর্দৃশ্য স্পষ্ট দৃষ্ট না হইলে যোগ সাধন করা যায় না। পরন্তু যে কোন যোগীর সাধন করিতে করিতে শেষে বিন্দুর মাহাত্ম্য ও কামকলাতত্ত্বজ্ঞান হইবেই হইবে।

কামকলা বিষয়ে পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছি, তদ্ব্যতীত আরো একটু স্পষ্ট বলিতেছি যে, কামকলা সাধন লয়যোগ। কামকলা সকল দেহেই আছেন এবং সকলেরই উপাস্য।

(১১) সকলেই জানেন, দেহ মধ্যে ষট্‌চক্র বা ছয়টি পদ্ম আছে। যথা মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র। এই ষট্‌চক্র ব্যতীত আরো তিনটি গুপ্তচক্র আছে। সর্ব্বশুদ্ধ নবচক্র। তদ্বিবরণ "খেচরী মুদ্রা" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশ করিব, ইচ্ছা রহিল।

যে কোন যোগ সাধন করিতে হইলে কামকলা ধরিতে হইবেই। কামকলা-সংস্পর্শশূন্য যে যোগ, তাহা যোগ নহে, কর্ম্মভোগ! পূর্ব্বকথিত নবচক্রাদি না জানিলে, যেমন যোগশিক্ষা হয় না, তেমনি কামকলা ছাড়িলে কোন যোগসাধন হয় না।

কামকলাতত্ত্ব বলিতে যোগ ও প্রাণায়াম সম্বন্ধে এত কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই, কামকলাতত্ত্ব-জিজ্ঞাসার্থী পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা যোগের কথা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর শেষাংশ প্রাণায়াম ও যোগাদি বিষয় বর্ণিত হইল। প্রাণায়াম বা যোগশিক্ষার্থী পাঠকগণের অবগতির জন্য আরো বলিতেছি যে, যথেচ্ছা আহার বিহার করিয়া প্রাণায়াম বা যোগসাধন কখনই করিবে না এবং গ্রীষ্ম, বর্ষাদি ঋতুতে আরম্ভ করিবে না। কোন কোন বুজরুক উপদেশ দেন যে, "রুদ্ধদ্বার গৃহ মধ্যে বসিয়া শ্বাস গ্রহণ করিয়া, যতক্ষণ পার, নিশ্বাস বন্দ করিয়া কুম্ভক কর" এ কথায় আস্থা স্থাপন করিবেন না। কাহার শরীর কোন্ যোগের উপযোগী, তাহা বিচার না করিয়া, নবচক্রাদি নিয়ম না বুঝাইয়া, আহার বিহারাদি নিয়ম না বলিয়া এবং প্রাণায়াম বা যোগসাধনের প্রারম্ভে ও সাধন কালীন যাহা যাহা অবশ্য করণীয় এবং পালনীয়, সেই সমস্ত বিশেষরূপে শিক্ষা না দিয়া, যিনি প্রাণায়াম বা যোগ শিক্ষা দেন, তিনি গুরু নহেন, কপটাচারী মহাশত্রু! ভয়ানক বুজরুক!! শিক্ষকের আসনে উপবিষ্ট ভয়ানক ভণ্ড!!!

শ্রীউমানাথ চট্টোপাধ্যায়।
(৮৫নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা।)

সীমন্তোন্নয়ন-মন্ত্রব্যাখ্যা।

ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নূ্ত্বা নূত্বা চ সূয়তাং রয়িং ॥১॥

অন্বয়ঃ। (হে কল্যাণি!) অয়ং বৃক্ষঃ উর্জ্জাবতঃ; (ত্বমপি) উর্জ্জীব ফলিনী ভব। বনস্পতেঃ পর্ণং (ইব) নূত্বা নূত্বা রয়িং সূয়তাং (ত্বয়া) ॥১॥

টীকা। হে কল্যাণি! অয়ং বৃক্ষঃ এষঃ তরুঃ ঔডুম্বরঃ উর্জ্জাবতঃ তেজস্বিনো বীজাৎ সমুৎপন্নঃ ইতি শেষঃ। উর্জ্জঃ শব্দাৎ অস্ত্যর্থে মতুপ্ প্রত্যয়ঃ বৈদিকপ্রয়োগাৎ সকারস্থাকারঃ। ত্বমপি উর্জ্জীব ঔডুম্বরীব ফলিনী প্রশস্তফলা প্রশস্তসন্ততিশ্চ ভব। বনস্পতে বৃক্ষস্য বনানাং পতিঃ বনস্পতির্বৃক্ষে ইতি নিপাতনাৎ সুটাগমঃ। পর্ণং পত্রং ইব নূত্বা নূত্বা প্রেষ্য প্রেষ্য বীপ্সায়াং দ্বির্ভাবঃ রয়িং পুত্রধনং সূয়তাং উৎপাদ্যতাং। সূপ্রসবে ইতি ধাতোঃ কর্ম্মণ্যনুজ্ঞায়াং লোট্। ঔডুম্বর-ফলানি যথা পরিণতি পর্য্যন্ত স্থায়ীনি তথা অপতনশীলানি তথা তৌ অপত্যানি বার্দ্ধক্যপর্য্যন্তং রোগশূন্যানি তথা মৃত্যুরহিতানি চ ভবন্তু ইতি ভাবঃ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ। হে কল্যাণি! এই ঔডুম্বর বৃক্ষ তেজস্বী বীজ হইতে সমুৎপন্ন হইয়াছে। তুমিও এই ঔডুম্বর বৃক্ষের ন্যায় ফলবতী (অর্থাৎ বহুসন্তানবতী) হও। বৃক্ষের পত্র সমুদায়ের ন্যায় তোমার সন্তানগণও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক ॥১॥

ওঁ যেনাদিতেঃ সীমানং নয়তি প্রজাপতি র্মহতে সৌভগায় তেনাহমস্যৈ সীমানং নয়ামি প্রজামস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোমি ॥২॥

অন্বয়। প্রজাপতিঃ মহতে সৌভগায় যেন অদিতেঃ সীমানং নয়তি অহং তেন অস্যৈ সীমানং নয়ামি অস্যৈ প্রজাং জরদষ্টিং কৃণোমি ॥২॥

টীকা। প্রজাপতিঃ কশ্যপঃ মহতে সৌভগায় অশেষ সৌভাগ্য লাভায় যেন শরেণ অদিতেঃ দেবমাতুঃ সীমানং সীমন্তং নয়তি উন্নীতবান তিষ্ঠোঽপি তিষ্ঠমিচ্ছন্তি ইতি লিটঃ স্থানে লট্ অহং তেন শরেণ অস্যৈ অস্যাঃ মৎপত্ন্যাঃ সীমানং নয়ামি সীমন্তমুন্নয়ামি। অস্যৈ প্রজাং অস্যাঃ সন্ততিং সুপাং সুপ্ ইতি ষষ্ঠীস্থানে চতুর্থ্যাদেশঃ জরদষ্টিং জরাপর্য্যন্তং দীর্ঘকালজীবিনং কৃণোমি করোমি কৃণোমি ইতি ছান্দসত্বাৎ সিদ্ধং। দেবপিতা যাদৃশ শরেণ অদিতেঃ সীমন্তোন্নয়নং কৃত্বা অমরান্ বহুবিভূতি-সম্পন্নাংশ্চ পুত্রান্ লেভে অহমপি তথা তাদৃশ শরেণ অস্যাঃ সীমন্তমুন্নীয় সুদীর্ঘ-জীবান্ ঐশ্বর্য্যশালিনশ্চ তনয়ান্ লপ্স্যে ইতি ভাবঃ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ। দেব-পিতা কশ্যপ বিশেষ সৌভাগ্য লাভার্থ শরদ্বারা দেব-মাতা অদিতির সীমন্তোন্নয়ন করিয়াছিলেন, আমিও সেই শরদ্বারা ইহার সীমন্তোন্নয়ন করিয়া ইহার সন্তানগণকে দীর্ঘজীবী করি ॥২॥

ওঁ রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা সীব্যত্বয়ঃ 'সূচ্যা অচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুখ্যং ॥৩॥

অন্বয়ঃ। অহং সুষ্টুতী সুহবাং রাকাং হুবে। (সা) নঃ সুভগাঃ শৃণোতু ত্মনা বোধতু অচ্ছিদ্যমানয়া অয়ঃ সূচ্যা সীব্যতু বীরং শতদায়মুখ্যং দদাতু ॥৩॥

টীকা। অহং সুষ্টুতী শোভনস্তত্যা ছান্দসত্বাৎ বিভক্তের্লুক। সুহবাং সুষ্ঠু হূয়তে যা তাং দেবস্বরূপিণীং রাকাং পূর্ণ-চন্দ্রং 'পূর্ণেরাকা নিশাকরে' ইত্যমরঃ, হুবে আহ্বয়ামি সা রাকা নঃ অস্মাকং সুভগাঃ শোভনপুণ্যাঃ বাচঃ ইত্যর্থঃ শৃণোতু আকর্ণয়তু ত্মনা আত্মনা ছন্দঃপ্রয়োগাদাকারলোপঃ বোধতু প্রতিবুদ্ধ্যতাং বোধত্বিত্যপি বৈদিক প্রয়োগাৎ ভ্বাদিগণীয়বৎ সিদ্ধং। অচ্ছিদ্যমানয়া ছেত্তুমশক্যয়া অয়ঃ সূচ্যা লৌহযন্ত্রবিশেষেণ সীব্যতু আবয়োঃ দম্পত্যোর্মনঃ পরস্পরং মিলিতং করোতু। সূত্রেণ কর্পটদ্বয়মিব পরস্পর প্রেম্ণা আবয়োশ্চিত্তযুগলং মেলয়তু। কদাচিদপি দম্পতী-কলহো মাভূদিত্যর্থঃ। শতদায়মুখ্যং শতং দায়া দানানি দাধাতোঃ র্ভাবে ঘঞ্ যস্য তেষু প্রভুত দাতৃষু মুখ্যং বীরং স্বোপযুক্তকর্ম্মসু সম্পূর্ণসমর্থং পুত্রং দদাতু। কেচিত্তু শতদায়মুখ্যমিতি পাঠং কল্পয়িত্বা শতং দদতি ইতি শতশব্দাৎ দাধাতোঃ কর্ত্তরি উণ প্রত্যয়েন সিদ্ধং কুর্ব্বন্তি। অয়ঃ সূচ্যা ইত্যত্র অয়ঃ ইতি পৃথক্ পদমপি দৃশ্যতে তন্মতে অয়ঃ অদঃ শব্দ নিষ্পন্নং ছান্দসত্বাৎ দকারশ্চ যকারঃ ॥৩

বঙ্গানুবাদ। আমি শোভনস্তুতি সকলের দ্বারা দেবরূপিণী রাকাকে (পূর্ণচন্দ্রকে) আহ্বান করি। তিনি আমার সুন্দর বাক্য সকল শ্রবণ করুন, এবং স্বয়ং প্রতিবুদ্ধ হইয়া চিরস্থায়ী প্রেমসূত্র দ্বারা আমাদের (স্ত্রী-পুরুষের) মনকে সংমিলিত করুন, এবং দাতৃশ্রেষ্ঠ কর্ম্মবীর পুত্র প্রদান করুন।

ওঁ যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ সুপেশসো যাভি র্দদাসি দাশুষে বসূনি তাভির্নোঽদ্য সুমনা উপাগহি সহস্রপোষং সুভগেররাণা ॥৪

অন্বয়ঃ। হে রাকে! তে যাঃ সুপেশসঃ সুমতয়ঃ (বর্ত্তন্তে) যাভিঃ (ত্বং) দাশুষে বসূনি দদাসি তাভিঃ (উপলক্ষিতা) তথা সুমনাঃ (সতী) অদ্য নঃ উপ আগহি। হে সুভগে! সহস্রপোষং ররাণা ভব ॥৪

টীকা। হে রাকে! পূর্ণচন্দ্র! তে তব যাঃ সুপেশসঃ অতিকোমলাঃ সুমতয়ঃ সুপ্রশস্তমনোবৃত্তয়ঃ সন্তি ত্বং যাভিঃ সুমতিভিঃ দাশুষে দানশীলায় যজমানায় দাশৃ দানে ইতি ধাতো র্লিটঃ ক্বসুপ্রত্যয়েন সিদ্ধং তত শ্চতুর্থ্যৈক বচনং। বসূনি ধনানি দদাসি বিতরসি তাভিঃ অতিকোমলাভি র্দানশীলাভিশ্চ মনোবৃত্তিভিঃ উপলক্ষিতা তাভিরিত্যত্র কমণ্ডলুনা ছাত্রমিতিবৎ বিশেষণে তৃতীয়া তথা সুমনাঃ সুপ্রশস্তচিত্তা দয়ার্দ্র চিত্তেত্যর্থঃ সতী অদ্য অস্মিন্নহনি নঃ অস্মাকং উপ সমীপে আগহি আয়াহি। আপূর্ব্বাৎ গমধাতোঃ কর্ত্তর্য্যনুজ্ঞায়াং লোট্ ছান্দসত্বাৎ সিদ্ধং। হে সুভগে প্রশস্তভাগ্যশালিনি! যদ্বা সু শোভনং ভগং ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতঃ ইত্যুক্ত প্রকারং যস্যাঃ তৎ সম্বোধনে হে ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনি! সহস্র পোষং ররাণা দদানা ভব। সহস্রপোষণকারিণং পুত্রং প্রযচ্ছ ইত্যর্থঃ ॥৪॥

হে পূর্ণচন্দ্র! তুমি যে অতিকোমল-চিত্তবশবর্ত্তী হইয়া দানশীল যজমানবর্গকে ধনদান করিয়া থাক, সেই অতিকোমল চিত্তদ্বারা উপলক্ষিত ও প্রসন্নহৃদয় হইয়া আমাদিগের নিকট আগমন কর, এবং আমাদিগকে সহস্রজনপোষণকারী পুত্র প্রদান কর ॥৪

ওঁ কিং পশ্যসি ॥৫

অন্বয়ঃ॥ (সুগমম্।)

টীকা। স্থালীপাকদর্শনকারিণীং পত্নীং পৃচ্ছতি। কিং পশ্যসি কিং অবলোকয়সি ॥৫

বঙ্গানুবাদ। পতি পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কি দেখিতেছ?

ওঁ প্রজাং পশূন্ সৌভাগ্যং মহ্যং দীর্ঘায়ুষ্ট্বং পত্যুঃ ॥৬

অন্বয়ঃ। (অহং) প্রজাং পশূন্ সৌভাগ্যং তথা মহ্যং পত্যুঃ দীর্ঘায়ুষ্ট্বং (পশ্যামি) ॥৬

টীকা। অহং প্রজাং ভবিষ্যসন্ততিং পশূন্ গবাদীন্ সৌভাগ্যং তথা মহ্যং মম ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী পত্যুঃ ভর্ত্তুঃ তব ইত্যর্থঃ দীর্ঘায়ুষ্ট্বং দীর্ঘং আয়ুঃ জীবিতকালঃ যস্য আয়ুর্জীবিতকালো না ইত্যমরঃ তস্য ভাবঃ তৎ পশ্যামি অবলোকয়ামি ॥৬

বঙ্গানুবাদ। আমি প্রজা (অর্থাৎ সন্তান), গবাদি পশু, সৌভাগ্য ও পতির দীর্ঘজীবন দর্শন করিতেছি। (ইহা পূর্ব্বপ্রশ্নের প্রত্যুত্তর।)

ইতি সীমন্তোন্নয়ন-মন্ত্র-ব্যাখ্যা ॥

(শোষ্যন্তীহোম-মন্ত্র-ব্যাখ্যা।)

ওঁ যা তে তিরশ্চী নিপদ্যতেঽহং বিধরণী ইতি তাং ত্বাং ঘৃতস্য ধারয়া যজে সংরাধনীমহং সংরাধন্যৈ দেব্যৈ দ্বেষ্ট্র্যৈ স্বাহা ॥১

অন্বয়ঃ। যা তে তিরশ্চী তথা বিধরণী নিপদ্যতে ইতি অহং (মন্যে) তাং সংরাধনীং ত্বাং ঘৃতস্য ধারয়া যজে। (এষা ঘৃতাহুতিঃ) সংরাধন্যৈ দ্বেষ্ট্র্যৈ দেব্যৈ স্বাহা।

টীকা। যা দেবতা তে তব তিরশ্চী বাঞ্ছিতফলবিঘাতকর্ত্রী তথা বিধরণী শুভ-কার্য্যবিঘাতকারিণী ইতি অহং মন্যে বিবি-নচমি তাং বিখ্যাতাং সংরাধনীং তব ইষ্ট-ফলপ্রদাত্রীং দেবতাং অহং ঘৃতস্য ধারয়া আজ্যাহুত্যা যজে অর্চ্চয়ামি। শুভজনন্যাঃ অশুভকারিণ্যাশ্চ দেব্যাঃ প্রীতিসম্পাদনার্থং ইমামাজ্যধারাং জুহোমি ইত্যর্থঃ। এষা ঘৃতাহুতিঃ আজ্যধারা সংরাধন্যৈ তব ইষ্টফল-প্রদাত্র্যৈ দ্বেষ্ট্র্যৈ চ বিদ্বেষিণ্যৈ চ দেব্যৈ দেব-তায়ৈ স্বাহা অর্পয়ামি ইত্যর্থঃ। স্বাহা দেব-হবির্দ্দানে ইতি বিশ্বঃ॥১

বাঙ্গানুবাদ। হে কল্যাণি! যে দেবতা তোমার অভিমত ফলের ব্যাঘাতকারিণী—শুভ কার্য্য-ব্যাঘাতকারিণী বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এবং যিনি তোমাকে ইষ্টফল প্রদান করিয়া থাকেন, সেই দেবতাদ্বয়কে আমি ঘৃতাহুতি দ্বারা অর্চ্চনা করি। এই ঘৃতধারা তোমার ইষ্টফলদায়িনী ও বিদ্বেষকারিণী দেবীকে অর্পণ করিলাম॥১

ওঁ বিপশ্চিৎ পুচ্ছমভরৎ তদ্ধাতা পুন-রাহরৎ। পরেহি ত্বং বিপশ্চিৎ পুমানয়ং জনিষ্যতেঽসৌ নাম।

অন্বয়ঃ। বিপশ্চিৎ পুচ্ছমভরৎ ধাতা তৎ পুনরাহুরৎ। হে বিপশ্চিৎ ত্বং পরেহি। অয়ং যথা পুমান্ জনিষ্যতে (তথা কুরু) (অস্য) নাম অসৌ ভবতু।

টীকা। বিপশ্চিৎ দেববিশেষঃ পুচ্ছং পুংলিঙ্গং অভরৎ অহরৎ হৃতবান্ অভরৎ ইতি হৃগ্রহো র্ভশ্ছন্দসি ইত্যনেন হকারস্য ভকারঃ। ধাতা বিশ্বস্রষ্টা তৎপুচ্ছং পুংলিঙ্গং পুনরাহরৎ সং-গৃহীতবান্। হে বিপশ্চিৎ শিশ্নহারিন্ দেব! ত্বং পরেহি সমাগচ্ছ অয়ং গর্ভঃ গর্ভস্থজন্তুঃ যথা যেন প্রকারেণ পুমান্ জনিষ্যতে উৎপৎস্যতে তথা কুরু বিধেহি। অস্য গর্ভস্থশিশোঃ নাম অসৌ ইদং ভবতু। অসৌ ইতি পুং-লিঙ্গং ছান্দসং॥২

বঙ্গানুবাদ। যে বিপশ্চিৎ নামক দেব-বিশেষ পূর্ব্বকালে শিশ্ন হরণ করিয়াছিলেন; বিধাতা তাহা পুনরায় আহরণ করেন। হে বিপশ্চিৎ! তুমি এখানে সন্নিহিত হও। এই গর্ভ যাহাতে পুরুষরূপে পরিণত হয়, তাহা করিও। ইহার নাম এই হইবে।

শ্রীগোপালচরণ স্মৃতিভূষণ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(ঠাকুর রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত-সঙ্গে)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ঠাকুর "হা চৈতন্য!" বলিয়া উঠিলেন। —(ভক্তদের প্রতি) চৈতন্য—কি না অখণ্ড চৈতন্য। বৈষ্ণবচরণ বল্‌তো, গৌরাঙ্গ এই অখণ্ডচৈতন্যের একটী ফুট।

[ব্রাহ্মসমাজ ও সাম্প্রদায়িকতা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি) ব্রহ্মজ্ঞানীরা নিরাকার নিরাকার ব'ল্‌ছে, তা হ'লেই বা। আন্তরিক তাঁকে ডাক্‌লেই হ'ল। যদি আন্তরিক হয়, তাহ'লে তিনি ত অন্তর্য্যামী, তিনি অবশ্য জানিয়ে দেবেন, তাঁর স্বরূপ কি।

"তবে এটা ভাল না—এই বলা যে, আমরা যা বুঝেছি, তাই ঠিক, আর যে যা

ব'ল্‌ছে, সব ভুল। আমরা নিরাকার ব'ল্‌ছি, অতএব তিনি নিরাকার, তিনি সাকার নন! আমরা সাকার ব'ল্‌ছি, অতএব তিনি সাকার, তিনি নিরাকার নন! মানুষ কি তাঁর ইতি ক'র্‌তে পারে?

"এই রকম বৈষ্ণব শাক্তদের ভিতর রেষারিষি আছে। বৈষ্ণব বলে—আমার কেশব, আবার শাক্ত বলে—আমার ভগবতী একমাত্র উদ্ধারকর্ত্তা।

"আমি বৈষ্ণবচরণকে সেজো বাবুর * কাছে নিয়ে গিছ্‌লুম। বৈষ্ণবচরণ বৈরাগী, খুব পণ্ডিত, কিন্তু গোঁড়া বৈষ্ণব। এদিকে সেজোবাবু ভগবতীর ভক্ত। বেশ কথা হচ্ছিল, এমন সময় বৈষ্ণবচরণ বলে ফেল্লে—মুক্তি দেবার একমাত্র কর্ত্তা কেশব। ব'ল্‌তেই সেজোবাবুর মুখ লাল হ'য়ে গেল। ব'লেছিল, শালা আমার! (সকলের হাস্য) শাক্ত কি না, ব'ল্‌বে না? আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি।

"যত লোক দেখি, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে, এ ওর সঙ্গে ঝগড়া ক'র্‌ছে, ও ওর সঙ্গে ঝগড়া ক'রছে। হিন্দু, মুসলমান, ব্রহ্মজ্ঞানী, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সব পরস্পর ঝগড়া করে। এ বুদ্ধি নাই যে, যাঁকে কৃষ্ণ বলছ, তাঁকেই শিব বলা হয়, তাঁকেই আদ্যাশক্তি বলা হয়; তাঁকেই যীশু বলা হয়, তাঁকেই আল্লা বলা হয়। এক রাম, তাঁর হাজার নাম।

"বস্তু এক, নাম আলাদা। সকলেই এক জিনিসকে চাচ্চে। তবে আলাদা জায়গা, আলাদা পাত্র, আলাদা নাম। একটা পুকুরে অনেক গুলি ঘাট আছে। হিন্দুরা এক ঘাট থেকে জল নিচ্চে, কলসী ক'রে,—ব'ল্‌ছে 'জল'। মুসলমানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্চে, চামড়ায় ক'রে—তারা ব'লছে 'পানি'। খ্রীষ্টানরা আর এক ঘাটে জল নিচ্চে—তারা ব'ল্‌ছে 'ওয়াটার' (water) (সকলের হাস্য)।

যদি কেউ বলে, না এজিনিসটা ভাল নয়, পানি; কি পানি নয়, ওয়াটার; কি ওয়াটার নয়, জল; তাহলে হাঁসির কথা হয়। তাই দলাদলি, মনান্তর, ঝগড়া; ধর্ম্ম-নিয়ে লাটালাটি, মারামারি, কাটাকাটি, এসব ভাল নয়। সকলেই তাঁর পথে যাচ্ছে; আন্তরিক ব্যাকুল হলেই তাঁকে লাভ করবে।

(মাষ্টারের প্রতি) তুমি এইটে শুনে যেও—

"বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, সব শাস্ত্রেই তাঁকেই চায় ও আর কারুকে চায় না। সেই এক সচ্চিদানন্দ! যাঁকে বেদে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বলেছে, তন্ত্রে তাঁকেই সচ্চিদানন্দ শিব ব'লেছে; তাঁকেই আবার পুরাণে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ ব'লেছে।

[শ্রীরামকৃষ্ণ ও তীর্থযাত্রা]

শ্রীরামকৃষ্ণ (বুড়ো গোপালের * প্রতি) তোমার কি এখন ইচ্ছা, তীর্থে যাওয়া?

বুড়ো গোপাল। আজ্ঞে হাঁ। একটু ঘুরে ঘারে আসি।

* সেজো বাবু—৺ মথুরানাথ বিশ্বাস। ৺রাণী রাসমণির জামাই। ঠাকুর রামকৃষ্ণের ভারি ভক্ত।

*বুড়ো গোপাল, এঁর পূর্ব্বের নিবাস সিঁতি। ঠাকুরের একজন সন্ন্যাসী ভক্ত।

রাম (বুড়ো গোপালের প্রতি)। ইনি বলেন, বহূদকের পর কুটীচক। যে সাধু অনেক তীর্থ ভ্রমণ করেন, তাঁর নাম বহূদক। যাঁর ভ্রমণ করার সাধ মিটে গিয়েছে, আর, এক জায়গায় স্থির হ'য়ে আসন ক'রে যিনি বসেন, তাঁকে বলে কুটীচক।

আর একটী কথা ইনি বলেন। একটী পাখী জাহাজের মাস্তুলের উপরে ব'সেছিল। জাহাজ গঙ্গা থেকে কখন কালাপানিতে প'ড়ছে, তার হুঁশ নাই। যখন হুঁশ হলো, তখন সে ডাঙ্গা কোন্ দিকে, জানিবার জন্য উত্তরদিকে উড়ে গেল। কোথাও কুল কিনারা নাই—তখন ফিরে এলো। আবার একটু বিশ্রাম করে দক্ষিণদিকে গেল। সে দিকেও কুল কিনারা নাই। তখন মাস্তুলের উপর চুপ ক'রে ব'সে রইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ (বুড়ো গোপাল ও ভক্তদের প্রতি)। যতক্ষণ বোধ হয় যে ঈশ্বর সেথা২, ততক্ষণ অজ্ঞান। যখন বোধ হয়, হেথা২, তখনই জ্ঞান।

"একজন তামাক খাবে, ত প্রতিবেশীর বাড়ী টিকে ধরাতে গেছে। রাত অনেক হ'য়েছে। তারা সব ঘুমিয়ে প'ড়েছিল। অনেকক্ষণ ধ'রে দোর ঠেলাঠেলি করার পর, একজন দোর খুল্‌তে নেমে এলো। লোকটির সঙ্গে দেখা হলে, সে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ল, কি গো! কি মনে করে? সে বল্লে, আর কি মনে করে! তামাকের নেশা আছে জানত, টিকে ধরাব মনে ক'রে। তখন সেই লোকটী বল্লে, বাঃ! তুমি ত বেশ লোক! এত কষ্ট করে আসা, আর দোর ঠেলাঠেলি; তোমার হাতে যে লণ্ঠন র'য়েছে! (সকলের হাস্য)।

"যা চায়, তাই কাছে র'য়েছে, অথচ লোক নানাস্থানে ঘুরে বেড়ায়!

রাম। মহাশয়! এখন এর মানে বুঝেছি, গুরু কেন কোন কোন শিষ্যকে বলেন, চার ধাম করে এসো। যখন একবার ঘুরে দেখে যে, এখানেও যেমন, সেখানেও তেমন, তখন আবার গুরুর কাছে ফিরে আসে। এ সব কেবল গুরুবাক্যে বিশ্বাস হবার জন্য।

কথা একটু থামিলে পর ঠাকুর রামের গুণ গাইতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তের প্রতি)। আহা, রামের কত গুণ! কত ভক্তদের সেবা আর প্রতিপালন! (রামের প্রতি) অধর বল্‌ছিল, তুমি নাকি তার খুব খাতির করেছ।

অধরের শোভাবাজারে বাড়ী। ঠাকুরের পরম ভক্ত। তাঁর বাড়ীতে চণ্ডীর গান হইয়াছিল। ঠাকুর ও ভক্তেরা অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। অধরের কিন্তু রামকে নিমন্ত্রণ করিতে ভুল হইয়াছিল। রাম বড় অভিমানী। তিনি লোকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাই অধর রামের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তাঁহার ভুল হইয়াছিল, এই জন্য রাম দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রাম (ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রতি)। সে অধরের দোষ নয়; আমি জান্‌তে পেরেছি, সে রাখালের দোষ! রাখালের উপর ভার ছিল—

শ্রীরামকৃষ্ণ। রাখালের দোষ ধরতে নেই, গলা টিপ্‌লে দুধ বেরোয়।

রাম। মহাশয়, বলেন কি, চণ্ডীর গান হলো—

শ্রীরামকৃষ্ণ। অধর ত জান্‌তো না। ঐ দেখ না, সে দিন যদু মল্লিকের বাড়ী আমার সঙ্গে গিছিলো। আমি চলে আসবার সময় জিজ্ঞাসা কল্লুম, তুমি সিংহবাহিনীর কাছে প্রণামী দিলে না? তা বল্লে, মহাশয়! আমি জান্‌তুম না যে প্রণামী দিতে হয়।

তা যদিই না বলে থাকে, হরি নামে দোষ কি? যেখানে হরিনাম, সেখানে না বল্লেও যাওয়া যায়।

নীতিমালা।

——:০:——

উত্তমৈঃ সহ সাঙ্গত্যং পণ্ডিতৈঃসহ সৎকথাম্।
অলুব্ধৈঃ সহ মিত্রত্বং কুর্ব্বাণো নাবসীদতি ॥১॥
পরবাদং পরার্থঞ্চ পরিহাস্যং পরস্ত্রিয়া।
পরবেশ্মনি বাসঞ্চ নকুর্ব্বীত কদাচন ॥২॥
পরোঽপি হিতবদ্ বন্ধুর্বন্ধুরপ্যহিতঃ পরঃ।
অহিতো দেহজো ব্যাধির্হিতমারণ্যমৌষধম্ ॥৩

উত্তম ব্যক্তির সহিত মিলন, পণ্ডিতের সহিত সদালাপ, অলুব্ধের সহিত মিত্রতা করিলে, অবসন্ন হইতে হয় না।১

পরচর্চ্চা, পরের অর্থ, পরের স্ত্রীর সহিত পরিহাস, পরগৃহে বাস কখনও করিবে না।২

পরও হিতকারী বন্ধু এবং বন্ধুও অহিতকারী পর হইয়া থাকে; যেরূপ দেহজাত ব্যাধি অহিতকারী ও অরণ্য হইতে আনীত ঔষধ হিতকারী হইয়া থাকে।৩

স বন্ধুর্যোহিতে যুক্তঃ স পিতা যস্তু পোষকঃ।
তন্মিত্রং যত্র বিশ্বাসঃ স দেশো যত্র জীব্যতে ॥৪
স ভৃত্যো যো বিধেয়স্তু তদ্বীজং যৎ প্ররোহতি।
সা ভার্য্যা যা প্রিয়ং ব্রূতে স পুত্রো যস্তু জীবতি ॥৫
স জীবতি গুণা যস্য ধর্ম্মো যস্য স জীবতি।
গুণ-ধর্ম্ম-বিহীনো যো নিষ্ফলং তস্য জীবনং ॥৬
সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রিয়ংবদা।
সা ভার্য্যা যা প্রিয়প্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা ॥৭
হিতা স্নাতা সুগন্ধাচ নিত্যঞ্চ প্রিয়বাদিনী।
অল্পভুক্তাল্পভাষা চ সততং মঙ্গলৈর্যুতা ॥৮॥
সততং ধর্ম্মবহুলা সততং চ পতিপ্রিয়া।
সততং প্রিয়বক্ত্রীচ সততং ভর্ত্তৃকামিনী ॥৯॥

হিতকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিকেই বন্ধু কহা গিয়া থাকে; যিনি পালন করেন, তিনিই পিতৃবাচ্য; যাঁহাকে বিশ্বাস করা যায়, তিনিই মিত্র; সেই দেশ, যথায় জীবিকা-নির্ব্বাহ হয়।৪

যে অধীন, তাহাকে ভৃত্য কহাগিয়া থাকে; যাহা হইতে অঙ্কুর নির্গত হয়, তাহাই বীজ; তিনিই ভার্য্যা, যিনি প্রিয় বাক্য বলেন; সেই পুত্র, যে জীবিত থাকে।৫

যাঁহার গুণ আছে, তিনিই জীবন ধারণ করেন; যাঁহার ধর্ম্ম আছে, তিনিই জীবন ধারণ করেন; যিনি গুণ ও ধর্ম্মবিহীন, তাঁহার জীবন নিষ্ফল।৬

সেই ভার্য্যা, যিনি গৃহে দক্ষা; সেই ভার্য্যা, যিনি প্রিয়বাদিনী; সেই ভার্য্যা, যিনি প্রাণের প্রিয়া; সেই ভার্য্যা, যিনি পতিব্রতা।৭

যিনি নিত্য হিতে রতা, স্নান করেন, সুগন্ধ দ্রব্য ধারণ করেন, যিনি প্রিয়বাদিনী,

পিতৃদেবক্রিয়াযুক্তা সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী।
যস্যেদৃশী ভবেদ্ ভার্য্যা দেবেন্দ্রো ন স মানুষঃ॥১০

যস্য ভার্য্যা বিরূপাক্ষী কশ্মলা কলহপ্রিয়া।
উত্তরোত্তরবাদা স্যাৎ সাজরা ন জরা জরা॥১১
যস্য ভার্য্যাশ্রিতান্যত্র পরবেশ্মাভিকাঙ্ক্ষিণী।
কুক্রিয়াত্যক্তলজ্জাচ সা জরা ন জরা জরা॥১২
যস্য ভার্য্যা গুণজ্ঞা চ ভর্ত্তারমনুগামিনী।
অল্পাল্পেন তু সন্তুষ্টা সা প্রিয়া ন প্রিয়া প্রিয়া॥১৩
দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
সসর্পেচ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥১৪
ত্যজ দুর্জ্জনসংসর্গং ভজ সাধুসমাগমম্।
কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাম্॥১৫

অল্প আহার করেন, অল্পভাষিণী, সর্ব্বদা মঙ্গলযুক্তা, সতত ধর্ম্মকার্য্যে রতা, সতত পতির প্রিয়া, সতত প্রিয়বাদিনী, সতত স্বামীকে কামনা করেন, পিতৃদেবক্রিয়াযুক্তা ও সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী, যাঁহার এবম্বিধ ভার্য্যা, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনি দেবেন্দ্র।৮—১০

যাঁহার ভার্য্যা বিরূপাক্ষী, পাপ ও কলহপ্রিয়া ও কথার প্রতিবাদোত্তর করেন, সেই জরা নামে অভিহিত; জরাকে জরা বলা যায় না।১১

যাহার ভার্য্যা অন্যাশ্রয়ে থাকে, পরগৃহাকাঙ্ক্ষিণী, কুক্রিয়ারতা ও লজ্জাহীনা, সেই জরা; জরাকে জরা বলা যায় না।১২

যাহার ভার্য্যা গুণজ্ঞা, স্বামীর অনুগামিনী ও অল্পে সন্তুষ্টা, তিনিই প্রিয়া; প্রিয়াকে প্রিয়া বলা যায় না।১৩

দুষ্টা ভার্য্যা, শঠমিত্র ও বাদোত্তরদায়ক ভৃত্য হইলে, উহা সসর্প গৃহে বাস তুল্য; উহাতে নিঃসন্দেহ মৃত্যু।১৪

দুর্জ্জনসংসর্গ ত্যাগ কর ও সাধুসমাগম ভজনা কর, অহোরাত্র পুণ্য কর ও নিত্য অনিত্যতা স্মরণ কর।১৫

ব্যালিকণ্ঠপ্রদেশাদপি চ ফণভৃতো ভীষণা যাচ রৌদ্রী।
যা কৃষ্ণা ব্যাকুলাঙ্গী রুধিরনয়নসংব্যাকুলা ব্যাঘ্রকল্পা।
ক্রোধেনৈবোগ্রবক্ত্রা স্ফুরদনলশিখা কাকজিহ্বা করালা
সেব্যা ন স্ত্রী বিদগ্ধৈঃ পরপুরগমনা ভ্রান্তচিত্তা বিরক্তা॥১৬॥
আপদর্থে ধনং রক্ষেদ্দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেদ্দারৈরপি ধনৈরপি॥১৭
ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ॥১৮॥
বরং হি নরকে বাসো ন তু দুশ্চরিতে গৃহে।
নরকাৎ ক্ষীয়তে পাপং কুগৃহান্ন নিবর্ত্ততে॥১৯

সর্পিণীর কণ্ঠ-নিকটবর্ত্তী স্থান হইতেও যে ভীষণ ও সর্প হইতেও যে ভয়ানক, যাহা কৃষ্ণসর্পিণী তুল্য ব্যাকুলাঙ্গী ও চক্ষু রক্তবর্ণ বশতঃ ব্যাকুল ব্যাঘ্রীতুল্যা; ক্রোধে উগ্রফণা, যে অনল-শিখার ন্যায় শিখা নির্গত করিতেছে, যে কাকজিহ্বার ন্যায় করালা, পরগৃহে গমনশীলা, ভ্রান্তচিত্তা ও বিরক্তা, এরূপ স্ত্রীর প্রতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি কখনও আসক্ত হইবে না।১৬

আপৎ জন্য ধন রক্ষা করিবে, ধনদ্বারা স্ত্রী রক্ষা করিবে এবং আপন শরীরকে স্ত্রী ও ধনদ্বারা সর্ব্বদা রক্ষা করিবে।১৭

কুল জন্য একজনকে ত্যাগ করিবে ও গ্রাম জন্য কুল ত্যাগ করিবে, জনপদ জন্য গ্রাম ত্যাগ করিবে ও আত্মার জন্য পৃথিবী ত্যাগ করিবে।১৮

বরং নরকে বাস করা কর্ত্তব্য, তথাপি দুশ্চরিত্রজনপূর্ণ গৃহে থাকা কর্ত্তব্য নহে;

চলত্যেকেন পাদেন তিষ্ঠত্যেকেন বুদ্ধিমান্।
ন পরীক্ষ্য পরং স্থানং পূর্ব্বমায়াতনং ত্যজেৎ ॥২০

ত্যজেদ্দেশমসদ্বৃত্তং বাসং সোপদ্রবং ত্যজেৎ।
ত্যজেৎ কৃপণরাজানং মিত্রং মায়াময়ং ত্যজেৎ ॥২১॥

অর্থেন কিং কৃপণহস্তগতেন পুংসাং
জ্ঞানেন কিং বহুশঠাকুলসঙ্কুলেন।
রূপেণ কিং গুণপরাক্রমবর্জ্জিতেন
মিত্রেণ কিং ব্যসনকালপরাঙ্মুখেন ॥২২॥

অদৃষ্টপূর্ব্বা বহবঃ সহায়াঃ
সর্ব্বে পদস্থস্য ভবন্তি মিত্রাঃ।
অর্থৈর্বিহীনস্য পদচ্যুতস্য
ভবত্যকালে স্বজনোঽপি শত্রুঃ ॥২৩॥

আপৎসু মিত্রং জানীয়াৎ রণে শূরং রহঃশুচিম্।
ভার্য্যাঞ্চ বিভবে ক্ষীণে দুর্ভিক্ষেচ প্রিয়াতিথিম্ ॥২৪॥

কারণ নরক হইতে পাপক্ষয় হয়, কিন্তু কুগৃহ হইতে পাপক্ষয় হয় না।১৯

বুদ্ধিমান ব্যক্তি একপদে চলিবেন ও একপদে দাঁড়াইবেন; অন্যস্থান পরীক্ষা না করিয়া পূর্ব্ববাস ত্যাগ করিবেন না ॥২০॥

অসদ্বৃত্ত দেশ ত্যাগ করিবে, উপদ্রুত বাসস্থান ত্যাগ করিবে, কৃপণ রাজাকে ত্যাগ করিবে ও মায়াময় মিত্রকে ত্যাগ করিবে।২১

অর্থ যদি কৃপণহস্তগত হয়, তাহাহইলে অর্থে প্রয়োজন কি? বহু শঠাকুল সঙ্কুল জ্ঞানে প্রয়োজন কি? গুণ-পরাক্রম-বর্জ্জিত রূপে প্রয়োজন কি? বিপদ-সময়ে পরাঙ্মুখ মিত্রে প্রয়োজন কি? ২২॥

অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে অনেকে সহায় হন, পদস্থ ব্যক্তির সকলেই মিত্র হন; কিন্তু অর্থবিহীন ও পদচ্যুত ব্যক্তির অকালে স্বজনও শত্রু হইয়া থাকেন।২৩॥

আপৎকালে মিত্রকে জানিবে, যুদ্ধে

বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজন্তি বিহগাঃ শুষ্কং সরঃ সারসাঃ
নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি গণিকা ভ্রষ্টং নৃপং মন্ত্রিণঃ।
পুষ্পং পর্য্যুষিতং ত্যজন্তি মধুপা দগ্ধং বনান্তং মৃগাঃ
সর্ব্বঃ কার্য্যবশাজ্জনো হি রমতে কস্যাপি কো বল্লভঃ ॥২৫॥

লুব্ধমর্থপ্রদানেন শ্লাঘ্যমঞ্জলিকর্ম্মণা।
মূর্খং ছন্দোঽনুবৃত্ত্যাচ যথাতথ্যেন পণ্ডিতম্ ॥২৬

সদ্ভাবেনহি তুষ্যন্তি দেবাঃ সৎপুরুষা দ্বিজাঃ।
ইতরে খাদ্যপানেন বাকপ্রদানেন পণ্ডিতাঃ ॥২৭

উত্তমং প্রণিপাতেন শঠং ভেদেন যোজয়েৎ।
নীচং স্বল্পপ্রদানেন সমং তুল্যপরাক্রমৈঃ ॥২৮

শূরকে, নির্জ্জনে শুচিবাস লোককে, স্ত্রীকে বিভবক্ষয় হইলে ও অতিথিকে দুর্ভিক্ষে জানিবে।২৪॥

বৃক্ষের ফল না থাকিলে, বৃক্ষকে পক্ষীগণ, শুষ্ক সরোবরকে সারসগণ, ধনশূন্য পুরুষকে বেশ্যা, সাম্রাজ্যহীন রাজাকে মন্ত্রীগণ, পর্য্যুষিত পুষ্পকে মধুপগণ, দগ্ধ বনকে মৃগগণ ত্যাগ করিয়া থাকে; সকলেই কার্য্য বশতঃ আত্মীয় হইয়া থাকে; নচেৎ কে কাহার প্রিয়?।২৫॥

অর্থ দান দ্বারা লোভীকে, অঞ্জলি দ্বারা মানীকে, ছন্দানুবৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ অনুনয় করিয়া মূর্খকে ও যথার্থ কথা দ্বারা পণ্ডিতকে সন্তুষ্ট করিবে।২৬

সদ্ভাব দ্বারা দেবতা, সৎ পুরুষ ও ব্রাহ্মণগণ সন্তুষ্ট হয়েন, ইতর লোক খাদ্য-পান দ্বারা ও বাক্য প্রদানে পণ্ডিতগণ সন্তুষ্ট হন।২৭

উত্তম ব্যক্তিকে প্রণিপাত দ্বারা, শঠ ব্যক্তিকে ভেদ দ্বারা, নীচকে অল্পদ্রব্য দান দ্বারা ও সমান ব্যক্তিকে তুল্য পরাক্রম দ্বারা যোজনা করিবে।২৮

যস্য যস্য হি যো ভাবস্তস্য তস্য হিতং বদন্।
অনুপ্রবিশ্য মেধবী ক্ষিপ্রমাত্মবশং নয়েৎ ॥২৯

নখীনাঞ্চ নদীনাঞ্চ শৃঙ্গীণাং শস্ত্রপাণিনাম্।
বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ ॥৩০

অর্থনাশং মনস্তাপং গৃহে দুশ্চরিতানি চ।
বঞ্চনঞ্চাপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ ॥৩১

হীনদুর্জ্জনসংসর্গমত্যন্তবিরহাতুরঃ।
স্নেহোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসচ্ছীলনাশনম্ ॥৩২

কস্য দোষঃ কুলে নাস্তি ব্যাধিনা কো ন পীড়িতঃ।
কেন নব্যসনং প্রাপ্তং শ্রিয়ঃ কস্য নিরন্তরাঃ ॥৩৩

কোঽর্থং প্রাপ্য ন গর্ব্বিতো ভুবি নরঃ কস্যাপদোঽস্তংগতাঃ
স্ত্রীভিঃ কস্য নখণ্ডিতং ভুবি মনঃ কো নাম রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ।
কঃ কালস্য ন গোচরান্তরগতঃ কোঽর্থো-গতো গৌরবং
কো বা দুর্জ্জনবাগুরানিপতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ পুমান্ ॥৩৪

জ্ঞানী ব্যক্তি, যাহার যে ভাব, তাহাকে তদনুযায়ী কহিয়া, তাহার মনোভাব লইয়া, শীঘ্র আত্মবশে আনয়ন করেন।২৯

নখধারী নদী, শৃঙ্গধারী, শস্ত্রধারী, স্ত্রীলোক ও রাজকুলের লোককে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে।৩০

অর্থনাশ, মনস্তাপ, গৃহে দুশ্চরিত্রতা, বঞ্চন ও অপমান বুদ্ধিমান ব্যক্তি প্রকাশ করিবেন না।৩১

হীন ও দুর্জ্জন ব্যক্তির সংসর্গ, অত্যন্ত বিরহাতুর, অন্যে স্নেহ ও অন্যগৃহে বাস, এই সমুদায় স্ত্রীলোকের সুশীলতাকে নষ্ট করে।৩২

কুলে কাহার দোষ নাই? কে রোগে পীড়িত না হয়? কে ব্যসনপ্রাপ্ত হয় নাই ও সৌভাগ্য কাহার চিরকাল থাকে? ৩৩

সংসারে কোন্ মনুষ্য অর্থ প্রাপ্ত হইয়া গর্ব্বিত না হয়? কাহার আপদ নাই? সংসারে স্ত্রীর দ্বারা কাহার মন খণ্ডিত না হইয়াছে? কে রাজার প্রিয়? কে কালের কবলে না পতিত হয়? কোন্ অর্থ গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছে? কোন্ ব্যক্তি দুর্জ্জন-জালে পতিত হইয়া কুশলে যাইতে পারে? ৩৪

যস্মিন্ দেশে ন সম্মানঃ ন প্রীতির্নচ বান্ধবাঃ।
নচ বিদ্যাগমঃ কশ্চিৎ তং দেশং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥৩৫

ধনস্য যস্য রাজভ্যো ভয়ং নাস্তি ন চৌরতঃ।
মৃতঞ্চ যন্নমুচ্যেত সমর্জ্জয়স্ব তদ্ধনম্ ॥৩৬

যদর্জ্জিতং প্রাণহরৈঃ পরিশ্রমৈঃ
মৃতস্য তদ্বৈ বিভজন্তিরিক্থিনঃ।
কৃতঞ্চ যদ্দুষ্কৃতমর্থলিপ্সয়া
তদেব দোষোপহতস্য যৌতুকম্ ॥৩৭

সঞ্চিতং নিহিতং দ্রব্যং পরামৃষ্যং মুহুর্মুহুঃ।
আখোরিব কদর্য্যস্য ধনং দুঃখায় কেবলম্ ॥৩৮

নগ্না ব্যসনিনো রূক্ষাঃ কপালাঙ্কিতপাণয়ঃ।
দর্শয়ন্তীহ লোকস্য অদাতুঃ ফলমীদৃশম্ ॥৩৯

যে দেশে সম্মান নাই, প্রীতি নাই, বান্ধব নাই ও বিদ্যাগম নাই, সেই দেশকে পরিত্যাগ করিবে।৩৫

রাজা হইতে, চোর হইতে যে ধনের ভয় নাই ও মৃত ব্যক্তিকে যে ধন ত্যাগ না করে, সেই ধন উপার্জ্জন কর।৩৬

প্রাণান্ত-পরিশ্রমে যাহা অর্জ্জন করা যায়, মৃতব্যক্তির সেই ধন অংশীদারগণ ভাগ করিয়া লয়। অর্থ লোভে যাহা পাপ করা যায়, দোষোপহত ব্যক্তির উহাই যৌতুক।৩৭

সঞ্চিত দ্রব্যের বারম্বার চিন্তা করিয়া থাকে, তজ্জন্য কদর্য্য ব্যক্তির ধন মূষিকের ন্যায় কেবল দুঃখ জন্য হইয়া থাকে।৩৮

নগ্ন, ব্যসনপ্রাপ্ত, রূক্ষ ও হস্তে ভিক্ষা-পাত্র, কৃপণ ব্যক্তির এই সকল ফল দেখিতে পাওয়া যায়।৩৯

সঞ্চিতং ক্রতুশতৈর্নযুজ্যতে
যাচিতং গুণবতে ন দীয়তে।
তৎ কদর্য্যপরিরক্ষিতং ধনং
চৌর-পার্থিব-গৃহে প্রযুজ্যতে ॥৪০

ন দেবেভ্যো ন বিপ্রেভ্যো বন্ধুভ্যো নৈব আত্মনি।
কদর্য্যস্য ধনং যাতি অগ্নি-তস্কর-রাজসু ॥৪১

অতিক্লেশেন যেঽপ্যর্থাধর্ম্মস্যাতিক্রমেণচ।
অরের্বা প্রণিপাতেন মাভুবং স্তে কদাচন ॥৪২

বিদ্যাঘাতো হ্যনভ্যাসঃ স্ত্রীণাং ঘাতঃ কুচেলতা।
ব্যাধীনাং ভোজনাজ্জীর্ণং শত্রোর্ঘাতঃ প্রপঞ্চতা ॥৪৩

তস্করস্য বধোদণ্ডঃ কুমিত্রস্যাল্পভাষণম্।
পৃথক্ শয্যাতু নারীণাং ব্রাহ্মণস্যানিমন্ত্রণম্ ॥৪৪

দুর্জ্জনাঃ শিল্পিনো দাসা দুষ্টাশ্চ পটহাঃ স্ত্রিয়ঃ।
তাড়িতা মার্দ্দবং যান্তি ন তে সৎকার-ভাজনম্ ॥৪৫

শত যজ্ঞেও যে ধন ব্যয় করা যায় না ও গুণবান ব্যক্তিকে—যাচ্ঞা করিলেও দেওয়া যায় না, কদর্য্য ব্যক্তির রক্ষিত সেই ধন চোর ও রাজগৃহে যাইবার যোগ্য।৪০

দেবতাতে, ব্রাহ্মণেতে, বন্ধুতে ও আপনাতে না গিয়া, কদর্য্য ব্যক্তির ধন অগ্নি, চোর ও রাজগৃহে গিয়া থাকে।৪১

অতি ক্লেশে, ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া অথবা শত্রুর প্রণিপাত দ্বারা যে ধন লাভ করা যায়, এরূপ ধন যেন তোমার না হয়।৪২

অনভ্যাস বিদ্যার নাশ, কদাকার বস্ত্র স্ত্রীলোকদিগের মৃত্যু, খাদ্য জীর্ণ হইলে ব্যাধির নাশ ও শঠতা শত্রুর নাশ।৪৩

চোরের বধ-দণ্ড, কুমিত্রের অল্পভাষণ, স্ত্রীগণের পৃথক্ শয্যা ও ব্রাহ্মণের অনি-দণ্ড।৪৪

দুর্জ্জন, শিল্পী, দাস, দুষ্টলোক, পটহ ও স্ত্রীলোক, তাড়িত হইলেই মৃদুতা প্রাপ্ত হয়; তাহারা কখনও সৎকারভাজন হয়না।৪৫

জানীয়াৎ প্রেষণে ভৃত্যান্ বান্ধবান্ ব্যসনাগমে।
মিত্রঞ্চাপদিকালেচ ভার্য্যাঞ্চ বিভবক্ষয়ে॥৪৬

স্ত্রীণাঞ্চ দ্বিগুণাহারঃ প্রজ্ঞাচৈব চতুর্গুণা।
ষড়্ গুণো ব্যবসায়শ্চ কামশ্চাষ্টগুণঃ স্মৃতঃ ॥৪৭

ন স্বপ্নেন জয়েন্নিদ্রাং ন কামেন স্ত্রিয়ং জয়েৎ।
ন চেন্ধনৈর্জ্জয়েদ্ বহ্নিং ন মদ্যেন তৃষাং জয়েৎ ॥৪৮

নদ্যশ্চ নার্য্যাশ্চ সমস্বভাবাঃ
স্বতন্ত্রভাবে গমনাদিকঞ্চ।
তোয়ৈশ্চ দোষৈশ্চ নিপাতয়ন্তি
নদ্যোহি কুলানি কুলানি নার্য্যঃ॥৪৯॥

নদী পাতয়তে কূলং নারী পাতয়তে কুলম্।
নারীণাঞ্চ নদীনাঞ্চ স্বচ্ছন্দা ললিতা গতিঃ ॥৫০

প্রেরণে ভৃত্যগণকে, ব্যসনাগমে বন্ধুগণকে, আপদ্‌কালে মিত্রকে ও ধনক্ষয় হইলে স্ত্রীকে জানিবে।৪৬

স্ত্রীগণের দ্বিগুণ আহার, বুদ্ধি চারিগুণ, ষড়্‌গুণ ব্যবসায় ও আটগুণ কাম কথিত হইয়াছে।৪৭

নিদ্রা দ্বারা নিদ্রা জয় করিবেনা, কাম দ্বারা স্ত্রী জয় করিবেনা, কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নিকে জয় করিবে না ও মদ্য দ্বারা তৃষ্ণা জয় করিবেনা।৪৮

নদী ও নারীর সম স্বভাব, উভয়ের স্বতন্ত্রভাবে গমনাদি; নদী জল দ্বারা কূল পাতিত করে ও নারী দুষ্ট স্বভাব দ্বারা কুল নষ্ট করে॥৪৯

নদী কূলপাতন করে, নারী কুলপাতন করে; নারী ও নদীর স্বচ্ছন্দ-ললিত-গতি ॥৫০

রাজা ন তৃপ্তো ধনসঞ্চয়েন
ন সাগরস্তৃপ্তিমগাজ্জলেন।
ন পণ্ডিতস্তৃপ্যতি ভাষিতেন
তৃপ্তং ন চক্ষুঃ প্রিয়দর্শনেন ॥৫১

স্বকর্ম্ম ধর্ম্মার্জ্জিতজীবিতানাং
শাস্ত্রেষু দারেষু সদারতানাম্।
জিতেন্দ্রিয়াণামতিথিপ্রিয়াণাং
গৃহেঽপি মোক্ষঃ পুরুষোত্তমানাম্ ॥৫২

মনোঽনুকূলাঃ প্রমদা রূপবত্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
বাসঃ প্রাসাদপৃষ্ঠেষু স্বর্গঃ স্যাচ্ছুভকর্ম্মণঃ ॥৫৩

ন দানেন ন মানেন নার্জবেন ন সেবয়া
ন শাস্ত্রেণ ন শস্ত্রেণ সর্ব্বথা বিষমাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৫৪

শনৈর্বিদ্যা শনৈরর্থাঃ শনৈঃ পর্ব্বতমারুহেৎ।
শনৈঃ কামঞ্চ ধর্ম্মশ্চ পঞ্চৈতানি শনৈঃ শনৈঃ ॥৫৫

ধন, সঞ্চয় দ্বারা তৃপ্তিলাভ করে না, জল দ্বারা সাগর তৃপ্তিলাভ করেন না, কথা কহিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি তৃপ্তিলাভ করেন না, ও প্রিয় দর্শন করিয়া চক্ষু তৃপ্তিলাভ করেনা ॥৫১

স্বকর্ম্ম ও ধর্ম্মার্জ্জিতজীবনধারী, শাস্ত্রে ও স্বস্ত্রীতে সদা রত, জিতেন্দ্রিয় ও অতিথি-প্রিয় পুরুষোত্তম ব্যক্তিগণের গৃহেও মোক্ষ।৫২

রূপবতী, স্বলঙ্কৃতা ও অনুকূলমানসা প্রমোদা এবং প্রাসাদ-পৃষ্ঠে বাস শুভকর্ম্মের স্বর্গ স্বরূপ ॥৫৩

দান, মান, ঋজুতা, সেবা, শাস্ত্র ও শস্ত্র দ্বারা স্ত্রীলোক বশ হয় না; স্ত্রীগণ সর্ব্বদা বিষম ॥৫৪

অল্পে অল্পে বিদ্যা, অল্পে অল্পে অর্থ, অল্পে অল্পে পর্ব্বতারোহণ করিবে; অল্পে অল্পে কাম ও ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিবে। এই পাঁচটি অল্পে অল্পে করিতে হয় ॥৫৫

যে বালভাবান্ন পঠন্তি বিদ্যাং
যে যৌবনস্থা হৃধনাস্তদারাঃ।
তে শোচনীয়া ইহজীবলোকে
মনুষ্যরূপেণ মৃগাশ্চরন্তি ॥৫৬

আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চেষ্টয়া ভাষিতেন চ।
নেত্র-বক্ত্র বিকারাভ্যাং লক্ষ্যতেঽন্তর্গতং মনঃ ॥৫৭॥

অনুক্তমপ্যূহতি পণ্ডিতো জনঃ
পরেঙ্গিতজ্ঞানফলা হি বুদ্ধয়ঃ।
উদীরিতার্থঃ পশুনাপি গৃহ্যতে
হয়াশ্চ নাগাশ্চ বহন্তি দেশিতম্ ॥৫৮

অর্থাদ্ভ্রষ্টস্তীর্থযাত্রাস্তু গচ্ছেৎ
সত্যাদ্ভ্রষ্টো রৌরবং বৈ ব্রজেচ্চ।
যোগাদ্ভ্রষ্টঃ সত্যধৃতিঞ্চ গচ্ছে-
দ্রাজ্যাদ্ভ্রষ্টো মৃগয়াং বৈ ব্রজেচ্চ ॥৫৯

যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেবহি ॥৬০

যাহারা বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করেনা, যৌবন কালে ধন ও স্ত্রীলাভ করে না, তাহারা এই সংসারে শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয় ও মনুষ্যরূপে পশুগণের ন্যায় বিচরণ করে ॥৫৬

আকার, ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা, কথাবার্ত্তা এবং চক্ষু ও মুখের বিকার দ্বারা মনুষ্যের মনের ভাব জানা যায় ॥৫৭

না কহিলেও পণ্ডিত ব্যক্তি জানিতে পারেন; কথা বলিলে পশুরাও বুঝিতে পারে; ঘোটক ও হস্তী আদেশ বহন করে ॥৫৮

অর্থহীন হইলে তীর্থযাত্রা করা কর্ত্তব্য; সত্যভ্রষ্ট হইলে রৌরব নামে নরকে গমন করে; যোগভ্রষ্ট হইলে সত্য ও ধৃতিকে অবলম্বন করিবে; রাজ্যভ্রষ্ট হইলে রাজার মৃগয়ায় গমন করা কর্ত্তব্য ॥৫৯

যে নিশ্চয়তা পরিত্যাগ করিয়া অনিশ্চ-

ভোজ্যং ভোজনশক্তিশ্চ রতিশক্তির্বরাস্ত্রিয়ঃ।
বিভবো দানশক্তিশ্চ নাল্পস্য তপসঃ ফলম্ ॥৬১

বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্।
নীচাদপ্যুত্তমাং বিদ্যাং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥৬২

কুসুমস্তবকস্যেব দ্বেবৃত্তী তু মনস্বিনঃ।
মূর্দ্ধ্নি বা সর্ব্বলোকানাং বিশীর্য্যেত বনেঽথবা ॥৬৩॥

যদি বিভববিহীনঃ প্রচ্যুতো বাশুদৈবা-
ন্ন তু খলজনসেবাং প্রার্থয়েন্নৈব নীচম্।
ন তৃণমদতি সিংহঃ স ক্ষুধার্ত্তোঽপি কালে।
পিবতি রুধিরমুষ্ণং প্রায়শঃ কুঞ্জরাণাম্ ॥৬৪

সকৃদ্দুষ্টঞ্চ যন্মিত্রং পুনঃ সন্ধাতুমিচ্ছতি।
স মৃত্যুমেব গৃহ্ণীয়াৎ গর্ভমশ্বতরী যথা ॥৬৫

শত্রোরপত্যানি প্রিয়ংবদানি
নাপেক্ষিতব্যানি বুধৈর্মনুষ্যৈঃ।
তান্যেষু কালেষু বিপৎকরাণি
বিষস্য পাত্রাণ্যপি দারুণানি ॥৬৬

উপকারগৃহীতেন শত্রুণা শত্রুমুদ্ধরেৎ।
পাদলগ্নং করস্থেন কণ্টকেনৈব কণ্টকম্ ॥৬৭

অপকারিষু মায়ায়াং চিন্তয়েন্ন কদাচন।
স্বয়মেব পতিষ্যন্তি কুলজাতা ইব দ্রুমাঃ ॥৬৮

কার্য্যকালোচিতা পাপৈর্মতিবুদ্ধির্বিহীয়তে।
সানুকূলাত্তু বৈ দৈবাৎ পুংসঃ সর্ব্বত্র জায়তে ॥ ৬৯

ধনপ্রয়োগকার্য্যে চ তথাবিদ্যাগমেষু চ।
আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জঃ সদা ভবেৎ ॥৭০

স্বতাকে অবলম্বন করে, তাহার নিশ্চয়তা নষ্ট হয় ও অনিশ্চয়তাও নষ্ট হইয়া থাকে।৬০

ভোজ্য ও ভোজনশক্তি; রতিশক্তি ও চারু স্ত্রী, বিভব ও দানশক্তি, এই সকল অল্প তপস্যার ফল নহে।৬১

বিষ হইতেও অমৃত গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; অপবিত্র স্থান হইতে কাঞ্চন, নীচ হইতে উত্তম বিদ্যা ও দুষ্কুল হইতে স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।৬২

জ্ঞানী ব্যক্তির কুসুমের ন্যায় দুইটি বৃত্তি; হয় সকল লোকের মস্তকে থাকে, অথবা বনে বিশুষ্ক হইয়া যায়।৬৩

যদি ধনহীন হয় অথবা দৈব বশতঃ ঐশ্বর্য্যস্খলিত হয়, তাহা হইলে খল জনের সেবারূপ নীচ কার্য্য করিবে না; সিংহ ক্ষুধার্ত্ত হইলেও তৃণ ভক্ষণ না করিয়া প্রায় হস্তীর উষ্ণ রুধিরই পান করিয়া থাকে ॥৬৪

যে ব্যক্তি একবারও দুষ্ট মিত্রের সহিত [সন্ধি] করিতে ইচ্ছা করে, সে কাঁকড়ার গর্ভের ন্যায় মৃত্যুকে আহ্বান করিয়া থাকে।৬৫

প্রিয়বাদী শত্রু-পুত্রকে জ্ঞানী মনুষ্য কখনও উপেক্ষা করিবে না; কারণ তাহারাই সময়ে দারুণ বিষপাত্রাপেক্ষাও বিপদজনক হইয়া থাকে।৬৬

উপকারগৃহীত শত্রুদ্বারা শত্রুকে উদ্ধার করিবে; করস্থ কণ্টকদ্বারা পাদলগ্ন কণ্টককে উদ্ধার করিবে।৬৭

অপকারী ব্যক্তির চাতুরিতে কখনও চিন্তা করিবে না; কারণ কূলজাত বৃক্ষের ন্যায় তাহারা স্বয়ংই পতিত হইবে।৬৮

পাপ দ্বারা কার্য্যকালোচিত মতিবুদ্ধি নষ্ট হইয়া থাকে; দৈবানুকূলতায় পুরুষের সর্ব্বত্র সানুকূলবুদ্ধি হইয়া থাকে।৬৯

ধনপ্রয়োগ কার্য্যে, বিদ্যাউপার্জ্জনে, এবং আহারে ও ব্যবহারে সর্ব্বদা লজ্জা পরিত্যাগ করিবে।৭০

ধনিনঃ শ্রোত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যস্তু পঞ্চমঃ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে ন কুর্য্যাৎ তত্র সংস্থিতিম্ ॥৭১

লোকযাত্রা ভয়ং লজ্জা দাক্ষিণ্যং দানশীলতা।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে ন তত্র দিবসং বসেৎ॥৭২

নৈকত্র পরিনিষ্ঠাস্তি জ্ঞানস্য কিল শৌনক।
সর্ব্বঃ সর্ব্বং ন জানাতি সর্ব্বজ্ঞো নাস্তি কুত্রচিৎ ॥ ৭৩

ন সর্ব্ববিৎ কশ্চিদিহাস্তি লোকে
নাত্যন্তমুর্খো ভূবি চাপি কশ্চিৎ।
জ্ঞানেন নীচোত্তমমধ্যমেন
যোঽয়ং বিজানাতি স তেন বিদ্বান্ ॥৭৪

[ক্রমশঃ]

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

ধনী, শ্রোত্রিয় (১), রাজা, নদী, চিকিৎসক, এই পাঁচটি যেস্থানে না থাকে, সেস্থানে বাস করা কর্ত্তব্য নহে।৭১

লোক-যাত্রা, ভয়, লজ্জা, দাক্ষিণ্য, দানশীলতা, এই পাঁচটি যে স্থানে নাই, সে স্থানে একদিবসও বাস করা কর্ত্তব্য নহে।৭২

(সূত শৌনককে কহিয়াছিলেন) হে শৌনক! জ্ঞানের একত্র-পরিনিষ্ঠা নাই; সকল ব্যক্তি সকল জানেনা এবং কোথায়ও সর্ব্বজ্ঞ নাই।৭৩

সংসারে সর্ব্বজ্ঞ কেই নাই অথবা পৃথিবীতে কেহ অত্যন্ত মূর্খও নাই; নীচ, মধ্যম ও উত্তম জ্ঞানদ্বারা যিনি জানেন, তিনি তাহাতেই বিদ্বান্।৭৪

---

(১) শ্রোত্রিয়-লক্ষণ যথা—
জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যাভ্যাসী ভবেদ্ বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেবহি॥

বিদেশীর মর্ম্ম-কথা।*

সুইট্‌জরলণ্ডের অন্তঃপাতী একটি পল্লীগ্রামে আমার জন্ম হয়। গ্রামটি অতি মনোহর। ইহার একদিকে চিরতুষারাবৃত গিরিশৃঙ্গ, অপর দিকে দুইটি ভগ্ন পাহাড়। প্রকৃতির লীলাভূমি এই "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্মভূমি ছাড়িয়া বিদেশে নানারূপ দৈহিক ব্যাধি ও মানসিক যন্ত্রণায় জীবন অতি দুর্বিষহ হইয়া পড়িল। মৃত্যু ভিন্ন এ জীবনে আর শান্তি নাই, এই ভাবিয়া আজ ৩৭ বৎসর এইখানে মরিব বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি; কিন্তু কৈ, মৃত্যুত হইল না। জন্মভূমির স্বাস্থ্যকর জল-বাতাসে বিপরীত ফল ফলিল। যে রহস্য এতদিন হৃদয়ের অন্তস্তলে লুকাইয়া রাখিয়াছি, তাহাই বোধ হয় সর্ব্বসাধারণের সমীপে প্রকাশ করিব বলিয়া এখনও বাঁচিয়া আছি। আমার মর্ম্মকথা পূর্ণরহস্য ও বিভীষিকাময়। মনে করিয়াছিলাম, এ রহস্য কদাচ কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না। আপনারা বলিতে পারেন, আমার এইরূপ মনে করিবার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নহে, কতক শিক্ষার দোষে, কতক আমার বদ্ধমূল সংস্কারের বিপর্য্যয়-ঘটনার সমাবেশে।

---

* উপাখ্যানটী প্রথমতঃ "থিয়সফিষ্ট" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাহার পর "লুসিফার" ও অন্যান্য পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়। (লেখক।)

অনেকে এই রহস্যময় ঘটনাকে ভৌতিক বা দৈবিক মনে করিতে পারেন; কিন্তু আমার ভূতে বা দেবে বিশ্বাস নাই; অথচ ইহা যে অমূলক স্বপ্ন মাত্র, তাহাও বলিতে পারি না। কারণ ইহাতে কার্য্য, কারণ, উদ্দেশ্য ও সম্বন্ধ যথাযোগ্যরূপে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। যদিও কালের প্রভাবে আমার দেহে জরা ও বার্দ্ধক্য উপনীত হইয়াছে, কিন্তু আমার স্মরণশক্তির কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটে নাই। এই ভয়াবহ ঘটনার প্রত্যেক অংশ—এমন কি, অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বিষয়ও আমার স্মরণ-পটে জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে! এই ঘটনোক্ত জনৈক মহাত্মা এখনও জীবিত আছেন। তিনিই আমার সমুদায় দুর্ঘটনার মূল। তাঁহার নাম স্মরণ মাত্রেই আমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হয়; অথচ আমি হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে ভক্তি করিয়া থাকি! তিনি আমার শোচনীয় অবস্থাকে দারুণ ভীতি ও যাতনার সংমিশ্রণে অধিকতর শোচনীয় করিয়াছেন; অথচ তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিয়াছি। তিনি আমার বদ্ধমূল সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া জীবনের প্রকৃত পথ দেখাইয়াছেন।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমার সুইট্‌জর লণ্ড দেশে জন্ম হয়। কিন্তু আমার পিতা-মাতা ফ্রান্সদেশীয় ছিলেন। তাঁহারা ভলটায়ার (Voltaire) রোশিয় (J. J. Rousseon) ও ডি হোলবাকের (D' Holbach) জগদ্বিখ্যাত (trinity) ত্রৈনী-টীর জ্ঞান-শিক্ষা-বীজ আমার সুকুমার মানস-ক্ষেত্রে বপন করেন এবং জর্ম্মনি-বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে শিক্ষা প্রদান করেন। এই শিক্ষার দোষে আমি পূর্ণ জড়বাদী হইয়া পড়ি। এই পরিদৃশ্যমান জড়প্রকৃতি ভিন্ন তাহার উপরে বা বাহিরে কোথাও কোন একটা কিছুরই অস্তিত্ব কল্পনা-পথে আনিতে পারিতাম না। যাহার বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে অসমর্থ হইতাম, তাহা অলীক-কল্পনা-প্রসূত মনে করিতাম। প্রত্যেক মানবে আত্মা বিদ্যমান, স্বীকার করিয়াও, তাহা জড়ময় বলিয়া তর্ক করিতাম। মহাত্মা (Origen) অরিগেন ঈশ্বরকে যে চৈতন্য সংজ্ঞায় বিশেষিত করেন, তাঁহার সেই "চৈতন্য" জড়দেহ অপেক্ষা সূক্ষ্মতর এক প্রকার পদার্থ ভিন্ন অপর কোন বিশেষ ধারণা করিতে পারা যায় না। অতএব যে চৈতন্যকে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকৃষ্ট-রূপে জানিতে পারা যায় না, সেই "চৈতন্য" কিরূপে প্রত্যক্ষ হইতে পারে, অথবা এই প্রত্যক্ষীভূত ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা হইতে পারে, ইহাই আমি তর্ক করিতাম। এইরূপে চৈতন্যবাদে উপেক্ষা ও চৈতন্যবাদীগণকে ঘৃণা করিতে লাগিলাম। জড়-বাদ আমার মূলমন্ত্র হইয়া পড়িল। প্যাস্কাল (Pascal) তাঁহার "চিন্তা" প্রসঙ্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার ঘোর সন্দেহবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, আর আমি সেই সন্দেহ-বাদের পরিবর্ত্তে নাস্তিক্য-বাদ প্রচার করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতাম। উক্ত চিন্তাশীল মনীষীর কয়েকটী কথা আমি কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম এবং সময়ে সময়ে তাহা হৃদয়ের আবেগে উচ্চারণ করিতাম, এবং হৃদয়ে কিঞ্চিৎ শান্তি পাইতাম। তাঁহার উক্তি এই—

"I have examined if this god of whom all the world speaks, might not have left some marks of himself. I look everywhere, and everywhere I see nothing but obscurity. Nature offers nothing that may not be a matter of doubt and inguietude"

যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিখিল জগৎ ঘোষণা করে, সে ঈশ্বরের কোন চিহ্নই আমি এ জগতে খুঁজিয়া পাইলাম না! আমি প্রত্যেক স্থান অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কৈ, ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন ভিন্ন সুস্পষ্ট কোনই প্রমাণ আমার নয়নগোচর হইলনা। প্রকৃতির এমন কোন পদার্থই পাইলাম না, যে তাহা জটিল ও সন্দেহপূর্ণ নহে। আমিও আজ পর্য্যন্ত এমন কিছুই দেখিতে পাইলাম না, যাহাতে আমার ধারণা কিছুমাত্র বিচলিত হইতে পারে। আমি কখনও ঈশ্বর বিশ্বাস করি নাই এবং কখনও করিব না, কিন্তু মানবের অন্তর্নিহিত শক্তি সম্বন্ধে প্রাচ্য মহর্ষিগণ যেরূপ প্রচার করেন এবং যে শক্তির সাধনায় মানব ত্রিকালজ্ঞ হন, সেই সকল সিদ্ধ মনীষীগণকে আমি কখনও উপেক্ষা করিতে পারিব না এবং আমার জীবন থাকিতে এতৎসিদ্ধি বা বিভূতি সম্বন্ধে কখনও অবিশ্বাস করিতে পারিব না। এই শক্তির পরিচয় আমি বিলক্ষণ পাইয়াছি। ঐ শক্তি বড়ই ভীতি ও যন্ত্রণাপ্রদ। ইহা যেস্থান হইতে বা যে কারণে সমুদ্ভূত হউক না কেন, আমি ইহাকে বড় ভয় ও ঘৃণা করি।

দুর্ভাগ্য ক্রমে আমার পিতা মাতার মৃত্যু হইল এবং একটি মোকদ্দমা-সূত্রে আমাদের প্রায় সমুদায় সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গেল। সংসারের একমাত্র অবলম্বনীয়া স্নেহশালিনী জ্যেষ্ঠা ভগিনী এক দরিদ্রের গৃহিণী হইলেন। আমি হাম্‌বার্গের জনৈক ধনাঢ্যের অংশীদার হইয়া বাণিজ্যাভিলাষে জাপান অভিমুখে সমুদ্র-যাত্রা করিলাম।

কয়েক বৎসর আমার ব্যবসায় বেশ চলিতে লাগিল। অনেক ধনপতি জাপানীর বিশ্বাসভাজন হইলাম। তৎসময়ে যে সকল স্থানে বিদেশীয়গণের সমাগম দুষ্কর ও আয়াসসাধ্য ছিল, আমি সেই সকল স্থানে অনায়াসে ব্যবসায় চালাইতে লাগিলাম। আমার কোন ধর্ম্মবিদ্বেষ ছিল না। আমি জাপানীগণের ধর্ম্মানুশীলন করিতে লাগিলাম। আমি জানিতাম, পৃথিবীর মধ্যে যদি কোন ধর্ম্ম বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক থাকে, তবে তাহা বৌদ্ধ ধর্ম্ম। আমি অবসর কালে জাপানের প্রধান প্রধান ধর্ম্ম মন্দির দেখিতে লাগিলাম। "কাইটো" র ষষ্ঠাধিক নবতি মন্দিরের প্রধান প্রধান মন্দির, দেবুজী ও তন্মধ্যস্থ সুবিরাট ঘণ্টা, জিওনিন, এনারিনোএসারো, কাইমিশু, হিগাজী হংভোণী এবং আরও অনেক মন্দির দেখিলাম।

এইরূপে অনেক দিন অতিবাহিত হইল বটে, কিন্তু আমার সন্দেহ-ব্যাধি আরোগ্য হইল না, অথবা আমার ধারণার সামান্য মাত্রও পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না, তাহা এক দিনেরও জন্য চিন্তা করিলাম না। পূর্ব্বে যেমন খৃষ্টীয় পাদরীগণের অথবা ইউরোপীয়

প্রেততত্ত্ববাদীগণের কথা শুনিয়া বিদ্রূপ-নয়নে হাসিতাম, এখানেও সেইরূপ জাপানী যোগী ও সিদ্ধ পুরুষগণের তত্ত্বকথায় হাসি সম্বরণ করিতে পারিতাম না।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ দে।

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ষষ্ঠ শ্লোকের আলোচনা।

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি

গলদশ্রুধারে কবে ভাসিবে নয়ন ?
বদনে গদ্গদ-রুদ্ধ হইবে বচন ?
কবে হবে পুলকেতে লোমাঞ্চিত গাত্র ?
হরি হে ! নামটি তব উচ্চারণ মাত্র !

আহা ! এমন কথা আর কেহ জগতে শুনাইয়াছেন কি ? ঈশা বলুন, মুশা বলুন, মহম্মদ বলুন, আর এদিকে বুদ্ধ বলুন, শঙ্কর বলুন, ইদানীন্তন রামমোহন বলুন, আধুনিক কেশব বলুন, এমন কথা কেহ বলিয়াছেন কি ? শুনিয়াছি, কেশবচন্দ্র একটু আধটু বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাও গৌরাঙ্গ-শিক্ষার বাতাস একটু গায়ে লাগিয়াছিল বলিয়া। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতির শিষ্য-মণ্ডলেও আলোচ্য শিক্ষা-শ্লোকটির সারসৌরভস্বরূপ ভগবন্নাম-প্রেম-মহিমার এইরূপ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। ফলে তাহাও গৌরাঙ্গ-শিক্ষা-সঙ্গেরই সুধাময় ফল, সন্দেহ নাই। রামকৃষ্ণ দেব অনেক সময়ে "হা চৈতন্য! হা গৌরাঙ্গ!" বলিয়া সমাধি-প্রাপ্ত হইতেন। প্রভুপাদ বিজকৃষ্ণও তাঁহার শেষ জীবনে প্রয়াগের কুম্ভ মেলায় স্বীয় আশ্রমে গৌর-নিতাই বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা ও সেবা বিধান করিয়া, অন্তিমে সেই গৌরাঙ্গেরই অন্তিমলীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রধামে অন্তিম শ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। ভগবন্নাম-প্রেম-প্রসঙ্গে আলোচ্য শিক্ষা-শ্লোকের বর্ণিত দশা শ্রীমৎ রামকৃষ্ণের, এবং শেষ দশায় বিজয়কৃষ্ণেরও প্রায় সর্ব্বদাই পরিলক্ষিত হইত। আজ যে খোল-করতালে—নৃত্য-কীর্ত্তনে—প্রেমাশ্রু-পুলক-লোমাঞ্চনে ব্রাহ্ম এবং খৃষ্টান-সমাজেও ভগবন্নাম-প্রেম প্রচারের ঢেউ লাগিয়াছে, শ্রীগৌরাঙ্গ-শিক্ষা-সম্মোহিনী বংশী-ধ্বনিই তাহার মূল-উৎস-উৎপাদিনী ! গৌরাঙ্গকে কেহ চিনুন না চিনুন, গৌরাঙ্গ-লীলামৃত কেহ আস্বাদন করুন না করুন, অলক্ষিতে গৌরাঙ্গ-শিক্ষার ভাবতরঙ্গ-রঙ্গেই ভারতের সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বধর্ম্মেই ভগবানের নাম-প্রেম-প্রচার চলিয়াছে। তবে কি না, খাস্ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে গৌরাঙ্গের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যেমন ভগবদুপাসনার অঙ্গীভূত এবং তৎসহ একীভূত ভাবে চলিয়াছে, অন্যত্র তদ্রূপ নহে। ফল কথা, মূলতঃ যেখানে ঈশ্বরের

নাম-প্রেম-সাধনের প্রচার, সেই খানেই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা-সম্বন্ধে গৌরাঙ্গ-শিক্ষা-শক্তির সঞ্চার। কলির ভগবদ্ভজন-প্রণালীর পূর্ণতম আদর্শ গৌরাঙ্গই জগতে প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

গৌরাঙ্গের পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতি-পুরাণাদি শাস্ত্রেও নারদ, শাণ্ডিল্য, কপিল, বেদব্যাস প্রভৃতি মহামহর্ষিরাও ভগবানের নাম-প্রেমে হাসা-কাঁদা-নাচা-গাওয়া ও ভাব-মদে মেতে যাওয়ার কথা না বলিয়াছেন, এমন নহে; তবে কিনা, তাহা শাস্ত্র-খনির গুপ্তমণিরূপে সাধারণের পক্ষে লুপ্তপ্রায় ছিল। গৌরাঙ্গ সেই নিভৃত রত্নভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া দু-হাতে জগতে লুটাইয়াছেন! হরি হরি বোলে—আচণ্ডালে সেই অমূল্য রত্নরাজি বিলাইয়াছেন! ভারতের তদানীন্তন জ্ঞানকর্ম্ম-প্রধান ভগবদ্ভজনকে ভক্তিপ্রধান মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়া, অল্পায়ু অসমর্থ কলির জীবের সুলভ্য ও সুখসেব্য করিয়াছেন। শক্ত মিশ্রী জলে ভিজাইয়া পানা করিয়া দিলে, যেমন তাহা দুর্ব্বল অদন্ত জনের সুখ-সেব্য হয়, জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রধান শক্ত সাধন-ধর্ম্মকে তদ্রূপ ভক্তিরসে ভিজাইয়া, ভক্তাবতার গৌরচন্দ্র কেবল দুর্ব্বল কলির জীবের প্রতি কৃপা-বশেই সে অমৃত আপনি যেমন অজস্র পান করিয়াছেন, তেমনি সেই আপন অধরামৃত-প্রসাদে জগৎ অভিষিক্ত, আপ্যায়িত ও অমৃতীভূত করিয়াছেন। ধন্য কৃষ্ণচৈতন্য অবতার; আর ধন্য তাঁহার নাম-প্রেম প্রচার! নামে যে তিনি এবং নামই যে তিনি, এতত্ত্ব শ্রীগৌরাঙ্গই নিজে বাধিয়া জগৎকে শিখাইয়াছেন। ভগবদ্দর্শন হইলে, ভক্ত ভাবানন্দে কেঁদে ওঠে; ধ্রুব বা বিল্বমঙ্গলের মত কথা ফুটেও না ফোটে! পুলকে শিহরে কায়, প্রেমাবেশে ভেসে যায়! নামের মর্ম্ম যে বুঝেছে, নাম নিলে তার তাই হয়। নামেই সে নামী পেয়ে, হাসে কাঁদে নাচে গায়! কৃষ্ণের সশরীরে আবির্ভাব ও কৃষ্ণের নামমাত্রের শ্রবণ-কীর্ত্তন—ভগবন্নাম-সর্ব্বস্ব ভক্তের হৃদয়ে এতদুভয়েরই সমীকরণ স্বতএব সংসাধিত। তাই নাম নিলেই প্রেম হয়, কারণ নামেই সেই প্রেমময়! সুতরাং প্রকৃত ভক্তের ভগবন্নাম-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃই "সাত্ত্বিকভাবের" সঞ্চার হয়। সেই অপূর্ব্ব আদর্শ-চিত্রের অভিমুখ-সাধন শিক্ষাদানার্থ মহাপ্রভু বলিতেছেন—

"নয়নং গলদশ্রুধারয়া"— দরদরিত অশ্রুধারে নয়ন আমার কবে ভাসিবে? সেদিন 'হরি' বলিতে আঁখি ঝরিবে, সেদিন আমার কতদিনে আসিবে? বাস্তবিক, তা না হলে কি তৃপ্তি হয়? বাস্তবিক যে যারে ভালবাসার মত ভালবাসে, তার নামেই বুঝি তার চক্ষে জল আসে! যেখানেই প্রেম অহৈতুক, সেইখানেই এই কৌতুক! সুবিখ্যাত শক্তিভক্তিমান্ মায়ের সুসন্তান কমলাকান্ত গাইয়াছেন,—

"কতদিনে সেদিন আমার দিবি মা তারা!
সেদিন 'তারা' বলতে তারা বেয়ে
শতধারে পড়্‌বে ধারা!"

আহা! সেরূপ না হলে কি আর নাম নিয়ে সুখ? একদিন—সেই নীরব-নিশীথ-নিভৃতে—জ্যোৎস্না-প্লাবিত পদ্মার প্রশান্ত বুকে নৌকার মাঝির মুখে সুমধুর সারীর সুরে শুনিয়াছিলাম——

"(আমি) লোকের মুখে বঁধু তোমার
নাম শুনে হই বেয়াকুল!
(আমার) নয়ন-জলে বয়ন ভাসে,
হল্‌দি ছেঁচ্‌তে ছেঁচি আঙুল!"

আহা! কি মোহমন্ত্রই শুনিয়াছিলাম! আর বুঝি জীবনে তেমন শুনিবনা! সেই সুর যেন এই অকিঞ্চিৎকর হৃদয়-'ফণোগ্রাফে' অবিকল ধরা আছে, এবং আজিও অবিকল বাজিতেছে! আমাদের অকিঞ্চন দীনদাস 'ভক্তের প্রতি ভগবদ্ভক্তি'তে এই ভাবেই গাইয়াছেন,——

"(আমার)
নাম শুনে যার কাঁদো২ বদন হাসে না,
(আবার)
নাম শুনে যার হাসিমুখে কান্না আসে না,
বল্‌ব কি আর——সত্য বচন,
(সে জন প্রেমের নয় মহাজন)
সে আমারে বাসার মতন ভালবাসেনা।"

অতি হর্ষে বা বিষাদেই কান্না আসে। আবার হর্ষ-বিষাদের যুগপৎ প্রভাবেও কান্নার আবির্ভাব হয়। অনুতাপী পাপী ভগবানের নাম ভাবিতেও ভয়ে কাঁদে। তাও একরূপ নামে কাঁদা। সে কান্না এলেও আমরা কৃতার্থ হইতে পারি।—

"হে ঈশ্বর! প্রেমময় নামটি তোমার,
পাপী আমি, তাই ভয় হতেছে আমার—
পীযূষ-পূরিত তব নাম উচ্চারণে;
কি বলে' শরণ তব লইব চরণে?"

অনুতাপের উচ্ছাস-ভরা বক্ষে—ছল ছল চক্ষেই যেন কথাকটি বলা হইয়াছে। ফলে ভগবন্নামে পাপীর কাঁদা ও সাধুর কাঁদা, দুইই সুন্দর! দুইই সেই চিত্তহারীর চিত্তহর! ভয়ে কাঁদা, অভিমানে কাঁদা ও দুঃখে কাঁদা, হেত্বর্থপক্ষে একই কথা; কারণ ভয় ও অভিমানও দুঃখেরই অনুভূতি। এস্থলে অনুতাপীর ভয়ে দুঃখেই কাঁদা হইল; একটু সুমিষ্ট অভিমানের গন্ধও আছে ইহাতে। অর্থাৎ "সর্ব্বভয়নিবারণ—ভীষণ ভবভয় বিনাশন তোমার নাম নিতেও আমার ভয় হয়! আমার এ ভয়াবহ দুর্দ্দশা কেন ঘটাইলে ভগবন্? এখন আমার কি উপায় হইবে? তোমার নামই নিরুপায়ের উপায়। এ উপায়হীন দীনকে কি সে উপায় দিয়া পায় রাখিবেনা?" এইরূপ ভগবন্নাম-প্রসঙ্গ-সঙ্গিনী ভাব-তরঙ্গিনী হৃদয়ে উদ্বেলিত হইয়া নয়ন-পথেই উচ্ছলিত!

আবার——

"নামানন্দে—প্রেমানন্দে এস নাম-প্রেমময়!
আনন্দাশ্রুনীরে আজ নাওাব নামে তোমার॥"

এখানে নামে আনন্দ-ক্রন্দনের কথা! অনুতাপকারী ভক্তিভিখারীর যে নাম গ্রহণে রোদন, তাহা আপাত-বিমর্ষ-বেদন-মূলক হইলেও, হর্ষ-পরিণাম, সন্দেহ নাই। অনুতাপীর তাপ সে স্বর্গীয় অশ্রু-নিঃস্রবে ক্রমশঃ জুড়াইতে থাকে। মৃত প্রিয়জনের নাম নিলে লোক যে ভাবে কাঁদে, সেই অমৃত-প্রিয়তমের নাম নিলে কেউত সে ভাবে কাঁদেনা। সে প্রিয়তমের নামামৃত পান-রূপ আনন্দ-ক্রন্দনে পাপীর পাপ-জয়, তাপীর তাপ-ক্ষয়; তাহাতে সাধুর সাধ পূরে, ভক্তের প্রেম-স্ফুরে, ভাবুকের ভাব উথলে, রসিকের রস উছলে!

ভক্তোত্তম বৈষ্ণব-কবি নরোত্তম দাস গাহিয়াছেন——

(কবে)——
"গৌরাঙ্গ' বলিতে হবে পুলক-শরীর!
'হরি হরি' বলিতে নয়নে ব'বে নীর!

* * * *

হরি হরি কবে মোর হইবে সুদিন,
ভজিব শ্রীরাধাকৃষ্ণ হয়ে প্রেমাধীন।
"রাধা-গোবিন্দ" বলি কান্দিব উচ্চৈঃস্বরে।
ভিজাব সকল অঙ্গ নয়নের নীরে"॥

নরোত্তমের এই নামানন্দ-ক্রন্দনের আশা নামের কৃপায় পূর্ণ হইয়াছিল।

ভগবানের নামটি মাত্র নিতেই নয়ন-জলে ভেসে যাওয়া—অর্থাৎ কেঁদে আকুল হওয়া—বড় সোঝা কথা নহে! ইহা ভগবানে ভক্তের অসাধারণ ভাবাবেশের ফল। এই অতুল্য ভাব-সম্পদ জগতে অতি দুর্লভ বস্তু। 'হরি' বলিয়া প্রহ্লাদ কাঁদিয়াছেন, ধ্রুব কাঁদিয়াছেন, বিল্বমঙ্গল কাঁদিয়াছেন; ফলে ভগবদ্ভক্তিভাবোন্মত্ত ভারতে অনেকেই কাঁদিয়াছেন। আর গৌরাঙ্গের কাঁদার কথা আর বলিব কি? বলিবার সাধ্যইবা কি?

"গোরা রা বলিতে কেঁদে ওঠে।
ধা বলিতে ধূলায় লোটে!"

হরিনামে গৌরহরির——

"জল-যন্ত্র-ধারা যৈছে বহে অশ্রুজল;
আশ পাশ লোক যত ভিজিল সকল!'

হরিনামানন্দ-অশ্রুজলে গৌরহরি আপন অঙ্গ ভিজাইয়া, পার্ষদগণের অঙ্গও ভিজাইয়াছেন! নামকীর্ত্তনক্ষেত্র সত্য সত্য কর্দ্দমাক্ত করিয়াছেন! যে ভাগ্যবান মহাজনেরা স্বচক্ষে সে অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারাই স্বগ্রন্থে ও শিষ্য-গ্রন্থে তাহা লিখিয়া ও লেখাইয়া গিয়াছেন। এক আধ জনে মাত্র লেখেন নাই। ভিন্ন ভিন্ন জনে ভিন্ন ভিন্ন সন্দর্ভে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ঐ এক অভিন্ন অদ্ভুত ব্যাপারের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভগবন্নাম-গ্রহণে কার্য্যতঃ যাঁহার নিজের অবস্থা ঐরূপ, তিনি ভক্তি-ভজনার্থীর সাধনীয় শিক্ষা-শ্লোকে ভক্তের ঐকান্তিকী আশা অঙ্কিত করিতে ভগবদুদ্দেশে কেন না বলিবেন "নয়নং গলদশ্রুধারয়া"

* কদা তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি?"
হরিহে! নামটি তব করিতে গ্রহণ,
দর দর ধারে কবে ঝরিবে নয়ন?

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র। (যশোহর।)

বেদান্ত-সূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

প্রথম অধ্যায়।

চতুর্থ পাদ।

১১। ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ।

১২। প্রণাদয়ো বাক্যশেষাৎ।

১৩। জ্যোতিষৈকেষামসত্যান্নে।

১১। বিবিধত্ব ও তত্ত্বাতিরেকত্ব হেতুক সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত তত্ত্বসমূহের সংখ্যা-নির্দ্দেশ দ্বারা প্রধানের শাস্ত্রীয় প্রামাণিকতা সিদ্ধ হয়না।

১২। "পঞ্চজন" পদে প্রাণ ও পরবর্ত্তী শ্রুতির কথিত অপর তত্ত্বচতুষ্টয় বুঝাইতেছে।

১৩। কান্ব শ্রুতিতে অন্নের উল্লেখ না থাকায়, তৎস্থলে জ্যোতির উল্লেখ করিয়া পঞ্চসংখ্যার পূরণ করা হইয়াছে।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায় ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অপর কতিপয় ব্রাহ্মণে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে পরমাত্মা ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা আছে। চতুর্থ ব্রাহ্মণে উক্ত বিষয়ে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়, যথা—

"যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চ জনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ তমেবমন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতে মৃতমিতি"।

অর্থাৎ——

আমি জ্ঞানময় নিত্যামৃতসত্ত্ব।
অনুভবি নিত্য ব্রহ্মামৃততত্ত্ব॥
যিনি পরমাত্মা, যাঁতে স্থিত রয়,
"পঞ্চজন" সহ পরব্যোমাশ্রয়॥

সাংখ্যবাদীগণ বিচার করেন যে, এই

আদিভূত পঞ্চজনই সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ব।

১১শ সূত্র এই বলিতেছে যে, "পঞ্চজন" এই বাক্য দ্বারা সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতিতত্ব বুঝাইতে পারেনা; কেননা, সাংখ্যমতে আত্মা স্বয়ং সেই পঞ্চবিংশতির অন্যতম তত্ব, এবং মহাকাশও একটি তত্ব; কিন্তু এই তত্বদ্বয় প্রমাণসিদ্ধরূপে "পঞ্চজন" বাক্যের অন্তর্ভূত হইতে পারেনা।

অতএব এই "পঞ্চ পঞ্চ জন" উক্তির সহিত সাংখ্যতত্ববাদের ঐক্য বা সামঞ্জস্য হয় না। পরমাত্মাই সমগ্র অধ্যায়টির প্রতিপাদ্য বিষয়; তন্মধ্যে সহসা অপ্রাসঙ্গিক প্রধান বা প্রকৃতিতত্বের আলোচনা অসম্ভব। "পঞ্চজন" পদে সাধারণ ভূততত্ব এবং "পঞ্চ পঞ্চ জন" পদে গন্ধর্ব্ব, পিতৃ, দেব, অসুর এবং রাক্ষস, এই পঞ্চ; অথবা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং নিষাদ, এই পঞ্চ জাতি বুঝাইতেছে; কিম্বা এতদ্দ্বারা জীবাত্মার দর্শন, শ্রবণ, রসন, শ্বসন এবং মনন, এই পঞ্চ বিষয়তত্বও বুঝাইতে পারে। পরবর্ত্তী শ্রুতিতে—অর্থাৎ উক্ত উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্রুতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, যথা—"প্রাণস্যপ্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো বৈ মনো বিদুঃ"।

অর্থাৎ—

প্রাণের যে প্রাণ, চক্ষু যে চক্ষের;
শ্রোত্রের শ্রবণ, ভক্ষ্য যে ভক্ষের,
মনের যে মন,
জানে যেই জন।—

উপরোক্ত ঔপনিষদী উক্তিতে "প্রাণের প্রাণ" প্রভৃতি পদে যে পুরুষের তত্ব প্রতিপাদিত, তাহাতে কোন পদগত আপত্তি অসম্ভাবিত। যেহেতু উক্ত তত্বপ্রতিপাদক ঐরূপ শ্রুত্যন্তরও দৃষ্ট হয়। "তেবা এতে পঞ্চ পঞ্চ পুরুষাঃ" (ছাঃ উঃ ৩।১৩।৬) "প্রাণোহ পিতা, প্রাণোহ মাতা" (ছাঃ উঃ ৭।১৫।১) এতদ্ব্যাখ্যায় এক আপত্তি এই উঠিতে পারে যে, যেখানে "মাধ্যন্দিন শ্রুতি" প্রাণ (নিশ্বাস), চক্ষু, কর্ণ, মন এবং অন্ন, এই পঞ্চের উল্লেখ করেন, কিন্তু "কান্ব শ্রুতি" ইহার মধ্যে অন্নের উল্লেখ মোটেই করেন না, সেখানে উক্ত পঞ্চপদার্থ স্থলে কেবল চারিটিমাত্র গ্রহণীয়; কেননা পাঁচটি অবিসংবাদিত রূপে প্রমাণিত হইতেছে না।

১৩শ সূত্রে বলা হইয়াছে যে, যদিও "কান্ব শ্রুতি" অন্নের উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে জ্যোতির উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—"তদ্দেবো জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ"। সর্ব্বজ্যোতির জ্যোতি জানিয়া তাঁহাকেই দেবগণ উপাসনা করেন। মাধ্যান্দিন শ্রুতিতে পাঁচটি তত্বসত্তাই স্বীকৃত হইয়াছে; সুতরাং "জ্যোতি" তন্মধ্যে বিনিবিষ্ট করিয়া "পঞ্চ জন" প্রমাণিত করা নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু 'কান্ব' শ্রুতিতে তদভাবে তাঁহার প্রয়োজন। অপিচ, "ষোড়শিনো" ন্যায়েও এস্থলে তত্তুল্যতাই পরিদৃষ্ট হয়; যেহেতু মীমাংসাদর্শনের ব্যাখ্যানুসারে বিভিন্ন বিভিন্ন শ্রুতির বশে উহা "অতিরাত্র" যজ্ঞে প্রযুক্ত হইতেও পারে, না হইতেও পারে।

(ক্রমশঃ)

দেবভাষা-স্তোত্রম্।

নমামি ত্বাং দেবভাষে চতুর্ব্বেদ-প্রসূতিকে।
পদ্মযোনেরাস্যপদ্মে নমামি মধুরূপিকে॥
স্মৃতিস্তন্ত্রস্পুরাণানীতিহাসো দর্শনানি চ।
সাহিত্যংগণিতংশিল্পংসঙ্গীতংজ্যোতিষন্তথা
সর্ব্বাণ্যেতানি শাস্ত্রাণি রাজন্তে জগতীতলে॥
কৃপয়া কেবলন্তেহি ত্বং সর্ব্বশাস্ত্ররূপিণী॥
পরাপরা চ দ্বে বিদ্যে উভয়োস্ত্বম্বিবোধিনী।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং সাধনে সহকারিণী॥
নিত্যং ব্যাকরণে দুর্গে রাজ[illegible] দেবি দুর্জ্জয়ে।
অলঙ্কার-বিধানেন কবচেন সমাবৃতে॥

বাল্মীকিব্যাসমাঘাস্ত কালিদাসশ্চ ভারবিঃ।
বহুসাধন-যুদ্ধেন জিত্বা ত্বাম্বশমানয়ন্ ॥
যদা ত্বম্পদ্যরূপাসি ছন্দোহম্বর-সুশোভিতে।
রসমাধুর্য্যভাবেন ভূষণেন বিভূষিতে ॥
তদ্রূপস্তোপভোগেন বিমুগ্ধা দেব-মানবাঃ।
দর্শনেনাপি ধন্যাঃ স্যুর্ম্লেচ্ছ-যবন-দানবাঃ ॥
কচিদ্বা ত্বং নাট্যরূপা বাক্‌চাতুর্য্যবিমোহিনী।
নমাম্যহং বর্ণরূপে বিচিত্রে বরবর্ণিনি ॥
সর্ব্বভাষা-প্রসূতিস্ত্বং সর্ব্ববিদ্যা-বিকাশিনী।
সংসার-বিষবৃক্ষস্য সুধাফলস্বরূপিণী ॥
বিষয়াতপতপ্তস্য সর্ব্বসন্তাপনাশিকে।
অবকাশে তোষিকাত্বমবসাদপ্রসাদিকে ॥
কাব্যানাং কল্পনাভূতে কবীনাং কণ্ঠমালিকে।
ভাবুকস্য ভাবনীয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতপ্রিয়ে ॥
রসনা-রসলালিত্য-ললিতে রসরঞ্জিনি।
মানসে সরসি ত্বংহি হংসীব কলকূজিনি ॥
আর্য্যবংশ-সুপুত্রস্য মানবস্য মনোরমে।
সুসাহিত্য-সরোজস্য মধুপস্য মধূপমে ॥
গদ্যে পদ্যে তথা গীতে বাক্যেচ বহুরূপিণী।
শ্রুতেঃ কণ্ঠস্য চিত্তস্য প্রাণানাং পরিতোষিণী ॥
মূর্খোহহং জ্ঞানহীনোহহং ন কবির্নচ ভাবুকঃ।
বচনাতীতমাহাত্ম্যং বচসা কিম্বদাম্যহং ॥
প্রসীদ দেবি মে নিত্যং দেবানাং রসনাসনে।
ত্রিজগদ্বন্দ্যপাদারবিন্দে তে চাস্তু মে মতিঃ ॥
গ্রসতীদং জগৎ সর্ব্বং ম্লেচ্ছভাষা দিনে দিনে।
তদ্গ্রাসাত্রাহি মাং দীনং দেহিমে চরণাশ্রয়ম্ ॥
তব পদপদ্মে নিবসতু নিত্যং।
মধুরস-মুগ্ধং শরদশ্চিত্তম্ ॥

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

(পদ্যানুবাদ।)*

নমি তোমা দেবভাষে! চারিবেদ-প্রসূতিনি!
পদ্মযোনি-মুখপদ্মে প্রণমি মধুরূপিণি!
স্মৃতি-তন্ত্র-দর্শন-পুরাণ-ইতিহাস-কথা;
সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্প-গণিত-জ্যোতিষ তথা;
এই সব শাস্ত্ররাজি বিরাজিত ভূমণ্ডলে,
তুমি সর্ব্বশাস্ত্ররূপা, তোমারি করুণা-বলে।
পরা ও অপরা বিদ্যা, তুমি উভ-বিবোধিনী;
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ-সহায়িনী।
ব্যাকরণ-দুর্গে সদা বিরাজ দেবি দুর্জ্জয়ে!
অলঙ্কার বিধিরূপ বর্ম্মে সমাবৃত হয়ে।
বাল্মীকি-ব্যাস-ভারবি-মাঘ কালিদাস কবি—
সাধন-সংগ্রামে বহু জিনিলা তোমারে দেবি!
যবে তুমি পদ্যরূপা—ছন্দ-বাস-সুশোভিতা,
মাধুর্য্য-রস ভাবের বিভূষণ-বিভূষিতা,
সে রূপের উপভোগে বিমুগ্ধ দেব-মানব;
দর্শনেও ধন্য হল যবন-ম্লেচ্ছ-দানব!
নাট্যরূপা কভু তুমি—বাক্‌চাতুর্য্যবিমোহিনী;
প্রণমামি বর্ণরূপে! বিচিত্রে! বরবর্ণিনি!
সর্ব্ব ভাষা-মাতা তুমি, সর্ব্ববিদ্যাবিকাশিনী;
সংসার-বিষবৃক্ষের সুধাফল-স্বরূপিণী।
বিষয়াতপ-তপ্তের সর্ব্বতাপ-প্রণাশিনী;
অবসর-বিনোদিনি—অবসাদ-প্রসাদিনী।
হে কাব্য কল্পনাময়ি! ভাবুকের ভাবনীয়ে!
কবি-কণ্ঠহাররূপে! মণ্ডিতে! পণ্ডিতপ্রিয়ে!
রসনা-রসলালিত্যে ললিতে! রসরঞ্জিনি!
মানস-সরসে তুমি মরালি-কল-কূজিনি!
আর্য্যবংশ সুসন্তান-মানব-মানসরমে!
সুসাহিত্য-সরোজের মধুপের মধূপমে!
গদ্যে পদ্যে গীতে আর বাক্যেও বহুরূপিণি!
শ্রবণ-কীর্ত্তন মনঃ প্রাণের পরিতোষিণি!
মূর্খ আমি—জ্ঞানহীন, কবি বা ভাবুক নহি;
মহিমা বচনাতীত, বচনে কেমনে কহি?
দেবের রসনাসনা দেবি! সুপ্রসন্না থাক;
ত্রিজগৎ-পূজ্য তব পাদপদ্মে মতি রাখ।
গ্রাসিল সর্ব্বভুবন ম্লেচ্ছভাষা দিনে দিনে।
উদ্ধারি সে গ্রাস হতে পদাশ্রয় দেও দীনে॥
তব পদ-কমলে নিবসুক নিত্য
মধুরস-মোহিত শরতের চিত্ত।

(কস্যচিদ্ দেবভাষা-সেবার্থিনঃ।)

* মূল স্তোত্র-রচকের রচনা যেরূপ সরলসংস্কৃতময়ী, তাহাতে এই পদ্যানুবাদের তত প্রয়োজন ছিলনা, তবে "অধিকন্তু ন দোষায়" ভাবিয়া, এবং শুধু সংস্কৃত প্রবন্ধ বাঙ্গালা-পত্রিকায় সাজেনা বলিয়া এই চেষ্টা।
(অনুবাদক।)

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১০ম বর্ষ, ১০ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।	আষাঢ়।	১৩১০ সাল, ১৮২৫ শকাব্দা।

বর্ণভেদতত্ত্ব।

(বর্ণ ও জাতি শব্দ)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

শাস্ত্রীয় জাতিভেদের যৌক্তিকতা ও মৌলিকতা এবং বর্ত্তমান জাতি-ভেদ।

পূর্ব্বে বচনের বড় আদর ছিল, যুক্তির পরাজয় এই সময়ে আরম্ভ। প্রধান কারণ শিক্ষার অভাব এবং অবৈধ স্বার্থসংরক্ষণ। "নাস্তিবচনস্যাতিভারঃ" ও "কিমিবহি বচনং ন কুর্য্যাৎ" এই সকল কথা এখন শুনা যায় না। এখন অনেকটা দোষ দূর হইয়াছে। মুসলমান্ শাসনের সময়ে দেশে শাস্ত্রচর্চ্চা বড়ই বিকৃত হইয়াছিল, তখনই বচনের মান প্রতিপত্তি প্রসার প্রবল হইয়াছিল। নচেৎ পূর্ব্বাচার্য্যেরা সেরূপ বচনসর্ব্বস্ব ছিলেন না। বৃহস্পতি বলিয়াছেন "কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোহর্থনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।" যুক্তিহীন বিচার ধর্ম্মের হানিজনক। কালের কি কুটিল গতি! পণ্ডিত মহাশয়েরা যুক্তির নামে শিহরিয়াউঠেন, বলেন "শাস্ত্রে আছে, করিতে হইবে, যুক্তি টুক্তি বুঝিনা বাপু!" সে দিন চলিয়া গিয়াছে! এখন যুক্তির যুগ। জাতি-ভেদ যাঁহারা মানেন না, তাঁহাদিগের সহিত আমাদের সহানুভূতি নাই। তাঁহাদের মতে সকলেই সমান, যেহেতু সকলেই পরমেশ্বরের সন্তান। সকলেই সমান বলিলে, আমরা কিছুই বুঝিনা। সকলের রূপ, গুণ,

কর্ম্ম, আকার, আচার, শান্তি, অশান্তি, অধিকার, কিছুই একরূপ হইতে পারেনা। সকলের বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রবৃত্তি, প্রকৃতি, পরস্পর পৃথক্ ছাড়া এক প্রকার হইতে পারেনা। দর্শন-বিজ্ঞানের যুক্তি ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। মনুষ্য সমাজের ব্যবহার ও বিবেকবুদ্ধি ইহার প্রতিকূলে জলন্ত দৃষ্টান্ত। সকলের সামর্থ্য, সকলের অবস্থা যখন সমান নহে, তখন ইহাদের ব্যবস্থা ও বিভিন্ন হওয়া সঙ্গত।

গুণবান্ এবং ঘৃণার্হ ব্যক্তির সমান সম্মান সমাজের শ্রেয়ঃকল্প নহে, তাহাতে পাপের বা দুষ্কার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়। আর গুণের উপযুক্ত মর্য্যাদা রক্ষিত হয়না, ইহা অত্যন্ত অহিতকর ও অযৌক্তিক। দুষ্কার্য্যকারী পরস্বাপহারীর সহিত সত্যবাদী সদাচারী সজ্জনের আহার ব্যবহার ও শোণিত-সম্বন্ধ, কিছুই উপযুক্ত নহে। বংশমর্য্যাদা জগতের একটী আবশ্যকীয় এবং গৌরবের দ্রব্য। শিক্ষিত ব্যক্তির ঔরসে শিক্ষিতা বনিতার গর্ভে যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে পিতামাতার সংস্রবে ও শাসনে থাকিলে, শিক্ষিত হওয়া সমধিক সঙ্গত; সুতরাং বংশানুসারে গুণী হওয়া একান্ত অসম্ভব নয়। শিক্ষা, সঙ্গ, ব্যবহারের ভেদে সহোদরেরও পৃথক্‌ভাব উপস্থিত হয়। আর দার্শনিক সুযুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তের দ্বারা অদৃষ্ট, জন্মান্তর, প্রমাণিত হইতে পারে। যখন শিক্ষা, সঙ্গ, ও স্বাস্থ্য দ্বারা এবং পিতৃ শুক্রশক্তি, মাতৃ লোহিতশক্তি দ্বারা উৎপন্ন সকল গুণেরই বৈপরীত্য দৃষ্ট হইবে, তখন অদৃষ্টবাদ আশ্রয়। মোটের উপর শুক্র-শোণিতশক্তি লৌকিক কারণের মধ্যে মুখ্য, সন্দেহ নাই, কাজেই ভিন্ন প্রকারের ব্যক্তির জন্য ভিন্নরূপ সামাজিক ব্যবস্থা আবশ্যক। একত্র শয়ন, ভোজন, ভ্রমণ, অধ্যয়ন ইত্যাদি দ্বারা ব্যক্তিগণের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি বিশেষের আদান প্রদান সর্ব্বদা সম্পাদিত হয়, সহজে ইহা অনুভূত হয়না। পরিণামে প্রবল হইলে পরিচয় পাওয়া যায়। সংসর্গ-শক্তির জন্য সৎসঙ্গে সদ্ভাব এবং পাপ-প্রসঙ্গে লোক পাপ শিক্ষা করে। সমস্ত পদার্থই স্বজাতির মধ্যে শক্তি বিকাশ করিতে পারে। মনের উপর কুশিক্ষার লাঞ্ছন বৈদ্যুতিকশক্তিতে ক্রমে ক্রমে সংগৃহীত হইয়া, সুবোধ সচ্চরিত্র সন্তান কুল-পাংশুল হইয়া দাঁড়ায়। প্রথম বিদেশীয় শিক্ষার প্রচলন সময়ে অনেক পবিত্র পিতামাতার পবিত্র পুত্র বিকৃত ব্যভিচারী হইয়াছিল, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। সতত লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইতেছে।

লোকের অবস্থামত কর্ম্মে তাহাকে নিযুক্ত করিলে তাহার উন্নতি হয়। দোষীকে গুণবানের সম্মান দিলে, দোষ আর ইহ-জীবনে সারেনা। কাজেই গুণকর্ম্মানুসারে অথবা সম্ভব হইলে, বংশানুসারে আহার-বিবাহাদির নিয়ম থাকা যুক্তিযুক্ত। আমাদের শাস্ত্রীয় জাতিভেদ এই যুক্তিমূলক। সম্প্রতি সমাজের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে, শাস্ত্রীয় জাতিভেদ এখন নাই। গুণকর্ম্ম মতে ত নাইই, বংশগত জাতিভেদও বহু পূর্ব্বে নানারূপে কলুষিত হইয়াছে। সমাজের ব্যভিচারে, এখন যাহারা যে বংশীয় বলিয়া পরিচিত, প্রকৃতপক্ষে তাহারা তদ্বংশোৎপন্ন

কিনা, তাহাও সন্দেহস্থল। বস্তুতঃ নীচ-বংশীয় জাতি উচ্চবংশ-পরিচয় লাভ করিয়া উচ্চজাতির সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন করায়, বংশগত জাতিভেদ স্থির নাই।

চারিবর্ণ ব্যতীত যে সকল জাতির উল্লেখ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ সকল জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে শাস্ত্রে যেখানে যাহা আছে, সে সকলগুলিই যে যুক্তিসহ, এমন মনে হয়না। উহার সকল ভাগই প্রক্ষিপ্ত এবং পরবর্ত্তিগণের ধূর্ত্ততার নিদর্শন, ইহা বেশ বুঝা যায়। ব্রাহ্মণ বৈশ্য-কন্যা বিবাহ করিলে সেই সঙ্গজাত সন্তান অম্বষ্ঠ জাতি। অসবর্ণ-বিবাহ যখন প্রচলিত ছিল, তখন পিতা ও মাতার বর্ণ পৃথক্ই থাকিত, তাই বলিয়া সন্তান অন্য জাতি হইবে কেন? অম্বষ্ঠজাতি ব্রাহ্মণের ঔরসোৎপন্ন এবং অসবর্ণা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়াও অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিতে বা ব্রাহ্মণকে কন্যাদান করিতে পারিবেনা, ইহা অসম্ভব। যদি বৈশ্যকন্যা ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বনিতা না হইয়া উপপত্নী হয়, তবে ঐ গর্ভজাত সন্তান সমাজে স্থান লাভ করিবে কেন? যে সময় ব্যভিচার দোষের ছিল, সে সময় ব্যভিচারজাত সন্তান জীবিত থাকা কি সঙ্গত? সমাজে কি এখনও ব্যভিচার নাই? সে সকল সন্তান কি মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইতেছে? বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র যদি পিতার জাতি না হইল, তবে অসবর্ণ বিবাহ কি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠনের উদ্দেশ্যেই আরব্ধ হইয়াছিল? পুরাণে দেখা যায়, অনেক রাজা ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিয়াছেন; তাঁহাদের সন্তান কিন্তু নূতন কিছু হয় নাই। ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির সবর্ণ বিবাহজাত অসংখ্য সন্তান কি দেশের পক্ষে পর্য্যাপ্ত ছিলনা? শোণিত-সম্মিশ্রণ সংঘটিত করিয়া নূতন জাতি না গড়াইলে বুঝি আর পারা যাইত না! ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্র-সংসর্গে জাত সন্তান চণ্ডাল। শূদ্র ত্রিবর্ণের বহিভূর্ত, সুতরাং এই সংসর্গ অসবর্ণ বিবাহও নহে, ব্যভিচার। চণ্ডাল শব্দই চাঁড়াল শব্দের মূল। এই জাতি বঙ্গে ব্যতীত অন্যত্র দৃষ্ট হয়না। তবে কি বঙ্গের ব্রাহ্মণীরাই শূদ্র-সহবাস একচেটে করিয়া লইয়াছিলেন? ইহা শাস্ত্রের কথা না গোঁজামিল! সমাজের অধিকাংশই শাস্ত্রানুসারে অসবর্ণ বিবাহ ও ব্যভিচারের ফল। হিন্দুসমাজের বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক বোধে অনার্য্য-সংসর্গ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল; সেই সকল অনার্য্য কুটুম্ব ও তৎসংসর্গজাত আর্য্যসন্তানেরা যাহাতে জাতিভেদের মধ্যে স্থান পান, তাহাই করিতে গিয়া এই সকল গোঁজামিল দিতে হইয়াছে। চণ্ডাল অনার্য্য জাতি, তাহাকে আর্য্য গণ্ডীর অভ্যন্তরে আনিতে গিয়া অদ্ভুত লিখিতে হইল। অনার্য্য-সন্তানই বঙ্গের আদিম অধিবাসী, এইজন্য অন্যত্র এ জাতি পাওয়া দুষ্কর। আর্য্যসমাজের সহিত বহুকাল সম্বন্ধে এবং আর্য্যশোণিতাদি লাভে উহারা অনেকটা অনার্য্যভাব পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছে। সম্প্রতি আর তাহারা চণ্ডাল নাই, "নমঃশূদ্র" হইয়াছে। তাহাদের মুখে শুনি, তাহারা নমস্ মুনির সন্তান। বিংশ শতাব্দী না হইলে হয়ত এতদিন শুনিতাম, নমস্ ও লোমশ

একই মুনি, পদ্মপুরাণে প্রমাণ আছে। অধিক কি, ম্লেচ্ছ, খস, যবন প্রভৃতিকেও হিন্দুসন্তান করা হইয়াছে। নিষাদ জাতিও আর্য্যজাতি। ম্লেচ্ছ, যবন প্রভৃতির অদ্ভুত উৎপত্তি বলিলেই উহারা আর্য্যসন্তান হইবে, তাহার অর্থ কি? যেখানে আর স্ত্রীপুরুষ দুটী মিলান যায় নাই, সেখানে পুরুষের হস্ত-পদাদি হইতেই কত জাতির উৎপত্তি বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের বেণের বৃত্তান্ত গুলি নিবিষ্ট চিত্তে পাঠ করিলে ইহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণীয় বচনেও বেণাঙ্গ হইতে ম্লেচ্ছাদির উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ক্রিয়া-লোপ হেতু শূদ্রত্ব প্রতিপাদন করিতে গিয়া মনু বলিতেছেন,——

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রবিড়াঃ কাম্বোজাযবনাঃ শকাঃ।
পারদা পহ্লাবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ খরদাঃ খশাঃ।

ক্রিয়া লোপের জন্য এই সকল ক্ষত্রিয় জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। পৌণ্ড্র, ঔড্র, দ্রবিড়, কাম্বোজ, যবন চীন, কিরাত ইত্যাদি কি সত্যই আর্য্যজাতি? চীন কি আচারভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়জাতি? হিন্দুর গণ্ডীতে যবন, ম্লেচ্ছ, চীনকেও স্থান দিতে হইয়াছে; গোঁজামিল আর কাহাকে বলে! কতকগুলি জাতির সংজ্ঞা-ব্যবস্থানুসারে বোধ হয় তাহাদের সংজ্ঞার কারণ ব্যবসায়। গোপ অর্থ গোপালক। ঐ কার্য্যটী বৈশ্যের, কিন্তু লক্ষপতি বৈশ্য কি আপনি গোপালন করিবে? কাজেই গোপালনের লোক চাই; যিনি তাহা করিয়াছিলেন, তিনি যে বর্ণেরই হউন না কেন, নাম গোপ। সহদেবকেও বিরাটপুরে "গোপাল" বলা হইত। এখনকার গোয়ালের নূতন জন্ম না হইলে শাস্ত্রের মহিমা থাকে কি? শঙ্খকার, তাম্বুলী, তিলি ইত্যাদির মূল ঐরূপ। এই সকল জাতির বিদ্যা-বুদ্ধি, শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসায় বাদ দিলে, অনেকাংশে একরূপ হইয়া যায়। এদেশের অনেক জাতি ব্যবসায়ে বদ্ধ থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষাদি না করায় স্বতন্ত্র হইয়া গিয়াছে, নচেৎ ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ইত্যাদি জাতির অপেক্ষা তাহারা—সুশিক্ষা দিলে, বিশেষ কোনও অংশে ন্যূন না থাকিতে পারে। এই সকল ব্যবসায় দ্বারা পৃথগ্‌ভূত জাতির জন্মতত্ত্ব শাস্ত্রানুরূপ হইবার বিশেষ কারণ দেখা যায়না। ফলতঃ ব্যভিচার দ্বারা এই সমাজ সংবর্দ্ধিত হইয়াছে, ইহা অযৌক্তিক। আর্য্য এবং অনার্য্য শোণিতের সংমিশ্রণে অধিকাংশ জাতি উৎপন্ন, উহা আর্য্যদের একরূপ অপরিহার্য্য বলিয়াই করিতে হইয়াছিল। অনার্য্যদেশে আসিয়া অধিকাংশ আর্য্য তাহাদের সহিত কুটুম্বিতা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

অনার্য্যেরা কিছুদিন হয়ত দাসত্বও করিয়াছিল। অনার্য্যগণ 'দাস' নাম ধারী ছিল। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১০৪ সূক্তে "দাস" শব্দ আছে, উহা সেখানে অনার্য্য দিগেরই বাচক। অনার্য্যেরা কৃষ্ণবর্ণ ছিল। ঋগ্বেদ তৃতীয় মণ্ডল ৩১ সূক্তে উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ১০১

সূক্তে আর্য্যদিগের শ্বেতবর্ণ কথিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে আর্য্য অনার্য্যের সংগ্রামের বহু বর্ণনা আছে, বিস্তার শঙ্কায় উদ্ধৃত করিলামনা। আমাদের শাস্ত্রে আর্য্যের বর্ণ শ্বেত, আবার ব্রাহ্মণের বর্ণ শ্বেত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বোধ হয়, বেদের আর্য্যজাতি একমাত্র ব্রাহ্মণ। অবশ্য বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ এই স্থানের লক্ষ্য নহে। অনার্য্য শূদ্র কৃষ্ণকায়। অনার্য্যেরা যজ্ঞদ্বেষী "অযজ্বান্" যাগবিরহিত। প্রথম অবস্থায় অনার্য্যেরা আর্য্যদিগের উপর অনেক অত্যাচার করিত, তখন তাহাদের শক্তি সামর্থ্য ছিল। শূদ্রও যজ্ঞহীন, খাদ্যাখাদ্য-বিচারবিহীন। পরে এই অনার্য্য কৃষ্ণবর্ণ জাতির সহিত আর্য্যদের বিবাহাদি সম্বন্ধ হইতে লাগিল। তখন তাহারা শুচি ও গোবিপ্ররক্ষক এবং সত্যবাদী বলিয়া উক্ত হইতে লাগিল। মহাভারত এবং ভাগবতের যে দুইটী শূদ্রলক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহা একত্র পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা যায়, উভয় শূদ্র ভিন্ন। এই সময় অনার্য্যেরা সংস্কৃত শিক্ষা করে। তখনই—

ইত্যেতে চতুরোবর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী'

লিখিত হইবার সূত্রপাত হয়। ক্ষত্রিয় সম্রাট্ দাস রাজার কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করেন। সেই প্রসঙ্গে দাস রাজের প্রার্থনা পূরণ করিয়া তাহার সম্মান রক্ষা করা হয়। সম্প্রতি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিগ্রোপ্রধানকেও সম্মান করিতেছেন। দাসরাজ অবশ্য অনার্য্য। সত্যবতী যত সুন্দরী হউন না কেন, তাঁহার গর্ব্ভে শ্বেতবর্ণ ঋষির বীর্য্যে যে সন্তান জন্মেন, তিনিই যখন কৃষ্ণবর্ণ, তখন মাতার কথা আর বলিতে কি? পুত্রগণ কিন্তু আর্য্যসন্তান আর্য্যই হইলেন।

মনু বলেন, "জাতোনার্য্যামনার্য্যায়া মার্য্যাদার্য্যোভবেদ্গুণৈঃ।"

অনার্য্যা রমণীর গর্ব্ভে আর্য্যের ঔরসে উৎপন্ন সন্তান গুণদ্বারা আর্য্য হইবে। বস্তুতঃও তাহাই হইতেছিল। তখনকার অনার্য্য সংসর্গজাত মলিনবর্ণ সন্তান গুণানুসারে আর্য্যনাম গ্রহণ করিতেন; এইরূপে ক্রমে অনার্য্যশক্তির ঘাত-প্রতিঘাত-সঙ্ঘাতজাত সংসর্গে আর্য্যগণ বর্ত্তমান বর্ণ ব্যবহার ও অবনতির মূলরহস্য লাভ করিয়াছিলেন। এদেশে কেবল এক শ্বেতবর্ণ জাতিই আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের এদেশবাসী কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্যজাতির সহিত বিবাদ বিসম্বাদ বিগ্রহের পর জয় পরাজয় ও সময়ানুসারে সন্ধিও হইয়াছিল। বহুদিনের সংঘর্ষে, সখ্যভাব—কদাচিৎ দাস্যভাবেরও আবির্ভাব হইয়াছিল। শোণিত-সম্বন্ধও হইয়াছিল। বর্ত্তমান হিন্দুজাতি তাহারই ফল। নির্ভাজ অনার্য্যাকার এখনও এদেশের অসভ্যজাতিতে বিদ্যমান। এদেশের বর্ত্তমান সমাজে যে অল্পাধিক পরিমাণে অনার্য্যশোণিত এখনও অনুপাত অনুসারে অবস্থিত আছে, তাহা সকলেরই স্বীকার্য্য। প্রকৃতপক্ষে শ্বেত-কৃষ্ণের সম্মিলন ব্যতীত এদেশে অন্য বর্ণের অস্তিত্ব প্রমাণ করা দুরূহ। জগতে এখনও তাম্রবর্ণ বা পীতাভবর্ণ জাতি আছে। তাহারা অবশ্য শ্বেতবর্ণ আর্য্য সম্প্রদায়ের শাখা না হইতে পারে। ভারতে প্রাচীনকালে ঐ দুইজাতি বাস করিত কিনা, তাহা

এখনও অন্ধকারে! বর্ত্তমান সমাজে যাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত, তাহারা অনেকে বিদেশাগত অনার্য্যজাতি, ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

আর কতকগুলি ক্ষত্রিয় আর্য্য-অনার্য্যের সম্মিশ্রণজাত, তাম্রবর্ণ জাতি ইহাদের আদিপুরুষ, এরূপ প্রমাণ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। যদিও কোনও সময়ে ভারতে তাম্রবর্ণ ও পীতবর্ণ জাতির অবস্থিতি সম্ভব বলিয়া প্রমাণিত হয়, তথাপি তাহারা ভারতীয় সমাজের ক্ষত্রিয় বৈশ্য কিনা, তাহা বুঝিবার অবকাশ রহিবেনা। তাহারা জগতের সমাজে ক্ষত্রিয় বৈশ্য হইতে পারে। বর্ত্তমান যুগে সকল জাতিই ক্ষত্রিয় বৈশ্য। বোধহয় যে হিসাবে চীন, যবন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতিকে আর্য্যসন্তান বলা হইয়াছে, সেই হিসাবেই ক্ষত্রিয় বৈশ্য রক্ত ও পীতবর্ণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। রক্তবর্ণ বা পীতবর্ণ জাতি যে ভারতে আসিয়াছিল এবং তাহারা যে ভারতীয় শ্বেতাঙ্গ আর্য্য জাতির অবান্তর শ্রেণী বিশেষ, এ কথা কল্পনার কাছে বিশেষ প্রমাণার্হ হইলেও, সত্যের সহিত সুপরিচিত বলিয়া বোধ হয়না। ভারতীয় সমাজের ক্ষত্রিয় বৈশ্য রক্ত বা পীতবর্ণ ছিলেন, বোধ হয়না। তবে একবংশীয় ব্যক্তির মধ্যে কেহ সুন্দর, কেহ যেমন কাল হইয়া থাকে, তদ্রূপ বর্ণ পৃথক্ থাকিতে পারে; কিন্তু তাহাতে বর্ণভেদ হওয়া অসম্ভব। যেহেতু জাতিগত বর্ণানুসারে যে পার্থক্য, তাহা বংশগত হইতে পারে, ব্যক্তিগত হইতে পারেনা। গৌরবর্ণ পিতার শ্যামবর্ণ সন্তান হইতে পারে, এই পার্থক্য স্থায়ী হয়না, কারণ ঐ পুত্রের সন্তান আবার শ্যামবর্ণই হইবে, তাহার কারণ নাই। জাতিগত বর্ণ কিন্তু অপরিহার্য্য। এতদ্দ্বারা বুঝা যায়, মহাভারতীয় শ্লোকবলে রক্তবর্ণ ও পীতবর্ণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যের অস্তিত্ব ভারতীয় সমাজে প্রমাণিত হইতে পারেনা। তবে ঐ বর্ণ শব্দের অর্থ যদি শরীরের রঙ না হইয়া আন্তরিক প্রকৃতি এবং সেই সেই জাতির কর্ম্ম হয়, তাহা হইলে উহা দ্বারা গুণ-কর্ম্মানুসারে জাতিভেদ সমর্থিত হইবে। নতুবা উহার কোনও যৌক্তিক সঙ্গতি সংগ্রহ করা যায়না। জাতিভেদের যুক্তি পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে, গুণকর্ম্মানুসারী জাতিভেদের মূলে যৌক্তিকতা আছে এবং উহা উপযুক্ত সময়েই দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিল। উহা দ্বারা দেশের প্রভূত উপকারও সাধিত হইয়াছিল, ইহা আলোচিত হইয়াছে। গুণ বংশগত হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সম্ভব নহে; সুতরাং বংশগত জাতিভেদও পবিত্রভাবে সংরক্ষিত হইলে ভিত্তিশূন্য বা যুক্তিবিহীন ও অন্তঃসাররহিত হয়না। তবে ভারতীয় সমাজে বর্ত্তমান যে জাতিভেদ, তাহা পূর্ব্বোক্ত দুইটীর কোনওটী নহে। দুইটীরই অস্বাভাবিক অযৌক্তিকবিকৃত পরিণাম এখন এদেশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে।

অবসরে আমরা পুরুষ সূক্তের একটু আলোচনা করিয়া, বর্ত্তমান জাতিভেদের সমালোচনা করিব। পুরুষ সূক্ত রূপকে পরিপূর্ণ। "ব্রাহ্মণোহস্য" ইত্যাদি মন্ত্রটী নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিলে, বুঝা যায়, উহা বিরাট্ পুরুষের বর্ণনাও নহে,

প্রজাপতির বর্ণনাও নহে, রাষ্ট্রপুরুষের বর্ণনা মাত্র। সমাজের বর্ণনাই এই ঋকের অর্থ। ব্রাহ্মণ তখনকার সমাজের মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু এবং শূদ্র পদ। জ্ঞান-প্রকাশ ব্রাহ্মণে, সুতরাং তদভাবে সমাজ নীরব; বল ক্ষত্রিয়ে, তাহা না থাকিলে সমাজের কার্য্য করিবার শক্তি লোপ পাইল। কৃষি-বাণিজ্য বৈশ্য বল, তাহা না থাকিলে সমাজ ভগ্ন উরু হয়, দাঁড়াইতে পারেনা। পরিচর্য্যা শূদ্রকার্য্য, তাহা না থাকিলে, সমাজের হস্ত-পদ-মস্তিষ্ক সবই অপরিষ্কৃত রুগ্ন ভগ্ন হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। যাহার দ্বারা কাজ পাইতে হইবে, তাহার সেবা শুশ্রূষা চাই। এইত গেল ঋকের প্রকৃত অর্থ, এখন টীকাকার ভাষ্যকার যাহাই কেন বলুন না, এ ঋক্ আধুনিক। সকলেই ব্যাখ্যা করিতে গোঁজামিল দিয়াছেন। বেদের বর্ণিত বিরাট্ পুরুষ জিনিষটা কি, এ বিষয় যাঁহার কিছুমাত্র জ্ঞানও আছে, তিনি অবশ্যই বলিবেন, ব্রাহ্মণজাতি বিরাট পুরুষের মুখ হইতে পারেনা। কেবল ব্রাহ্মণাদি চারিজাতি মানবের দ্বারা যদি বিরাট্ মূর্ত্তি কল্পিত হয়, তবে স্থাবরজঙ্গম কাহার বাটী যাইবে? অতএব ব্রাহ্মণ মুখরূপে কল্পিত হইয়াছিলেন, এরূপ অর্থও দর্শনশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। বিরাট্ পুরুষের বর্ণনা বহু পুরাণে আছে, বেদান্তাদি দর্শনেও সমর্থিত হইয়াছে, কিন্তু তাহা ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ বিশিষ্ট ভারতীয় সমাজ হইতে বড় বিভিন্ন। এখানে এবিষয়ের বিস্তৃত বিচার বিধেয় নয় বলিয়া নিরস্ত হইলাম। ঐ মন্ত্র পুরুষ সূক্তের অন্তর্গত নয়, উহা কোনও মতে জাতিভেদের প্রমাণরূপে পুরুষসূক্তে প্রক্ষিপ্ত। বিরাটের সহিত উহার সম্বন্ধ বলিতে গেলে বিরাট্ বহুবিধ হইয়া দাঁড়াইবে। ঐ মন্ত্রের অর্থ যদি টীকাকারদিগের মতানুযায়ীই হয়, তাহা হইলেও উহা অর্থাৎ মুখ দিয়া, হাত দিয়া, অপূর্ব্ব জীবোৎপত্তি-প্রক্রিয়া প্রচার করা বেদের অনধিকার চর্চ্চা ব্যতীত আর কিছুই নহে। জীবশরীর-নির্ম্মাণ-প্রণালী ও জগতের পূর্ব্বতন অবস্থা বিষয়ে ভারতীয় আর্য্যজাতির জ্ঞান এত তিরস্কৃত, এরূপ বিশ্বাস করিতে কষ্ট হয়। এখন অর্থবাদ বাক্যের কথা। অর্থবাদে যদি লিখিত থাকে 'ব্রাহ্মণ মুখ হইতে উৎপন্ন' তবে তাহাই অর্থবাদবাক্যের যথার্থ অর্থ নহে। জৈমিনি বলেন 'স্তুত্যর্থত্বেন বিধীনাং স্যুঃ' অর্থবাদের স্বার্থ প্রতিপাদন তাৎপর্য্য নহে, বিধির স্তুতি করাই তাৎপর্য্য। যদি অর্থবাদের প্রকৃত অর্থ ধরিতে হয়, তবে বেদের প্রামাণ্য থাকেনা, এজন্য সকলেই "অর্থবাদ বিধির স্তাবক" এই কথা বলিয়াছেন। অর্থবাদের বিষয়ে "ঋগ্ভাষ্যোপোদ্ঘাত প্রকরণে" ও ন্যায়মালায় সায়ণমাধব যাহা বলিয়াছেন এবং ভাষ্যে শবরস্বামী ও শাস্ত্রদীপিকায় পার্থসারথি মিশ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আলোচনা করিলে, অর্থবাদের কোনও মূল্য নাই, কেবল বিধির প্রশংসা বা নিন্দাই উহার উদ্দেশ্য, ইহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। ভট্টবার্ত্তিক, ভট্টরহস্য, ভট্টদীপিকা, রাণক, আপোদেবী, মীমাংসা পরিভাষা, অর্থসংগ্রহ প্রভৃতি মীমাংসা শাস্ত্রের সকল গ্রন্থে অর্থবাদের তাৎপর্য্য প্রশংসা বা নিন্দা, একথা

লেখা আছে। এ প্রবন্ধে ঐ সকল জটিল বিষয়ের বিচার একান্ত অনাবশ্যক। মোটের উপর বেদের পুরুষসূক্ত বা যজুর্ব্বেদীয় অর্থবাদ, কিছুতেই জাতিভেদের কোনও তত্ত্ব নাই, কেবল ব্রাহ্মণাদির নামোল্লেখ আছে, তাহা ব্রাহ্মণাদি জাতির অস্তিত্বে প্রমাণ হইতে পারে, সম্ভবতঃ সে বিষয়ে কেহই প্রমাণ চাহেনা; কারণ তাহা প্রত্যক্ষ। পুরুষসূক্তাদিতে জাতিভেদের যতটুকু আছে, তাহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, এখন দেখা যাউক, বর্ত্তমান জাতিভেদ কি? এখন সমাজে জাতি অসংখ্য, অধিকাংশ জাতিই ব্যবসায় দ্বারা স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছে। কেবল মূল চারিবর্ণের ব্যবসায় ঠিক নাই। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য বর্ণও আছে কিনা, সন্দেহ। যাহারা ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত, তাহারা যে অনেকে আর্য্যজাতিই নহেন, একথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তবে সম্প্রতি কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়, একথা শুনা যাইতেছে, তাহার মূল কি, তাহা এ প্রবন্ধে আলোচ্য নয়; ফলতঃ শাস্ত্রীয় ক্ষাত্রিয় লক্ষণ কিছু দেখিতে পাইনা। ইঁহারা ক্ষত্রিয় হইলে, দেশে ক্ষত্রিয় আছে, ফলতঃ সকলেই স্বধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধশূন্য। সম্প্রতি আরও অনেক জাতি বৈশ্য হইতে চাহেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে বৈশ্য হইলেও, দেশে আচারভ্রষ্ট বৈশ্য পাওয়া যাইবে। বস্তুতঃ ভারতের সর্ব্বত্র ব্রাহ্মণ আছে; ইহারা ব্রাহ্মণ নামেই পরিচিত। ইঁহারা সকলে ব্রাহ্মণ বংশীয় কিনা, নির্ণয় করা অসম্ভব। ব্রাহ্মণের সকল লক্ষণ-আচার-ব্যবহার ইহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে না, কিন্তু জীবিকার অনুরোধে অধ্যয়ন অধ্যাপনাদি কয়টা কার্য্য ইহাদিগকে বাধ্য হইয়া করিতে হয়। ইঁহারা ব্রাহ্মণের গুণ-ক্রিয়ায় অনুরক্ত হইয়া আত্মোন্নতির চেষ্টা করিলে, সমাজের উপকার, তাহা এ জাতির একান্ত অসম্ভব কার্য্য নহে। যাঁহারা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য আছেন, কেহই ঐ নামে বা ঐ জাতির শাস্ত্রোক্ত ব্যবহার পালন করেন না, এমন কি, শ্রাদ্ধতর্পণাদিতে ক্ষত্রিয়ত্ব বৈশ্যত্ব রক্ষিত হয়না। পূর্ব্বাচার গ্রহণ করিলে, এই শ্রেণী সমাজের অশেষ কল্যাণ করিতে পারে। শূদ্র এদেশে আছে কিনা, বলা যায়না। এদেশের প্রায় সকল জাতির শূদ্রাচার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিন্তু অল্প দিন মধ্যেই সকল জাতি স্বীয় শূদ্রত্ব পরিহার করিবে, আশা পাওয়া যাইতেছে। প্রকৃত শূদ্র এখন ভারতে নাই বলিলেও হয়, ভারতের এখন অধিকাংশ লোক শূদ্র, একথা বলিলেও চলে। আর্য্য-অনার্য্য-সম্মিশ্রণজাত জাতি সকলই বর্ত্তমান সমাজের অধিক স্থান ব্যাপিয়া আছে, সুতরাং এ সমাজে বংশগত ভাব পরিহার করিলে, গুণগত জাতিভেদ প্রচার করিলে, আবার ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় পাওয়া যাইতে পারে, আবার দেশের কল্যাণ হইতে পারে। যে সকল জাতি অধুনা বিভিন্ন, শাস্ত্রেও যাহাদের উৎপত্তি কীর্ত্তন ভিন্নরূপে দেখা যায়, তাহাদের সকলেই ভিন্ন জাতি না হইতে পারে। বহুকাল পরে ব্যবসায় বংশগত হওয়ায়, উহারা এক একটী স্বতন্ত্রজাতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শাস্ত্রের ঐ সকল উৎপত্তি-বাক্য অযৌক্তিক এবং প্রক্ষিপ্ত; কাজেই বলিতে গেলে,

এখন দেশে যাহা জাতিভেদ, তাহার কতকটা সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং কতকটা ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের স্ব স্ব সম্প্রদায় মধ্যে বিবাহাদি আবদ্ধ রাখা ইত্যাদির পরিণাম মাত্র। ইহা অশাস্ত্রীয় এবং অযৌক্তিক। দেশের মধ্যে এখন যতগুলি বিভিন্ন জাতি আছে, এতগুলি জাতি থাকাই অন্যায় এবং অসম্ভব। কেবল গৃহবিবাদ ও দলাদলিতে সমাজ এত সঙ্কীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য অন্তঃসারশূন্য হইয়াছে। এত জাতি এত ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বহুল দেশে থাকিলে কখনও পূর্ব্বতন ভারত উন্নত হইতে পারিত না। এত শুচিবেয়ে হইলে কখনও প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যপোত চীনদেশে যাইতে পারিতনা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় কার্য্যানুরোধে গঠিত হওয়া আবশ্যক হয়, কিন্তু তাহা পরস্পরের সহানুভূতির বিরোধী হইলে, তাহাই জাতীয় জীবনের মূলে কঠোর কুঠারাঘাত, সন্দেহ নাই। এখন জাতিভেদের কি আছে, দেখা যাউক্। প্রথমতঃ একজাতি অন্য জাতির কন্যা বিবাহ করিতেছে না। ইহার একটু ব্যভিচারও আছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে এখনও কায়স্থ বৈদ্যে বিবাহ হইতেছে। একজাতি অন্য জাতির সহিত শোণিত সম্বন্ধ করার পরিণাম সর্ব্বত্র সমান হয়না। উৎকৃষ্ট জাতি নিকৃষ্ট জাতির সহিত বিবাহাদি করিলে, তাহার জাতীয়শক্তি শিথিল হইতে পারে, কিন্তু যদি উভয় জাতির গুণকর্ম্ম-শক্তি-সামর্থ্য একই রূপ হয় এবং ঐ দুই জাতি এক দেশবাসী হয়, তবে উহাদের কিছুই ক্ষতি নাই। অসবর্ণবিবাহ দেশে পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের শক্তি বিকাশের সহায়তা করিয়াছিল। ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিয়াছিলেন, পুরাণে ইহার পরিচয় আছে। নিম্নশ্রেণীর কন্যা উচ্চশ্রেণীতে বিবাহিত হইলে, সন্তান ভাল না হইতে পারে, কিন্তু এই উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার গুণকর্ম্মানুসারে করিতে হইবে। একজাতির মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় সংঘটিত হইয়া কাহারও পাত্রী মিলিল না বলিয়া বিবাহ হইলনা, কাহারও কন্যার বর জুটিলনা বলিয়া ঘরে থাকিল, এরূপ ঘটিতেছে। ইহাতে অনেকজাতি উচ্ছিন্ন যাইতেছে। বংশজ ও শ্রোত্রিয়ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে শতবর্ষ পূর্ব্বে যত লোক ছিল, এখন তাহার প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়াছে। কুলীন-কন্যাদের অবিবাহিতা থাকিতে হয়, ভ্রূণহত্যা করিতে হয়, তাহাতেও দেশের শক্তি ক্ষীণ হইতেছে। অধিকাংশজাতির মধ্যে কৌলিন্যপ্রথা না থাকিলেও, তাহাদের দশা অনেকাংশে এইরূপ হইয়াছে, কারণ একসমাজের লোক অন্যসমাজে ক্রিয়া কর্ম্ম করেনা। সে সকল দৃষ্টান্ত দিবার অবকাশ এখানে নাই।

এরূপ শত দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি এবং করিতেছি। এই সম্প্রদায়-বিরোধে যেমন দেশের জনবল ক্ষয় হইতেছে, সেরূপ ভাবে ভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ প্রচলিত না থাকায়, বিশেষ ক্ষতি হইতেছেনা, পরন্তু পরিণামে এ প্রথার আবশ্যকতা অনুভব করা যাইবে। জাতিভেদের এ প্রথা উঠাইয়া দেওয়া অর্থাৎ ভিন্ন জাতির বিবাহ প্রচলন আবশ্যক নাই, কিন্তু একজাতির মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিবাহ না দিলে

অচিরে অনেক বংশ নির্ব্বংশ ও অনেক সমাজ বিধবা-রাজ্যে পরিণত হইবে। বস্তুতঃ জাতিভেদের এই নিয়ম এখনও বিশেষ অনিষ্টকর নহে।

জাতিভেদের দ্বিতীয় নিয়ম একজাতি অন্য জাতির অন্ন গ্রহণ করেন না। বস্তুতঃ কুষ্ঠবিকৃতাঙ্গ নীচজাতির অন্ন উচ্চজাতির গ্রাহ্য নহে, তাহাতে স্বাস্থ্য, শক্তি, শুচিতা বিনষ্ট হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ নামধারী কদাচারী কুৎসিতের অন্নগ্রহণে শাস্ত্র অধুনা বাধা না দিলেও, যুক্তিবলে উহার দোষ অপরিহার্য্য। আহার্য্য প্রিয়, হৃদ্য, পরিষ্কৃত ও স্বাস্থ্যের অনুকূল হওয়া দরকার, তাহা না হইলে ব্রাহ্মণ-কন্যার পাকেও শরীরের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না, বরঞ্চ স্বাস্থ্যহানি এবং মনোগ্লানি ভোগ করিতে হইবে। অপরে অপরের অন্নস্পর্শ করিলে, তাহা অগ্রাহ্য, ইহাতেও একটু যুক্তি আছে। বাস্তবিক ঘৃণিত ব্যক্তির স্পর্শেও খাদ্যে অসদ্ গুণবর্দ্ধক বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চার হইতে পারে; কিন্তু নামে ব্রাহ্মণ ও কর্ম্মে চণ্ডাল, এমন একব্যক্তি অন্নস্পর্শ করিলে, ক্ষতি নাই, আর নামে ক্ষত্রিয় বা শূদ্র, গুণে ব্রাহ্মণ, এরূপ ব্যক্তির স্পৃষ্ট অন্ন অগ্রাহ্য, ইহা শাস্ত্রের আদেশ নহে। সমাজের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিষের বিষক্রিমিমাত্র। আর্য্যশাস্ত্রকারগণ অযৌক্তিক প্রথার প্রচলন পছন্দ করিতেন, এমন মনে হয়না; পরিবর্ত্তিগণের স্বার্থে সমাজ উচ্ছিন্ন গিয়াছে।

যাহা স্বাস্থ্যের অনুকূল, পরিষ্কৃত, সুপথ্য, এমন খাদ্য সচ্চরিত্র সুশ্রীক ব্যক্তির দ্বারা নির্ম্মিত হইলে, তাহা অবশ্য গ্রাহ্য। বংশ-বিচারে এখন কৃতকার্য্য হওয়া যায়, যদি তদ্বংশীয় লোক বংশোচিত গুণসম্পন্ন হন। নচেৎ যুক্তিযুক্তসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে গুণেরই আদর করিতে হইবে। যাহাকে দেখিলে, তাহার হাতের খাদ্য গ্রহণে অপ্রবৃত্তি বা ঘৃণার উদ্রেক হয়, তাহার প্রস্তুত খাদ্য বা প্রদত্ত খাদ্য, তাহার বংশগৌরব যতই গৌরবান্বিত হউক না কেন, চিকিৎসা-শাস্ত্রের মতে স্বাস্থ্যহানি করিবে, সুতরাং তাহাতে ধর্ম্মহানিও আছে। মানব যৌক্তিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিসর্জ্জন দিয়া, যদি অন্যবিধ উপায়ে খাদ্য নির্ব্বাচন করেন, তবে সে খাদ্য তাঁহার জীবনের কি মরণের সহায়, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। মহর্ষি মনুর সময়ে এ বিষয়ে সুনিয়ম ছিল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনির্ম্মলানন্দ ভারতী।

পঞ্চকোষ বিবেক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

রসপ্রকাশক দ্রবীয় তত্ত্ব ষষ্ঠ কোষ এবং গন্ধ প্রকাশক কঠিন ক্ষিতিতত্ত্ব ব্রহ্মের সপ্তম কোষ হইতেছে, এই সমষ্টি ব্রহ্ম চৈতন্য সাপ্ত কৌষিক। ঐ সাপ্ত কৌষিক ব্রহ্ম চৈতন্য আমাদিগের স্বকপোল কল্পিত নহে, মনুস্মৃতিতে উহা ভাবান্তরে ব্যক্ত আছে, ইহাদ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে পূর্ব্বোক্ত সাপ্ত কৌষিক ব্রহ্ম চৈতন্য জড় ভাবে মগ্ন হইয়া আভ্যন্তরিক অনুরাগ ও বিরাগ বা আকর্ষণী ও বিক্ষেপনী ক্রিয়া দ্বারা সূর্য্য.

চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, পৃথিবী, সমুদ্র, নদ, নদী, পর্ব্বত, স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু, বাষ্প, মেঘ প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া ঐ জড় ভাবের আবরণে বাহ্য চৈতন্য বা জ্ঞান আবরিত হয়, কেবল বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরতম মহাদি ক্ষেত্রস্থ নিয়মিকা শক্তিদ্বারা জড় জগৎ সুব্যবস্থিত ভাবে চলিতে থাকে ও ক্রমে ক্রমে বিবর্ত্তন রথচক্রের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া সৃষ্টির উন্নয়ন প্রণালী আরম্ভ হয়। ঐ সৃষ্টির উন্নয়ন প্রণালী অনুসারে জড়াবরিত চিদনু প্রধূমিত হইতে থাকে, অর্থাৎ ঐ জড় সংসৃষ্টি চিদনু সকল সৃজন, পালন, ও ধ্বংশনীতিক্ষেত্রের মধ্য দিয়া অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় কোষরূপ বর্ত্ম বা সেতু নির্ম্মাণ করিয়া বিবর্ত্তন রথে জড়াবরণরূপ তমোময় ভবসমুদ্র পার হইয়া পরপারস্থ চৈতন্যভূমি প্রাপ্ত ও তাহাতে সংমিশ্রিত হয়। ইহার নাম সৃষ্টির উন্নয়ন প্রণালী (Ascending cycle) ইহার একটি দৃষ্টান্ত এইরূপ দেওয়া যাইতে পারে মনে করুন সর্ব্বব্যাপি তৈজস বা তাড়িৎ শক্তিই (Electricity or electric force) যেন অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ উহা গুহ্যভাবে (Latent state) সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে কিন্তু পরিচালক (Conductor) ব্যতিত তড়িৎবিকাশিত হয়না ও জ্যোতিরাকর্ষক কেন্দ্র (Focus) ব্যতিত আলোকও প্রকাশিত হইতে পারেনা যেমন বর্হিজগতে জ্যোতিরাকর্ষক আলোকাধারই (Focus) সূর্য্য, সেইরূপ অন্তর্জগতে চিদ্ বিকাশক বা চৈতন্যের আধারই মহত্তত্ত্ব বা সমষ্টি বুদ্ধিতত্ত্ব।

জগতের সর্ব্বত্রই গুহ্যতেজ বা তড়িৎশক্তি বিদ্যমান আছে, উহা যখন গুহ্য থাকে তখন তাহার আকার বা কার্য্য থাকেনা, তড়িতের পরিচালক ও আধার ব্যতিত উহা যে প্রকাশিত হইতে পরেনা ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। সূর্য্যই ঐ তেজ বা তৈজস পদার্থের পরিচালক ও আলোকাধার (Focus) ঐ আলোকাধার সূর্য্য গুহ্যতেজঃ পরিচালিত ও ঘনিভূত হইয়া আকার বিশিষ্ট হয়,* যেমন সূর্য্য মেঘাবারিত হইলে প্রকাশ হয় না সেইরূপ জড়াবরণ দ্বারা মন বুদ্ধিরও বিকাশ হয় না। যেমন কাষ্ট মৃত্তিকা নির্ম্মিত আবরণ ভেদ করিয়া আলোক বাহির হইতে পারেনা সেইরূপ মলিন জড়াবরণ ভেদ করিয়া চৈতন্যের বিকাশ হয় না। কিন্তু যদি মৃত্তিকা নির্ম্মিত আবরণ স্বচ্ছ কাচে পরিণত করা যইতে পারে অর্থাৎ মৃত্তিকার পরিবর্ত্তে যদি কাচের আবরণ হয়, তবে ঐ কাচের পরতলা ভেদ করিয়া আলোক বাহির হইতে পারে, প্রকৃত পক্ষে জড় তত্ত্বের মধ্যে চৈতন্য বা চিদগ্নি লুকায়িত আছে, ঐ আভ্যন্তরিণ চিদগ্নি প্রভাবে জড়াণু সকল সূক্ষ্ম জীবাণুরূপে পরিণত হইয়া ধাতু ও উদ্ভিদ (অন্নখাদ্য) রূপে প্রকাশিত হয়। ঐ অন্ন অন্নময় কোষ নির্ম্মাণ করিয়া লয়

টীকা * প্রকৃতপক্ষেও সূর্য্য কেবল বাহ্য জগতের তেজঃ বা আলোকাধার নহে, অন্তর্জগতের ও তমোনাশক জ্যোতি বা বুদ্ধি তত্ত্বের আধার। সূর্য্যমণ্ডলস্থ আদিত্য বা ভগদেব হইতে পার্থিব জীবে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরিত হয়, গায়ত্রী ও সূর্য্য অর্ঘ মন্ত্র প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

তদভ্যন্তরে আগ্নেয় ও বায়বীয় জীবোপাদান দ্বারা প্রাণময় কোষ নির্ম্মিত হয় এবং তাহাতে অস্পষ্ট মানসাভাস প্রকাশিত হয়। যেমন সূর্য্য মেঘাবারিত থাকিলে তাহার প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ পদার্থে ও প্রতিফলিত হইতে পারেনা, সেইরূপ চিদনু সকল জড়াবরিত থাকায় ঐ অন্নময় ও প্রাণময় কোষে মন বুদ্ধির স্পষ্ট বিকাশ হয় না এই জন্য কীট পতঙ্গ পশু জগতে মন-বুদ্ধির বিকাশ অতি অল্প, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কিন্তু ক্রমে পশ্বাদির উন্নতাবস্থার চিদগ্নি কর্ত্তৃক শনৈঃ শনৈঃ মনোময় কোষ স্ফুরিত হইতে থাকে। ঐ মনোময় কোষ যেমন প্রস্ফুটিত হয় অমনি মানস পুত্র রূপ বিজ্ঞাতার ও বিকাশহয়। যেমন পূর্ব্বোক্ত ঘনমেঘ অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম (পাতলা) হইলে ঐ পাতলা মেঘ ভেদ করিয়া সূর্য্যের প্রতিবিম্ব স্বচ্ছ কাচপাত্রে প্রতিফলিত হইয়া তদাকার ধারণ করে, সেই রূপ চিদ্-জ্যোতিতে বায়বীয় প্রাণময় কোষ-স্বচ্ছ হইলে তাহাতে মানসাকার ধারনোপ-যোগী মনোময় কোষ প্রস্ফুটিত হয় ও তাহাতে বুদ্ধিতত্ত্ব বা বিজ্ঞানময় কোষরূপ চিদ্-বিম্ব ধারনোপযোগী জ্যোতিরাকর্ষক কেন্দ্র (Focus) স্বরূপ মানসাকার (Ideal form) নির্ম্মিত হয় ও তাহাতে সূর্য্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মলিন প্রতিবিম্বের ন্যায় সেই বিরাট মহা আমির মলিন প্রতিবিম্ব স্বরূপ আমার আমিত্ব (জীবাত্মা) প্রতি-বিম্বিত হয়। তদনন্তর সূক্ষ্মমেঘ ও বাষ্প যতই দূরীভূত হইতে থাকে সৌরালোক ও সৌরপ্রতিবিম্ব ততই পরিস্কৃত হয়। যেমন সাধারণ পরিষ্কার কাচপাত্রে সূর্য্যের প্রতি-বিম্ব পতিত হয় বটে কিন্তু সূর্য্যকান্ত মণি ব্যতিত সৌরতেজ উদ্গীরণ করিতে পারেনা সেইরূপ মন বুদ্ধিতে বিজ্ঞাতার বিকাশ হয় বটে কিন্তু আনন্দময় কোষ স্ফুরিত না হইলে বিজ্ঞাতার বিমল চিদানন্দ উপভোগ হয় না।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে এক চৈতন্য বা জ্ঞানই সত্য, তদ্ভিন্ন এই ভূত বা ভৌতিক জগৎ সমস্ত সত্য নহে * যদি তাহাই হয় তবে এই অসত্য ভৌতিক পদার্থ নির্ম্মিত অন্নময়াদি কোষের মধ্যে শনৈঃ শনৈঃ চৈতন্যের বিকাশ ও তদ্দ্বারা ভৌতিক কোষ সকল উন্নীত ও তাহাতে বিজ্ঞাতার আবির্ভাব হয় কেন? উপরোক্ত প্রশ্ন অতীব কঠিন হইলেও ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, জ্ঞান ব্যতিত জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্ব কখনই থাকিতে পারেনা, পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বস্তু একই জ্ঞানের দুইটি পৃষ্ঠমাত্র, উহার একটি অভাব হইলে অপরটিরও অভাব হয়। জ্ঞানই জ্ঞাতা আবার জ্ঞানই জ্ঞেয় বস্তুর আকার ধারণ পূর্ব্বক ঐ জ্ঞাতার নিকট প্রকাশিত হয়। পাশ্চাত্য নবিন বৈজ্ঞানিকগণও সূক্ষ্ম চতুষষ্টী-উপাদান (Elements) হইতে স্থূল বস্তুর সৃষ্টি স্বীকার করেন, কেহ কেহ ঐ চতু-ষষ্টি উপাদানের মূল তদপেক্ষা একই সূক্ষ্ম-

---

টীকা * জগৎ সত্য নহে অর্থে অস্তিত্ব হীন নহে তবে যে আকার আমরা দেখিতে পাই তদ্রূপ ঠিক নহে জ্ঞান জ্ঞাত বস্তুকে যে আকারে পরিদর্শন করায় সেই আকারই সত্যের ন্যায় প্রতিভাত হয় এই জন্যই পরিদৃশ্যমান জগৎকে অসত্য বলা হইয়াছে।

তম উপাদান (Homogenious matter) পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছেন। ঐ সূক্ষ্মতম মূল উপাদানের প্রকৃতি ও তাহার উৎপত্তি স্থির করিতে না পারিয়া অজ্ঞেয় বাদের দোহাই দিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন হিন্দু দার্শনিকগণের সূক্ষ্ম উপাদান ভিন্নরূপ, তাঁহারা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় অর্থাৎ জ্ঞানের পাঁচটি দ্বার দিয়া যে পাঁচ প্রকার জ্ঞেয় বস্তুর ভাব অন্তরে প্রবৃষ্ট হয় সেই পঞ্চপ্রকার জ্ঞেয় বস্তুর উপাদানই হিন্দু-দর্শনের মৌলিক উপাদান, উহাকে পঞ্চ মহাভূত বা পঞ্চতন্মাত্র কহে। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটির মূল উপাদান যাহা ঐ পঞ্চ জ্ঞেয় বস্তুর মূল উপাদানও তাহাই, অর্থাৎ ঐ জ্ঞানের পাঁচটি ইন্দ্রিয় যে যে পঞ্চ উপাদান বা পঞ্চ মহাভূত দ্বারা নির্ম্মিত * ঐ পাঁচ প্রকার জ্ঞেয় বস্তুও সেই সেই উপাদান সেই পঞ্চ মহাভূত দ্বারা নির্ম্মিত। ঐ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও ঐ ঐ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় দ্বারা অর্থাৎ উভয় সংমিশ্রণে এক একটি ভাবের উদ্বোধন হয়।

পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়ের মধ্যবর্ত্তিতায় আমিত্ব বোধক জীবের নিকট ঐ সকল জ্ঞেয় বস্তুর ভাব পরিগৃহিত হয়। অর্থাৎ আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি পুত্রবান, আমি রাজা বা প্রজা আমি ধনী বা দরিদ্র ইত্যাকার সংশ্লিষ্ট ভাবময় কর্ত্তা বা জ্ঞাতাই আমিত্ব বোধক জীব। ঐ আমিত্ব জ্ঞানও, বিষয় সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়। উহাই বৈকৃতিক জ্ঞান।

প্রাকৃতিক জ্ঞান হইতে ভূত এবং ভৌতিক বিষয়ের বিকাশ হয়, আবার ঐ ভৌতিক বিষয় হইতে বৈকৃতিক জ্ঞান বিকাশিত হয়।

শাস্ত্রীয় ভাষায় প্রথমোক্ত বিকাশকে মায়িক বিকাশ কহে ঐ মায়িক বিকাশ দুইভাগে বিভক্ত যথা ১। বিশুদ্ধ সাত্বিক (মায়িক) বিকাশ ২। জাড্য তামসিক বিকাশ। উভয়ই প্রাকৃতিক বিকাশ।

শেষোক্ত বিকাশকে বৈকৃতিক বা অবিদ্যা জনিত মিশ্র বিকাশ কহে। প্রথমোক্ত বিশুদ্ধ সাত্বিক ও জাড্যতামসিক বিকাশের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে প্রাকৃতিক জ্ঞানরূপ ব্রহ্ম চৈতন্য হইতে ভূত বা ভৌতিক জগৎ প্রকাশের রহস্য এবং শেষোক্ত মিশ্র বিকাশ বুঝিতে পারিলে জীবের নিকট বিষয় রোধও সুখ দুঃখের বিকাশের রহস্যোদ্ভেদ হইবে। ইতিপূর্ব্বে এই পঞ্চদশীর তত্ত্ববিবেকের পঞ্চদশ শ্লোক হইতে অষ্টাবিংশ শ্লোকের সংকৃত ব্যাখ্যা ও সমালোচনায় উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইলেও বর্ত্তমান মীমাংসার উপযোগী সাধারণের বোধগম্য অপেক্ষাকৃত বিশদ সমালোচনার আবশ্যক।

উল্লিখিত তত্ত্ববিবেকের শ্লোক কয়েকটির সার মর্ম্ম এই যে জগৎ বিকাশক শক্তিরূপিণী মহামায়ার সত্ত্বাংশই অনন্ত জ্ঞানের বিশুদ্ধ দর্পণ স্বরূপ এবং তমাংশই ঐ জ্ঞান দর্পণ প্রতিবিম্বিত ভৌতিক জগৎ অর্থাৎ ঐ জ্ঞান দর্পণে জাগতিক বিষয় সকল প্রতিবিম্বিত হয়। ঐ বিম্বিভূত অনিত্য ভৌতিক পদার্থের বিকাশই তামসিক বিকাশ।

টীকা * ঐ পঞ্চভূতাত্মক ইন্দ্রিয়ের সহিত চিদনু সংশ্লিষ্ট-মন ও প্রাণের যে আশ্চর্য্য সংমিশ্রন আছে তাহা পঞ্চাগ্নি-জ্ঞানবিশিষ্ট সিদ্ধ যোগীগণই অবগত আছেন।

এক্ষণে শাস্ত্রীয় উক্তি ছাড়িয়া ঐ জ্ঞান দর্পণের প্রকৃত তাৎপর্য্য এইযে বুদ্ধিতত্ত্বে যে বিষয় প্রতিভাত হয় ঐ (ভূত বা ভৌতিক) বিষয়ই জ্ঞেয় পদার্থ, ঐ জ্ঞেয় পদার্থই জ্ঞাতা অনুভব করেন। প্রকৃত পক্ষে এই ভৌতিক জগতের অভ্যন্তরে যে নিত্য সনাতন নিয়ম বা নীতি বিদ্যমান আছে ঐ নিত্য নিয়ম বা সনাতন নীতির অবান্তর নাম সৃষ্টি বিজ্ঞান ঐ সৃষ্টিবিজ্ঞানই পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানদর্পণ স্বরূপ উহা আর একটু বিশদভাবে বলা আবশ্যক। এই বিশ্বরাজ্যের যেখানে যেরূপ প্রয়োজন সেখানে সেইরূপ নিদ্দিষ্ট নিয়মাধীনে কার্য্য চলিতেছে উহা জ্ঞান বা বিচার মূলক শক্তির কার্য্য ভিন্ন কখনই অন্ধ শক্তির কার্য্য হইতে পারেনা। ঐ জ্ঞানমূলক শক্তির ক্রিয়াকেই আমাদের শাস্ত্রকারগণ ঐশ্বরীক শক্তির ক্রিয়া বা বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক বিকাশ বলেন, যেমন জীব জগতে জ্ঞানমূলক কোন পুস্তক প্রণয়ন দ্বারা কোন বিষয় প্রকাশ করিতে হইলে প্রথমতঃ অন্তর রাজ্যস্থ বুদ্ধি কর্ত্তৃক বিষয় উদ্বোধিত এবং মন দ্বারা সেই পুস্তকের ভাব সমূহ কল্পিত হয়, তৎপরে ঐ গ্রন্থের কল্পিত ভাব সমূহ লিপি দ্বারা বহির্জগতে প্রকাশ করিতে হইলে ঐ ভাব সমূহ অক্ষর দ্বারা শ্রেণীবদ্ধ করিয়া সাজাইতে হয়, সেইরূপ বিরাট জ্ঞানভাণ্ডার হইতে মহামন কল্পিত পুস্তকরূপ ব্রহ্মাণ্ড সজ্জিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ অক্ষর কতকগুলি রেখার সমষ্টি, ঐ রেখা আবার কতকগুলি কল্পিত বিন্দুর সমষ্টি, অতএব যেমন পূর্ব্বোক্ত বুদ্ধি হইতে কল্পনা প্রসূত গ্রন্থের আদি উপাদান বিন্দু, বিন্দু হইতে রেখা, রেখা হইতে অক্ষর, (স্বর ব্যঞ্জক) অক্ষর হইতে শব্দ, শব্দ হইতে পদ, পদ হইতে শ্লোক, শ্লোক হইতে একখানি কাব্য, একখানি কাব্য হইতে এক একটী নীতি-বিজ্ঞান প্রকাশিত হয়, সেইরূপ অনন্ত-জ্ঞান ভাণ্ডারস্থ সৃষ্টি-বিজ্ঞান হইতে যে সৃষ্টির কল্পনা হয় ঐ কল্পিত ভাব সমূহ প্রকাশ করিতে হইলে প্রথমতঃ কল্পিত সৃষ্টির মূল উপাদান পঞ্চ মহাভূত হইতে যথাক্রমে শব্দ, গতি বা স্পর্শ, রূপ, রস, ও গন্ধ তন্মাত্র বিকাশিত হয়, আবার ঐ সকল পদার্থের বিকার হইতে বহুতর ধাতব পদার্থ, ঐ সকল ধাতুর বিকার হইতে উদ্ভিদ পদার্থ, উদ্ভিদের বিকার হইতে স্বেদজ জীব, ঐ স্বেদজ জীব হইতে জরায়ুজ ও অণ্ডজ পশু পক্ষ্যাদি জীবের উৎপত্তি হয়। যখন জীবে অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষ সম্পূর্ণরূপ প্রস্ফুটিত হয় তখন জ্ঞাতার আবাস নির্ম্মিত হয়, জ্ঞাতার ঐ আবাসই পূর্ব্বোক্ত মস্তিষ্কস্থ বুদ্ধি কোষ (যাহা শাস্ত্রে বিজ্ঞানময় কোষ নামে অভিহিত) ঐ জ্ঞাতাকেই জীবাত্মা বা মানসপুত্র কহে যেহেতু মহৎ বুদ্ধিতত্ত্বে জ্ঞানের জ্ঞেয়ভাব (অর্থাৎ অনুভূত বিষয়) প্রতিবিম্বিত হইলে জ্ঞানের অনুভূতি অংশ অর্থাৎ জ্ঞাতৃভাবও সঙ্গে সঙ্গে বিকাশিত হয়, পূর্ব্বোল্লিখিত মহত্তত্ত্ব বা বিরাট মানসতত্ত্ব উক্ত জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাবের জননী এবং চৈতন্য উহাদিগের পিতৃস্থানীয়, * পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে

টীকা * মম যোনীর্মহৎ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্॥
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারতঃ

যে সৃষ্টবস্তুর অভ্যন্তরে সৃষ্টি বিজ্ঞান লুকায়িত আছে প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির উপাদান পঞ্চ মহাভূত—— শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি তত্ত্বদাত্মক জ্ঞান পৃথক কোন পদার্থ নহে। পূর্ব্বোল্লিখিত জ্ঞানের যে দুইটী অঙ্গ জ্ঞাতা ও জ্ঞাত পদার্থ ঐ দুইটীই একই বিরাট মনোপ্রসূত, বা সৃষ্টি বিজ্ঞান হইতে বিকাশিত, উহার মধ্যে একটী সৃষ্টাভিমানী কর্ত্তা বা জ্ঞাতা অন্যটী জ্ঞাত পদার্থ। উভয়ই যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত একই মহামনের অন্তর ও বহির্ভাগ মাত্র। বহির্ভাগ বা বহিরঙ্গ না থাকিলে অন্তর বা অন্তরঙ্গ শব্দ প্রযুজ্য হইতে পারেনা ঐ বিরাট মহামন বা মহত্তত্ত্বই পূর্ব্বোল্লিখিত জ্ঞান দর্পণ স্বরূপ; ঐ জ্ঞান দর্পণের অন্তর ভাগই আলো, বহির্ভাগ তাহার আবরণ (অন্ধকার) অথবা অন্তরঙ্গ জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞান প্রতিবিম্ব, উহাতেই জ্ঞানের ভাব প্রতিফলিত ও উপলব্ধ হওয়ায় ঐ জ্ঞান বিম্বই জ্ঞাতা বা কর্ত্তা (subject) বহির্ভাগ তাঁহার আবরণ রূপ ছায়া (object) জ্ঞাত পদার্থ। পূর্ব্বোক্ত মহৎবুদ্ধি যাহাতে জ্ঞাতা ও জ্ঞাত বস্তু প্রতিফলিত হয় তাহাই সৃষ্টি বিজ্ঞান স্বরূপ। এইজন্যই সৃষ্টি বিজ্ঞানের অন্তরঙ্গই বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক জ্ঞান। বহিরঙ্গই তমোময় আবরণ যুক্ত ছায়া। ঐ আবরণ যুক্ত বা কল্পিত জ্ঞাত পদার্থ নানাপ্রকার ছায়ার ন্যায় জ্ঞান দর্পণে প্রতিফলিত হওয়ায় জ্ঞাতা তাহাই অনুভব করেন। শাস্ত্রে অনন্ত প্রকৃতি রাজ্যের অভ্যন্তর ভাগকে বিশুদ্ধ সত্ত্বঃ প্রধানা প্রকৃতি এবং ঐ প্রকৃতি রাজ্যের বহির্ভাগে (সৃষ্টির উপাদান পঞ্চভূত বা ভৌতিক জড় জগতকে) তমো প্রধানা প্রকৃতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতির উপরোক্ত বহিরঙ্গ (ভূত বা ভৌতিক জগৎ) যখন পূর্ব্বোল্লিখিত বিরাট মনোপ্রসূত তখন উহাতেও মনের আনবিক শক্তি বা মনের সত্ত্বা আছে। পঞ্চদশীর পরবর্ত্তি একটি শ্লোকে উহা বর্ণিত হইয়াছে যথা——

> সত্ত্বা চিতি সুখঞ্চেতি ত্রিবিধ ব্রাহ্মণ স্মৃতঃ।
> মৃচ্ছিলাদিষু সত্ত্বাষু ব্যজ্যতে নেতর দ্বয়ম্॥

বঙ্গানুবাদ।—সত্ত্বা (অস্তিত্ব) চিতি (জ্ঞান) সুখ (আনন্দ) অর্থাৎ সচ্চিদানন্দই ব্রহ্ম। মৃত্তিকা পর্ব্বতাদি পদার্থে কেবল ব্রহ্মসত্ত্বা অস্তিত্ব আছে জ্ঞান ও আনন্দের বিকাশ উহাতে নাই।

উহাতে জ্ঞানের বিকাশ নাই বলিয়াই শাস্ত্রকারগণ উহাকে তমো প্রধানা প্রকৃতি বলিয়াছেন কিন্তু যখন উহাতে ব্রহ্মসত্ত্বা আছে তখন জ্ঞানও গুহ্যভাবে আছে—

> নাসতো বিদ্যতেভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ
> উভয়োরপি দৃষ্টান্তে স্তনয়োস্তত্ত্ব দার্শিভিঃ॥

বঙ্গানুবাদ।—যাহা নাই তাহা কখন থাকিতে পারেনা যাহা আছে তাহা কখন বিলুপ্ত হইতে পারেনা।

যখন জড় পদার্থেও ব্রহ্মসত্ত্বা আছে তখন তাহার বিকাশও সম্ভব। ঐ বিকাশের নামই পরিণাম বাদ, উহা বিবর্ত্তবাদের

একাংশ। উপরোক্ত বিবর্ত্তবাদের দুইটী প্রণালী যথাকালের অবনয়ন ও উন্নয়ন প্রণালী (Descending and ascending cycle) অনন্ত জ্ঞানানন্দ বা সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মের চিন্ময়ী প্রকৃতি হইতে জড় জগৎ পর্য্যন্ত কালের অবনয়ন প্রণালী, এবং ঐ জড় রাজ্যের প্রারম্ভ হইতে মানব ও দেবরাজ্যের পরিণাম মুক্তি পর্য্যন্ত উন্নয়ন প্রণালী। উক্ত জড় রাজ্যের পরিণাম যথাক্রমে উদ্ভিদ স্বেদজ অণ্ডজ ও জরায়ূজ প্রভৃতি জীবদের পূর্ব্ব বর্ণিত আকর্ষনী ও বিয়োজনী ক্রিয়া দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভূতের রাসায়নিক সংযোগ হয়। ঐ সংযোগ দ্বারা অন্ন (পোষনোপাদন) প্রস্তুত হয়, উহাই জীবদেহের উপাদান। ঐ অন্ন প্রস্তুত হইলে উহাই প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট নিয়মে রাসায়নিক সংযোগ দ্বারা যথাক্রমে উদ্ভিজ স্বেদজ অণ্ডজ ও জরায়ূজ দেহের উপাদান নির্ম্মিত হয়। ঐ সকল উপাদান নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীনে পুনঃ রাসায়নিক সংযোগ হয় তদ্দ্বারা ক্ষুদ্র কীটানু হইতে বৃহৎ জীব দেহ নির্ম্মিত হয় ঐ দেহকে অন্নময় কোষ বলে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে ধাতব উপাদান যথাক্রমে উদ্ভিজ্জ স্বেদজ অণ্ডজ জরায়ূজ জীবের দৈহিক উপাদানে পরিণত ও তদ্দ্বারা অন্নময় কোষ (জীবদেহ) নির্ম্মিত হয় ঐ অন্নময় কোষ সপ্তভাগে বিভক্ত যথা—চর্ম্ম, মেদ, মাংস, রক্ত, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র উহাদিগকে সপ্তধাতু কহে ঐ সপ্তধাতুর মধ্যে বহুতর অবান্তর ভাগ আছে ও বহুতর জৈব যন্ত্র ও যান্ত্রিক ক্রিয়া (Organs and organic action) আছে যথা প্লীহা, যকৃৎ, পাকাশয়, মলাশয়, মুত্রাশয়, হৃদ্‌পিণ্ড বা রক্তাশয় ফুস্ ফুস্ শিরা ধমনী স্নায়ু প্রভৃতি ঐ অন্নময় কোষাভ্যন্তরে শনৈঃ শনৈঃ প্রাণময় কোষের বিকাশ হইতে থাকে অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরে পঞ্চবায়ুর ক্রিয়া হইতে থাকে তদ্দ্বারা অন্নময় কোষ (দেহ) গতিবিশিষ্ট হইয়া ক্রমিক পুষ্ট ও বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরে পঞ্চ বায়ুর পঞ্চ প্রকার গতি দ্বারা রক্ত সঞ্চালন, নিশ্বাস প্রশ্বাস প্রবহণ, আহার গ্রহণ, মল মূত্র নির্গমন, জম্ভন উদ্গার প্রভৃতি দ্বারা শরীরের পোষণ ক্রিয়া সম্পাদন হয়। প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত পঞ্চ কোষ একই পদার্থোদ্ভূত ভৌতিক ও মানসিক ভাব বিকাশের যন্ত্রস্বরূপ, তন্মধ্যে অন্নময় কোষ বাহ্য যন্ত্র এবং প্রাণময় কোষ তাহার পরিচালক; ঐ অন্নময় কোষ স্থূল, প্রাণময় কোষ সূক্ষ্ম, উভয়ই একই সূত্রে ওত প্রতভাবে প্রোথিত আছে। ঐ প্রাণময় কোষ দ্বারা অন্নময় কোষ গতিশীল বাহ্য জগৎ হইতে স্বজাতীয় অন্ন (পোষণোপযোগী ভৌতিক উপাদান) গ্রহণ করিয়া তাহার অসার অংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সারাংশ নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। ইহার নির্ব্বাচন মস্তিষ্কজাত বুদ্ধি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচন নহে। পদার্থের অভ্যন্তরে যে সৃষ্টি বিজ্ঞান (নীতিচক্র) লুকায়িত আছে সেই বিজ্ঞান নীতির নির্ব্বাচন। ঐ নির্ব্বাচন ক্রিয়া উদ্ভিদ এমন কি জড়তত্ত্বের মধ্যেও বিদ্যমান আছে এবং তদ্দ্বারা সমস্ত জগৎ নিয়মিত আছে।

ঐ প্রাণময় কোষ দ্বারা ঐ অন্নময় কোষ (জীবদেহ) যতই পুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়

ততই প্রাণময় কোষের কার্য্যকরী শক্তি বা ক্ষমতার প্রসার হয় এবং তদভ্যন্তরে অর্থাৎ জীবদেহে মনোবুদ্ধি-বিকাশোপযোগী মস্তিষ্কের মানসযন্ত্র নির্ম্মিত হইতে থাকে। যখন অন্নময় ও প্রাণময় কোষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখন তৈজস দেবোপাদান দ্বারা মানসযন্ত্র নির্ম্মিত ও মনোময় কোষের বিকাশ হয়, অর্থাৎ বিরাট মানস ক্ষেত্রস্থ জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি দ্বারা মস্তিষ্ক, জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয়-গ্রহণ-চিন্তা এবং তদ্দ্বারা নির্ব্বাচনোপযোগী ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মস্তিষ্কে মানসিক শক্তি ও উচ্চ বৃত্তির স্ফুরণ হয়। যখন জড় দেহাভ্যন্তরে পূর্ব্বোক্ত বিজ্ঞান-স্ফুলিঙ্গ রূপ দেবতত্ত্ব দ্বারা দেহের উত্তম অঙ্গ মস্তিষ্কস্থ মানসযন্ত্র স্বচ্ছ হয়, তখন মানসপুত্র রূপ বিজ্ঞানতত্ত্ব স্ফুরিত ও বিকাশিত হয় এবং মানব প্রকৃত মানবত্ব প্রাপ্ত হয়। ঐ বিজ্ঞানতত্ত্ব ধারণোপযোগী যন্ত্রকে শাস্ত্রীয়ভাষায় বুদ্ধি বলে।

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, অব্যক্ত সৃষ্টি-বিজ্ঞান হইতে ব্যক্ত স্থূল জড়জগৎ পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়ের অভ্যন্তরে বুদ্ধিতত্ত্ব গুহ্য বা লুক্কায়িত থাকে, অর্থাৎ বিরাট মানসশক্তি হইতে যে পঞ্চভূত বা ভৌতিক জড়তত্ত্ব বিকাশিত হয়, তন্মধ্যেও মানসশক্তি বা মানসোপাদানের অস্তিত্ব আছে এবং তাহার আভ্যন্তরিক ক্রিয়াও আছে। ঐ ক্রিয়া অননুভূত (Imperceptible); প্রকৃতপক্ষে ভূত বা ভৌতিক উপাদান মানসোপাদানের আবরণ মাত্র; পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টিকারী বিজ্ঞানাগ্নি তেজরূপ আগ্নেয় জৈব উপাদান (Firy element বা Life principle) দ্বারা জড়তত্ত্ব তরল ও স্বচ্ছ হইলে, তদভ্যন্তরস্থ ঐ বিজ্ঞানাগ্নিস্ফুলিঙ্গের জ্যোতি মস্তিষ্কে প্রতিবিম্বিত হয়। শাস্ত্রে প্রকৃতির যে সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণের উল্লেখ আছে, উহা যথাক্রমে জ্ঞানবিকাশিনী বুদ্ধি, শক্তি, প্রবৃত্তি ও ক্রিয়াউদ্দীপনী জৈবী শক্তি এবং জ্ঞানাবরণী জড়শক্তি হইতেছে। অতএব জড়োপাদানের মধ্যে আগ্নেয় জৈবোপাদান, তদভ্যন্তরে জ্যোতির্ম্ময় মানসোপাদান লুক্কায়িত থাকায়, সৃষ্টির উন্নয়ন-প্রণালী বা ক্রমোন্নতিমূলক বিজ্ঞাননীতি অনুসারে যথাক্রমে জীবদেহ বা অন্নময় কোষ, তদভ্যন্তরে ক্রিয়াশীল প্রাণময় কোষ, তদভ্যন্তরে প্রবৃত্তি, কল্পনা ও চিন্তাউদ্দীপক সংকল্পাত্মক মনোময় কোষ, তদভ্যন্তরে স্বয়ং বিজ্ঞাননীতির আভাসরূপ নির্ব্বাচক ও ব্যবস্থাপক স্বরূপ নিশ্চয়াত্মক বিজ্ঞানময় কোষ, তদভ্যন্তরে ব্রহ্মানন্দবিকাশক আনন্দময় কোষ বিকাশিত হয়। পূর্ব্ববর্ণিত মত ধাতব উপাদান (Mineral element) উদ্ভিদোপাদানে পরিণত হইলে, অন্ন (পোষণোপাদান) প্রস্তুত হয়; ঐ অন্ন স্বয়ংই প্রকৃতির নিয়মানুসারে চিৎ প্রকাশের যন্ত্র স্বরূপ পরিণত হইতে থাকে, অর্থাৎ অন্নময় কোষ প্রস্তুত করিয়া লইতে থাকে। ধাতু ও উদ্ভিদ পদার্থ বিকৃত হইয়া তাহার পোষণাংশ হইতেই স্বেদজ জীবের উৎপত্তি হয়। সকলেই অবগত আছেন যে, পচ্‌লা হইতে মশা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট উৎপন্ন হয়। পৌরাণিক মতে পৃথিব্যাদি গ্রহ, নক্ষত্র, পর্ব্বত, নদ, নদী, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, পুষ্পাদি নির্ম্মিত হওয়ার পর সৃষ্টিক্রিয়া স্থগিতগতি

দেখিয়া, অর্থাৎ জীব সৃষ্টি না হওয়ায়, ব্রহ্মার ইচ্ছানুসারে স্বীয় মন হইতে কামদেবকে উৎপন্ন করিলেন, এই জন্য কামদেবের এক নাম মনসিজ। কামদেবের প্রতি জীব-সৃষ্টির আদেশ হওয়ায়, কামদেব পরীক্ষার্থে প্রথমতঃ ব্রহ্মার প্রতি কামশর নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে ব্রহ্মাও কামান্ধ হইয়া স্বীয় কন্যা সন্ধ্যার প্রতি অভিলাষ প্রকাশ করায়, উপস্থিত মানসপুত্র দক্ষ প্রজাপতি লজ্জায় ঘর্ম্মাক্ত ও দ্রবীভূত হন; সেই দক্ষের স্বেদ হইতে রতির জন্ম হয়; এই রতির সহিত কামদেবের বিবাহ হয়, তৎফল স্বরূপ স্ত্রী-পুরুষের বিলাস হইতে জীব-জগৎ উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত পৌরাণিক উপাখ্যানের রহস্যোদ্ভেদ করিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে যে, পূর্ব্ববর্ণিত মত অনাদি অনন্ত সৃষ্টিবিজ্ঞান হইতে সৃষ্টি-কল্পনা রূপ মনোময় ব্রহ্মা উৎপন্ন হন। পরে মনোময় ব্রহ্মা হইতে দক্ষ অর্থাৎ উদ্যম (Energy) উৎপন্ন হয়; কিন্তু কেবল দক্ষ বা উদ্যম দ্বারা কখনও সৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারেনা। স্বর্ণের অভ্যন্তরে তাহার (অর্থাৎ স্বর্ণের) স্বয়ং দ্রবীভূত হওয়ার ক্ষমতা বা শক্তি আছে; তাহা না থাকিলে, অগ্নির উত্তাপে কাষ্ঠ প্রভৃতির ন্যায় স্বর্ণও ভস্মীভূত হইত, কখনই দ্রবীভূত হইতনা; কিন্তু যেমন স্বর্ণের দ্রবীভূত হওয়ার ক্ষমতা বা শক্তি থাকিলেও, অগ্নির উত্তাপ ব্যতীত স্বর্ণ কখনও দ্রবীভূত হইতে পারেনা, সেইরূপ অভিলাষ ও আসক্তি ব্যতীত কেবল উদ্যম বা কার্য্যকরী শক্তি হইতে সৃষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারেনা। অভিলাষ মনের অঙ্গ, বা মন হইতে উৎপন্ন হয়, কিন্তু আসক্তি মনের অঙ্গ হইলেও, সাক্ষাৎভাবে কার্য্যকরী শক্তি বা উদ্যম হইতে বিকশিত হয়। এইজন্য কাম বা অভিলাষকে মনসিজ বা ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং রতি বা আসক্তি দক্ষের ঘর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হওয়া বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। সাক্ষাৎ কার্য্যকরী শক্তি হইতে উদ্ভিদ ও স্বেদজ জীবের উৎপত্তি হয়, কিন্তু অণ্ডজ ও জরায়ুজ জীব অভিলাষ ও আসক্তি ব্যতীত উৎপন্ন হইতে পারেনা; অতএব উপরোক্ত উপাখ্যানটি সম্পূর্ণ সৃষ্টিবিজ্ঞান-মূলক।

শ্রীঅশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
(সাতক্ষিরা।)

উদ্ভট-শ্লোক।

কবি নিম্নোক্ত শ্লোকে পাঠকগণকে ভগবান্ নারায়ণের আশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন করিতেছেন:—

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো।
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণপটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিতফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥

শৈব যাঁরে শিব বলি করেন সাধনা,
বেদান্তীরা ব্রহ্ম বলি করেন ভাবনা,
বুদ্ধ-বোধে বৌদ্ধ যাঁর করেন চিন্তন,
কর্ত্তা বলি ভাবে যাঁরে নৈয়ায়িক-গণ,
পূজ্য বলি জৈন যাঁরে পূজেন সংসারে,
মীমাংসক কর্ম্ম বলি ভাবেন যাঁহারে,
ত্রিলোকের পতি সেই শ্রীমধুসূদন,
তোমাদের মনোবাঞ্ছা করুন পূরণ।

শ্রীকৃষ্ণ নিকটে থাকিলে, যে কোকিল-ধ্বনি ও নীলোৎপলমাল্য শ্রীমতী রাধিকার চিত্তে পরম আনন্দ দান করিত, আজ শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে সেই দুইটী বস্তু তাঁহার পক্ষে কিরূপ যন্ত্রণা-দায়ক হইয়াছে, তাহাই কৌশল-ক্রমে এই শ্লোকে কথিত হইতেছে।

কূজতি কিল কোকিলকুল উজ্জ্বলকলনাদং
জৈমিনিরিতি জৈমিনিরিতি জল্পতি সবিষাদম্
(জয়দেব)

নীলনলিনমালামহহ বীক্ষ্য পুলকবীতা
গরুড় গরুড় গরুড়েত্যপি রৌতি পরমভীতা॥
(সনাতন গোস্বামী)

বৃন্দাবনে হৃষ্টমনে কোকিল-নিকর
করিতেছে কি মধুর কুহু কুহু স্বর।
শ্রীমতী অমনি তাহা বজ্রনাদ গণি,
"জৈমিনি জৈমিনি" নাম জপেন তখনি।
নীলোৎপল-মাল্য, যাহা মনোমুগ্ধকর,
কণ্ঠদেশে কিবা তাঁর শোভিছে সুন্দর!
কৃষ্ণসর্প ভাবিয়াই তারে মনে মনে,
"গরুড় গরুড়" নাম করেন বদনে!

যখন সীতা-বিরহ-কাতর রামচন্দ্র সেতু-বন্ধের ইচ্ছায় সমুদ্র-তীরে গমন করেন, তখন তিনি সূর্য্যদেবের অস্তগমন দেখিয়া ও ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া তপ্ত-হৃদয়ে সেতুবন্ধের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন :—

সমগ্রামাদিত্যপ্রিয়কমলিনীং ষট্পদহতাং
বিলোক্যান্তর্মোদাৎ মৃদু কুমুদবৃন্দং বিহসতি।
রবিঃ কৃষ্ণঃ পন্থা হৃতনববধূনাময়মহো
নিমজ্জন্নম্ভোধৌ কলয়তি করৈরুদ্ধৃতভরৈঃ॥

সূর্য্যদেব অস্তগামী হলেন এখন,
সুবিধা পাইয়া তাই মধুকর-গণ
তাঁহার পরম প্রিয়া পদ্মিনীর সনে
বিহার করিছে মহা আনন্দিত মনে।
হেন অপরূপ কাণ্ড করিয়া দর্শন,
মৃদু মৃদু হাসিতেছে কুমুদিনী-গণ!
অপরে হরণ করে পত্নীটী যাহার,
জলে ঝাঁপ দিয়া মরা উচিত তাহার,
ইহা বুঝাইয়া দিতে সূর্য্যদেব তাই,
ঊর্দ্ধদিকে আপনার কর তুলিয়াই,
মনের ঘৃণায় বড় হইয়া কাতর,
ধীরে ধীরে ডুবিছেন সমুদ্র ভিতর।

নিরুৎসাহ রামচন্দ্রকে সেতুবন্ধের আশা পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে সূর্য্যাস্তের কারণ বুঝাইয়া দিয়া, লক্ষ্মণ এই রূপে তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন :—

সমুদ্বিগ্নানস্মানতলজলপারপ্রতিবিধৌ
বিলোক্য ব্যামর্ষাৎ ঘনগতষনোর্ম্মিং বিদধতঃ
পয়োধের্গাম্ভীর্য্যং কিয়দিতি স আবেদনপরো
নিমজ্জন্নম্ভোধৌ কলয়তি করৈরুদ্ধৃতভরৈঃ॥

অতল-সমুদ্র-পারে করিতে গমন
চিন্তিত দেখিলা আমাদিগকে তপন।

সীতা-হরণের কথা জানিতে পারিয়া,
মনের আবেগ মনে আর না চাপিয়া,
সমুদ্র ধরিয়া শেষে তরঙ্গ ভীষণ
উর্দ্ধদিকে মেঘ পানে করিছে গমন।
অতল সাগর নয়, সতল সাগর,
অতি অল্প জল আছে ইহার ভিতর,
ইহা বুঝাইয়া দিতে 'থাই' দিয়া তাই
উর্দ্ধদিকে আপনার কর তুলিয়াই,
সাহস-প্রদানে সূর্য্য হইয়া তৎপর,
ধীরে ধীরে ডুবিছেন জলের ভিতর!

ব্রাহ্মণ-গণের প্রতি লক্ষ্মীর বিষদৃষ্টি কেন, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

আঘাতো ভৃগুণা কৃতো নিজপতেঃ পাদেন শৌরেরুর-
স্তম্ভোধিং কিল কুম্ভসম্ভবমুনিস্তাতং নিজং পীতবান্।
বিচ্ছিন্নচ্ছদনং গৃহং দ্বিজগণাঃ কুর্ব্বন্তিচ শ্রীফল-
মিত্থং ব্রাহ্মণদুর্নয়াদসদয়া তানেব পদ্মালয়া॥

যিনি মোর পতি হরি, যিনি মোর পতি হরি,
ভৃগু লাথি মারে তাঁর বুকের উপরি।
যিনি পিতা রত্নাকর, যিনি পিতা রত্নাকর,
অগস্ত্য পূরিল তাঁরে পেটের ভিতর।
মম শ্রীফলেতে বাস, মম শ্রীফলেতে বাস,
ব্রাহ্মণেরা তার পত্র ছেঁড়ে বারমাস।
দুর্ব্বিনীত বিপ্রগণ, দুর্ব্বিনীত বিপ্রগণ,
তাদের বাড়ীতে নাহি করি পদার্পণ!

গুণী ব্যক্তিই গুণীর গুণ বুঝিতে পারেন, কিন্তু অগুণী ব্যক্তি গুণীর গুণ বুঝিতে পারেন. ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

সংগৃহ্লাতি গুণী গুণং হি গুণিনো গৃহ্লাতি তং নাগুণী।
দূরারণ্যনিকেতনোঽপি মধুপো প্রাপ্যৈব তৎ পঙ্কজম্॥
তৎক্ষৌদ্রং পরিসেবতে হি নিতরামাকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতো।
ভেকস্তন্নিকটস্থিতোঽপি নিয়তং খ্যাদত্যহো কর্দ্দমম্॥

গুণীই গুণীর গুণ বুঝে বিলক্ষণ,
অগুণী গুণীর গুণ না বুঝে কখন।
দূরবন হইতেও ভ্রমর আসিয়া,
পদ্মিনীর মধু খায় আকণ্ঠ পূরিয়া!
কিন্তু কি আশ্চর্য্য হায় দেখ এ সংসারে,
নিকটে থেকেও ব্যাঙ্ কাদা খেয়ে মরে!

ধনবান্ দাতা হইলেই যাচকের প্রকৃত উপকার হয়; ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

পৃথিব্যামনেকো ধনেশো হি কিন্তু
প্রসিদ্ধং বদান্যং সমভ্যেতি ভিক্ষুঃ।
পয়োর্থী পতত্রী পয়োদাৎ কদাপি
পয়োধিং ন যাতি প্রপূর্ণং পয়োভিঃ॥

আছে বটে এ সংসারে ধনী অগণন,
তাহাদের মধ্যে কিন্তু দাতা কয়জন?
উদার স্বভাব যাঁর এসংসারে হয়,
ভিক্ষুগণ গিয়া লয় তাঁহারি আশ্রয়।
থাকুক্ প্রচুর জল সমুদ্র-ভিতরে,
চাতক ত্যজিয়া তারে মাগে জলধরে!

এসংসারে চারি প্রকার দুঃখী আছে। তন্মধ্যে কোন্ দুঃখীর দুঃখের মাত্রা কিরূপ, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে :—

দুঃখাতিদুঃখং নধনা হি যে বা।
ততোঽপি দুঃখং কৃপণস্য সেবা॥
ততোঽপি দুঃখং পরগেহবাসঃ।
ততোঽপি দুঃখং সুচিরপ্রবাসঃ॥

এসংসারে নাহি যার কিছুমাত্র ধন,
দুঃখী হইতেও দুঃখী নিশ্চয় সেজন।
তাহা হইতেও দুঃখী সেজন নিশ্চয়,
কৃপণের সেবা করি যার দেহক্ষয়।
তাহা হইতেও দুঃখী জানিও তাহারে,
যে জন পরের ঘরে নিত্য বাস করে।
তাহ'তেও দুঃখী আর আছে এক জন,
বিদেশে পড়িয়া যার কাটিল জীবন!

কোনও এক দরিদ্র কবি কিঞ্চিৎ পাইবার আশায় কোনও এক ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকট গমন করিয়া এবং তাঁহার সুমধুর বাক্য ও আচার ব্যবহারে প্রীত হইয়া আসিবার সময় অভীষ্ট-সিদ্ধি না হওয়াতে মনের দুঃখে এই শ্লোকটী বলিয়াছিলেনঃ—

ছায়য়া কতি ন তর্পিতা জনাঃ
সৌরভৈঃ কতি ন বাসিতা দিশঃ।
কো ভবন্তমপহাতুমীহতে
ক্ষুন্ন চেৎ দুগতি চন্দনদ্রুম॥

হে চন্দন! কি কহিব মহিমা তোমার,
ছায়া দিয়া ক্লান্ত জনে কর উপকার।
সুগন্ধের কথা তব বলিতে না পারি,
দশ দিক্ আমোদিত চিরদিন ধরি।
যদি না পেটের জ্বালা থাকিত সংসারে,
হে চন্দন! কোন্ জন ছাড়িত তোমারে?

পৃথিবীর পক্ষে মহাভার কি, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছেঃ—

যাচমানজনমানসবৃত্তেঃ
পূরণায় বত জন্ম ন যস্য।
তেন ভূমিরতিভারবতীয়ং
ন দ্রুমৈর্ন গিরিভি র্ন সমুদ্রৈঃ॥

যে জন মানব-জন্ম করিয়া গ্রহণ
যাচকের অভিলাষ না করে পূরণ,
সেই জন পৃথিবীর পক্ষে মহাভার,
সমুদ্র-পর্ব্বত-বৃক্ষে ভার কিবা তার?

কেতকী-বনে ভ্রমরকে কেলি করিতে দেখিয়া কবি আক্ষেপ সহকারে কহিতেছেন—

যৈর্মাকন্দবনে মনোজ্ঞপবনে সদ্যঃ স্খলন্মাধুরী
ধারাধোরণিধৌতধামনি ধরাধীশত্বমালম্বাতে
তেষাং নিত্যবিনোদিনাং সুকৃতিনাং মাধ্বী-
কপানং পুনঃ
কালঃ কিং ন করোতি কেতকি যতস্ত্বপি
কেলীস্থলী॥

ধন্য ধন্য ধন্য সেই ধন্য আম্রবন,
বহে যাহে মৃদু শীত সুগন্ধ পবন;
পরম-মাধুর্য্য-রস-প্রবাহে পড়িয়া
যে স্থান সর্ব্বদা রয় বিধৌত হইয়া;
সে স্থানে করিত কেলি যত সব অলি,
কেতকি! তাদের আজ তুমি লীলাস্থলী।
অঘটন-ঘটনাও ঘটে এ সংসারে,
রে কাল! মহিমা তোর কে বুঝিতে পারে?

"মুখের দোষ" বড়ই অসুখ-জনক। সর্পের দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই শ্লোকে এই নীতিশিক্ষা দিতেছেনঃ—

বাসঃ সার্দ্ধং মলয়জগণৈঃ কোমলস্পর্শমঙ্গং
ক্ষুন্নির্ব্বাহঃ প্রযতপবনৈ রত্নমাভাতি মৌলৌ।
তত্রাপ্যাশীবিষ ইতিজনৈস্ত্যজ্যতে নামমাত্রাৎ
কস্ত্যাজ্যোব্যো ন জগতি ভবেদাস্যদোষেণ দুষ্টঃ॥

চন্দনের সনে থাক দিবস-যামিনী,
কিবা সুকোমল আহা তব দেহখানি,
পরম পবিত্র বায়ু আহার তোমার,
মস্তকে ধরিয়া থাক মণি অনিবার,
কিন্তু "আশীবিষ" নাম শুনিলেই কাণে,
তোমারে ছাড়িয়া দেয় সবে মানে মানে।
যাহার মুখের দোষ রয় অতিশয়,
তাহারে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য কেবা নয়?

কোনও কবি এই শ্লোকে কলি-কালের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন :—

ধর্ম্মঃ প্রব্রজিতস্তপঃ প্রচলিতং সত্যঞ্চদূরে গতং
পৃথ্বী মন্দফলা নরাঃ কপটিনশ্চিত্তঞ্চ শাঠ্যার্জ্জিতম্।
রাজানোঽর্থপরা ন রক্ষণপরাঃ পুত্রাঃ পিতৃদ্বেষিণঃ
সাধুঃ সীদতি দুর্জ্জনঃ প্রভবতি প্রাপ্তে কলৌ দুর্যুগে॥

ধর্ম্ম পলায়েছে, নাই তপ জপ আর,
কোথায় গিয়াছে সত্য, খুজে মিলা ভার।
পৃথিবীতে ফল শস্য না জন্মে তেমন,
মানুষ হয়েছে শঠ, শাঠ্যে ভরা মন।
অর্থ শুষে লয় রাজা, পালন না করে,
পুত্রও বিদ্বেষ করে পিতার উপরে।
দুষ্ট হয় বলবান, শিষ্ট হীনবল,
কুযুগ কলিতে হায় ঘটে এসকল।

কোনও এক সুপণ্ডিত কবি কোনও এক ধনাঢ্য তৈলিক মহাশয়ের বাটীতে বিদায় আনিতে গিয়া, তত্রত্য পুরোহিত-অধ্যক্ষের নিকট অপমানিত হইয়া এই শ্লোকটী বলিয়াছিলেন :—

ঘণ্টাশঙ্খমুচাক্রবাদনপটুঃ শূদ্রাশ্রমেশার্চ্চনে
শ্রাদ্ধে সিক্তকুলার্দ্র...নগ্রহীকৃতো যোঽন্বহান
যস্তৈলাঢ্যন্দরকুক্ষিগহ্বরভরব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরো
ধিক্ তাঽধ্যক্ষতমং সুধীরবর মাং ধিক্ ধিক্ বিধানং বিধেঃ॥

শূদ্র-গৃহে পূজা হেতু গমন করিয়া,
কত রঙ্গ কর শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া;
যে কাণ্ড কর হে তুমি দুপুর বেলায়,
বর্ণনা করিতে তাহা নাহি পারা যায়।
ভিজা চা'লে ভিজে যায় তব বস্ত্রখানি,
শেষে জোরে গাঁট দাও, ওহে গুণমণি!
তৈলিক প্রভুর গৃহে বসিয়া আহারে,
ব্রহ্মাণ্ড পুরিয়া ফেল উদর ভিতরে।
তোমাকেও ধিক্, আর আমাকেও ধিক্,
পোড়া বিধিকেও দিই ধিক্ শতাধিক!

(ক্রমশঃ)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি,এ,

পূর্ণ বাবু সংস্কৃত শ্লোক অনুবাদে সিদ্ধ হস্ত। ধর্ম্মবিষয়ক গ্রন্থাদির এইরূপ প্রাঞ্জল পদ্য বঙ্গানুবাদ হইলে স্বদেশের ও মাতৃ ভাষার প্রভূত উপকার হয়।

সম্পাদক।

সে দেশ।*

(১)

ওগো, মোর সুখ-শান্তি-বাস—
পাতা তাঁর বুকের উপরে;
স্মৃতির সুবর্ণ ইতিহাস,
আছে আঁকা তার স্তরে স্তরে!

(২)

স্নেহ-সুতা প্রাণের বন্ধন—
হৃদি-নিধি শায়িত সেখানে;
অতিদূর—বহুদূর হ'তে
তাই প্রাণ টানে তার পানে!

(৩)

সে দেশের স্বর্ণাসনে বসি,
স্নেহের মাধুরী-মাখা 'হাসি,' (১)
মৃদু ডাকে—আয় আয় আয়,
'অনুরাগ' সুধা-গাথা গায়!

(৪)

প্রতিধ্বনি সবার প্রাণের
দেয় সাড়া করিলে আহ্বান;
বাণী তথা সুখ-তানে গায়!
শান্ত হৃদয়ের 'স্নেহ-গান'!

(৫)

মধুর আনন্দ-স্মৃতি, রাজিছে সে দেশে নিতি,
আহা! 'সহ-অনুভূতি' কতই সেখানে!
তাই প্রাণ তাঁর তরে, সতত বেদনা করে,
দৃঢ় আকর্ষণে সদা টানে তাঁর পানে!

---

* বিগত ২৫শে আশ্বিন—মহানবমীর দিন, গ্রেট্ ব্রিটেন্ ও আয়র্লণ্ডের রয়্যাল এসিয়্যাটিক্ সোসাইটীর অন্যতম সদস্য মাননীয় শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ জ্ঞানভূষণ মহাশয়ের জননী পরলোক গমন করিয়াছেন। "সে দেশ" তাঁহার মাতৃদেবীর স্বর্গারোহণে, তৎ কর্তৃক রচিত হইয়া, প্রকাশার্থ আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে।

সম্পাদক।

(১) আমার আনন্দময়ী জননী।

(৬)

সে দেশের বায়ু-স্তরে, স্নেহ-সুধা খেলা …;
সে সুধা বিতরে শান্তি সম-বেদনার!
সে দেশের প্রতি জীব, সদানন্দ যেন শিব,
স্নেহময় বন্ধু যেন সবাই আমার!

(৭)

সে সুধা-হ্রদের নীর, সেই মন্দাকিনী-তীর,
শ্যাম প্রান্তরের সেই লতা-গুল্ম যত,
হিরণ্ময় পাখীগুলি, সুকণ্ঠে অমিয়-বুলি,—
যত কিছু সব যেন 'চির পরিচিত'!

(৮)

সে দেশের শত্রুতায়, কভু ব্যথা না জাগায়,—
দয়া—সম-বেদনার ছায়া!
ওথাকার হৃদি-প্রাণ, নহে কঠিন পাষাণ,
গড়া যেন কোমলতা দিয়া!

(৯)

সে দেশের নর-নারী, মুছায় নয়ন-বারি,
মরতে কাঁদিলে কেহ,—আহা! কি 'বেদন'!
শান্তি দেয় ছিন্ন প্রাণে— ভগ্ন হৃদে, স্নেহ-গানে,—
'আকুল সোহাগে' করে মধুর চুম্বন!

(১০)

সৈকত-প্রান্তরময়, আহা! দিব্য জ্যোতির্ম্ময়
'স্নেহ-হৃদয়ের অণু' আছে মিশাইয়া;
কত স্নেহ-ভালবাসা, কত সুখ-শান্তি-আশা,
সে দেশের কেন্দ্র-গর্ব্ভে আছে লুকাইয়া!

(১১)

সেই শান্তি-কেন্দ্র কাছে, আমার "নলিনী" (২) আছে!
সোদর "ধীরেনে" (৩) স্নেহে হৃদয়ে ধরিয়া!
পরার্দ্ধ যোজন হ'তে, তাই সে দেশের পথে,
ছুটে প্রাণ, ভগ্ন হৃদি জুড়াবে বলিয়া!

(২) জ্যেষ্ঠা কন্যা। (৩) একমাত্র বংশধর।

(১২)

সে দেশে মাধুর্য্যময়, শান্তির কোমলাশ্রয়,—
জ্যোতির্ম্ময় আছে এক 'হীরক-মন্দির' ; (৪)
'দয়া' তথা মূর্ত্তিমতী, সুষুপ্তি সুখের অতি,
সে দেশের 'আনন্দাশ্রু' বড়ই গম্ভীর !

(১৩)

নন্দনের চিরস্নেহময়,—
বহে তথা মন্থর মলয় ;
ফুটে ফুল সুবাস-লহরী,
গুন্ গুন্ গায় মধুকরী ;
'সরলতা' মূর্ত্তিমতী হ'য়ে—
বিরাজিত সে শান্তি-আলয়ে ;
একখানি 'অমৃত প্রতিমা,' (৫)
দয়া-স্নেহে বিশ্ব-নিরুপমা,
অই ডাকে স্নেহের আবেশে,
তাই প্রাণ ছুটে সেই দেশে !
আনন্দ-আহ্বান আহা তাঁর,—
শ্রুতিমূলে পশে বার বার ;
তাই প্রাণ টানে সেই দেশে !—
যাই তথা উদাসীন-বেশে !!

(১৪)

মাগো !
তুমি আছ যথা, সে কি 'সদানন্দ ধাম' ?
সকলেরি বুকে মাখা আনন্দ-আরাম !
তুমি আছ যথা, সে কি 'নন্দন কানন' ?
অমৃত-পরাগ-গন্ধে, ভরে প্রাণ-মন !
তুমি আছ যথা, সে কি 'সত্য-শান্তি-পুর' ?
নিষ্কাম-বৈরাগ্য-ব্রতে প্রাণ ভোরপুর !
তুমি আছ যথা, সেকি 'অমর-আলয়' ?
নরও কি অমর হ'য়ে সেইখানে রয় ?
তুমি আছ যথা, সেকি কুহকের ঠাঁই ?

(৪) মাতৃ-নিকেতন। (৫) মা—আমার।

সেথা কি মরত-স্মৃতি কোন কিছু নাই ?
তুমি আছ যথা, সেকি 'চিরসুখময়' ?
টানে প্রাণ তোমা পানে, মরণে কি ভয় !!

মাগো !

ঢালিলে এ প্রাণে কেন এত স্নেহরাশি,—
দয়া পরকাশি ?
এত বেশী স্নেহ ফেলি, কেন গেলে চলি,'—
করি' হৃদি খালি ?
তোমারি মধুর স্নেহ পুনঃ কি কারণে,—
জাগে এ পরাণে ?
পরাণে তোমারি 'স্মৃতি' জাগে নিরন্তর,—
'স্নেহপূর্ণ স্বর' :
অলক্ষ্যে বিজনে বসি, স্মরি তব নাম,—
যাক্ এ পরাণ !
যে দেশে গিয়াছ মাগো, 'আনন্দ' তথায়,—
দিগন্ত ভাসায় ?
যে যায় সে নাহি ফিরে কোন প্রলোভনে,—
ত্যজি' স্নেহ-ধামে ?
এত কি অমৃত-ভরা সেই দেব-দেশ,
নাহি দুঃখলেশ ?
নাহি সেথা জরা-মৃত্যু-শোক-অশ্রুধার,
নাহি হাহাকার ?
তুচ্ছ এ 'জীবন', হায় 'নিষ্ঠুর সংসার',—
সেই-মাত্র সার !
বুঝিয়াছি, তাই প্রাণ উদাস ব্যথায়,—
সেথা যেতে চায় !
পারিনা খেলিতে আর—ক্লান্ত-দেহ-ভার,—
বিশ্ব যে আঁধার !
একা যদি আসিয়াছি, যাব যদি একা,—
কেন দিলে দেখা ?
পথ যে জানিনা মাগো, ডাক একবার,—
মিনতি আমার !

আঁধার ধরণী, জ্যোতিঃ দেখাও জননি,
যাইব এখনি,
পরিহরি' 'কারাগার', আনন্দ-নগরে,—
চির শান্তিতরে!
তোমারি অমৃত-কোলে করিব শয়ন!!
সেই শুভক্ষণ-
প্রতীক্ষায় প্রতিক্ষণ ব্যাকুল জীবন,—
নমি মা চরণ,!!!

শ্রীঅম্বিকাচরণ দাস।
(শ্যামবাজার, কলিকাতা।)

বৈজ্ঞানিকগণের মত।

রোগসম্বন্ধে—

ভারতবর্ষে জ্বর বিকার রোগে আজকাল অধিক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ম্যালেরিয়ার কারণ স্রোতহীন মলিন জলে উৎপন্ন মশক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। বিকার (enteric typhus and typhoid fever) সম্বন্ধে ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য-বিভাগের প্রধান ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন সাহেব ১৯০১ সালের বার্ষিক সমালোচনা প্রসঙ্গে (৬ হইতে ১৭ পৃষ্ঠা) বলেন যে, পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন চতুর্দ্দশটী দেশের বিকাররোগগ্রস্ত প্রায় ৭০০ রোগীর ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, শতকরা ৭০টী রোগের উৎপত্তি জল হইতে এবং ১৭টী দুগ্ধ হইতে। অবশিষ্ট অন্যান্য কারণে। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত যে, এই রোগ নিবারণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে জল ও তৎপরে দুগ্ধের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সুডার করফিল্ড (Schuder Corfield) প্রভৃতি ইউরোপের বড় বড় ডাক্তারগণ জলের সহিত অবস্থিত এই রোগবীজের সংক্রমণ-ক্ষমতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ-সংগ্রহ করিয়াছেন। ডাক্তারদিগের মতে এক দুইটী বিকার-বীজাণু এক গ্লাস জলের সহিত পান করিলে, সাধারণ স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তির কিছু না হইতে পারে, কিন্তু জলে ধৌত দুগ্ধভাণ্ডের মধ্যে যদি ২।১ টী বীজাণু থাকে, এবং উহাতে দুগ্ধ রাখা যায়, তাহা হইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঐ রোগ-বীজ ঐ দুগ্ধে প্রভূত বিস্তার লাভ করে এবং প্রাণ-নাশক হইয়া উঠে। দুগ্ধ বীজাণুকে সম্যক্‌রূপে পোষণ করে এবং অনেক বাটীতে একব্যক্তি দুধ দেওয়ায়, সংক্রমণ অধিক হইয়া থাকে। সাধারণভাবে

জাল-দেওয়া দুগ্ধে তিন মাস বিকারবীজাণু সজীব থাকিতে পারে।

ভাল জল ব্যবহার করিলেও এই রোগ হইতে ত্রাণ নাই। মল-দূষিত ধূলিরাশি রোগের আর একটী কারণ। পৃথিবীর উপরিস্থ মৃত্তিকা যাহাতে সঞ্চিত মলে দূষিত না হয়, তাহার সুব্যবস্থা আবশ্যক; পয়ঃপ্রণালীর সংস্কার এজন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। স্যুডার (schuder) দেখিয়াছেন যে, যে সকল সৈন্য নিজ পাদুকা নিজে পরিষ্কার করে ও যে সকল শ্রমজীবী হস্তপ্রক্ষালন না করিয়া ধূলি-মলিন হস্তেই আহার করে, তাহাদের মধ্যে ঐ রোগ-সংখ্যা স্পষ্টতঃ অধিক। এই বীজাণু কিন্তু কর্ষিত জমীর উপর পচনক্রিয়াবিধায়ক বীজাণুকর্তৃক শীঘ্রই নিধনপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশ্বস্রষ্টার এই আশ্চর্য্য নিয়ম সম্বন্ধে যতই পর্য্যালোচনা করা যায়, ততই বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। মিউনিসিপালিটী প্রভৃতিতে যে নিয়মানুসারে অগভীর খাদে বিষ্ঠাদি প্রোথিত করা হয়, উহা প্রকৃতির অনুকূল। রাস্তায় জল দেওয়ার প্রথাও পরোক্ষভাবে স্বাস্থ্যকর। দূষিতধূলি জলসিক্ত না হইলে, উড়িয়া অনাবৃত দুগ্ধাধারে পড়িলে, বিষময় ফল উৎপাদন করিতেপারে। অন্যান্য খাদ্যাদিও দোকানে খোলা না রাখিয়া, কাচের বাক্সে বা আলমারিতে রাখিলে ভাল হয়।

মাছিগুলিও রোগের একটী কারণ। তাহারা কোথায় বসে, বিচরণ করে, বা আহার করে, তাহার ঠিকানা নাই। রন্ধন-গৃহের অদূরে যাঁহারা (সহরে স্থান-সংক্ষেপ বশতঃ) পাইখানা নির্ম্মাণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সাবধান হইবেন।

ইউরোপের বড় বড় ডাক্তার, ডাক্তার-দিগের পরিচ্ছদকে বিপদের একটী কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রোগীর পরিচ্ছদও ঐরূপ।

অল্পস্থানে একত্র সুস্থ অসুস্থ অনেক ব্যক্তির বাস রোগোৎপত্তি সম্বন্ধে পরিচ্ছদ হইতে এক সোপান মাত্র ব্যবধানস্থ। রোগ-বীজ মনোনীত করিবার ব্যক্তিও অনেক-গুলি পায়; তাহাকে বেশী দূর যাইতেও হয়না। দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে ইহার প্রমাণ হইয়াছে।

এই সকল হইতে দেখা যায় যে, জল, বাতাস ও মৃত্তিকা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, পরিধেয় বসন, জনসঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া আবশ্যক; নতুবা বিকারের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া দুরূহ। সার-কথা, সর্ব্ব বিষয়ে শুচি হওয়া আবশ্যক। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণা-লব্ধ ফল-রূপে নূতনভাবে আবার সেই পুরাতন ঋষিগণের প্রাচীন প্রথা শৌচাচার-বিধান দেখা দিল।

শ্রীশরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত, বিএ।

বিষ্ণুপদ।

সর্ব্ব কার্য্যের প্রথমে আচমন। আচমন-পূর্ব্বক সকল কার্য্য করিতে হয়। আচমনের মন্ত্রে একটা কথা মনে করাইয়া দেয়, সেটী বিষ্ণুপদ। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" এই অংশটুকু যেন কি একটা মহতী ধারণার প্রতি চিত্তকে প্রবৃত্ত করিতে চায়। প্রথমতঃ

মনে নানা জল্প-বিকল্প-সঙ্কুল চিন্তাতরঙ্গ সমুপস্থিত হয়, পরে অনুসন্ধিৎসা এবং উৎকণ্ঠার প্রবল তাড়নায় অধীর হইয়া, সুবিধামত যে কোনও স্থানে তাহার পর্য্যবসান হয়; কিন্তু কেমন যেন একটু সুগভীরতত্ত্ব ইহার অভ্যন্তরে রহিয়া গেল বলিয়া একরূপ অতৃপ্তি থাকিয়া যায়, তাহার পারদর্শন সুসম্ভব হয় না। বিষ্ণু পুরাণে যে বিষ্ণুপদের আলোচনা আছে, উহাকে আভাস বা ইঙ্গিত স্বরূপ মনে করিয়া একদা উহার তত্ত্বানুসন্ধান করা হয়। সন্দেহের নিরসন সম্ভাবিত কি না, তাহা অনালোচ্য, তবে বিষ্ণুপুরাণের সেই কথাগুলি বর্ত্তমান প্রবন্ধে পাঠকদিগের নিকট উপস্থিত করাই এ উদ্যমের উদ্দেশ্য। বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশের অষ্টম অধ্যায়ের ত্রিনবতিতম শ্লোক হইতে পরবর্ত্তী কতকগুলি শ্লোকে বিষ্ণুপদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এই অষ্টম অধ্যায়ে জ্যোতিশ্চক্র বর্ণনা করা হইয়াছে। ঐ অধ্যায়ের বক্তা পরাশর মহর্ষি বলিতেছেন,—

"ঊর্দ্ধোত্তরমৃষিভ্যস্তু ধ্রুবো যত্র ব্যবস্থিতঃ।
এতদ্বিষ্ণুপদং দিব্যং তৃতীয়ং ব্যোম্নিভস্বরং॥"

এই শ্লোকের অর্থ আকাশমার্গস্থ সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঊর্দ্ধে এবং উত্তর দিকে যেখানে ধ্রুব অবস্থিতি করিতেছে, সেই দিব্য ভাস্বর তৃতীয় স্থানের নাম বিষ্ণুপদ। ব্যাখ্যাকার সুপ্রসিদ্ধ শ্রীধর স্বামীর উক্তি "বিষ্ণুপদ স্থিতিমাহ যাবৎ সমাপ্তি। ঊর্দ্ধং তদুপরি উত্তরং চ। সপ্তর্ষিভ্য উপরি যত্র ধ্রুবস্তিষ্ঠতি তদ্ ধ্রুবস্যাশ্রয়ভূতং বিষ্ণুপদাখ্যং ভূম্যপেক্ষয়া দিব্যং তৃতীয়ং স্থানমিত্যর্থঃ। তদ্ধি বৈরাজস্য হৃদয়নাড়ীস্থানং অতঃ তদন্তর্য্যামিণো বিষ্ণোঃ স্থানং।" ধ্রুবের আশ্রয়ভূত স্থান বিষ্ণুপদ। বৈরাজের হৃদয়নাড়ীস্থান, এইজন্য তদন্তর্য্যামী বিষ্ণুর স্থান। শ্রীধর স্বামীর কথায় বুঝিলাম, ধ্রুব বিষ্ণুপদ আশ্রয় করিয়া আছে। ধ্রুব নক্ষত্র বোধ হয় সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। উত্তর মুখে দাঁড়াইয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে, সপ্তর্ষির অনতিদূরে ধ্রুব অবস্থিত। ধ্রুব অচল বলিয়া প্রতীত হয়। পৃথিবীর উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু একটা কাল্পনিক রেখা দ্বারা সংযুক্ত করিয়া দিয়া, ঐ রেখাকে উত্তর দিকে বর্দ্ধিত করিলে, ভচক্রের যে স্থানে উপনীত হইবে, তথায়ই ধ্রুব নক্ষত্র অবস্থিত আছে। ধ্রুব অনবরত চলিলেও, পৃথিবীর লোক ধ্রুবকে অচলই দেখিতে বাধ্য। সপ্তর্ষিমণ্ডল ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। শিশুমারচক্রের পুচ্ছস্থান ধ্রুব। শিশুমারচক্র আমরা সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল দেখিতে পাই, কিন্তু ধ্রুব স্থির দেখি। শিশুমারের পুচ্ছটী যেন ধ্রুবের গায়ে বাঁধা রহিয়াছে। ধ্রুব নিশ্চল, কিন্তু শিশুমার ঘুরিতেছে। বিষ্ণুপুরাণে দ্বিতীয়াংশের নবমাধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে দেখি "তারাময়ং ভগবতঃ শিশুমারাকৃতি প্রভোঃ। দিবিরূপং হরের্যস্ত তস্য পুচ্ছে স্থিতো ধ্রুবঃ।" আকাশে হরির যে তারকাময় শিশুমার আকৃতি আছে, ধ্রুব তাহার পুচ্ছদেশে রহিয়াছে। এই ধ্রুব বিষ্ণুপদ আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান। 'ধ্রুব' বলিলে, যদিও আমরা এই উত্তরস্থ ধ্রুবকেই বুঝিতে পারি, না, তথাপি এখানে এই উত্তর ধ্রুবই লক্ষ্য। 'ধ্রুব' বলিলে, জ্যোতিষশাস্ত্রে দুটী নক্ষত্র বুঝে,—

একটী উত্তরে, অন্যটী দক্ষিণে। পূর্ব্বোক্ত রেখা কুমেরুর দক্ষিণে প্রবর্দ্ধিত করিলে, ভচক্রের যেস্থানে স্পর্শ করে, সেখানেও ধ্রুব আছে, তাহার নাম যাম্যধ্রুব। ভারতবর্ষ হইতে যাম্যধ্রুব চক্ষুগোচর হইতে পারে না, এইজন্যই বোধ হয় জ্যোতির্বিদ্যাবিৎ পরাশরও ধ্রুব নামে উত্তরধ্রুবকেই নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারিয়াছেন। নিরক্ষরেখার উপর অথবা তাহার দক্ষিণ দিকে দাঁড়াইলে, যাম্যধ্রুব দেখা যাইতে পারে, ঐ রেখা লঙ্কারও দক্ষিণ দিক দিয়া গিয়াছে। ধ্রুবকে চিনিলে বিষ্ণুপদও চেনা হইল। শ্রীমদ্‌ভাগবতে দেখিতে পাই, ধ্রুব স্থানকামনায় তপস্যা করিয়াছিল। যথা ধ্রুবোক্তি "স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং।" ভগবান্ ধ্রুবকে স্থান দিয়াছেন। স্থানের মহিমাও ভাগবতে দৃষ্ট হয়। সপ্তর্ষির মাথার উপরে স্থান, বড় সৌভাগ্য। উত্তানপাদ রাজার পুত্ররূপে ধ্রুব পুরাণে বর্ণিত, সেই ধ্রুবই আকাশে। প্রজাপতির আরাধনা করিয়া ধ্রুব আকাশে ঐ দিব্য স্থান পাইয়াছেন, ইহা বিষ্ণুপুরাণে আছে, :যথা,—"উত্তানপাদপুত্রস্তু তমারাধ্য প্রজাপতিং স তারাশিশুমারস্য ধ্রুবঃ পুচ্ছে ব্যবস্থিতঃ।" বিষ্ণুপদের বর্ণনা যেরূপ পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, ধ্রুব দ্বারা সেস্থান এতক্ষণে চিনিয়া লওয়া গেল। অতঃপর দেখা যাউক, শাস্ত্র এ বিষ্ণুপদের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন কি না? ঐ অষ্টম অধ্যায়ের ৯৪ তম শ্লোকে দেখা যায় "নির্ধূতদোষপঙ্কানাং যতীনাং সংযতাত্মনাং। স্থানং তৎ পরমং-বিপ্র! পুণ্যপাপপরিক্ষয়ে॥" শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, যে সমস্ত সংযতাত্মা যতীদিগের সমস্তদোষক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, পাপ-পুণ্যের অবসান হইয়াছে, এই পবিত্র স্থান তাঁহাদের। পরবর্ত্তী শ্লোকে দেখা যাইতেছে যে, পাপপুণ্য বিগমে, দুঃখকারণ তিরোহিত হইলে, যেখানে গমন করিয়া শোক প্রাপ্ত হয় না, তাহাই ঐ বিষ্ণুর পরমপদ।* বিষ্ণুর পরম-পদের ব্যাখ্যার্থ আর কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে

ধর্ম্মধ্রুবাদ্যাস্তিষ্ঠন্তি যত্রতে লোকসাক্ষিণঃ।
তৎ সাষ্ট্যোৎপন্নযোগেদ্ধা স্তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং॥
যত্রোতমেতৎ প্রোতঞ্চ যদ্ভূতং সচরাচরং।
ভব্যঞ্চ বিশ্বং মৈত্রেয়! তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।
দিবীব চক্ষুরাততম্ যোগিনাং তন্ময়াত্মনাং।
বিবেকজ্ঞানদৃষ্টঞ্চ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥
যস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতো ভাস্বান্ মেধীভূত স্বয়ং ধ্রুবঃ।
ধ্রুবেচ সর্ব্বজ্যোতীংষি জ্যোতিষ্যম্ভোমুচো দ্বিজ॥

এই সকল শ্লোকের তাৎপর্য্য যথা,—বিষ্ণুর সহিত সমান ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদি-বশীকার আছে বলিয়া যে সমাধি লাভ হয়, তদ্দ্বারা দীপ্ত ধর্ম্ম ও ধ্রুবাদি যেখানে অবস্থিতি করিতেছেন, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ।

* অপুণ্যপুণ্যোপরমে ক্ষীণাশেষার্ত্তিহেতবঃ। যত্র গত্বা ন শোচন্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং॥

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সমস্ত জগৎ যাহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে, তাহাই বিষ্ণুর পরম পদ। যাহা দ্যুলোকে [আকাশে অথবা স্বর্গে] বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় তন্ময়ান্তঃকরণ যোগিগণের বিবেকদৃষ্টির বিষয়, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। শ্রীধরস্বামী টীকায় "চক্ষু" কথার অর্থে—"সর্ব্বপ্রকাশং সূর্য্যরূপং চক্ষুরিব" লিখিয়াছেন। যেখানে ধ্রুব স্বয়ং মেধীভূত হইয়া রহিয়াছে, এবং জ্যোতিষ্ক সকল ধ্রুবকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ও মেঘগণ তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়াছে, তাহাই বিষ্ণুর পরমপদ। সাধারণতঃ যাহাকে আমরা "মেইকাঠ" বলি, তাহাই মেধি। যাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে হয়, তাহাই মেধি। জ্যোতিষ্কগণ ধ্রুবকে আশ্রয় করিয়া আছে। সপ্তর্ষি প্রভৃতি ধ্রুবের চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ করে, শিশুমারও ধ্রুবকে প্রদক্ষিণ করিয়া ভ্রমণ করে। ধ্রুব জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আশ্রয়, ধ্রুবের আশ্রয় বিষ্ণুপদ। বিষ্ণুপুরাণে আবার দেখা যায় "শিশুমারাকৃতি প্রোক্তং যদ্রূপং জ্যোতিষাং দিবি। নারায়ণঃ পরং ধাম্না তস্যাধারঃ স্বয়ং হৃদি।" ইহার অর্থ—আকাশে শিশুমারের ন্যায় যে তারাময় আকৃতি আছে, তাহার হৃদয়ে পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন স্বয়ং নারায়ণ তাহার আধাররূপে বিরাজ করিতেছেন। এখন বুঝা গেল, শিশুমারের হৃদয়ে স্বয়ং নারায়ণ, শিশুমারের পুচ্ছে ধ্রুব। এরূপ হইলে, ধ্রুব যে পুচ্ছে থাকিয়া হৃদয়স্থবিষ্ণুর চরণে স্থান পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ কি? পাঠক মহোদয়গণ! ঐ দেখুন, আপনাদের উগ্র-সাধক ধ্রুব—ভক্তির সম্রাট ধ্রুব বিষ্ণুপদে স্থান লাভ করিয়া, উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইয়া, আপনাদের দিকে চাহিয়া, কত কি ধর্ম্মমাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিতেছেন! যোগেন্দ্র-মুনীন্দ্র-নাগেন্দ্র-নরেন্দ্র সকলেরই আরাধনার ধন, আশার অবলম্বন—যেখানে গেলে জ্বালামালার অবসান হইবে, আপন আনন্দে আপনি ভাসিতে হইবে, আপনি হাসিতে হইবে, সেই পরম প্রিয়তম বিষ্ণুপদ ঐ দেখুন। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" রবে বেদ যাহার উল্লেখ করিতেছে, সেই পবিত্র বিষ্ণুপদ পৌরাণিক জ্যোতির্বিৎ পরাশর মৈত্রেয়ের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেই প্রস্তাবই বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশের অষ্টম নবম অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে। স্বধর্ম্মানুরাগিহিন্দুমহোদয়গণ! পরাশরের কাছে বিষ্ণুপদের ব্যাখ্যা শুনিলেন, সময়ে আবার বিষ্ণুপদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনিতে পাইবেন, আশা করি। অদ্য এই স্থানে বিশ্রাম।

তীর্থপদাশ্রিতস্য—
শাস্ত্র-সেবিনঃ কস্যচিৎ—
[যশোহর, বেদবিদ্যালয়।]

গৃহস্থের সদাচার।

(বিষ্ণুপুরাণ)

সগর নামক নরপতি ঔর্ব্ব মহর্ষির নিকট, "গৃহস্থের সদাচার কিরূপ?" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, ঔর্ব্ব মহাশয় গৃহস্থের সদাচার ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশের একাদশাদি অধ্যায়ে এই ঔর্ব্ব-সগর-সংবাদ উক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই গার্হস্থ্য আশ্রমের সেবায় নিরত; বস্তুতঃ গৃহস্থের সংখ্যার আতিশয্য অত্যন্ত আবশ্যকীয়। অন্যআশ্রমবাসিগণ একমাত্র গৃহস্থের সহানুভূতিতে জীবন নিরাপদ বিবেচনা করিয়া স্বাশ্রমোচিত ধর্ম্মযাজনে অগ্রসর হইতে পারে। যোগোপনিষদে শ্রীভগবান্ ব্যাসদেব বলিয়াছেন "মাতুস্তন্যং যথা পীত্বা সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ। তদ্বদ্ গৃহিণমাশ্রিত্য স্বাশ্রমাস্ত্রয় এবতে।" জীবগণ যেমন মাতৃস্তন্য পান করিয়া জীবন ধারণ করে, সেইরূপ গৃহস্থাশ্রমের সহায়তায় অন্যআশ্রমত্রয় জীবিত থাকে। গৃহস্থ আশ্রয়, অপরআশ্রমী আশ্রিত; গৃহস্থ দাতা, অন্যআশ্রমী গ্রহণকর্ত্তা; গৃহস্থ প্রতিপালক, অপর প্রতিপাল্য। এই জন্য গৃহস্থাশ্রমের অত্যধিক প্রশংসা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এই গৃহস্থাশ্রমের পবিত্রতা কেবল সদাচার লইয়া। অন্য আশ্রমের তপ-উপাসনাদি অত্যন্তকৃচ্ছ্রসাধ্য বটে, কিন্তু গৃহস্থের সদাচারও অনন্তকর্ম্মময়। এই গার্হস্থ্যধর্ম্মের সদাচার জানিবার জন্য সকলেরই আকাঙ্ক্ষা হয়, সেই জন্য আমরা ঔর্ব্বমহর্ষি কথিত সদাচারগুলি এখানে উদ্ধৃত করিব।

ঔর্ব্ব বলিতেছেন,

শ্রূয়তাং পৃথিবীপাল! সদাচারস্য লক্ষণং। সদাচারবতা পুংসা জিতৌ লোকৌ উভৌ অপি ॥১॥

বঙ্গব্যাখ্যা। হে রাজন্! সদাচারের লক্ষণ শ্রবণ করুন্। সদাচারশীল ব্যক্তি ইহলোক এবং পরলোক, উভয়ই জয় করিয়াছেন। ১

সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ। তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে ॥২॥

বঙ্গব্যাখ্যা। যাঁহাদের দোষ ক্ষীণ হইয়াছে, তাঁহারা সাধু। সৎ শব্দ (সৎ+আচার =সদাচার, এইখানকার সৎশব্দ) সাধু বুঝায়; সেই ক্ষীণদোষ সাধুগণের যে আচরণ, তাহাই সদাচার নাম ধারণ করে। ২

সপ্তর্ষয়োঽথ মনবঃ প্রজানাং পতয়স্তথা। সদাচারস্য বক্তারঃ কর্ত্তারশ্চ মহীপতে ॥৩॥

বঙ্গব্যাখ্যা। হে ভূপ! সপ্তর্ষি, মনুগণ ও প্রজাপতিগণ সদাচারের পুরাতন বক্তা। তাঁহারা শুধু বক্তা নহেন, সদাচারের কর্ত্তাও। ৩

ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে সুস্থে চ মানসে মতিমান্ নৃপ। বিবুদ্ধশ্চিন্তয়েৎ-ধর্ম্মং অর্থঞ্চাস্যাবিরোধিনং ॥৪॥

বঙ্গব্যাখ্যা। ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তসময়ে জাগরিত হইয়া, মতিমান্ ব্যক্তি সুস্থচিত্তে ধর্ম্ম চিন্তা করিবেন এবং ধর্ম্মের অবিরোধী অর্থের চিন্তাও করিবেন। ধর্ম্মবিরুদ্ধ অর্থের চিন্তা কখনও করিবেন না। ৪

[ক্রমশঃ]

কস্যচিৎ দীনস্য।
যশোহর।
বেদ বিদ্যালয়।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১০ম বর্ষ, ১০ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা। | শ্রাবণ। | ১৩১০ সাল, ১৮২৫ শকাব্দা।

জাতিভেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

২। সঙ্করবর্ণ।

যখন প্রথমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি হয়, তখন আর কোন জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল না। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে, সেই সমসাময়িক গ্রন্থসমূহে সে কথার উল্লেখ থাকিত। সঙ্করবর্ণের উৎপত্তির কথা মনুসংহিতাতেই বিস্তৃতরূপে লিখিত রহিয়াছে। এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ সাহেব বলেন, যখন শিল্পীদিগের বিভাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতি স্বরূপ গণ্য করা হয় নাই, তখন ইহাই অনুমিত হইতেছে যে, জাতিভেদপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার সময় ভারতে শিল্পের উন্নতি কিছু মাত্র ছিল না।*

ইহা অবশ্য সত্য যে, ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য জাতির উৎপত্তি হয় নাই। সমাজের এবং মানুষের আবশ্যকতা অনুসারেই তাহাদিগের উৎপত্তি হইয়াছে।

যখন আর্য্যদিগের রাজ্য সমগ্র আর্য্যভূমি ছাইয়া ফেলিল—যখন আর্য্যসমাজই বলিতে গেলে ভারতের সমাজ ছিল, রাজ্যের সেই বিস্তৃতির দিনে—সমাজের সেই উন্নত অবস্থায় চিকিৎসক, নরসুন্দর, রজক, কুম্ভকার প্রভৃতি নানা ব্যবসায়ী লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল। এ সকল না থাকিলে, একটী সুভ্যসমাজ চলিতেই পারে না। তাই কর্ম্মাধীন আর্য্য ও অনার্য্য এবং মিশ্রবংশজ ব্যক্তিগণ সেই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া, বহু সংখ্যক বর্ণ বৃদ্ধি করিয়াগিয়াছে। স্মৃতি ও পুরাণকার ইহাদিগকে সঙ্করবর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

* "Elphinstone's History of India"—20

মনুসংহিতার—

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।
নিষাদঃ শূদ্রকন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে॥"

প্রভৃতি শ্লোক হইতে—

"যথৈব শূদ্রো ব্রাহ্মণ্যাং—বাহ্যং জন্তুং—প্রসূয়তে।
তথা বাহ্যতরং বাহ্য শ্চাতুর্ব্বর্ণ্যে প্রসূয়তে॥"

পর্য্যন্ত এবং যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায়—

"বিপ্রান্ মূর্দ্ধাবসিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্।

প্রভৃতি হইতে—

"ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যং পূর্ব্ববচ্চাধরোত্তরম্॥

পর্য্যন্ত এবং উশনা সংহিতার—

"অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি জাতিবৃত্তি বিধানকম্"

প্রভৃতি হইতে—

"বেদশাস্ত্রাবলম্বাস্তে ভবিষ্যন্তি কলৌযুগে।"

পর্য্যন্ত শ্লোক সমূহেই আমরা সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি দেখিতে পাই।

ইহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় বলিতেছেন।*

"চাতুর্ব্বর্ণ্যের বিধিনিষেধাদি সমাজ গঠনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবর্ত্তিত হইল বটে; কিন্তু অনুলোমবর্ণ সঙ্করদিগকে লইয়া সমাজে গোলযোগ বাধিল; তাহাদের মধ্যে কেহ পিতার ধর্ম্ম, কেহ মাতার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া চলিতে চাহিল; অথচ বিশুদ্ধ দ্বিজাতিগণ তাঁহাদিগকে প্রকৃষ্ট অধিকার দিতে ও প্রকৃষ্ট জাতি বলিয়া সমাজে গ্রহণ করিতে সহজে সম্মত হইলেন না। কাজেই একটা সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। সমাজরক্ষক ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ সঙ্করগণের মাতৃজাতিত্ব স্বীকার করিলেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও ঘোষণা করিলেন যে, যাহারা সদাচার অবলম্বন করিয়া উৎকৃষ্ট জাতিতে কন্যাদান করিতে থাকিবে, তাহারা পাঁচ ছয় পুরুষ পরে ক্রমশঃ উৎকৃষ্টজাতি বলিয়া গণ্য হইবে। * এইরূপে কত হীনবর্ণ উচ্চবর্ণে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, কত শূদ্রধর্ম্মা জাতি ক্রমশঃ বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, এমনকি ব্রাহ্মণ বর্ণের সহিত সম্মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যের মিতাক্ষরায় তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এখনও বোধ হয়, সেই কারণে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই উচ্চকুলে কন্যাসম্প্রদান আদরণীয় ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছে।"

"এক দিকে যেমন উচ্চগতি, অপর দিকে সেই রূপ দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থাভেদে অধোগতি ঘটিতেছিল। তাহারই ফলে বহুতর অনুলোম ও প্রতিলোম বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইতে লাগিল।"*

"One of the Rigvedic Rishis solemnly prays to Pushan to protect him on his journey and provide him with a supply of fair damsels.† Vyasa, than whose name there is none more venerable in Sanskrit literature, and many of the heroes of the Mahabharata

* "জাত্যুৎকর্ষঃ যুগে জ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেঽপিবা।
ব্যত্যয়ে কর্ম্মণাং সাম্যং পূর্ব্ববচ্চাধরোত্তরম্।"
যাজ্ঞবল্ক্য ১।৯৬

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস।

† ঋগ্বেদ ৯।৬৭।১০।

[Dhritarashtra, Pandu, Yudhishthir, Bhima, Arjuna, Drona, Karna etc. some god or other was the father of every one of these warriors] are represented as not having been born in wedlock. The traditions regarding them, and such legends as these of Dirghatamas and his mother Mamata* and of Svetaketu, son of Uddalaka, and his mather † when divested of their poetical and supernatural elements, testify to a looseness of sexual morals quite unknown in later times."¶

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেই সেকালের লোকের চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা জনা যাইবে। মহাভারতের পরবর্ত্তী সময়েও এরূপ উদাহরণ বিরল নহে।

সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি হওয়ার পর, "সমাজের প্রয়োজনানুসারে প্রত্যেক সঙ্করজাতির পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্ম কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইল। ধর্ম্ম-নির্দ্দেশ অনুসারেই তাহারা স্ব স্ব শ্রেণীর লোক লইয়া এক একটী পৃথক্ সমাজের সৃষ্টি করিল; ভিন্নসমাজভুক্ত হইলে, তাহারা এক একটী বিভিন্ন জাতি বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল।" §

৩। অন্তর্জ্জাতি।

অধুনা আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিতর আবার অনেক অন্তর্জ্জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে এমন ছিলনা। কিরূপে যে এই সকল স্বতন্ত্র অন্তর্জ্জাতির সৃষ্টি হইল, তাহারও কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

"১। বিভিন্ন দেশে বাস নিবন্ধন স্বদেশ ও জাতিবর্গের সংস্রবত্যাগ।

২। কৌলিক মত ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিন্ন মত গ্রহণ ও ভিন্ন গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার।

৩। ভিন্ন আচার বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান।

৪। স্ব স্ব সমাজে প্রভুত্ব লইয়া বিবাদ।

৫। আর্থিক অবস্থা ও জ্ঞানের উন্নতিতে নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চশ্রেণীতে প্রবেশ লাভ।

৬। সভ্যতার বিস্তারে নিম্ন জাতির আত্মপরিচয় গোপন।

৭। বৈবাহিক আদান প্রদান।

"Inter marriages among the various Aryan castes seem, however, to be common in those days, and these gave rise to a member of mixed castes in Ancient India."†

"The smallest differences as regards locality, trade or profession and practice was enough to constitute a separate caste, and thus four original castes have grown to four thousand, and there are no intermarriges or interdining between any two of these. These four thousand castes form so many different communities and the phrase "Hindu community," is

* মহাভারত, আদি পর্ব্বে ১০৪ অধ্যায়।

† মহাভারত আদি পর্ব্বে ১২২ অধ্যায়।

¶ "Hindu civilisation under British rule."

§ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস।

† "Fusion of sub-castes in India"-by Rai Bahadur Lala baijnath.

but a geographical expression. The evil results of such a system on the social, religious and political condition of a country cannot be overstated."*

৪। কি কারণে জাতিভেদ-প্রথার উৎপত্তি হইল।

আমরা যদি জাতিভেদপ্রথার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটু প্রণিধান করিয়া বিবেচনা করি, তাহা হইলেই দেখিতে পাইব যে, সাধারণলোকের দুর্ব্বলতা ও তেজোহীনতাই ইহার স্রষ্টা। কারণ তখন সমাজের নূতন অবস্থা—তখন একজনের উপর আর একজন প্রভুত্ব করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। সাধারণলোক পুরোহিতদিগের চরণে বিবেকবুদ্ধি অর্পণ করিয়া, জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্মচিন্তার কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিল; আবার দেহ-ধন রক্ষার ভার ক্ষত্রিয়ের হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা ঈদৃশ লোকের সঙ্গে রক্তসম্পর্ক পরিত্যাগ করিবেন, তাহা অতি-স্বাভাবিক। পুরোহিতেরা সাধারণলোকদিগেকে মূর্খ ও অশুদ্ধ বলিয়া ঘৃণা করিতে লাগিলেন; আর ক্ষত্রিয়েরা নিস্তেজ কাপুরুষ বণিক ও কৃষকদের রক্ত-সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। পুরোহিত ও ক্ষত্রিয়ের এইরূপ ব্যবহারে সাধারণলোকে দ্বিরুক্তি না করিয়া সহ্য করিতে লাগিল।"†

"Blind followers are always the most thoroughgoing and the most zealous, outside the narrow and sacred precincts of an interested group of Brahmans, there was no one now to dispute or even question their authority...... Whatever the Brahmans now uttered or wrote was accepted as an infallible truth. If any Brahman wanted to countenance a particular custom of a particular tribe, he had only to declare that it was sanctioned by the Sastras. But whether he was right or wrong, whether he had mis-interpreted or not very few were in a position to judge...... Thus sprang up an infinity of caste rules and regulations, chiefly local, some universal, but mainly some thing more than merely conventional or customary."*

৫। অত্যাচারের বিপ্লব।

আর্য্যসমাজের সেই পুরাতন গুণগত এবং কর্ম্মগত জাতিভেদের স্থানে যে কিরূপে বংশগত জাতিভেদ আসিয়া দাঁড়াইল, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। জাতিভেদ প্রথা বংশগত হওয়ার পূর্ব্ব হইতেই, দেশে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য স্থাপিত হইতেছিল। অবশেষে এমন সময় আসিল, যখন ব্রাহ্মণেতর জাতি ব্রাহ্মণের অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে উঠিতে ও বসিতে লাগিলেন। কিন্তু আঘাতের

* Dr. R. G. Bhandarkar. P H. D&c on "Social reform and the programme of the Madras Hindu social reform Association"

† শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত।

* "Hindu" civilisation under British rule"

পর একটা প্রতিঘাত হইয়া থাকে। আর্য্য-সমাজেও তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না।

আধ্যাত্মিকশক্তিপ্রভাবে সমাজ চলিবে, দেশ চলিবে, রাজ্য শাসিত হইবে, সেই শক্তি তখন ব্রাহ্মণের হস্তে; তাই ক্ষত্রিয় যখন রাজা হইলেন ব্রাহ্মণ তাঁহার পরামর্শ দাতা হইলেন। ক্ষত্রিয় বাহু, ব্রাহ্মণ মস্তক—ক্ষত্রিয় শক্তি, ব্রাহ্মণ বুদ্ধি। সুতরাং ব্রাহ্মণের ক্ষমতা যে দিনদিন নিরঙ্কুশ হইবে তাহার আর সন্দেহ কি?

ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত ধীরে ধীরে ক্ষত্রিয়প্রভৃতিরও উন্নতি হইতে লাগিল। তাই তাহারা তখন ব্রাহ্মণের ক্ষমতা হ্রাস করিবার জন্য লোলুপ হইল।

"But the extravagant pretensions of the Brahmanic priesthood were, as we also saw, shortly after disputed by the other members of the Aryan community, especially the Kshatriyas."*

তাই বহুকাল হইতেই আমরা ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণে একটা বিবাদের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। শাস্ত্রাদি হইতে এই বিবাদের প্রমাণও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।† বৈশ্য প্রভৃতিও যে ব্রাহ্মণের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াও, ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিল, তাহারও প্রমাণ আছে।‡ বশিষ্ট, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, বেণ, নহুষ, নিমি প্রভৃতির উপাখ্যান পাঠেও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিবাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। আমরা বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখিতে পাই যে, একজন বচনকর্ত্তা, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ, উভয়েরই প্রাধান্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগের ভিতর একটা সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন; * কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের হস্তেই সামাজিক শাসনদণ্ড। তাই তাঁহারা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ত্রুটি করেন নাই।

অনুশাসন নিরপেক্ষ এবং সমদর্শী হওয়াই সর্ব্বথা বিধেয়। কিন্তু ব্রাহ্মণাধিকার-বিস্তৃতি এবং রক্ষার জন্য শাস্ত্রকারগণ তাহা করিতে পারেন নাই। তাই মন্বাদি গ্রন্থে ব্রাহ্মণেতর জাতিসম্বন্ধে আমরা অনেক কঠোর অনুশাসন দেখিতে পাই। শূদ্রদিগের ত কথাই নাই। আমরা মনু হইতে সামান্য দুই একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা হইতেই শূদ্রের অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মনু বলিতেছেন ঃ—

"যেন কেনচিদঙ্গেন হিংস্যাচ্চেচ্ছ্রেষ্ঠমন্ত্যজঃ।
ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্য তন্মনোরনুশাসনং॥"

অন্ত্যজ শূদ্র যে কোন অঙ্গের দ্বারা কোন শ্রেষ্ঠবর্ণকে প্রহার করিলে, সেই শূদ্রের সেই অঙ্গ ছেদন করিতে হইবে।

* "Hindu civilisation under British rule."

† ঋগ্বেদানুক্রমণিকা (৮।৩২)

রামায়ণ; ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, হরিবংশ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

‡ শ্রীমদ্ভাগবত, ৯।২ অধ্যায়।

* "তস্মাৎ ক্ষত্রাৎ পরং নাস্তি তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মধস্তাদুপাস্তে রাজসূয়ে।"

আবার দেখুন, শূদ্র যদি কোন শ্রেষ্ঠ-জাতির সহিত একাসনে বসিতে চাহে, তাহা হইলে তাহার কটিদেশে তপ্তলৌহ দ্বারা দাগ দিয়া দিতে হইবে! তারপর তাহার নির্ব্বাসন!

"সহাসন মভিপ্রেপ্‌স্থরুৎকৃষ্ট-
স্যাপ কৃষ্টজঃ
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ——"

শূদ্র কৃতী হইলেও তাহার ধন সঞ্চয়ে অধিকার নাই!

"শক্তেনাপিহি শূদ্রেণ ন কার্য্যো-
ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রোহি ধনমাদাস্য ব্রাহ্মণানেব
বাধতে।"

শূদ্র কেন ধন সঞ্চয় করিতে পাইবেনা? কারণ তাহা হইলে "ব্রাহ্মণানেব বাধতে"!

এরূপ দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। যাঁহারাই ইতিহাসের পাঠক, তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে, সামাজিক অত্যাচারের ফলেই সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে। আর সেই বিপ্লবের সময় প্রভূত-ক্ষমতাশালী, অপ্রমেয়প্রতিভাসম্পন্ন এমন এক একজন মহানুভব ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন যে, সেই পদদলিত প্রপীড়িত সমাজ তাঁহারই স্নেহের পতাকা-নিম্নে সমবেত হইয়া, সমাজ-পীড়কের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছে।

ফরাসী-রাষ্ট্রবিপ্লবের দিকে চাহিয়া দেখ। দেখিবে—যখন একদিকে ফ্রান্সের ধনকুবেরগণ নিজ নিজ রম্য হর্ম্ম্যে সুরা ও বারবিলাসিনী লইয়া নৃত্যগীতে মত্ত হইলেন, আর অপরদিকে দরিদ্রপ্রজাকুল একমুষ্টি অন্নের জন্য বিতাড়িত কুক্কুরের ন্যায় গৃহ হইতে গৃহান্তরে রোদন করিয়া বেড়াইতে লাগিল, আর উন্মত্ত ধনীদিগের মর্ম্মস্পৃক্ বাক্যবাণে জর্জ্জরিত হইয়া ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ক্ষোভে, পথে ঘাটে পড়িয়া মরিতে লাগিল, তখনই ফ্রান্সে বিদ্রোহের বাদ্য বাজিয়া উঠিল।

আবার দেখ, রোমীয় পোপদিগের অত্যাচার হইতে সাধারণ প্রজামণ্ডলীকে রক্ষা করিবার জন্য মার্টিন্ লুথারের জন্ম হইল। দলে দলে প্রজাগণ তাঁহার পদ-নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। ইউরোপে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইল।

আবার অলিভর্ ক্রমওয়েলের দিকে চাহিয়া দেখ, রাজনৈতিক বিপ্লবের বিকট হাস্য দেখিতে পাইবে। প্রজার রাজা—দেশের কর্ত্তা যিনি, তাঁহারই রক্তরঞ্জিত মস্তক ধুলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল!

ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

ভারতবর্ষের দিকে চাহিয়া দেখ; দেখিবে, যখন সামাজিকস্বার্থপরতায় হিন্দুসমাজের নীচবর্ণগণ উৎপীড়িত, তখনই সিদ্ধার্থের জন্ম হইল। সহস্র ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিল—ব্রাহ্মণদিগের অপ্রতিহত শক্তির উপর খড়্গাঘাত হইল। বুদ্ধদেব ব্রাহ্মণাধিকারের প্রতিবাদ করিলেন; জাতিভেদের কঠোর নিয়ম সকল অনেকটা শিথিল হইয়া গেল। সাধারণ প্রজার হৃদয়ে স্বাধীন চিন্তার স্রোত বহিতে আরম্ভ করিল।

সপ্তম অধ্যায়।

আধুনিক ও প্রাচীন জাতিভেদ।

বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে প্রণালীর জাতিভেদ দেখিতে পাই, পূর্ব্বে এরূপ ছিলনা। শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয়ের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়—

"Endogamy i e, marriage within and not without the limits of a group, is a characteristic of caste .... commensality within and not without a group is in almost all cases another characteristic of castes." *

এখন আমরা দেখিতে পাই যে, একবর্ণের অন্ন তদূর্দ্ধবর্ণ গ্রহণ করেন না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতির ভিতর আর বৈবাহিক আদান প্রদান দৃষ্ট হয়না। ইহাই অধুনা জাতিভেদের প্রধান লক্ষণ। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, জাতিভেদপ্রথার সৃষ্টির সময়ে, এমনকি, মনুর পূর্ব্ব পর্য্যন্তও, ব্রাহ্মণ শূদ্রের স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করিতেন, মনুর গ্রন্থেও তাহার উল্লেখ আছে। বিবাহাদি সম্বন্ধেও এখনকার মত কোন কঠিন নিয়ম ছিলনা। তখনও অনুলোম এবং প্রতিলোম বিবাহ হইত। মনুও অনুলোম বিবাহ অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। তবে প্রতিলোম বিবাহ তিনি নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। কিন্তু সে নিষেধ সত্ত্বেও তখন প্রতিলোম বিবাহ যে সংঘটিত না হইত, তাহা নহে। প্রতিলোম বিবাহ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর মহাশয় বলেন :—

"But since they (the lawbooks) speak of the issue of such marriages and give the law with reference to them, there must have been in practice many cases of the kind." *

অধুনা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের সহিত আহার করেন না, ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সহিত আহারে অস্বীকৃত। বর্ত্তমান যুগে—

"commensality within and not without a group is in almost all cases another characteristic of castes."

কিন্তু মহাভারত এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য পরস্পর পরস্পরের প্রস্তুত খাদ্যসামগ্রী ভক্ষণ করিতেন। মনুর ৪। ২২৩ শ্লোকে আছে, শূদ্রের পাক দ্বিজাতির অভক্ষ্য। কিন্তু সেই মনুরই আবার অন্যত্র (৪।২৫৩) দেখিতে পাওয়া যায় যে, যদি কোন শূদ্র একজন দ্বিজের দাস বা বন্ধু বা ক্ষৌরকার বা কৃষিকার্য্যের অংশীদার হয়, তাহা হইলে সেই শূদ্রের পাক দ্বিজাতির অভক্ষ্য নহে। ইহা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, তখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য প্রভৃতি পরস্পরের সহিত আহার করিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা গৌতম বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ অনায়াসে ধর্ম্মনিরত ক্ষত্রিয়ের অথবা বৈশ্যের সহিত আহার

* "Social History of India" by R. G. Bhandarkar.

* "Social History of India" by R. G. Bhandarkar.

করিতে পারেন। * ধর্ম্মনিরত শূদ্রের গৃহে যে ব্রাহ্মণ "হব্যে কব্যে" আহার করিতে পারিতেন, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। †

"Apastamba, ... having laid down that a brahman should not eat with a kshatriya and others, says that according to some, he may do so with men of all the varnas who observe their proper religious duties except with the Sudras. But men here there is a counter exception, and as allowed by Manu, a brahman may dine with a Sudra who may have attached himself whim with a holy intent (1-18. 9,13, 14)" ‡

ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে—অধুনা অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে ভারতবাসী বিভক্ত। কিন্তু পূর্ব্বে সেরূপ ছিলনা। সর্ব্ব প্রথমে সকলেই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য ছিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উৎপত্তি হইল। কিন্তু ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র, এই চারি জাতি ভিন্ন আর কোনও পঞ্চম জাতির উল্লেখ অন্যত্র দেখা যায়না। কায়স্থ জাতির কথা মনুতে নাই; বিষ্ণুপুরাণ এবং যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাতেই কায়স্থদিগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। "Towards the close of the buddhist hindu period, the term Kayastha was applied not to a distinct caste but to men who were employed as scribes and taxgatherers, men who, in all likelihood, belonged partly to the Vaisya and partly to the Kshatriya caste.' *

বৈশ্যদিগের কথাও পুরাতন সংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায় না। মনুতে মাংসবিক্রেতা, সুরাবিক্রেতা প্রভৃতিদিগের সহিত বৈদ্য (চিকিৎসক) সম্প্রদায়কে শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে।

"The modern Vaidiya or physician caste does not also appear in the more anicent Sanhitas such as those of Manu and Yajnavalka. Physicians are mentioned in those books but nowhere as a distinct caste, ... Manu mentions physicians in the same cattegory as meat-sellers and liquor-vendors." (ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বিএ।

আপস্তম্বীয় গৃহসূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(একাদশ খণ্ড) (চতুর্থ পটল।)

ব্রহ্মচারী যদি উপনয়নের অগ্নি ধারণ করেন, তাহাহইলে ঐ অগ্নিতে প্রত্যহ এক এক খানি বা দুই দুই খানি সমিধ প্রদান করিবেন। যদি উপনয়নাগ্নি ধারণে অক্ষম

---

* ১৭।১। † বর্ত্তমান প্রবন্ধের "আহার ও বিবাহ"।

‡ "Social History of India" by R. G. Bhandarkar.

* "Hindu civilisation under British rule."

হন, তবে ত্রিরাত্র পর্য্যন্ত উপনয়নাগ্নি ধারণ করিয়া, উহা বিসর্জ্জন করিতে পারিবেন; অনন্তর লৌকিকাগ্নিতে হোমকার্য্য নিষ্পাদন করিবেন। সমিৎপ্রদান কার্য্য নিত্য-কর্ম্ম, উহা অন্য কাহারও অপেক্ষায় বদ্ধ হইতে পারে না। উপনয়নাগ্নি বিসর্জ্জনের পরে, কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন, উপনয়নাগ্নি নষ্ট হইয়াছে, এখন আর হোমের দরকার নাই; কিন্তু তাহা নহে, কেন না নিত্যকর্ম্ম যেভাবেই হউক্ না কেন, করা চাই। অকরণে প্রত্যবায়-শ্রুতি আছে। ঐ সমিৎ প্রদান কার্য্য সুদর্শনাচার্য্যের মতে "উপনয়নাদাসমাবর্ত্তনাদহরহঃ সায়ংপ্রাতঃ সায়মেববা।" উপনয়ন হইতে সমাবর্ত্তন পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় অথবা কেবল সন্ধ্যাকালে। এই সমিৎপ্রদানের কথা পূর্ব্ব পূর্ব্ব সূত্রব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, বর্ত্তমান সূত্রে ইহার আর একটু বিশেষত্ব উল্লিখিত হইতেছে।

সদারণ্যাদেধান্ আহৃত্য। ২৪

সমিধ্ কাষ্ঠগুলিকে সব সময়ই অরণ্য হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। সমিধ্গুলি উত্তম হওয়া বোধ হয় উদ্দেশ্য। আরণ্য বৃক্ষের সমিধ্গুলি দোষহীন হওয়া যত সম্ভব, গৃহ-বাটিকায় জীববিচরণের বহুলতাপ্রযুক্ত এবং নিকটস্থ বৃক্ষ হইতে বারম্বার গ্রহণ করিবার সুবিধা থাকায়, বৃক্ষের শাখাদি ভগ্ন হইবার সম্ভাবনাবশতঃ, তত্রত্য সমিধ্ তত ভাল হওয়া বোধ হয় সম্ভব হইত না। অথবা ব্রহ্মচারীকে জনসমাজের কুটিলতা কদর্য্যতা হইতে দূরে রাখিবার জন্যই, তাহার দৈনিক সমিৎসংগ্রহার্থে অরণ্যগমনের ব্যবস্থা করা হইত।

বর্ত্তমান সমাজে এই সমিধাদান কার্য্য উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। উপনয়নের দিনেই যে দুই চারিখানি সমিৎ প্রদান করা হয়। তখন উপনয়নের পর হইতে দ্বাদশ বর্ষ গুরুগৃহে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়ন ও জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া, পরে সমাবর্ত্তন করিতেন; অধুনাতন সমাজে উপনয়নের দিনে তদ্দণ্ডেই সমাবর্ত্তন হোম সম্পাদন করা হয়। ব্রহ্মচর্য্য ও বেদাধ্যয়নের সময়টা একেবারেই উড়িয়া যায় নাই। তাহার অনুকল্প বা অনুস্মারকরূপে তিন রাত্রি বা সাত রাত্রি, অপর জাতির মুখাবলোকন না করিয়া, ব্রহ্মচারী ঘরের ভিতর থাকেন। তখনকার আহারাদির ব্যবস্থাও অনেকটা ব্রহ্মচর্য্যের মত। এই ব্যাপারটা অবশ্য সমাবর্ত্তন হোমের পূর্ব্বেই হওয়া উচিত ছিল, তাহাহইলে ইহাকে আমরা গুরু-গৃহবাসের যথার্থ অনুকল্প বলিতে পারিতাম। কিন্তু উপনয়নও সমাবর্ত্তনহোম এক্ দিনেই হয়, এটা তার পরে। এই ত্রিরাত্র স্বগৃহ-বাস গুরুগৃহবাসের সহিত অনেকটা এক-রূপ। গুরুগৃহে ব্রহ্মচারী সংযত হইয়া থাকিতেন, এই সময়ও, বেশ-সংযমের ও সাবধানতার ব্যবস্থা আছে। অপরের সহিত একপ্রকার নিঃসম্পর্ক হইয়াই ব্রহ্ম-চারীকে থাকিতে হয়। গুরুগৃহে বেদ-পাঠ করা হইত, এখানে সন্ধ্যা ও শিবপূজাদি শিখান হয়। আজকাল অনেকস্থলে দেখা যায়—'ত্রিবেদীয় সন্ধ্যাবিধি' এবং "নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতি" ইত্যাদি পুস্তক ব্রহ্মচারীর বেদের

অভাব মোচন করে। মোটের উপর সমগ্র-ভারতীয় সমাজের অবস্থা প্রায় একরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বঙ্গের দশা আমরা স্বচক্ষে অবিরত দর্শন করিতেছি, সে চিত্র এই-ই রূপ। বেদের চর্চ্চা না থাকায় এবং পিতা মাতার বেদসম্বন্ধে কোনও রূপ ধারণা না থাকায়, আমাদের বেদপাঠ সন্ধ্যোপাসনার কয়েকটী মন্ত্রপাঠেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাহাতেও প্রকৃত উদ্দেশ্য দূরবর্ত্তী হইয়াছে। সন্ধ্যার মন্ত্রগুলি শুদ্ধরূপে উচ্চারিত হইবার আশা সাধারণের কাছে নাই, অনেক পণ্ডিতের নিকটও নাই। অর্থবোধও তথৈবচ। এরূপাবস্থায় ব্রহ্মচারী অজ্ঞাত অবুদ্ধ কয়েকটী মাত্র কথা উচ্চারণ করিয়া, কিছুই ইষ্টসিদ্ধি করিতে পারে না। উপযুক্ত গুরু অর্থাৎ যাঁহার হস্তে একটী বালকের জীবন নিঃসঙ্কোচে ন্যস্ত করা যাইতে পারে, এরূপ ব্যক্তি—এরূপ শিক্ষিত, সচ্চরিত্র, স্বদেশহিতৈষী, স্বধর্ম্মানুরাগী কর্ম্মী-গুরু সমাজে দুর্ল্লভ হওয়ায়, নিজের ঘরে রাখার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরিবর্ত্তনের বলে উহা ক্রমশঃ "নিয়ম রক্ষায়" পর্য্যবসিত হইয়াছে।

উপনীত ব্রহ্মচারীর প্রতি গুরুগৃহে গুরুর কর্ত্তব্য ইঙ্গিতে বলা হইতেছে যথা,—

উত্তরয়া সংশাস্তি ॥২৫॥

"ব্রহ্মচার্য্যসি" অর্থাৎ তুমি ব্রহ্মচারী ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গুরু ব্রহ্মচারীকে শিক্ষা দান করিবেন। প্রথমে "তুমি ব্রহ্মচারী" বলিয়া জানাইয়া, পরে ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য উপদেশ দিলেই, তাহার প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করা হইল। কর্ত্তব্যের উপদেশটা ব্যক্তিগত ভাবে না হওয়া উচিত। কর্ত্তব্যপালয়িতাদের প্রশংসা করা একটা প্ররোচক ব্যাপার; আর্য্য আচারে সর্ব্বদা শাস্ত্র তাহা দেখাইয়াছেন। এরূপ হইলে, ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যের গুরুত্ব অপেক্ষা আদর্শগত কর্ত্তব্যের মহিমা যেন একটু ভালরূপ পরিস্ফুট হয়, ও অনুরাগ যেন আর একটু বর্দ্ধিত হয়।

গুরুগৃহে তিনরাত্রি অতিবাহিত করিলে, পরে যাহা কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে কথিত হইতেছে,—

বাসশ্চতুর্থীমুত্তরয়া দত্ত্বাহন্যৎ পরিধাপ্য ॥২৬॥

চতুর্থ রাত্রিতে ব্রহ্মচারীর পরিধেয় বস্ত্রখানি "যস্যতে প্রথমাবাস্যং' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক আচার্য্য গ্রহণ করিবেন, তাহাকে অন্য একখানি কাপড় পরাইয়া দিবেন। ব্রহ্মচারী উপনয়ন-দিনে যে "সদ্যঃকৃত্তোত" বস্ত্রখানি পরিধান করিয়াছিলেন, সেই খানিই আচার্য্য লইবেন। সে বস্ত্র দৃঢ় নহে, দীর্ঘদিন স্থায়ী হইবেনা বিবেচনায় খুলিয়া লওয়া হয় বোধ করি। অথবা, ব্রহ্মচারী পূর্ব্ব-জীবন অপেক্ষা বর্ত্তমান জীবনে যে ক্লেশ-কঠোরতার মধ্য দিয়া কার্য্যোদ্ধারে অগ্রসর হইবেন, তাহারই প্রথম ইঙ্গিতস্বরূপ তাঁহার ত্যাগশিক্ষা ও সহিষ্ণুতাপরীক্ষার একটী দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। একদিকে সদ্যোজাত-সূত্ররচিতবসন দৃঢ় না হইবারও কথা।

সূত্রে "চতুর্থীং" এই দ্বিতীয়াবিভক্তি "চতুর্থ্যাং" এই সপ্তমীর অর্থে প্রযুক্ত

হইয়াছে, আচার্য্য হরদত্তের অভিপ্রায় এই-রূপ। হরদত্ত আরও বলিয়াছেন "চতুর্থী-মিত্যত্র ন রাত্রি বিবক্ষিতা, কিং তর্হি, অহোরাত্রসমুদায়ঃ তত্রাহন্যেবাদানং বাসসঃ।" "চতুর্থীং" এই চতুর্থীপদে রাত্রি বুঝিতে হইবে না, অহোরাত্র বুঝিতে হইবে। বস্ত্র-গ্রহণকার্য্য দিবসেই করিতে হইবে, রাত্রিতে নহে। হরদত্তের মতে—চতুর্থী অর্থ চতুর্থদিবস। কার্য্যসকল দিবসেই উপযুক্ত, বিশেষ উল্লেখ ব্যতীত কোনও কার্য্য রাত্রিতে করা বুঝিতে হয় না। সুদর্শনা-চার্য্য বলেন, এই বস্ত্রগ্রহণপর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় উপনয়ন সংস্কার। এইখানেই উপনয়নের শেষ। ইহার পরে যে কার্য্য কর্ত্তব্য, তাহার নাম সুদর্শন রাখিয়াছেন 'পালাশকর্ম্ম' গৃহ্যকার আপস্তম্বমতের উপনয়নকর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইল।

চতুর্থ পটল একাদশ খণ্ড সমাপ্ত।

পঞ্চম পটল, দ্বাদশ খণ্ড।

বেদাধ্যয়নান্তে কর্ত্তব্য 'স্নান' নামক কর্ম্ম প্রতিপাদ জন্য, এই খণ্ডের প্রথম সূত্রপাত।

আপস্তম্ব বলিতেছেন,—

বেদমধীত্যস্নায়াৎ প্রাগুদয়াৎ ব্রজং প্রবিশ্য অন্তর্লোম্না চর্ম্মণা দ্বারমপিধায়াস্তে ॥১॥

বেদ সম্যক্‌রূপে পাঠ করিয়া, এবং বেদার্থ অবগত হইয়া, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম পরি-ত্যাগেচ্ছু এবং অন্যাশ্রম অর্থাৎ গার্হস্থ্যা-শ্রম-প্রবেশার্থী ব্রহ্মচারী, প্রত্যূষে সূর্য্যো-দয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া, অন্তর্লোমচর্ম্মদ্বারা দ্বার আবৃত করিয়া, অবস্থিতি করিতে থাকিবেন।

আচার্য্য হরদত্ত বলেন, কেবল বেদ-পাঠ করিলে চলিবে না। বেদ বিচারের জন্য, বেদাঙ্গ ও মীমাংসা অধ্যয়ন করিতে হইবে। "শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দসাংচিতিঃ। জ্যোতিষাময়নং চৈব ষড়ঙ্গো বেদ ইষ্যতে। বেদের ছয়টী অঙ্গ—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ। শিক্ষার অভাবে বেদমন্ত্রগুলি শুদ্ধরূপে উচ্চারিত হইতে পারেনা। মাত্রা, স্বর ইত্যাদির সূক্ষ্মতত্ত্ব শিক্ষায়। অনুচিত-উচ্চারিত মন্ত্র যজমানের হানি করে, এরূপ প্রমাণ অসংখ্য। বৈদিক কার্য্যানুষ্ঠান করিতে হইলে কল্পসূত্র অপরিহার্য্য। কল্প-সূত্রেরই এক ভাগ শ্রৌতসূত্র, অপর ভাগ গৃহ্যসূত্র। শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রের সাধারণ-নামই কল্পসূত্র। ব্যাকরণ না হইলে, বেদ-মন্ত্রের অর্থবোধ হইতে পারে না, কাজেই বেদপাঠে ব্যাকরণ আবশ্যক। নিরুক্ত—বৈদিক অভিধান, বৈদিক শব্দের অর্থ নিরুক্তে লেখা আছে। ব্যাকরণ, অভিধান, দুইই চাই; পরের অভাব একে পূরণ করেনা। ছন্দঃশাস্ত্র না জানিলে পাঠ করা যায় না, ছন্দোভঙ্গ হয়। জ্যোতিষ না হইলে, বেদোক্ত ক্রিয়াকাণ্ডের দিন স্থির করা যায় না। মীমাংসা না জানিলে, ষড়ঙ্গেও ফল হয় না। অনুষ্ঠানের বেলা পদে পদে সন্দেহ সমুপস্থিত হয়; মীমাংসা-ন্যায় দ্বারা সত্য নির্ব্বাচন করিতে হয়। মন্ত্রাদির বিনিয়োগ, ক্রমপারম্পর্য্য প্রভৃতি

কর্ম্মানুষ্ঠানের একান্ত আবশ্যকীয় ব্যাপার-গুলিও মীমাংসার অধীন।

নৈনমেতদহরাদিত্যোভিতপেৎ ।২

ঐ দিবস ঐ ব্রহ্মচারীকে সূর্য্যদেব তাপ প্রদান করিতে পারিবেন না। সেই গোষ্ঠে গোগৃহে ঐ সমস্ত দিবস ব্রহ্মচারী অবরুদ্ধ থাকিবেন, তাহা হইলে সূর্য্য তাঁহাকে তাপিত করিতে পারিবেন না। সুদর্শনাচার্য্য বলেন,— 'ন মূত্রপুরীষোৎসর্গার্থমপি অসৌ মণ্ডপান্নির্গচ্ছেৎ ইতি।" ব্রহ্মচারী প্রস্রাব-ত্যাগ বা মলত্যাগের জন্যও ঐ মণ্ডপ হইতে বাহিরে যাইতে পাইবেন না। "সূর্য্য তাপিত করিবেন না" বলিলে বুঝা যায় যে, সন্ধ্যাসময় পর্য্যন্ত এই ভাবে ব্রহ্মচারী থাকিবেন। সন্ধ্যাবসানে আর তাঁহাকে ঐ গোষ্ঠগৃহে থাকিতে হইবে না, কারণ সূর্য্য অস্তমিত। তদ্দিনকর্ত্তব্য সমিধাদান-প্রভৃতি কর্ম্ম কিরূপে সমাপন করিতে হইবে, অথবা অন্য অনুষ্ঠানাদি যাহা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে আপস্তম্ব বলিতেছেন,—

মধ্যন্দিনেঽগ্নেরুপসমাধানাদ্যাজ্যভাগান্তে পালাশীং সমিধং উত্তরয়া আধায়, অপরেণ অগ্নিং কট এরকায়াং বা উপবিশ্য, উত্তরয়া ক্ষুরমভিমন্ত্র্য, উত্তরেণ যজুষা বপ্তে প্রদায়াপাংসর্জ্জনাদ্যা কেশনিধানাৎ সমানং ।৩।

ঐ দিবস মধ্যন্দিনসময়ে, অগ্নির উপসমাধান হইতে আরম্ভ করিয়া, আজ্যভাগহোম পর্য্যন্ত শাস্ত্রবিহিত কার্য্যপটল সমাপন করিয়া, "ইমংস্তোমং" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্র সহকারে পালাশ সমিধ অগ্নিতে প্রদান করিয়া, অগ্নির অপরদিকে কট (মাদুরী) অথবা এরকার (যাহা দ্বারা মাদুরী প্রস্তুত করা হয়, সেই গুলি, এরকা। সাধারণতঃ ইহাদের নাম পাঁতি।) উপরে উপবেশন করিতে হইবে। পরে 'ত্র্যায়ুষং' ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্র পড়িয়া, ক্ষুর অভিমন্ত্রিত করিবেক; ও 'শিরোনামাসি' এই যজুর্ম্মন্ত্র পাঠ করিয়া, তাহা বপনকর্ত্তার নিকট অর্পণ করিবেক। বপনকাল-কর্ত্তব্য অন্যান্য কর্ম্ম উপনয়নকালীন বপনের সহিত সমান।

আজ্যভাগহোমাদিকার্য্য— যাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মচারী স্বয়ংই করিবেন; আচার্য্য বা অপর কোনও ব্রাহ্মণ করিলে চলিবেনা। হরদত্ত বলেন—বপনের (কেশকর্ত্তনাদির) কর্ত্তা 'নাপিত' এবং সুদর্শনাচার্য্য বলেন—'মন্ত্রবিৎ-ব্রাহ্মণ'। এই উভয় মতের মধ্যে কোনটী সমঞ্জস, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। নাপিত অথবা ব্রাহ্মণ, কে সমাবর্ত্তনার্থী ব্রহ্মচারীর কেশ-বপন করিতেন, তাহা বলা যায় না। লুপ্ত-কার্য্য ব্যবহারদর্শনের অভাবে অনেকটা অনাবিষ্কৃত থাকিয়া যায়। আমরা মনে করি, হরদত্ত মহোদয় যে সময়ে 'অনাকুলা' রচনা করেন, সেই সময় নাপিত বপন করিত। আর সুদর্শন যখন "তাৎপর্য্যদর্শন" রচনা করেন, তখন ব্রাহ্মণ কেশ বপন করিতেন। উভয়ে ভিন্নদেশীয় হইলে, একই সময়ে দেশভেদে উভয় মত সমর্থিত হইতে পারে। উভয়ে সমসাময়িক না হইলে, সুদর্শনাচার্য্য পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে ক্ষৌরাদি-

কর্ম্ম নাপিতদিগের একচেটিয়া ছিলনা; থাকিলেও সংস্কারাদিসময়ে ঐ কার্য্য ব্রাহ্মণেরা স্বয়ং সম্পাদন করিতেন, অপরকে স্পর্শ করিতে দিতেন না, এরূপ অনুমানের ভিত্তি দৃঢ় নহে। কারণ স্বয়ং আপস্তম্ব অনেক স্থানে নাপিতের উল্লেখ করিয়াছেন। তবে এক সময়ে যে ক্ষৌরপ্রভৃতি কার্য্য এক এক শ্রেণীর লোকের উপর অর্পিত ছিলনা, আবশ্যকমত সকলেই স্ব স্ব নখকৃন্তনাদি এবং সন্তানের নাড়ীচ্ছেদাদি কার্য্য নিজেরাই সম্পাদন করিতেন, একথা অনেকাংশে প্রমাণিত হইতে পারে, সন্দেহ নাই। উপনয়নে যেমন কেশাদি কুশস্তম্বে নিক্ষেপ করিবার কথা আছে, এখানেও সেই প্রকার। বপনকারীর অনুমন্ত্রণাদিও উভয়ত্রই সমান। মূলের "সমানং" কথাটী হইতে ঐটুকু অবগত হওয়া যায়। সুদর্শনও 'উপনয়নেন সমানং' বলিয়াছেন।

জঘনার্দ্ধে ব্রজস্যোপবিশ্য বিস্রস্য মেখলাং ব্রহ্মচারিণে প্রযচ্ছতি ।৪

কেশ, শ্মশ্রু, নখ প্রভৃতি ক্ষৌর হইয়া ব্রহ্মচারী গোষ্ঠ-গৃহের জঘনদেশে উপবেশন পূর্ব্বক, মেখলাটী খসাইয়া অন্য ব্রহ্মচারীকে অর্পণ করিবেন। যে মেখলা ব্রহ্মচারী ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা অন্য একজন ব্রহ্মচারীকে অর্পণ করিবেন। যেখানে সেখানে ফেলিয়া দিবেন না, বা যাহাকে তাহাকেও দিবেন না।

তাংস উদুম্বরমূলে দর্ভস্তম্বে বা উত্তরেণ যজুষা উপগূহতি ॥৫॥

যে ব্রহ্মচারী ঐ মেখলা গ্রহণ করিলেন, তিনি ঐ মেখলাকে "ইদমহং বিষ্ণুশর্ম্মণো গোতমস্য পাপ্মানমুপগূহামি উত্তরো বিষ্ণুশর্ম্মা দ্বিষদ্ভ্যঃ" এই যজুর্মন্ত্র দ্বারা, উদুম্বরবৃক্ষের মূলে, অথবা কুশস্তম্বে লুকাইয়া রাখিয়া দিবেন। মন্ত্রটীর অর্থ "এই আমি বিষ্ণুশর্ম্মা গোতমের পাপ লুকাইয়া রাখিতেছি, বিষ্ণুশর্ম্মা শত্রুগণের উত্তরবর্ত্তী হইলেন।" এই মেখলা লুকাইয়া রাখাই, পাপ ত্যাগ করিয়া লুকাইয়া রাখা। এরূপভাবে মেখলাত্যাগের অন্য কোনও রূপ উদ্দেশ্য আছে কি না, ভগবান্ জানেন; তবে পাপত্যাগ করিয়া, তাহা জনসমাজের অগোচরে রাখিয়া, বিদ্বান্ চরিত্রবান্ হইয়া, জনসমাজে মিশিতে যাইতেছি, এরূপ ধারণা থাকা সমাবৃত্ত ব্রহ্মচারীর অনেক উপকারে আসে। যিনি সংসারে দশজনের একজন হইয়া, দয়া, পরোপকার, অতিথিব্রত লইয়া গৃহস্থ হইতেছেন, তিনি "পাপ রাখিয়া পবিত্র হইয়া গেলাম" মনে করিলে, এবং তদনুস্মৃতির সম্মান রাখিলে, বস্তুতঃই সমাজ তাঁহার দ্বারা অশেষ প্রকারে উপকৃত হইতে পারে। অনুষ্ঠান নাই। উপনয়নের দিনে সেই একবার মাত্র ক্ষৌর হওয়া, তাহাতে এসব নিয়ম প্রতিপালিত হয়না, সুতরাং ফলাফল-অনুসন্ধান বিড়ম্বনা।

এবংবিহিতাভিরেবাদ্ভিরুত্তরাভিঃ ষড়্ভিঃ স্নাত্বা উত্তরয়া উদুম্বরেণ দতো ধাবতে ॥৬॥

পরে বিহিত অর্থাৎ পূর্ব্ববিহিত শীতোষ্ণ জল দ্বারা, ব্রহ্মচারী নিজে ছয়বার স্নান করিবেন। এই অভিষেচনের মন্ত্র 'আপোহিষ্ঠা'

প্রভৃতি তিনটী ঋক্, এবং "হিরণ্যবর্ণা" ইত্যাদি তিনটী ঋক্। এই স্নান ব্যাপার সম্পাদিত হইলে, 'অন্নাদ্যায়ব্যূহধ্বং' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, উদুম্বর-শাখা লইয়া, দন্তধাবন (দাঁতন) করিবেন। হরদত্ত মতে—ছয় মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ছয়বার স্নান। প্রত্যেক মন্ত্রে, এক একবার। সুদর্শনমতে—ছয়মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক অবশেষে একবার স্নান করিতে হইবে। এ সব মীমাংসা শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য। উভয় পক্ষেরই যুক্তি আছে। ব্রহ্মচারীর স্নান এই সমাবর্ত্তনব্যাপারে আছে, সুতরাংই সমাবর্ত্তনের অপর নাম 'স্নান'।

স্নানীয়োচ্ছাদিতস্নাতঃ ॥৭॥

স্নানোপকরণ মধুকচূর্ণাদি দ্বারা উদ্বর্ত্তিত-দেহ, এবং আমলকপিষ্টাদি শিরঃস্নানীয় অর্থাৎ মাথাঘষা মস্‌লার দ্বারা স্নাত হইবে। ভালরূপে মস্‌লা ইত্যাদি দ্বারা পরিস্কৃত হইয়া, গার্হস্থ্যবিধানে স্নান করিতে হইবে। ব্রহ্মচারীর গন্ধদ্রব্য ও প্রসাদনসামগ্রী ব্যবহারের অধিকার ছিলনা, অদ্য আরম্ভ হইল।

উত্তরেণ যজুষাহতমন্তরং বাসঃ পরিধায়, সার্ব্বসুরভিণা চন্দনেন উত্তরৈর্দেবতাভ্যঃ প্রদায়, উত্তরয়ানুলিপ্য মণিং সৌবর্ণং সোপধানং সূত্রোতং উত্তরয়া উদপাত্রে ত্রিঃ প্রদক্ষিণং পরিপ্লাব্য উত্তরয়া গ্রীবাস্বাবধ্যেবমেব বাদরং মণিংমন্ত্রবর্জ্জং সব্যে পাণৌ আবধ্য আহতমুত্তরং-বাসো রেবতীস্ত্বেতি সমানং ॥৮॥

"সোমস্যতনূরসি" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আহত অন্তর্বাস পরিধান করিবেন। পরে কস্তূরীপ্রভৃতি গন্ধদ্রব্যসংযোগে সুরভিত চন্দন "নমোগ্রহায়" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দেবতাগণকে উৎসর্গ করিয়া দিবেন। অনন্তর "অপ্সরস্সু যোগন্ধঃ" এই মন্ত্র দ্বারা স্বশরীরে ঐ চন্দন লেপন করিবেন। তৎপরে সুবর্ণমণি সূত্রদ্বারা গ্রথিত করিয়া, সেই মণির উভয় পার্শ্বে হীরক বা বৈদূর্য্যমণি সমাবেশ করিয়া, "ইয়মোষধে ত্রায়মাণা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া, জলপূর্ণ পাত্রে প্রদক্ষিণ ভাবে তিনবার ডুবাইয়া, "অপাশোস্যুত্তরোমে" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠসহকারে, ঐ মণি কণ্ঠদেশে বন্ধন করিবেন। অন্য একটী বদরমণি সূত্রে গাঁথিয়া, জলপাত্রে তিনবার ডুবাইয়া, বিনা মন্ত্রে বামহস্তে ধারণ করিবেন। পরে "রেবতীস্ত্বা"; ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা, বস্ত্রধারণ সম্বন্ধে, যে সকল কার্য্য উপনয়নে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাই আচার্য্য করিবেন।

আচার্য্য সুদর্শন বলেন যে—"উত্তরবস্ত্র ধারণের কার্য্য ব্রহ্মচারী স্বয়ংই করিবেন, কারণ আচার্য্য তৎকালে সেখানে উপস্থিত থাকিবার কথা নাই"। এরূপ অনেকের মত, কিন্তু "উপনয়নের সহিত সমান" বলিলে, সেখানে যেরূপে আচার্য্য ঐ সকল কার্য্য সম্পাদন করাইয়াছিলেন, এখানেও তাহাই করা কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়ায়। উপনয়নে দেখা গিয়াছে,—আচার্য্য সদ্যঃকৃত্তোতবস্ত্র লইয়া, "রেবতীস্ত্বা" এই মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া, "যা অকৃন্তন্" ইত্যাদি তিনটী মন্ত্র পাঠ করিয়া, ব্রহ্মচারীকে বস্ত্র পরিধান করাইয়াছেন। পরে 'পরীদংবাসঃ' ইত্যাদি

মন্ত্র দ্বারা বস্ত্রপরিধানকারী ব্রহ্মচারীকে অভিমন্ত্রিত করিয়াছেন। এখানে বস্ত্র পরিধান করাইতে হইবেনা, কারণ এটী উত্তরীয় বস্ত্র। সুদর্শন বলিতেছেন "ইহোত্তরীয়মেব বিধীয়তে।" পূর্ব্বে একবার ব্রহ্মচারী স্নানান্তে কাপড় পরিয়াছেন, এবার উত্তরীয় লইতেছেন। যাহাকে "অন্তর্বাস" বলা হইয়াছে, তাহাই যে পরিধেয় বসন, একথা বোধ হয় পাঠকবর্গের বুঝিতে কষ্ট হইবেনা।

ব্রহ্মচর্য্যে বিলাস-বাসনা নির্ব্বাসিত হইয়াছিল। গার্হ্যস্থের উদয়ে সমৃদ্ধি শোভা সুশ্রীকতার দিকে লক্ষ্য করা আবশ্যক হইয়াছে, তাই চন্দন-কস্তূরী-অগুরুর মেলা। মণিমুক্তা-হীরক-স্বর্ণের খেলা। গার্হস্থ্যজীবনের সুখ সমৃদ্ধি ভোগরাগের এখানেই একবার মহলা দেওয়া হইতেছে। বহুদিন ক্ষৌরহীনগাত্র— কেশসংস্কারশূন্য— অরণ্যবাসী তপস্বী ব্যক্তির সমাজে যাইতে হইবে; আরণ্য নাগরে পরিণত হইবে; সুতরাং সংস্কারের বিপুল আয়োজন চাই।

বদরীবীজ যে কিজন্য বামহস্তে ধারণ করিতে হইবে, তাহা বুঝা সুকঠিন। ইহা বিলাস নহে, কারণ অশোভন। কণ্ঠে স্বর্ণ-হীরক,—বামহস্তে বদরীবীজ, অবশ্য মানানসইগোছ হইলনা। মনে হইল, আপাততঃ সংসারপ্রবিষ্ট ব্যক্তি, বিলাসের মধ্যে পড়িয়া, ব্রহ্মচর্য্যের কঠোরতাশিক্ষা শিথিল করিয়া না ফেলেন, তাই বৈদ্যুতিকশক্তির সমতারক্ষার্থে, বদরীবীজ ধারণ। এই পদার্থের ঐ জাতীয় ক্ষমতা আবিষ্কার করা যাইতে পারে কিনা, তাহা বিজ্ঞানবিদ্‌ বিবেচনা করুন। আমরা তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া নিরস্ত রহিলাম; অতঃপর আমাদের অনধিকার।

তস্য দশায়াং প্রবর্ত্তৌ প্রবধ্য দর্ব্যাসাগায় আজ্যেনাভ্যানায়মুত্তরা আহুতীর্হুত্বা জয়াদি প্রতিপদ্যতে ॥৯॥

সেই বস্ত্রের দশায় (ছিলায়) হস্তদ্বয় বদ্ধ করিয়া, দর্ব্বীতে ঘৃতের দ্বারা "আয়ুষ্যং" "বর্চ্চস্যং" ইত্যাদি আটটী প্রধানাহুতি প্রদান করিবে। পরে প্রসিদ্ধ জয়াদিহোম নিষ্পাদন করিবে। সূত্রে যে "অভ্যানায়ন্" পদ আছে, তাহার অর্থ—হস্তদ্বয়ের উপরিভাগে আসিক্ত যে ঘৃত, তাহা দ্বারা প্রধানহোমকার্য্য সম্পাদন। উভয়হস্ত উক্তবস্ত্রের দশায় বন্ধন করা সকলের মত নহে। অনেকে বলেন, বামহস্তমাত্র বাঁধিতে হইবে; তবে উভয়হস্তই দর্ব্বীর অগ্রে স্থাপন করিয়া, হোম করিতে হইবে। প্রধানহোম সম্পন্ন হইলে, হস্ত দর্ব্বীর অগ্রভাগ হইতে তুলিয়া লইয়া, পরে জয়াদি হোম করিতে হইবে। দর্ব্বী প্রভৃতি হোমদ্রব্য পাঠকের পরিচিত। জয়াদিহোমের বর্ণনা এই গৃহ্যসূত্রব্যাখ্যায় অনেক স্থানে প্রদান করিয়াছি। পাঠকবর্গ! স্মরণ রাখিবেন।

পরিষেচনান্তংকৃত্বা এতাভিরেব দক্ষিণে কর্ণে আবধ্নীতৈতাভিরেব সব্যে ॥১০॥

পরিষেচনান্ত শাস্ত্রোপদিষ্ট কার্য্যাবলী সম্পন্ন করিয়া, আহুত্যর্থক মন্ত্র (আয়ুষ্যং ইত্যাদি আটটী) দ্বারা হস্তদ্বয় একবার দক্ষিণ কর্ণে বাঁধিবে, পরে মোচন করিবে। আবার

ঐ সকলমন্ত্রে একবার বামকর্ণে বাঁধিবে, আবার মোচন করিবে। একই মন্ত্র, এই হেতু দুইবার "এতাভিঃ" লেখা হইয়াছে।

এবমুত্তরৈর্যথালিঙ্গং স্রক্ঃ শিরস্ত্যা-ঞ্জনমাদর্শাবেক্ষণমুপানহৌ ছত্রং দণ্ডমিতি।১১

অনন্তর মন্ত্রপাঠ সহকারে স্রক্ প্রভৃতি ষট্দ্রব্য গ্রহণ করিবে। "যথালিঙ্গং" বলায় বুঝাগেল, যে মন্ত্রের যে পদার্থপ্রতিপাদনে সামর্থ্য আছে, সেই মন্ত্র সেই দ্রব্য গ্রহণে ব্যবহৃত হইবে। "শুভিকেশিরঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় দ্বারা, মস্তকে মালিকা বন্ধন করিতে হইবে। পরে 'যদাঞ্জনং ত্রৈককুদং' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় দ্বারা চক্ষুর্দ্বয়ে অঞ্জন (কজ্জল) প্রদান করিতে হইবে। "আদর্শাবেক্ষণং যস্মে" এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক আদর্শগ্রহণ করিতে হইবে। "প্রতিষ্ঠেস্থঃ" এই মন্ত্র দ্বারা, উপানহ (চর্ম্মপাদুকা) গ্রহণ করিতে হইবে। 'প্রজাপতে শরণমসি' এই যজুর্বেদীয় মন্ত্র দ্বারা দণ্ড (লাঠী) গ্রহণ করিবে। সুদর্শনাচার্য্যের মতে সকল গ্রহণ কার্য্যই এক একটী মন্ত্র দ্বারা করা কর্ত্তব্য। যেখানে মন্ত্র অধিক; ঐ আধিক্য বিকল্পার্থ বলিয়া জানিতে হইবে। এটী বা ওটী যে কোন-ওটী দ্বারা করিতে হইবে। ব্রহ্মচারীর নিষিদ্ধ পদার্থের মধ্যে গন্ধ, মাল্য, ছত্র, দণ্ড, উপানৎ ইত্যাদি পড়িয়াছিল। প্রথমবর্ষের হিন্দুপত্রিকায়—ব্রহ্মচারীর প্রতি গোভিল-গৃহ্যসূত্র হইতে উদ্ধৃত উপদেশগুলি পাঠ করিলে, পাঠক এগুলিকে পাইবেন। ব্রহ্মচর্য্যের গণ্ডী পার হইয়া, সেইগুলি গ্রহণ করা হইতেছে। (ক্রমশঃ)

তীর্থপদাশ্রিত
শ্রীকেদারনাথ ভারতী।
যশোহর বেদবিদ্যালয়।

চিত্রগুপ্ত গুপ্তচিত্র নহে।

বিগত বৈশাখ মাসের হিন্দু পত্রিকায় "জ্ঞানভিক্ষু" "কর্ম্ম ও চিত্রগুপ্ত" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। উহা পাঠে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কারণ আমরা কায়স্থ, আমাদিগের আদিদেব চিত্রগুপ্ত, তিনি পুরাণে উচ্চাসন গ্রহণ করিয়া, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরও পূজনীয় হইয়াছেন। প্রাচীনকালে তাঁহার আবির্ভাব হইলেও, অতি দূরবর্ত্তী গগনমণ্ডলস্থ ছায়াপথের তারকাপুঞ্জের ন্যায় তিনি আমাদিগের দূরবীক্ষণের অতীত বস্তু নহেন। একাদশ যমের মধ্যে তিনি অন্যতম বলিয়া প্রথিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহারই বংশধর মসীজীবী ক্ষত্রিয়; ভারতের হিমালয় হইতে কুমারিকা, ও শ্যামদেশ হইতে কাবুলের সীমান্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত নানা স্থানে বাস করিতেছি। এই অতি বিস্তৃত, বিশাল কায়স্থ জাতিকে একতাসূত্রে নিবদ্ধ করিবার জন্য আমরা কায়স্থগণ একপ্রাণ হইয়া নানাবিধ চেষ্টা করিতেছি; এমন সময়ে "জনৈক জ্ঞানভিক্ষু" আমাদিগের আদিদেব চিত্রগুপ্তের পৌরাণিক অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া, আকাশতত্ত্বে "গুপ্তচিত্রে" পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যেমন সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ হইতে ক্ষত্রিয়কুল উৎপন্ন হইয়াছিলেন, তদ্রূপ মসীজীবী কায়স্থগণ চিত্রগুপ্ত হইতে সম্ভূত, তিনি দেবতা হইয়াও মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগের পিতৃপুরুষ হইয়াছিলেন। পুরাণে তাঁহার বিবাহ, সন্তানোৎপাদন ইত্যাদি

স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ পুরাণ-প্রথিত মহাত্মাকে "গুপ্তচিত্রে" পরিণত করিলে, কায়স্থদিগের বিশেষ ক্ষতি হয়; তজ্জন্য "জ্ঞানভিক্ষু" মহাশয়কে এই উদ্যম হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করি।

প্রবন্ধের প্রারম্ভে "জ্ঞানভিক্ষু" বলেন যে—

"আমরা ইহ জীবনে যে সকল কর্ম্ম করি, তাহা তিনি (চিত্রগুপ্ত) লিপিবদ্ধ করেন, এবং তাঁহার সেই হিসাব অনুসারে, আমরা দণ্ডিত বা পুরস্কৃত হই।"

"পুরাণে চিত্রগুপ্তের যেরূপ ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা সময়ান্তরে প্রকাশিত হইবে। কিন্তু পুরাণাদি, নানাবিধ অলঙ্কার ও অর্থবাদে পূর্ণ।" প্রবন্ধকার অলঙ্কার ও অর্থবাদ বাদ দিয়া, মহাত্মা চিত্রগুপ্তকে "গুপ্তচিত্রে" পরিণত করিতে চাহিতেছেন, তজ্জন্য এই প্রতিবাদ।

প্রবন্ধকারের প্রবন্ধটী এক্ষণও পূর্ণাবয়ব ধারণ করে নাই, এমত স্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, তিনি চিত্রগুপ্ত সম্বন্ধে কি লিখিবেন, তাহা না জানিয়া, আমি কি প্রকারে প্রতিবাদ করিতেছি। কিন্তু "জ্ঞান-ভিক্ষু" তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যস্থলে ও শেষ-ভাগে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সিদ্ধান্ত স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি বলেন "আমাদিগের কর্ম্ম কায়িক বা বাচিক বা মানসিক, যে রূপই হউক না কেন, তাহা একেবারে বিনষ্ট হয় না। তাহার সংস্কার (impression) মানস-ক্ষেত্রেই অঙ্কিত হউক, অথবা মহাকাশেই বিলীন হউক, কোন না কোন রূপ অবস্থায় অবশ্য কোথাও অবস্থিতি করিবে।" তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত এই—"এই জড়জগতে যত প্রকার ঘটনা সংঘটিত হইতেছে ও হইবে, তাহা এই নীলাকাশে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে; ইহা অতি নিগূঢ় সত্য, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।" প্রবন্ধ-কার 'নীলাকাশ' কাহাকে বলেন, তাহা নির্দ্দেশ করা আবশ্যক। বায়ুশূন্য আকাশ, কি আমাদিগেরস্থ মস্তকোপরি বায়ুপূর্ণ আকাশ। বোধ হয়, তাঁহার নীলাকাশ শব্দের অর্থ বায়ুশূন্য আকাশ। উপরোক্ত উদ্ধৃত অংশ দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রবন্ধকারের মতে, আমরা যত প্রকার কর্ম্ম এই পৃথিবীতে করিতেছি, যাহা যাহা মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতেছি, ও যাহা যাহা হৃদয়ে চিন্তা করিতেছি, তৎসমুদায় নীলা-কাশে প্রতিবিম্বিত হইতেছে; ইহার নাম "গুপ্তচিত্র"। পৌরাণিকেরা নীলাকাশের এই প্রতিবিম্বকে অর্থবাদ বাক্য ও অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিয়া, একজন দেবতা রূপে প্রতি-ষ্ঠিত করিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে, অর্থবাদ অথবা অলঙ্কার প্রমাণ নহে, সুতরাং "চিত্রগুপ্ত" অথবা গুপ্তচিত্র দেবতা কি মানুষ ছিলেন না। তিনি কল্পনাপ্রসূত পুরুষ মাত্র ছিলেন। ইহাই প্রবন্ধকারের মত।

আজ কতিপয় বৎসর হইল, কর্ণেল অলকট্ সাহেব মহোদয় কলিকাতা নগরে চিত্রগুপ্ত (Hidden picture) শীর্ষক একটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাৎকালিক সংবাদ-পত্রে, আমি উহা পাঠ করিয়াছিলাম। আমার বোধ হয়, প্রবন্ধকার উক্ত বক্তৃতার সার সংগ্রহ করিয়া, বর্ত্তমান গুপ্তচিত্র সম্বন্ধে, তাঁহার মত প্রকাশ করিয়াছেন। অলকট্

সাহেব মহোদয়, আমার যতদূর স্মরণ হইতেছে, কেবল শাব্দ প্রতিবিম্বের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, "এই জগতে যে সমস্ত শব্দ প্রতিনিয়ত হইতেছে, তাহা সমস্তই মহাকাশে চিরকালের জন্য অঙ্কিত রহিয়াছে, অর্থাৎ মহাকাশ (Ether) একটী প্রকাণ্ড শব্দমান (Phonograph) যন্ত্র বিশেষ।" মনুষ্যের কার্য্য, কি মানসিকচিন্তা, আকাশে প্রতিবিম্বিত হয়, ইহা তিনি বলিয়াছিলেন, আমার স্মরণ হয় না। কিন্তু সে অনেক দিনের কথা, ও তাঁহার সিদ্ধান্ত কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত না থাকায়, আমি তাহাতে কোন প্রকার নির্ভর করিতে পারি নাই।

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মনীষীগণের মতে, এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ অবিনাশী, কারণ, যে সমস্ত পরমাণু দ্বারা এই জড়জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার ধ্বংস নাই। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ—ক্রমবিকাশ (Evolution) দ্বারা জগৎ গঠিত হইয়াছে, বলেন। সৃষ্টির অগ্রে কি ছিল, তদ্বিষয়ে তাঁহারা কিছুমাত্র বলেন না। বিজ্ঞান সে বিষয়ে অসমর্থ, এই বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেন। কিন্তু আমাদিগের আর্য্যগণ এই বিষয়ে বিশেষ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই গুরুতর বিষয়ে কোন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, আমাদিগের দুইটী মাত্র পথ অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথম—বৈজ্ঞানিকসিদ্ধান্ত, দ্বিতীয়—বিজ্ঞান অবিরোধী প্রাচীন মনীষীগণের মত। স্ব কপোলকল্পিত, অথচ যাহার রহস্য বিজ্ঞান প্রমাণ করিবেন না, তাহা কখনই গ্রাহ্য করা যায় না।

বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা কতদূর এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে পারি, তাহা প্রথমতঃ দেখা আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে শব্দমান (Phonograph) যন্ত্রের সাহায্যে, ক্ষণস্থায়ী সচঞ্চল শব্দকে আমরা কিছুকালের জন্য স্থায়ী, ও তাহার পৌনঃপুন্যাবৃত্তির সংস্থাপন করিতে পারিয়াছি। এই যন্ত্র বিশ্লেষণ করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, ইহার অভ্যন্তরে এক প্রকার কোমল স্নেহযুক্ত পদার্থে সমাচ্ছন্ন একটী নল (cylinder) অনবরতঃ ঘূর্ণিত হইতেছে। উক্ত যন্ত্রের সাহায্যে, শব্দ সকল উক্ত কোমল পদার্থে রেখাঙ্কিত হইতেছে। এই রেখাসকল শব্দের আধার হইয়া, উহাকে লিপিবদ্ধ করিতেছে। উক্ত কোমল তৈলাক্ত দ্রব বস্তুর সাহায্যে, নল যে প্রকার শব্দ লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইতেছে, মহাকাশের সেই প্রকার কোন শক্তি আছে কি না? যদি থাকে, তবে যে সমস্ত শব্দ পৃথিবীতে প্রতিক্ষণ হইতেছে, তাহা অবশ্যই নীলাকাশে প্রতিবিম্বিত অর্থাৎ লিপিবদ্ধ হইবে; কিন্তু যদি না থাকে, তবে হইতে পারে না। বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অবস্থায় মহাকাশের এই শক্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকগণ কোন মত দিতে পারেন না। কিন্তু যেমন গন্ধ পৃথিবীর গুণ, তদ্রূপ শব্দ মহাকাশের গুণ। কার্য্য-কারণ ভাবে উভয়ের পার্থক্য অনুমেয়, এবং উভয়ই এক প্রকার সমধর্ম্মী আণবিক সূক্ষ্মতম পদার্থে বিনির্ম্মিত, সুতরাং মহাকাশের ন্যায় শব্দও অবিনাশী। [illegible] শব্দের সূক্ষ্মতম

অণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়না, তখন উহা কোন না কোন প্রকারে চিরস্থায়ী হইবেক। কিন্তু এই শব্দ মহাকাশের শক্তির তারতম্যে কি প্রকার অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা স্থির করিতে পারিতেছি না। শব্দ সম্বন্ধে কর্‌ণেল্ অল্‌কটের, অথবা প্রবন্ধকারের যুক্তি আমরা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করিতেও পারিনা, কারণ তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানের বিরোধী নহে। কিন্তু শব্দ যে ভাবে পৃথিবী হইতে সমুত্থিত হইতেছে, ঠিক সেই ভাবে, কোন প্রকার অবস্থান্তরিত না হইয়া, মহাকাশের কোন্ স্থানে লিপিবদ্ধ হইতেছে, তাহা কেহই নিশ্চয় রূপে বলিতে পারেন না। অবস্থান্তর হওয়াই নিতান্ত সম্ভব, কারণ বায়ুশূন্য মহাকাশ ও পৃথিবীর মধ্যস্থলে, নানা প্রকার আণবিক বায়ুস্তর বর্ত্তমান রহিয়াছে। সেই বায়ুস্রোতে আকৃষ্ট হইয়া, শব্দ সকল অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে, তাহার সন্দেহ নাই, এ সম্বন্ধে নানারূপ মত উপস্থিত হইতে পারে। বায়ুশূন্য মহাকাশ (Airless Ether) যৎকালে আমাদিগের ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তু, তৎকালে তথায় কি অন্য কোনস্থানে কিরূপ হইতেছে, আমরা জানিনা। কিন্তু যে সকল ঘটনা পৃথিবীতে হইতেছে, ও যে সমস্ত চিন্তা মানুষের মনে উদিত হইতেছে, তাহা মহাকাশে প্রতিবিম্বিত কি লিপিবদ্ধ হইতেছে, প্রবন্ধকারের এই মত সম্পূর্ণ অসম্ভব ও বিজ্ঞানবিরোধী। ভৌতিক ঘটনাবলী ও মানবহৃদয়স্থ চিন্তাপ্রবাহ কোন প্রকার আণবিক সংযোগে সংগঠিত হয় নাই, তাহা সর্ব্বদাই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা সাগরবক্ষস্থিত বীচিমালার ন্যায় তরঙ্গায়িত হইতেছে। মানুষের চিন্তাপ্রবাহ অন্তর্যামী ঈশ্বর ও ব্যক্তিবিশেষ ব্যতীত অন্য কেহ জানিতে পারে না। অবশ্য কার্য্য-কারণের সংঘাতে তাহাতে মানবের অদৃষ্ট অথবা প্রাক্তন নিরূপণ করিতেছে মাত্র। সূচিভেদ্য অন্ধকারে, নির্জ্জন কুটীরে, অথবা সুগভীর সমুদ্রমধ্যে, মৃত্তিকার অভ্যন্তরে, দিগন্তবিস্তৃতবনমধ্যে, অথবা পর্ব্বতগুহায় অনবরতঃ যে সমস্ত ভৌতিক ঘটনা হইতেছে, তাহা সেই সর্ব্বজ্ঞ বিধাতা পুরুষ ব্যতীত, আর কেহ জানিতে পারে না। তাহা নীলাকাশে কি প্রকারে প্রতিবিম্বিত হইবে, তাহা কেবল প্রবন্ধকার জানেন, মানবীয়বুদ্ধি অথবা বিজ্ঞান তাহা চিন্তা করিতেও পরাস্ত হয়।

দ্বিতীয়—বিজ্ঞানাবিরোধী আর্য্যমনীষীগণের মত।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ, খং মনো-
বুদ্ধিরেবচ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে, ভিন্না প্রকৃতি-
রষ্টধা ॥৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং, প্রকৃতিং বিদ্ধি-
মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো, যয়েদং
ধার্য্যতে জগৎ ॥৫॥

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

এক এবং অদ্বিতীয়ঃকারণ স্বরূপ পরব্রহ্ম, সৃষ্টির জন্য প্রকৃতি এবং পুরুষ রূপে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই প্রকৃতি পরা

ও অপরা নামে বিভক্ত হইয়াছেন। পরা ও অপরা প্রকৃতিকে পঞ্চবিংশতি প্রকার তত্ত্বে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, অথবা বুদ্ধি, অথবা মনঃ, মহত্তত্ত্ব হইতে অহংতত্ত্ব, অহংতত্ত্ব হইতে পঞ্চতন্মাত্র (যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ) ও একাদশ ইন্দ্রিয়। উক্ত পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূত—যথা, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, সৃষ্টির আদিতে জড়জগতের প্রথম-বিকাশ শব্দ। (The word) যখন সমস্তই তমসাচ্ছন্ন ছিল, তখন ভগবানের ইচ্ছায় একটী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল। যুগযুগান্তর এই শব্দব্রহ্ম ওঁকার রূপে ধ্বনিত হইলে, প্রথমে আকাশরূপ জ্যোতির বিকাশ হয়। শব্দ হইতে মহাকাশের সৃষ্টি হইয়াছিল, এবং মহাকাশে শব্দসমুদায় বিলীন হইবে, ইহা মনীষীগণেরও বাক্য।

অন্য স্থানে—

> ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো, ব্রহ্মণ-
> স্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
> ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ, যজ্ঞাশ্চ
> বিহিতাঃ পুরা ॥২৩॥

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

"ওঁ তৎ সৎ" এই তিনটী পরব্রহ্মের সংজ্ঞা-বাচক শব্দ, ইহা আমাদিগের মূল প্রণব। শ্রুতি বলিয়াছেন "ওমিত্যেবমগ্র আসীৎ" সৃষ্টির প্রারম্ভে 'ওঁকার' ছিল। "প্রথমমোঙ্কা-রাত্মকমাসীৎ, তস্মাৎ নিঃসৃতাঃ সর্ব্বে প্রলী-য়ন্তে তত্রৈব।" ব্রহ্ম স্বরূপ 'ওঁকার' সৃষ্টির আদিকালে ছিল, তাহা হইতে সমস্তই নির্গত হইয়াছে, এবং তাহাতেই সমস্ত বিলীন হইবে। "দীপ্যাতোং জ্যোতিঃ" ওঁকার হইতে জ্যোতির উৎপত্তি। উপনিষদ্ হইতে আর অধিক মন্ত্র উদ্ধৃত করিবার প্রয়ো-জন নাই। বেদে স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করি-য়াছেন যে, শব্দ হইতে মহাকাশ ও মহাকাশ হইতে জ্যোতির উৎপত্তি। পৃথিবী হইতে যে সমস্ত শব্দ গগনমার্গে প্রতিনিয়তঃ সমুত্থিত হইতেছে, তাহা মহাকাশে বিলীন হইবেক, তাহা আমাদিগের আর্য্য ঋষি-গণের মত।

প্রবন্ধকার "গুপ্তচিত্র" সম্বন্ধে বিজ্ঞান-শাস্ত্র-সমুদ্র আলোড়িত করিয়া, যাহা ন্যায় ও যুক্তি অনুসারে প্রমাণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাতে কাহারও আপত্তি নাই। স্বকপোলকল্পিত বাক্য, যাহা বিজ্ঞান কি শাস্ত্র-সম্মত নহে, তাহা লিখিলে কোন লাভ নাই, কেবল হাস্যাস্পদ হইবার সম্ভাবনা। কিমধিকমিতি।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সরকার।
ফরিদপুর, আর্য্যকায়স্থ-সমিতির সভাপতি।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

হিন্দুপত্রিকা সম্প্রদায় বা জাতিবিশেষের অনিষ্ট কামনা করে না; প্রত্যুত সকল জাতীয় সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুকেই প্রীতির চক্ষে দর্শন করিতে অভ্যস্ত এবং ইচ্ছুক। কায়স্থজাতির উপর বিদ্বেষ বা অসন্তোষ বশে "কর্ম্ম ও চিত্রগুপ্ত" প্রবন্ধ প্রকা-শিত হয় নাই। প্রবন্ধলেখকও একজন কায়স্থ। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ইত্যাদি নানাশাস্ত্রে, চিত্রগুপ্তদেবের উৎপত্তি, বিবাহাদি, এবং ক্ষত্রিয়াচার-পরতা ও তদ্বংশীয়গণের কায়স্থ-আখ্যা-প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। লেখক, মহা-পুরুষ চিত্রগুপ্তকে উড়াইয়া দিয়া, স্বজাতির (কায়স্থ জাতির) অহিতসাধন করিতে চাহেন না। বর্ত্তমানযুগের বৈজ্ঞানিক গবেষণার নির্ভর করিয়া, মহাকাশের গুপ্তচিত্র দেখাইতে চাহেন। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান মহাকাশের প্রতিবিম্ব-গ্রহণসামর্থ্য যুক্তি এবং প্রমাণদ্বারা নিঃসংশয়রূপে স্থির করি-য়াছে। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বাবু সন্দিহান হইলেন কেন, জানি না। লেখকের উক্তি, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকযুগের মহারথীগণের নিকট উপেক্ষিত হইবে না। আমরা আশাকরি, কোনও কায়স্থ মহোদয় এই বৈজ্ঞানিক আলোচনায় অপ্রীত হইবেন না।

বিনীত সম্পাদক।

তত্ত্ব-সমাস।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

পদার্থ অনুভূতির দাস। যতটুকু অনুভূত হয়, ততটুকুই আমাদের কাছে পদার্থের স্বরূপ। অনুভূতির বৃত্ত অতিক্রম করিয়া, যদি পদার্থের কোনও অস্তিত্ব বা স্বরূপ বিরাজিত থাকে, তবে জগৎ তাহাতে কখনই সাক্ষ্য দিতে পারিবেনা। অনুভূতির বাহিরে অন্য পদার্থ কেন, নিজের অস্তিত্ব বিষয়েও নীরবতার রাজ্য। দুঃখের কথা পূর্ব্ব-সূত্রে প্রতিপাদন করা হইয়াছে। দুঃখানুভবের কাছেই আমরা দুঃখের পরিচয় পাই, সুতরাং অনুভবের করণ-কারণাদির বিশ্লেষণ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। অনুভূতির পদবীতে আরোহণ করিয়া, দুঃখ আমাদের নিকট আসে। দুঃখের প্রতিবিধান যে অভিপ্রেত, সে বিষয় আর বলিতে কি? দুঃখের উপস্থিতির প্রণালী অবগত হইতে পারিলে, বোধ হয়, তাহার আগমনের প্রতীকারও করা যাইতে পারে। এই আশায়, অনুভবের কারন-লক্ষণাদি-জিজ্ঞাসার প্রকারভেদ-জ্ঞাপক প্রত্যুত্তর-বাক্যের সন্নিহিত হওয়া কর্ত্তব্য হইয়াছে। অনুভবের সংখ্যা অনেক, কিন্তু সমস্ত লৌকিক অনুভবকে পাঁচ প্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে। অনুভবের কারণও সাধারণতঃ পাঁচ প্রকার। কারণানুসারে কার্য্যের জাতিবিভাগ দৃষ্ট হয়।

পঞ্চাভিবুদ্ধয়ঃ ॥৮॥

অভিবুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ প্রকার। বুদ্ধির অভিমুখে বিষয়কে লইয়া যাহারা উপস্থিত করে, তাহারাই অভিবুদ্ধি। বিষয় বাহিরে, আর বুদ্ধি ভিতরে; এই উভয়ের সম্বন্ধসংস্থাপক অভিবুদ্ধি বা জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাহ্যপদার্থ স্বরূপতঃ বুদ্ধির কাছে পৌছিতে পারে না। প্রতিবিম্ব রূপে জ্ঞানেন্দ্রিয়-প্রণালীতে আরোহণ করিয়া, উহাদিগকে বুদ্ধির সন্নিহিত হইতে হয়। এই জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চকের নাম—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। চক্ষু দর্শন এবং কর্ণ শ্রবণ ও নাসিকা গন্ধগ্রহণ, জিহ্বা রসগ্রহণ এবং ত্বক্ স্পর্শনজ্ঞানের জনক।

এই জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি কি পদার্থ, এ বিষয়ে অস্মদ্দেশে বহুকাল হইতে নানাবিধ তর্ক বিতর্ক হইতেছিল। তত্ত্ব-সমাসে কপিল-দেব, এই জ্ঞানেন্দ্রিয়বর্গের স্বরূপ নির্দ্ধারণের জন্য কিছুই বলেন নাই, এবং ইহাদের নামাদিরও নির্দ্দেশ করেন নাই। প্রবচন-সাংখ্যে এই বিষয়ে বিবিধ মতামত বিচারিত হইয়াছে। পাঠকবর্গের পরিতৃপ্তির জন্য আমরা এখানে সংক্ষেপে তাহার পরিচয় প্রদান করিব। প্রথমে আমরা দেখিতে পাই, চক্ষুর মধ্যে গোলাকার তারকা দৃষ্ট হয়। উহাকে প্রচলিতভাষায় আমরা 'চক্ষের মণি' বলিয়া থাকি। ঐ তারকার মধ্যে, এক শ্রেণীর স্বচ্ছপদার্থ আছে। ঐ স্বচ্ছপদার্থের আবরক পর্দ্দা, সূক্ষ্ম হইলেও বেশ সুদৃঢ়। ঐ গোলাকার তারকার উপরে বাহ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হয়। স্বচ্ছপদার্থের প্রতিবিম্বগ্রহণ-ক্ষমতা চিরপ্রসিদ্ধ। প্রতিবিম্ব পতিত হইলে, উত্তেজিত চাক্ষুষ স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে, তাহা

মস্তিষ্কে নীত হয়, এবং তথায় লাঞ্ছন উৎপাদন করে। মস্তিষ্কশক্তিবলেই উহার জ্ঞান সম্পন্ন হয়। তারকার উপর কোনও প্রকার আবরক বা প্রতিরোধক পদার্থ সংগৃহীত হইলে, আর আমাদের দর্শন কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। দর্শন-প্রতিরোধক 'ছানি' প্রভৃতি রোগই ইহার নিদর্শন। যখন ঐ তারকা বিকৃত হইলে, আর দর্শন-জ্ঞান হয় না, তখন তারকাই দর্শনজ্ঞানের যন্ত্র বা ইন্দ্রিয়। এই মতপ্রবর্ত্তক দার্শনিক সম্প্রদায় বৌদ্ধ।

তারকাযন্ত্রকে, কপিলদেব প্রবচনে ইন্দ্রিয় বলেন নাই। তিনি চক্ষুর্গোলকের ন্যায় দৃশ্য বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থকে ইন্দ্রিয় বলিতে চাহেন না। প্রবচন সূত্র "অতীন্দ্রিয়ং ইন্দ্রিয়ং ভ্রান্তানামধিষ্ঠানে।" ইন্দ্রিয়—দৃশ্য-গোলক বা তারকা নহে, উহা অতীন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠান তারকাকে ভ্রান্তব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয় বলিয়া থাকে।

আমাদের দেশের নৈয়ায়িক সম্প্রদায় চক্ষুর তারকাকে ইন্দ্রিয় বলেন না; তবে তারকায় বিরাজিত এক প্রকার তেজঃ, যাহা তারকা হইতে অবিচ্ছিন্নরূপে গ্রাহ্যপদার্থ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া, তাহার উপর পতিত হয়, এবং তৎক্ষণাৎই আত্মাতে তদ্বস্তুর জ্ঞান সংঘটিত হয়, ঐ তেজই চক্ষুরিন্দ্রিয়, এইরূপ বলেন। দুই তারকা হইতে নিঃসৃত দুইটী তেজোধারার অগ্রভাগ বস্তুতে গিয়া সম্মিলিত হয়। একটী চক্ষুতারকার দোষ উৎপন্ন হইলে, অন্যটীর ঐ সামর্থ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তারক-বিনিঃসৃত তেজঃ রূপহীন, সুতরাং জন নয়নের অগ্রাহ্য। চক্ষু রূপ গ্রহণ করে, কাজেই দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপবৎ পদার্থের জ্ঞান হয়। মনের সহিত সংযোগ না হইলে, কোনও ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান-জননসামর্থ্য নাই, এটী নৈয়ায়িকের সাধারণ নিয়ম, সুতরাং মনোযোগ চাই।

নৈয়ায়িকমতের তেজঃপদার্থকে, সাংখ্য-বাদী ইন্দ্রিয় বলেন না। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ, পদার্থ পর্য্যন্ত, প্রসর্পণের জন্য 'বৃত্তি' স্বীকার করেন। "ন তেজোঽপসর্পণাৎ তৈজসং চক্ষুর্বৃত্তিতঃ তৎসিদ্ধেঃ।" এই সূত্রে চক্ষুর তৈজসত্ব নিরাস করা হইয়াছে। মোট কথায়, ইন্দ্রিয় তাঁহাদের মতে ভৌতিক হইতে পারে না। "আহঙ্কারিকত্বশ্রুতের্ন ভৌতিকানি।" ইন্দ্রিয় অহঙ্কারোৎপন্ন পদার্থ, এইকথা শ্রুতিতে আছে, অতএব উহা ভৌতিক হইতে পারেনা। ভৌতিক হইতে না পারিলে, তৈজসও হইতে পারে না। অধিষ্ঠানাশ্রিত আহঙ্কারিক শক্তি বিশেষই ইন্দ্রিয়, ইহাই সাংখ্যমত। পদার্থ গ্রহণ সময়ে কেহ কেহ বৃত্তি কল্পনাও করেন, কেহবা শক্তির দ্বারা উপপত্তি করেন। আহঙ্কারিকত্বের সামঞ্জস্যার্থে সাংখ্যাচার্য্যগণের অভিপ্রায় এইরূপ যে, অহংকার হইতেই যাবতীয় বিশেষ-জ্ঞান হয়। 'আমি' "আমার" জ্ঞান জগতের সমস্ত অনুভবের সঙ্গে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে। অহংকারের সংসর্গ ত্যাগ করিলে, আর আমাদের লৌকিকস্বরূপ সুদৃঢ় থাকে না। প্রথমে বুদ্ধি, পরে অহঙ্কার, তারপর মন, অবশেষে ইন্দ্রিয়, এইগুলির দ্বারা একটী সম্পূর্ণ অনুভব নিষ্পন্ন হয়। প্রক্রিয়ায় প্রথমে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য, উহা অবিস্পষ্ট-

ভাবের, পরে মনের সন্দেহাত্মাত্মক, তৎপরে অহঙ্কারাত্মক, তদন্তে নিশ্চয়াত্মকভাবের স্ফুরণ হয়। প্রত্যেক অনুভবের ভিতরে এই কয় প্রকার অবস্থা আছে, কিন্তু আমরা সহসা তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না। কার্য্য, কারণে পৌছায়, ইহাই স্বভাব, মন এবং ইন্দ্রিয়, অহঙ্কারের কাছে লইয়া যায়। এক অহম্ভাবই, ভিন্ন ভিন্ন রূপে জাগতিক-জ্ঞানের আকারে ভাসমান হয়, ইহা আহ-ঙ্কারিকমতের মূল কথা।

সাংখ্যসম্প্রদায়ের মধ্যে আবার মতামত আছে; কেহ শক্তিবাদী কেহ শক্তিসমন্বিত-বৃত্তিবাদী। বিস্তার শঙ্কায় সে সকল কথা এস্থানে আলোচিত হইল না। শক্তিবাদী সাংখ্যমতে দর্শনজ্ঞানের সাধারণ প্রক্রিয়া এইরূপ—চক্ষুস্তারক এবং বাহ্যপদার্থ পর-স্পর সম্মুখীন হইলে, তারকযন্ত্রে এক-প্রকার প্রবৃত্তি উপস্থিত হয়, ঐ প্রবৃত্তি-বলে প্রতিবিম্বগ্রাহিণীশক্তির কার্য্যাভি-মুখতা উপস্থিত হয়। তখন গ্রাহ্যপদার্থের-প্রতিবিম্ব, তারকের স্বচ্ছাংশে বিধৃত হয়। তৎসঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিও বৃক্ষাকারে পরিণত হয়। বৃক্ষাকারে পরিণতা বুদ্ধিবৃত্তি সন্নিকৃষ্ট আত্মচৈতন্যে প্রতিবিম্বিত হইলে, বুদ্ধিতে একজাতীয় চৈতন্য-স্ফুরণ উপস্থিত হয়, উহাই দর্শনজ্ঞান। এস্থানে, পরস্পর আত্মা ও বুদ্ধির প্রতিবিম্বন ভাষ্যকার বিজ্ঞান-ভিক্ষুর মত। অন্যতর প্রতিবিম্বন অর্থাৎ আত্মাতে বুদ্ধির প্রতিবিম্বিত হওয়া, সকলে স্বীকার করেন না। বিষয়সমন্বিতা-বুদ্ধিবৃত্তিতে আত্মসন্নিকর্ষ বশতঃ, চৈতন্যা-বভাস উপস্থিত হয়, ইহাই অনুভব, এইরূপ কেহ কেহ বলেন। বৃত্তিবাদীরা, অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপে বিষয়দেশ পর্য্যন্ত গমন করে, এইটুকু নূতন বলেন, অপ-রাংশ শক্তিবাদীর ন্যায়। আমরা সকল আচার্য্যগণের মত এবং পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিতগণের মতামত এখানে আলোচনা করিতে পারিলাম না। স্বতন্ত্র প্রবন্ধা-কারে তাহা প্রকাশ করা যাইবে, আশা রহিল। সকলের মতেই প্রতিবন্ধকাভাব একটী আবশ্যকীয় কারণ, ইহা বলা বাহুল্য।

চক্ষুরিন্দ্রিয়ের ন্যায়, শ্রোত্রাদিও আহঙ্কা-রিক শক্তিপদার্থ বিশেষ, ইহাই সাংখ্যমত। শ্রোত্রাদির কার্য্যপ্রণালীতে মতামতের আড়-ম্বর বড় কম, তজ্জন্য উপেক্ষিত হইল। এই পাঁচটী অভিবুদ্ধি দ্বারাই, আমরা সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করি। ইহারাই আমাদের কাছে দুঃখ আনিয়া দেয়।

মনও সাংখ্যমতে ইন্দ্রিয়, কিন্তু উভ-য়াত্মক। জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়, উভ-য়েরই ধর্ম্ম এক মনে আছে, কাজেই মন উভয়েন্দ্রিয়। মন যে আমাদের দুঃখের কারণ, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবেনা।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কথা হইল, এখন কর্ম্মেন্দ্রি-য়ের কথা। সর্ব্বদা জ্ঞানেন্দ্রিয় অনুভবের সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে না। কর্ম্মেন্দ্রিয়, বিষয়কে প্রায় সর্ব্বদাই জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিকট আনিয়া উপস্থিত করে। আমাদের দেহ কেবল জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা চলিতে পারে না। কর্ম্মেন্দ্রিয়ই প্রধানতঃ উহার চালক। তবে সে চালনায় চৈতন্যের অস্পষ্ট বিকাশ মাত্র আছে।

পঞ্চ কর্ম্মযোনয়ঃ ॥৯॥

কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটী। কর্ম্মেন্দ্রিয় কর্ম্মযোনি, কর্ম্মের উৎপত্তিস্থান। ঐ পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করিয়া, শরীরনির্ব্বাহক যাবদীয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইতেছে, সুতরাং উহাদিগকে 'কর্ম্মযোনি' বলা হইয়াছে। বাগিন্দ্রিয়, হস্ত, পদ, মলোৎসর্গ-যন্ত্র ও মূত্রত্যাগ-যন্ত্র এই পাঁচটীর নাম কর্ম্মেন্দ্রিয়। বাক্ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, আমরা শব্দ উচ্চারণ করি। উচ্চারণপ্রযত্নজন্য শব্দ কণ্ঠ, তালু, জিহ্বা প্রভৃতি স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, স্ফুট ভাবে বহির্গত হয়। যে ক্ষমতাবলে—অর্থাৎ যে শক্তির সহায়তায়, আমরা ঐরূপ শব্দ উচ্চারণ করিতে পারি, তাহা বাক্। মনের ভাব জ্ঞাপক সঙ্কেতসমূহের মধ্যে, ভাষা বা কথাই প্রকৃষ্ট উপকরণ। এই উপকরণ, আমরা বাগিন্দ্রিয়ের মাহাত্ম্যে প্রাপ্ত হই। গ্রহণসামর্থ্য দ্বারা হস্ত-ইন্দ্রিয় কল্পিত হয়। যখন অবস্থা বিশেষে রোগাক্রান্তি নিবন্ধন হস্ত বিদ্যমান থাকে, কিন্তু কার্য্য অর্থাৎ গ্রহণের সামর্থ্য থাকে না, তখন আমরা কি বুঝি? এইমাত্র বুঝি যে, যে শক্তি-বলে, হস্ত গ্রহণকার্য্য সম্পাদন করিত, সেই শক্তি অর্থাৎ পাণি-ইন্দ্রিয় সংমূর্চ্ছিত হইয়াছে, সুতরাং অধিষ্ঠান দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে না। পাদ ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা বিচরণ করি। মলত্যাগ এবং প্রস্রাবত্যাগ-জন্য, পায়ু ও উপস্থ রূপ ইন্দ্রিয়দ্বয়।

এই সমস্ত কর্ম্মেন্দ্রিয়কে, কোনও প্রচীন দার্শনিক ত্বগিন্দ্রিয় নামে বলিতে চাহেন। হস্ত ও পদ, ভিন্ন কার্য্য করে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে, কেবল হস্তই আদান কার্য্যে একমাত্র সমর্থ, একথা বলা যায়না। আমাদের শরীরের অনেক স্থান দিয়া, আমরা পদার্থ গ্রহণ করিতে পারি; অভ্যাস-বলে পায়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায়। বহু-দিন হইতে মানব হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, এই জন্য হস্তের গ্রহণসামর্থ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; অনুনুশীলনে অপরের হ্রাস হইয়াছে। হস্ত-পদাদির ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট-স্থানে আবদ্ধ নহে। ত্বগিন্দ্রিয় বিকল হইলে, হস্ত ও পদ সমানভাবেই অকর্ম্মণ্য হয়। পক্ষাঘাত রোগগ্রস্তের হস্ত বা পদে বিশেষ কিছু শক্তিগত পার্থক্য অনুভব করা যায়না। আভ্যন্তরিকস্রোত অর্থাৎ রক্ত-সঞ্চারাদির পথ বন্ধ হইলে, কিম্বা উপরস্থ স্নায়ুমণ্ডলীর স্তম্ভিতভাব হইলে, যখন হস্ত, পদ, বদন ইত্যাদি সকলেরই কার্য্য বন্ধ হয়, তখন এক ত্বগিন্দ্রিয়, স্থান বিশেষে ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, এইরূপ বলাই ভাল। তাঁহার মতে—ত্বক্ সর্ব্বশরীরব্যাপী হইলেও, স্থানে স্থানে উহা ভিন্ন২ কার্য্য সম্পন্ন করে, সুতরাং উহা জ্ঞানকর্ম্মোভয়েন্দ্রিয়। কর্ম্মেন্দ্রিয় নির্ব্বাচনের স্বতন্ত্র প্রয়োজন তিনি বোধ করেন না।

৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে, জনৈক সন্ন্যাসীর নিকট আমরা এই মতের একটু আলোচনা শুনিয়াছিলাম। তিনি আমাদের সমক্ষে, একটী জলপূর্ণপাত্রে তাঁহার দক্ষিণ পাদের বৃদ্ধ অঙ্গুলিটী প্রবেশ করাইয়া, সমস্ত জল পান করিয়াছিলেন! পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা জল-পান করা যায়, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন "কর্ম্মশক্তি, শরীরের সকল স্থানেই অভ্যাস বা শিক্ষা

দ্বারা, চালনা করা যাইতে পারে; কিন্তু জ্ঞানশক্তি সেরূপ নহে; উহা অধিষ্ঠানের অন্যত্র সংক্রমিত হয়না। কর্ম্মেন্দ্রিয় বা কর্ম্মশক্তি, একমাত্র ত্বক্ আশ্রয় করিয়া আছে।" ফলতঃ অধিষ্ঠান স্থির না থাকিলে, ইন্দ্রিয়ের পার্থক্য রক্ষা করা কঠিন।

একটী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত এক দিন আলোচনাপ্রসঙ্গে শুনিয়াছিলাম,—"আদান ও উৎসর্গ একই ক্রিয়া। দ্রষ্টা বা অনুভবিতা, ক্রিয়ার কেন্দ্রাভিমুখতা ও বহির্ম্মুখতা গুণে, ভিন্ন স্থানে দাঁড়াইয়া, ভিন্নরূপ দর্শন করেন। একটী বস্তুর দুইটী পৃষ্ঠ, ভিন্ন দুইটী বস্তু নহে। অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ পদার্থের অংশগতবিভাগ মাত্র, কিন্তু স্বরূপতঃ উহারা একই বস্তুর মধ্যে, আপন আপন অস্তিত্ব হারাইয়া, 'এক' হইয়া রহিয়াছে। এই সকল মতামত বিচার সুধীগণ করিবেন। সুবোধ পাঠকমহোদয়গণ! আপনাদের উপরই যুক্ততাযুক্ততা বিচারের ভার, আমরা আলোচক মাত্র।

জ্ঞান ও কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাখ্যা করা হইল। এখন প্রাণাদি পঞ্চকের কথা বলা হইতেছে।

পঞ্চ বায়বঃ ॥১০॥

শরীরাবস্থিত বায়ু পাঁচ প্রকার। ইহাদের নাম যথাক্রমে প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান। এই পঞ্চবায়ুর স্বরূপ নির্ব্বাচনে দার্শনিকসমাজে একটু গোলযোগ আছে। প্রাণাদি কাহারও মতে আন্তরবায়ু, কাহারও মতে ক্রিয়াত্মক, কাহারও মতে বাহ্য বায়ু, এবং কাহারও মতে এতদুভয়ের বিলক্ষণ পদার্থ। প্রথমে দেখা যাউক, আন্তরবায়ু হইবে দোষ কি? শরীরের বাহিরে যেমন বায়ু অনন্ত আকাশ—চরাচর ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ভিতরেও সেইরূপ বায়ু আছে। বাহিরে বায়ুর নাম বায়ু, ভিতরে প্রাণাদি পাঁচটী নাম হয় কেন? অবশ্য ভিন্নকার্য্য সম্পাদনের জন্যই ভিন্ননাম হওয়া সম্ভব। যেমন দেখা যায়—পাককালে 'পাচক' সংজ্ঞা, ও ধাবন সময়ে 'ধাবক' নাম, এবং পূজন সময়ে সেই একই ব্যক্তি 'পূজক' নামে অভিহিত হয়। ব্যক্তি এক হইলেও, ভিন্নকার্য্য নিবন্ধন ভিন্ননামে আখ্যাত হইতে হয়। সেইরূপ একই বায়ু বাহিরে কেবল বহমান (বাতি) বলিয়া বায়ু, আবার ভিতরে প্রাণনাদি কার্য্য সম্পন্ন করায়, প্রাণাদি নামে কথিত হইতেছে। প্রাণবায়ুর কার্য্য প্রাণন, যাহার বলে জীবিত থাকা যায়। আপত্তিকারী বলিতে পারেন, "শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্য দেখিতে পাইনা। শ্বাস-প্রশ্বাস সতত বাহ্যবায়ু দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। বাহ্যবায়ু রুদ্ধ হইলে, প্রাণবায়ুর সাহায্যে বোধ হয় জীবিত থাকা যায়না। আমরা কোনও বায়ু দ্বারা জীবিত থাকিনা; কতকগুলি উপকরণের সমবায়ে আমাদের জীবনরক্ষা। শ্বাস-গ্রহণ ও প্রশ্বাস-ত্যাগ তাহার একটী, উহা বাহ্যবায়ু দ্বারা সম্পন্ন হয়। আর অপান উৎসর্গাদি কার্য্য সম্পাদন করে, ইহাও বৃথা। কেন না, কোনও বায়ুর সাহায্যে আমাদের মলোৎসর্গাদি নিষ্পন্ন হয় না। স্নায়বিক এবং পৈশিক সঙ্কোচন—প্রসারণাদি দ্বারা আমাদের ঐ ব্যাপার সম্পন্ন হয়।" এইরূপে এই সকল বায়ুর কার্য্য আপত্তিকারীরা অস্বীকার

করেন। পরিশেষে তাঁহারা বলেন—"প্রাণাদি বায়ু নহে, শ্রুতিতে ভিন্নতা উল্লেখ আছে। "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণোমনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণিচ, খং বায়ুর্জ্যোতিরাপশ্চ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী" এই শ্রুতিতে প্রাণ এবং বায়ু ভিন্ন রূপে উক্ত হইয়াছে। একপদার্থ হইলে, এরূপ উক্তির অর্থ কি? স্থাননির্ণয়ে দেখা যায়—"হৃদে প্রাণো গুদেহপানঃ সমানো নাভিমণ্ডলে, উদানঃ কণ্ঠদেশে চ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ।" অর্থাৎ প্রাণবায়ু হৃদয়ে, এবং অপান গুহ্যদেশে, সমান নাভিমণ্ডলে, উদান কণ্ঠদেশে এবং ব্যান সর্ব্বশরীরে। হৃদয়ে এক প্রকার বায়ু আছে, সে প্রাণীকে রক্ষা করে; কণ্ঠে আর একরকম বায়ু আছে, সে তাহা করেনা, ইত্যাদি বাক্যে কোনও যুক্তি নাই। একই বাহ্যবায়ু শরীরে প্রবেশ পূর্ব্বক সর্ব্বস্থানের কার্য্য সম্পাদন করিতেছে। কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থানে একটী বায়ু বসিয়া থাকে, এমন প্রমাণ নাই। যদি সেই স্থানে একনাম, আবার অন্য স্থানে গেলে অন্য নাম হয়, তবে একই বায়ু সমস্তকার্য্য করিতে পারে, এবং কে প্রাণ, কে অপান, তাহারও নির্দ্ধারণ না হইতে পারে।" ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য আপত্তি আছে। তাহার আলোচনায় দরকার নাই।

কেহ কেহ বলেন, যেমন এক পিঞ্জরে কতকগুলি পক্ষী থাকিলে, তাহাদের সকলের ক্ষুদ্রব্যাপারের সমবেত অনুব্যাপারবলেই সেই পিঞ্জরটী আলোড়িত হয়, পিঞ্জরের স্বতন্ত্র ব্যাপার থাকা দরকার হয় না, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা দেহে সর্ব্বক্ষণ যে ব্যাপারসকল উপস্থিত হইতেছে; উহার অনুব্যাপার বা পুঞ্জীভূতভাবের দ্বারাই দেহরক্ষা হয়। ঈশ্বরকৃষ্ণ কারিকায় এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যা বায়বঃপঞ্চ।" প্রাণাদি পঞ্চক, যাহারা বায়ু বলিয়া বিখ্যাত, তাহারা স্বতন্ত্রপদার্থ নহে, ইন্দ্রিয়সমূহের সামান্য অর্থাৎ সাধারণবৃত্তি। বাচস্পতি লিখিয়াছেন "করণানাং সামান্যা সাধারণী বৃত্তি র্ব্যাপারঃ।" সমস্ত ইন্দ্রিয়াদির সম্মিলিত ব্যাপার-বলেই, এই প্রাণধারণ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, ইহাতে কোনও স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হয় না।

আবার কেহ কেহ প্রাণকে বাহ্যবায়ুও বলেন। তাঁহাদের মত যথা—শরীরস্থ অবকাশ, উষ্মা ও জল, ইহাদের সাংযোগিক কার্য্য শ্বাস-প্রশ্বাস। দৈহিক উষ্মা, রসরক্তাদিরূপ জলীয়ভাগকে উত্তেজিত করে; তদুভয়-সংঘর্ষ-জনিত বেগ উদরাকাশে গিয়া পরিপুষ্ট হয়, পরে ঐ পরিপুষ্টক্রিয়া 'ফুঃফুস' নামক সঙ্কোচ-বিকাশশীল যন্ত্রকে সঙ্কুচিত এবং বিকাশিত করে। বিকাশক্রিয়ায় বাহ্যবায়ুর পরিপূরণ হয়, সঙ্কোচক্রিয়ায় তাহার ত্যাগ হয়। প্রাণযন্ত্রের এই প্রকার ক্রিয়ায় পরিপাকাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়, এবং জীবন রক্ষিত হয়। এই মতও শ্রুত্যুক্ত বায়ু এবং প্রাণের ভিন্নতা উক্তি দ্বারা নিরস্ত হয়।

সম্প্রতি সর্ব্বশেষ মত অর্থাৎ 'প্রাণ স্বতন্ত্র পদার্থ' এইমত বলা যাইতেছে। প্রাণ স্বতন্ত্র পদার্থ। প্রাণের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের কার্য্যশক্তি উৎপন্ন এবং রক্ষিত হয়। প্রাণ সবল থাকিলে, ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য করে।

প্রাণের অপগমে ইন্দ্রিয় কার্য্য করিবে না, এবং দৈহিক রসাদি তখন রুধিরাদিপরিণাম প্রাপ্ত হইবেনা। প্রাণ যে অঙ্গ ত্যাগ করিবে, সে অঙ্গ অকর্ম্মণ্য হইবে। প্রাণের উৎক্রান্তি ও লোকান্তরগমনাদি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ। মৃত্যুর পর প্রাণ লোকান্তরগমনার্থ ইন্দ্রিয়াদিকে লইয়া উৎক্রান্ত হয়। প্রাণের উৎক্রান্তি শ্রুতিতে আছে। এই মতের সমর্থক বেদান্তসূত্র—"নবায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ" বিজ্ঞানভিক্ষু এই মতের আবিষ্কর্ত্তা। বেদান্তীরা ঐ সূত্রের অন্যথা ব্যাখ্যা করেন। প্রাণাদির স্বরূপ এবং স্থাননির্ণয়ের অধিক আলোচনা করিবার স্থান এখানে নাই। বারান্তরে তত্ত্বসমাসের অন্যাংশ আলোচিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

তীর্থপদাশ্রিতস্য কপিলসেবকস্য কস্যচিৎ।
যশোহর, বেদ-বিদ্যালয়।

হিন্দুরাজা সীতারাম রায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

(পরিশিষ্ট।)

সীতারামের গুরুদেবের বাটীতে এবং উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের কুলাচার্য্য ঘটকগণের নিকট সীতারামের বংশবিবরণ যেরূপ জ্ঞাত হওয়া যায়, এবং তদীয় গুরুদেবের বাটীতে "গুরুকুলপঞ্জী" পুস্তকে তাঁহার রাজত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা লিখিত আছে, নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল, এবং এতৎসহ তাঁহার উর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ হইতে সমস্ত বংশধরগণের তালিকা প্রদত্ত হইল।

সীতারামের উর্দ্ধতন একাদশ পুরুষের নাম রামদাস (গজদানী)। রামদাসের অনন্ত, ধনন্ত ও শিবরাম তিন পুত্র। অনন্তের পুত্র ধরাধর, ধরাধরের পুত্র সুধাকর। সুধাকরের পুত্র নীলাম্বর। নীলাম্বরের পুত্র রত্নাকর, রত্নাকরের পুত্র হিমকর, হিমকরের পুত্র রামরাম দাস (বিশ্বাস খাস)। রামরামের পুত্র হরিশ্চন্দ্র রায় (রায় রাঁয়া)। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র উদয়নারায়ণ। উদয়নারায়ণের দুই পুত্র—রাজা সীতারাম ও লক্ষ্মীনারায়ণ রায়। রাজা সীতারামের শ্যামসুন্দর, শূরনারায়ণ, রামদেব ও জয়দেব চারি পুত্র। লক্ষ্মীনারায়ণের যদুনাথ, নরনারায়ণ, জয়নারায়ণ ও বিজয়নারায়ণ চারি পুত্র। সীতারামের পুত্র রামদেব ও জয়দেব নিঃসন্তান। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামসুন্দর রায়ের পুত্র আনন্দরাম, আনন্দরামের পুত্র নিমাই রায়। তিনি নিঃসন্তান হওয়ায়, শ্যামসুন্দরের বংশ নিমাই রায় হইতেই লোপ পায়। সীতারামের দ্বিতীয়পুত্র শূরনারায়ণের পুত্র প্রেমনারায়ণ, প্রেম নারায়ণের পুত্র রাধাকান্ত। রাধাকান্তের পুত্র নবকুমার। নবকুমারের কোন পুত্র সন্তান থাকেনা। রাধাকান্ত রায়ের কন্যা—নবকুমারের ভগিনী অলকমণির পুত্র গিরিশচন্দ্র দাস। গিরিশচন্দ্রের পুত্র উমাচরণ দাস এক্ষণ মহম্মদপুরের নিকটে সূর্য্যকুণ্ডের বাটীতে বাস করিতেছেন। উমাচরণের পুত্র সন্তান কিছুই নাই। লক্ষ্মীনারায়ণের পৌত্র নেহালচাঁদের পুত্র সন্তান

না থাকায়, তিনি একটী দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণকান্ত রায়; তাঁহার বংশে এক্ষণ দেবনাথ রায় আছেন। দেবনাথ রায়ের একটী পুত্র জন্মিয়াছে। প্রথম প্রস্তাবে দেবনাথ রায়কে দত্তকপুত্র বলা হইয়াছে, কিন্তু তিনি দত্তকপুত্র নহেন, তাঁহার পিতামহ কৃষ্ণকান্ত রায় দত্তকপুত্র ছিলেন। ঘটকের কুলজী ও গুরুকুলপঞ্জী পুস্তকে দেখা যাইতেছে, সীতারাম জ্যেষ্ঠ, লক্ষ্মীনারায়ণ কনিষ্ঠ, কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণের বংশের দেবনাথ রায় ও সীতারামের প্রপৌত্রের দৌহিত্রসন্তান বলেন যে, লক্ষ্মীনারায়ণই জ্যেষ্ঠ। মদীয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে সেইরূপই লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে, নিশ্চিত কিছুই অবগত হওয়া যায় না। সীতারাম জ্যেষ্ঠ হইবার সম্ভাবনাই অধিক। প্রথম প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে, সীতারাম নিজে রাজা হইয়া 'রায়' উপাধি গ্রহণ করেন, কিন্তু সীতারামের পিতামহ হরিশ্চন্দ্র নবাবের "রায় রাঁয়া" হইয়া 'রায়' উপাধি গ্রহণ করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবের ভ্রম, এই প্রস্তাব দেখিয়া সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

যশোহরের নিকটবর্ত্তী পুড়ুপাড়া গ্রামে, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের কুলাচার্য্য ঘটকবংশ বাস করেন। সেই বংশোদ্ভব ৺দেবনারায়ণ ঘটকের নিকট হইতে, এই কুল-বিবরণ লিখিত হইয়াছে। সীতারামের গুরুদেবভবনের কুলপঞ্জীতে সীতারামের উর্দ্ধতন রামরামের নাম পর্য্যন্ত আছে। উক্ত ঘটক-বংশের পূর্ব্বপুরুষ ঘনশ্যাম ঘটক-লিখিত কুলজীতে রামদাস গজদানী সম্বন্ধে কিছু বর্ণিত আছে। তাহাতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, রামদাস তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে হস্তী দান করিয়া, "গজদানী" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

রামদাসের পর হিমকর পর্য্যন্ত, সম্ভবতঃ এই বংশ অত্যন্ত হীনাবস্থায় পতিত হয়। অবস্থাহীনতা বশতঃ ঘটকদের উপযুক্ত পূজা দিতে, অর্থাৎ তাঁহাদের সম্মানরক্ষার্থ অর্থাদি দিতে পারেন নাই। বংশমর্য্যাদায়ও উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের মধ্যে অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর ছিলেন, সুতরাং ঘটক মহাশয়েরা তাঁহাদিগকে কায়স্থ বলিয়াই গণ্য করিতেন না। তাহার প্রমাণ ঘটকের কবিতায় লিখিত আছে—

"হাল চষে, তাল খায়, গিধনাতে বাস;
তার বেটা কায়েৎ হ'লো বিশ্বাসখাস।"

প্রকৃত প্রস্তাবে বংশমর্য্যাদাও তত ভাল ছিল না। হিমকরের পুত্র রামরাম, তৎকালীন বাঙ্গলার নবাব সা সুজার অধীনে রাজমহলে চাকুরী করিতেন। তিনি কি পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, জানিবার উপায় নাই। তিনিই নবাব সরকার হইতে "বিশ্বাসখাস" উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রথম প্রস্তাবে "খাসবিশ্বাস" উপাধি লিখিত হইয়াছে, কিন্তু "বিশ্বাস খাস" হইবে। রামরামের পুত্র হরিশ্চন্দ্র ও নবাবসরকারে চাকুরী করিয়া, দক্ষতার চিহ্ন স্বরূপ "রায় রাঁয়া" উপাধি প্রাপ্ত হন। তৎকালে "রায় রাঁয়া" উপাধি ও পদ অতি উচ্চ সম্মানের ছিল। হরিশ্চন্দ্রের পুত্র উদয়নারায়ণ প্রথমে ঢাকার নবাবের অধীনে, পরে ঢাকা হইতে রাজধানী মুরশিদাবাদে (মুরশিদাবাদকে তখন

মুক্সুদাবাদ বলিত) নীত হইয়া মুরশিদ কুলি জাফর খাঁর অধীনে, চাকলা ভূষণার ফৌজদারীতে "রায় রাঁয়া" ছিলেন। ঘটকের কুলজীতে আছে, উদয়নারায়ণ প্রথমে ভূষণা গোপালপুরে, পরে সূর্য্যকুণ্ডে বাস করিয়া ছিলেন। সীতারামই মহম্মদপুর নগরের সৃষ্টি করেন। উদয়নারায়ণের পূর্ব্বপুরুষদের কোথায় কাহার বিবাহ হয়, তাহা কুলজীতে নাই। কিন্তু উদয়নারায়ণ বর্ত্তমান কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত বনওয়ারীবাদ রাজধানীর নিকট মহীপতিপুর গ্রামে কুলীনের কন্যা বিবাহ করেন।

সীতারাম প্রথমে মুরশির্দাবাদ জেলার অন্তর্গত ফতেসিংহ পরগণার মধ্যে দাস পলসা গ্রামে, দ্বিতীয়বারে অগ্রদ্বীপের নিকট পাটুলিতে, তৃতীয়বারে ভূষণার অধীন ইদিলপুর গ্রামে বিবাহ করেন। প্রথমা স্ত্রীর সন্তানাদি হয় নাই, এইরূপ শ্রুত হয়। মধ্যমা স্ত্রীর শ্যামসুন্দর ও শূরনারায়ণ, তৃতীয়া স্ত্রীর রামদেব ও জয়দেব দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সীতারামের মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনটী স্ত্রীই জীবিতা ছিলেন। সীতারামের বিবাহ সম্বন্ধে, তৃতীয়প্রস্তাবে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা প্রবাদ শুনিয়া লিখিত হইয়াছিল বলিয়া, একটু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এই প্রস্তাব দেখিয়া সংশোধন করিতে হইবে।

• শূরনারায়ণের পুত্র প্রেমনারায়ণ যশোহর জেলার অধীন মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত গুটীয়া রামদার গাতির উত্তর, শিয়ালজোড় গ্রামে ভগবান্ দাসের কন্যা বিবাহ করেন। এই দাসবংশও সীতারামের আনীত, আশ্রিত ও বৃত্তিভোগী। বংশমর্য্যাদায় ইঁহারা "বহড়ানের দাস" বলিয়া খ্যাত। ইঁহাদিগের পূর্ব্বনিবাস কাটোয়ার নিকট বহড়ান্ গ্রামে ছিল। এই বংশে এক্ষণ উমেশচন্দ্র, লক্ষ্মীকান্ত ও যুধিষ্ঠিরচরণ দাস জীবিত আছেন। প্রবাদ আছে যে, উক্ত ভগবান্ দাসের কন্যা অতিশয় রূপবতী ছিলেন, প্রেমনারায়ণ কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন।

সীতারামের রাজ্যনাশের প্রকৃত কারণ সম্পূর্ণ লিখিতে গেলে, বঙ্গের মহাভিজাত্যসম্পন্ন মাননীয় বংশের কলঙ্ক কালিমা প্রকাশ করিতে হয়, অর্থাৎ নাটোর রাজবংশের আদিপুরুষ রঘুনন্দনের স্বার্থপরতা ইত্যাদি বর্ণনা করিতে হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে উহা কিয়দংশ বর্ণিত হইয়াছে। সীতারামের রাজত্বনাশের পর, তদীয়ানুজ লক্ষ্মী-নারায়ণ হরিহর নগরে, এবং তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্যামসুন্দর শ্যামগঞ্জে, মধ্যমপুত্র শূরনারায়ণ সূর্য্যকুণ্ডের বাড়ীতে বাস করেন। দয়াশীলা মহারাণী ভবানী সীতারামের পৌত্র প্রেমনারায়ণকে নলদী পরগণার মধ্যে কিছু জমিদারী বৃত্তি বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। নাটোর রাজসরকারের চাকলা ভূষণার অধীন নলদী পরগণা বিক্রীত হইলেই, প্রেমনারায়ণ মহারাণী-প্রদত্ত বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন। নলদী পরগণার খরিদদার দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, প্রেমনারায়ণের সমস্তবৃত্তান্ত শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রাজবংশের উপকার ও সম্মানরক্ষা এবং স্বজাতিপ্রিয়তা বশতঃ প্রেমনারায়ণকে বার্ষিক ১২০০৲ বার শত টাকা আয়ের

বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ টাকা নলদী পরগণার সদরকাছারী হইতে দেওয়া হইত। তখন সদরকাছারী মহম্মদপুরে সীতারামের রাজবাটীর পার্শ্বেই ছিল, পরে যশোহর জেলার অন্তর্গত লোহাগড়া থানার অধীন লক্ষ্মীপাশায় উঠিয়া যায়। কিছু দিন পরে, প্রেমনারায়ণের শেষ অবস্থায়, ঐ ভাতা ৬০০৲ ছয়শত টাকায় পরিণত হয়। প্রেমনারায়ণের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাধাকান্ত ও পৌত্র নবকুমার ৩৬০৲ তিন শত ষাটি টাকা হিসাবে যাবজ্জীবন পাইয়াছিলেন। নবকুমারের পরলোকের পর, তদীয় বিধবা পত্নী মাসিক ১০৲ দশ টাকা হিসাবে পাইতেন। নবকুমারের পত্নীর পরলোক গমনের পরে ঐ বৃত্তি বন্ধ হইয়া গিয়াছে, শ্রুত হয়। প্রথম প্রস্তাবে লিখিত আছে যে, নাটোরের দয়াশীলা দ্বিতীয়া অন্নপূর্ণা রাণী ভবাণী প্রেমনারায়ণকে বার্ষিক ৩৬০৲ টাকা ভাতা দিতেন, তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। তিনি প্রেমনারায়ণকে কতকগুলি সম্পত্তি বৃত্তি দিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব দেখিয়া, তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে।

সীতারামের গুরুদেব-ভবনের কুলপল্লীতে সীতারাম ও তাঁহার গুরু কৃষ্ণবল্লভ সম্বন্ধে যে গল্প লিখিত আছে, তাহা তৃতীয় প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে। তাহার প্রথমাংশ নিম্নে লিখিত হইল।

তৃতীয় প্রস্তাবে, কৃষ্ণপ্রসাদ ঠাকুর মহাশয়কে সীতারামের গুরুদেব বলা হইয়াছে, কিন্তু কৃষ্ণপ্রসাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণবল্লভই সীতারামের গুরু ছিলেন। (কৃষ্ণপ্রসাদ নহে।) ভূষণাপ্রদেশে শিষ্যালয়ে গতায়াত এবং স্বদেশীয় মহাপণ্ডিত, ইত্যাদি কারণে উদয়নারায়ণ ও সীতারামের সহিত কৃষ্ণবল্লভের চারি ভ্রাতার যথেষ্ট আলাপ পরিচয় ছিল। সীতারামের রাজত্বের কিছু পূর্ব্ব হইতেই গঙ্গাতীরবর্ত্তী প্রদেশে বর্গীর হাঙ্গামা অতিশয় প্রবল হইয়াছিল। তাহারা গৃহস্থের সর্ব্বস্বলুণ্ঠন, গৃহদাহ, স্ত্রী ও কন্যার সতীত্বনাশ প্রভৃতি পৈশাচিক অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়া, দেশ সম্পূর্ণ অরাজক করিয়া তুলিয়াছিল। কৃষ্ণবল্লভ বর্গীর অত্যাচারে অত্যন্ত প্রপীড়িত হইয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহাদিগের গৃহদেবতা ৺মোহন রায় বিগ্রহের অলঙ্কার আদি লুণ্ঠনে বাধা দিতে গিয়া, কৃষ্ণবল্লভের জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা কৃষ্ণকিঙ্করকে বর্গীর হস্তে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। বর্গীর আক্রমণ সময়ের কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। কখন কি অবস্থায় আসিয়া গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিত, কিছুই জানিবার উপায় ছিল না। বস্তুতঃ বর্গীর ভয়ে রাঢ় দেশের প্রত্যেক গৃহস্থই সর্ব্বদা শঙ্কিত থাকিত। অনেকেই পৈতৃক বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বঙ্গের নবাব অনেক চেষ্টা করিয়াও, বর্গীর হাঙ্গামা নিবারণে অসমর্থ হইয়াছিলেন। পরে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর সময়ে, তিনিই বর্গীর হাঙ্গামা নিবারণ করিয়া, প্রজাবর্গের দুঃখ বিমোচন করেন। কৃষ্ণবল্লভ বর্গীর অত্যাচারে যৎপরোনাস্তি ক্ষতিগ্রস্ত, শোকাকুল ও মর্ম্মাহত হইয়া, পরিবার ও আত্মীয়কুটুম্ব সহ দেশত্যাগের সংকল্প করিলেন। তখন দূরদেশে যাতায়াত বড়ই বিপদসঙ্কুল ছিল। পথিমধ্যে দস্যুভয় ইত্যাদি নানারূপ বিপদাশঙ্কা

ছিল। বিশেষতঃ তৎকালে "পথি নারী বিবর্জ্জিতা" কথাটীর সার্থকতা বিশেষরূপে প্রবলা ছিল। কৃষ্ণবল্লভ হঠাৎ আত্মীয়, বান্ধব ও পরিবার সহ কোথায় উপস্থিত হইবেন, ইত্যাদি চিন্তায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, মনে মনে নানারূপ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন টেঁয়ার নিকটবর্ত্তী কপিলেশ্বরের ঘাটে ভাগীরথীতে কৃষ্ণবল্লভ স্নান করিতেছিলেন, এমন সময়ে রাজা সীতারাম মুরশিদাবাদ হইতে গঙ্গার মধ্য দিয়া, নৌকায় স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। উভয় উভয়কে যথোচিত সাদরসম্ভাষণ ইত্যাদির পর, কৃষ্ণবল্লভ রাজা সীতারামকে নিজের দুরবস্থার কথা জানাইয়া, তাঁহার রাজ্যমধ্যে বাসোপযোগী স্থান প্রার্থনা করিলেন। রাজা সীতারাম তাঁহার প্রস্তাবে সন্তোষ সহকারে সম্মতি দিয়া, মহম্মদপুরে প্রত্যাবৃত্ত হন। কৃষ্ণবল্লভও কিছুদিন পরে, আত্মীয় স্বজন সহ যশোহর জেলার অধীন মহম্মদপুর থানার অন্তর্গত বিনোদপুরের নিকট ঘুন্নিয়া গ্রামে উপস্থিত হইয়া, সীতারামকে সংবাদ দেন। রাজা সীতারাম, কৃষ্ণবল্লভের আগমন সংবাদে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়া, তদীয় রাজধানীর নিকটেই যশপুর গ্রামে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। কৃষ্ণবল্লভের তখন ব্রাহ্মণ ব্যতীত কায়স্থ শিষ্য ছিল না। তিনি কায়স্থ ইত্যাদি জাতির দানও গ্রহণ করিতেন না, এজন্য তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণপ্রসাদের নামে, যশপুর গ্রামের কতক অংশ বার্ষিক ২৪৲ চব্বিশ টাকা কর ধার্য্য করিয়া, সীতারামের নিকট হইতে মৌরসী বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। অদ্যাপি সেই সম্পত্তি কৃষ্ণবল্লভের বংশধরগণের অধীনে আছে। সীতারাম কৃষ্ণবল্লভকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন, এবং পরে যে উপায়ে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হয়েন, সবিশেষ তৃতীয়প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে। সীতারাম কৃষ্ণবল্লভের নিকট দীক্ষিত হইবার পরে, গুরু-পুত্র আনন্দচন্দ্র ও গৌরীচরণকে অনেক ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে মহম্মদপুরের নিকট ঝামা মহেশপুরেই ১৫০/০ দেড় শত বিঘা ব্রহ্মোত্তর ছিল, তাহার প্রায় সমস্তই এক্ষণ নদীগর্ভে গিয়াছে। সীতারামের গুরুদেবের বাড়ীতে তৎপ্রদত্ত সনন্দ অদ্যাপি রহিয়াছে। সেই সনন্দে দৃষ্ট হয় যে, সীতারাম গুরুপুত্রদ্বয়কে ৮০০/০ আট শত বিঘা জমি নিষ্কর দান করিয়াছিলেন। এই সম্পত্তির অধিকাংশই তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের দখলে নাই। অনেক দিন হইতেই বেদখল হইয়াছেন। বিদেশীয় ব্রাহ্মণগণের অনেক স্থানেই এইরূপ নিষ্করসম্পত্তি হইতে বেদখল হওয়া দেখা যায়। "যার লাঠি তার মাটী"। অনেকে অনেকস্থলে, অনেক দুর্ব্বল ব্যক্তির সম্পত্তি বলপূর্ব্বক দখল করিয়া থাকেন, এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। সীতারামের মন্ত্রগ্রহণবিবরণ তৃতীয়-প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে।

সীতারামের রাজত্বসম্বন্ধে উক্ত কুলপঞ্জীতে সংক্ষিপ্ত যে বিবরণ আছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। বঙ্গের নবাবের অধীন "ফত্তাবাদ" নামক স্থানে, করিম খাঁ নামক একজন পাঠান নবাবের বিদ্রোহী হয়।

সীতারাম তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজয় পূর্ব্বক, নবাবের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। নবাব সীতারামের উপর যৎপরো-নাস্তি সন্তোষ লাভ করিয়া, পুরস্কার স্বরূপ নলদী পরগণা তাঁহাকে জায়গীর দান করেন। সীতারাম নলদী পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া, রীতিমত রাজস্ব আদায়পূর্ব্বক ভোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ অন্যান্য পরগণা দখল পূর্ব্বক, স্বীয় অধিকার বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি ২২ বাইশ পরগণার রাজা ছিলেন। অনেকে বলেন যে ৪৪ চুয়াল্লিশ পরগণা তাঁহার রাজত্বভুক্ত ছিল। সমগ্র রাজত্বের কত আয় ছিল, তাহার উল্লেখ নাই। নলদী পরগণা তাঁহার প্রথম জমিদারী, অর্থাৎ জায়গীর। ইহাই প্রথম হইতে তাঁহার দখলে ছিল। নলদী ব্যতীত অপর ভূভাগ ১৪ চতুর্দ্দশ বৎসর তাঁহার অধীনে ছিল। নবাবের সহিত বিবাদ ও যুদ্ধ ইত্যাদি সম্বন্ধে কুলপঞ্জীতে বেশী কিছু লিখিত নাই। সামান্যতঃ বর্ণিত আছে যে, নবাবের জামাতা আবুতোরাব চাকলা ভূষণার ফৌজদার ছিলেন; তাঁহার সহিত সীতারামের একটু মনোমালিন্য ছিল। মনোমালিন্য থাকিলেও, আবুতোরাব সীতারামের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে পারেন নাই, কারণ নলদী পরগণা সীতারামের জায়গীর ছিল। তিনি তাহার রাজস্ব রীতিমত নবাব-সরকারে দাখিল করিতেন। যখন সীতারাম যুদ্ধে জয়লাভ পূর্ব্বক অন্যান্য পরগণা নিজের জমিদারীভুক্ত, করিতে লাগিলেন, তোরাব সেই সময়ে সীতারামের বিরুদ্ধে নবাবের নিকট প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নবাব-দরবার হইতে তোরাবের প্রতি হুকুম আসিল যে, সীতারামের নিকট হইতে সমস্ত খাজানা আদায় করিয়া লয়েন। আবুতোরাব সীতা-রামের নিকট করের জন্য সংবাদ পাঠাই-লেন। সীতারাম রাজস্ব দিতে অস্বীকৃত হইয়া উত্তর দিলেন যে, নলদী পরগণা তাঁহার জায়গীর, অন্যান্য পরগণা তিনি যুদ্ধে জয় করিয়া লইয়াছেন। যদি রাজস্ব দিতে হয়, তবে তাঁহার অধিকার সময় হইতে দিবেন। এসম্বন্ধে কুলীজাফর খাঁকে উপযুক্ত নজরানা দিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহারা বর্ত্তমানে জমিদারী চালাইতে অক্ষম ও অনুপযুক্ত, কেহ বা স্ত্রীলোক, সুতরাং তাঁহাদের জমিদারী তিনি নিজ হেফাজতে রাখিয়া, নবাবসরকারের হিতসাধন করিতেছেন। ফৌজদার আবু-তোরাব এই মর্ম্মে নবাবের নিকট আরজি করিলেন। আরজির উত্তরে নবাব তোরাবের প্রতি আদেশ দিলেন যে, "উহাকে দস্তুর মাফিক শাসন কর"। এদিকে তোরাব সীতা-রামের প্রতি হুকুম দিলেন—"তুমি হপ্তামধ্যে টাকা পাঠাও"। সীতারাম সে আদেশ অবহেলা করিয়া, ভূষনার নিকট গোপালপুর ও অন্যান্য স্থানে যে পাঠান ও ভোজপুরী সৈন্য ছিল, তাহা সমবেত করিয়া, যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তোরাব সীতারামের প্রতি আদেশ করিলেন "তোমার স্ত্রী-পুত্রগণকে ও তোমাকে বেইজ্জত করিয়া, হাবুজখানায় পুরিয়া, ধান খাওয়াইয়া, টাকা আদায় করিয়া, তোমার জমিদারী খাস করা হইবে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীবরদাকান্ত দে।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্টীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১০ম বর্ষ, ১০ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।	ভাদ্র।	১৩১০ সাল, ১৮২৫ শকাব্দা।

অদৃষ্টই দেশভেদে জন্মের হেতু।

জ্ঞান ধর্ম্ম মনুষ্য মাত্রেরই সাধনীয়। সর্ব্বত্রেই তাহার গৌরব দৃষ্ট হয়। সকল দেশের ধর্ম্ম-পুস্তকেই তাহার ব্যবস্থা ও নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। ফলে সকল দেশের শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানের গভীরতা, ধর্ম্ম-ক্রিয়ার বিশুদ্ধতা, তৎসাধনের নিষ্ঠা, এবং উপাসনার অবলম্বন ও প্রকার একরূপ নহে। যে দেশের লোকের সাধারণতঃ যেমন প্রকৃতি, যেমন অভিরুচি, যেমন ধারণাশক্তি, যেমন অদৃষ্ট, তাঁহাদের শাস্ত্রোক্ত জ্ঞানের গভীরতা, ঈশ্বরে নিষ্ঠা ও ধর্ম্মকর্ম্মের পবিত্রতা তাহারই অনুরূপ। যেখানে যেমন প্রয়োজন, সেখানে বিধাতা সেইরূপ ব্যবস্থাপক। আমরা এমত বলিতে চাহিনা যে, কেবল আর্য্যশাস্ত্রই ঈশ্বর-প্রণীত, আর অন্যান্য বর্ণের শাস্ত্র সকল স্ববুদ্ধি-কল্পিত। কিন্তু মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, সকল দেশের শাস্ত্রই ও সকল দেশের ধর্ম্মই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ স্বরূপ। যিনি দন্তবিশিষ্ট মানবের প্রতি চর্ব্ব্য চোষ্য প্রভৃতি বিবিধ খাদ্যের বিধান করিয়াছেন, রোগীর পক্ষে লঘু আহারের নিয়ম করিয়াছেন, দন্তবিহীন শিশুর পক্ষে দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তিনি যে ভিন্ন ভিন্ন দেশের জনসমাজের সাধারণ প্রকৃতি, পূর্ব্ব সংস্কার, অধিকার, অদৃষ্ট, ধারণা, রুচি ও পরিপাকশক্তির অনুযায়ী ধর্ম্ম ও তৎসাধনের প্রকার, জ্ঞান ও তৎসাধনের প্রণালী প্রেরণ করিবেন, তাহা কিছুমাত্র বিস্ময়কর নহে। এই বিস্তীর্ণ নরলোক, অদৃশ্য স্বর্গলোক ও পর-লোক বিধাতার এইরূপ বিচিত্র ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ।

২। কৃতকর্ম্মের সঞ্চিতাংশ জীবের যে অদৃষ্টকে রচনা করে, তাহারই ফলভোগার্থে জীব যেমন পুনঃ পুনঃ উত্তমাধম লোকে ও উত্তমাধম কুলে জন্মগ্রহণ করেন, সেইরূপ অসংখ্য অসংখ্য মনুষ্য স্ব স্ব অদৃষ্টের ভোগসুলভ দেশবিশেষে ও সমাজবিশেষে জন্মিয়া থাকেন এবং সেই অদৃষ্ট অনুসারে তত্তদ্দেশপ্রচলিত শাস্ত্র ও ধর্ম্মদ্বারা শাসিত হইয়া থাকেন। জন্মভাগী জীবের পক্ষে আশ্চর্য্য কৌশলী ও বিচিত্র শক্তিমান্ বিধাতা পুরুষের এই সার্ব্বভৌমিক নিয়ম হইতে উদ্ধার লাভ সহজ নহে। যেমন নানা জীবের পারলৌকিক ভোগার্থ নানাপ্রকার উৎকৃষ্টো-ৎকৃষ্ট স্থান সপ্তশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া, দক্ষিণ ও উত্তরমার্গে বিস্তীর্ণভাবে সংস্থাপিত আছে; যেমন বিবিধ অশুভাচার জনিত পাপভো-গার্থে অধম হইতে অধমতর লোকসকল নির্ম্মিত হইয়াছে; সেইরূপ এই মর্ত্ত্যপুরীতে উপভোগের যোগ্য নানাপ্রকার শুভকর্ম্মের ফলভোগার্থ বিধাতার প্রণীত নানাপ্রকার ধর্ম্ম ও শাস্ত্র-দ্বারা শাসিত উত্তমাধম নানা-দেশ ও সম্প্রদায় সকল স্থাপিত রহিয়াছে। যে সকল মানবের অদৃষ্ট সামান্যতঃ যেরূপ দেশ বা জনসমাজের যোগ্য, তাঁহারা সেই রূপ দেশ বা সমাজে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মিয়া যেমন একদিকে অদৃষ্টের সমতা অনুসারে সামান্যতঃ স্ব স্ব প্রারব্ধের ভোগ ও পুনঃক্রিয়া করেন, সেইরূপ অন্যদিকে তাঁহাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব বিশেষ বিশেষ অদৃষ্ট যাহা কিছু থাকে, তদনুযায়ী ভোগ ও ক্রিয়া দ্বারা এই সংসারে বিচিত্রতা দেখাইয়া থাকেন।

৩। এইরূপে সামান্য ও বিশেষ বিশেষ অদৃষ্ট লইয়া, স্ব স্ব কর্ম্মসূত্র ধরিয়া, জীব-সকল যাতায়াত করিতেছেন। ইহারই জন্য এই মর্ত্ত্যপুরীতে একদিকে দেশগত, সমাজ-গত, সম্প্রদায়গত, উপাসনা ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রকারগত, আহার-ব্যবহারের রীতিগত, ধর্ম্মসাধনের প্রণালীগত, ইত্যাদি সামান্য সামান্য বিভিন্নতা বিরাজ করিতেছে; অন্য-দিকে প্রত্যেক ব্যক্তির অদৃষ্টের বিশেষতা প্রত্যেক দেশ বা সমাজের অভ্যন্তরে ধর্ম্মা-ধর্ম্মের ব্যক্তিগত বিচিত্রতা দেখাইতেছে। এরূপ বলিলে বোধ হয় অশাস্ত্র হইবেনা যে, সামান্যতঃ যে সকল মানবের অদৃষ্ট ইউরোপের ধর্ম্মশাসনের ও তদ্দেশসুলভ ভোগাপভোগের যোগ্য, তাঁহারা সেই দেশে জন্মেন। আর যাঁহারা ভারতবর্ষে আসি-বার যোগ্য, তাঁহারা ভারতেই জন্মেন। এস্থানে স্বভাবতঃ সকলের মনে এই প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, যে, ধরাপৃষ্ঠে নানা-দেশ, নানাসমাজ, যদি কেবল অদৃষ্টভো-গেরই স্থান হইল, তবে তন্মধ্যে কোন্ দেশ ও কোন্ সমাজ শুভাদৃষ্টভোগের ও শুভা-দৃষ্ট সঞ্চয়ের স্থান ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট?

৪। ইহার উত্তর এই যে, যেমন স্বর্গসকলের মধ্যে ব্রহ্মলোক সর্ব্বোৎকৃষ্ট, সেইরূপ এই মর্ত্ত্যলোকে এই ভারতবর্ষ সর্ব্ববর্ষোত্তম পুণ্যক্ষেত্র। এই স্থানে পিতৃ, দেব ও ব্রহ্ম-ভুবনের পথপ্রদর্শক আতিবাহিকী দেবতা-স্বরূপ মানব প্রকৃতিস্থ ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নাখ্য নাড়ীত্রয় পুণ্যসলিলা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীরূপে সর্ব্বপ্রকার আশ্রমকে পবিত্র করিয়া থাকেন। এই স্থানে অযোধ্যা, মথুরা, মায়া,

কাশী, কাঞ্চী, অবন্তী, দ্বারকা প্রভৃতি মোক্ষপুরী সকল পাপী তাপী অর্থী প্রার্থী জনগণের শান্তি বিধানার্থে সংস্থাপিত আছেন। এই স্থানে নর-নারীর সুকৃতির সুফল ও কালান্তরভাবী মুক্তি বিধানার্থ গোলোকধাম, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুপদ প্রভৃতি মহা স্বর্গীয় কক্ষা সকল; গোকুল, ব্রহ্মাবর্ত্ত, গয়াতীর্থ প্রভৃতি ভৌমস্বর্গধাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া আছেন। এই স্থানে যোগ ও মোক্ষধর্ম্মের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তিস্বরূপ যোগীবর-হরভৈরব-যামিক-পরিরক্ষিত মহাশক্তি-পীঠ-মালা হিমাদ্রি ব্রহ্মপুত্র পারাবার বেষ্টিত গিরিপৃষ্ঠে, অরণ্যে, নদীতীরে, মহানগরে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদে, সর্ব্বত্রে শোভা পাইতে-ছেন। এই স্থানে বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণগণের শুভ ভবন সকল স্বর্গাপবর্গাদি শতগুণ আনন্দ-সোপানের প্রথম সোপানরূপে পরি-কীর্ত্তিত হয়েন। এই দেশে ঘরে ঘরে যজ্ঞপুরুষ নারায়ণের প্রতিমূর্ত্তি সকল প্রতি-ষ্ঠিত আছেন এবং তাঁহার পাদপদ্মদর্শন ও তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক আশ্রমীগণ সর্ব্বকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন। এই দেশে মনুষ্য সকল তাঁহার পূজা না করিয়া এবং নিত্য সন্ধ্যা-উপাসনা না করিয়া জলগ্রহণ করেন না এবং তাঁহাকে নিবেদন না করিয়া ষড়ঋতু-জাত কোন ফল-শস্য ও কোন সুখ ভোগ করেন না। গৃহস্থের পক্ষে পিতামহ যেমন পূজনীয়, পিতামাতা যেমন ভক্তিভাজন, স্ত্রী যেমন সহধর্ম্মিণী, স্বামী যেমন স্ত্রীর আশ্রয়তরু, সন্তান যেমন স্নেহের ধন, এই পুণ্য-স্থানের লোকের দৃষ্টিতে নারায়ণ তদ্রূপ। এই পবিত্র বর্ষের লোকেরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কোন ক্রিয়ানুষ্ঠান ও কোন আমোদ প্রমোদ করেন না।

৫। ব্রহ্ম হইতে অস্বতন্ত্রা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবা-ত্মিকা মহাবিদ্যাস্বরূপিণী যে মহামায়া শক্তির বিবর্ত্তে এই জগৎ আবর্ত্তিত হইতেছে; যিনি সৃষ্টিশক্তিরূপে মহাপ্রলয় সময়ে অব্য-ক্তাবস্থা লাভপূর্ব্বক প্রলয়ে লীন জীবগণের নিরুদ্ধবৃত্তির শান্তি বিধানার্থ মহাঘোরা কালরাত্রিস্বরূপিণী ভয়ঙ্করী দুর্গামূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন; যাঁহার হৃদয়ে নারায়ণ তৎকালে ঐশ্বর্য্য সম্বরণ পূর্ব্বক জগদুদয়-কালাপেক্ষায় বাস করিয়াছিলেন; সেই ব্রহ্মসনাতনী নারায়ণী দুর্গাদেবীকে এই সর্ব্ববর্ষোত্তম ভারতবর্ষীয় জন সকল বর্ষে বর্ষে শরৎকালে আপনাদের যথাসর্ব্বস্ব দিয়া পূজা করিয়া থাকেন। সেই সময়ে সিন্ধু, হিমগিরি, ব্রহ্মপুত্র, সাগর-পরিবেষ্টিত ভার-তের ঘরে ঘরে আনন্দের সীমা থাকেনা। হোম, যাগ, চণ্ডীপাঠ, কুমারীপূজা, ব্রাহ্মণ-ভোজন, অতিথিসৎকার, বাদ্যভাণ্ড, নৃত্য-গীত প্রভৃতি দ্বারা গ্রাম-নগর আনন্দোৎসবে পরিণত হয়। তদ্ব্যতীত উক্ত ভুবনেশ্বরীর কতপ্রকার মূর্ত্তির পূজাই যে কত সময়ে কত সমারোহে ভারতের স্থানে স্থানে আচরিত হয়, তাহার নিরূপণ নাই। মা বলিয়া ডাকিলে, মনুষ্যের হৃদয়ে যে স্বর্গসুখ-বিনিন্দিত আনন্দ জন্মে, মা ব্রহ্মময়ীকে ভারতবাসিগণ মা বলিয়া সেই পরমানন্দ উপভোগ করেন। এই একপ্রকার রসের উদাহরণ মাত্র। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা কল-নামান্তরে তাঁহাকে কখনও বাবা বলিয়া ডাকিতেছেন, কখনও সখা বলিয়া

ডাকিতেছেন, কখনও নায়িকা বলিয়া আরাধনা করিতেছেন এবং কখনওবা গোপাল বলিয়া তাঁহাকে ক্ষীর, সর, নবনীত নিবেদন পূর্ব্বক অকৃত্রিম পুত্র-বাৎসল্য প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপে ভগবান নানা দেবদেবী রূপে সমস্ত গৃহমেধীগণের গৃহদেবতা হইয়া, তাঁহাদের ভদ্রাসনের প্রধান পীঠ এবং হৃদয়ের রত্নবেদী গ্রহণ করিয়া আছেন। এই মহাপবিত্র ভারতভূমিতে তিনি যেমন পরমপূজনীয় পরমাত্মীয় গৃহদেবতা ও হৃদয়েশ্বর, সেইরূপ তিনি আত্মধ্যানপরায়ণ যোগী ও জ্ঞানীজন-সেব্য আত্মার আত্মা পরমাত্মা। এই মহাপুণ্য-ক্ষেত্রে কেবল গৃহ, হৃদয় ও আত্মার সঙ্গে তাঁহার নৈকট্য সম্বন্ধ। যাঁহারা আত্মাতে তাঁহাকে আত্মস্থ দেখেন, তাঁহারা তাঁহাকে বিনা ব্যবধানে দর্শন করেন। যাঁহারা হৃদয়-সরোজিনীর কর্ণিকা মধ্যে তাঁহার প্রেমানন্দ-মকরন্দ পান করেন, তাঁহারা সন্মুখসম্বন্ধে তাঁহার প্রসাদ লাভ করেন। এবং যাঁহারা স্ব স্ব গৃহে, স্ব স্ব গ্রামে এবং তীর্থধামে মহোৎসব সহকারে তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞ, প্রতিমা-পূজা ও হোমাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা গৃহ, গ্রাম ও সমগ্র ভারতক্ষেত্রকে তাঁহার মন্দিররূপে দর্শন করেন। এই মহানৈকট্য সম্বন্ধের আকর্ষণে উর্দ্ধ উর্দ্ধ স্বর্গীয় কক্ষা সকল ভারতভুবনে অবতীর্ণ হইয়া ভারতবাসীগণকে কৃতার্থ করিতেছেন। এমন মহা পবিত্র যে ভারতবর্ষ, তাহাকে যদি সর্ব্ববর্ষোত্তম না বল, তবে তোমার বুদ্ধিকে ধিক্।

৬। এই স্থানই নানা মূর্ত্তিতে বিষ্ণুর, সদাশিবের ও ব্রহ্মময়ী মহাশক্তির অবতরণ ও আবির্ভাবক্ষেত্র। ধর্ম্ম ও মোক্ষ সাধনের ভূমি বিধায়, এস্থানে যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি, ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, তখন তখন ভগবান অবতীর্ণ হয়েন। এই স্থানের প্রতি তাঁহার এই বিশেষ করুণা। এই দেশেই তিনি ঐরূপে যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্টের দমন, সাধুদিগের ত্রাণ, এবং ফল-সাধন ও মোক্ষসাধন ধর্ম্মের পুনঃসংস্কার করেন। এই দেশেই তিনি পুরুষ ও শক্তি, পিতৃ ও মাতৃ অংশে, নানা দেব-দেবী রূপে অবতীর্ণ হইয়া, স্বীয় কর্ম্মনিষ্ঠ, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী প্রভৃতি ভক্তদিগকে ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গরূপ তত্ত্বসকল; আধিদৈব, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক প্রভাব সকল; উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার জন্য, তাবৎ শক্তি, গুণ, প্রেম, বৈরাগ্য, বিভূতি ও বৈরাটিক অলঙ্কার সমূহকে স্বীয় পরিগৃহীত রূপ-সকল দ্বারা আবিষ্কার করিয়া থাকেন। এই দেশেই মহা মহা ভক্তেরা তাঁহার ঐ সকল রূপ, নাম, শক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য রূপ অবলম্বন ও উপায়দ্বারা অন্তে ব্রহ্মজ্ঞানে আরোহণ করেন। এই স্থানই শব্দব্রহ্মরূপ বেদধারী, অপরব্রহ্মসেবী তপঃ-পরায়ণ এবং পরব্রহ্মনিষ্ঠ আত্মজ্ঞানী ব্রাহ্মণগণের মহা সম্মান-ক্ষেত্র। এই স্থানেই দ্বাপর যুগের অবসানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া, মহারাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে স্বহস্তে লক্ষ ব্রাহ্মণের পাদধৌত করতঃ-ব্রাহ্মণ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। এই স্থানেই নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধ সন্ন্যাসধর্ম্মের এবং সাধ্য-সাধন-নিরপেক্ষ সর্ব্ববিজ্ঞানশ্রেষ্ঠ বেদান্ত-বিজ্ঞানের পরমাদর বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত।

হিন্দু-পত্রিকা।

১৩০৯ সালের সূচীপত্র।

এই স্থানেই ধর্ম্মকল্পবৃক্ষ সর্ব্ব প্রকার অধিকারীকে যথাযোগ্য ফল বিতরণ করিতেছে। এই স্থানই সর্ব্ববর্ণ ও সর্ব্বাশ্রমীর সনাতন শিষ্টাচার-ক্ষেত্র। এই স্থানেই ভগবানকে শত্রুভাবে দৃষ্টি করিয়া বীরগণ সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করিয়াছেন। এমন মহা পবিত্রবর্ষকে যদি সর্ব্ববর্ষোত্তম না বল, তবে তোমার বুদ্ধিকে ধিক্।

৭। অতএব এই স্থানই ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ ফলসাধনের কর্ম্মভূমি। অন্যান্য বর্ষে ধর্ম্ম ও মোক্ষসাধন নাই। সে সকল বর্ষ কেবল অর্থ ও কাম-বিরচিত ভোগ-ভূমি। তথাকার লোকেরা রম্য হর্ম্ম্যে বাস করেন বটে, বেশবিন্যাসে সুপটু বটেন, অশ্বরথাদিতে গমনাগমন করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের গৃহে নারায়ণের সেবা প্রতিষ্ঠিত নাই। তাঁহারা নারায়ণের পবিত্রনাম জপ করেন না, তাঁহারা ফল-শস্যাদি আহারীয় দ্রব্য তাঁহাকে নিবেদন না করিয়াই আহার করেন, তাঁহারা কেবল ভোগে উন্মত্ত। সুতরাং সে সকল বর্ষ কেবল অর্থ ও কামের মহা ভোগভূমি; ধর্ম্মকর্ম্ম বা মোক্ষসাধনের ভূমি নহে। কিন্তু ভারতবর্ষ যেমন ধর্ম্মকর্ম্ম সাধনের স্থান, সেইরূপ মোক্ষসাধনের ভূমি।

৮। ভারতবর্ষে একমাত্র নারায়ণপর দেবতাদের সহিত নারায়ণপর বেদাদিশাস্ত্রীয় বিধানানুযায়ী মানবগণের আদান-প্রদান সম্বন্ধ। ভারতের নারায়ণনিষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা সাধুপুরুষেরা বেদরূপ দিব্যচক্ষুতে দেখিতে পান যে, দেবতারা তাঁহাদের অশেষপ্রকার উপকার করিতেছেন। ইন্দ্রদেবরাজ পর্জ্জন্য-বর্ষণ পূর্ব্বক ধরণীকে উর্ব্বরা করিতেছেন। চন্দ্র-সূর্য্য শিশির ও উত্তাপদ্বারা ফল-শস্যের পুষ্টিবিধান করিতেছেন। মরুদ্‌গণ দোহাল-স্বরূপ হইয়া অক্ষীণগর্জ্জিত মেঘরূপীগাভীকে দোহন করতঃ ক্ষীরধার স্বরূপ জলধারাদ্বারা প্রজাপালন করিতেছেন। রুদ্র, উষা, পুষা, স্বাহা, স্বধা, বরুণ, প্রভৃতি দেবগণ মনুষ্যের বল-বীর্য্য-আরোগ্যাদি মঙ্গল বিধান করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া, ভারতবাসীগণ প্রেমে গদ্‌গদ হইয়া সেই সকল দেবগণের উদ্দেশে হোম-যাগাদি ক্রিয়া আচরণ করিয়া থাকেন এবং তাহার সম্ভাবিত ফলসকল নারায়ণের পাদপদ্মে সমর্পণ করেন। ভগবদ্‌গীতায় কহিয়াছেন।—(৩য় অঃ॥)

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষবোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥১০
দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥১১॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তা ন প্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২॥
যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩॥

প্রজাপতি পুরাকালে যজ্ঞাধিকার সহকারে প্রজা সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাদিগকে কহিয়াছিলেন, তোমরা যজ্ঞকার্য্য দ্বারা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হও। যজ্ঞই তোমাদের অভীষ্ট ও ভোগপ্রদ হইবে। তোমরা যজ্ঞ দ্বারা দেবতাদিগকে বর্দ্ধিত করিবে এবং তাঁহারা বৃষ্টি আদি দ্বারা অন্নাদি উৎপন্ন করিয়া তোমাদিগকে বর্দ্ধিত করিবেন। এইরূপে দেবতারা ও তোমরা পরস্পর সংবর্দ্ধিত হইয়া পরমশ্রেয়ঃ লাভ করিতে থাকিবে। দেবগণ যজ্ঞে বর্দ্ধিত হইয়া বৃষ্টি আদি দ্বারা তোমাদিগকে অভিলষিত ভোগ্যদ্রব্য প্রদান করিবেন। অতএব যে ব্যক্তি সেই দেবগণের দত্ত অন্নাদি তাঁহাদিগকে না দিয়া ভোগ করিবে, তাহাকে তস্কর বলিয়া জানিবে। যাঁহারা বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞের অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন, সেই সাধুরা "পঞ্চসূনা" জনিত পাপ হইতে মুক্ত হন। আর যাহারা কেবল লোভপরবশ হইয়া আপনাদের উদর পূরণের নিমিত্তে অন্ন পাক করে, তাহারা কেবল পাপই ভোগ করিয়া থাকে।

৯। এইরূপ দেবতা ও মনুষ্যের মধ্যে আদান-প্রদান সম্বন্ধ ভারতের সনাতন ধর্ম্ম। ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজারা কেবল দেবতাদের পূজার নিমিত্তই প্রজার নিকট ভূমির কর গ্রহণ ও কৃষিকর্ম্ম করিতেন। ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বৃষ্টি, উত্তাপ, শিশির প্রভৃতি পরিবেশন পূর্ব্বক ভূমি হইতে শস্য উৎপন্ন করেন। সেই ভূমির কর ন্যায্যরূপে দেবতাদিগেরই প্রাপ্য। রাজা, দেবতাদিগকে তাহা দিবার নিমিত্তে প্রজার নিকট হইতে ভূমির কর লইতেন। তদ্দ্বারা মহা মহা যজ্ঞ করিতেন। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে মহারাজ দিলীপের বিবরণে এই সনাতন ধর্ম্মের উদাহরণ দর্শাইয়াছেন, যথা—

দুদোহ গাং স যজ্ঞায় শস্যায় মঘবা দিবম্।
সম্পদ্বিনিময়েনোভৌ দধতুর্ভুবনদ্বয়ং ॥১॥২৬॥

মহারাজ দিলীপ দেবগণের তুষ্টিসাধন যজ্ঞের নিমিত্তে পৃথিবীকে দোহন করিয়া লইতেন, আর ইন্দ্র পৃথিবীকে বর্দ্ধনের নিমিত্তে স্বর্গকে দোহন করিতেন; অর্থাৎ পর্জন্য বর্ষণ করিতেন। এইরূপে সম্পদ্-বিনিময় দ্বারা তাঁহারা উভয়ে উভয় ভুবন—অর্থাৎ স্বর্গ ও পৃথিবী রক্ষা করিতেন।

১০। দেব ও মনুষ্যের এই বিনিময়ের ভাব ভারতের সনাতন ধর্ম্ম। মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের বিবরণে আছে যে, উক্ত রাজার দুঃখের ও ধর্ম্ম-পরীক্ষার একশেষ হইলে, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন—

আরোহ ত্রিদিবং রাজন্ ভার্য্যা-পুত্র-সমন্বিতঃ।
সুদুষ্প্রাপং নরৈরন্যৈর্জ্জিতমাত্মীয় কর্ম্মভিঃ ॥৮॥২৩৮॥

রাজন্! তুমি ভার্য্যা ও পুত্রের সহিত স্বর্গে আরোহণ কর। এই স্বর্গ অন্যের পক্ষে দুর্লভ। তুমি নিজ কর্ম্ম দ্বারা তাহা আয়ত্ত করিয়াছ।

কতিপয় উত্তর প্রত্যুত্তরের পর রাজা কহিলেন, যদি কোশলবাসী আমার প্রজাগণ আমার সহিত স্বর্গে যাইতে পারে, তবে আমি স্বর্গে যাইতে পারি। নতুবা "ততোঽহমপি যাস্যামি নরকং বাপি তৈঃ সহ" আমি তাহাদের সহিত নরকে গমন করিব। ইন্দ্র কহিলেন, কোশলবাসী জনগণের মধ্যে কেহবা পুণ্যশীল, কেহবা পাপাত্মা, তাহাদের কর্ম্ম ও ফল ভিন্ন ভিন্ন। অতএব স্বর্গ কিরূপে সকলের ভোগ্য হইতে পারে? তুমিই বা কিরূপে তাহাদিগকে লইয়া স্বর্গে গমন করিতে পার? একথায় রাজা উত্তর করিলেন।—

শক্র ভুঙ্‌ক্তে নৃপো রাজ্যং প্রভাবেন কুটুম্বিনাম্।
যজতেচ মহা যজ্ঞৈঃ কর্ম্ম পৌর্ত্তং করোতি চ ॥
তচ্চ তেষাং প্রভাবেন ময়া সর্ব্বমনুষ্ঠিতং।
উপকর্ত্তৄন্ নসন্ত্যক্ষে তানহং স্বর্গলিপ্সয়া ॥
তস্মাদ্ যন্মম দেবেশ কিঞ্চিদস্তি সুচেষ্টিতং।
দত্তমিষ্টমথোজপ্তং সামান্যং তৈস্তদস্তনঃ ॥
বহুকালোপভোগ্যংহি ফলং জন্মম কর্ম্মণঃ।
তদস্তু দিনমপ্যেকং তৈঃ সমং ত্বৎ প্রসাদতঃ ॥

রাজগণ অনুগত প্রজাগণের প্রভাবেই রাজ্যভোগ করেন, ও পূর্ত্তাদি কর্ম্ম সমুদয় করিয়া থাকেন। আমি সেইরূপ, প্রজার প্রভাবে ও আনুকূল্যেই রাজ্যভোগ, যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতি সমুদয় কর্ম্ম করিয়াছি। সুতরাং তাহারা আমার উপকারী। এমন অবস্থায় স্বর্গলাভের নিমিত্ত আমি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিনা। অতএব দেবরাজ! আমি যাহা কিছু সুকার্য্য করিয়াছি, যাহা কিছু জপ করিয়াছি, প্রজারা তৎসমুদয় ফলের অংশী হউক। আমি যে সমুদয় পুণ্যের ফল একাকী বহুকাল ভোগ করিতাম, তাহা যদি তাহাদের সহিত বিভক্ত করিয়া একদিনও ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে, তাহাই আমার প্রার্থনীয়।

১১। মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের এই নিঃস্বার্থভাব ও ন্যায়পরতা দৃষ্টে ইন্দ্র তাঁহাকে প্রজাগণের সহিত স্বর্গে যাইতে অনুমতি করিলেন। এই আখ্যায়িকা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, এই ভারতে প্রজাগণ রাজার যজ্ঞাদি শুভ কর্ম্মের ফলভাগী। কেননা ফল-শস্যাদি লাভের নিমিত্তে তাহার একাংশের মূল্য কর স্বরূপে যদি দেবগণকে দেওয়া যায়, তবে তাদৃশ কৃতজ্ঞতারূপ পরমধর্ম্মের ফলভাগী রাজা-প্রজা উভয়েই। রাজা, দেবগণ ও প্রজাগণের মধ্যবর্ত্তী স্বরূপ। তিনি যজ্ঞাদি দ্বারা দেবারাধনা করেন বটে; কিন্তু সেকার্য্যে প্রজাগণের অংশ আছে। এই সমস্ত বিনিময়ধর্ম্ম, ন্যায়পরতা, রাজা-প্রজা-সম্বন্ধ, এবং নিগূঢ়তত্ত্ব ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম্ম। ভারতবাসীগণ তদনুসারে স্বীয় স্বীয় ও রাজকীয় যজ্ঞাদি ক্রিয়ার যোগে

আপনাদের সুখভোগের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ পবিত্র উপহার সকল বেদ-দ্বারে উপস্থিত করিয়া দেন।

১২। গৃহস্থাশ্রমে, উদূখল, জাঁতা, চুল্লী, জলকুম্ভ ও সংমার্জ্জনী, এই পঞ্চ প্রকার হিংসা-স্থান আছে। তাহাকে "পঞ্চসূনা" কহে। তাহাতে অহরহ বিস্তর ক্ষুদ্র জীব নষ্ট হয়। ঐ পঞ্চবিধ উপায় দ্বারা গৃহস্থ প্রতিদিন যে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করেন, তাহার অগ্রভাগ বৈশ্বদেবগণকে নিবেদন করিতে হয়। তাহা করিলেই ঐ পঞ্চসূনা-জনিত পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। এই বর্ত্তমান কালেও এই পঞ্চসূনাযজ্ঞ ভারতের নানাস্থানে যথা বিধানে দ্বিজাতিদিগের ভবনে নিত্য অনুষ্ঠিত হয়; এবং এই বঙ্গদেশে প্রত্যেক ভদ্রের ভবনে নারায়ণের নিত্য সেবা উক্ত যজ্ঞের এবং অন্যান্য বহুতর বৈদিক নিত্যকর্ম্মের স্থান গ্রহণ করিয়াছে।

১৩। "যজ্ঞাদ্‌ভবতি পর্জ্জন্য" যজ্ঞধূমে মেঘ জন্মে; মেঘহইতে বৃষ্টি হইয়া বসুন্ধরার অশেষ কল্যাণ হয়। এনিমিত্তে দেবোদ্দেশে যজ্ঞ ও হোমাদি ক্রিয়া করা ভারতবাসীদিগের ধর্ম্ম। এরূপ ধর্ম্মক্রিয়া অন্য কোন বর্ষে নাই। ১৮৭৪ সালের অনাবৃষ্টি নিবন্ধন বেহার্ প্রদেশের দুর্ভিক্ষ সময়ে কোন পাদরী দর্শাইয়াছিলেন যে, কোন কোন বড় বড় যুদ্ধসময়ে কামানের ধূমে মেঘোৎপন্ন হইয়া বৃষ্টি হইয়াছিল। অতএব বৃষ্টির অভাবস্থলে কামান দাগা উচিত। কিন্তু আমাদের বক্তব্য এই যে, ভারতের বেদবিধি ইউ-রোপীয় বিজ্ঞানের উপরি প্রতিষ্ঠিত নহেন। তিনি ধর্ম্মেতে প্রতিষ্ঠিত, সনাতন, এবং সময়ে ফলদান করেন।

অন্ন শুক্র-শোণিতরূপে পরিণত হয়, এজন্য কহিয়াছেন "অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি" অন্ন হইতে ভূত সকল জন্মে। পর্জ্জন্য হইতে অন্ন জন্মে। আর পর্জ্জন্য অর্থাৎ মেঘ যজ্ঞীয় (মন্ত্রপূত) ধূমাদি দ্বারা উৎপন্ন হয়। এবং সেই যজ্ঞ যজ্ঞকারীদিগের ক্রিয়া-ব্যাপাররূপ কর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত হয়। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা" ইতি শ্রুতেঃ॥" অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সকল সূর্য্যলোকে থাকে। অতএব সূর্য্য হইতে বৃষ্টি, বৃষ্টি হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে প্রজা জন্মে। ইহা শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। শাস্ত্রবিধি—বিজ্ঞান বা হেতুবাদ-মূলক নহেন। তদ-নুযায়ী ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলেই ফলোৎপন্ন হয়। ইহাই ভারতের ধর্ম্ম।

১৪। আমাদের বিশ্বাস এই যে, ভারত-বাসীগণ যদি বেদাগম-বিহিত হোমাদি-যুক্ত যজ্ঞ ও দেবার্চ্চনাদি ক্রিয়া করেন, তবে এত অনাবৃষ্টি হয়না। যে পরিমাণে যজ্ঞাদি ক্রিয়ার হ্রাস হইতেছে, সেই পরিমাণে জনসমাজে হাহাকার উঠিয়াছে। ভারতীয় শাস্ত্রবিধি স্বীয় সন্তানদিগের বর্ত্তমান লোভ ও স্বার্থপরিপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা হতবল ও হতমান হইয়া আছেন। তাঁহার মর্য্যাদা না রাখিলে ভারতের মঙ্গল হইবেক না। অন্যান্য বর্ষে তাঁহার আদর নাই। তথা নরলোক ও দেবলোকের পরস্পর বর্দ্ধিত-করণরূপ যজ্ঞক্রিয়ার প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের মধ্যে দৈবশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও অদৃষ্টের প্রভাব নাই। সুতরাং সে সকলের প্রতি তাঁহারা নির্ভর করেন না। তাঁহারা অধিকাংশতঃ

পুরুষকারের প্রতি নির্ভর করেন। অভিমান, লোভ ও তীব্রকামনাই তাহার নিয়ামক। দৈববিধি, দেবপ্রভাব, দেবপ্রসাদ-পরিপূর্ণ ধর্ম্মক্রিয়া তাঁহাদের নির্ভরস্থল নহে, এবং তাঁহাদের ধর্ম্মালয়ের প্রার্থনা-সমস্ত স্বর্গ ও মর্ত্ত্যপুরীর সহ আদান-প্রদান-সম্বন্ধযুক্ত বিনিময়-ধর্ম্ম নহে।

১৫। বিশেষতঃ সে সকল বর্ষের লোকেরা প্রায় মাংস দ্বারা উদর পূর্ণ করেন। পশুদিগের প্রতি পশুবৎ ব্যবহার করিয়া তাহাদের মাংস লাভ করেন। নানাবিধ কৌশলাবলম্বন পূর্ব্বক অন্যান্য দেশ হইতে ভোজ্য দ্রব্যাদি লইয়া গিয়া উপভোগ করেন। কল, বল ও কৌশলই তাঁহাদের যন্ত্র। সুতরাং তাঁহারা প্রাপ্য-লাভের নিমিত্তে দেবারাধনা ও যজ্ঞানুষ্ঠান প্রয়োজনীয় বোধ করেন না। তাঁহাদের অনুশাসনার্থ সেরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রও নাহি। কিন্তু ভারতবাসীগণ সর্ব্ব প্রকার মঙ্গলার্থ-অনুষ্ঠান বিধায়ক বিধিশাস্ত্রের শাসনাধীন বাস করেন, এবং সদা ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে ধর্ম্মচর্চ্চিত মনোবুদ্ধি ধারণ করেন। তাঁহাদের মনে অবৈধ ছল-বল-কল-কৌশল স্থান পায়না। দেবধর্ম্মের অভাব, পুরুষকাররূপ অভিমান, অপরিমেয় চিন্তা ও লোভাতিশয্য হইতেই কল-কৌশল জন্মে। ভারতের সেরূপ লোভাতিশয্য ও ও তজ্জনিত চিত্তের উদ্বেগ নাই, সুতরাং সে সমস্ত যন্ত্রও নাই। তাঁহার একমাত্র উপায় ও লক্ষ্য দেবারাধনা। তাঁহার সে উপায়টী মূঢ়রূপে স্বার্থযুক্ত নহে। কিন্তু সরল, সরস, দেবভক্তি-চর্চ্চিত এবং নিগূঢ় বৈরাগ্যযুক্ত। কেননা, তাঁহার উদ্দেশ্যই দেবারাধনা দ্বারা দেব-প্রসাদরূপে ভক্ষ্য, পেয়, পরিধেয় ও অপর সুখ লাভ করা। কিন্তু অন্যান্য বর্ষের উপায়গুলি কেবল ভোগার্থ এবং শরীর ও ইন্দ্রিয় চরিতার্থ-করণার্থ। দেবার্থ বা ধর্ম্মার্থ নহে। অতএব তথা দেবার্থ বা ধর্ম্মার্থ যজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রয়োজন হয় না এবং তাহার ব্যবস্থারূপ কোন শাস্ত্রও নাহি। কেবল ভোগার্থ উপায়-প্রয়োগ মাত্রই তথাকার কর্ম্ম। সে কর্ম্ম আমাদের শাস্ত্রদৃষ্টিতে কর্ম্ম নহে। আমাদের যাহা কর্ম্ম, তাহা বেদাগম-বিহিত ধর্ম্ম। কেবল কর্ম্ম আর ধর্ম্ম, এই নাম-ভেদ মাত্র। সুতরাং সে সকল বর্ষ কর্ম্মভূমি নহে; সর্ব্বতোভাবে ভোগভূমি।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

ব্রহ্ম-শক্তি।

দেবতা ও অসুরদিগের মধ্যে যে সংগ্রাম হয়, তাহাতে ব্রহ্মের কৃপায় দেবতাদিগের জয় হয়। জয়লাভ করিয়া তাঁহাদের মনে অত্যন্ত গর্ব্ব উপস্থিত হয়; তাঁহারা ভাবিলেন, তাঁহাদের স্বীয় ক্ষমতাতেই এই জয়লাভ করিয়াছেন।

ব্রহ্ম তাঁহাদের এই ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, উহা নিরাকরণের জন্য তাঁহাদিগের নিকট এক অদ্ভুত দেহ ধারণ পূর্ব্বক দেখা দিলেন; কিন্তু দেবতারা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তাঁহারা সকলে অগ্নিকে বলিলেন,

(কারণ অগ্নিই তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগামী) জাতবেদ, তুমি দেখ দেখি, ইনি আমাদের পূজনীয় কি না। জাতবেদ তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মের নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্ম যেন জানেন না, এইভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? অগ্নি যেন একটু বিরক্ত হইলেন; তিনি এত বড় দেবতা, তাঁহার আবার পরিচয়! তিনি বাহাদুরি করিয়া বলিলেন, আমি অগ্নি—জাতবেদ। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি শক্তি আছে? জাতবেদ বলিলেন, আমি তাবৎ বস্তু দগ্ধ করিতে পারি। এই কথা শুনিয়া ব্রহ্ম এক গাছি তৃণ দিয়া বলিলেন, ইহাকে দগ্ধ কর। অগ্নি তখন তাঁহার সমগ্র শক্তি প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তৃণ দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ব্রহ্মের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, দেবতাদিগের নিকট গমন করিয়া বলিলেন যে, এই অদ্ভুত মূর্ত্তি পূজনীয় কি না, তাহা তিনি নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না।

এবার বায়ুকে ভার দেওয়া হইল। দেবতারা বলিলেন, বায়ু, তুমি দেখিয়া আইস, ইনি আমাদের পূজনীয় কি না। বায়ু তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্ম-সন্নিধানে গমন করিলেন।

ব্রহ্ম পূর্ব্ববৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? আমি বায়ু—আমি মাতরিশ্বা। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি প্রকার শক্তি আছে? বায়ু বলিলেন, আমি তাবৎ বস্তুকেই পরিচালন করিতে পারি। ব্রহ্ম একগাছি তৃণ দিয়া বলিলেন, ইহাকে পরিচালন কর দেখি। বায়ু তাঁহার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াও উহা পরিচালন করিতে পারিলেন না।

বায়ু লজ্জিত হইয়া দেবতাদিগের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, ইনি আমাদের পূজনীয় কি না, তাহা আমি নির্দ্ধারণ করিতে পারিলাম না।

তৎপরে দেবতারা ইন্দ্রকে বলিলেন, মঘবন্, তুমি জান দেখি, ইনি আমাদের পূজনীয় কি না। তিনি তথাস্তু বলিয়া ব্রহ্মের নিকট গমন করিলে, ব্রহ্ম তথা হইতে চলিয়া গেলেন। ইন্দ্র কিন্তু ফিরিলেন না। তিনি সেই সময়ে আকাশে বহুশোভমানা হৈমবতী উমা নাম্নী রমণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইনি কি আমাদের পূজনীয়?

উমা বলিলেন, ইনি ব্রহ্ম, ব্রহ্মের অনুগ্রহেই তোমরা জয়লাভ করিয়া মহিমান্বিত হইয়াছিলে। উমার উপদেশেই ইন্দ্র ব্রহ্মকে জানিতে পারিয়াছিলেন।

এই জগৎ যে একমাত্র শক্তির দ্বারা পরিচালিত, এবং সেই শক্তিতেই সকলেই শক্তিমান্, তাহাই বুঝাইবার জন্য তলবকার শ্রুতির উপরোক্ত উপাখ্যানের অবতারণা। অগ্নির দাহিকা শক্তি, বায়ুর পরিচালিকা শক্তি ইত্যাদি সমুদায় শক্তিই সেই ব্রহ্ম-শক্তির উপর স্থাপিত। অহঙ্কার বশতঃ মানব ও দেবতারা স্বীয় স্বীয় শক্তি ঘোষণা করেন, কিন্তু সর্ব্বশক্তির আধার ব্রহ্ম। উহার মূল শ্লোকগুলি পদ-বিশ্লেষণ করিয়া নিম্নে দেওয়া গেল।

ব্রহ্মহ দেবেভ্যঃ বিজিগ্যে তস্যহ ব্রহ্মণঃ বিজয়ে দেবাঃ অমহীয়ন্ত

তে ঐক্ষন্ত অস্মাকম্ এব অয়ং বিজয়ঃ অস্মাকং এব অয়ং মহিমা ইতি ॥১॥

তৎহ এষাং বিজজ্ঞৌ তেভ্যঃহ প্রাদুর্ব্বভূব তৎ ন ব্যজানন্ত কিম্ ইদং যক্ষম্ ইতি। তে অগ্নিম্ অব্রবন্ জাতবেদ এতৎ বিজানীহি কিম্ এতৎ যক্ষম্ ইতি তথা ইতি ॥২

তৎ অভ্যদ্রবৎ তম্ অভ্যবদৎ কঃ অসি ইতি। অগ্নিঃ বা অহম্ অস্মি ইতি অব্রবীৎ জাতবেদা বা অহম্ অস্মি ইতি ॥৩॥

তস্মিন্ ত্বয়ি কিং বীর্য্যং ইতি। অপি ইদং সর্ব্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যাং ইতি ॥৪

তস্মৈ তৃণং নিদধৌ এতৎ দহ ইতি তৎ উপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তৎ ন শশাক দগ্ধুং স ততঃ এব নিবব্রতে ন এতৎ অশকং বিজ্ঞাতুং যৎ এতৎ যক্ষমিতি ॥৫॥

অথ বায়ুং অব্রুবন্ বায়ু এতৎ বিজানীহি কিমেতৎ যক্ষং ইতি তথেতি ॥৬॥

তৎ অভ্যদ্রবৎ তং অভ্যবদৎ কঃ ভবসি ইতি বায়ুঃ বা অহং অস্মি ইতি অব্রবীৎ মাতরিশ্বা বা অহং অস্মি ইতি ॥৭॥

তস্মিন্ ত্বয়ি কিং বীর্য্যং ইতি। অপি ইদং সর্ব্বং আদদীয়ং যৎ পৃথিব্যাং ইতি ॥৮॥

তস্মৈ তৃণং নিদধৌ এতৎ আদৎস্ব ইতি তৎ উপপ্রেয়ায় সর্ব্বজবেন তৎ ন শশাক আদাতুং স ততঃ এব নিবব্রতে ন এতৎ অশকং বিজ্ঞাতুং যৎ এতৎ যক্ষং ইতি ॥৯॥

অথেন্দ্রমব্রুবন্মঘববন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্‌যক্ষমিতি তথেতি তদভ্যদ্রব্যৎ তস্মাত্তিরোদধে ॥১০॥

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্‌যক্ষমিতি ॥১১॥

উমা শব্দে জ্ঞান। কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, হিমালয় প্রদেশেই ব্রহ্মজ্ঞানীরা বাস করিতেন, এইজন্য উমাকে হৈমবতী বলা হইয়াছে। পূজ্যপাদ শঙ্কর বলেন যে, হিমবতের কন্যা গৌরীই ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী; সুতরাং উমা শব্দে ব্রহ্মজ্ঞানই বুঝায়। সোম ব্রহ্মের একটি নাম। উময়া সহ বর্ত্ততে ইতি সোমঃ। যাহাই হউক, উমা হৈমবতী বলিতে এখানে যে ব্রহ্মজ্ঞান, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে গেলে ধৈর্য্য চাই। অন্যান্য দেবতারা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, কিন্তু ইন্দ্র তাহা করিলেন না, এবং তাঁহার ধৈর্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্ম-পদ।

অপ্রমাদ-বর্গ।

অপ্রমাদ অমৃতপদং প্রমাদো মচ্চুনঃপদং।
অপ্রমত্তা ন ম্রিয়ন্তে যে প্রমত্তা যথামৃতাঃ ॥১

অনুবাদ। অপ্রমাদ হইতে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়, আর প্রমাদ মৃত্যুর পথ। অপ্রমত্ত ব্যক্তিরা মরেনা ; প্রমত্ত ব্যক্তিরা মৃতবৎ হইয়া রহিয়াছে।

এবংবিশেষতো জ্ঞাত্বা অপ্রমাদং হি পণ্ডিতাঃ।
অপ্রমাদে প্রমোদন্তে আর্য্যানাং গোচরে রতাঃ ॥২

অনুবাদ। আর্য্যজ্ঞানরত পণ্ডিত ব্যক্তিরা অপ্রমাদকে এই প্রকারে বিশেষরূপে জানিয়া অপ্রমাদে প্রমোদ লাভ করেন।

তে ধ্যায়িনঃ সাতাতিকা নিত্যং দৃঢ়-পরাক্রমাঃ।
ফুষন্তি ধীরা নির্ব্বাণং যোগক্ষেম-মনুত্তরং ॥৩

অনুবাদ। ধ্যানশীল সততচেষ্টাসম্পন্ন নিত্য দৃঢ়পরাক্রম ধীর ব্যক্তিগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট যোগক্ষেমস্বরূপ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

উত্থানবতঃ স্মৃতিমতঃ শুচিকর্ম্ম-ণো নিশম্য কারিণঃ।
সংযতস্য ধর্ম্মজীবিনঃ অপ্রমত্তস্য যশোঽভিবর্দ্ধতে ॥৪

অনুবাদ। জাগরণশীল, স্মৃতিসম্পন্ন, শুচিকর্ম্মা, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাকারী সংযত ধর্ম্মজীবী অপ্রমত্ত ব্যক্তির যশ বর্দ্ধিত হয়।

উত্থানেনাপ্রমাদেন সংযমেন দমেন চ।
দ্বীপং করোতি মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি ॥৫

অনুবাদ। উত্থান, অপ্রমাদ, সংযম ও দমদ্বারা মেধাবী ব্যক্তি এমন দ্বীপ সৃষ্টি করেন, যাহা জলে নিমজ্জিত হয় না।

প্রমাদমনুযুঞ্জন্তি বালা দুর্ম্মেধি-নো জনাঃ।
অপ্রমাদঞ্চ মেধাবী ধনং শ্রেষ্ঠঞ্চ রক্ষতি ॥৬॥

অনুবাদ। দুর্ম্মেধা বা নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ প্রমাদের পশ্চাৎ ধাবিত হয়, আর মেধাবীগণ অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠধন মনে করিয়া তাহা সযত্নে রক্ষা করেন।

মা প্রমাদমনুযুঞ্জেথ মা কামরতি-সন্থবং।
অপ্রমত্তোহি ঝায়ন্তো প্রাপ্নোতি বিপুলং সুখং ॥৭॥

অনুবাদ। কাম এবং রতি-সম্ভূত আনন্দ ও প্রমাদের অনুবর্ত্তী হইবে না। যে ব্যক্তি অপ্রমত্ত ও ধ্যায়ী হয়, সে বিপুল সুখ প্রাপ্ত হয়।

প্রমাদমপ্রমাদেন যথা নুদতি পণ্ডিতঃ।
প্রজ্ঞাপ্রাসাদমারুহ্য অশোকঃ শোকিনীং প্রজাং।
পর্ব্বতস্থ ইব ভূমিস্থং ধীরো বালমবেক্ষতে ॥৮॥

অনুবাদ। পণ্ডিত ব্যক্তি অপ্রমাদ দ্বারা যখন প্রমাদকে বিতাড়িত করেন, তখন তিনি প্রজ্ঞা-প্রাসাদে আরোহণ করিয়া, শোকরহিত হইয়া, শোকসম্পন্ন জ্ঞানহীন প্রজাদিগকে, যেমন পর্ব্বতস্থ কোনও ব্যক্তি নিম্নভূমিস্থ ব্যক্তিকে দর্শন করে, সেইভাবে অবলোকন করেন।

অপ্রমত্তঃ প্রমত্তেষু সুপ্তেষু বহুজাগরঃ।
অবলাশ্বংবৈ সৈন্ধবো হিত্বা যাতি সুমেধসঃ ॥৯॥

অনুবাদ। সুপ্তদিগের মধ্যে জাগরণশালী ব্যক্তি যেরূপ, প্রমত্তদিগের মধ্যে অপ্রমত্ত ব্যক্তি সেইরূপ। সিন্ধুদেশীয় সবল অশ্ব যেমন দুর্ব্বল অশ্বকে পশ্চাতে ফেলিয়া চলিয়া যায়, সুমেধা ব্যক্তি তদ্রূপ দুর্ম্মেধাকে পশ্চাতে রাখিয়া যান।

অপ্রমাদেন মঘবা দেবানাং শ্রেষ্ঠতাং গতঃ।
অপ্রমাদং প্রশংসন্তি প্রমাদো গর্হিতঃ সদা ॥১০॥

অনুবাদ। অপ্রমাদ-বলে মঘবা অর্থাৎ ইন্দ্র দেবতাগণের শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। অপ্রমাদ প্রশংসনীয়, প্রমাদ সতত গর্হিত।

অপ্রমাদরতো ভিক্ষুঃ প্রমাদে ভয়দর্শকঃ।
সংযোজনমণুং স্থূলং উহমগ্নীব গচ্ছতি ॥১১॥

অনুবাদ। অপ্রমাদরত ভিক্ষু প্রমাদে ভয়দর্শন করেন, এবং অগ্নি যেমন কাষ্ঠদাহন করে, তদ্রূপ স্থূল সূক্ষ্ম বন্ধনগুলি দগ্ধ করেন।

অপ্রমাদরতো ভিক্ষুঃ প্রমাদে ভয়দর্শকিঃ।
অভব্যঃ পরিহাণায় নির্ব্বাণস্যেব অন্তিকে ॥১২॥

অনুবাদ। যে ভিক্ষু অপ্রমাদরত এবং নির্ব্বাণের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, এবং প্রমাদে ভয় দর্শন করেন, তিনি তাঁহার পূর্ণাবস্থা হইতে কখনও পতিত হইতে পারেন না।

অপ্রমাদ-বর্গ নামক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ পরিসমাপ্ত হইল।

পুষ্প-বর্গ।

কো ইমং পৃথিবীং বিজেষ্যতি যমলোকঞ্চ ইমং সদেবকং।
কো ধর্ম্মপদং সুদেশিতং কুশলঃ পুষ্পমিব পচেস্‌সতি ॥১॥

অনুবাদ। কে এই পৃথিবী, যমলোক (টীকাকার বলেন—চতুর্ব্বিধ অপায়লোক) ও দেবতাগণের সহিত দেবলোক জয়

করিতে পারিবে? এই সম্যক্ উপদিষ্ট ধর্ম্ম-পদ কোন্ কুশল ব্যক্তি পুষ্পের মত সমাদরে চয়ন করিতে পারিবে?

শেখঃ পৃথিবীং বিজেষ্যতি যম-
লোকঞ্চ ইমং সদেবকং।
শেখো ধর্ম্মপদং সুদেশিতঃ কুশলং
পুষ্পমিব পচেস্সতি ॥২

অনুবাদ। শেখ অর্থাৎ শিক্ষাশীল ব্যক্তি (বৌদ্ধমতে অধিশীল শিক্ষা, অধিচিত্তশিক্ষা, অধিপ্রজ্ঞশিক্ষা, এই শিক্ষাত্রয়বান্ শেখ) পৃথিবী, অপায়লোক এবং দেবলোক জয় করিতে পারিবে। শেখ সুন্দররূপে উপদিষ্ট ধর্ম্মপদ, নিপুণ মালাকারের পুষ্পচয়নের ন্যায় অক্লেশে চয়ন করিবে।

ফেণোপমং কায়মিমং বিদিত্বা
মরীচিধর্ম্মং অভিসম্বুধানঃ।
ছিত্বাচ মারস্য পপুষ্পকানি অদ-
র্শনং মৃত্যুরাজস্য গচ্ছেৎ ॥৩॥

অনুবাদ। এই শরীর ফেণোপম (জল-বুদ্বুদ সদৃশ) নিতান্ত অস্থির, এইরূপ অবগত হইয়া, ইহার মরীচিধর্ম্ম—অর্থাৎ মরীচিকার ন্যায় অকিঞ্চিৎকরতা এবং ভ্রান্তি-মূলকতা বুঝিতে পারিয়া, মারের (কাম অথবা সাধন-মার্গের শত্রুর) বন্ধন-পাশগুলি অনায়াসে ছেদন করিয়া, মৃত্যুরাজের অদর্শন লাভ করিবে; অর্থাৎ সমস্ত লোভ-কাম-বন্ধনাদি ছেদপূর্ব্বক ভিক্ষু অমরত্ব প্রাপ্ত হইবে।

পুষ্পাণ্যেব প্রচিন্বন্তং ব্যাসক্তম-
নসং নরং।
সুপ্তং গ্রামং মহৌঘ ইব মৃত্যুরা-
দায় গচ্ছতি ॥৪॥

অনুবাদ। যেমন রজনীতে নিদ্রিত গ্রাম মহা বন্যার মহা প্লাবনে কোন্ অজ্ঞাত দেশে লইয়া যায়, তদ্রূপ অস্থিরচিত্ত পুষ্প-চয়নকারীর ন্যায় ব্যাসক্তচিত্ত নরকে মৃত্যু অজ্ঞাত অসাবধান ভাবেই গ্রহণ করিয়া গমন করে। (মহৌঘ অর্থে কেহ বলেন—মহানদী। নদী নিদ্রিত জীবশুদ্ধ গ্রাম গ্রাস করে)।

পুষ্পাণ্যেব প্রচিন্বন্তং ব্যাসক্তম-
নস রানং।
অতৃপ্তং ইব কামেষু অন্তকো
কুরুতে বশং ॥৫॥

অনুবাদ। "অনবস্থিতচিত্ত পুষ্পকারীর ন্যায় ব্যাসক্তচিত্ত ব্যক্তিকে কামভোগে অতৃপ্ত অবস্থায়ই অন্তক আপন বশে আনয়ন করে।

যথাহি ভ্রমরঃ পুষ্পং বর্ণগন্ধমহিং-
সয়ন্।
পরৈতি রসমাদায় এবং গ্রামে
মুনিশ্চরেৎ ॥৬॥

অনুবাদ। যেমন ভ্রমর পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিয়া মধু পান করে; পুষ্প, বর্ণ বা গন্ধ, কিছুরই অনিষ্ট করে না, তদ্রূপ ভিক্ষু মুনি গ্রামে ভিক্ষার্থ ভ্রমণ করিয়া নিজ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, কিন্তু গ্রামের কোনও রূপ উদ্বেগ বা অপকার সাধন করিবেন না।

ন পরেষাং বিলোমানি ন পরেসাং
কৃতাকৃতঃ।
আত্মনো বা অবেক্ষেত কৃতানি
অকৃতানিচ ॥৭॥

অনুবাদ। ভিক্ষু মুনি গ্রামে বিচরণ করিতে করিতে অপরের পরুষ মর্ম্মচ্ছেদক বাক্য শ্রবণে কিছু মনে করিবেন না এবং অন্যের কর্ত্তব্য কার্য্য ও অকার্য্য দেখিবেন না; কেবলমাত্র নিজের গর্হিত কর্ম্ম এবং সৎকর্ম্ম বিষয়ে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, ও তদনুসারে কার্য্য করিবেন।

যথাপি রুচিরঃ পুষ্পং বর্ণবৎ তৎ
অগন্ধকঃ।
এবং সুভাষিতা বাচঃ অফলা ভব-
ন্ত্যকুর্ব্বত ॥৮॥

অনুবাদ। যেমন সুদৃশ্য মনোরম বর্ণের ফুলও গন্ধবিহীন হইলে বিফল হয়, তদ্রূপ কর্ত্তব্য-বিমুখ ব্যক্তির মাধুর্য্যাদি গুণশালী স্নিগ্ধ বাক্যও বিফল বলিয়া বুঝিতে হইবে। (বৌদ্ধকর্ম্মযোগী কেবল কাজ চাহেন, লম্বা চওড়া ভক্তির কথা—জ্ঞানের কথা বলিয়া সময় কাটাইতে চাহেন না।)

যথাপি রুচিরং পুষ্পং বর্ণবত্তু সগ-
ন্ধকং।
এবং সুভাষিতা বাচঃসফলা ভবন্তি
সুকুর্ব্বতঃ ॥৯॥

অনুবাদ। যেরূপ মনোজ্ঞ বর্ণ-বৈচিত্র্য-শালী সুগন্ধ কুসুম সফল হয়, সেইরূপ যিনি সুচারুরূপে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করেন, তাঁহার মধুর বাক্য সফলতা প্রাপ্ত হয়। (কথার সফলতা কথায় নহে, কেবল কার্য্যেই কথার মর্য্যাদা রক্ষিত হয়, অন্য প্রকারে হয় না।)

যথাহি পুষ্পরাশিনা কার্য্যে মালা-
গুণে বহু।
এবং জাতেন মর্ত্ত্যেন কর্ত্তব্যং
কুশলং বহু ॥১০॥

অনুবাদ। যেমন পুষ্পরাশি দ্বারা নিপুণ মালাকার নানা প্রকার মালাগুণ রচনা করিয়া উহার সার্থকতা সম্পন্ন করে, তদ্রূপ যদি জাত মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীলব্যক্তি ক্ষুদ্র-জীবনের দ্বারা কতকগুলি কুশল অর্থাৎ সৎকর্ম্ম করেন, তবেই তদ্দ্বারা উহার সার্থকতা সংসাধন করিতে পারেন।

ন পুষ্পগন্ধঃ প্রতিবাতমেতি, ন
চন্দনং তগরং মল্লিকা বা।
সতাঞ্চ গন্ধঃ প্রতিবাতমেতি সর্ব্বা
দিশঃ সৎপুরুষঃ প্রবাতি ॥১১॥

অনুবাদ। পুষ্পের গন্ধ কখনও বায়ুর অনুকূলে ব্যতীত প্রতিকূলে প্রবাহিত হয়না। চন্দনগন্ধ, তগরপুষ্প-গন্ধ, মল্লিকা কুসুমের গন্ধ, ইহারা (উৎকৃষ্ট হইলেও) প্রতিবাত-প্রবাহিত হয় না। সৎ অর্থাৎ সাধু ভিক্ষুগণের চরিত্র-কুসুমের গন্ধ বায়ুর প্রতিকূলেও বাহিত হয়; সৎপুরুষ সকল নিজেদের সুচরিত্রের মনোরম গন্ধে দশদিক্ আমোদিত করিয়া গমন করেন।

চন্দনং তগরংবাপি উৎপলং অথ
বসিস্কী।
এতেষাং গন্ধজাতানাং শীলগন্ধ
অনুত্তরঃ ॥১২

অনুবাদ। চন্দন, তগর, পদ্ম ও জাতি পুষ্প, ইহাদের সকলের গন্ধ অপেক্ষা সচ্চরিত্র সাধু ভিক্ষুগণের শীল-পুষ্পগন্ধ সমধিক শ্রেষ্ঠতর বলিয়া বিবেচিত হয়। (পালি ভাষায় জাতিফুলের নাম বস্সিকী; টীকায় দেখা গেল।)

অপ্রমত্ত অয়ং গন্ধ যাহয়ং তগর চন্দনী।
যশ্চ শীলবতাং গন্ধঃ বাতি দেবেষু উত্তমঃ ॥১৩॥

অনুবাদ। শীলগন্ধ প্রমাদশূন্য। তগর-চন্দনাদির এই গন্ধ ক্ষণস্থায়ী এবং মর্ত্ত্যলোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ। চরিত্রবানের চরিত্র-গন্ধ এত উত্তম যে, দেবলোকেও বহিয়া থাকে।

তেষাং সম্পন্নশীলানাং অপ্রমাদ বিহারিণাং।
সম্যতাঙ্গাবিমুক্তানাং মারো মার্গং ন বিন্দতি ॥১৪॥

অনুবাদ। অপ্রমাদ বিচরণকারী সুশীল ও সম্যতাঙ্গ বিমুক্ত মহাপুরুষগণের (বৌদ্ধমতে পঞ্চবিধ বিমুক্তিসম্পন্ন সাধকগণের) পন্থা অনুসরণ করিতেও কাম অকৃতকার্য্য হয়।

যথা সঙ্কারধানস্মিং উজ্ঝিতে চ মহাপথে।
পদ্মস্তত্র জায়েত শুচিগন্ধং মনোরমং।
এবং সংস্কারভূতেষু অন্ধভূতে পৃথুজ্জনে।
অতিরোচতি প্রজ্ঞায়ৈ সম্যক্ সম্বুদ্ধসাধকঃ ॥১৫-১৬॥

অনুবাদ। কুপথে ক্ষিপ্ত পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা রাশির মধ্যে যদি একটী সুগন্ধ পদ্ম পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, তাহা যেরূপ অপরাপর স্থানজাত পুষ্প অতিক্রম করিয়াও নিজ শুচিগন্ধ-গুণে মনোরম হয়, তদ্রূপ বিবেকান্ধ ক্লেশজনক আবিলতাপূর্ণ জনসমাজে উৎপন্ন একজন প্রজ্ঞাবান্ সম্যক্ বোধসম্পন্ন বুদ্ধ-শিষ্যও প্রজ্ঞাবলে অত্যধিক বিরোচমান হয়েন। ১৫-১৬

পুষ্পকে অবলম্বন করিয়া উপমাদিবলে এ অধ্যায়ে উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং ইহার নাম পুষ্প-বর্গ।

পুষ্প-বর্গ সমাপ্ত।

অপ্রমাদভিক্ষু, যশোহর, বেদবিদ্যালয়।

"ধর্ম্মপদ" প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্র। এই গ্রন্থ পালি ভাষায় লিখিত। পালির সংস্কৃতের সহিত অত্যধিক নিকট সম্বন্ধ। এই পালি শ্লোকগুলিকে আমরা সুবিধামত সংস্কৃতে—কখনও বা মিশ্রসংস্কৃতে পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে আমাদের সংস্কৃতজ্ঞ পাঠকবর্গের সুবিধা হইতে পারে। পূর্ব্বে ধর্ম্মপদের যমকবর্গ প্রকাশিত হইয়াছিল তৎপরে বহুদিন আর অবকাশাভাবে ধর্ম্মপদ প্রকাশ করিতে পারি নাই। সম্প্রতি আবার উদ্যম অবলম্বন করা গেল; আশা করা যায়, ধর্ম্মপদের এক এক পরিচ্ছেদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। বৌদ্ধশাস্ত্র বটে, কিন্তু এই গ্রন্থে যে সকল অমূল্য উপদেশ কথিত হইয়াছে, তাহা প্রায়শঃ হিন্দুধর্ম্মের অবিসম্বাদী সত্যের প্রতিধ্বনি স্বরূপ। পাঠকমহোদয়গণ ধর্ম্মপদ পাঠে যদি কথঞ্চিৎ তৃপ্তি প্রাপ্ত হন, পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

বিনীত লেখক।
যশোহর।

প্রশ্নোত্তরম্।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যক্ষ উবাচ।

কো মোহঃ প্রোচ্যতে রাজন্! কশ্চ মানঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
কিমালস্যঞ্চ বিজ্ঞেয়ং কথং শোকঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪৭॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মোহোহি ধর্ম্মমূঢ়ত্বং মানস্ত্বাত্মাভিমানিতা।
ধর্ম্মনিষ্ক্রিয়তালস্যং শোকস্ত্বজ্ঞানমুচ্যতে ॥৪৮॥

যক্ষ উবাচ।

কিং স্থৈর্য্যমৃষিভিঃ প্রোক্তং কিং চ ধৈর্য্যমুদাহৃতম্।
স্নানঞ্চ কিং পরং প্রোক্তং দানঞ্চ কিমিহোচ্যতে ॥৪৯॥

যক্ষ কহিলেন—হে রাজন্! মোহ কাহাকে বলে? অভিমান কাহাকে বলে? আলস্য কাহাকে বলে? শোক কাহাকে বলে? ৪৭॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—ধর্ম্ম বিষয়ে অজ্ঞানতাকেই মোহ কহে; আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করাই অভিমান; ধর্ম্মকার্য্যে উদাসীনতাকে আলস্য ও অজ্ঞানকেই শোক কহা যায় ॥৪৮॥

যক্ষ কহিলেন—ঋষিগণ কাহাকে স্থৈর্য্য কহিয়াছেন, ধৈর্য্য কাহাকে বলিয়াছেন, স্নান কাহাকে কহিয়াছেন ও দান কাহাকে কহিয়াছেন? ৪৯॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

স্বধর্ম্মে স্থিরতা স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
স্নানং মনোমলত্যাগো দানংবৈ ভূতরক্ষণম্ ॥৫০॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—স্বধর্ম্মে স্থির থাকাকেই স্থৈর্য্য, ইন্দ্রিয়নিগ্রহকে ধৈর্য্য; মনের মালিন্য ত্যাগ করাকে স্নান ও জীবকে রক্ষা করাকে দান কহিয়াছেন। মনোমালিন্য ত্যাগকরাই স্নান, জল দ্বারা স্নানকে প্রকৃত স্নান কহেনা, একথা ভীষ্মদেবও যুধিষ্ঠিরকে কহিয়াছিলেন—

"আত্মা নদী সংযমতোয়পূর্ণা সত্যহ্রদা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ।
তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র! ন বারিণা শুদ্ধ্যতি চান্তরাত্মা॥

সংযম রূপ জলে পূর্ণ আত্মারূপ নদী, উহার সত্যরূপ হ্রদ (গর্ভ), শীলরূপ তট, দয়ারূপ ঊর্ম্মি (ঢেউ); হে পাণ্ডুপুত্র! সেই জলে স্নান কর, যেহেতু অন্তরাত্মা জল দ্বারা শুদ্ধ হয় না।

এবিষয়ে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ৮ উল্লাসে ৭০ শ্লোক, যথা—

"শৌচন্তু দ্বিবিধং দেবি! বাহ্যাভ্যন্তর ভেদতঃ।
ব্রহ্মণ্যাত্মার্পণং যৎ তৎ শৌচমান্তরিকং স্মৃতম্॥

এবিষয়ে কূর্ম্মপুরাণে উত্তর ভাগে ১১ অধ্যায়ে——

"বাহ্যমভ্যন্তরং শৌচং দ্বিধা প্রোক্তং দ্বিজোত্তমাঃ।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং মনঃশুদ্ধিরথান্তরম্॥] ৫০।

যক্ষ উবাচ।

কঃ পণ্ডিতঃ পুমান্ জ্ঞেয়ো নাস্তিকঃ কশ্চ উচ্যতে।
কো মূর্খঃ কশ্চ কামঃ স্যাৎ কো মৎসর ইতি স্মৃতঃ ॥৫১॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধর্ম্মজ্ঞঃ পণ্ডিতো জ্ঞেয়ো নাস্তিকো মূর্খ উচ্যতে।
কামঃ সংসারহেতুশ্চ হৃত্তাপো মৎসরঃ স্মৃতঃ ॥৫২॥

যক্ষ উবাচ।

কোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তঃ কশ্চ দম্ভঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
কিন্তৎ দৈবং পরং প্রোক্তং কিন্তৎ পৈশুন্যমুচ্যতে ॥৫৩॥

ধিষ্ঠির উবাচ।

মহাজ্ঞানমহঙ্কারো দম্ভো ধর্ম্মধ্বজোচ্ছ্রয়ঃ।
দৈবং দানফলং প্রোক্তং পৈশুন্যং পরদূষণম্ ॥৫৪॥

যক্ষ উবাচ।

ধর্ম্মশ্চার্থশ্চ কামশ্চ পরস্পরবিরোধিনঃ।
এষাং নিত্যবিরুদ্ধানাং কথমেকত্র সঙ্গমঃ॥৫৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যদাধর্ম্মশ্চ ভার্য্যাচ পরস্পরবশানুগৌ।
তদা ধর্ম্মার্থকামানাং ত্রয়ানামপি সঙ্গমঃ ॥৫৬

যক্ষ উবাচ।

অক্ষয্যো নরকঃ কেন প্রাপ্যতে ভরতর্ষভ।
এতন্মে পৃচ্ছতঃ প্রশ্নং শীঘ্রং বক্তুমিহার্হসি॥৫৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ব্রাহ্মণং স্বয়মাহূয় যাচমানমকিঞ্চনম্।
পশ্চান্নাস্তীতি যো ব্রূয়াৎ সোঽক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ ॥৫৮

বেদেষু ধর্ম্মশাস্ত্রেষু মিথ্যা যা বৈ দ্বিজাতিষু।
দেবেষু পিতৃধর্ম্মেষু সোঽক্ষয়ং নরকং ব্রজেৎ॥৫৯

যক্ষ কহিলেন—কে পণ্ডিত? কে নাস্তিক? কে মূর্খ? কাম কি? মৎসর কাহাকে বলে? ৫১।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলা যায়; নাস্তিককেই মূর্খ কহাযায়; সংসারের হেতুকে কাম ও হৃদয়ের তাপকে মৎসর কহা গিয়া থাকে।৫২॥

যক্ষ কহিলেন—অহঙ্কার কাহাকে কহে? দম্ভ কাহাকে কহে, শ্রেষ্ঠ দৈব কাহাকে বলে ও পৈশুন্য কাহাকে বলে? ৫৩।

যুধিষ্ঠির কহিলেন—মহা অজ্ঞানকে অহঙ্কার বলে; (সংসারে খ্যাত হইবার জন্য) ধ্বজার ন্যায় ধর্ম্ম-চিহ্ন সকলকে উচ্ছ্রিত করাকে দম্ভ কহে; দান-ফলকে দৈব বলে; পরকে দোষ দেওয়াকে পৈশুন্য কহে।৫৪॥

যক্ষ কহিলেন—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম, এই তিনটি পরস্পর বিরোধী, এই সকল বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সকলের একত্র সমাবেশ কি প্রকারে হয়? ৫৫॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—যখন ধর্ম্ম ও ভার্য্যা পরস্পর বশবর্ত্তী হয়, তখন ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের একত্র সমাবেশ হয় ৫৬॥

যক্ষ কহিলেন—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! কে অক্ষয় নরক পায়, এই কথা প্রশ্ন করিতেছি, শীঘ্র উত্তর দাও। ৫৭॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—যাচমান অকিঞ্চন ব্রাহ্মণকে স্বয়ং আহ্বান করিয়া যিনি পরে "নাই" বলেন, তিনি অক্ষয় নরকে গমন করেন।৫৮॥

বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, ব্রাহ্মণ, দেব ও পিতৃ-ধর্ম্মে যিনি মিথ্যা বুদ্ধি করেন, তিনি অক্ষয় নরক প্রাপ্ত হন।৫৯॥

বিদ্যমানে ধনে লোভাৎ দানভোগবিবর্জ্জিতঃ।
পশ্চান্নাস্তীতি যো ব্রূয়াৎ সোঽক্ষয়ং নরকং
ব্রজেৎ ॥৬০

যক্ষ উবাচ।

রাজন্ কুলেন বৃত্তেন স্বাধ্যায়েন শ্রুতেন বা।
ব্রাহ্মণ্যং কেন ভবতি প্রব্রূহ্যেতৎ সুনি-
শ্চিতম্॥৬১

ঠির উবাচ।

শৃণু যক্ষ কুলং তাত ন স্বাধ্যায়ো নচ শ্রুতম্।
কারণংহি দ্বিজত্বেচ বৃত্তমেব ন সংশয়ঃ ॥৬২॥
বৃত্তং যত্নেন সংরক্ষ্যং ব্রাহ্মণেন বিশেষতঃ।
অক্ষীণবৃত্তো ন ক্ষীণো বৃত্ততস্ত হতোহতঃ॥৬৩
পঠকাঃ পাঠকাশ্চৈব যেবান্যে শাস্ত্রচিন্তকাঃ।
সর্ব্বে ব্যসনিনো মূর্খা যঃ ক্রিয়াবান্ স
পণ্ডিতঃ ॥৬৪॥

ধন থাকিতেও লোভবশতঃ যে ব্যক্তি দান ও ভোগবর্জ্জিত হন ও পরে "নাই" এই কথা বলেন, তিনি অক্ষয় নরকে গমন করেন।৬০॥

যক্ষ কহিলেন—রাজন্! কুল, বৃত্ত (আচার), বেদপাঠ কিম্বা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব হয়, ইহা নিশ্চয় করিয়া বল।৬১॥

যুধিষ্ঠির কহিলেন—হে যক্ষ! হে তাত! বেদাধ্যয়ন কিম্বা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব হয় না, কেবল একমাত্র চরিত্রই ব্রাহ্মণত্বের কারণ হইয়া থাকে।৬২॥

ব্রাহ্মণ বিশেষরূপে চরিত্র রক্ষা করিবেন; যাঁহার চরিত্র ক্ষীণ না হয়, তিনি কিছুতেই ক্ষীণ হন না; কিন্তু যাঁহার চরিত্র মন্দ হয়, তিনিই হত হইয়া থাকেন।৬৩॥

অধ্যাপক, ছাত্র ও অন্যান্য যাঁহারা শাস্ত্র চিন্তা করেন, যদ্যপি তাঁহারা ব্যসনী হন, তাহা হইলে তাঁহারা মূর্খ; কিন্তু যিনি ক্রিয়াবান্, তিনিই পণ্ডিত।৬৪॥

চতুর্ব্বেদোঽপি দুর্ব্বৃত্তঃ ন শূদ্রাদতিরিচ্যতে।
যোঽগ্নিহোত্রপরো দান্তঃ স ব্রাহ্মণ ইতি
স্মৃতঃ ॥৬৫॥

যক্ষ উবাচ।

প্রিয়বচনবাদী কিং লভতে
বিমৃশিতকার্য্যকরঃ কিং লভতে।
বহুমিত্রকরঃ কিং লভতে
ধর্ম্মেরতঃ কিং লভতে কথয় ॥৬৬॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

প্রিয়বচনবাদী প্রিয়ো ভবতি,
বিমৃশিতকার্য্যকরোঽধিকং জয়তি।
বহুমিত্রকরঃ সুখং বসতে,
যশ্চ ধর্ম্মরতঃ সদ্গতিং লভতে ॥৬৭॥

যক্ষ উবাচ।

কো মোদতে কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ কাচ
বার্ত্তিকা।
বদ মে চতুরঃ প্রশ্নান্ মৃতা জী
বান্ধবাঃ ॥৬৮॥

চতুর্ব্বেদাধ্যায়ী যদি দুর্ব্বৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনি শূদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ নহেন; যিনি অগ্নিহোত্রপর ও দান্ত, তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন।৬৫॥

যক্ষ কহিলেন।—প্রিয়বচনবাদী কি লাভ করেন? যিনি বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, তিনি কি লাভ করেন? বহুমিত্রকারী কি লাভ করেন ও যে ব্যক্তি ধর্ম্মে রত, তিনি কি লাভ করেন, বল।৬৬॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন—প্রিয়বচনবাদী প্রিয় হন; বিমৃশিতকার্য্যকারী অধিক জয় করেন; বহুমিত্রকারী সুখে বাস করেন ও যিনি ধর্ম্মে রত, তিনি সদ্গতি লাভ করেন।৬৭॥

যক্ষ কহিলেন—সুখী কে? আশ্চর্য্য কি? পথ কি? ও বার্ত্তা কি? এই চার প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর, তোমার মৃত ভ্রাতৃগণ জীবিত হউন।৬৮॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

পঞ্চমেহহনি ষষ্ঠে বা শাকং পচতি স্বে গৃহে।
অনৃণীচাপ্রবাসীচ স বারিচর মোদতে ॥৬৯॥
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তীহ যমালয়ে।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ ॥৭০॥
তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নৈকোঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা ॥৭১॥
অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে
সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রি-দিনেন্ধনেন।
মাসর্ত্তু দর্ব্বী পরিঘট্টনেন
ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা ॥৭২॥

(সম্পূর্ণ।)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

কহিলেন—হে বারিচর! যে ব্যক্তি অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া, দিবসের পঞ্চম কিম্বা ষষ্ঠভাগে স্বগৃহে শাক পাক করেন, তিনি সুখী।৬৯॥

জীবগণ প্রতিদিন যমালয়ে যাইতেছে, তথাপি অবশিষ্ট মনুষ্যগণ স্থায়িত্ব ইচ্ছা করে, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? ৭০॥

তর্ক সকলের নির্ণয় নাই; শ্রুতি সকল ভিন্ন ভিন্ন; এক ঋষিও এরূপ নাই, যাঁহার মত প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইতে পারে; ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহাতে নিহিত আছে; মহাজন যেদিকে গমন করেন, উহাই পথ।৭১॥

এই মহামোহময় কটাহে সূর্য্যরূপ অগ্নি দ্বারা, রাত্রি ও দিবসরূপ কাষ্ঠ দ্বারা, মাস ও ঋতুরূপ দর্ব্বী (হাতা) পরিঘট্টন দ্বারা কাল ভূতগণকে পাক করিতেছেন, ইহাই বার্ত্তা।৭২॥

শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষাষ্টক।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ষষ্ঠ শ্লোকালোচনার পরিশিষ্ট।

"বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা"—

অর্থাৎ—

(কবে তব হরিনাম করিতে গ্রহণ)
বদনে গদ্গদ-রুদ্ধ হইবে বচন?

বলিয়াছিত—

"গোরা 'রা' বলিতে কেঁদে ওঠে"

কেঁদে উঠিলে বচন গদ্গদ হইবেই। যদি প্রেমময়ের নাম নিতেই কান্না আসে, তবে কি আর তাঁর নামটা ভাল মুখে আসে? তা সে না আসায় আসে যায়না। বরং সেরূপ না-আসার না আসাতেই আসে যায়। আমাদের ন্যায় যাদের নামে রুচি নাই, তাদের কৃত নামোচ্চারণে মিষ্টতা নাই—সজীবতা নাই,—যেন পূর্ণতাই নাই। ভক্তের মুখের হরিনামে হরি সাক্ষাৎ বিরাজিত, আর আমাদের মুখের হরিনামে হরি তদন্তর্নিহিত। আমরা একটি পরিষ্কার পরিশুদ্ধ কুঁদে-কাটা 'হরি' বলিলে যেমন হরিনাম হয়, মহাপ্রভুর মুখের এক 'হ'তে তাহার কোটিগুণ! অথবা ঐ এক 'হ'তেই হরির সর্ব্বস্ব! আর আমরা রুচির অভাবে, যেন নাম নিয়েও হায়! নাম-ধনে নিঃস্ব। অরুচির মুখে কিছুই ভাল লাগেনা। রসগোল্লাও বিরসগোল্লা হয়। আমাদের অরুচির মুখে—এমন যে জগৎ-মজানো মধুর

হরিনাম, তাও যেন কেবল 'হ' আর 'র' এ 'ইকার' মাত্র হইয়া যায়!

"গোরা 'রা-রা-রা-রা-রা-রা' বলে'
ঢলে গদাধরের গায়"

'রা' বলিয়া আর কথা সরিলনা। অমনি গদাধরের অঙ্গে ভক্তের "গৌর-গদাধরের" সোণার অঙ্গ ঢলিয়া পড়িল! যেন ভক্তাবতার এক 'রা'তেই রাধা-কৃষ্ণ দর্শনে সমাধিপ্রাপ্ত হইলেন! কৃষ্ণচৈতন্য-মুখে শুধু এই 'রা'-তেই রাধা-কৃষ্ণ যুগলরূপে মূর্ত্তিমান! কৃষ্ণ ত শুধু শব্দে আসেন না, ভাষায় ভাসেন না। তিনি আসেন টানে,—ভাসেন প্রাণে! নাম-রসের বন্যা যখন ভক্তের মনোপ্রাণ ভাসাইয়া নয়নে বয়নে ছোটে, অমনি নয়ন উথলিয়া ওঠে, বদনে গদ্গদ বাণী আধো আধো ফোটে, এবং তখন এক 'রা'তেও রাধাকৃষ্ণতত্ত্বের শত উৎস ছোটে! ভগবন্নামকীর্ত্তনে মহাপ্রভুর যখনি উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, তখনি বাণী গদ গদ—নামোচ্চারণ আধো আধো হইয়া—অমনি ভাব-সমাধি বা একেবারে ভাবোন্মাদ ঘটিয়াছে! পুরীর সেই মহা-রথোৎসবের নাম-কীর্ত্তন-মহোৎসবে মহাপ্রভুর সেই মহানৃত্যোৎসব বর্ণন স্মরণ করুন——

"সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে—তাহে রক্তোদ্গম।
জ-জ-গ-গ-জ-জ-গ-গ' গদ্গদ বচন॥"

লক্ষ লোকের গগন-বিদারী যুগপৎ "জয় জগন্নাথ" নিনাদের মধ্যে একা মহাপ্রভুর সেই অস্পষ্ট "জ-জ-গ-গ" ধ্বনিতে সেই "দারুব্রহ্ম" জীবন্ত-জলন্ত-জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছেন! হায়! নীলাচলের সেই শুভদিন আজ কোথায়? এখনও সেই নীলাচল, সেই 'দারুব্রহ্ম', সেই রথোৎসব, সেই নৃত্য-কীর্ত্তন, সেই অগণিত কণ্ঠের গগনভেদী "জয় জগন্নাথ" উচ্চারণ, সবই আছে, কিন্তু সেই অনিন্দ্য গৌর-রূপের সেই আনন্দ-নর্ত্তন—সেই 'জ-জ-গ-গ' গদ্গদ-কীর্ত্তন—সেই ভক্ত-মনোরথে রথের জগন্নাথের আর পথের জগন্নাথের মহামিলন আজ কোথায়? অন্ততঃ স্থূল প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত, সন্দেহ নাই।

অহৈতুক প্রেমে সকল রসেই সাত্ত্বিক বিকার বিকসিত হয়। বাৎসল্য-রস-মূর্ত্তি-মতী মা যশোমতী তাঁহার প্রাণ-গোপালের বিরহে গোপালকে ডাকিতে গিয়াও ডাকিতে পারিতেছেন না।—

"কোথা গোপাল" বল্‌তে গিয়ে
বদনে না সরে বাণী।
"কো-গো" বলে' নয়ন-জলে
আকুল হ'ল নন্দরাণী॥" (দীনদাস)

নন্দরাণীর "গোপালময়" সমগ্র হৃদয়টা এত বেগে আনন-পথে উছলিয়া উঠিল যে, আর বিস্পষ্ট বাক্যবিন্যাসের অধর-সংযম অসাধ্য হইল। তাঁহার প্রতিনিশ্বাস-পালিত 'গোপাল' নামটি মাত্রও তখন স্ফুরিল না!

আর একটি বঙ্গীয় প্রাচীন কবি-কাকলীর সুরে আর এক রসের উদাহরণ শুনুন—

"(এ কি) লজ্জা না প্রেম, বল্‌লো সখি!
বুঝ্‌তে নাহি পারিগো।
(কথা) কৈতে গেলে ঢোক্ গিলি সৈ!
ঢোক্ ঠেকাতে নারিলো॥"

এটি প্রায় পূর্ব্বরাগের অবস্থা। আর একটি পরানুরাগের মিলনাবস্থার বিধিকৃত ব্যবস্থা দেখুন—

"(ও যার) পরশ মাত্র অবশ গাত্র,
পরশের রস বুঝিনে।
(ও তার) মুখের ভাষেই সুখে ভাসি,
অর্থ-তত্ত্ব খুঁজিনে॥
(ওরূপ) দেখার সাধে নয়ন বাদী,
জলের ছলে অন্ধ হই।
(কথা) কৈতে বাধে, যায়না কওয়া,
বোবা হওয়াই ভাল সই॥
(ও সই) সাধের আমার সাধ মেটেনা,
বাদ সাধে মোর দেহ-মন।
(বুঝি) পরের হাতে প্রাণ সঁপিয়ে,
অরি হল আপন জন॥"

এই গীতিকাটি ইহার উদ্দিষ্ট সেই অনুপম প্রিয়তমের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও উৎসর্গীকৃত দেহ-মন-প্রাণাদির উদ্দেশে একরূপ ব্যাজস্তুতিবিশেষ। ফলিতার্থে সাত্ত্বিক বিকারের উচ্ছ্বাসে প্রিয়তমের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি সম্ভোগের ব্যাঘাত হওয়া দূরে থাকুক্, বরং তদ্ব্যতীত প্রকৃত সম্ভোগই হয় না; সম্ভোগে প্রকৃত আস্বাদনই হয়না, আস্বাদনে প্রকৃত পরিতৃপ্ততা বা চরিতার্থতা হয় না। আহা! সেই "আধো আধো বাধ বাধ" ভাব পূর্ণতাকেও অতিক্রম করে! তাই সুরেন্দ্র-বাঞ্ছিত সাত্ত্বিক বিকারবশে গদ্‌-গদ-কণ্ঠ-ভাষে ভগবানের অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ নামোচ্চারণেরও এমন বিস্পষ্ট ও সুসম্পূর্ণ মহিমা! তাই মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকের এই মহাগীতি—

হরিহে! নামটি তব করিতে গ্রহণ,
কবে হবে রুদ্ধকণ্ঠ গদ্গদ বচন?

"পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি?"

-আহা!-

কবে হবে পুলকিত—লোমাঞ্চিত গাত্র,
হরিহে! নামটি তব উচ্চারণ মাত্র!

ভগবন্নাম-গ্রহণমাত্রে অঙ্গে পুলক-লোমাঞ্চের উদয় সাধারণ সৌভাগ্যের বিষয় নহে। আমরা শীতের লোমাঞ্চ জানি, রোগের লোমাঞ্চ জানি, ভয়ের লোমাঞ্চ জানি, পুলকের লোমাঞ্চও বোধ হয় ক্বচিৎ কখনও একটু আধটু জানি; কিন্তু সে হয়ত হঠাৎ অর্থ-বিত্ত পেয়ে, কি মোহিনীর মুখের দিকে চেয়ে! কিম্বা আকস্মিক বিপদ হতে অকস্মাৎ উত্তীর্ণ হলে, অথবা কোনও উৎকট বিরহে বিকট মিলন পেলে! ইত্যাদি। কিন্তু ভগবানের একটি নাম মাত্র—একটি কথা মাত্র উচ্চারণে যে সেই দুর্লভ ভাব পুলক-লোমাঞ্চন লাভ কিভাবে সম্ভবে, আমরা সম্ভবতঃ তাহাই বুঝিনা। তবে ভাগ্যবলে ভারত-বর্ষে হিন্দুকুলে জন্মলাভ হইয়াছে, তাই একটু যা গন্ধ পাওয়া যায়। সেই গন্ধ-টুকুতেই আমরা আনন্দিত ও আশ্বস্ত।

আমাদের ন্যায় ঐহিকসর্ব্বস্ব ও পারমার্থিকনিঃস্ব নিয়াধিকারীর নিকটে শুধু শব্দ-বিশেষের স্মরণ-কীর্ত্তনাদি জন্য পুলক-লোমাঞ্চন বরং বিস্ময়ের বিষয় বোধ হওয়াও বিস্ময়ের বিষয় নহে। ভগবন্নামে লোমাঞ্চন আমাদের সংসার-সর্ব্বস্ব জীবনে অপরীক্ষিত। টাকার ঘড়া নয়, মোহরের তোড়া নয়, প্রিয়ার হাস্য নয়, প্রিয়পুত্রের আস্য নয়, বেকারের চাকুরীটি নয়, খ্যাতি-ব্যাধিতের উপাধিটি নয়, তবে শুধু স্মরণমাত্রেও লোমাঞ্চ হওয়ার বস্তু কি আমাদের কাছে ভগবানের নাম? সাধুর মুখে শুনি,

শাস্ত্র-বাক্যে জানি, আমরাও হয়ত রচনায় লিখি, বক্তৃতায় বকি, কিন্তু প্রকৃত বস্তুতত্ত্বের আস্বাদ এ জীবনে একটুও' পাইব কি? দুটা আখরের উচ্চারণে লোমাঞ্চন! আর তার জন্যই এ ভূ-ভারতে চিরকাল এত আকিঞ্চন! এর জন্য এখানে লোকে প্রাসাদ ছেড়ে তরুতলে থাকে, চন্দন ছেড়ে ভস্ম মাখে, মুকুট খুলে জটা ধরে, জোড়া ফেলে কৌপীন পরে! ঐ দুটি আখরের জন্য এখানে কে কি না করে? ঐ জন্য এখানে কত ভোগী যোগী হইতেছেন, কত আমীর ফকিরী লইতেছেন! পুরাণ-ইতিহাসে শুনি, ঐ জন্যই নাকি ব্রহ্মা তপস্বী, শিব শ্মশান-বাসী, বুদ্ধ উদাসী, গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী! যে দুই আখরের এত প্রবল প্রতাপ, এমন অসামান্য প্রভাব, তার স্মরণে—কীর্ত্তনে এ ভারত-ভুবনে পুলক-লোমাঞ্চন অবশ্য অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নয়, তাহা আমরাও যুক্তিতে বুঝি। কিন্তু যুক্তিতে বুঝা একরূপ, আর ভক্তিতে বুঝা অন্যরূপ। ইহা তর্ক-বিচারের অনধিকৃত, আইন-নজীরের অবিষয়ীভূত, বক্তৃতা-কবিতায় অবিকসিত, শাস্ত্রীয় উক্তিতে অননুভূত। একমাত্র ভক্তের ভক্তিতেই ইহা অধিগত ও আস্বাদিত! আমরা সেই ভক্তি-ধনেরই কাঙাল; সুতরাং ভগবন্নামের মহত্ব, নাম-গ্রহণের গুরুত্ব, আর তজ্জনিত পুলক-লোমাঞ্চনের মধুরত্ব আমরা কিরূপে বুঝিব? অথচ উহাই এই বিষয়-বিষাক্ত মানব-জীবনের একটি অপূর্ব্ব অমৃতময় অবস্থা। এই মহাসত্য সাধনার্থী মানবকে শিক্ষা দিতেই জগদাচার্য্য শ্রীগৌরাঙ্গের এই শিক্ষাশ্লোকের ব্যবস্থা।

নামের কৃপায় নামের মর্ম্ম যে একটু বুঝিয়াছে, সে-ই মজিয়াছে। সে-ই জানিয়াছে, কেন দুটি আখরের মনোচ্চারণে ভক্ত-অঙ্গে অপূর্ব্ব প্রেম-লাঞ্ছন পুলক-লোমাঞ্চনের উদয় হয়। বুঝি সেই অতিভাগ্যধরের অন্তরাত্মাই কবির বীণার তানে তান মিলাইয়া অনুদিন গান করে—

"হরি হরি হরি!
কি মধু-লহরী!
মনে মাত্র স্মরি,
উঠি যে শিহরি!
হরি হরি হরি!
কি নাম আমরি!"

আলোচ্য শিক্ষা-শ্লোকটিতে আমাদের দয়াল গৌরাঙ্গ তাঁহার আত্মাদর্শ-প্রদর্শিত কলি-জীবোদ্ধারণ ভক্তি-ভজনে সাত্ত্বিক বিকারের প্রকৃষ্ট গুরুত্ব-বোধই উৎকৃষ্টরূপে শিক্ষা দিয়াছেন।

শাস্ত্রমতে সাত্ত্বিক ভাব অষ্টবিধ। ভক্তাবতার মহাপ্রভুর হাতে-গড়া ভক্তি-দর্শন-কবিবর শ্রীরূপগোস্বামী তাঁহার "ভক্তিরসামৃত সিন্ধু"তে আটটি সাত্ত্বিক ভাব-রত্ন আবিষ্কার করিয়াছেন, যথা—

"তে স্তম্ভস্বেদরোমাঞ্চাঃ স্বরভে-
দোঽথ বেপথুঃ।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সা-
ত্ত্বিকাঃ স্মৃতাঃ"

স্তম্ভ, ঘর্ম্ম, পুলকলোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয়, এই আটটিকে "অষ্টসাত্ত্বিক বিকার" বা "অষ্টসাত্ত্বিক ভাব" বলা যায়। ভক্তিভজনতত্ত্বের এই

সাত্ত্বিকবিকার-বিশ্লেষণে মহামনোবিজ্ঞানবিৎ শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রত্যেক বিকার বা ভাবেরই একটু পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

"স্তম্ভো হর্ষভয়াশ্চর্য্য বিষাদামর্ষ-
সম্ভবঃ।
তত্র বাগাদিরাহিত্যং নৈশ্চল্যং
শূন্যতাদয়ঃ॥"

হর্ষ, ভয়, আশ্চর্য্য, বিষাদ ও অমর্ষ (ক্রোধ) হইতে স্তম্ভ জন্মে। তাহাতে বাক্য রুদ্ধ, অঙ্গ নিশ্চল (স্তম্ভ অর্থাৎ থাম; অঙ্গ স্তম্ভিত হওয়া—অর্থাৎ থামের মত নিশ্চল হইয়া যাওয়া) এবং সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়-ব্যাপার নিরুদ্ধ হয়। ভগবদ্ভক্তিতে এহেন স্তম্ভের উদয় অল্প সৌভাগ্যের বিষয় নয়।

"স্বেদো হর্ষভয়ক্রোধাদিজঃ ক্লেদ-
করস্তনোঃ।"

হর্ষ, ভয় ও ক্রোধাদির প্রাবল্যে যে শরীর ক্লেদার্দ্র হয়, তাহাকে স্বেদ বা ঘর্ম্ম বলা যায়। সাধারণতঃ রোগ, গ্রীষ্ম ও বিকট চিত্তবিকারজাত ঘর্ম্মের আমরা খবর রাখি। কিন্তু আকস্মিক ও অত্যাধিক হর্ষ ভিন্ন হর্ষজ ঘর্ম্ম দুর্লভ। সেই আকস্মিক ও অত্যধিক হর্ষ ভক্তের ভগবন্নামগ্রহণাদিতে যেমন হইয়া উঠে, তেমন আর কাহার কিসে হইবে? ঐহিক হর্ষে ঘর্ম্মোদ্গম, সম্ভব হইলেও অতি কম।

"রোমাঞ্চোঽয়ং কিলাশ্চর্য্যহর্ষো-
ৎসাহভয়াদিজঃ।"

বিস্ময়, পুলক ও ভয়াদি হইতে রোমাঞ্চ জন্মে। ভগবন্নাম-প্রেমের অধ্যাত্মবৈদ্যুতিক প্রভাবে ভক্ত-অঙ্গের যে পুলকজাত রোমাঞ্চ, তাহাই বিধাতার রোমাঞ্চ-সৃষ্টির পরম ও চরম সার্থকতা।

"বিষাদবিস্ময়ামর্ষহর্ষভীত্যাদিসম্ভবং।
বৈস্বর্য্যং স্বরভেদঃস্যাদেষগদ্গদি-
কাদিকৃৎ॥"

বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, হর্ষ ও ভয়াদি-জন্য স্বর-বিকৃতি উপস্থিত হয়। স্বরভেদ হইতেই গদ্গদবাক্যতা জন্মে। ভগবানে চিত্ত একান্ত তদ্গত না হইলে আর ভগবন্নামোচ্চারণে বাক্য গদ্গদ হয় না। ভগবদ্-বিষয়িণী শত সহস্র সাধারণবক্তৃতা হইতেও ভাব-গদ্গদভাষণে একটিমাত্র ভগবন্নামের অস্ফুট ও অসংপূর্ণ উচ্চারণও অধিকতর গৌরবান্বিত!

"বিত্রাসামর্ষহর্ষাদ্যৈর্বেপথুর্গাত্র-
লৌল্যকৃৎ।"

অতি ত্রাস, ক্রোধ ও হর্ষাদি হইতে বেপথু অর্থাৎ কম্পের আবির্ভাব; তদ্দ্বারা গাত্রের চাঞ্চল্য জন্মে। আমরা বাঙ্গালী, ভয়ে কাঁপাটি মর্ম্মে মর্ম্মে জানি। ক্রোধে কাঁপাও কিছু না কিছু জানি;—অন্ততঃ অন্তঃপুরে! আর হর্ষে কাঁপা সেই অনন্ত হর্ষামৃত-সিন্ধুর নামামৃত-বিন্দুর স্পর্শেই প্রকৃত সম্ভবে।

"বিষাদরোষভীত্যাদের্বৈবর্ণ্যং স্বর-
বিক্রিয়া।
ভাবজ্ঞৈরত্র মালিন্যকার্শ্যাদ্যাশ্চ
প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

বিষাদ, ক্রোধ ও ভয়াদি হইতে যে বর্ণ-বিকার উৎপন্ন হয়, তাহাই বৈবর্ণ্য।

ভাবজ্ঞগণ কহেন, মলিনতা ও কৃশতাদিও ইহাতে জন্মে। এখানে হর্ষের উল্লেখ নাই; কিন্তু 'আদি' শব্দের মধ্যেই হর্ষ ও লজ্জা প্রভৃতিকে স্থান দিতে হইবে। হর্ষজন্য বৈবর্ণ্য খুব কমই ঘটে। দুঃখ, ভয় ও রোষাদি জনিত বৈবর্ণ্যই সচরাচর দৃষ্ট হয়। তবে আকস্মিক হর্ষলাভে বা লজ্জায় মুখমণ্ডলে আরক্তিমতা প্রকাশ পায়। ভক্তের শ্রীমুখ-কমল ভাগবতানন্দে আরক্ত ও ভগবদ্বিরহ-বোধে মলিন হয়; কিন্তু সে মালিন্য কি সুন্দর! সে মালিন্যের অন্তরালে এক অপূর্ব্ব অধ্যাত্মপ্রভা প্রচ্ছন্ন থাকে। ভাগ্য-ক্রমে সে প্রভা দেখিবার চক্ষু যাঁহার আছে, তিনিই তাহা দেখিতে পান। তীর্থাদি দর্শনে বা সাধুসঙ্গলাভে ভগবৎভজনার্থীর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়; তাহাও সাত্ত্বিক বর্ণ-বিকার মধ্যে গণ্য। সংসারে, প্রবাস-প্রত্যাগত প্রাণ-পতির দর্শনে দীর্ঘ-বিরহ-বিশীর্ণা সতীর মুখমণ্ডলে এই সাত্ত্বিকভাবের প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রকটিত হয়। এইরূপ অন্যান্য রসের অন্যান্য উদাহরণও কল্পনা করা যাইতে পারে।

> "হর্ষরোষবিষাদাদ্যৈরশ্রু নেত্রে জলোদ্গমঃ।
> হর্ষজেঽশ্রুণি শীতত্বমৌষ্ণ্যং রোষাদিসম্ভবে॥"

হর্ষ, রোষ ও বিষাদাদি জন্য যে নেত্রে জলোদ্গম হয়, তাহাই অশ্রু। তন্মধ্যে হর্ষজনিত অশ্রু শীতল ও দুঃখ-রোষাদিজনিত অশ্রু উষ্ণ। সিদ্ধ মহাজন-বাক্য অবশ্য সত্য; তবে তাহা পরীক্ষা করিয়া কয়জনবা দেখিতে পারেন? কয়জনের ভাগ্যেইবা অত্যানন্দ জন্য অশ্রুলাভ ঘটে? তবে ভগবদ্বিষয়ে ভক্তের অশ্রুপাত কেবল হর্ষ জন্যই হয় না। দুঃখ-ভয়াদি জন্যও হয়। কিন্তু সে দুঃখ-ভয়াদির অন্তরালেও নিগূঢ় সাত্ত্বিকানন্দ নিহিত; কারণ মূলে যে সেই আনন্দময়ই বিরাজিত। ফলে এবিষয় ইতঃপূর্ব্বে আলোচ্য শিক্ষাশ্লোকের প্রথমাংশিক প্রবন্ধেই আলোচিত হইয়াছে; এখানে পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। শুনিয়াছি, এ সম্বন্ধে মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ পরমহংস বলিয়াছেন যে, সুখের শীতল অশ্রু প্রধানতঃ কাণের দিকের চক্ষু-কোণ হইতে ঝরে, আর দুঃখের উষ্ণ অশ্রু প্রধানতঃ নাকের দিকের চক্ষু-কোণ হইতে ঝরে। তবে পরীক্ষার সুবিধা সকলের সহজে ঘটেনা; কেননা সংসারে সুখাশ্রু সুদুর্লভ। ফলিতার্থে এটি পরীক্ষিত সত্য।

> "প্রলয়ঃ সুখ-দুঃখাভ্যাঞ্চেষ্টাজ্ঞান-নিরাকৃতিঃ।
> অত্রানুভাবাঃ কথিতা মহীনিপা-তনাদয়ঃ॥"

সুখ বা দুঃখের আতিশয্য জন্য যে বহিরিন্দ্রিয়ের চেষ্টা ও অন্তরিন্দ্রিয়ের সংজ্ঞা লোপ পায়, তাহাকেই 'প্রলয়' বলা যায়। এই প্রলয়-ভাবের প্রাবল্যেই ভূমিতে পতন ইত্যাদি (যাহাকে সাধারণকথায় "দশায় পড়া" প্রভৃতি বলা হয়) লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবশাস্ত্র-বর্ণিত বিরহের দশ দশার মধ্যে 'মোহ' দশা এই প্রলয় ভাবেরই অন্তর্ভূত।

এই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের আবার চারি প্রকার অবস্থা-বিভাগ আছে, যথা—ধূমায়িত, জ্বলিত, দীপ্ত ও উদ্দীপ্ত। যখন

কেবল দুই একটি ভাবের অঙ্কুর ও তাহা সংবরণীয়, তখন তাহা ধূমায়িত। যখন কতিপয় ভাবের প্রকাশ ও তাহা কষ্টে সম্বরণীয়, তখন জ্বলিত। যখন অনেক ভাবেরই সুপ্রকাশ ও তাহা অসংবরণীয়, তখন দীপ্ত। আর যখন সমগ্র ভাবের যুগপৎ প্রকট প্রকাশ বা উচ্ছ্বাস, এবং সেই মহাভাগ্যবান ভাব-ভাজনের আত্ম-হারা ভাবের বশে উহার সংবরণচেষ্টাও অসম্ভব, তখনই তাহার 'উদ্দীপ্ত' সংজ্ঞা।

এই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের মধ্যে অশ্রু, গদ্গদবাক্য ও পুলক-লোমাঞ্চ, এই তিনটী ভাব আলোচ্য শিক্ষাশ্লোকটিতে উক্ত হইয়াছে। সাধারণতঃ এই তিন ভাবই দৃষ্ট হয়। স্তম্ভ, ঘর্ম্ম, কম্প, বৈবর্ণ্য ও প্রলয়, এই পঞ্চভাবও এই ভাবত্রয়ের অন্তর্ভূতভাবেই অল্পাধিক স্ফুরিত হয়; কিন্তু ভগবদ্ভজন বিষয়ে বিশিষ্ট ভাবোচ্ছ্বাস ব্যতীত ঐগুলি বিশিষ্টরূপে দৃষ্ট হয় না। শ্রীরাধিকার পূর্ব্বরাগের অবস্থায় প্রধানতঃ পূর্ব্বোক্ত ঐ তিনটি ভাবেরই প্রকাশ হইত। তখন পর্য্যন্ত তিনি কৃষ্ণানুরাগ-জনিত ভাব-বিকার সম্বরণ করিতে পারিতেন। তখনও শ্রীমতীর সাত্ত্বিক ভাবের "ধূমায়িত" অবস্থা। তৎপর লোমাঞ্চের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কৃষ্ণসঙ্গ-লালস-লোলাঙ্গে কম্পের আবির্ভাব হইল; সুতরাং তাঁহার ভাবও "জ্বলিত" হইয়া দুঃসম্বরণীয় হইল। এই অবস্থায় সখীর প্রতি শ্রীমতীর একটি উক্তি শ্রীপাদ রূপগোস্বামী মহোদয় উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন।—

"নিরুদ্ধং বাষ্পান্তঃ কথমপি ময়া গদ্গদগিরো।
হ্রিয়া সদ্যো গূঢ়াঃ সখি বিঘটিতো বেপথুরপি॥
গিরিদ্রোণ্যাং বেণৌ ধ্বনতিনিপুণৈরিঙ্গিতনয়ে।
তথাপ্যূহাঞ্চক্রে মম মনসি রাগঃ পরিজনৈঃ॥"

অর্থাৎ——

গিরির গহ্বরে মুরলীর স্বরে,
ইঙ্গিত-আহ্বান শুনি,
নয়নের বারি নয়নে নিবারি,
লজ্জায় গদগদ বাণী।
কিন্তু সখি! মোর গাত্র-কম্প ঘোর
রোধিতে না হয় শক্তি;
তাই অনুমানে পরিজনে জানে,
মম কৃষ্ণ-অনুরক্তি।

শিক্ষাশ্লোকোক্ত ভাবত্রয়ের সহিত গাত্র-কম্প উপস্থিত হইলেই ভাবের বহির্বিকাশ অসম্বার্য্য হয়। তখন হয়ত উক্ত ভাবত্রয়ও সম্বরণ-যোগ্যতা সত্ত্বেও অসম্বৃত হইয়া ভাব-ভাজনকে বিহ্বলিত করে। কৃষ্ণদর্শনে দেবর্ষি নারদের ভাব-বিহ্বলাবস্থার বর্ণনে এইরূপ "দীপ্ত" ভাবের একটি প্রদীপ্ত দৃষ্টান্ত-শ্লোক, যথা——

"ন শক্তিমুপবীননে চিরমধত্ত কম্পাকুলো।
ন গদ্গদনিরুদ্ধবাক্ প্রভুরভূদুপশ্লোকনে॥
ক্ষমোঽজনি ন বীক্ষণে বিগলদশ্রুপূরঃপুরো।
মধুদ্বিষি পরিস্ফুরদবশমূর্ত্তিরাসীন্মুনিঃ॥"

অর্থাৎ——

শ্রীকৃষ্ণদর্শন করি সম্মুখে সহসা,
অবশাঙ্গ নারদের ভাবাবেশ-দশা!
কম্পেতে অশক্ত মুনি বীণার বাদনে;
স্তবনে অশক্ত—বাণী গদ্গদ বদনে;
বর্ষণে অজস্রধারে হর্ষ-অশ্রুনীর,
দর্শনে অশক্ত মুনি শ্রীমূর্ত্তি হরির!

আহা! দেবর্ষির এই দেব-দুর্লভ অবস্থা কি চমৎকার! কর-কম্পে বীণা 'বেসুর' বাজিল, কিন্তু সে বেসুরেই আজ অসুরারির সুরাসুর-সেব্য অপূর্ব্ব গুণ-গান হইল!

বিশুদ্ধ সুর-তান-লয়ে কখনও বুঝি তেমনটি হয় নাই। আজ অস্পষ্ট গদ্গদ বাক্য-চেষ্টা মাত্রে যে স্তব হইল, নারদের তেমন স্তবে তুষ্ট বুঝি কৃষ্ণ কখনও হন নাই। অশ্রুধারে দৃষ্টিলোপ হওয়ায়, যেরূপ অস্পষ্ট কৃষ্ণরূপ দৃষ্ট হইল, তেমন অপরূপরূপ বুঝি বিস্পষ্ট দৃষ্টিতেও নারদ কখনও দর্শন করেন নাই! ভগবৎকৃপালেশে ভক্তের সাত্ত্বিক ভাবাবেশের মহিমাই এইরূপ!

নারদ প্রভৃতি নিত্যসিদ্ধ পরমভক্তের এবম্প্রকার ভাবাবেশ-উদাহরণ, এবং স্বয়ং কৃষ্ণ-প্রাণাধিকা শ্রীরাধিকার পূর্ব্বোক্ত ভাববিকার-বর্ণন, এ সমস্তেও সমস্ত ভাবের যুগপৎ বিকাশ বিকসিত নহে। সমগ্র অষ্ট সাত্ত্বিকভাবের বিস্পষ্ট বিকাশ মহাভাবময় শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরিতে পরিদৃষ্ট হইয়াছে। শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে শ্রীচৈতন্যের সেই অনন্য-সাধারণ নৃত্যকীর্ত্তনোৎসবের সেই চিত্তচমৎকারিণী—পাষণ্ড-হৃদয়েও লোমাঞ্চ-সঞ্চারিণী বর্ণনা এইখানে আস্বাদন করুন—

"উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার।
অষ্ট সাত্ত্বিকভাব উদয় সমকাল॥
মাংসব্রণ সহ রোমবৃন্দ পুলকিত।
শিমুলের বৃক্ষ যেন কণ্টকে বেষ্টিত॥
একেক দন্তের কম্প দেখি লাগে ভয়।
লোকে জানে দন্ত সব খসিয়া পড়য়॥
সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ ছুটে—তাতে রক্তোদ্গম।
জ-জ-গ-গ-জ-জ-গ-গ গদ্গদ বচন॥
জলযন্ত্র-ধারা যৈছে বহে অশ্রুজল।
আশপাশ লোক যত ভিজিল সকল॥
দেহকান্তি গৌর—কভু দেখিযে অরুণ।
কভু কান্তি দেখিযে মল্লিকাপুষ্প সম॥
কভু স্তম্ভ—কভু প্রভু ভূমিতে লোটায়।
শুষ্ক কাষ্ঠসম হস্ত পদ না চলয়॥"

কি অদ্ভুত! কি অপূর্ব্ব! কি অসাধারণ! ইহাই বুঝি "ন ভূত ন ভবিষ্যতি!" অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব ছাপাইয়া—তাহার উপরেও ইহার গতি! ভগবৎপ্রেমে এহেন ভাবোচ্ছ্বাস—এরূপ ভাবোন্মাদ কবির কল্পনা, ভাবুকের ভাবনা, জ্ঞানীর গবেষণা এবং অস্মদাদির ন্যায় অধমাধিকারী অভাব-ভাজন অভাজনের ধারণার সংপূর্ণ অতীত! ইহা জগতে অতুল্য; অথবা ইহা কেবল ইহারই তুল্য!

শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং মূর্ত্তিমান ভাবাবেশ-স্বরূপ। তাঁহার দর্শনে সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোকের হর্ষাশ্রু বর্ষণ এবং স্পর্শনে পাষণ্ডেরও লোমহর্ষণ হইত। গৌরাঙ্গের বাল্যলীলায়, সেই অতিথি তৈথিক ব্রাহ্মণের কৃষ্ণোদ্দেশে নিবেদিত পক্কান্ন গৌরাঙ্গ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ ভক্ষিত হইলে, যখন ধ্যানযোগে সেই বিপ্র-যোগিবর সম্মুখস্থ গৌরকেই তাঁহার কৃষ্ণ বলিয়া চিনিলেন, অমনি তখনই—

"স্বেদ-কম্প-লোমাঞ্চ—গদ্গদবাক্য কহে।
নয়নাশ্রুধারা যেন স্রোতস্বতী বহে॥"
(চৈতন্যভাগবত)

কৃষ্ণ-দর্শনে নারদের যে দশা পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, গৌরাঙ্গ দর্শনেও তৈর্থিক ব্রাহ্মণের তদ্বৎ বা ততোধিক দশা উপস্থিত হইল। তৈর্থিকের চক্ষে তখন কৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ একাঙ্গ; তাই তাঁহার অঙ্গেও অমনি অপূর্ব্ব সাত্ত্বিক ভাবরসের তরঙ্গ-রঙ্গ! ভগবদ্দর্শনে ভক্তের এই অবস্থাই স্বাভাবিক। তারপর ভগবন্নামগ্রহণেও যদি নাম-নামীতে অভেদ জ্ঞানে ভক্তের ভাব-দশা হয়, তবে তদপেক্ষা ভজন-কৃতার্থতা আর কি হইতে পারে? তাই গৌরাঙ্গোক্ত এই 'শিক্ষাশ্লোকে

ভগবন্নাম-গ্রহণেই সেই পরমর্ষিজন-স্পৃহণীয় ভাবাবেশ লাভের প্রাণগত প্রার্থনা পরিব্যক্ত হইয়াছে।

ভাব হইতেই প্রেমের উদয় হয়। শাস্ত্র বলেন—"অথাসক্তি স্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।"

আসক্তি হইতে ভাব।
ভাব হতে প্রেম-লাভ॥

আসক্তি ঘনীভূত হইয়া ভাব এবং ভাব ঘনীভূত হইয়াই ক্রমে প্রেমে পরিণত হয়। "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" গ্রন্থে প্রেমের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"সম্যঙ্‌মসৃণিতস্বান্তো মমতাতিশয়াঙ্কিতঃ
ভাবঃ সএব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥"

অর্থাৎ—

যাহে হয় অন্তস্তল অতিস্নিগ্ধ সুনির্ম্মল,
অতীব মমতা মাখা যায়;
অতি ঘনীভূতসত্ত্ব, এমন যে ভাব-তত্ত্ব,
পণ্ডিতেরা প্রেম ক'ন তায়।

অতএব প্রেমের জন্যই ভাবের প্রয়োজন। সাত্ত্বিক বিকার সেই ভাবেরই আবির্ভাব-লক্ষণ।

ভগবৎপ্রসঙ্গে দু-একটি সাত্ত্বিক বিকার অনেক সময়ে অনেক ভাবুক-প্রকৃতি সাধারণ ব্যক্তিতেও বিকসিত হইয়া থাকে; কিন্তু উহা ঠিক সাত্ত্বিক ভাব নয়; উহা শাস্ত্রে "সত্ত্বাভাস" নামে কথিত। সত্ত্বাভাস ভাবুকতার ফল; কিন্তু ঠিক ভক্তির ফল নহে। তবে সুনীতি-ভিত্তিতে অবিরল অনুকূল অনুশীলন থাকিলে, ক্রমে ভাবুকতাও ভক্তিতে পরিণত হইতে পারে। ফলে ভগবন্নাম-গ্রহণেই যাহার অশ্রু-লোমাঞ্চন-গদ্‌গদভাষণাদি আপনি উপস্থিত হয়, সে যে নিশ্চয় ভক্তিধনে ধনবান, সাত্ত্বিক ভাব-সম্পদে ভাগ্যবান ও অচিরাৎ হরি-প্রেমানন্দে চরিতার্থ হইবার অবাধিত অধিকারবান, এই মহা সত্যই মহাপ্রভুর এই শিক্ষাশ্লোকে বর্ণময়রূপে অবতীর্ণ। দীনদাস গাইয়াছেন,—

কৃষ্ণরূপ ধ্যানে যার অশ্রুধার নাহি বহে॥
কৃষ্ণগুণ গানে যার বাণী গদগদ নহে॥
কৃষ্ণকথা শুনে যার অঙ্গ লোমাঞ্চিত নয়॥
বৃথা তার নরজন্ম ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমুদয়॥
কৃষ্ণনাম নিতে যার বিকাশে সাত্ত্বিক ভাব॥
কৃষ্ণকৃপা-বলে তার কৃষ্ণপ্রেম হয় লাভ॥
কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণে মজ কর কৃষ্ণ-আরাধন।
কৃষ্ণকৃপা-লাভে ভাবে পাবে কৃষ্ণপ্রেম-ধন॥

(ক্রমশঃ)

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

জাতকর্ম্ম ও নিষ্ক্রমণ।

জাতকর্ম্ম-মন্ত্রব্যাখ্যা।

ওঁ ইয়মাজ্যেদমন্নমিদমায়ুরিদমমৃতং।

অন্বয়ঃ। ইয়ং আজ্যা ইদং অন্নং ইদং আয়ুঃ ইদং অমৃতং (ভবতি)।

ব্যাখ্যা। ইয়ং ঘৃতং ইতি শেষঃ বিধেয় প্রাধান্যাৎ স্ত্রীলিঙ্গ নির্দ্দেশঃ আজ্যা প্রজ্ঞা বুদ্ধিদায়িনী, ঘৃতস্য সুবুদ্ধিজনকত্বং আয়ুর্ব্বেদে প্রসিদ্ধং। আ সম্যক্‌প্রকারেণ জায়তে অনয়া ইতি করণে অনট্‌। ইদং ঘৃতং

অন্নং প্রাণধারণহেতুত্বাৎ ঘৃতস্য প্রাণধারণো-পযোগি সমুদয়োপাদান যুক্তত্বাৎ কেবলঘৃত-ভোজনেনৈব মানবা জীবিতুং সমর্থা ইতি সুশ্রুতটীকায়াং ডল্বণমিশ্রঃ। 'ইদং আয়ুঃ সুদীর্ঘজীবনদায়ী। তথাচ আয়ুর্ব্বেদঃ আয়ুর্ঘৃতে গুড়ে রোগাঃ। ইদং ঘৃতং অমৃতং অমৃতবৎকার্য্যকারকং। ঘৃতস্য অমৃতত্বং ক্ষিপ্তশৃগাল-কুক্কুর-বিষনাশকত্বাৎ প্রসিদ্ধং। "যস্মাত্তেজোময়ং ব্রহ্ম ঘৃতে তচ্চ প্রতিষ্ঠিতং তেজোময়ামৃতং দিব্যং মহাপাতকনাশনং।" ইতিস্মার্ত্তভট্টাচার্য্য কৃত প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বং। অনেন তব জিহ্বাং সংমার্জ্জ্য ত্বাং সুদীর্ঘজীবিতং করোমি ইত্যর্থঃ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ। (আমি যে ঘৃতের দ্বারা তোমার জিহ্বা মার্জ্জন করিতেছি) ইহা বুদ্ধিজনক, অন্নস্বরূপ, আয়ুর্বৃদ্ধিকারক ও অমৃতবৎ কার্য্যকারক ॥১॥

ওঁ মেধাং তে মিত্রাবরুণৌ মেধা-
মগ্নি র্দধাতু তে।
মেধাং তেঽশ্বিনৌ দেবাবাধত্তাং
পুষ্করস্রজৌ ॥২॥

অন্বয়ঃ। মিত্রাবরুণৌ তে মেধাং দধাতু। অগ্নিঃ তে মেধাং দধাতু। পুষ্করস্রজৌ দেবৌ অশ্বিনৌ তে মেধাং আধত্তাং ॥২॥

টীকা। মিত্রাবরুণৌ সূর্য্যপ্রচেতসৌ মিত্রশ্চ বরুণশ্চ তৌ দেবতাদ্বন্দ্বে অত আং। তে তব মেধাং ধারণাবতীং ধিয়ং দধাতু উৎপাদয়তু। অগ্নিঃ অনলঃ তে তব মেধাং দধাতু— উৎপাদয়তু। আশংসায়াং লোট্। পুষ্করস্রজৌ পদ্মমালিনৌ পুষ্করগ্রথিতাঃ স্রজঃ যয়োঃ তৌ, বিসপ্রসূন রাজীব পুষ্করাম্ভোরুহাণি চ ইত্যমরঃ। দেবৌ অশ্বিনৌ অশ্বিনীকুমারৌ তে তব মেধাং আধত্তাং উৎপাদয়তাং ত্বং এতেষাং প্রসাদেন সুমেধাঃ ভব ইত্যর্থঃ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ। সূর্য্য ও বরুণ তোমার মেধা উৎপাদন করুন। অগ্নি তোমার মেধা উৎপাদন করুন। পদ্মমালাভূষিতকণ্ঠ অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও তোমার মেধা উৎপাদন করুন ॥২॥

ওঁ সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য
কামং সনিং মেধাময়াসিষং ॥৩॥

অন্বয়ঃ। সদসঃ পতিং অদ্ভুতং ইন্দ্রস্য প্রিয়ং মেধাং সনিং কামং অয়াসিষং ॥৩॥

টীকা। সদসঃ সভায়াঃ পতিং দেবৈঃ সভাপতিত্বেন বৃতং অদ্ভুতং আশ্চর্য্যকর্ম্মকারকং ইন্দ্রস্য দেবপতেঃ প্রিয়ং সৎপরামর্শাদিপ্রদানেন প্রীতিকরং মেধাং ধারণাবতীং ধিয়ং ধী ধারণাবতী মেধাং ইত্যমরঃ। সনিং দাতারং সন দানে ইতিধাতোঃ ঔণাদিক ই প্রত্যয়ঃ ছান্দসত্বাৎ কর্ম্মণি ন ষষ্ঠী। সুরাচার্য্যং কামং পর্য্যাপ্তং যথা তথা ক্রিয়াবিশেষণমেতৎ অয়াসিষং শরণত্বে উপগচ্ছামি। যাধাতোঃ ছান্দসত্বেন বর্ত্তমানে লুঙ। তন্মেধালাভার্থং সুরাচার্য্যস্য আশ্রয়ং গৃহ্নামি ইত্যর্থঃ ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ। আমি দেবগণ কর্ত্তৃক সভাপতিত্বে বৃত অদ্ভুত কার্য্যকারক ইন্দ্রের অতিপ্রিয় মেধাদায়ক বৃহস্পতিকে পর্য্যাপ্তরূপে আশ্রয় করি ॥৩॥

ওঁ নাভিং কৃন্তত স্তন্যঞ্চ দত্ত ॥৪॥

অন্বয়ঃ। নাভিং কৃন্তত স্তন্যঞ্চ দত্ত ॥৪॥

টীকা। নাভিং নাড়ীং কৃন্তত ছেদয়ত। স্তন্যং স্তনভবং দুগ্ধঞ্চ দত্ত কুমারস্য মুখে স্তনমর্পয়ত। (ধাত্রীগণান্ সম্বোধ্য পিত্রা ইদং বক্তব্যং ॥৪॥)

বঙ্গানুবাদ। হে ধাত্রীগণ! ইহার নাড়ীচ্ছেদন কর এবং স্তন্যদান কর ॥৪॥

ইতি জাতকর্ম্ম-মন্ত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা।

অথ নিষ্ক্রমণ-মন্ত্রব্যাখ্যা।

ওঁ যত্তে সুষীমে হৃদয়ং হিতমন্তঃ
প্রজাপতৌ।
বেদাহং মন্যে তদ্ব্রহ্মমাহং পৌত্র-
মঘং নিগাং ॥১॥

অন্বয়ঃ (হে চন্দ্র)! তৌ সুষীমে প্রজাপতৌ অন্তঃ যৎ হিতং হৃদয়ং নিহিতং (তৎ)

অহং বেদ। তং ব্রহ্ম ইতি মন্যে (অতো-হহং প্রার্থয়ে) অহং পৌত্রং অঘং নিগাং ॥১॥

টীকা। হে চন্দ্র! হে আহ্লাদকর সুধাংশো! চদি আহ্লাদে ইতি ধাতোঃ রক্ প্রত্যয়ঃ। তথাচ কালিদাসঃ যথা প্রহ্লাদনাচ্চন্দ্রঃ। তে তব সুষীমে অতিশীতলে প্রজাপতৌ সর্ব্বভূতানাং অন্তরাত্মনি আনন্দদায়কত্বেন রক্ষাকর্ত্তরি অন্তঃ মধ্যে যৎ হিতং সাধারণজনহিতকরং হিতশব্দাৎ তৎকরোত্যর্থে শিচ্ ততঃকর্ত্তরি পচাদিত্বাৎ অচ্ হৃদয়ং অন্তরাত্মা নিহিতং তৎ হৃদয়ং অহং বেদ জানামি বিদ্ধাতোঃ কর্ত্তরি লটঃস্থানে লিট্। তং হৃদয়ং ব্রহ্ম পরব্রহ্মস্বরূপং ভবতি ইতি শেষঃ অহং ইতি মন্যে বিবিণষ্মি। অতঃ তব আহ্লাদকরত্বাৎ তব অন্তরাত্মনঃ ব্রহ্মস্বরূপত্বাচ্চ অহং প্রার্থয়ে তৎ সকাশে যাচমানঃ অস্মি যৎ অহং পৌত্রং পুত্রসম্বন্ধি পুত্রশব্দাৎ তস্যেদমিত্যণ্। অঘং দুঃখং অংহো দুঃখব্যসনেষ্বঘমিত্যমরঃ মা নিগাং ন প্রাপ্নোমি। নিপূর্ব্বাৎ ইণ ধাতোর্লঙঃ উত্তম পুরুষৈক বচনং। ইণো গাদেশশ্চ। যথা মে পুত্রাঃ মূর্খা ন ভবন্তি ন চ ম্রিয়েরন্ তথা কুরু ইত্যর্থঃ। তব অন্তরাত্মা যাদৃক্ শীতলঃ মম পুত্রান্তঃকরণমপি তাদৃক্ সুশীতলমস্তু ইতি ভাবঃ ॥১॥

বঙ্গানুবাদ। হে চন্দ্র! তোমার অতি শীতল ও সাধারণজনের হিতকারী অন্তরে যে হৃদয় নিহিত আছে, তাহা আমি জানি। আমি বিবেচনা করি যে, তাহাই পরব্রহ্মস্বরূপ; একারণ আমি প্রার্থনা করি যে, আমি যেন পুত্র-সম্বন্ধি দুঃখ কখনও ভোগ না করি ॥১॥

ওঁ যৎ পৃথিব্যা অনামৃতং দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতং।
বেদামৃতস্যাহং নাম মাহং পৌত্রমঘং খষং ॥২॥

অন্বয়ঃ। পৃথিব্যাঃ যৎ অনামৃতং তৎ দিবি চন্দ্রমসি শ্রিতং। অহং অমৃতস্য নাম বেদ অহং পৌত্রং অঘং মা খষং ॥২॥

টীকা। পৃথিব্যাঃ মর্ত্ত্যমণ্ডলস্য যৎ অনামৃতং অমৃতং মৃধাতোর্ভাবে ক্তঃ। তেন মৃতং মরণং ন মৃতং অমৃতং মরণাভাবঃ ততঃ তৎকরোত্যর্থে শিচ্ ততঃ অমৃতি ধাতোঃ-কর্ত্তরি পচাদিত্বাৎ অচ তেন অমৃতশব্দস্য মরণাভাবকর্ত্তৃত্বং যস্মাৎ তৎ অনামৃতং ছান্দসত্বাদ্দীর্ঘং। তৎ দিবি দ্যুলোকে চন্দ্রমসি চন্দ্রমণ্ডলে শ্রিতং বর্ত্তমানং। অহং অমৃতস্য নাম বেদ জানামি। কদাপি ন দৃষ্টবান্ ইত্যর্থঃ। অতঃ অহং অমৃতস্য সকাশে প্রার্থয়ে নিবেদয়ামি যৎ অহং পৌত্রং পুত্রসম্বন্ধি অঘং দুঃখং পুত্রব্যাপদাদিজনিতমিত্যর্থঃ মা খষং ন প্রাপ্নোমি। খষ গতৌ ইতিধাতো লুঙঃ উত্তমপুরুষৈক বচনং। সর্ব্বে গত্যর্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থাঃ জ্ঞানার্থাশ্চ ইতি সূত্রেণ খষধাতোঃ প্রাপ্ত্যর্থঃ। মা যোগাৎ অড়াগমাভাবঃ ॥২॥

বঙ্গানুবাদ। পৃথিবীর যে অমৃত, তাহা স্বর্গীয় চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থিত। সুতরাং আমি কেবল অমৃতের নাম মাত্র জানি। আমি আজ অমৃতের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, কখনও পুত্র-সম্বন্ধি দুঃখ যেন প্রাপ্ত না হই ॥২॥

ওঁ ইন্দ্রাগ্নী শর্ম্ম যচ্ছতং প্রজায়ৈ মে প্রজাপতী।
যথায়ং নপ্রমীয়েত পুত্রো জনিত্র্যা অধি ॥৩॥

অন্বয়ঃ। হে প্রজাপতী ইন্দ্রাগ্নী! যুবাং মে প্রজায়ৈ শর্ম্ম যচ্ছতং। (যুবাং তথা কুরুতং) অয়ং জনিত্র্যা অধি যথা ন প্রমীয়েত ॥৩॥

টীকা। হে প্রজাপতী লোকপালৌ ইন্দ্রাগ্নী! শক্রানলৌ! যুবাং মে মম প্রজায়ৈ সন্তানায় সুখার্থশব্দযোগে চতুর্থী। শর্ম্ম সুখং শর্ম্মশাত সুখানিচ ইত্যমরঃ। যচ্ছতং দদতং

যথায়ং সুখী ভবিষ্যতি তথা কুরুতং। যুবাং তথা তাদৃক্ কুরুতং যথা যেন প্রকারেণ অয়ং মে সন্তানঃ জনিত্র্যা জনন্যা অধি সহ ন প্রমীয়েত কেনাপি হিংস্যেত। মীঙ হিংসায়ামিতি ধাতোঃ কর্ম্মণি লিঙ। যথা মে ভার্য্যা পুত্রশ্চ ন বিপদ্যেয়াতাং তথা কর্ত্তুমর্হতং ইতি ভাবঃ ॥৩॥

বঙ্গানুবাদ। হে লোকপাল ইন্দ্র এবং অগ্নি! তোমরা দুইজনে আমার সন্তানকে সুখ প্রদান কর এবং যাহাতে আমার সন্তান ও তাহার জননীকে কেহ হিংসা না করে, তাহা করিও ॥৩॥

ওঁ ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত! অত্রিনেত্র সমুদ্ভব!
গৃহাণার্ঘ্যং শশাঙ্কেদং রোহিণ্যা সহিতো মম ॥৪॥

অন্বয়ঃ। হে ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত! অত্রিনেত্রসমদ্ভব! শশাঙ্ক! (ত্বং) রোহিণ্যা সহিতঃ সন্ অর্ঘ্যং গৃহাণ ॥৪॥

টীকা। হে ক্ষীরোদার্ণবসম্ভূত! ক্ষীরোদসাগরাদুৎপন্ন! ক্ষীরাণি উদকানি যস্য সঃ উদকস্যোদাদেশঃ। তস্য প্রভেদাঃ ক্ষীরোদো লবণোদস্তথাপরে ইত্যমরঃ। অর্ণাংসি জলানি অম্ভোঽর্ণস্তোয় পানীয়নীরক্ষীরাম্বুসম্বরমিত্যমরঃ। তানি সন্তি অস্মিন্ অস্ত্যর্থে ব প্রত্যয়ঃ নিপাতনাৎ সলোপশ্চ। ক্ষীরোদ নামা অর্ণবঃ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয়ঃ। তস্মাৎ সম্ভূত! উৎপন্ন! পুরা কিল দেবাসুরা সর্ব্বে মিলিত্বা মন্দরপর্ব্বতং মন্থানদণ্ডং কৃত্বা সাগরান্ মমন্থুঃ তস্মাচ্চ ক্রমেণ চন্দ্রঃ ঐরাবত হস্তী উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্বঃ লক্ষ্মী সরস্বতী অমৃতঞ্চ সমুদ্ভুতানি। এতদ্বিবরণং পদ্মপুরাণে দ্রষ্টব্যং। অত্রেঃ অত্রিনামক মুনেঃ নেত্রাৎ সমুদ্ভবঃ উৎপত্তিঃ যস্য সঃ তৎসম্বোধনং। হে শশাঙ্ক! শশঃ অঙ্কঃ চিহ্নং যস্য তৎসম্বোধনং। ইদং অর্ঘ্যং অর্ঘায় পূজাবিধয়ে ইদং তৎ অর্ঘঃ পূজাবিধৌ মূল্যে ইতি বিশ্বঃ। রোহিণ্যা চতুর্থ নক্ষত্রেণ পত্ন্যা সহিতঃ সন্ সংপূর্ব্বাৎ ধা ধাতোঃ কর্ত্তরি ক্তঃ সমো বা ততহিতয়োঃ ইতি মকারলোপঃ। গৃহাণ স্বীকুরু ॥৪॥

বঙ্গানুবাদ। হে ক্ষীর সমুদ্রসমুৎপন্ন! অত্রিঋষির নয়ন হইতে সমুদ্ভূত! শশাঙ্ক! তুমি রোহিণীর সহিত আমার প্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ কর ॥৪॥

ওঁ যদদশ্চন্দ্রমসি কৃষ্ণং পৃথিব্যা হৃদয়ং শ্রিতং।
তদহং বিদ্বাংস্তৎ পশ্যন্মাহং পৌত্রমঘং রুদং ॥৫॥

অন্বয়ঃ। পৃথিব্যাঃ যৎ হৃদয়ং তৎ অদঃ কৃষ্ণং চন্দ্রমসি শ্রিতং। অহং তৎ বিদ্বান্ তৎপশ্যন্ (চ অস্মি) অহং পৌত্রং অঘং মা রুদং ॥৫॥

টীকা। পৃথিব্যাঃ ভূমেঃ তদধিষ্ঠাতৃদেবতায়াঃ ইতি যাবৎ। যৎ হৃদয়ং অন্তরাত্মা তৎ অদঃ পুরো দৃশ্যমানং কৃষ্ণং কলঙ্কস্বরূপং সৎ চন্দ্রমসি চন্দ্রমণ্ডলে শ্রিতং। অহং তৎ বিদ্বান্ জানন্ তৎ পশ্যন্ চ অবলোকয়ন্ অস্মি ভবামি জানামি পশ্যামি চ ইত্যর্থঃ অতঃ পৃথিব্যাঃ হৃদয়বত্ত্বেন তৎস্বরূপত্বাৎ ত্বৎসকাশে প্রার্থয়ে যৎ অহং পৌত্রং পুত্রসম্বন্ধি অঘং দুঃখং উদ্দিশ্য মা রুদং ক্রন্দামি ॥৫॥

বঙ্গানুবাদ। পৃথিবীর যে হৃদয়, তাহা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া কলঙ্কস্বরূপে চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থিত। আমি তাহা জানি এবং দেখিয়াছি। একারণ প্রার্থনা করি, পুত্রজনিত দুঃখে যেন আমাকে রোদন করিতে না হয় ॥৫॥

ইতি নিষ্ক্রমণ-মন্ত্রব্যাখ্যা সমাপ্তা।

শ্রীগোপালচন্দ্র স্মৃতিভূষণ।

কত দিনে ?

(১)

সুখ সাধ শান্তি আশ,
সকলি গিয়াছে বিভো,
আর কেন তবে—
দেহেতে রহিল প্রাণ ?
বাসনা কাঁদাতে বুঝি
রাখিয়াছ ভবে।

(২)

তাই যদি হৃদে প্রভু,
বাসনা তোমার, দাও
যত ইচ্ছা হয় ;
সহিব নীরবে ক্লেশ,
কিবা ভয়, হৃদি যার
দুঃখ-জ্বালাময় !

(৩)

কত যতনের আহা
ভেঙ্গে দিলে বাসনার
সোনালী স্বপন ;
নিরাশার দাবানলে
ফেলে দিয়ে কাঁদাইলে
সারাটী জীবন।

(৪)

দুঃখের জীবন মম,
কাঁদিতে কাঁদিতে গেল,
নয়নের ধার—
কভু মোর ঘুচিল না,
এখন রয়েছে শুধু
অনন্ত আঁধার।

(৫)

যদিহে করুণা করি
চাহিতে নয়ন মেলি,
স্নেহ নিরমল
এক বিন্দু যদি দিতে,
তবেই হইত বিভো !
জনম সফল।

(৬)

তবে কি অকালে আজি,
আশার প্রদীপ মম,
যাইত নিবিয়া ?
বাসনা কামনা মম,
অকালে সকলি যেত,
আঁধারে মিলিয়া ?

(৭)

অধম সন্তান বলি
চাহিলেনা কৃপা করি,
চরণে ঠেলিলে ;
পাথেয় লইলে কাড়ি,
অসহায় চির তরে,
অকূলে ভাসালে।

(৮)

যাতনা বেদনা প্রাণে
দাও প্রভু যত হয়
বাসনা তোমার ;
মিনতি চরণে, বল
কবে হবে জীবনের
সমাধি আমার ?

(৯)

সাধনা কামনা মম
কত দিনে ফুরাইবে—
নয়নের-জল ?
কত দিনে পাব প্রভু,
তোমার করুণা-কণা,
স্নেহ নিরমল ?

(১০)

অনন্ত আঁধারে ঘেরা
কত দিনে ভব-লীলা
ঘুচিবে আমার ?
কত দিনে পাব নাথ,
শান্তির শীতল ছায়া,
চরণে তোমার ?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।
(রাজসাহী।)

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১০ম বর্ষ, ১০ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। আশ্বিন। ১৩১০ সাল, ১৮২৫ শকাব্দা।

অযোধ্যাবতার শ্রীরামচন্দ্র।

প্রথম প্রস্তাব।

রাম নাম লইতে ভাই না করিও হেলা।
ভব-সিন্ধু তরিবারে রাম নাম ভেলা॥
রাম নাম স্মরণে যমের দায় তরি।
ভবসিন্ধু তরিবারে রাম-পদ তরী॥
রাম নাম লইতে যে করে অভিলাষ।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত সে বৈকুণ্ঠে করে বাস॥
ভবনিধি পার কর রঘুকুলমণি।
তরিবারে দু'টী পদ করেছ তরণী॥"

(কৃত্তিবাস)

ভক্তাধিক ভক্ত ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর পক্ষে পতিত-পাবন রাম নাম কি মধুর! কি মধুর! ভগবৎতত্ত্বজ্ঞ ব্রহ্মদর্শী হিন্দুর আধ্যাত্মিক চক্ষে নবদূর্ব্বাদলশ্যাম শ্রীরাম-মূর্ত্তি কি সুন্দর! কি সুন্দর! যে ভুবনবিখ্যাত অমর কাব্য গ্রন্থে কোকিলকণ্ঠ বাল্মীকি, মহাকবি বাল্মীকি, ধ্যানমগ্ন মহর্ষি বাল্মীকি, অব্যয় অক্ষরানন্দ উপভোগ করিতে করিতে শাশ্বত শ্রীরামচরিত্র গান করিয়াছেন, সেই রসাল রামায়ণ কি পবিত্র! কি পবিত্র! স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্য এবং মর্ত্ত্য হইতে পাতাল—সমগ্র সুবিশাল বিশ্বসংসারে যাহা কিছু মহান্, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু পবিত্র, সুন্দর, তাহা যেন রাম নামরূপ রত্নভাণ্ডারের অন্তর্নিহিত বলিয়া বোধহয়। এমন মধুর নাম, এমন সুন্দর মূর্ত্তি, এমন জ্ঞানময় গ্রন্থ আর কখনও কোথায়ও শুনিয়াছ বা দেখিয়াছ কি? ধন্য সেই দেশ, যে দেশে রঘুনন্দন রামের জন্ম; ধন্য সেই জাতি, রাবণ-বিজয়ী রাঘব যে জাতির গৌরব এবং আদর্শ পুরুষ; এমন মহিমান্বিত ও মহাপুরুষানুগৃহীত দেশকে মর্ত্ত্যধাম বলিয়া বিশ্বাস করিতে আদৌ ইচ্ছা হয় না, এই

জন্য ভারতভূমি ভূস্বর্গ নামের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। সীতাপতি শ্রীরাম যাহাদের পিতা, মা জানকী যাহাদের জননী, ঠাকুর লক্ষ্মণ যাহাদের রক্ষক, ভাগ্যবান ভরত-শত্রুঘ্ন যাহাদের সহস্র সংগুণের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, বাল্মীকি যাহাদের গায়ক এবং পবননন্দন মারুতী যাহাদের বীর, সেজাতির অনন্তকাল স্থায়িনী সেই জন্মভূমির নাম পৃথিবীর মানচিত্র হইতে কখনও কি লুপ্ত হইতে পারে? ইহাত অসম্ভব কথা! কেবল অসম্ভব নহে, অসম্ভব হইতে অসম্ভবতর, অসম্ভবতর হইতে অসম্ভবতম। এই মধুর রাম নাম রূপের সাগর, গুণের আকর এবং প্রেমের শেখর! এই মধুর রাম নাম সতীর প্রাণ, সাধুর ধ্যান, ভক্তের ভরসা, নিরাশার আশা, অগতির গতি এবং অজ্ঞানীর দ্যুতি। এই মধুর রাম নাম মুমুক্ষুর যন্ত্র, মুমূর্ষুর ত্রাণ-তন্ত্র, আর মহাপাপীর মহামন্ত্র। এমন পতিত-পাবন অনাথশরণ জগজ্জীবন নাম আর আছে কি? ভগবান সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রের নবদূর্ব্বাদল শ্যামসুন্দর মূর্ত্তির দিকে যখনই দৃষ্টিপাত করি, তখনই একাধারে সেই শান্ত ও সাংগ্রামিক মূর্ত্তির আদর্শ পুরুষকে দেখিতে পাই, যখনই একাধারে মনুষ্যত্ব (Humanity) ও ঈশ্বরত্বের (Divinity) সমুজ্জ্বল সম্পূর্ণতার মূর্ত্তি নয়ন সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখনই নয়নের প্রেমাশ্রু সম্বরণ করা কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠে। আঁধারে আলোক দিতে, ভীতকে অভয় করিতে, উপায়হীনকে উৎসাহিত করিতে, দগ্ধপ্রাণ শীতল করিতে, পাপীকে পরিত্রাণ করিতে, ভগ্নহৃদয়ে ভরসা দিতে, অধঃপতিত জাতির উদ্ধার করিতে, সুষুপ্ত ও অলসকে জাগ্রত করিতে এবং বজ্রাদপি কঠোর হৃদয়কে কুসুমাদপি কোমল করিতে, রাম নামের তুল্য মহামন্ত্র আর দেখিনা। এই মধুর রাম নাম নিরাশায় উজ্জ্বল আলোক, নির্বীর্য্যের বীর্য্য, পদানতের পরিত্রাণ এবং অত্যাচারিত ও অসমর্থ জনের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র। এমন নাম আর আছে কি?

"ভর্জ্জনংভববীজানাং অর্জ্জনং সুখ-সম্পদম্।
তর্জ্জনং যমদূতানাং রাম রামেতি গর্জ্জনম্॥"

ভাই হিন্দু! ঐ কমললোচন রামের মধুর মূরতির দিকে আধ্যাত্মিক চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ দেখি। একবার ঐ রামরূপসাগরে মগ্ন হইয়া ধ্যানাবস্থায় প্রাণকান্ত রামের পবিত্রতায় পূতমানস হও দেখি।

"শ্যামল শরীর তাঁর চাঁচর কুন্তল।
সুধাংশু জিনিয়া মুখ করে ঝলমল॥
আজানুলম্বিত দীর্ঘ ভুজ সুললিত।
নীলোৎপল জিনি চক্ষু আকর্ণ পূরিত॥
কে বর্ণিতে হয় শক্ত রক্ত ওষ্ঠাধর।
নবনীত জিনিয়া কোমল কলেবর॥
সংসারের রূপ যত একত্র মিলন।
কিসে বা তুলনা দিব নাহিক তেমন॥

বামে সীতা, দক্ষিণে শ্রীরাম! বামে মা জানকী এবং পার্শ্বে জনক-জামাতা রাম! এই যুগলমূর্ত্তি—এই সীতাপতি শ্রীরামমূর্ত্তি মনোহর হইতেও মনোহর!

"সীতাং পার্শ্বগতাং সরোরুহকরাং বিদ্যুন্নিভং রাঘবং"

সতীর পতিভক্তি, পতির পত্নীপ্রাণতা, ভ্রাতৃবৎসলতা, জন্মভূমিহিতৈষিতা, প্রজাপ্রেম, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন,

স্বধর্ম্ম-রক্ষা, প্রিয়ম্বদত্ব, শৌর্য্য, বীর্য্য, উৎসাহ, উদ্দীপনা, জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা, গুরুভক্তি, মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, সত্যপালন, মিথ্যায় ঘৃণা, পাপে বিদ্বেষ, স্নেহ, দয়া, দাক্ষিণ্য, সৌজন্য, সাধুতা, বিনয়, স্বজাতিপ্রেম, জ্ঞানী ও ভক্তে ভক্তি, ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা, অকৃত্রিম বন্ধুতা, অসাধারণ শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সম্পূর্ণতা —এই সকল দেবদুর্ল্লভ মহাগুণ এই অপূর্ব আদর্শ মূর্ত্তিতে একাধারে সুন্দররূপে সম্মিলিত হইয়া কি সুন্দর শোভায় ভারতভূমিকে মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল! এমন নির্ম্মল শরীর, নিষ্কলঙ্ক স্বভাব এবং নিষ্পাপ জীবন, জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সুবর্ণ-সিংহাসনেরই উপযুক্ত। তাহাতেই—

"কূজন্তং রাম রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরম্।
আরুহ্যকবিতাশাখাংবন্দেবাল্মীকিকোকিলম্॥'

এত মহান, এত মধুর, এত পবিত্র এবং এত সুন্দর না হইলে কি এই রাম নামের মহিমায় দুর্দ্দমনীয় দস্যুদল-ধুরন্ধর রত্নাকর সাহিত্য-সরোবরের শারদীয় সরোজ এবং আধ্যাত্মিক আশ্রমের মহামুনি হইয়া অক্ষয় অক্ষরানন্দ ভোগ করিতে পারিতেন? পাষাণ-পাপী অহল্যা যে নামে মুক্ত, চণ্ডাল গুহক যে নামে স্বর্গবাসী, সূর্য্যবংশ যে নামে পবিত্র এবং অন্ধ কৈবর্ত্তের কাষ্ঠের নৌকা যাঁহার পাবনীয় পদস্পর্শে হিরণ্ময়, সে নাম এবং তাঁহার নাম কি সামান্য হইতে পারে?

"পাপিষ্ঠো বা দুরাত্মা পরধনপরদারেষু সক্তো
যদিস্যাৎ
নিত্যং স্নেহাৎ ভয়াদ্বা রঘুকুলতিলকং ভাবয়ন্ সম্পরেতঃ।
ভূত্বা শুদ্ধান্তরঙ্গো ভব শতজনিতানেক
দোষৈ র্বিমুক্তঃ
সদ্যো রামস্য বিষ্ণোঃ সুরবরবিনুতং যাতি
বৈকুণ্ঠমাখ্যম্।
হস্তা যুদ্ধে দশাস্যং ত্রিভুবনবিষমং বামহস্তেন
চাপং
ভূমৌ বিষ্টভ্য তিষ্ঠন্নিতরকরধৃতং ভ্রাময়ন্
বাণমেকম্॥
আরক্তোপান্তনেত্রঃ শরদলিতবপুঃ সূর্য্য-
কোটি প্রকাশো।
বীরশ্রীবন্ধুরাঙ্গস্ত্রিদশপতিনুতঃ পাতু মাং
বীররামঃ॥"

ভাই হিন্দু! আইস, আমরা এই কোটি কোটি ভাই একত্রে মিলিয়া, রামায়ণ গান করিতে করিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের অব্যয় ব্রহ্মপদে ভক্তিভরে প্রণাম করি। যাঁহার নামের মহিমায় সংসার-সাগর গোবৎসপদ তুল্য সহজ ও সামান্য হইতে পারে, যাঁহার কৃপায় সর্ষপ সুমেরু এবং সুমেরু সর্ষপ হইতে পারে, যিনি ভারতের আদর্শ শিক্ষক, যিনি রামায়ণের মহামূর্ত্তি (Central figure) যিনি ভক্ত হিন্দুর উপাস্য, সেই রাম মানব নহেন।

"রামরামেতি রামেতি রাম রাম মনোরমে।
সহস্রনাম তত্তুল্যং রামনাম বরাননে॥
রাম রামেতি যো নিত্যং জপন্তি মনুজা ভুবি।
তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন॥"

সাক্ষাৎ নারায়ণীস্বরূপিণী মা জানকীর যিনি পতি, ভক্তাধিক ভক্ত হনুমানের যিনি হৃদয়, গুহক "চণ্ডাল" হইয়াও যাঁহার অকৃত্রিম বন্ধুতাব্যঞ্জক আলিঙ্গনে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া পবিত্র, এবং অসাধারণ

ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতপ্রবর দশাননের যিনি শত্রু হইয়াও মৃত্যুকালে অকৃত্রিম সখা এবং সদ্গতির কারণ, তাঁহাকে কি মানব বলিতে ইচ্ছা হয়? মানব নহেন বলিয়া, অসংখ্য অমর হিন্দু বীরবৃন্দ ধর্ম্মযুদ্ধে "হর বম্ বম্ ববম্ বম্" অথবা "জয় রাম জয় জয় রাম" বলিয়া কর্ত্তিতকণ্ঠে তরবারী চালাইতে চালাইতে হাসিয়া হাসিয়া প্রাণ দিয়াছে। মানব নহেন বলিয়া বনের পক্ষী-কেও হিন্দু "রাম" নাম শিখাইয়া দগ্ধপ্রাণ শীতল করে। মানব নহেন বলিয়া, মৃত্যুর পরেও "হরে রাম হরে রাম" "রাম সচ হায় রাম সচ্ হায়" এই আধ্যাত্মিক ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর মৃতদেহ শ্মশান-ক্ষেত্রাভিমুখে বাহিত হয়। রাম নাম ছাড়িয়া হিন্দু কি বাঁচিতে পারে? সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম ভগবান। পদ্ম-পুরাণকার (উত্তর খণ্ড, ৭২) বলেন—

"রমন্তে যোগিনোনন্তে সত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরং ব্রহ্মাভিধীয়তে॥"

অতএব রঘুনন্দন রাম পরমাত্মা রূপে শ্রীশ্রীভগবান।

"রামায় রামভদ্রায় রামচন্দ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥"

(২য় প্রস্তাব)

ভাই! এবারে সাক্ষাৎ নারায়ণী লক্ষ্মী-স্বরূপিণী আদর্শ সতী সীতাদেবীর ঐশী মূর্ত্তির দিকে একবার নয়ন নিক্ষেপ কর। "সুন্দরইন্দীবরনীলম্" আদর্শ দেব ক্ষত্রিয়-বংশাবতংস শ্রীরামচন্দ্রের ইনি সহধর্ম্মিণী! আদর্শ পতির ইনি আদর্শ পত্নী! প্রাণাধিক প্রিয়তর ভর্ত্তায় ইনি দেহ, মন ও আত্মা সমাধিস্থ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন; সীতা ও শ্রীরাম, এই যুগলমূর্ত্তি একই উদ্দেশ্যে, একই জীবনে অনুপ্রাণিত।

"প্রাণৈস্তেপ্রাণান্ সন্দধামি অস্থিভিরস্থীনি।
মাংসৈ র্মাংসানি ত্বচা ত্বচম্॥"

স্বয়ং ভগবান যাঁহাকে প্রাণের প্রাণ স্বরূপিণী পত্নী রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াও, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যাঁহাকে রাজ্যলক্ষ্মী রূপে সঙ্গে রাখিয়া বনবাসের দুঃখ ভুলিতে পারিয়াছেন, ভক্তা-ধিক ভক্ত হনুমান যাঁহাকে "মা" বলিয়া প্রাণ শীতল করিয়াছেন, যোগীশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি জনক যাঁহার জনক হইয়া কৃতার্থম্মন্য অরবর্ণী অশোককাননেও যিনি অনাদি অব্যয় রামের ধ্যানে পরমানন্দিতা, সুধন্যা গোদাবরীর নির্ম্মল সলিলে কহ্লার-কমল অবলোকন করিয়া যে পতিপ্রাণা সাধ্বীসতী স্বীয় স্বামীর কমল লোচনভ্রমে উৎফুল্লা, সেই সতীশ্রেষ্ঠা মা জানকীর ঐ রূপের, ঐ মূর্ত্তির, ঐশ চরিত্রের বিষয় একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। এই রূপ মানবীয় রূপ নহে।

"পরমাসুন্দরী কন্যা যেন হেমলতা।
শিরালে হইল জন্ম নাম রাখে সীতা॥
লক্ষ্মীর রূপের কিবা কহিব তুলন।
যাঁর রূপে ভুলিলেন শ্রীরঘুনন্দন॥
যেই জন শুনে এই লক্ষ্মীর জনম।
ধনে পুত্রে লক্ষ্মী তারে দেন নারায়ণ॥"

এমন আদর্শসতী, এমন আদর্শ সহ-ধর্ম্মিণী, এমন আদর্শ মাতা, আর কখনও দেখিয়াছ কি? শ্রীরাম যেমন আদর্শ

পুরুষ, সতী সীতা তেমন আদর্শ রমণী! এই মূর্ত্তি মানবী মূর্ত্তি নহে; মা জানকী সাক্ষাৎ নারায়ণী লক্ষ্মীরূপে জগতে অবতীর্ণা। ভাগ্যবতী ভারতরমণীর সম্মুখে ইনি আদর্শ শিক্ষয়িত্রী।

আর ঐ যে কবিতাকল্পদ্রুমের অভ্রভেদী অত্যুচ্চ শাখায় আরোহণ করিয়া কবি-কোকিল বাল্মীকি মধুর রামচরিত্র কূজনে ঈশ্বর-বিরহী পাপীর কঠোর হৃদয়কে কোমল করিয়া তুলিতেছেন, মর্ত্ত্যধামে ত্রিদিবের অমৃতধারা ছড়াইয়া দিতেছেন, ঐ মধুর গীতিমালা যে মহাকাব্যে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহারই নাম রামায়ণ। ভক্তের চিত্তচকোরের সম্মুখে এই রসাল রামায়ণ যেন স্বর্গের প্রেম-সুধাকর। ভাষার মাধুর্য্যে, শব্দের লালিত্যে, প্রেম ও ভক্তির আবেশে, চরিত্রের মনোমোহন সমাবেশে, কবিতার উচ্ছ্বাসে, নৈসর্গিক শোভার বর্ণনায়, ঘটনাবলীর সুচারু চিত্রাঙ্কণে, যাহা লইয়াই বিচার কর, শ্রীরামায়ণ জগতের অদ্বিতীয় মহাকাব্য। নায়ক যাহার স্বয়ং ভগবান, সেই অতুলনীয় মহাকাব্য কি প্রত্যাদিষ্ট (Inspired) না হইয়া থাকিতে পারে? রামায়ণ কাব্য রামানুগৃহীত মহাপুরুষের অপূর্ব্ব ভক্তির অনন্ত উৎস, এই মহাকাব্যের নায়ক সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণ।

লোকাভিরামং রণরঙ্গধীরং
রাজীবনেত্রং রঘুবংশ-নাথম্।
কারুণ্যরূপং করুণাকরং ত্বাং
শ্রীরামচন্দ্রং শরণং প্রপদ্যে॥

ব্রহ্মচারীর বেশে, দস্যুতাব্যবসায়ী রত্নাকরকে শ্রীভগবান যে অপূর্ব্ব শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার চৈতন্যোদয় হয় এবং রাম নামের গুণে বাল্মীকির অমরত্ব ও জীবন্মুক্তি লাভ হয়। যে মধুর নামের গুণে অজ্ঞানী ও অধার্ম্মিক রত্নাকর, মহর্ষি ও মহাকবি বাল্মীকি রূপে পরিণত হন, কবিবর আজীবন কাল সেই গুণসিন্ধু রামচরিত্র ও পবিত্র রাম নাম গান করিতে করিতে কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। মহাকবি বাল্মীকি নিজেই বলিয়াছেন "যতদিন অনন্ত আকাশে দিবাকর ও নিশাকর বিদ্যমান থাকিবে ততদিন রামায়ণ কাব্য লুপ্ত হইবেনা।" এই ভবিষ্যদ্বাণী যে ব্রহ্ম-বাক্য তাহাতে আর সংশয় কি? অনন্ত আকাশ দ্রবীভূত হইয়া যাইতে পারে, মহাসাগর মরুভূমিতে পরিণত হইতে পারে, কিন্তু রামায়ণ বা রামচরিত্রের লোপ হওয়া কদাপি সম্ভবপর নহে। ভক্ত চাতকের চক্ষুর সম্মুখে শ্রীরামচন্দ্রের সুমধুর চরিত্র যেন নিদাঘের নবজলধর; ভক্তাধিক ভক্তের হৃদয়-অযোধ্যায় ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আজীবন রাজত্ব করিতে করিতে প্রেম-সরযূর জলে শ্রীচরণ প্রধৌত করুন, ভক্তের ইহাই কামনা, ইহাই প্রার্থনা। রামায়ণের মধুরতা মানবিক নহে, ইহা অনন্ত সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব আকর। ভক্তের প্রেমপিপাসা ভক্তের ভগবতাসক্তি যতই বাড়ে ততই বাড়াইবার ইচ্ছা হয়; এই জন্য বুঝি বাল্মীকির ঐশী লেখনী নিস্তব্ধ হইবার পরেও উত্তর রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, অদ্ভুত রামায়ণ, যোগবাশিষ্ট রামায়ণ, উত্তর রাম চরিত প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীরামচরিত্র গীত

হইয়াছে। ইংরাজি, লাটিন, ফরাসী, পর্টুগিজ, জর্ম্মণ, আরবা, পারস্ত, উর্দ্দু, হিন্দি, বাঙ্গালা, তৈলঙ্গী, তামিল, কানাড়ী, মালয়লী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি ভাষায় সংস্কৃত রামায়ণ অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে। ইংরাজিতে গদ্যে পদ্যে নানাভাবে রামায়ণের অনুবাদ ও সংস্করণ আছে। বাঙ্গলায় বহু প্রকারের রামায়ণ, রামায়ণানুবাদ এবং পাঁচালি, নাটক প্রভৃতি রূপে রামচরিত্র সুন্দর রূপে বিবৃত আছে। ইহা যত পুরাতন হয় ততই নূতন হয়। এই রসাল রামায়ণ এবং মধুর রামচরিত ভারতবর্ষের লোকের দেহ, মন ও আত্মার উপরে ত্রেতা যুগ হইতে অসাধারণ আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছে। ভারতের নর নারী রাম ও রামায়ণ দেখিয়া চরিত্র গঠন করিতে শিখিয়াছে। কোটি কোটি কণ্ঠে রাম নাম এখনও মধুর, কোটী কোটি মন্দিরে রামমূর্ত্তি এখনও অতি সুন্দর। রাম ও রামায়ণ না থাকিলে ভারতের লোক পশু হইয়া যাইত। রামায়ণরূপ দিনমণি অস্তমিত হইলে "ভারতে আসিবে আবার আঁধার রজনী।" হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র হইতে যদি রামচরিত্র ও কৃষ্ণচরিত্র অন্তর্হিত করা হয়, তাহা হইলে হিন্দুর তুল্য হতভাগ্য জীব এবং হিন্দুধর্ম্মের তুল্য অসার ধর্ম্ম পৃথিবীতে আর হইতে পারেনা। রামচরিত্র হিন্দুশাস্ত্রের মহা তেজ এবং রামায়ণ মহাকাব্য হিন্দুধর্ম্মপ্রাসাদের রক্ষণী স্তম্ভ স্বরূপ।

বাল্যাবস্থায় ভগবান রামচন্দ্র তাড়কা রাক্ষসী বধ করিয়া ন্যায়ের রাজ্য স্থাপন করেন। তাড়কাকে বধ করিয়া তিনি ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম রক্ষা, ভক্তের সাধন রক্ষা, দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন করেন। কিশোরে হরধনুভঙ্গ করিয়া ক্ষত্রিয় উপাধির সার্থকতা রক্ষা এবং শারিরীক উন্নতির সম্পূর্ণতা (Perfection) প্রদর্শন পূর্ব্বক ভূতলে অতুল দৃষ্টান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়েন। আমরা ইহাতে এই শিক্ষা প্রাপ্ত হইলাম যে, বাল্যকাল হইতেই ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন এবং শারিরীক উন্নতির সাধন করা প্রত্যেক মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। যৌবনে তিনি গুহকের সহ মিত্রতা পিতৃসত্য পালন, পত্নীপ্রেম, সাগর বন্ধন, রাবণবধ, অহল্যাউদ্ধার, বনের বানরকে বশ, সমরকুশলতা, বীরত্ব, শৌর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, চরিত্রবল, জ্ঞান, ধ্যান, সখ্যতা, অধ্যবসায়, অমিত পরিশ্রমপরায়ণতা প্রভৃতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তদন্তর অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া ভূতলে আদর্শ ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করেন। রঘুনন্দন শ্রীরামচন্দ্র যেমন রূপের সাগর, তেমনি গুণের আকর। তিনি অনন্ত গুণের গুণমণি, আদর্শ পুরুষের শিরোমণি। তাঁহার যে কোনও বয়সের যে কোনও লীলা লইয়া বিচার করি, তাঁহার নিষ্পাপ দেহ এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্র প্রতি পদে পদে অখণ্ড আনন্দের আকরকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া দেয়; রাম নামে পবিত্র প্রেমের উৎস উচ্ছসিত হইয়া উঠে। রামের তুল্য আদর্শ সখা, আদর্শ সহোদর, শিক্ষক, পিতা, পতি, পুত্র, গুরু, বীর, রাজা, জ্ঞানী এবং আদর্শ আধ্যাত্মিক

পুরুষ আর কোথায়? শারীরিক উন্নতির, মানসিক উন্নতির এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির ইনি চরম আদর্শ। এই সুন্দর মহান আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে ইহকালে ও পরকালে বিমল সুখ ও শাশ্বত শান্তিলাভ করা যায়। সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্র যাহার আদর্শ তাহার মানব জনম সার্থক।

সম্পূর্ণ জ্ঞানের বিজ্ঞানী হইয়াও, মানবলীলার অনুরোধে, জগতের মায়াময় জীবের কল্যাণার্থে, সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্র যোগীশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। বশিষ্ঠদেব উর্দ্ধবাহু হইয়া রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন——

"হে জনা অপরিজ্ঞাত আত্মাবো দুঃখসিদ্ধয়ে।
পরিজ্ঞাত ত্বনন্তায় সুখায়োপশমায়চ॥"
(যোগবাশিষ্ট।৫।২৩।)

এই জ্ঞানই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র "পূর্ণ জ্ঞানামৃত স্বরূপং" তিনি দেখাইয়াছেন কেবল শুষ্ক জ্ঞান মোক্ষের কারণ নহে; জ্ঞান ও ভক্তির একত্র সম্মিলন মানবের মোক্ষ সাধনের মূলমন্ত্র।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

নিরামিষ ভোজন সমর্থন।

ভারতীয় আর্য্য জাতির গভীর রহস্যময় অনুসন্ধানের লক্ষ্য শরীর রক্ষা। সমান্য দৃষ্টিতে জীবজগতের সর্ব্বত্র শরীর রক্ষার প্রবল প্রযত্ন পরিলক্ষিত হয়, বস্তুতঃ উহা প্রকৃতির পশ্চাদনুসরণ ব্যতীত অন্য কিছু নয়, সুতরাং স্বাভাবিক, কিন্তু এস্থানে আমরা ভারতীয় আর্য্যগণের শরীর রক্ষাই প্রধান লক্ষ্য, একথা উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রয়োগ করিতেছি। নিজের অস্তিত্ব হারাইতে, ধ্বংসের করাল দশনে সন্দষ্ট ও নিষ্পিষ্ট হইতে কেহই চাহেনা। যদি কেহ মোহবশে আপন মরণ আপনি আহ্বান করে, রক্ষিণী শক্তি তখন তাহার সেই অসঙ্গত উদ্যমের বিরুদ্ধে একটী বিপুল সংগ্রামের আয়োজন করে। রক্ষিণী শক্তি সর্ব্বদা জীব প্রকৃতিকে সুস্থ রাখিতে চেষ্টা করে, ইহাই সনাতন নিয়ম। আভ্যন্তরীণ অপচয় অজ্ঞাত ভাবে অবস্থিত থাকিলে, অনায়াসে বিনাশ সমাগত হয়, তাই রক্ষিণী শক্তি শত শঙ্খনাদে জানাইয়া দেয়। বাহ্য লক্ষণরূপে ঐ গুলিকে আমরা গ্রহণ করি এবং সমাধানে সযত্ন হই। সহজেই শরীর রক্ষা স্বাভিলষিত হইয়া দাঁড়ায়। প্রাচীন ভারতের আর্য্যমনীষীগণ শরীরের জন্য শরীর রক্ষা করিতেন না। স্বভাবের স্রোতে গা ভাসাইয়া শরীরের নশ্বরত্ব ক্ষণভঙ্গুরত্বের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়া তির্য্যগজাতির শরীর রক্ষার্থ প্রযত্ন গ্রহণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর উদ্দেশ্যে তাঁহারা শরীর রক্ষা করিতে বলেন নাই। শরীর নশ্বর মনে করিয়া, শরীরে মমতাশূন্য হইয়া ক্ষণস্থায়ী শরীরের দ্বারা একটী মহৎকার্য্য সিদ্ধ করিয়া লইবার জন্য তাঁহারা শরীরকে ভালবাসিতে বলেন। ইষ্ট পূজার উপহার ছাগশিশুর জন্য কোমল দুর্ব্বাদল চয়ন এবং ঐ ছাগশিশুর বহুবিধ শুশ্রূষা সংরক্ষণ যেমন, আর্য্য মহর্ষিগণের

মত ধর্ম্মার্থী শরীর রক্ষাও তদ্রূপ। মহাবাক্য মনে হয় "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।" ধর্ম্মের জন্য শরীর রক্ষা করিতে বলিয়াছেন আবার অধর্ম্মহেতু হইলে শরীর ত্যাগের আদেশ দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহারা যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্যের উপদেশ দিয়াছেন, সেই সমস্ত কার্য্যকলাপই প্রত্যক্ষতঃ বা পরোক্ষতঃ শরীর রক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু ধর্ম্মহীন জীবনকে তাঁহারা মরণ বলিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্মের জন্য তাঁহারা শরীরশোষক কঠোর তপশ্চর্য্যাদির উপবাসব্রতাদির বিধানে ক্লান্ত হন নাই, সুতরাং ধর্ম্মার্থে শরীরকে উপায় স্বরূপ মনে করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট হইতেন। যে আর্য্যশাস্ত্রের প্রতিপত্রে শরীর রক্ষার কথা আছে, সেই শাস্ত্রবশবর্ত্তী আর্য্যযোগী শরীর ত্যাগ করা কত সামান্য কার্য্য বলিয়া মনে করে, তাহা শারীরবলের সেবক মহাবীর আলেক্জাণ্ডার দেখিয়া গিয়াছিলেন। ধর্ম্মের জন্য শরীর রক্ষা করিতে হইলে, শরীর রক্ষার উপায় অনুষ্ঠানও পরম্পরায় ধর্ম্মার্থ। আহার শরীর রক্ষার প্রধান উপায়। আহার্য্য সামগ্রী ভুক্ত পরিপক্ক হইয়া রস রুধির প্রভৃতি আকারে ক্রমশঃ পরিণাম গ্রহণপূর্ব্বক শরীরের ক্ষীণাংশের পূরণ সম্পাদন করে। সবর্ল স্নায়ুযন্ত্র ও সংরক্ষক সংশোধক সংবর্দ্ধক যন্ত্র সমূহ পরস্পর যথাধিকার কার্য্য নিষ্পাদন করায় ইন্দ্রিয় শক্তি ও প্রাণশক্তি অব্যাহত থাকে, অনাবশ্যক বা অপক্ষীণ অংশ অপসারিণীশক্তি প্রভাবে বহিষ্কৃত হইতে থাকে।

এইরূপে সংগ্রহ সঞ্চার সম্বর্দ্ধন সম্পরিক্ষয় প্রণালীতে পুনঃ পুনঃ শরীর রক্ষা সম্পন্ন হয়। আর্য্য আয়ুর্বিজ্ঞান শাস্ত্রে শরীর যন্ত্র সমূহের সংরক্ষণ সংবর্দ্ধন বিষয়ে বহুতথ্য নিরূপিত হইয়াছে, এখানে তাহা আলোচনাই নহে, তবে সংক্ষেপে আহার দেহ রক্ষার উপায় এইমাত্র বলা হইল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানও শারীরযন্ত্র সর্ব্বদা ক্রিয়াশীল এ কথা বলেন, আর ঐ ক্রিয়া দ্বারা শরীর রক্ষিত হয় বলেন। ক্রিয়া হইলেই ক্ষয় নিশ্চিত, সুতরাং ক্ষীণের পূরণ অত্যাবশ্যক হয়, তজ্জন্যই আহারের দরকার, সুতরাং প্রকারন্তরে আহারের দ্বারাই শরীর রক্ষা হয়, ইহাও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অনুমোদন। একটী পাশ্চাত্যমনীষীর মত এখানে উদ্ধৃত করিয়া নিরস্ত হইব, বিস্তারিত আলোচনায় অবকাশ এ প্রবন্ধে নাই। ডাক্তার পার্কার (T. J. Parkar D Sc.) বলেন "Our bodies have done a certain amount of work, and have undergone a proportional amount of waste, just as a fire every time it blazes up consumes a certain weight of coal.

সংক্ষেপে বুঝিতেগেলে আহার কিজন্য? ক্ষুধার জন্য। ক্ষুধা কি? অভাবের আহ্বান শরীরপোষণকার্য্যে পরিশ্রান্ত যন্ত্র সমূহ সবলতা লাভ করিবার জন্য তাহাদের উপকরণ সামগ্রীর অভাব অনুভব করে। সেই অভাব আমাদিগকে যে উপায়বুঝাইয়া দেয়, যে সিংহনাদে আমরা জাগরিত হইয়া অভাব পূরণের জন্য ধাবমান হই, তাহারই নাম ক্ষুধা। ক্ষুৎপ্রতীঘাত আহারের উদ্দেশ্য, উহা পরম্পরায় শরীর রক্ষা সংসাধন করে। অস্মদ্দেশের প্রতিভাশীল মহর্ষি পতঞ্জলি

কেবল ক্ষুধানিবারণের জন্য আহারের ব্যবস্থা করেন নাই। ক্ষুৎপ্রতীঘাত বা শরীররক্ষাই শুধু আহারের উদ্দেশ্য নহে। শরীররক্ষার যাহা মূল উদ্দেশ্য ধর্ম্মরক্ষা, তাহাই আর্য্যমহর্ষিগণের আহারব্যবস্থার মূল লক্ষ্য। পতঞ্জলি মহাভাষ্যে বলিতেছেন "ভক্ষ্যংন নাম ক্ষুৎপ্রতীঘাতার্থমুপাদীয়তে, শক্যংচ অনেন শ্বমাংসাদিভিঃ অপি ক্ষুৎপ্রতিহন্তুং। তত্র নিয়মঃ ক্রিয়তে ইদং ভক্ষ্যমিদং অভক্ষ্যমিতি।" পাঠকমহোদয়গণ! সমাহিত হউন, দেখিবেন, পাশ্চাত্যদেশের শিক্ষাদীক্ষামহত্বের সহিত ভারতীয় শিক্ষাদীক্ষামহত্বের এইখানে পার্থক্য। এইটুকু ভারতের উৎকর্ষ বা গৌরব; এইটুকুতেই ভারতীয়শিক্ষা মনুষ্যত্ব বিকাশের সম্পূর্ণ উপযোগিনী, এবং এইখানেই তাহার সম্পূর্ণতার একটী প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। শরীররক্ষক খাদ্য সর্ব্বদেশে প্রশংসিত এবং শরীরের অনিষ্টকারী খাদ্য সর্ব্বদেশেই নিন্দিত, কিন্তু ভারতে একটু নূতনত্ব আছে। এই নূতনত্বটুকু ভারতের পুরাতন শ্রেষ্ঠত্বের নামান্তর। শরীররক্ষক সর্ব্ববিধ খাদ্য ভারতে প্রশংসিত নহে, তাহার কতকগুলি অভক্ষ্যের তালিকায় পড়িয়া গিয়াছে। বরাহমাংস খাদ্য শরীররক্ষক, কিন্তু ভারতীয় আর্য্যগণ সর্ব্ববিধ বরাহমাংসের শরীররক্ষকতাগুণ গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কেননা কোন কোনও বরাহমাংস তাঁহাদের বিবেচনায় অভক্ষ্য। অভক্ষ্য কথাটীর রহস্য পরে বিবেচিত হইতেছে। অভক্ষ্য বস্তর দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করা কর্ত্তব্য নহে, তাই পতঞ্জলি বলিয়াছেন—ক্ষুধানিবৃত্তিই আহারের উদ্দেশ্য নয়, অভক্ষ্য কুক্কুরমাংসেও ক্ষুধানিবৃত্তি হইতে পারে। অভ্যাসবশে মনুষ্য, পশ্বাদির আহার্য্য গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু তাদৃশ জীবনের আবশ্যকতা আর্য্য মহর্ষিগণ উপলব্ধি করেন নাই। পাশ্চাত্যপ্রদেশের বহির্দৃষ্টিসম্পন্ন জড়জগৎ লইয়া ব্যতিব্যস্ত মহাত্মগণ শরীররক্ষা হইলেই নিশ্চিন্ত হইলেন; অন্তর্দৃষ্টিশীল ভারতীয় মহর্ষিগণ জীবনের মূল লক্ষ্য স্থির না থাকিলে, বৃথা জীবন ধারণ শ্লাঘ্য মনে করেন না, কাজেই ধর্ম্মগ্লানিকারক অভক্ষ্য বলকারক খাদ্য গ্রহণেও নিষেধ করিয়াছেন। ইউরোপীয় সমাজের বহির্ম্মুখতা এবং প্রাচীন ভারতীয় সমাজের অন্তর্দৃষ্টিই উভয় সমাজের আদর্শগত সূক্ষ্মরহস্য, এই টুকু আমরা যখন বিস্মৃত হই, তখনই গোলযোগ বাধাইয়া বসি। এখন আমরা দেখিব কিরূপ আহারে শরীররক্ষা হয়। শারীরবিজ্ঞানের প্রণালীতে বলিতে গেলে বলিতে হয়, যাহা আমাদের শরীরের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ তাহার পরিপূরণ জন্যই আহার গ্রহণ, ঐ ক্ষয় কিরূপ পরিমাণে সংঘটিত হয়, তাহাই আলোচনা করা আবশ্যক। যে অংশ যে পরিমাণে ক্ষয়িত হয়, তৎপরিমাণে তাহার পূরণ করা সঙ্গত। একের স্থানে অন্যকে নিযুক্ত করিলে, শারীরযন্ত্রের ক্রিয়া অব্যাহত থাকিবেনা। জলের আসনে ভক্ষ্যদ্রব্যকে বসাইলে, অস্বাভাবিকভাবে শরীর রুগ্নতার দিকে আকৃষ্ট হইবে। খাদ্যের অভাব বোধ হইলে পানীয় গ্রহণ করা, আর জলোদররোগকে আহ্বান করা একরূপ কথা। সমতা রক্ষা কেবল যে সংখ্যাগত

তাহা নহে, পরিমাণগতও বটে। পাশ্চাত্য-পণ্ডিতেরা বলেন—ক্ষয়িত অংশের পরিমাণ আমরা মল, মূত্র ও স্বেদ দ্বারা অবগত হইতে পারি। মল মূত্রাদি হইতে প্রকৃতপক্ষে শরীরের ক্ষয়িত অংশের পরিমাণ হইতে পারেনা, ইহা আমরা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু এ প্রবন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াই আমরা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মুখীন হইব। প্রথমে কয়েকটী কথা—আচার ব্যবহার, পরিশ্রম, চরিত্র, পিতৃমাতৃশক্তি, সুস্থতা সবলতা, বয়স, দেশীয় জলবায়ুর প্রকৃতি, শীতাতপের ন্যূনতা বা আধিক্য, মানসিকভাব বিপর্য্যয় ইত্যাদি কারণে, শারীরিক ক্ষয় বৃদ্ধি বা পুরণের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে, সুতরাং আমরা মোটামুটী হিসাব লইয়া এখানে নির্ণয় করিতেছি। ইউরোপের তত্বজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী বলেন, ইউরোপের মধ্যমাকার পরিশ্রমী একজন পুরুষের দেহ হইতে দৈনিক ৩০০গ্রেণ যবক্ষারজান ও ৪৬০০ গ্রেণ অঙ্গার বহির্গত হয়, ঐ পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। এদেশের লোকের শক্তি, শ্রম ও অবস্থার অনুপাতে, একজন মধ্যমাকার পরিশ্রমী ও বলিষ্ঠ এদেশবাসীর দেহ হইতে প্রতিদিবস ২২০গ্রেণ যবক্ষারজান এবং ৩৫০০গ্রেণ অঙ্গার বহিষ্কৃত হয়, এরূপ মত একজন ভারতীয় ডাক্তার প্রকাশ করেন। আমরা ডাক্তার সাহেবের কথায় দ্বিরুক্তি করিতে সাহসী নহি, তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, শীতপ্রধান তুষারদেশে তাপোৎপাদক বা প্রবর্ত্তক যবক্ষারজানময় খাদ্য যে শরীরে যে ভাবে বা যে পরিমাণে গৃহীত হওয়া উচিত, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ঐরূপ খাদ্য সে শরীরে সে ভাবে সে পরিমাণে গৃহীত হইলে শারীরযন্ত্র নিরাপদে থাকে না। কেবল শ্রম ও দৈহিক উন্নতি বা বলাবলের অনুপাতে ডাক্তার সাহেব মত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। হিমপ্রধান স্থানে যবক্ষারজান ও অঙ্গারের ব্যবহারিক অনুপাত যত, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তাহা হইতে পারেনা। দুঃখের বিষয় এই যে, আমরা ইউরোপীয়শরীরে ইউরোপে পরীক্ষিত অনুপাতে গ্রহণ না করিলে, পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষা হইতে পারেনা, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া বসিয়া আছি। অনুসন্ধিৎসুবর্গ একবার পরীক্ষা করিবেন ইহাই অনুরোধ। আমার বিবেচনায় যবক্ষারজানের মাত্রা পূর্ব্বোক্তহিসাবে বেশী হইয়াছে। মোটের উপর এদেশে তাপোৎপাদক অপেক্ষা বাহ্যতাপের সমতাকারক খাদ্যই অধিক আবশ্যক মনে করি। এতক্ষণে আমরা দেখিলাম—এদেশে মধ্যমাকার বলবান্ শ্রমী লোক ২২০গ্রেণ যবক্ষারজান এবং ৩৫০০গ্রেণ অঙ্গার খাইয়া জীবিত থাকিবে। এই যবক্ষারজান বা অঙ্গার সর্ব্ববিধ খাদ্যদ্রব্যেই অল্লাধিক পরিমাণে আছে। উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণিজ এই উভয়বিধ খাদ্যের মধ্যে প্রাণিজ খাদ্যে যবক্ষারের পরিমাণ অধিক, এবং উদ্ভিজ্জ খাদ্যে অঙ্গার অধিক। যবক্ষারজানময় খাদ্য অপেক্ষা অঙ্গারময় খাদ্য অনেক অধিকগুণ আবশ্যক, সুতরাং প্রাণিজ খাদ্য অপেক্ষা উদ্ভিজ্জ খাদ্য অধিকগুণ দরকার। পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত মতে এই হিসাব দেখান যাইতেছে,

ইহা পাঠকের মনে রাখা উচিত। উদ্ভিজ্জ খাদ্য হইতে যবক্ষারজান সংগ্রহ করা যাইতে পারে, কিন্তু পরিমাণের অল্পতাবশতঃ অনেক খাদ্য গ্রহণ কর্ত্তব্য হইয়া পড়ে। এরূপাবস্থায় জীবজ এবং উদ্ভিজ্জ এতদুভয়ের কোন্ খাদ্য গ্রাহ্য, তাহা নিরূপণ করা আবশ্যক হয়। প্রথমে শরীররক্ষকখাদ্য-বিষয়ে পাশ্চাত্য মতের একটু আভাস দেওয়া হউক্। সূক্ষ্মদর্শী ডাক্তার Halliburton বলেন, মনুষ্যদেহের রক্ষার্থে—Proteids, Fats, Carbohydrates এবং জল ও লবণ এই পঞ্চবিধ পদার্থাত্মক আহার চাই। ইহার মধ্যে Proteids দেহ রক্ষার্থ অত্যাবশ্যকীয়। এই Proteids এক শ্রেণীর মিশ্র উপাদান। একজন ইউ-রোপীয় পণ্ডিত বলেন—Proteids are highly complex compounds of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulphur, * * * ইঁহার আলোচনায় আমরা আমাদের অভিপ্রেত যবক্ষার ও অঙ্গার উভয়ই পাইতেছি। অন্য পদার্থ আমাদের প্রবন্ধের আলোচনীয় নহে, কেবল অঙ্গার ও যবক্ষারই আলোচ্য। এই যবক্ষারজান প্রাণিজখাদ্য হইতে গৃহীত হওয়া আবশ্যক, জৈবখাদ্য শরীর-রক্ষার উৎকৃষ্ট উপায়, এইরূপ অনেকের মত। এ প্রসঙ্গে বিচার করিবার আগে একটী কথা বলা দরকার। উদ্ভিজ্জ খাদ্য এবং প্রাণিজ খাদ্য এই ভাবের কথাটী আমাদের দেশে নূতন। নিরামিষভোজী এবং উদ্ভিজ্জভোজী এক কথা নহে। মৎস্য মাংস ভোজনে অনেক স্থানে অসম্মতি থাকিলেও, নিরামিষভোজীকে সর্ব্ববিধ জৈব-খাদ্য ত্যাগ করিতে বলা হয় নাই। কোনও ব্রতী বা ব্রহ্মচারীকে ঘৃত, দুগ্ধ, নবনীত ইত্যাদি প্রাণিজ খাদ্য গ্রহণে নিষেধ করা হয় নাই। "অমাসমমাংসং বহুসর্পিষ্কং ব্রত-য়তি।" ইত্যাদি শত শত বিধানে মাংস-ত্যাগের সঙ্গে ঘৃত দুগ্ধ ত্যাগ কথিত হয় নাই, দেখাইতে পারি। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা তাহা অবগত আছেন। বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত সমাজের অনেক মহাত্মা সংস্কৃত প্রমাণ উদ্ধৃত করিলে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, আমি তাঁহাদের সম্মুখে এ প্রবন্ধে সংস্কৃতবচন তুলিয়া নিরামিষ সমর্থন করিবনা।

এক কথায় অঙ্গার খাদ্য উদ্ভিজ্জ হইতে লইয়া, ঘৃত দুগ্ধাদি জৈব খাদ্য হইতে যবক্ষার লইলে, নিরামিষের ব্যাঘাত নাই, মৎস্য মাংসেরও সংগ্রহ নাই। আমি হিন্দুশাস্ত্রের দোহাই দিতেছিনা, পার্ক, পেভি, প্লেফেয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে জৈব ও উদ্ভিজ্জ খাদ্যের সম্মিশ্রণে দেহরক্ষা করিবার কথা প্রতিপদে স্বীকার করিতেছি। প্রাণিজ খাদ্য মধ্যে মাংসের অভাব দুগ্ধের দ্বারা পূরণ করিতে বলিতেছি। একথার গূঢ় রহস্য পরে প্রকাশ করিতেছি। যদি কেহ মনে করেন, দুগ্ধাদি প্রাণিজ খাদ্য গ্রহণ করিলেও নিরামিষ আহার করা হইল না, আমি তাঁহার মত আর্য্যশাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করি। যদি কোনও স্থানে খাদ্য সংগ্রহের জন্য প্রাণি হিংসা অবৈধ বলা হইয়া থাকে, আর তদনুসারে যদি কেহ দুগ্ধকে ত্যাগ করিয়া বৎসের

প্রতি কৃপা প্রকাশ করিতে চাহেন, তাঁহার সাধু উদ্দেশ্যে আমি বাধা দিতে চাহিনা, কিন্তু তিনি মনে রাখিবেন, তাঁহার জীবন বা জীবিকা অপর জীবনের অপেক্ষা করে। সাংখ্যাচার্য্যেরা এককালে যজ্ঞাদি কার্য্যের দোষকীর্ত্তন করিতে গিয়া, পশুবধ এবং ব্রীহিযবাদি বীজনাশ এক তুলাদণ্ডে উঠাইয়া ছিলেন। দুগ্ধপানে প্রাণিহিংসা যেমন, খাদ্যবিনাশে তাহা অপেক্ষা বড় বেশী পার্থক্য নাই। উদ্ভিজ্জভোজী এবং প্রাণিজ-খাদ্যভক্ষক এই উভয়বিধ জীব জগতে বিরাজমান। আমরা উদ্ভিজ্জ ভোজনের সমর্থন করি। কেবল উদ্ভিজ্জ বা কেবল প্রাণিজ খাদ্য খাইলে জীবন রক্ষা হয়, কিন্তু উভয়ত্রই শঙ্কা আছে। যে দেশে যাহা অধিক পাওয়া যায়, সে দেশের প্রকৃতি তাহাকেই খাদ্য রূপে গ্রহণ করে। আইস্ল্যাণ্ড নিবাসীরা প্রায়শঃ মৎস্যমাংসভোজী, অন্য খাদ্য দুর্ল্লভ। নিউবিয়া ও আবিসিনীয়ার লোকে সর্ব্বদাই মৎস্য মাংস খায়, উদ্ভিদ্ দুষ্প্রাপ্য। সাইবিরীয়ার দশাও ঐরূপ। ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জর্ম্মনী ইত্যাদি স্থানে উভয়বিধ খাদ্য পাওয়া যায় এবং ব্যবহৃত হয়। মেক্সিকো প্রদেশের লোক প্রায় নিরামিষভোজী, মধ্যে মধ্যে মাংস আহার করে। জগতের ইতিহাসে দেখা যায়—মনুষ্যগণ উভয়ভোজী, জান্তব এবং উদ্ভিজ্জ খাদ্য সকলেই অল্প বা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে। যাহারা অধিক উদ্ভিজ্জ খায়, তাহাদিগকে আমরা উদ্ভিজ্জ-ভোজী, এবং যাহারা অধিক জৈবখাদ্য খায় তাহাদিগকে এ প্রবন্ধে জান্তবখাদ্যভোজী বলিয়া নির্দ্দেশ করিব। এখন দেখিব উদ্ভিজ্জ এবং প্রাণিজ খাদ্য মধ্যে মাংস ও দুগ্ধ ইহার কোন্ খাদ্য মানুষের স্বাভাবিক। একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত বলেন, ফলই মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য। আমরা তাঁহার কথা স্বীকার করি। ফলাহারে মনুষ্য দীর্ঘজীবন লাভ করে। আমাদের আর্য্যশাস্ত্র একথার অনুমোদন করেন, কিন্তু ফলই একমাত্র খাদ্য হওয়া অসম্ভব। পাশ্চাত্য পণ্ডিত ওয়ালার (A. D. waller) বলেন মনুষ্য উভয়ভোজী। উভয় খাদ্য গ্রহণই মানবের স্বাভাবিক, কিন্তু মাংস ভোজন মানবের অপরিহার্য্য। মানবের অন্ত্র মধ্যমাবয়ব, উহা উভয়ভোজন সমর্থন করে। মাংসভোজীর অন্ত্র ক্ষুদ্র, উদ্ভিদ্‌ভোজীর বৃহৎ, মানবের না ক্ষুদ্র না বৃহৎ।

তিনি আরও বলেন, দন্ত দ্বারাও মনুষ্য উভয়ভোজী অনুমিত হয়। মানুষের ৪টী Canines বা মাংস ভোজনোপযোগী দন্ত আছে, সুতরাং মাংসভোজন স্বাভাবিক। ওয়ালারের এইমত ইউরোপে সর্ব্ববাদীসম্মত রূপে গ্রাহ্য হয় নাই, সুতরাং ইহা বলিতে চাহিনা। মাংসভোজীজীবে ঐ চারিটী দন্তের মত দন্ত দৃষ্ট হয় বলিয়াই, উহা মাংস ভোজনোপযোগী বিশ্বাস করিতে পারি না। উহা Incisors জাতীয় দন্তেরই অবান্তর ভেদ মাত্র। অনেক মাংসভোজী জীব আছে, যাহাদের ঐরূপ দন্ত নাই। ওয়ালারের মতে তদ্দেশস্থ মাংসভুক্‌দিগের যখন আপত্তি আছে, তখন আমাদের উপেক্ষা করাই ভাল। কেবল যে মাংস ভোজন মানবের স্বভাব, ইহার প্রমাণ নাই,

কিন্তু ফলশস্য মানবের স্বভাবজাত ভগবৎ-প্রদত্ত খাদ্য ইহার অশেষ প্রমাণ আছে। প্রকৃতি মানুষের জন্য পক্কফল ভাণ্ডারে রাখিয়াছে, মাতৃস্তন্য সদ্যোজাতশিশুর জন্য জোগাড় করিয়াছে, কিন্তু প্রাকৃতপ্রসাদ-রূপে মাংস* কোথাও উপস্থিত নাই। মাংসভোজী জীব মাংস ত্যাগ করিয়া জীবিত থাকে, তবে আপাততঃ অভ্যাসভঙ্গে দুর্ব্বল হয়, কিন্তু সে মাংস ত্যাগের পর আপন ইচ্ছায় উদ্ভিজ্জ খাইয়া জীবিত থাকিতে পারে; আর উদ্ভিজ্জভোজী জীব উদ্ভিজ্জ ত্যাগ করিয়া, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাংসভক্ষণ করিতে পারেনা। শিক্ষায় বা বলেও তাহার দ্বারা ঐ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। যে সমস্ত জীবের মাংস গ্রহণ করিতে হয়, তাহারা প্রায় সকলেই উদ্ভিদ্ খায়। উদ্ভিদ্ ভোজন যে স্বাভাবিক, তাহার সন্দেহ নাই। দুগ্ধই জৈবখাদ্যের মধ্যে স্বাভাবিক ভোজন। একমাত্র দুগ্ধে জীবন রক্ষার সমস্ত উপাদান আছে। স্তন্যদুগ্ধ পরীক্ষা করিয়া প্রাউট্ সাহেব এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। সদ্যোজাত শিশু যাহা দ্বারা জীবিত থাকিতে পারে, সেই খাদ্যে যদি সকল অবস্থার মানবই জীবন ধারণ করিতে পারে, তবে সেই খাদ্য স্বাভাবিক, না দন্তোদ্গমের পূর্ব্বে যে খাদ্য খাওয়া যায়না এবং দন্ত পতিত হইলে যাহা খাওয়া অসম্ভব, সেই খাদ্য স্বাভাবিক? আমরা বলিতে চাহি মানব উভয়ভোজী জীব, কিন্তু জৈব খাদ্য মধ্যে দুগ্ধই স্বাভাবিক, মাংস কখনই নহে। ডাক্তার পার্কস্ তাঁহার Manual of Hygiene নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

The chemical composition of animal and vegetable albuminates is very similar and they manifestly serve equal purposes in the body. The meateater and the man who lives on corn* or peas and rice are equally well nourished. But it has been supposed that Either the kind or the rapidity of nutrition is different and that the men who feed on meat or the carnivorous animal will be more active and more able to exert a sudden violent effort than the vegetarian or the herbivorous animal whose food has an equal potential energy but which is supposed to be less easily evolved. The evidance in favour of this view seems to me to be very imperfect. And the evidence in men is the same.—In India, the illfed people on rice and a little millet or pea may indeed show less power but take the wellfed rice and peaeater and he will show when in training no inferiority to meat-eaters. এরূপ অনেক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে কিন্তু অনাবশ্যক। অস্মদ্দেশে যে সকল মাংসাশী ব্যক্তি মাংসাভাবে ভারতের বলবীর্য্য গেল বলিয়া চীৎকার করিতেছেন, তাঁহারা কি E. A Parkes M, D. মহোদয়ের এই উক্তি টুকু পাঠ করিতে অবসর পাইয়াছেন? মাংসভোজীর নিকট ভাতডা'লভক্ষক ভারতবাসী পরাজিত হইবেনা, ইহা শুনিয়াও কি হাইতন্দ

খাওয়ার আবশ্যকতা বোধ থাকে? মৎস্য মাংসভক্ষণে শারীরিক বলবৃদ্ধি হয়, একথা কি কেহও আটাডা'লভোজী ভারত-বাসীকে দেখিয়া বলিতে পারেন? কেহ কেহ ভেতো বাঙ্গালীর উপর বলের কটাক্ষ করেন, তাঁহাদিগের কথায় প্রতাপ রায়, মনোহর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি গত শতাব্দীর বাঙ্গালী বীরের নাম মাত্রোল্লেখ করিয়াই উত্তর দিতে চাহি। এখনও এই বঙ্গে এমন বহুসংখ্যক ব্যক্তি জীবিত আছে, যাহারা মাত্র খেসারি মুসুরির ডা'ল, এবং মোটা চাউলের অন্ন ও কিঞ্চিৎ সবজী গ্রহণ করিয়া, এবং বৎসরে গড়ে ৪।৫ সের মাত্র চুনা পুটী মাছের ঝোল্ খাইয়া জীবন ধারণ করে, কিন্তু বলাবল নির্ণয়ে, সের ভোর আটা, পোয়া ভোর ঘেউ, আর সের ভোর অরহর্‌কা ডাউরের আসামী পশ্চিমা ভায়াকে দুর্ব্বল বালকের মত পরাস্ত করিতে পারে। অধঃ-পতনের একটা পরিস্ফুট লক্ষণ দেশের লোকে নিজেদের এবং দেশের নিন্দা করিতে থাকে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সক-লকেই আমি এই বিষয় একটু চিন্তা করিতে বলি, পক্ষান্তরে আত্মগরিমা প্রকা-শেও নিষেধ করি। আর একটা কথা, মাংসভোজনে নিরাপদে থাকা যায় এবং ডা'ল ইত্যাদি খাইলে নানা পীড়া উপস্থিত হয় এরূপ অনেকের মত। একজন ডাক্তার বলিয়াছেন, খেসারীর ডা'ল পক্ষাঘাত রোগের একমাত্র কারণ। আমি তাঁহা-দিগকে জিজ্ঞাসা করি, আইস্‌ল্যাণ্ডের অনেক লোকে যে স্কার্ভি নামক রোগে আক্রান্ত হয়, তাহার কারণ কি মাংস না উদ্ভিদ্? খেসারীর ডাল খাইয়া পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় ৪০০০০০০ চল্লিশলক্ষ লোক জীবিত থাকে। ঐ ডাল তাহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য, সেখানে শতকরা কত লোকের পক্ষাঘাত দেখা যায়? ঐ ডাল যাহারা ব্যবহার করেনা, তাহাদের পক্ষাঘাত হয় কিজন্য? অনেক ডাক্তার বলেন, দুগ্ধ বা উদ্ভিজ্জ খাদ্য নির্দ্দোষভাবে সর্ব্বদা পাওয়া যায়না। নির্দ্দোষ দুগ্ধ অপেক্ষা নির্দ্দোষ মাংস সহজে পাওয়া যায়। ইঁহাদিগের কথায় উত্তর দিবার পূর্ব্বে ইঁহাদিগের অন-ভিজ্ঞতার জন্য আপনি বিস্মিত হইতে হয়।

যে দেশের লোক দুটী শাক বা ঘাস সংগ্রহ করিয়া খাইতে পারেনা, নিজের শ্রমে উপা-র্জ্জিত দুটী কলাই ঘরে রাখিয়া খাইতে পারেনা, নিজের কর্ষণলব্ধ ধান্য বিদেশে পাঠাইয়া দিয়া, উদরের জন্য বৃক্ষপত্র সিদ্ধ করিয়া খাইতে বাধ্য হয়, তাহাদের গৃহপালিত গাভীর দুগ্ধ অপেক্ষাও শুদ্ধ বা নির্দ্দোষ মাংস সুলভ ইহাই দুঃখকর। অভাবেই দুষ্ট খাদ্য গ্রহণ করে, সদ্ভাবে বা স্বেচ্ছায় নহে। মাংস না খাইয়া কেবল দেড়পোয়া চাউল ও ডা'ল্ খিচুড়ী করিয়া ভক্ষণ করিলে, তাহাতে ২২০গ্রেণের অধিক যবক্ষারজান এবং ৪০০০গ্রেণেরও বেশী অঙ্গার দেহে প্রবিষ্ট হয়, ইহা পাশ্চাত্য দেশের অনুমোদিত। দুই সের দুগ্ধ, এক পোয়া তণ্ডুলের অন্ন, এবং ১ছটাক চিনি আহার করিলেও প্রায় ঐরূপ যবক্ষারজান ও অঙ্গারের আগম হয়। এই সকল হিসাবে শরীররক্ষা বা বলোৎকর্ষের জন্য মাংস ভক্ষণের আবশ্যকতা দেখা যায় না, পাশ্চাত্য মতে ইহা প্রতিপাদিত হইল। মাংস ভোজন ত্যাগ করিয়া না কি হার্ব্বার্ট

স্পেন্সার মহোদয় দুর্ব্বল হইয়াছিলেন। ইহা সত্য এবং সম্ভব বটে। পুরুষপরম্পরাগত শুক্রশোণিতশক্তি এবং আজীবনের অভ্যাস সহসা পরিবর্ত্তিত হইলে, দুর্ব্বলতা কেন, ভীষণ পীড়ার সম্ভাবনা। দ্বাদশবর্ষ ব্যাপি নিরামিষ ভোজনের পর মৎস্য মাংস ব্যবহার করিয়া, আমি সম্বৎসরকাল কঠিন রূপে পীড়িত ছিলাম। নিরামিষ ভোজনের ১২বৎসর ৭মাসের অভিজ্ঞতায় বুঝিয়াছি, নিরামিষভোজনে বলবুদ্ধির হানি হয় না। মানসিক শ্রমের জন্য মাথা সবল রাখিতে, মৎস্য মাংস হইতে ফস্ফরাস্ গ্রহণের দরকার নাই। ঘৃতের দ্বারা মস্তিষ্ক সবল থাকে। পাশ্চাত্য মতে ঘৃত অঙ্গার পদার্থ হউক্ দুঃখ নাই। শাস্ত্র হইতে ঘৃতের স্মৃতিমেধাবৃদ্ধিকারিতার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এ প্রবন্ধে ইহার আবশ্যকতা নাই। নিরামিষভোজনে সাত্ত্বিকগুণ উদ্রিক্ত হয়। মাংসের স্থানে এই জন্য দুগ্ধকে বসাইতে চাই। সত্বপক্ষপাতে মানব ধার্ম্মিক হইবে কি না ভগবান্ জানেন, কিন্তু উন্নত নৈতিক পুরুষ হইবে ইহা নিশ্চিত। জগতের লোককে ধর্ম্মাচার্য্য হইতে বলি না, শিষ্ট, শান্ত, সংযত হইতে বলি এবং উদ্ধত অবিমৃশ্যকারী হইতে নিষেধ করি, কাজেই নিরামিষভোজন সমর্থন করি। এই সকল বিষয়ে এ প্রবন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের অনুমতির আলোচনা করিব না, সংক্ষেপে বলি, যাহা অভক্ষ্য, তাহা শরীররক্ষক হইলেও পরিত্যাজ্য, যেহেতু অভক্ষ্য অর্থ আধ্যাত্মিকশক্তির সংমূর্চ্ছক ভক্ষ্য। অন্য প্রবন্ধে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের শাস্ত্রসম্মতবিচার প্রকাশ করিব। এখানে বলি, আরণ্য ও গৃহপালিত জন্তুর মাংসে পার্থক্য, সমুদ্র ও পুষ্করিণীর মৎস্যের গুণগত ভেদ, ও শ্বেতবরাহ, আরণ্য বরাহ ও পালিত বরাহের মধ্যে কোনও একটু সূক্ষ্ম পৃথগ্ভাব বুঝিয়া, যাঁহারা খাদ্যাখাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাঁহারা মৎস্য মাংসকে রাজস আহার বলিয়া গিয়াছেন। সত্বপক্ষপাতী ব্যক্তিকে উহা গ্রহণ করিতেও নিষেধ করিয়াছেন। সম্প্রতি আমি পাশ্চাত্য প্রদেশের মুকুটমণি স্বরূপ জর্ম্মান দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লুইস্ কুন্ নিরামিষাহারের যে প্রশংসা করিয়াছেন, তাহাই অংশতঃ উদ্ধৃত করিয়া এ প্রবন্ধ সমাপন করিব। এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণ দ্বারা স্বতন্ত্র প্রবন্ধাকারে প্রকাশের বাসনা রহিল।

"The new science of Healing" নামক পুস্তকে Louis Kuhne বলিতেছেন, "...... in a number of families children have been reared from the begining without meat, and I have always made a special point of watching the development of such. I can confidently assert, that the trials have resulted decidedly in favour of a vegetarian diet. The childrens, development is almost without exception admirable both physsically and mentally and mentally in all three directions—that of the understanding, the will, and the temper."

শ্রীকেদারনাথভারতী সাংখ্যতীর্থ।

যশোহর বেদবিদ্যালয়।

ভগবদ্গীতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥১৩॥

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতিস্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪॥

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥১৫॥

অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥১৬॥

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নোবিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥১৭

দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮॥

সঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোব্যনুনাদয়ন্ ॥১৯॥

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥
হৃষীকেশং তদাবাক্য মিদমাহ মহীপতে॥২০

অন্বয়—প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (ভীষ্মঃ) তস্য হর্ষং সংজনয়ন্ উচ্চৈঃ (মহান্তং) সিংহনাদং বিনদ্য (কৃত্বা) শংখং দধ্মৌ (বাদিতবান্) ॥১২॥

বঙ্গানুবাদ—প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ (ভীষ্ম) তাঁহার (দুর্য্যোধনের) আনন্দ জন্মাইয়া উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া শংখ বাজাইলেন ॥১২॥

অন্বয়—ততঃশঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ চ পণবানকগোমুখাঃ সহসা (তৎক্ষণাৎ) এব অভ্যহন্যন্ত (বাদিতাঃ) স শব্দঃ তুমুলঃ (মহান্) অভবৎ ॥১৩॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর শঙ্খ, ভেরী, পণব, (মাদল) আনক, (পটহ) গোমুখ, (শৃঙ্গ প্রভৃতি) সকল সহসা বাদিত হইল, সে শব্দ তুমুল হইয়া উঠিল ॥১৩॥

অন্বয়—তত শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ (ঘোটকৈঃ) যুক্তে মহতি স্যন্দনে (রথে) স্থিতৌ মাধবঃ পাণ্ডবশ্চ এব দিব্যৌ শংখৌ প্রদধ্মতুঃ (বাদয়ামাসতুঃ) ॥১৪॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত মহারথে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জ্জুন দিব্য দুইটী শঙ্খ বাজাইলেন ॥১৪॥

অন্বয়—হৃষীকেশঃ পাঞ্চজন্যং ধনঞ্জয়ঃ দেবদত্তং, ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ মহাশংখং পৌণ্ড্রং, কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং দধ্মৌ, নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ (দধ্মতুঃ), পরমেষ্বাসঃ (মহাধনুর্দ্ধরঃ) কাশ্যশ্চ, মহারথঃ শিখণ্ডী চ, ধৃষ্টদ্যুম্নঃ, বিরাটশ্চ, অপরাজিতঃ সাত্যকিশ্চ, দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াশ্চ মহাবাহুঃ সৌভদ্রশ্চ হে পৃথিবী-পতে, সর্ব্বশঃ (সর্ব্বে এব) পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ ॥১৫॥১৬॥১৭॥১৮॥

বঙ্গানুবাদ—শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্ত শঙ্খ এবং ভীমকর্ম্মা বৃকোদর পৌণ্ড্র নামক মহা শঙ্খ বাজাইলেন,

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজাইলেন, আর মহাধনুর্দ্ধর কাশিরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট, অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীপুত্রগণ ও মহাবাহু সুভদ্রাতনয়,—হে পৃথিবীপতে, ইঁহারা সকলে পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন।১৫॥১৬॥১৭॥১৮॥

নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব ব্যনুনাদয়ন্ তুমুলঃ সঃ ঘোষঃ (শঙ্খনাদঃ) ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ॥১৯॥

বঙ্গানুবাদ—আকাশ এবং পৃথিবীকে বিশেষরূপে ধ্বনিত করিয়া, সেই তুমুল শব্দ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিল ॥১৯॥

অন্বয়—হে মহীপতে, অথ শস্ত্রসংপাতে প্রবৃত্তে [সতি] কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুনঃ) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ব্যবস্থিতান্ (যুদ্ধোদ্যোগেন স্থিতান্) দৃষ্ট্বা ধনুঃ উদ্যম্য (উত্তোল্য) তদা হৃষীকেশম্ ইদং বাক্যম্ আহ ॥২০॥

বঙ্গানুবাদ—হে রাজন্, শস্ত্রসম্পাত প্রবৃত্ত হইলে, কপিধ্বজ অর্জ্জুন তখন ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে যুদ্ধোদ্যোগে ব্যবস্থিত দেখিয়া ধনুঃ উত্তোলন পুরঃসর শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন ॥২০॥

উপরোক্ত শ্লোক কয়েকটীর কোন টীকার প্রয়োজন নাই; বঙ্কিম বাবু ও উহার টীকা লেখেন নাই।

কিন্তু প্রাচীন টীকাকারগণ "ভীষ্ম দুর্য্যোধনের পিতামহ, রক্তসংসৃষ্ট স্নেহ বশতঃ দুর্য্যোধনের আশঙ্কা দূর এবং হর্ষোৎপাদন করিবার জন্য সিংহনাদ শঙ্খধ্বনি করিলেন, কিন্তু দুর্য্যোধনের বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়াও, কুলাগতসম্বন্ধশূন্য দ্রোণাচার্য্য উপেক্ষার ভাবে নির্ব্বাক্ রহিলেন, কোন প্রকার উৎসাহ প্রদান করিলেননা" ইত্যাদি ও অন্যান্য প্রকার ব্যাখ্যাও করিয়াছেন; অপ্রয়োজন বোধে তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করিলাম না। ঐ টীকার মধ্যে যে অংশটুক উদ্ধৃত হইল, তৎসম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলা আবশ্যক যে, ভীষ্মই প্রধান সেনাপতি, যুদ্ধকালে সৈন্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করা সেনাপতির একটী প্রধান কর্ত্তব্য কার্য্য। দ্রোণাচার্য্য তৎকালে প্রধান সেনাপতি ছিলেন না, ভীষ্মের অধীনে যুদ্ধ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন মাত্র। এরূপ স্থলে কৌরবপক্ষে প্রধান সেনা-নায়ক ভীষ্মের সিংহনাদ ও শংখধ্বনি দ্বারা দুর্য্যোধনের বাক্যের অনুমোদন, হর্ষউৎপাদন, অন্যান্য সেনাপতি ও সৈন্যবর্গের উৎসাহ বর্দ্ধন, তৎসহ যুদ্ধ-ঘোষণা করা, সময়োচিত কর্ত্তব্য কার্য্যই হইয়াছে। দ্রোণাচার্য্যের তদ্রূপ করিবার প্রয়োজনাভাব। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্বপক্ষের সন্তোষ উৎপাদন ও সৈন্যগণের উত্তেজনা ও উৎসাহ বর্দ্ধন করা যুদ্ধজয়ের নিমিত্ত, প্রধান সেনাপতি বা সৈন্যপরিচালকের একটী প্রধান কর্ত্তব্যকার্য্যই সুতরাং ভীষ্ম তাঁহার সেই কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। রক্তসংসৃষ্টহেতু স্নেহবশতঃ দুর্য্যোধনের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত ভীষ্ম তদ্রূপ করিলে, ও কুলাগত সম্পর্কশূন্যতা হেতু দ্রোণাচার্য্য তদ্রূপ না করিলে উভয়কেই লঘুচেতা বলিতে হয়, বস্তুতঃ উপরোক্ত কার্য্য হেতু তাঁহাদের চিত্তের উচ্চতা ভিন্ন নীচতা প্রকাশ পায় না।

কৌরবসেনা-নায়ক ভীষ্মের সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনির পরে, উভয়পক্ষের স্বীয় স্বীয় শঙ্খ ধ্বনি (রণবাদ্যবিশেষ বাজিয়া উঠা) স্বাভাবিক। এক্ষণকার (Bugle) প্রভৃতির ন্যায় তৎকালে এক একজন যোদ্ধার এক এক প্রকার গম্ভীর হৃদয়োন্মাদক উদ্দীপনা-পূর্ণ রণ-গীতিধ্বনিসূচক এক একটী উচ্চ শ্রেণীর যন্ত্র থাকিত, যথা শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্চ-জন্য, অর্জ্জুনের দেবদত্ত, ভীমের পৌণ্ড্র, রাজা যুধিষ্ঠিরের অনন্ত-বিজয়, নকুল সহদেবের যথাক্রমে সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক, এবং অন্যান্য যোদ্ধাদিগেরও ঐরূপ যন্ত্র ছিল।

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত।
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্ ॥২১॥
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥২২॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধে র্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩॥

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ।

হে অচ্যুত, যাবৎ অহম্ অবস্থিতান্ যোদ্ধুকামান্ এতান্ নিরীক্ষে, অস্মিন্ রণসমুদ্যমে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্; যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য প্রিয়চিকীর্ষবঃ যে এতে অত্র সমাগতাঃ (তান্) যোৎস্যমানান্ অহম্ অবেক্ষে (তাবৎ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয় ॥২১॥২২॥২৩॥

বঙ্গানুবাদ। অর্জ্জুন কহিলেন।

হে অচ্যুত, যাবৎ আমি যুদ্ধকামনায় অবস্থিত ইহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই যুদ্ধে কাহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ করিতে হইবে, [এবং] যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া যাহারা এই স্থানে সমাগত হইয়াছে, সেই সকল যুদ্ধার্থীগণকে অবলোকন করি, তাবৎ তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর ॥২১॥২২॥২৩॥

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যেস্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫॥
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭॥

অন্বয়—সঞ্জয়ঃ উবাচ।

হে ভারত, গুড়াকেশেন (গুড়াকা নিদ্রা তস্যাঃ ঈশেন, জিতনিদ্রেণ) [অর্জ্জুনেন] এবম্ উক্তঃ হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাং [রাজ্ঞাং] [সম্মুখে] রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা "হে পার্থ, এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ পশ্য" ইতি উবাচ ॥২৪॥২৫॥

ব্যাখ্যা—সঞ্জয় কহিলেন।

হে ভারত, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক হৃষীকেশ

এইরূপ অভিহিত হইয়া, উভয় সেনার মধ্যে ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখ সমুদায় রাজগণের সম্মুখে [সেই] উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া, "হে পার্থ, সমবেত কুরুগণকে অবলোকন কর" ইহা কহিলেন ॥২৪॥২৫॥

অন্বয়—অথ পার্থঃ তত্র স্থিতান্ উভয়োরপি সেনয়োঃ পিতৃন্ পিতামহান্ আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৃন্ পুত্রান্ তথা সখীন্ শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চ এব অপশ্যৎ ॥২৬॥

ব্যাখ্যা—অনন্তর পার্থ সেই স্থানে অবস্থিত উভয়সেনায়ই পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর, সখা এবং সুহৃদ্গণকেও অবলোকন করিলেন ॥২৬॥

অন্বয়—সঃ কৌন্তেয়ঃ অবস্থিতান্ তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ সমীক্ষ্য পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ বিষীদন্ [সন্] ইদম্ অব্রবীৎ ॥২৭॥

ব্যাখ্যা—সেই কুন্তীপুত্র রণস্থলে অবস্থিত সেই সকল বন্ধুগণকে দেখিয়া অতিশয় কৃপাবিষ্ট ও অবসন্ন হইয়া এই কথা বলিলেন ॥২৭॥

উপরোক্ত শ্লোক কয়েকটীর প্রাচীন টীকাকারগণের টীকায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় প্রায় কিছুই নাই, কেবল একটী কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। তাঁহারা বলেন, অর্জ্জুনের অভিপ্রায় এই যে, ভিন্ন ভিন্ন দেশাগত রাজগণের সহিত তাঁহাদের (পাণ্ডব গণের) কোন শত্রুতা না থাকিলেও, ঐ রাজাগণের ভাবদৃষ্টে তাঁহারা সন্ধির কোন চেষ্টা করিবেন না, তাঁহারা দুর্য্যোধনের হিতার্থে মরণ পর্য্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন বিবেচিত হওয়ায়, তাঁহাদিগের সম্মুখে রথ স্থাপন করুন, আমি একবার দেখিয়া লইব যে, আমার উপযুক্ত প্রতিযোগী যোদ্ধা কোন ব্যক্তি, আমি স্বয়ং কাহার সহিত যুদ্ধ করিব, এবং অন্য কাহার সহিত কোন ব্যক্তির যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে ঐ রূপ বলিলে, অর্জ্জুনের অভিপ্রায়ানুরূপ শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতির সম্মুখে রথ স্থাপন করিলে, অর্জ্জুন পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর প্রভৃতি বন্ধু বান্ধব সকলকে দেখিয়া, এই যুদ্ধে উপরোক্ত বন্ধু ও স্বজনগণের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, তাঁহার ঐ স্বজনগণকে বধ করিতে হইবে ইত্যাদি চিন্তা মনে উদিত হওয়ায়, তিনি কৃপাবিষ্ট অর্থাৎ করুণার্দ্রচিত্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া, পরবর্ত্তীশ্লোকোক্ত তাঁহার সেই লোকাতীত অশ্রুতপূর্ব্ব নিঃস্বার্থ উদার মহদ্ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উপরোক্ত এবং উহার পরবর্ত্তী কয়েকটী শ্লোকের ভাবার্থ পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, অর্জ্জুন বাস্তবিক যে কাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন, তাহাই নির্ব্বাচন করিবার জন্য, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যের সম্মুখে রথ স্থাপন করিতে বলিলেন, তদ্রূপ রথ স্থাপনের পর, তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্রই যে, তাঁহার চিত্ত বিগলিত ও করুণার্দ্র হইয়া হঠাৎ নিঃস্বার্থ উদার মহান্ ভাবের বিকাশ হইল ইহা সম্ভব নহে। যখন বহু চেষ্টা করিয়া সন্ধি হইল না, যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, এবং উভয় পক্ষের সমগ্র আত্মীয় স্বজন যুদ্ধার্থে সমবেত হইল, তখনই অর্জ্জুনের চিত্ত করুণার্দ্র ও নিঃস্বার্থ মহদ্ভাবে পরিপূর্ণ

হইয়াছিল; সেই জন্যই তিনি আক্ষেপের সহিত শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন,—দুর্ব্বুদ্ধি দুর্য্যোধনের প্রিয়চিকীর্ষুগণ যাঁহারা এই যুদ্ধে সমাগত হইয়াছেন, তাহাদিগকে আমি একবার দেখি, এবং এই রণসমুদ্যমে কাহাদিগের সহিত আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে একবার দেখিয়া লই, তজ্জন্য আপনি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন করুন। এই বাক্যগুলি সম্পূর্ণ করুণাব্যঞ্জক ও আক্ষেপ সূচক। পরে শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্মদ্রোণাদির সম্মুখে রথ স্থাপন করিলে, অর্জ্জুন তাঁহাদিগকে অর্থাৎ আত্মীয় স্বজনকে দেখিয়া, হৃদয় একেবারে দ্রবীভূত হওয়ায় কৃপাবিষ্ট হইয়া, বিষাদ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, ইহাই সম্ভব ও পূর্ব্বাপরসঙ্গত।

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৮॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯॥
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০॥
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১॥
কিংনো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানিচ ॥৩২॥
তইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানিচ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩৩॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥৩৪॥
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥৩৫॥
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ স্ববান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬॥
যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষংমিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ৩৭
কথং ন জ্ঞেয় মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥৩৮॥
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলংকৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥৩৯॥
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥৪০॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪২॥
উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যানাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৩
অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরংভবেৎ ॥৪৫

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা-র্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থউপাবিশৎ।
বিসৃজ্যসশরং চাপং শোকসংবিগ্ন-মানসঃ॥৪৬

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ। হে কৃষ্ণ যুযুৎস্নূন্ ইমান্ স্বজনান্ সমবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা মম গাত্রানি সীদন্তি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি॥২৮॥

বঙ্গানুবাদ—অর্জ্জুন কহিলেন। হে কৃষ্ণ যুদ্ধেচ্ছু এই স্বজনগণকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া, আমার শরীর অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে॥২৮॥

অন্বয়—মে (মম) শরীরে বেপথুশ্চ (কম্পশ্চ) রোমহর্ষশ্চ (রোমাঞ্চশ্চ) জায়তে হস্তাৎ গাণ্ডীবং স্রংসতে (নিপততি) ত্বক্ চ পরিদহ্যতে এব॥২৯॥

বঙ্গানুবাদ—আমার শরীরে কম্প এবং রোমহর্ষ হইতেছে, হস্ত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে, এবং চর্ম্ম যেন দগ্ধ হইতেছে॥২৯॥

অন্বয়—হে কেশব, অবস্থাতুং চ ন শক্নোমি, মে মনশ্চ ভ্রমতি ইব বিপরীতানি নিমিত্তানি চ পশ্যামি॥৩০॥

বঙ্গানুবাদ—হে কেশব, আমি আর অবস্থান করিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন ঘুরিতেছে, আর আমি বিপরীত লক্ষণ সকল দর্শন করিতেছি॥৩০॥

অন্বয়—আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং হত্বা শ্রেয়শ্চ ন অনুপশ্যামি; হে কৃষ্ণ [অহং] বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে, রাজ্যং চ সুখানি চ ন [কাঙ্ক্ষে] ॥৩১॥

বঙ্গানুবাদ—যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া শ্রেয়ঃ দেখিতেছি না, হে কৃষ্ণ আমি জয় চাহিনা, রাজ্য ও সুখ চাহিনা॥৩১॥

হে গোবিন্দ, যেষাম্ অর্থে নঃ (অস্মাকম্) রাজ্যং ভোগাঃ সুখানিচ কাঙ্ক্ষিতম্, আচার্য্যাঃ, পিতরঃ পুত্রাঃ তথা এবচ পিতামহাঃ, মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ, শ্যালাঃ, তথা সম্বন্ধিনঃ, তে ইমে প্রণান্ ধনানিচ ত্যক্ত্বা (ত্যাগমঙ্গীকৃত্য) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ (অতএব) নঃ (অস্মাকম্) রাজ্যন কিং, ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিম্? হে মধুসূদন, মহীকৃতে কিংনু, ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ অপি-ঘ্নতঃ (অস্মান্ মারয়তঃ) অপি এতান্ ন হন্তু মিচ্ছামি, হে জনার্দ্দন, ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য নঃ (অস্মাকং) কা প্রীতিঃ স্যাৎ॥৩২॥৩৩॥৩৪॥৩৫॥

বঙ্গানুবাদ—হে গোবিন্দ, যাহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ, ও সুখকামনা আমাদের কাঙ্ক্ষিত, সেই আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালা এবং কুটুম্বগণ ধন ও প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া যুদ্ধে অবস্থিত, অতএব আমাদের রাজ্যেই কাজ কি, ভোগেই কাজ কি, জীবনেই বা কাজ কি? হে মধুসূদন! ইহারা আমাদিগকে মারিলেও আমি—পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক, ত্রিভুবনের রাজ্যের জন্যও ইহাদিগকে মারিতে ইচ্ছা করিনা। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে নিহত করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে?॥৩২॥৩৩॥৩৪॥৩৫॥

অন্বয়—আততায়িনঃ * এতান্ হত্বা অস্মান্ পাপম্ এব আশ্রয়েৎ তস্মাৎ বয়ং স্ববান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং ন অর্হাঃ, হি

* অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারীচ ষড়েতে আততায়িনঃ॥

(যতঃ) হে মাধব, স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ স্যাম (ভবেম) ॥৩৬॥

বঙ্গানুবাদ—এই আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে, অতএব আমরা স্ববান্ধব ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে বিনাশ করিতে পারি না, যেহেতু হে মাধব, স্বজন বধ করিয়া আমরা কিরূপে সুখী হইব? ॥৩৬॥

অন্বয়—যদ্যপি লোভোপহতচেতসঃ এতে কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহেচ পাতকং ন পশ্যন্তি, হে জনার্দ্দন, কুলক্ষয় কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ম্? ॥৩৭॥৩৮॥

বঙ্গানুবাদ—যদিও ইহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া কুলক্ষয় কৃত দোষ ও মিত্রদ্রোহে পাতক দেখিতেছে না, (কিন্তু) হে জনার্দ্দন, কুলক্ষয় জনিত দোষ দেখিয়াও আমাদের এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য জ্ঞান কেন না হইবে? ॥৩৭॥৩৮॥

অন্বয়—কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ (পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ) কুলধর্ম্মাঃ প্রণশ্যন্তি, ধর্ম্মে-নষ্টে (সতি) অধর্ম্মঃ কৃত্স্নম্ উত (অপি) কুলং অভিভবতি (ব্যাপ্নোতি) ॥৩৯॥

বঙ্গানুবাদ—কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্ম্ম নষ্ট হয়; ধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম (অবশিষ্ট) সমুদায় কুলকে অভিভূত করে ॥৩৯॥

অন্বয়—হে কৃষ্ণ, অধর্ম্মাভিভবাৎ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি; হে বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণিবংশোদ্ভব) স্ত্রীষু দুষ্টাষু (সতীষু) বর্ণসঙ্করঃ জায়তে ॥৪০॥

বঙ্গানুবাদ—হে কৃষ্ণ, অধর্ম্মাভিভূত হইলে কুলস্ত্রীগণ দুষ্টা হয়; হে বার্ষ্ণেয় (বৃষ্ণিবংশোদ্ভব) স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে বর্ণসঙ্কর জন্মে ॥৪০॥

অন্বয়—সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্করঃ) কুলঘ্নানাং কুলস্যচ নরকায় এব (ভবতি) এষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ (লুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ যেষাং তে) পিতরঃ পতন্তিহি ॥৪১॥

বঙ্গানুবাদ—বর্ণসঙ্কর কুলঘ্নদিগের এবং কুলের নরকের নিমিত্তই হয়, ইহাদের লুপ্তপিণ্ডোদক পিতৃগণ নিশ্চয় পতিত হয় ॥৪১॥

অন্বয়—কুলঘ্নানাম্ এতৈঃ বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দোষৈঃ শাশ্বতাঃ জাতিধর্ম্মাঃ (বর্ণধর্ম্মাঃ) কুলধর্ম্মাশ্চ (চকারাৎ আশ্রমধর্ম্মাদয়ঃ অপি) উৎসাদ্যন্তে (লুপ্যন্তে) ॥৪২

বঙ্গানুবাদ—কুলঘ্নদিগের এই সকল বর্ণসঙ্কর কারক দোষে সনাতন বর্ণধর্ম্ম আশ্রমধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায় ॥৪২॥

অন্বয়—হে জনার্দ্দন, উৎসন্ন কুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যানাং নিয়তং নরকে বাসঃ ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম (শ্রুতবন্তোবয়ম্) ॥৪৩॥

বঙ্গানুবাদ—হে জনার্দ্দন, যাহাদের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হয়, সেই সকল মনুষ্যগণের নিয়ত নরকে বাস হয়, ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥৪৩॥

অন্বয়—অহোবত, (কষ্টম্) বয়ং মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ; (যৎ যস্মাৎ) রাজ্যসুখলোভেন স্বজনং হন্তুম্ উদ্যতাঃ॥৪৪॥

বঙ্গানুবাদ—হায়! আমরা মহৎ পাপ করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি; যেহেতু রাজ্যসুখ লোভে আমরা স্বজন বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি। ॥৪৪॥

অন্বয়—যদি অপ্রতীকারম্ অশস্ত্রং মাং শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণেহন্যুঃ (হনিষ্যন্তি)

তৎ-মে ক্ষেমতরং (অত্যন্তহিতং) ভবেৎ॥৪৫

বঙ্গানুবাদ—যদি শস্ত্রধারী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ প্রতিহিংসাপরাঙ্মুখ ও অশস্ত্র আমাকে যুদ্ধে বিনাশ করে, তাহাও আমার পক্ষে অত্যন্ত মঙ্গলকর হইবে ॥৪৫॥

অন্বয়—সঞ্জয়ঃ উবাচ। অর্জ্জুনঃ এবম্ উক্ত্বা সংখ্যে (যুদ্ধে) সশরং চাপং বিসৃজ্য শোকসংবিগ্নমানসঃ (শোকাকুল চিত্তঃ) [সন্] রথোপস্থে (রথোপরি) উপাবিশৎ॥৪৬

বঙ্গানুবাদ—সঞ্জয় কহিলেন। অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া যুদ্ধস্থলে সশর ধনুঃ পরিত্যাগ করিয়া শোকাকুল চিত্ত হইয়া রথোপরি উপবেশন করিলেন ॥৪৬॥

ইতি অর্জ্জুনবিষাদযোগ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

গৃহস্থের সদাচার।

(বিষ্ণুপুরাণ।)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অপীড়য়া তয়োঃকামং উভয়োরপি
চিন্তয়েৎ।
দৃষ্টাদৃষ্টবিনাশায় ত্রিবর্গে সম-
দর্শিতা ॥৫॥
পরিত্যজেদর্থকামৌ ধর্ম্মপীড়া-
করৌ নৃপ।
ধর্ম্মমপ্যসুখোদর্কং লোকবিদ্বিষ্ট-
মেবচ ॥৬॥

বঙ্গব্যাখ্যা। ধর্ম্ম এবং অর্থ এই দুয়ের যাহাতে পীড়া অর্থাৎ ক্ষুণ্ণতা উপস্থিত না হয়, এরূপ ভাবে কামচিন্তা করিবে। ত্রিবর্গে (ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে) সমদৃষ্টি, দৃষ্টাদৃষ্ট-বিনাশ নিবৃত্তি করে। (দৃষ্টাদৃষ্ট-বিনাশায় দৃষ্টাদৃষ্টবিনাশনিবৃত্তয়ে ইতি স্বামী) ধর্ম্মের পীড়াকর অর্থাৎ সঙ্কোচক বা ক্ষোভক অর্থ এবং কাম পরিত্যাগ করিবে। আবার যে সকল ধর্ম্মকার্য্যের পরিণামে নানারূপ অশুভফলসম্ভাবনা আছে, এবং যাহা লোকসমাজের বিদ্বিষ্ট, এরূপ ধর্ম্মকার্য্যও করিবেনা। (শ্রীধরস্বামী অশুভফল ধর্ম্ম-কার্য্যের দৃষ্টান্তস্বরূপে ব্যাঘ্রাদিসেবিত তীর্থ-গমন বলিয়াছেন, আর লোকবিদ্বিষ্ট ধর্ম্ম-কার্য্য সৌত্রামণীযাগে সুরাগ্রহ গ্রহণের উল্লেখ করিয়াছেন। সুধীসমাজে ইহার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচারের ভার রহিল।) ॥৫॥৬॥

ততঃকল্যং সমুত্থায়কুর্য্যান্মৈত্রং
নরেশ্বর !
নৈঋ´ত্যামিষুবিক্ষেপমতীত্যাভ্য-
ধিকংভুবঃ ॥৭॥
দূরাদাবসথাৎ মূত্রং পুরীষঞ্চ সমুৎ-
সৃজেৎ।
পাদাবসেচনোচ্ছিষ্টে প্রক্ষিপেন্ন
গৃহাঙ্গণে ॥৮॥

বঙ্গব্যাখ্যা। অনন্তর প্রাতঃসময়ে শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মিত্রদেবতাধিষ্ঠিত পায়ু নামক ইন্দ্রিয়ের কার্য্য অর্থাৎ মলত্যাগ করিবে। গ্রামের নৈঋ´তকোণে বাণক্ষেপ পথ অতিক্রম করিয়া অর্থাৎ ক্ষিপ্তবাণ যত-দূর যায় সেই পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া, তাহার

পরে মলোৎসর্গ করিবে। যদি উক্ত কার্য্য অসম্ভব হয়, তবে বাসভবন হইতে দূরে বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে। পাদ-প্রক্ষালন জল এবং উচ্ছিষ্ট কখনও গৃহের আঙ্গিনায় নিঃক্ষেপ করিবেনা ॥৭॥৮॥

আত্মচ্ছায়াং তরুচ্ছায়াং গোসূর্য্যা-
গ্ন্যনিলাংস্তথা।
গুরুদ্বিজাতীংশ্চ বুধো ন মেহেত
কদাচন ॥৯॥

বঙ্গব্যাখ্যা। নিজের ছায়া, বৃক্ষছায়া, গো, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, গুরু, ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতি ইহাদিগকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া কদাচ মেহন ক্রিয়া করিবেনা ॥৯॥

ন কৃষ্টে শস্যমধ্যে বা গোব্রজে
জনসংসদি।
ন বর্ত্মনি ন নদ্যাদিতীর্থেষু পুরু-
ষর্ষভ ॥১০॥
নাপ্সু নবাম্ভসস্তীরে ন শ্মশানে
সমাচরেৎ।
উৎসর্গং বৈ পুরীষস্য মূত্রস্য চ
বিসর্জ্জনম্ ॥১১॥

বঙ্গব্যাখ্যা। কর্ষিতক্ষেত্রে শস্যাদির মধ্যে, গোষ্ঠে, জনসংসর্গে, পথে, নদীর ঘাটে, জলে, জলের ধারে ও শ্মশানে কখনও মলোৎসর্গ বা প্রস্রাব পরিত্যাগ করিবেনা। (এই সকল স্থানে মলত্যাগাদি যে দোষাবহ, তাহা বোধহয় সকলেই বুঝিতে পারিবেন।) ॥১০॥১১॥

উদঙ্মুখো দিবোৎসর্গো বিপরীত-
মুখো নিশি।
কুর্ব্বীতানাপদি প্রাজ্ঞো মূত্রোৎ-
সর্গঞ্চ পার্থিব। ১২

বঙ্গব্যাখ্যা। দিনে উত্তরমুখ হইয়া মলত্যাগ ও প্রস্রাব ত্যাগ করিবে। রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইয়া করিবে। বাধা না থাকিলে এইরূপ ব্যবস্থা ॥১২॥

তৃণৈরাস্তীর্য্য বসুধাং বস্ত্রপ্রাবৃত-
মস্তকঃ।
তিষ্ঠেন্নাতিচিরং তত্র নৈব কিঞ্চি-
দুদীরয়েৎ ॥১৩

বঙ্গব্যাখ্যা। মলোৎসর্গ সময়ে ভূমিতে তৃণ পাতিয়া, মাথায় কাপড় ঢাকা দিয়া অবস্থিতি করিবে। বহুক্ষণ তথায় অবস্থিতি করিবেনা এবং কিছু উচ্চারণ করিবেনা অর্থাৎ কথা বলিবেনা ॥১৩॥

বল্মীকমূষিকোৎখাতাং মৃদ মন্ত-
র্জ্জলাং তথা।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ নাদদ্যা-
ল্লেপসম্ভবাম্ ॥১৪॥
অন্তঃ প্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হলোৎখাতাঞ্চ
ভূমিপ।
পরিত্যজেন্মৃদশ্চৈতাঃ সকলাঃ
শৌচসাধনম্ ॥১৫॥

বঙ্গব্যাখ্যা। বল্মীকের (সাধারণতঃ বল্মীক শব্দে উঁয়ের ঢিপি বুঝা হয়।) অথবা ইঁদুরের উৎখাত মৃত্তিকা কিম্বা অন্তর্জলা (জলমধ্যস্থা) মৃত্তিকা, অথবা অন্য বারের শৌচের অবশিষ্ট মৃত্তিকা ও গৃহলেপ মৃত্তিকা কদাচ শৌচার্থে লইবেনা। কীটাদি মিশ্র, লাঙ্গলোৎখাত মৃত্তিকাও শৌচার্থে গ্রহণ করা অনুচিত, প্রত্যুত ঐ সকল মৃত্তিকা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে ॥১৪॥১৫॥

একা লিঙ্গে গুদে তিস্রঃ তথা
বামকরে দশ।
হস্তদ্বয়ে চ সপ্তান্যাঃ মৃদঃ শৌচো-
পপাদিকাঃ ॥১৬॥

বঙ্গব্যাখ্যা। মেঢ্রে একবার, গুহ্যে তিনবার, বামহস্তে দশবার, হস্তদ্বয় একত্রিত করিয়া তাহাতে আর সাতবার মৃত্তিকা ঘর্ষণ করিতে হয়, এইরূপে মৃত্তিকা প্রদানই শৌচোপাদক, অন্যথা নহে ॥১৬॥

অচ্ছেনাগন্ধ ফেণেন জলেনাবুদ্বুদেনচ।
আচামেত মৃদং ভূয়স্তথাদদ্যাৎ
সমাহিতঃ ॥১৭॥
নিষ্পাদিতাঙ্ঘ্রি শৌচস্তু পাদাব-
ভ্যুক্ষ্য বৈপুনঃ।
ত্রিঃপিবেৎ সলিলং তেন তথা দ্বিঃ-
পরিমার্জ্জয়েৎ ॥১৮॥
শীর্ষণ্যানি ততঃস্বানি মূর্দ্ধানঞ্চ
নৃপালভেৎ।
বাহূ নাভিঞ্চ তোয়েন হৃদয়ঞ্চাপি
সংস্পৃশেৎ ॥১৯॥

বঙ্গব্যাখ্যা। অনাবিল এবং গন্ধফেণবিহীন, বুদ্বুদশূন্য জলদ্বারা ঐ মৃল্লিপ্তস্থান সকল ধৌত করিবে। পরে পুনর্ব্বার মৃত্তিকা গ্রহণ করিয়া তাহাদ্বারা পাদশৌচ নিষ্পাদন করিবে, অনন্তর চরণদ্বয় জলদ্বারা সুন্দররূপে ধৌত করিবে। তৎপরে তিনবার জল পান করিবে। (অনেকের মতে যাহাকে সাধারণতঃ 'কুলকুচি করা' বলা হয়, তাহাই এখানে 'পান' শব্দের লক্ষ্য।) দুইবার জলদ্বারা মুখমার্জ্জন করিবে। তদন্তে স্বীয় কেশকলাপ এবং মস্তকে জল স্পর্শ করাইবে এবং বাহুদ্বয়, হৃদয় ও নাভি প্রদেশ সজলকর দ্বারা স্পর্শ করিবে ॥১৭॥১৮॥১৯॥

আচান্তশ্চততঃকুর্য্যাৎ. পুমান্
কেশপ্রসাধনং।
আদর্শাঞ্জনমাঙ্গল্য দূর্ব্বাদ্যালভ-
নানিচ ॥২০॥

বঙ্গব্যাখ্যা। পূর্ব্বোক্তরূপে আচান্ত হইয়া পুরুষ কেশপ্রসাধন করিবে, পরে আদর্শ, অঞ্জন, মাঙ্গল্যদ্রব্য দূর্ব্বাদি স্পর্শ করিবে ॥২০॥

ঔর্ব্ব মহর্ষি সগর নৃপতিকে, অতঃপর গৃহস্থের ধর্ম্মার্থে ধনোপার্জ্জন আবশ্যক, ইহা বলিতেছেন যথা,——

ততঃস্ববর্ণধর্ম্মেণ বৃত্ত্যর্থঞ্চধনার্জ্জনং
কুর্ব্বীত শ্রদ্ধাসম্পন্নো যজেচ্চ
পৃথিবীপতে ॥২১॥

বঙ্গব্যাখ্যা। আচমনাদি কেশপ্রসাধন প্রভৃতি প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, স্বীয় জাতিধর্ম্মানুসারে অবস্থিতি ও জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ধন উপার্জ্জন করিবে। ঐ উপার্জ্জিত সম্পত্তির দ্বারা শ্রদ্ধান্বিত ভাবে যজ্ঞাদি স্বধর্ম্ম যাজন করিবে। (প্রাতঃকৃত্য শৌচাচমনাদির কথা বলায়, ইহার মধ্যে নিত্যকর্ত্তব্য সন্ধ্যোপাসনাদির কথাও বলা হইয়াছে, এরূপ স্বামী বলেন।)

সোমসংস্থা হবিঃসংস্থাঃ পাকসং-
স্থাশ্চ সংস্থিতাঃ।

ধনেযতোমনুষ্যানাং যতেতাতো ধনার্জ্জনে ॥২২॥

বঙ্গব্যাখ্যা। অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র, বাজপেয়ও আপ্তোর্য্যাম এই সপ্ত সোমসংস্থা, এবং অগ্ন্যাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শপূর্ণমাস, আগ্রয়ণ, চাতুর্থ্য, নিরূঢ় পশুবন্ধ ও সৌত্রামণি, এই সপ্ত হবিঃসংস্থা, আর অষ্টকা, পার্ব্বণ, শ্রাবণী, অগ্রহায়ণী প্রভৃতি সপ্তপাকসংস্থা, সমস্তই অর্থে সংস্থিত অর্থাৎ পাকযজ্ঞ, হবির্যজ্ঞ এবং সোমযজ্ঞ সকলই ধনের অধীন; অতএব মনুষ্যগণের ধনোপার্জ্জনের জন্য যত্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য।

অধুনা মধ্যাহ্নকালীন স্নানতর্পণাদির কথা মহর্ষি ঔর্ব্ব বিবৃত করিতেছেন।

নদীনদতড়াগেষু দেবখাতজলেষু বা নিত্যক্রিয়ার্থং স্নায়ীত গিরিপ্রস্রবণেষুচ ॥২৩॥

কূপেষূদ্ধৃততোয়েন স্নানং কুর্ব্বীত বা ভুবি।

স্নায়ীতোদ্ধৃততোয়েণ অথবা ভুব্যসম্ভবে ॥২৪॥

বঙ্গব্যাখ্যা। নিত্যক্রিয়া জন্য নদী, নদ, তড়াগ অথবা হ্রদের জলে কিম্বা পর্ব্বত প্রস্রবণের বিশুদ্ধজলে স্নান করিবে। অভাবে কূপ হইতে কলসাদি দ্বারা জল তুলিয়া, কূপের তীর ভূমিতে স্নানকার্য্য সম্পাদন করিবে। তাহা অসম্ভব হইলে, নদী হইতে শীতলজল আনাইয়া গৃহভূমিতে তদ্দ্বারা স্নান করিবেক। (স্বামী বলেন, তদভাবে যে কোনও জল উষ্ণ করিয়া স্নান করিতে হইবে। যদি তাহাও কথঞ্চিৎ অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে মন্ত্র দ্বারা বিনা-জলে স্নানকার্য্য সম্পন্ন করিবে।)

শুচিবস্ত্রধরঃস্নাতঃ দেবর্ষিপিতৃ-তর্পণং।

তেষামেবহিতীর্থেন কুর্ব্বীত সুসমাহিতঃ ॥২৫॥

বঙ্গাব্যাখ্যা। স্নানের পর শুচিবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সমাহিতমনে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে। দেব তর্পণে দেবতীর্থের দ্বারা জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। ঋষি-তর্পণে ও পিতৃতর্পণে তত্তত্তীর্থে দিতে হইবে। (দেব-তীর্থাদি বিষয়ে শাস্ত্রে উক্ত আছে, কণিষ্ঠাদেশিন্যঙ্গুষ্ঠমূলান্যগ্রং করস্যচ, প্রজাপতি পিতৃব্রহ্মদেবতীর্থান্যনুক্রমাৎ।)

ত্রিরপঃ প্রীণনার্থায় দেবানাং অপর্জ্জয়েৎ।

তথর্ষীনাং যথান্যায়ং সকৃচ্চাপি প্রজাপতেঃ ॥২৬॥

বঙ্গব্যাখ্যা। দেবতাগণের প্রীত্যর্থে তিনবার জল প্রদান করিতে হইবে। ঋষিগণের প্রীণনজন্য তিনবার জলদান করিবে। যথানিয়মে প্রজাপতিকে একবারমাত্র জলাঞ্জলি প্রদান করিবে।

পিতৃণাং প্রীণনার্থায় ত্রিরপঃ পৃথিবীপতে।

পিতামহেভ্যশ্চ তথা প্রীণয়েৎ প্রপিতামহান্ ॥২৭॥

মাতামহায় তৎপিত্রে তৎপিত্রেচ
সমাহিতঃ।
দদ্যাৎ পৈত্রেণতীর্থেন কাম্যঞ্চা-
ন্যৎ শৃণুস্ব মে ॥২৮॥

বঙ্গব্যাখ্যা। পিতৃপুরুষের তৃপ্তির জন্য তিন বার জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। পিতামহ প্রপিতামহগণের জন্যও ঐরূপ দিবে। মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ ইহাদিগের তৃপ্তিজন্যও ঐপ্রকারে জল প্রদান করিবে। এই সমস্ত পিতৃমাতামহাদিতর্পণ পিতৃ-তীর্থেই করিতে হইবে। এগুলি নিত্য; অপর বিশেষফললাভার্থে কাম্যতর্পণ বলিতেছি শ্রবণ কর।

(ক্রমশঃ)

দীনস্য কস্যচিৎ
যশোহর।

তত্ত্ব-সমাস।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

গত সংখ্যায় কর্ম্মোৎপত্তির অসাধারণ কারণ কর্ম্মেন্দ্রিয়, এবং শরীরধারক প্রাণনাদি-কার্য্যসম্পাদক প্রাণপঞ্চকের তত্ত্ব সমালোচিত হইয়াছে। এই কর্ম্মপ্রসঙ্গের মূল সূত্র আবিষ্কৃত হওয়ায়, কর্ম্মের অবান্তর বিভাগ বিষয়ে প্রশ্ন করিবার পথ সুগম হইয়াছে। কর্ম্ম স্বরূপ নির্ণয়ে মহর্ষি কিছুই বলেন নাই, কেননা নিতান্ত অনালোচিত অপরিচিত পদার্থেরই লক্ষণনির্ব্বাচন দ্বারা পরিচয় প্রদান বা স্বরূপ প্রদর্শন আবশ্যক হয়। কর্ম্মের লক্ষণ নির্ণয় করিতে গিয়া, গৌতমাদি তার্কিক দার্শনিকেরা গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু 'কর্ম্ম' বলিলে আপামর সাধারণ অজ্ঞ বিজ্ঞ সকলেই যাহা বুঝে, তাহা যে 'কর্ম্ম' শব্দেরই যথার্থ লক্ষ্য, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কপিলদেবের পদার্থবিভাগ স্বতন্ত্র প্রকারের; ইহার উদ্দেশ্য এবং আবশ্যকীয়তা অপর হইতে একটু ভিন্নরূপ। 'কর্ম্ম' যাহা করা যায়। কর্ম্মেন্দ্রিয়নির্ব্বাচনে কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলিকে কর্ম্ম-যোনি বা কর্ম্মোৎপত্তির মূল প্রসূতি বলা হইয়াছে। সেখানে সংক্ষেপে কর্ম্মের পরিচয় অবশ্য আছে, কিন্তু এই স্থানে কর্ম্মের জাতীয়তাসংশ্লিষ্টবিভাগ প্রদর্শিত হইতেছে। কপিল বলিতেছেন—

পঞ্চ কর্ম্মাত্মানঃ ॥২১॥

কর্ম্মের আত্মা অর্থাৎ স্বরূপ পাঁচ প্রকার। জগতে অনন্ত কর্ম্মরাশি প্রতি মুহূর্ত্তে সংঘটিত হইতেছে, আবার কত কর্ম্ম—জলাশয়-পৃষ্ঠে বিলীন জলবুদ্‌বুদের ন্যায় অনন্তের বিশালকুক্ষিতে আত্মরক্ষা করিতেছে! জীবের চতুর্দ্দিকে ঘনঘোররোলকল্লোল সহকারে অনবরত কর্ম্মস্রোত প্রবাহিত হইতেছে; সেই বিপুল কর্ম্মতরঙ্গে জীবকুল আপন অঙ্গ ভাসাইয়া চলিতেছে! এ অনন্ত অপরিমেয় অগণ্য কর্ম্মের সংখ্যা করে কার সাধ্য? বুদ্ধিতে তত অবকাশ নাই—ধৈর্য্যের তত দৃঢ়তা নাই যে, এই অসীম কর্ম্ম-সমুদ্রের এক ক্ষুদ্রতম অংশও আয়ত্ত করিতে পারে। সুতরাং কর্ম্ম কয় শ্রেণীতে বিভক্ত

হইতে পারে, তাহাই মহর্ষি বলিতেছেন—'কর্ম্ম পাঁচ প্রকার'।

তার্কিকদিগের শাস্ত্রে পঞ্চকর্ম্মের নাম—"উৎক্ষেপণং ততোঽবক্ষেপণং আকুঞ্চনং তথা, প্রসারণঞ্চগমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চচ।" উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন এই পঞ্চকর্ম্ম। যদ্দ্বারা পদার্থ ঊর্দ্ধদিকে ক্ষিপ্ত হয় তাহার নাম উৎক্ষেপণ কর্ম্ম, অধোদিকে বিক্ষিপ্ত হইলে অবক্ষেপণ কর্ম্ম, যে কর্ম্ম-বলে পদার্থের সহজ স্বাভাবিক আয়তন হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম আকুঞ্চন; আর যদ্দ্বারা আয়তন বর্দ্ধিত হয় তাহা প্রসারণ কর্ম্ম। গমন চিরপ্রসিদ্ধ। ঊর্দ্ধজ্বলন, তির্য্যগ্‌গমন, মণ্ডলাকারে ভ্রমণ ইত্যাদি সমস্তই গমনের অবান্তর ভেদ। এই পাঁচ শ্রেণীতে সমস্ত কর্ম্ম বিভক্ত হইতে পারে। কপিলদেব কিন্তু কর্ম্মের পঞ্চধাবিভাগ এই প্রকারে বলিয়াছিলেন মনে হয় না।

দীপিকাকার লিখিতেছেন "কেতে পঞ্চ-কর্ম্মাত্মানঃ? উচ্যন্তে বৈকারিকঃ তৈজসো ভূতাদিঃ সানুমানো নিরনুমানশ্চ। তত্র বৈকারিকঃ শুভকর্ম্মকর্ত্তা, তৈজসোঽশুভ-কর্ম্মকর্ত্তা। ভূতাদি মূঢ়কর্ম্মকর্ত্তা। সানুমানঃ শুভমূঢ়কর্ম্মকর্ত্তা। নিরনুমানঃ শুভামূঢ়-কর্ম্মকর্ত্তা। ইত্যেতে পঞ্চ কর্ম্মকর্ত্তারো ব্যাখ্যাতাঃ।" কর্ম্মের আত্মা ব্যাপক অর্থাৎ স্বরূপনিষ্পাদক কর্ত্তা যদি পঞ্চবিধ হয়, তবে কর্ত্তৃভেদে কর্ম্মভেদনিবন্ধন কর্ম্মও পাঁচ প্রকারের অতিরিক্ত হয় না। কর্ম্ম অসংখ্য, কিন্তু জগৎ ত্রিগুণাত্মক এই হেতু সমস্ত কর্ম্মেরই অভ্যন্তরে ত্রিগুণাত্মকতা বিদ্যমান আছে। জগতের যাবদীয় বস্তুজাত সাত্ত্বিক, রাজস এবং তামস এই ত্রেধা বিভক্ত হইতে পারে। কর্ম্মেরও তদ্রূপ সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ শুদ্ধবিভাগ, এবং সানুমান ও নিরনুমান এই দুই প্রকার মিশ্রবিভাগ—সমুদায়ে পঞ্চধা বিভাগ সমর্থিত হইতেছে। বৈকারিক অর্থ সাত্ত্বিক, তৈজস অর্থ রাজস এবং ভূতাদি অর্থ তামস।

এখানে একটু চিন্তা করা দরকার; সাংখ্যমতে সমস্ত কার্য্যেরই মূলতত্ত্ব অহম্ভাব। অহঙ্কার ব্যতীত এজগতে কর্ম্মের অস্তিত্ব নাই। "অহঙ্কারঃ কর্ত্তা ন পুরুষঃ।" এই সাংখ্য-প্রবচন সূত্রে, পুরুষ বা আত্মার মস্তক হইতে কর্ত্তৃত্বের গাঁট্‌রী লইয়া অহঙ্কারের ঘাঁড়ে চাপান হইয়াছে। অহঙ্কারের প্রকৃতি অনুসারে কর্ম্মেরও প্রকৃতি ভিন্ন হওয়া স্বাভাবিক। অহঙ্কার আবার ত্রিবিধ। "বৈকারিকস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ। ত্রিবিধোঽয়ং অহঙ্কারো মহতঃ সম্বভূবহ।" এই প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে, মহতত্ত্ব-সমুদ্ভূত অহঙ্কার বৈকারিক, তৈজস এবং তামস এই তিন প্রকার। বৈকারিক বা সাত্ত্বিককর্ত্তা যে কর্ম্ম করেন, তাহা অবশ্য সাত্ত্বিক, সুতরাং তাঁহাকে 'শুভকর্ম্মকর্ত্তা' বলিয়া দীপিকাকার যথার্থই সাধুব্যাখ্যা করিয়াছেন। রাজস কর্ত্তার কার্য্য অবিমৃশ্য-কারিতার ফলে, রজোগুণের অত্যধিক চপলতা বশতঃ, অশুভ ভিন্ন হইতেই পারেনা। তামস কর্ত্তা, তমোভিভবহেতু বুদ্ধির সত্ত্ব-প্রকাশশূন্য ভাব উপস্থিত হওয়ায়, কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্য বিবেকবিহীন মূঢ়কর্ম্মকারী হইবেন, ইহা সঙ্গত। সানুমান কর্ত্তা সাত্ত্বিকতামস-ভাবের সমবায় দৃষ্টান্ত। সাত্ত্বিকভাবের উদয়ে

শুভকার্য্যে, তামসভাবের অভ্যুদয়ে মূঢ়-কার্য্যে প্রবৃত্তি হয়, সুতরাং উভয়শক্তি-সংঘাতে তিনি মিশ্রকার্য্যকারী হইতে বাধ্য হন। নিরনুমান কর্ত্তা সাত্বিকরাজস ভাবের একীকরণের পরিণাম দৃশ্য। তিনি সত্বোদ্রেক বশতঃ শুভকারী হইতে পারেন, আবার রজোভি-বৃদ্ধি হেতু মূঢ়ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজস ভাব গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। রজোবৃদ্ধি তাঁহার মূঢ়ভাব পরিত্যাগ করায়, কিন্তু কোনও স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতে দেয় না, এইজন্য তিনি 'শুভামূঢ়কর্ম্মকারী' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। তামসভাবের পরাজয় হেতু 'অমূঢ়কার্য্যকারী' হয়েন, কিন্তু রজোভাবের অস্থিরতা নিবন্ধন অশুভ-কার্য্য না করিতেও পারেন, এইজন্য 'অমূঢ়-কর্ম্মকারী' বলা হইয়াছে, 'অশুভকর্ম্মকারী' বলা হয় নাই। এখন দেখা গেল, পঞ্চবিধ কর্ত্তার কর্ম্ম পঞ্চবিধ—সাত্বিক, রাজস, তামস, সাত্বিকতামসিক, সাত্বিকরাজসিক। সংক্ষেপে শুভ, অশুভ, মূঢ় এই ত্রিবিধ কর্ম্ম বলিলেই চলিতে পারিত, কিন্তু এই তিন প্রকার (শুদ্ধসাত্বিক, শুদ্ধরাজস শুদ্ধ-তামস) অপেক্ষা মিশ্রকর্ম্ম এবং মিশ্র-কর্ত্তারই আধিক্য দৃষ্ট হয়, অতএব মিশ্র-বিভাগ একটী প্রধান বিভাগরূপে পরি-গণিত হইতে পারে। কর্ত্তৃবিভাগভঙ্গী ও কর্ম্মপ্রভেদ ব্যাখ্যাত হইল।

সংসারের সমস্ত কর্ম্মই দুঃখ প্রসব করে। কোনও কর্ম্ম স্বয়ংই দুঃখরূপ, কাহারও উত্তরভাবী ফল দুঃখাত্মক, কাহারও পূর্ব্বে শত শত দুঃখের আক্রমণ সহ্য করিয়া ছিন্নদেহ ভিন্নরক্ত হইয়া কর্ম্ম নিষ্পাদন করিতে হয়। কর্ম্মের অণু পরমাণু বিশ্লেষণ করিলেও তাহাতে দুঃখের এক একটী প্রচ্ছন্ন সজীব কণিকা ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না। দুঃখ আমার স্বভাব নহে, দুঃখ আগন্তুক। বহ্নির উষ্ণতা, জলের শীততা প্রভৃতির ন্যায় দুঃখ আমার আত্মসহকারীধর্ম্ম নয়। দুঃখ আগন্তুক, শুধু আগন্তুক নহে, অনিষ্টকারী অতিথি। দেববৎ পুজিত হইয়া সম্বন্ধশূন্য অতিথি যেমন সুযোগমতে গৃহস্থের চিরসঞ্চিত বিত্ত আত্মসাৎ করে, তদ্রূপ দুঃখও সুখদ স্বরূপে সম্মানিত হইয়া, আমার আত্মভাবটুকু পর্য্যন্ত চুরি করিয়া লইয়াছে! দেখা যাউক্ এই দুঃখ কি কৌশলে আমাকে ভুলাইল! আগে পাঁচ জন সুদক্ষ কর্ম্মচারী পাঠাইয়াছিল, তাহারা আসিয়া আমার বিকৃতি সংঘটিত করিয়া গেল, আমি আপনহারা হইলাম! তখন দুঃখ আসিয়া দেখাদিল। আমি আপন ইচ্ছায় বিশ্বস্তজ্ঞানে তাহার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলাম! এইত জীবননাটকের পূর্ব্বাংশের কথা। দুঃখ দূর করিতে হইলে, এই দুঃখের মূলীভূত কারণ কয়টীকে চিনিতে হয়। চিনিয়া—জানিয়া—বুঝিয়া রাখিলে আর তাহাদের হাতে পড়িতে হইবেনা। তাহা-দের চাতুরীতে আর আতুর হইতে হইবেনা। গতসর্ব্ব বর্ব্বর অবস্থাকে আর আদরে আলিঙ্গন করিতে হইবেনা। এই পাঁচ জনের আকার, প্রকার, আচার, ব্যবহার, প্রথা, পদ্ধতি বুঝিতে পারিলেই ত চেনা হইল, সুতরাং জিজ্ঞাসা করিতে হয়, ইহারা প্রকৃতপক্ষে কে এবং কিরূপ?

মহর্ষি কপিলাচার্য্য জগতের যাবদীয়

দুঃখরাশি দূরীকরণে কৃতসংকল্প, কাজেই জীবের প্রতি সানুগ্রহদৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক বলিতেছেন,—

পঞ্চ-পর্ব্বা হ্যবিদ্যা ॥১২॥

পাঁচ ভাগে বিভক্ত অবিদ্যাই তাহাদের পাঁচজনের স্বরূপ। এই পাঁচটী প্রকৃতপক্ষে একই পদার্থ, কিন্তু অবস্থাগত পার্থক্য পরিস্ফুট রূপে প্রতীত হওয়ায়, ইহাদিগের ভিন্নভাবে নামকরণের আবশ্যকতা হইয়াছে। পঞ্চপর্ব্বা বলিলে বুঝা যায়, যাহার পাঁচটী পর্ব্ব অর্থাৎ অবান্তরবিভাগ আছে তাহা। এক অবিদ্যাই পাঁচপ্রকার। পর্ব্ব অর্থ অংশবিশেষ, বংশাদির এক একটী অংশকে (যাহাকে চলিতভাষায় ফাঁপ্ বলা হয় তাহাকে) 'পর্ব্ব' বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ বাঁশের একটী ফাঁপ অন্য একটী ফাঁপ হইতে বস্তুগত্যা পৃথক্ হইলেও, উভয়েই সমগ্রবংশের অন্তর্গত অবান্তরঅংশ মাত্র। অবিদ্যা একটীবস্তু, যাহার পাঁচটী ফাঁপ আছে। বাঁশের ফাঁপ যেমন একটীর উপর একটী ক্রমানুসারে বিন্যস্ত, এবং পূর্ব্বাপরীভাবে জাত, অবিদ্যার অংশগত-বিভাগগুলিতেও তাদৃশ পূর্ব্বাপরীভাব অনুভূত হইতে পারিবে।

'অবিদ্যা' আর্য্যদর্শনের একটী জটিল শব্দ। এই শব্দটীর অর্থ লইয়া, বেদান্ত ও সাংখ্যদর্শনের মধ্যে বেশ একটু মতান্তর আছে। বেদান্তমতে 'মায়া' এবং 'অবিদ্যা' একইপ্রকৃতির অবস্থানুগত সংজ্ঞাদ্বয়। শুদ্ধসত্বপ্রধানা প্রকৃতির নাম মায়া, উহা ঈশ্বরের উপাধি; আর মলিনসত্ব প্রধানা প্রকৃতি অবিদ্যা, উহা জীবের উপাধি। মায়োপধিকপরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, অবিদ্যোপাধিক জীব অজ্ঞ বা অল্পজ্ঞ, অনীশ্বর, অল্পশক্তি। উপাধির গুণে এই তারতম্য সংঘটিত হয়। ঈশ্বরের উপাধি মায়াতে সাত্বিকভাব শুদ্ধরূপে বিরাজিত, সুতরাং জ্ঞানের অবাধ-প্রসর্পণ সম্ভব। জীবের উপাধি অবিদ্যার সত্বাংশ মলিন, মৃত্তিকানির্ম্মিত চিম্নীর ন্যায় অবিশুদ্ধ, কাজেই জ্ঞানের আলোক বিস্তীর্ণ হইতে পায় না; এইজন্য জীবেরজ্ঞান অস্পষ্ট। মায়া ও অবিদ্যার এইটুকু বেদান্তে পার্থক্য। এখন আর একটু কথা এই যে, মায়াও অবিদ্যা প্রকৃতির ভাবান্তর। প্রকৃতি অনিত্যা ব্রহ্মশক্তি। বেদান্তের প্রকৃতি ব্রহ্মের শক্তি, কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতি শক্তি নহে। সাংখ্যের পুরুষ চৈতন্যতত্ব অপরিণামী, এবং প্রকৃতি জড়তত্ব পরিণামশালিনী। প্রকৃতি পরিণামিনী হইলেও সাংখ্যমতে নিত্যা, তবে চৈতন্যের ন্যায় কুটস্থনিত্যা নহে। প্রকৃতি সাংখ্যমতে মূল জড়তত্ব দ্রব্য পদার্থ, শক্তি বা গুণ নহে। বেদান্তের ন্যায় সাংখ্যের অবিদ্যা—প্রকৃতির মলিন-সত্বপ্রধান অবস্থা নহে। সাংখ্যে অবিদ্যা অর্থ ভ্রমবুদ্ধি, এক শ্রেণীর বিপর্য্যয় বা বিপরীতজ্ঞান। প্রকৃতি জড়বস্তু, আর অবিদ্যা ভ্রমজ্ঞান, সুতরাং উভয়ের পার্থক্য-ব্যাখ্যার জন্য প্রয়াস পাওয়া বৃথা।

মায়া এবং প্রকৃতি একার্থকশব্দ, এরূপ অনেকগ্রন্থে উল্লেখ আছে। 'মায়া' শব্দ সাংখ্যবাদীরা ব্যবহার করেন না। বোধ হয়, ঐ শব্দ ব্যবহার করিলে তাঁহাদের 'প্রকৃতিকে' অবস্থান্তরে ব্যাখ্যা করিতে

হয়। ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু ভাষ্যে এবং সাংখ্যসারে, পুরাণের বচন তুলিয়া প্রকৃতি ও মায়াকে এক করিয়া, 'মায়া'শব্দ সাংখ্যশাস্ত্রে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি সাংখ্যবেদান্ত মিলাইতে গিয়া ওরূপ করিয়াছেন। সাংখ্যে হিরণ্যগর্ভ মহাশয়কেও আনিতে চাহিয়াছেন। সাংখ্যে রূপকমূলক 'মায়া' শব্দ ব্যবহার না করিয়া আচার্য্যেরা ভালই করিয়াছেন; এখানে তাহা অনালোচ্য।

মোটের উপর সাংখ্যে অবিদ্যাদিপঞ্চকের নামান্তর বিপর্য্যয়। ঐ নামেই ইহাদের যথেষ্টপরিচয় দেওয়া হয়। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচপ্রকার বিপর্য্যয় বা অবিদ্যা। অবিদ্যাদির লক্ষণব্যাখ্যায় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন মত আদৃত হইয়াছে, তাহার বিস্তারপ্রদর্শন এখানে অনেকাংশে অনাবশ্যক ও অসম্ভব। সংক্ষেপে দীপিকাকারমতে লেখা যাইতেছে, 'অবিদ্যা' অর্থ সাধারণতঃ ভ্রমজ্ঞান। অনিত্যে নিত্যতাজ্ঞান অশুচিতে শুচিত্বজ্ঞান ইত্যাদি অযথার্থজ্ঞানই অবিদ্যা। অবিদ্যাপঞ্চকের অন্য পাঁচটী নাম আছে; তাহা এখানে উল্লিখিত হওয়া আবশ্যক। সেইগুলি যথা—তম, মোহ মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র। অস্মিতা বা মোহের লক্ষণ—অষ্টপ্রকৃতিতে আত্মজ্ঞানাভিমান। দীপিকাকার বলেন "অষ্টপ্রকৃতিষু (অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার ও তন্মাত্র ৫, এই, আটটীতে) অনাত্মসু য আত্মজ্ঞানাভিমানঃ স মোহঃ।" রাগ বা মহামোহ—দিব্যাদিব্যভেদে দশবিধশব্দাদিবিষয়ে অনুরাগ। শব্দাদিদশপ্রকার ভোগ্যবিষয় এবং অণিমাদি অষ্টবিধঐশ্বর্য্য, এই অষ্টাদশবিষয়ের ভোগ প্রতিবন্ধকের প্রতি যে বিদ্বিষ্টভাব তাহারই নাম দ্বেষ বা তামিস্র। ঐ অষ্টাদশবিষয়ে অত্যন্ত অভিনিবেশই অভিনিবেশ বা অন্ধতামিস্র। অষ্টাদশবিধ বিষয় আমাদিগের বিনষ্ট না হউক, শত্রুদ্বারা আক্রান্ত না হউক, এই প্রকার ঐশ্বর্য্যবিষয়ভোক্তার অভিনিবেশই প্রকৃত, 'অভিনিবেশ'। মরণত্রাসকেও কেহ অভিনিবেশ বলিয়াছেন। এই পঞ্চ অবিদ্যার স্বরূপনির্ব্বাচনে বিস্তর মতামত আছে। এখানে তাহা উল্লিখিত হইল না। পাঠকমহোদয়গণ! স্বতন্ত্রপ্রবন্ধাকারে সেই বিস্তৃত চর্চ্চা দেখিতে পাইবেন। এখানে এককথায় বলি, পঞ্চবিধ ভ্রমবুদ্ধি উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে মুগ্ধ করে, আমরা অকাতরে ভ্রমের পশ্চাদনুসরণ করিয়া, দুঃখের করালকবলে পতিত হই। পঞ্চ-ভ্রমজ্ঞানই পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যা।

(ক্রমশঃ)

তীর্থপদাশ্রিতস্য কপিলসেবকস্য।
যশোহর বেদবিদ্যালয়।

সংক্ষিপ্ত-সমালোচনা।

হিন্দুধর্ম্মেরপ্রমাণ। শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। পূর্ণবাবু বঙ্গসাহিত্যসংসারে সুপরিচিত ব্যক্তি। তিনি বহুদিন হইতে বঙ্গভাষার দরিদ্রভাণ্ডারে, বহুগবেষণা ও প্রাণপণপরিশ্রমে সংগৃহীত অনেক অমূল্য

রত্ন অর্পণ করিয়া, মাতৃভূমির প্রকৃতপরিচর্য্যা করিয়া আসিতেছেন। কুশিক্ষার কদর্য্য প্রভাবে—আত্মানুসন্ধানের অত্যন্ত অভাবে—আমাদের জাতীয়জীবনের মূলদেশ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে চলিয়াছে; এসময় যিনি জাতীয় আদর্শের উজ্জ্বল উৎকর্ষ দেশের দশের সমক্ষে সমুপস্থিত করেন, তিনি বাস্তবিকই আন্তরিকধন্যবাদের পাত্র। পূর্ণবাবু 'সমাজতত্ত্বে' আর্য্যসমাজের যে গৌরবময় সুরঞ্জিত সম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে সমাজের অসাধারণ উপকার সংসাধিত হইয়াছে। তাঁহার 'দেব সুন্দরী'তে দেবদেবীতত্ত্বের সরল সুযুক্তিপূর্ণ সুন্দর ব্যাখ্যা এবং ভক্তিবাদের গূঢ়রহস্য বিবৃত হইয়াছে। 'হিন্দুধর্ম্মেরপ্রমাণ' তাঁহার সেই সকল গ্রন্থের পরিশিষ্টস্বরূপ,' একথা গ্রন্থকার স্বয়ংই প্রকাশ করিয়াছেন। নামেই গ্রন্থের প্রকৃষ্টপরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুধর্ম্মের অত্যুচ্চনীতি এবং অনুপমমৌলিকতা, তিনি শাস্ত্র এবং যুক্তির সাহায্যে সমর্থন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। প্রধানতঃ—ভারতবাসীর গৌরবস্থল গীতাশাস্ত্রের প্রামাণ্য নির্ণয়, এবং তদ্দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের অলৌকিকতা অসাধারণতা প্রমাণ করিতে গ্রন্থকার প্রয়াস পাইয়াছেন। বেদপ্রামাণ্য এবং বেদমূলকহিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠাপনার্থে পূর্ণবাবু সংক্ষেপে সচেষ্ট হইয়াছেন। যুক্তিরূপ সুদৃঢ়ভিত্তির উপর, হিন্দুর সারময়শাস্ত্রাবলী সংস্থাপিত করিয়া, ধর্ম্মের প্রমাণ নির্ব্বাচন করায় গ্রন্থকার, ধীরতার পরিচয় দিয়াছেন। এখানে এ গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনার স্থান নাই; তবে সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে,—গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণ্যপরিচিন্তনে যে উদ্যম ও অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহা সফলতার সঙ্গী হইতে পারিয়াছে। মুদ্রণ মনোরম, কাগজও ভাল। মূল্য একটাকা চারি আনা। আমরা আশা করি, সমগ্রহিন্দুমণ্ডলী 'হিন্দুধর্ম্মের প্রমাণ' পাইয়া পরিতুষ্ট হইবেন। এ প্রকার পুস্তকের বহুলপ্রচার বাঞ্ছনীয়

রাধিকা। শ্রীললিতমোহন বন্দোপাধ্যায়-বিরচিতা। এখানি কবিতাপুস্তক। পুস্তকে ত্রয়োদশটী কল্প বা পরিচ্ছেদ আছে। শ্রীরাধিকার উক্তিই এ গ্রন্থের স্বরূপ। বিষয় নূতন নহে, নির্ব্বাচনও পুরাতন। অভিসারে, উৎকণ্ঠায়, খেদে, মানে, বিরহে, স্বপ্নাবেশে, তন্ময়ত্বে সকল স্থানেই রাধিকাকে আমরা দেখিয়াছি। বেদব্যাসের মহাপুরাণে আদ্যাশক্তি শ্রীকৃষ্ণময়ী জগন্ময়ী রাধিকাকে আমরা দেখিয়াছি। জয়দেবের 'মধুরকোমলকান্তপদাবলী, পড়িয়াছি। রাধিকা মহাদেবী হইলেও তাহাতে সেখানে মানবীয়ভাবের পরিস্ফুট আধিপত্য; তবে সে ভাব উৎকট আবেগ ও অনুপম আবেশে যেন এক অবচনীয় আনন্দ রাজ্যে লইয়া গিয়াছিল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি মহাপ্রাণ কবির চিত্রিত রাধিকা মূর্ত্তি দেখিয়াছি, সেখানে দেবত্ব ও মানবত্বের, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের, অলৌকিকত্ব ও লৌকিকত্বের দুই প্রবাহ যেন মিশিয়া এক অভিনব সামগ্রী সৃষ্টি করিয়াছে। ললিত বাবুর রাধিকায় দেখিলাম, মানবাকৃতির প্রতি অঙ্গে দেবজ্যোতি। উৎকট কল্পনা বা উদ্দামবর্ণনা দেখিনা, সরল সহজ ভাষায় স্বভাব সুন্দর চিত্রণ। ভাষা একটু মার্জ্জিত হইলে ভাল হইত। পুস্তক খানি কাগজে মনোরম ভাবে মুদ্রিত। উৎকৃষ্ট বাঁধাই, দর্শন করিলেই পড়িতে বাসনা হয়। ইহার বাহ্য শোভা এবং আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্যে সামঞ্জস্য আছে। মূল্য এক টাকা। আদৃত হইলে আনন্দের কথা।

১০ম বর্ষ । কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ । ৭ম ৮ম সংখ্যা ।

১৩২০, ১৯১৩ ।

গ্রাহকগণ ।

বর্ত্তমান বর্ষের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন ।

হিন্দু-পত্রিকা ।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা ।)

শ্রীযুক্ত [illegible] এম, এ, বি, এল

[illegible] সম্পাদিত ।



সূচী ।

যশোহর ।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

শকাব্দা ১৮৩৫ ।

শাণ্ডিল্য-সূত্র।

বা

ভক্তি-মীমাংসা।

ভক্ত-সাধক সমাজের হৃদয়ের ধন শাণ্ডিল্য-ঋষির শতসংখ্যক ভক্তিসূত্র হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল্ মহাশয় কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত এবং মূল সংস্কৃত সূত্র ও স্বপ্নেশ্বরের টীকা-টিপ্পনীসহ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া সুলভ মূল্যে (কাপড়ে বাঁধাই ১॥০ টাকা ও কাগজে বাঁধাই ১৲ টাকা মূল্য) যশোহর হিন্দু-পত্রিকা-কার্য্যালয়ে আমার নিকট বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

Probudha Bharata Almoga, বলেন:—

"The Sandilya Sutra is a very ancient work on Bhakti: both philosophy and practice. Mr. Mozoomdar has translated it beautifully, giving a runing commentary, mostly drawn from Svapneswar, the commentator of Sandilya and explaining difficult passages and references in footnotes. The book is dedicated to Swami Vivekananda and opens with an able and learned introductoin by the translator. It is prettily got up.

Luzac's Oriental Series London বলেন:—

Mr. Jadunath Mozoomdar has translated from the Sanskrit Hundred Aphorisms of Sandilya or Religion of Love. Until recently this side of Indian religious thought has been greatly overlooked, but the publication and translation of the Narada and Sandilya Sutra have lately thrown a flood of light on Bhakti-Marga or the phath of Love. When the Maya or Avidya has been removed from the eyes of Paramahansa, he becomes a Bhakta, odevoted lover of Deity. The difference between Sandilya and Narad is between the monist and the dualist. Whilst the ecstatic devotion of the Dvaitavadi is for Saguna Isvara, that of the Advaitavadi is for Nirguna Brahman. Whether we can always agree with the commentary or not. Mr. Mozoomdar deserves our best thanks for this interesting contribution to the literature of divine love.

The Indian Mirror says:—

The book makes an important addition to the religious publications of the day.

The Tribune says:—

"* * Babu Jadunath has been devoting much of his time and thought to the popular exposition of abstruse Sanskrit works and his facile pen and cultured understanding cast a peculiar glow on all his writing in the department of religious and philosophical enquiry" * *

শ্রীহরিঃ।

(১৮৬৭ সালের ২৫ আইনমতে রেজিষ্টীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১০ম বর্ষ, ১০ম খণ্ড, ৭ম সংখ্যা। | কার্ত্তিক। | ১৩১০ সাল, ১৮২৫ শকাব্দা।

বর্ণভেদতত্ত্ব

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

আর্দ্ধিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালোদাস নাপিতৌ
এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ
মনু ৪ অধ্যায় ২৫৩।

ব্যাখ্যায় পণ্ডিতপ্রবর কুল্লুকভট্ট লিখিয়াছেন। "আর্দ্ধিকঃ কার্ষিকঃ, যো যস্য কৃষিং করোতি স তস্য ভোজ্যান্নঃ, এবং স্বকুলস্য মিত্রং, যো যস্য গোপালো, যো যস্য নাপিতঃ ক্ষৌরকর্ম্ম করোতি, যো যস্মিন্ আত্মানং নিবেদয়তি দুর্গতিরহং ত্বদীয়-সেবাং করোমি তৎসমীপে বসামীতি যঃ শূদ্রঃ স তস্য ভোজ্যান্নঃ।" যে যাহার কৃষি-কার্য্য করে সে তাহার ভোজ্যান্ন। যে যাহার কুলমিত্র, এবং যে যাহার গোপালন করে, এবং যে যাহার দাস ও যে যাহাকে সেবা করে, আর যে আত্ম-নিবেদন করে, এই সকল শূদ্র ভোজ্যান্ন। ব্রাহ্মণাদি তিনবর্ণ পরস্পরের অন্নাহার করিতেন। শূদ্রের মধ্যেও কৃষিকারী, গোপালক, নাপিত প্রভৃতির সহিত ভোজ্যান্নতা থাকার নিয়ম ছিল।

নিয়ম নিতান্ত অন্যায়ও নহে। এই সকল শূদ্রের সহিত ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল, কাজেই এই শূদ্রদের আচার ব্যবহারাদি বিষয়ে ব্রাহ্মণের সাদৃশ্যলাভ বড় অসম্ভব নহে। সুতরাং ইহাদের সহিত ভোজ্যান্নতা দোষের কি? বংশানুক্রমে শূদ্রের সহিত ব্রাহ্মণের মিত্রতা থাকিলে, বস্তুতঃ সেই শূদ্রকে অপর নীচজাতি বলিয়া বিশ্বাস থাকেনা। এদিকে যদি বহু সংসর্গে শূদ্রের অনার্য্যভাব দূরে যায়, তবে তাহার ভাত খাইতে দোষ কি? দেশের অন্ননিয়ম অর্থাৎ একজাতি অপর জাতির অন্ন খাযন্ন,

এই নিয়ম একেবারেই অশাস্ত্রীয়। কেন না, শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিয়ের অন্নে ব্রাহ্মণের দোষ নাই, কিন্তু কোনও ব্রাহ্মণ, এমন কি অন্য বংশীয় ক্ষত্রিয়ও কি ক্ষত্রিয়ের অন্ন-গ্রহণে আপত্তি না করিয়া পারেন? এগুলি সামাজিক বিদ্বেষ বিবাদ প্রভৃতির পরিণাম; শাস্ত্রের সহিত ইহার একেবারেই সম্পর্ক নাই। প্রত্যুত আহারাদি বিষয়ে এতটা সঙ্কীর্ণতার ফলে ব্রাহ্মণেরাই রন্ধনকার্য্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।

ক্ষণজন্মাপুরুষ দয়ানন্দ সরস্বতী বলিতেন, "রন্ধনটা চাকরের কার্য্য, ব্রাহ্মণের কার্য্য অধ্যয়ন অধ্যাপনা। উনুনে ফুঁ দেওয়া কি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য হইতে পারে?" দেশের দশা মন্দ না হইলে, ধর্ম্ম ছাড়িয়া উপধর্ম্মে মন যায় না। এত শুচিবেয়ে হইয়া দেশের হাত পা পেটের মধ্যে গিয়াছে, দেশ এখন অসাড়। গুণ, রূপ, আচার, ব্যবহার, প্রবৃত্তি প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া অনিষ্টকর আহার বর্জ্জন, এবং হিতকর আহার গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ; তাহাতে অশেষ যুক্তি আছে। সম্প্রতি যেটী প্রচলিত, এ নিয়ম অশাস্ত্রীয় এবং অন্যায়। অনেক পণ্ডিত বলেন—মনু-সংহিতার ঐ বচনের অর্থ অন্যরূপ। তাঁহা-দের মতে 'ভোজ্যান্ন' শব্দের অর্থ "তাহার অন্ন ভোজন করা যায়" এরূপ নহে; তাহার "দান গ্রহণ করা যায়" এইরূপ। শূদ্রের প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ আছে; এই শ্লোকে ঐ কয়টী শূদ্রের দান গ্রহণ করিলে দোষ হয় না, ইহাই বলা হইয়াছে। আমরা তাঁহাদের কথায় প্রত্যুত্তর দিতে চাহিনা। কেবলমাত্র সমাজের সাধারণকে জিজ্ঞাসা করিতে চাহি যে, "অমুকের সহিত আমার ভোজ্যান্নতা নাই বা আছে" ইত্যাদি কথায় তাঁহারা ঐ শব্দের কি অর্থ বুঝিয়া থাকেন? "ভোজ্যান্ন" শব্দের ভোজ্য অংশের অর্থ ভক্ষ্য অর্থাৎ ভক্ষণার্হ, আর অন্ন অর্থ অবশ্য আমরা যাহাকে 'অন্ন' বলিয়া থাকি, তাহাই হইবে। ইহাতে বুঝা যায়, যাহার অন্ন খাওয়া যায়, সেই ভোজ্যান্ন।

জাতিভেদের আর একটী কথা—সকলেই স্ব স্ব পৈত্রিক ব্যবসায় অবলম্বন করে। ইহাতে শিল্প পুরুষপরম্পরাগত প্রথাজনিত উৎকর্ষলাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু এই শিল্প চিরদিন সমভাবে চলা সঙ্গত নহে। সময়ানুসারে উহার পরিবর্ত্তন ও উৎকর্ষ-সাধন আবশ্যক হয়। তাহা করিতে হইলে তন্তু-বায় পুত্রকেও বিজ্ঞান শিখিতে হয়, সুতরাং কেবল তাঁত বুনিয়া কাটাইলে, পৈত্রিক কল কৌশল লাভ করিয়াও তাঁতের উন্নতি করিতে পারা গেল না। চিরন্তন প্রথায় শিল্প চালিত হইতে লাগিলে, বিদেশীয়প্রতি-যোগিতার ক্ষেত্রে তাহা আপনা হইতেই অদৃশ্য হইতে বাধ্য হয়। কল কারখানা বৃদ্ধি করিয়া, শিল্পের উন্নতি করিলে দেশের উপকার হয়, নচেৎ শিল্পে অন্নসংস্থানও হইতে পারেনা। ব্যবসায় জাতিবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ রাখা অন্যায়। তাহাতে অন্য লোকে ঐ কার্য্য করিতে লজ্জা, ঘৃণা ও অসম্মান বোধ করে। ঐরূপে ব্যবসায় নিতান্ত হীনাবস্থায় উপস্থিত হয়। ভগবান্ সকলকেই সমান বিদ্যা বুদ্ধি দেন নাই।

চর্ম্মকারের পুত্র ঐ বিদ্যার উপযোগী না হইতেও পারে, আবার অপরের পুত্রও ঐ ব্যবসায়ের যোগ্য হইতে পারে। কোনও ব্যবসায় ঘৃণিত নহে। অন্যদেশে রাজবংশের সন্তানও জুতা সেলাই করিতে সঙ্কোচবোধ বা অপমান জ্ঞান করেনা। যাহা করে, তাহাও কেবল আর্থিক উন্নতির সহিত সম্বন্ধ নিবন্ধন। এদেশের অনেক শ্বেতাঙ্গ জজও পেন্সন্ প্রাপ্তির পরে স্বদেশে গিয়া কুলিগিরি করেন। বিদ্যা-শিক্ষা করিলে আর কেরাণীগিরি ভিন্ন কিছু করা যায় না, এমন নহে। শিক্ষিত ব্যক্তিরা ব্যবসায়ের দিকে লক্ষ্য করিলে সুফল হয়। ব্যবসায় জাতিবিশেষের মধ্যে রাখিতে হইলে. উক্ত জাতির ঐ ব্যবসায়োপযোগী বিজ্ঞান শিক্ষা—এবং কল কারখানা করিতে হইলেও, ঐ জাতিরা একত্রে করিলে, জাতীয় ব্যবসায় রক্ষা করিয়া শিল্প জীবিত রাখা যায়। বস্তুতঃ তাহা সম্ভবপর নহে, সুতরাং ব্যবসায় অনুসারে জাতি পরিচালিত হওয়া অন্যায়। তাহাতে শিল্পনাশই সঙ্গতপরিণাম। যখন বিদেশ রপ্তানী এবং বিদেশীয় রাজা ছিলনা, তখন উহাতে সুবিধা হইত। অধুনা ঐরূপ প্রথা উঠিয়া যাওয়া সঙ্গত। উহার সহিত শাস্ত্রের আদেশের সম্বন্ধ বড় কম, সুতরাং ঐ প্রথা পরিত্যাগ করিলে শাস্ত্র অমান্য করা হইবেনা।

জাতিভেদের দ্বারা দেশের অনেক অপকার সাধিত হইয়াছে। এখন আর ইহা থাকা উচিত নহে; তবে কোনও জাতীয়বন্ধন না থাকিলেও, যে দেশে জাতিভেদ ছিল বা আছে. সে দেশের ভদ্র নাই। সমাজের উন্নতির জন্য একটা যেমন কিছু হউক না, শৃঙ্খলাসম্পাদকবন্ধন সমাজে চাই, তবে তাহা অযৌক্তিক এবং অশাস্ত্রীয় না হয়। একেবারে জাতিভেদ উঠিয়া যাওয়া এদেশের পক্ষে সঙ্গত নয়, আর সহজে ইহা উঠিতেও পারে না। চৈতন্যদেব ও গুরুনানক, আর ব্রাহ্মভায়ারা সকলেই সম্প্রদায়সৃষ্টি ব্যতীত সমাজের জাতিভেদের কিছু করিতে পারেন নাই। কোনও সংস্কারক জাতিভেদের মূলোৎপাটন করিতে পারিবেন, এরূপ ধারণা আমরা রাখি না। তবে দেশের প্রকৃত মঙ্গলের পরিচায়ক—গুণকর্ম্মানুসারীজাতিভেদ প্রচলিত হইলে, দেশের অর্থাগমের—বাণিজ্য-নীতির—কৃষিবিস্তার—জ্ঞান চর্চ্চার—শক্তিসঞ্চয়ের—উপায় উদ্ভাবিত হইবে মনে হয়। তাহাতে কৃতকার্য্য হওয়া, তত কঠিন নহে। দেশের দশজনে যদি যোগ্যতানুসারে কার্য্য করেন, তাহাহইলেই গুণকর্ম্মানুসারে জাতিভেদ রক্ষিত হইল। ইঁহাদের ক্ষোভের কারণও দেখিনা। যদি সমাজের লোকে আপনার মঙ্গল না বুঝেন, ক্ষুদ্রস্বার্থের মোহে দেশের—দশের—নিজের অশেষ সর্ব্বনাশ সাধনও কর্ত্তব্য মনে করেন, তাহা হইলে দেশের পরিণাম—এই অযৌক্তিক জাতিভেদের পরিণাম—এজাতির উচ্ছেদও এদেশের অরণ্যভাব। অনুচিত অধিকার অযোগ্যসম্মান, গুণের অনাদর, আর পাপের প্রশ্রয় যে সমাজে উপস্থিত হয়, সেই সমাজ অচিরে শোচনীয় দশায় উপনীত হয়। ইহা বুঝিয়া, দেশে দেবচরিত্রের পূজা ও অসুরপ্রকৃতির অবমাননা আরম্ভ

করিলে, দোষশোধন এবং গুণ শতগুণে উন্নতিলাভ করিবে; তখন জগৎপূজ্য আর্য্যভাব আবার ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতে লাগিবে। দুর্দ্দিনের আঁধার দূরে যাইবে; আর্য্যভাবের উজ্জলকিরণে দেশ আবার আলোকিত হইবে। নচেৎ স্বার্থ-মোহে, কুশিক্ষার প্রভাবে, অযৌক্তিকতা এবং অশাস্ত্রীয়তাকে যৌক্তিকতা এবং শাস্ত্রীয়তা বলিয়া বিশ্বাস করায়, দেশের দুর্গতি দূর হইবেনা, বরঞ্চ দারুণদুর্দ্দিন সন্নিকৃষ্ট হইতে লাগিবে। অনেকে বলেন—অধঃপতিত সমাজকে বিষসর্পদষ্ট রোগীর ন্যায় বাঁধিয়া রাখাই সঙ্গত, কিন্তু কেবল কি বাঁধিলেই সর্পবিষের চিকিৎসা হয়? শুধু ধূলাপড়ার বাঁধনে কি বিষের রোগী বাঁচে? সঞ্জীবনী শক্তিদ্বারা মন্ত্রপূত শাস্ত্রীয়-গুণকর্ম্মানুগত জাতিভেদের বন্ধনে সমাজকে বাঁধ, দেখিবে সমাজশরীর সবল হইতেছে; ঐ বন্ধন সমাজের গাত্রে অক্ষয়কবচ রূপে শোভা পাইতেছে। শক্তিবলে বিষক্রিয়া অপসারিত হইতেছে। শুধু ধুলাপড়ার, 'মনগুঝান' বাঁধনে রোগীর আসন্নমৃত্যুর পথ আরও অকণ্টক হইবে। বর্ত্তমান জাতিভেদ দেখিয়া, ইংরেজ পুরুষ কি বলিতেছেন, শুন,——

"If it were possible to invent a method by which a few men sent from a distant country could hold such masses of people as the Hindoos in subjection, that method would be the institution of castes. There is no institution which can so effectually curb the ambition of genius, reconcile the individual more completely to his station and reduce the varieties of human character to such a state of insipid and monotonous tameness, and yet the religion (Christianity) which destroys caste is said to render our empire in India more certain. It may be our duty to make the Hindoos christians—that is another argument; but, that we shall by so doing strengthen our empire we utterly deny. What signifies identity of religion to a question of this kind? Diversity of bodily colour and language would soon overpower this consideration. Make the Hiudoos enterprising, active and reasonable as yourselves—destroy the eternal track in which they have moved for ages and in a moment they would sweep you off the face of the earth."

Methodism—Sydney smith
(Edinburgh Review 1809)

বলি—ভারতীয়হিন্দুসমাজ! অযৌক্তিক অশাস্ত্রীয় পাপ জাতিভেদের প্রশ্রয় দিয়া, আর কতদিন নিজের পায়ে কুঠার বসাইবে? জাগ্রত হও। শাস্ত্রীয় জাতিভেদের জন্য প্রস্তুত হও, গুণকর্ম্মের পূজা কর। গুণ দেখিয়া—সামর্থ্য দেখিয়া অধিকার দেও। অধিকার-বিচারে জগতে পূজ্য হইয়াছিলে, আবার অধিকার-বিপ্লবে পদানত ঘৃণিত হইয়াছ। আপন আপন উপযুক্ত অধিকার আশ্রয় কর—যেমন গণ্য ছিলে তেমনি গণ্য

হইবে, যেমন ধন্য ছিলে তেমনি ধন্য হইবে। জগৎমান্য সম্মান পাপের প্রশ্রয় দিয়া হারাইতেছ, আর উদাসীন থাকিও না। গুণকর্ম্মানুসারী জাতিভেদ গ্রহণ কর। যাহা পূর্ব্বপুরুষ করিয়াছেন, তাহাতে মনোনিবেশ কর, নচেৎ তুমি কুসন্তান। পূর্ব্বপুরুষের যৌক্তিক অমূল্য নিয়মরত্নের অধিকারী হইতেও পারিলেনা! আপনার দোষে আপনি মজিলে। তাই বলি—হিন্দুসমাজ! গুণকর্ম্মানুসারে জাতিভেদ স্থাপন কর। ওঁ শান্তিঃ।

শ্রীনির্ম্মলানন্দ ভারতী।
যশোহর।

অদৃষ্ট দেশভেদে জন্মের হেতু।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

১৬। ভারতে দেবগণই অন্নের দাতা। ভারতবাসিগণ অন্য কোন দেশ হইতে খাদ্যদ্রব্য আহরণ করিতে সমুৎসুক নহেন। তাঁহারা নানা জন্তুর মাংস দ্বারা জীবন ধারণ করিতে পারেন না। তাঁহাদের অন্ন, ব্যঞ্জন, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, ফল ও মিষ্টান্ন প্রয়োজন। তাঁহাদের ক্ষেত্র সকল উর্ব্বর থাকিলে ঐ সকল দ্রব্য লাভ হয়। দেবগণই তাহার বিধাতা। সুমধুর বৃষ্টি বর্ষিত হইলেই, শস্য, ফল প্রচুর রূপে জন্মে। গো, মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুগণ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে তৃণপল্লব লাভ করিয়া, কর্ষণাদি কার্য্যে সুপটু হয় ও সুমধুর দুগ্ধ দানকরে। তাহাতে গৃহস্থের ঘর—ধান্য যবাদি শস্যে, আম্র কাঁঠালাদি ফলে, দধি দুগ্ধ ঘৃতে পরিপূর্ণ হয়। ভারতীয় পুণ্যবান গৃহস্থ আপনার গৃহে রাজলক্ষ্মীকে অবতীর্ণ দেখেন। আনন্দে গদ্‌গদ হইয়া প্রত্যেক ঋতুতে তাঁহার পূজা করেন। তিনি দেবদত্ত অন্নে প্রতিপালিত। দেবগণ যাহাতে তাঁহার অন্ন বিধান করেন, এজন্য যজ্ঞের প্রয়োজন। এরূপ ধর্ম্ম সাধন অন্য কোনও বর্ষে নাই। এ ধর্ম্মের সাধন কেবল ভারতবর্ষেরই নিমিত্ত।

১৭। মোক্ষসাধনও অন্য কোন বর্ষে নাই। কেননা, সে সকল বর্ষীয় লোকেরা কেবল ভোগার্থ অর্থ ও কামের সাধনা করেন। লোভবশতঃ অর্থের ও কামের অধিকারে থাকিয়া, তাঁহারা যেমন বেদবিহিত ধর্ম্মাচরণের অধিকারী নহেন; সেইরূপ সর্ব্ববাসনা পরিত্যাগ রূপ, দেহ ও আত্মার বিবেকরূপ, ব্রহ্মৈকাত্মজ্ঞান রূপ মোক্ষসাধনেরও যোগ্য নহেন। সেইজন্য অর্থ ও কামের স্থূল সূক্ষ্ম উপাদান দ্বারা তাঁহাদের সংসার ও মুক্তিস্থান বিরচিত। ধর্ম্ম ও মোক্ষের দ্বারা নহে। কোরাণ, বাইবেল প্রভৃতি শাস্ত্র সকল পড়িয়া দেখ, এই কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবে। প্রকৃত প্রস্তাবে সেই সকল বর্ষে সংসার কেবল অর্থ ও কামোপভোগের স্থান। ধর্ম্মের এবং ধর্ম্মের নিগূঢ় ও অন্তিমতত্ত্বরূপ মোক্ষসাধন বিবেকবৈরাগ্যের স্থান নহে। তথাকার লোকেরা যদিও নিত্য ভগবানের উপাসনা করুন, যদিও তাঁহাদের মধ্যে দয়াদাক্ষিণ্য

গুণের অভাব না থাকুক, কিন্তু বেদাগমবিহিত ধর্ম্মের ন্যায়—দ্রব্যময় অভ্যুদয়ফলসাধন, অথবা নিঃশ্রেয়সঃ ফলপ্রদ জ্ঞানসাধনধর্ম্ম তাঁহাদের মধ্যে ও তাঁহাদের বিধিশাস্ত্রে দৃষ্ট হয়না।

১৮। অতএব এই ভারতবর্ষই কেবল মহামোক্ষ স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনভূমি। এই পুণ্যভূমিতে, উপনিষৎশাস্ত্রসকল, ক্রিয়া ও কামনালক্ষণবিবর্জ্জিতনিবৃত্তিধর্ম্মরূপব্রহ্মজ্ঞান যথাধিকারীর উদ্দেশে উপদেশ করিয়াছেন। এই স্থানেই পরমারাধ্য মহর্ষি ব্যাসদেব, স্বীয় জয়াখ্যব্রহ্মসূত্রে কর্ম্মকাণ্ড হইতে ঐ জ্ঞানের সম্পূর্ণ পার্থক্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এইস্থানেই ঐ জ্ঞানকে মস্তক পাতিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক, মহামহা-ঋষি ও আচার্য্যগণ অনাশ্রমী সন্ন্যাসী হইয়াছেন; এবং কত রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি আশ্রমে তিষ্ঠিয়া আত্মচিন্তা, রাজ্যপালন, এবং লোকশিক্ষার্থ কর্ম্মযোগের যুগপৎ অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব এই পুণ্যস্থানেই উপনিষদের উপদেশ, ব্যাসের মীমাংসা এবং ঋষি ও আচার্য্যগণের বিচার, সিদ্ধান্ত এবং পবিত্র দৃষ্টান্ত—বিদেহকৈবল্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের মহোপকারী উপায় স্বরূপে বিদ্যমান আছে। এরূপ জ্ঞানসাধন এবং তাহার এরূপ উপায় পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নাই।

১৯। এই সকল কারণে সে সকল বর্ষকে ধর্ম্মস্থানরূপকর্ম্মভূমি, এবং আত্মবিদ্যাতে যুক্ত মোক্ষসাধনক্ষেত্র কহিনা। অর্থ ও কাম বিনির্ম্মিত স্থূল ভোগস্থান মাত্র কহি।, তথাকার লোকেরা কেবল আপনারাই অশন, বসন, রাজ-আভরণ আদি সুখভোগ করেন। সে সকল নারায়ণপর দেবগণকে নিবেদন করেন না। যদিও তাঁহাদের শাস্ত্রে ভগবানকে আত্মা, মন, প্রাণ নিবেদন করিয়া দিবার উপদেশ আছে, কিন্তু তাহাও মোক্ষজনক নহে। কেননা, তাহা কেবল স্বার্থের অনুরোধে স্থূল-উৎসর্গের ব্যবস্থা মাত্র। ঐহিক পারলৌকিক সন্ন্যাসের অনুরোধে নহে। স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীররূপ উপাধিত্রিতয় হইতে ভিন্ন আত্মাকে পরমাত্মাতে নিবেদনার্থ নহে। তাহার ফল যেরূপ স্বর্গ ব্যবস্থাপিত আছে, তাহা সূক্ষ্মদেহ ও স্বর্গীয়কলেবর এবং কামরূপ উপাধি দ্বারা বিনির্ম্মিত। তাহাই তাহাদের যথাধিকার মুক্তিস্থান। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে ত্রিবিধদেহ সন্ন্যাসরূপ মোক্ষের যে তাৎপর্য্য লেখেন, উহা সেরূপ মোক্ষের ত্রিসীমায় যায় না। ফলতঃ উহা মোক্ষই নহে। জিজ্ঞাসা করিতে পার, প্রভু যিশুখৃষ্ট কি সন্ন্যাসী ছিলেন না? খৃষ্টিয়ান্‌ধর্ম্মে কি সন্ন্যাস নাই? মুসলমান ধর্ম্মে কি ফকীরি নাই? ইহার উত্তর এই যে, সম্পূর্ণরূপে নাই। ঐ সকল ধর্ম্মে পৃথিবীর সুখসম্পৎত্যাগের নাম সন্ন্যাস হইতে পারে; পার্থিব স্থূলদেহে মমতাত্যাগের নাম সন্ন্যাস হইতে পারে; ধর্ম্মপ্রচারের জন্য প্রাণদান সন্ন্যাস হইতে পারে। তাহার ফল—সূক্ষ্মদেহের সামর্থ্যের উন্নতি ও স্বর্গীয় কলেবর লাভ, এবং তদ্ভোগে অনন্তস্বর্গভোগ হইতে পারে। তদূর্দ্ধ আর ত্যাগ নাহি, আর সন্ন্যাস নাহি, আর সিদ্ধি নাহি। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মানুসারে স্থূলশরীরের ও সাংসারিক-

সুখসম্পদের অতীত ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি বিরচিত সূক্ষ্মদেহ, তন্নিবন্ধন স্বর্গীয়দেহ, এবং সর্ব্বপ্রকার দেহের আদ্য-উপাদান স্বরূপিণী প্রকৃতিরূপ কারণদেহের প্রতি মমতা ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। এই সন্ন্যাসই ঐহিক পারলৌকিক ফল-ভোগ-বৈরাগ্য বলিয়া উক্ত হয়। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার শরীরের ও স্বভাবের জ্ঞান, ধ্যান, মমতা বিদূরিত হইয়া, আত্মার নির্ম্মলতত্ত্বজ্ঞান এবং ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-রূপ পরমজ্ঞান লাভ হইয়া বিদেহমোক্ষরূপ মহাসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহাতে আর সংসার, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ত্রিবিধ-দেহোপাধি, স্বর্গভোগাদি থাকেনা। ইহাই ভারতীয় ধর্ম্মের মোক্ষ, সন্ন্যাস ও আত্মজ্ঞান। সুতরাং অন্যান্য বর্ষ যেমন ধর্ম্মকর্ম্মের ভূমি নহে, সেইরূপ মোক্ষ ও আত্মজ্ঞান-সাধনের স্থান নহে। কেবল অবশিষ্ট দুটী ফল সাধনের ভূমি অর্থাৎ অর্থ ও কাম এবং তদুভয়ের প্রলয়ান্তমুপাশ্রিত ভোগক্ষেত্র। সেই কামভোগে ও অর্থবলে তথাকার নরনারীগণকে আপাততঃ ইন্দ্রতুল্য প্রতাপ বিশিষ্ট বোধ হয়, কিন্তু তাঁহারা গার্হস্থধর্ম্ম-নীতি, ক্রিয়া, আচার, ও বৈরাগ্যহীন। অতএব ভারতবর্ষের ন্যায় পুণ্যস্থান আর নাই।

২০। ভারতের লোকেরা বেদাগম-বিহিত ধর্ম্ম-সাধনে দৃঢ়তররূপে দীক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত। অতিবড় যে অলস ও মূঢ়, সেও পর্ব্বদিনে উৎসাহিত হয়, এবং স্বয়ং অনুষ্ঠানে অপারক হইলেও সরল-অনুষ্ঠাতাকে ভক্তি করে। ভারতবাসীগণের অর্থ ও কাম সমস্তই ধর্ম্মের অধীন। স্বর্গ সেই ধর্ম্মের পুষ্পফলস্বরূপ, এবং মোক্ষ তাহার কূটস্থ অমৃতরস। তাঁহারা যত অর্থ উপার্জ্জন করেন, ভূমি হইতে যত ফল শস্য প্রাপ্ত হন, গাভী হইতে যত দুগ্ধ দোহন করেন, তাহার অধিকাংশ ধর্ম্মার্থে ব্যয় করিয়া থাকেন। ঐ ব্যয়েতে যে পরিমাণ স্বার্থ-ত্যাগ থাকে, তাহা ধীরভাবে ধ্যান করিলেই বোঝা যায় যে, তাহা ভারতীয়ধর্ম্মের মোক্ষ-রূপ প্রাণ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে। ধর্ম্ম-ক্রিয়ার্থ সেইরূপ অর্থাদিত্যাগই অন্তে সমস্ত অবিদ্যাবরণ ভেদপূর্ব্বক মোক্ষপ্রদ-নির্ম্মলবৈরাগ্যকে প্রকাশ করিয়া থাকে। ভারতবাসীগণ ধর্ম্মার্থে যেমন অর্থাদিত্যাগে তৎপর, সেইরূপ ভগবানের পাদপদ্মে স্থান লাভার্থে তাবত্ ফলকামনাত্যাগেও তৎপর। অবলা, বালক, ইতরলোক প্রভৃতি অল্পমেধা-বিশিষ্ট যে সকল ব্যক্তি স্বভাবতঃ ভোগ-কামনাশীল, ভারতে তাঁহারাও ধার্ম্মিক। তাঁহারা যত কামনা করেন, সমস্তই ভগবানের নিকট করিয়া থাকেন, এবং অন্তরেরর নিবেদনসকল, দ্রব্যময়নৈবেদ্য যোগে দেবদ্বারে উৎসর্গ করেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পুরুষকারে ব্রতী, তাঁহারাও "সিদ্ধিদাতা গণেশ" না বলিয়া বিষয়কর্ম্মে অগ্রসর হন না।

২১। ভারতের গৃহস্থধর্ম্মের ন্যায় পরম পবিত্র নিঃস্বার্থধর্ম্ম অন্য কোন বর্ষে নাই। এখানকার প্রত্যেক ভদ্রাসন ভগবানের স্থান। বাস্তপুরুষ নারায়ণ প্রত্যেক বাস্তু-ভূমির অধিষ্ঠাতৃদেবতা। প্রতি গৃহস্থের প্রত্যেক নরনারীর হৃদয়স্থ ব্রহ্মবাড়ী সেই বাস্তভূমি কর্ত্তৃক আকর্ষিত। প্রত্যেক

বাস্তুভূমি পিতৃপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্ব পুরুষগণের অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ। কৃতিসন্তানকর্ত্তৃক পৈতৃকদেবসেবাদি পালন দ্বারা তাহার সার্থক্য হয়। তদ্দ্বারা অধিষ্ঠাতৃদেবতার তুষ্টি এবং পিতৃ ও দেববর্গের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। অন্য কোন বর্ষে এরূপ ভদ্রাসন প্রণালী নাই। ইহার মহাপবিত্র মর্যাদা জানিয়া চিরকাল এবং অল্পদিন পূর্ব্বেও, ভূস্বামিগণ ভদ্রাসনার্থ প্রত্যক ভদ্রগৃহস্থকে প্রচুর পরিমাণে নিষ্করভূমি দান করিয়া আসিয়াছেন। করদান দ্বারা বসতি করা, এদেশের শিষ্টাচার নহে। নিষ্করভূমিতে বাস, কৃষ্যাদি উপায় যোগে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে নিশ্চলভাবে গৃহস্থধর্ম্মসাধন, ভারতের সনাতন শান্তির ধর্ম্ম। কিন্তু অন্যবর্ষীয়দিগের বাসস্থানের স্থৈর্য্য নাই। তাহা কামোপভোগ প্রধান। তাহা বাস্তুদেবতার, পূর্ব্ব পুরুষগণের এবং দৈব ও পৈত্র্যকর্ম্মের অনুরোধে নহে। কিন্তু ভারতের গৃহের টান দেহের অপেক্ষাও অধিক। তাহা অটল—তাহা সকলতীর্থের সার। স্বর্গাদপিগরীয়সী মাতৃভূমি। বাস্তুত্যাগে ভারতে মঙ্গল ও শান্তিলাভ হয় না। বাস্তুত্যাগে পূর্ব্বপুরুষ গণের স্থাপিত দেবসেবাদি রহিত হইয়া যায়। তাঁহাদের নাম লুপ্ত হয়। দেবদেবীর অর্চ্চনা দ্বারা পুরুষানুক্রমের বাস্তুভূমিতে যে পীঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, নবনব প্রবাসে তাহা সম্ভবে না। অন্যান্য বর্ষে বাসের সহ ভগবানের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু আমাদের বাস—দেব, পিতৃ ও অতিথি লইয়া।

২২। ভারতীয় গৃহস্থগণের সমস্ত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ ভগবানে ও ভগবতীতে অর্পিত। প্রত্যেক ভদ্রগৃহস্থ স্ব স্ব ভবনের উৎকৃষ্ট ও উন্নতস্থান শ্রীহরিকে ও চণ্ডিকাদেবীকে নিবেদন করিয়াছেন। তথায় যথানিয়ম প্রতিদিন বা পর্ব্বকালে, ত্রিসন্ধ্যা শঙ্খঘণ্টানিনাদ ও গন্ধপুষ্পনৈবেদ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন। তথায় আবালবৃদ্ধ বনিতা, ইতর ভদ্র, সকলেই স্ব স্ব অধিকারানুসারে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষের উপযাচক হন। তথায় বালকগণ বিদ্যা প্রার্থনা করে; স্ত্রী, স্বামীর হিত প্রার্থনা করেন; মাতা পিতা সন্তানের আয়ুঃ, আরোগ্য, যশঃ, বল, বীর্য্য প্রার্থনা করেন; ভারগ্রস্থ গৃহপতি পোষ্যবর্গপ্রতিপালনার্থে ধন ধান্য প্রার্থনা করেন; এবং বৃদ্ধেরা সংসার তাপ হইতে ত্রাণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। অতএব ভারতবাসী দিগের কামনাসমস্ত সরস-ভাগবতীভক্তি-দ্বারা চর্চ্চিত। তদ্ভিন্ন—পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মোক্ষসাধনে তাঁহাদের নিগূঢ় লক্ষ্য। এরূপ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের ভাব অন্য কোন বর্ষে নাই। কেবল অবিশ্রান্ত ভোগ ও ভোগার্থে পুরুষকার তথাকার নিয়ম।

২৩। ভারতীয় ভদ্রব্যবহার সমস্তই দেবার্থ। তাঁহাদের উপাস্যদেবদেবীগণ সকলেই ব্রহ্মপর। যে পঞ্চভূত লইয়া তাঁহাদের নিত্য ব্যবহার, সে সমস্তই দেবতা। তাঁহাদের দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণ দেবতা। স্মৃতিশক্তি, মেধাশক্তি, ধৃতিশক্তি, গতিশক্তি, গ্রহণশক্তি, রতিশক্তি, অগ্নিশক্তি প্রাণনশক্তি প্রভৃতি সমস্তই দেবতাত্মিকা। কিছুই স্বকীয় ও স্বার্থের নিমিত্তে নহে।

সমস্তই দেবধাম। ইঁহাদের কূপ, বাপী, রাজপথ, বৃক্ষ, পান্থশালা, বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা—দেবার্থপূর্ত্তকর্ম্ম। স্বার্থ ও যশের জন্য নহে। ইঁহাদের বিবাহ ঈশ্বরার্থ ধর্ম্ম-সংস্কার। সন্তানোৎপত্তি পিতৃ-ঋণপরিশোধার্থ, এবং পুত্রজন্ম পুন্নামনরকনিবারক; কামার্থ নহে। ইঁহাদের স্নান, ভোজন, পান, আচমন, নিদ্রা, জাগরণ, উপার্জ্জন—সকলই ঈশ্বরার্থে। সকলি স্বার্থশূন্য সুধাময় ও পবিত্র। ইঁহারা জলে স্থলে পর্ব্বতে ব্যোমে সমীরে গোধনে শস্যভাণ্ডারে ধনাগারে দেবাধিষ্ঠাতৃত্ব দর্শন করেন। সর্ব্বত্রই নারায়ণপর দেবাবির্ভাব দর্শন করতঃ অন্তঃকরণ ভগবদ্ভক্তিতে সদা পরিপ্লুত করিয়া রাখেন।

২৪। অতএব যাঁহাদের জন্মান্তরের পুঞ্জ পুঞ্জ সুকৃতি থাকে, তাঁহারাই ভারতক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা ভারতে জন্মগ্রহণ করিলেই সমস্ত বেদবিধি, সমস্ত দেবগণ, সমস্ত ব্রাহ্মণকুল তাঁহাদের ভাগ্যকে আরো প্রসন্ন করিয়া থাকেন। সাংসারিক বলবীর্য্য ও বিত্তবিভবহীন হইলেও, তাঁহারা একমাত্র ধর্ম্ম ও বৈরাগ্যের প্রভাবে সকলের নিকট আদর লাভ করেন। মহারাজা হরিশ্চন্দ্রের দুরবস্থার একশেষ হইলেও, তাঁহাকে ইন্দ্রাদি দেবগণ পরমাদর করিয়াছিলেন। রাজ্যভ্রষ্ট বনবাসী মহারাজা যুধিষ্ঠিরকে সকলেই ধন্য ধন্য কহিত। সে দিনও রাজা রামকৃষ্ণ, লালাবাবু ও রাজা রাধাকান্ত দেব বৈরাগ্য অবলম্বন করায় আজও সকলে ধন্য ধন্য বলিতেছেন। আবার একটু উত্তর-পশ্চিমে গিয়া দেখ, বৃক্ষমূলবাসী সন্ন্যাসীগণের পদতলে হিন্দুস্থানের রাজাদিগের শিরোমুকুট লুণ্ঠিত হইতেছে। সন্ন্যাসীগণের কিছুরই অভাব নাই বলিয়া, সকলেই তাঁহাদিগকে 'মহারাজ' বলিয়া করযোড়ে সম্বোধন করিতেছেন।

২৫। কেবল ধর্ম্ম ও বৈরাগ্যই ভারতে ধন্য। তাহাই লাভের নিমিত্তে ভারতে জন্মগ্রহণ। সর্ব্বপ্রকার শোক-মোহ-দুঃখ-দারিদ্র্য-মোচনই তল্লাভের ফল। এখানে জন্মলাভ, ইহুদী ও পারসীদিগের ন্যায় ধনকুবের হইবার নিমিত্তে নহে। মুসলমান ও ইউরোপীয়দিগের ন্যায় বিষয়বিস্তার সেবা ও কামনা ভোগের নিমিত্তেও নহে। যাঁহারা তাদৃশ তামসিক বা রাজসিক যক্ষবৃত্তি বা কামোপভোগের অভিলাষী, কেবল বিষয়সেবায় এবং দম্ভ-মান-মদে উন্মত্ত, তাঁহারা এই সন্ন্যাসধাম ভারতে জন্মিয়া কি করিবেন? সুতরাং তাঁহারা তত্তদুপাদানে বিরচিত ভাগ্যগুণে অন্যান্য বর্ষে বা সমাজে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন; তথাকার ধর্ম্মশাস্ত্র ও সামাজিক নিয়ম দ্বারা শাসিত হন এবং স্ব স্ব ভাগ্যানুসারে তথাকার উপযুক্ত ভোগোপভোগ করিয়া থাকেন।

২৬। যদিও এখন ভিন্নবর্ষীয় অনেক লোক ভারতে আগমন ও বাস করিতেছেন এবং ভারতে তাঁহাদের বংশে অনেক পুত্র কন্যা জন্মগ্রহণ করিতেছে; কিন্তু তাদৃশ আগমন, বাস বা জন্ম হিন্দুসমাজের বহির্ভূত এবং তাঁহারা ভারতীয় ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-বিধায়ক শাস্ত্র সকলের শাসনাধীন নহেন। সুতরাং ভারতে জন্মগ্রহণের যে ভারতধর্ম্মজন্য পবিত্র ফল, তাহাতে তাঁহারা

বঞ্চিত এবং তাঁহারা তদুপযোগী অদৃষ্ট-বিরহিত। অনেক হিন্দুসন্তানও বিজাতীয় ধর্ম্ম ও আচারের অনুগামী হইয়াছেন। তাদৃশ ব্যক্তিরাও ভারত-মাতার ত্যাজ্য-পুত্র স্বরূপ। অতএব তাঁহারাও ভারতে জন্মগ্রহণের যে শুভ ফল, তাহার অধিকারী নহেন।

২৭। ফলে একথা বলায় দোষ নাহি যে, ভিন্নবর্ষীয় যে সকল লোক ভারতের জ্ঞানধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া এখানে আসিতেছেন, তাঁহাদের ভাগ্য অপেক্ষাকৃত প্রসন্ন হইয়াছে; কিন্তু যে সকল হিন্দুসন্তান হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দু-আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করতঃ বিজাতীয় ধর্ম্ম ও আচারাদি অবলম্বন করিতেছেন, অথবা স্বকপোল-কল্পিত ধর্ম্ম ও স্বেচ্ছাচার গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের অদৃষ্ট অতি মন্দ। কেননা তাঁহারা ভারত-জননীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহার হৃদয় স্বরূপ শাস্ত্র ও জ্ঞান-ধর্ম্মের অপমান করিতেছেন এবং সেই মহাপাপকার্য্যে কৃতকার্য্য হইবার জন্য তাঁহাদের বিজাতীয় ভ্রাতাগণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই উভয় প্রকার ব্যক্তিগণের অদৃষ্টসমষ্টি পরস্পর মিলিত হইবার নিমিত্তে কলিযুগের অপেক্ষা করিতেছিল। এখন উত্তরোত্তর তাহা বৃদ্ধি হইতে চলিল। তাঁহাদের এই মহাপাপের ফল যে অধোগতি, তাহা তাঁহারা কিয়ৎপরিমাণে এই জন্মেই অনুভব করিবেন। গৃহে ও মনে শান্তি পাইবেন না; সংসার-ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিবার জন্য সর্ব্বদা নব নব নিয়ম ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইবে; এবং দৈবাৎ দরিদ্রতা ও মূর্খতা উপস্থিত হইলে, সুসভ্য বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মে তিষ্ঠিয়া থাকা কঠিন হইবে।

২৮। এই সকল হিন্দুসমাজ-বহির্ভূত হিন্দু-সন্তানগণ প্রায়ই বিজাতীয় গুরুদিগের মতানুবর্ত্তী ও পক্ষপাতী। তদনুসারে তাঁহারা ভারতীয় রূপ, নাম, বিশেষণ ও প্রতিমা-অবলম্বিত নানা দেবদেবীর পূজাকে বহু ঈশ্বরের উপাসনা, জড়োপাসনা ও পৌত্তলিকতা বলিয়া ঘৃণা করেন এবং আপনাদের নবীন অশাস্ত্র ব্রহ্মোপাসনাকে এক অদ্বিতীয় নিরাকারের উপাসনা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে সে উপাসনা ন্যূনকল্প সগুণব্রহ্মোপাসনাও নহে; কেননা তাহা দ্বৈতরহিত আত্মবিদ্যাতে যুক্ত নহে; এবং উচ্চকল্পের নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনাও নহে; কেননা তাহা অদ্বৈত পরমতত্ত্বস্বরূপ আত্মজ্ঞানের অনুশীলনবিরহিত। যেরূপ বৈরাগ্য উদিত হইলে, দেহ-ইন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিরূপ উপাধি বিগত হইয়া সকল আত্মার বীজস্বরূপ পরমাত্মাতে অদ্বয় আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হয়, সে জ্ঞান তাঁহাদের জন্মে নাই এবং সে আত্মজ্ঞানের অনুশীলন রূপ নিরুপাধিক সাধন ও শাস্ত্রসিদ্ধ নিরাকারব্রহ্মোপাসনা তাঁহাদের মধ্যে নাই। তাহার নাম করিলে, তাঁহারা তাহাকে ঘৃণার সহিত 'অদ্বৈতবাদ' বলিয়া তুচ্ছ করিয়া থাকেন। তাঁহারা আপনাদের বিদ্যা ও সভ্যতাভিমান চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত যে ঈশ্বরোপাসনা বা ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা ভারতশাস্ত্রের অনুমোদিত ব্রহ্মোপাসনা নহে। তাহা আত্মবিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যাতে সংযুক্ত নহে। ব্রহ্মজ্ঞানের সহ তাহার

ছন্দাংশ নাই। তাহা একপ্রকার মনোবৃত্তি-রূপ ভক্তিলক্ষণা খৃষ্টীয়-ঈশ্বরোপাসনা মাত্র। তাহা ঠিক নিরাকারের বা ঠিক একেশ্বরের উপাসনা নহে। কেননা তাহাতে উপাধি-ত্যাগের এবং অদ্বয়ব্রহ্মবিদ্যার লক্ষণ নাই।

২৯। অতএব তাঁহারা আপনাদের ভ্রমের প্রতি অন্ধ। তাঁহারা 'পৌত্তলিক' অপবাদ দিয়া কর্ম্মযোগ ত্যাগকরতঃ দেবতা-হত্যা করিয়াছেন। আত্মবিদ্যার সম্পর্ক উঠাইয়া দিয়া, শাস্ত্রীয় সগুণব্রহ্মোপাসনা ত্যাগ করতঃ তপস্যার হিংসা করিয়াছেন, এবং অদ্বৈতবাদের ভয়ে ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ আত্মজ্ঞানকে হেয় করিয়া আত্মঘ্ন হইয়াছেন। এইরূপে ভারতীয় কর্ম্ম-ব্রহ্ম উভয় হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, তাঁহারা অশাস্ত্র-ব্রহ্মবাদাভিমানে আমোদিত হইয়াছেন। তাঁহারা ইহা ভাবেন না যে, শাস্ত্রীয় আত্মজ্ঞান ব্যতীত কোন মতেই আকার ও উপাধির হাত ছাড়াইবার যো নাই। কেননা তাঁহাদের শরীর সাকার, ইন্দ্রিয়গণ সাকারনিষ্ঠ, মনোবুদ্ধি সাকার-ভাবনাতৎপর। এসকল উপাধি ও আকার-রাজ্যে বৈরাগ্য না জন্মিলে, নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা—অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অনুশীলন কিরূপে সম্ভবে? এবং কোন্ বুদ্ধিতেইবা তাঁহারা হিন্দু-দিগকে বহু ঈশ্বরের উপাসক, সাকার-উপাসক ও পৌত্তলিক অপবাদ দিতে পারেন? সেরূপ অপবাদ সম্পূর্ণ অযোগ্য। পরমারাধ্য মহেশ্বর-কৃত অসংখ্য তন্ত্রশাস্ত্রে এবং মহর্ষি ব্যাসকৃত অষ্টাদশ পুরাণে, উপাসনার অধিকারে, যে কর্ম্মযোগলক্ষণা প্রতিমাপূজা, ব্রহ্মজ্ঞানে আরোহণের সোপান রূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে যাঁহারা হেয় ও তুচ্ছ করেন, তাঁহাদের উক্তি কথনই গ্রাহ্য নহে।

৩০। খ্যাতনামা আকবর নরপতির পরমজ্ঞানী মন্ত্রী আবুলফজল উক্ত নরপতির আদেশে বিস্তর উপনিষৎ শাস্ত্র পারস্যভাষায় তরজমা করাইয়াছিলেন এবং তৎসমূহের মর্ম্ম উত্তমরূপে অবগত হইয়া, স্বীয় "দবেস্তান" নামক গ্রন্থে হিন্দুদিগের একেশ্বরনিষ্ঠা ও প্রতিমাপূজার মহৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে ১৮১০ খৃষ্টাব্দে জেনেরল ষ্টুয়ার্ট নামক একজন বৃটিশ সেনাপতি স্বরচিত "হিন্দুপক্ষসমর্থন" গ্রন্থে এইরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন—

Abulfazle that enlightened minister of a great and enlightened monarch, Akbar, the glory of Eastern potentates thus speaks of the Hindoos, "They one and all believe in the unity of the God-head: and although they hold images in high veneration yet they are by no means Idolators, as the ignorant suppose. (General Stuarts vindication of the Hindoos P. 47. 1810 London.)

ইহার অর্থ এই।—পৃথিবীর পূর্ব্বাঞ্চলের সম্রাটগণের গৌরব স্বরূপ মহাপ্রতাপশালী এবং পরমজ্ঞানী আকবর নরপতির মহা-জ্ঞানী মন্ত্রী আবুলফজল হিন্দুদিগের সম্বন্ধে এইরূপ কহেন।—"তাঁহারা প্রত্যেকে এবং সকলে পরমেশ্বরকে এক এবং অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করেন; এবং যদিও তাঁহারা প্রতিমাতে মহাশ্রদ্ধা করেন, কিন্তু তাঁহারা

কোনমতে পৌত্তলিক নহেন—যাহা মূর্খেরা মনে করিয়া থাকেন।" এই মোটা কথাটা ভারতের গর্ভজাত নব্যেরা বুঝিতে পারিতেছেন না, ইহা তাঁহাদের দুরদৃষ্ট ও কলির প্রভাব।

৩১। কিন্তু যদিও শাস্ত্রে আছে যে, কলিযুগ প্রাপ্ত হইলে সমস্ত জগৎ ম্লেচ্ছীভূত হইবে, তথাপি নিরাশ হইবার কারণ নাই। কেননা শাস্ত্রে আবার ইহাও আছে যে, সকল দেবতার অভিন্নরূপ একমাত্র যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরির স্মরণ, নামকীর্ত্তন ও সেবা দ্বারা এবং যজ্ঞাদি যে কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করা যায়, তাহা তাঁহার পাদপদ্মে অর্পণ করিলেই কলিযুগে শুভাদৃষ্ট ও মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ধর্ম্মার্থীগণ তাঁহার উদ্দেশে ব্রত-পূজা-হোম-যাগাদির অনুষ্ঠান করিবেন; এবং মোক্ষার্থীগণও তাঁহার বিশ্ববিজয়ী ত্রিলোক-মোহন মকরন্দ-পূরিত পদারবিন্দে সমাধিগ্রহণ করতঃ, লোকশিক্ষার্থ বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দেবদেবীর অর্চ্চনা সকল আচরণ করিবেন। এইরূপ শুভানুষ্ঠানেই কলির অবান্তর উপদ্রব সকল, উৎপত্তিপতনশীল জলবুদ্বুদের ন্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হইবে। ভগবান মনু (১২।৯৬) স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন—

"উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানি কানিচিৎ
তান্যর্ব্বাক্কালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ॥"

যে সকল মত বেদমূলক নহে, লোকের বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন, তাহা উৎপত্তিমাত্রেই বিনষ্ট হয়। সে সমস্ত অমূলক ও ইদানীন্তন নিবন্ধন নিষ্ফল এবং অনৃত। এখন বেদাগমবিহিত হিন্দুধর্ম্ম প্রচুররূপে ভারতের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হইলেই অশাস্ত্র-মতসকল অদৃশ্য হইয়া যাইবে।

৩২। অতএব ভয় নাই! জাগ্রত হও, উৎসাহ ধর, কৃপণতা পরিহর, কটিবন্ধন কর, বিলাতী সভ্যতারূপ অভিমান দূর কর, এবং ঘরে বাহিরে হিন্দুধর্ম্মের মন্ত্রদীক্ষা—পূজাশিক্ষা প্রচার কর। ঘরে ঘরে নারায়ণের সেবা এবং সম্ভাবিতদিগের গৃহে দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, দোলযাত্রা প্রভৃতি মহামহা যজ্ঞানুষ্ঠান প্রচার কর। তোমাদের উদ্যোগে গুরু, পুরোহিত, অধ্যাপক, পৌরাণিক ও জ্যোতিষীগণের মঙ্গলকর ব্যবসায়ের উন্নতি হউক; গৃহাঙ্গনারা যজ্ঞের আয়োজনে বিব্রত হউন; যজমানগণ শ্রদ্ধা, বিনয়, দয়া-দাক্ষিণ্য গুণে অলঙ্কৃত হউন, এবং তোমাদের উৎসবোপলক্ষিত সুপবিত্র আনন্দময় ভবনের বাদ্যোদ্যম, নৃত্য, গীত, যাত্রা তোমাদের কুটুম্ব ও বন্ধুগণ—বালক-বালিকা ও মহিলাগণ পরম সুখে দর্শন ও শ্রবণ করুন। দরিদ্রগণ উৎসবনিকেতন হইতে অন্ন, বস্ত্র প্রভৃতি লাভ করতঃ উভয় হস্তোত্তলন পূর্ব্বক তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। হে সাধো! যদি বহুপুণ্যফলে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তবে তাহার সার্থক্য সম্পাদন কর। তুমি মৃত্তিকা বা পাষাণের ন্যায় অচেতন পদার্থ না হইয়া যে চেতন পদার্থরূপে জন্মিয়াছ, তজ্জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ কর। কীট-পতঙ্গ-পশু-পক্ষী না হইয়া যে মানবকুলে জন্মিয়াছ, সেজন্য সেই বিধাতাপুরুষকে নমস্কার কর। অন্য বর্ষে না জন্মিয়া যে এই পুণ্যভূমি ভারতে

জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রণাম কর। ইতরকুলে না জন্মিয়া যে ভদ্রবংশে আসিয়াছ, সে জন্য তাঁহাকে পুনশ্চ প্রণাম কর। বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব দেহ লইয়া যে ব্রাহ্মণকুলে ভূমিষ্ঠ হইয়াছ, তাহার হেতু স্বরূপ আপনার সুকৃতি ও ভগবানের ফলদাতৃত্ব স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বার বার প্রণাম কর। তাঁহার মহাপূজার্থ যজ্ঞাদি দেবার্চ্চনা এবং মোক্ষপ্রদ আত্মজ্ঞানের—ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা আপনার জন্ম সার্থক কর। (ক্রমশঃ)

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু।

সাংখ্যের ঈশ্বর।

জগতের সর্ব্ববিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই কোনও না কোনও প্রকারে ঈশ্বরবিশ্বাস বিদ্যমান আছে। বিশ্বাসের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া, কোনও ধর্ম্মপথের পথিক জলদগম্ভীরঘোষে বলিতে পারেন না, 'ঈশ্বরবিশ্বাসের জন্য আমার হৃদয়ক্ষেত্রে একটুও স্থান নাই।' সাদৃশ্য সূচক সমঞ্জস ভাষাবিচার—অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন বাদীর ভিন্নভাবের চিন্তার, ব্যাকুলতার, ও বিষাদের—অবসন্ন আশ্রয় স্বরূপে সর্ব্বত্রই 'ঈশ্বর'কে নির্দ্দেশ করিতে চির প্রস্তুত। কিন্তু যখন পদার্থবিজ্ঞান সম্মিলন বা সামঞ্জস্যের ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া, ভাষা বিচারের অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া, কেবল যৌক্তিকতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, তখন ভিন্ন বাদীর চিন্তাস্রোতের—বাদবিবাদ প্রবাহের—চরমলক্ষ্যের, সার্ব্বত্রিক সমতা সংস্থাপন করিতে পারেনা। দার্শনিক সমাজে সুতরাং একই নামে পরিচিত পদার্থের স্বরূপ সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে সমান হয় না। এই কথার মিলে যে পদার্থের প্রভেদ প্রণষ্ট হয় না, তাহা সাম্প্রদায়িক লোকের লোচনে প্রতিভাত হয়, কিন্তু সমদর্শীর সম্মুখে সম্ভব নয়। ভেদে অভেদদর্শনই সমদর্শিতার মূল সূত্র। কাজেই নিপুণ নয়নে হৃদয় নিহিত অভেদগ্রন্থের প্রতিচ্ছায়া যিনি অবলোকন করেন, তিনি, বাহ্যিকবস্তুরূপ বিভিন্ন হইলেও, তজ্জন্য অন্তঃকরণে অল্প মাত্র অবকাশ দিতে পারেন না। সমদর্শীর সম্বন্ধে বাদী প্রতিবাদীর চিন্তাচর্চ্চা বৃথা, কারণ বাদ বিবাদের ক্ষেত্র তাঁহার অনেক দূরে অবস্থিত। এ প্রবন্ধে কপিলদেবের কথা বলিব। অন্যকথা অবান্তর বা আগন্তুক আলোচনার অংশতঃ পরিপোষকরূপে গৃহীত হইবে।

God বা আল্লা ইত্যাদি নামে অভিহিত অন্য ধর্ম্মের 'ঈশ্বর' তর্কস্থলে আর্য্যশাস্ত্র প্রতিপাদিত ঈশ্বরের সহিত মিশিয়া যাইতে পারেন না; তবে শেষ আলম্বন স্বরূপে গৃহীত হওয়ায়, উদ্দেশ্যগতভাবে অনেকটা একরূপ। আর্য্য আস্তিক ষড়্দর্শনের মতভেদের বিবেচনা করিলেও, অনেক সময় এই ভাবের আভাষ পাওয়া যায়।

অশেষসূক্ষ্মতত্ত্বজ্ঞ আচার্য্য অক্ষপাদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহার মততত্ত্ব বহুল বিস্তৃত, এবং বিপুল গবেষণাপূর্ণ হইলেও, সংক্ষেপে তিনি 'জগৎকর্ত্তা' ঈশ্বরের কথা বলেন। তন্মতে এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড—

অনন্ত জীবজাত সকলই ঈশ্বরেচ্ছাপ্রসূত। কর্ম্মচক্রের প্রবৃত্তিকারণ অদৃষ্ট। অদৃষ্ট অস্বতন্ত্র; অদৃষ্টযন্ত্রের অধিষ্ঠাতা সর্ব্বজ্ঞানতেজোময় সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর। অদৃষ্ট দ্বারাই জাগতিক তাবৎ কার্য্যকারণভাবের সুন্দর ব্যাখ্যা হইতে পারে, কিন্তু অদৃষ্টের স্বতঃ শক্তি নাই; ঈশ্বরাধিষ্ঠিততা বশতঃ তাহার কার্য্যজনন সামর্থ্য।

কুসুমাঞ্জলিকার প্রতিভার অবতার উদয়নাচার্য্য—অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা রূপে ঈশ্বরের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে অদৃষ্টবাদ বিচার কেবল ঈশ্বরসিদ্ধির ভূমিকারচনা রূপ বলা যাইতে পারে। উদয়নাচার্য্য ঈশ্বরসত্তাকে স্বতঃসিদ্ধ সামগ্রী বলিয়া বিশ্বাস করেন। কুলগোত্রাদির ন্যায় চিরদিন স্বানুভবসিদ্ধ পরমেশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহই হইতে পারেনা। প্রমাণাদি দ্বারা ঈশ্বরাস্তিত্বসংস্থাপনপ্রয়াসকে তিনি 'মনন' বলেন। প্রকারান্তরে ঈশ্বরাস্তিত্ব বিচার ঈশ্বরোপাসনাই হইয়া দাঁড়ায়, এই জন্য তিনি সুপ্রসিদ্ধানুভব ভগবানের অস্তিত্বে যুক্তি দিয়াছেন।

বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরের নামোল্লেখ নাই বটে, কিন্তু অদৃষ্টনিরূপণ দর্শনে অনুমান করা যায়,—ঈশ্বরসত্তার স্বাভাবিক আবশ্যকতানুভব বশতঃ, উহা স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসে, পদার্থপ্রতিপাদনপ্রসঙ্গে মহামহিম মহর্ষি কণাদ তাহার উল্লেখ করেন নাই। ন্যায় বৈশেষিকের দার্শনিকভাগে সামঞ্জস্য আছে। সাংখ্য পাতঞ্জলের যেমন তাবৎ তত্ত্বই একসূত্রে সংগ্রথিত, ন্যায় বৈশেষিক উভয় দর্শনেরও প্রতিপাদ্যাংশে তদ্রূপই সম্মিলন দৃষ্ট হয়। পরমাণু সামগ্রী, অদৃষ্ট যন্ত্র, জীবজগৎ কার্য্য—অবশ্য অধিষ্ঠাতা কর্ত্তার আবশ্যকতা আছে; সুতরাং বৈশেষিকে অদৃষ্ট রূপ গুণপদার্থের উল্লেখ করায় ঈশ্বরেরও কথা অন্য প্রকারে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে অগ্রসর হওয়ার কারণ, বৈশেষিকে ঈশ্বরপ্রতিষেধ পরিদৃষ্ট হয় না।

বেদান্তদর্শনবিরচয়িতা বিশ্বমান্য মুনি বাদরায়ণ—ঈশ্বরের অস্তিত্ববিচারে 'বেদকর্ত্তৃত্ব'ই যুক্তি বা উক্তির মূলরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অশেষজ্ঞানগরিমানবগাহ নানাতত্ত্বপ্রভব বেদশাস্ত্র জগতের এক অপূর্ব্ব সামগ্রী; এই বেদের—এই অনন্ত জ্ঞানরত্নের আকরস্থান পরমেশ্বর। তিনি শাস্ত্রের যোনিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ নিরুপাধি চৈতন্যপদার্থের সত্ত্বপ্রধান মায়োপহিততা প্রযুক্ত ঈশ্বরত্ব সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বিকাশপ্রাপ্ত হয়। বেদান্তে মায়োপহিত চৈতন্য ঈশ্বর। মায়া সত্ত্বগুণাধিকা। সত্ত্বাংশপ্রাবল্য বশতঃ উহা নির্দ্দোষ স্বচ্ছ উপাধি। সুতরাং পরিষ্কৃত চিম্‌নীর সম্পর্কিত আলোকের রশ্মি যেমন শতধারায় উৎসারিত হয়, তদ্রূপ সাত্ত্বিকোপাধিমায়ার সম্পর্কযুক্ত চৈতন্যস্বরূপের চিৎস্বভাব শতধা সংমূর্চ্ছিত সংগৃহীত হইয়া, সর্ব্বজ্ঞত্বের স্বরূপ সংগঠিত হয়। বেদান্তবাদে জগৎ ভ্রমমাত্র; বাস্তব অস্তিত্ববিহীন, অজ্ঞানের আবর্ত্ত বই আর কিছু নয়। অজ্ঞান বা অবিদ্যা জগদ্ব্যাপারের মূলে থাকিলেও, ঈশ্বরকে সে প্রসঙ্গে একেবারে পরিত্যাগ করা হয় নাই। স্বাতন্ত্র্য ঈশ্বরেই দেওয়া হইয়াছে। সংকল্প স্রষ্টা

ব্যাপার নিষ্পাদন রূপ মহৈশ্বর্য্যেও তাঁহাকে ভূষিত করা হইয়াছে। জগৎসর্জ্জনে ঈশ্বরেচ্ছার আধিপত্য প্রদান করিতে বৈদান্তিক বিবাদ করেন না। সংক্ষেপতঃ এই স্থানেই আমরা এ বিষয়ে বিশ্রাম লইব।

সাংখ্যশাস্ত্রের ঈশ্বরাসিদ্ধিই এ প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য। প্রথমে ঈশ্বর অস্বীকারের যাহা পন্থা, তাহার আলোচনা করা দরকার। জগতের রচয়িতা পরমেশ্বর, এই জগতের দ্বারাই প্রমাণিত হইতে পারেন, ইহাই যুক্তির প্রথমাংশ। জগতের রচনাপ্রণালী অনুসন্ধান করিলে অবগত হওয়া যায়, এই জগৎ-সাংযোগিক সামগ্রী। কতকগুলি উপাদান দ্রব্যের নানাভাবের সংমিলন সংকলনেই, জগতের বক্ষে নিত্য নব নব পদার্থ আবির্ভূত হইতেছে। সূক্ষ্ম চক্ষে নিরীক্ষণ করিলে, ইহা হইতে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম আবিষ্কৃত হইতে পারে। এই সমস্ত নিয়মের সহায়তায় জড়বিজ্ঞান সতত জগন্নির্ম্মাণের ব্যাখ্যা করিতেছে। একমাত্র পরিণতি বা বিকাশের সাহায্যে, সংযোগ, বিভাগ, গতি, সংস্কারাদি ক্রমপরম্পরায় অনবরত জগতে অসীম পদার্থ প্রকাশিত হইতেছে। এক পদার্থ বহু পদার্থ সম্মিলনবলে সাংযোগিক ফলে অন্যরূপ পরিণতি প্রাপ্ত হইতেছে। এই সকল রহস্য অবগত হইলে, মানব ইহার ভিতর দুইটী পদার্থ দেখিবেন। একটী পরিণমমানা জড়সত্তা, আর একটী অধিষ্ঠাতৃ চেতনসত্তা। এই জড় চিৎ, বা পুরুষ প্রকৃতি লইয়া, জগৎসৃষ্টির ব্যাখ্যা করাই সাংখ্যকারের উদ্দেশ্য। একজন সুবুদ্ধি সুবিবেচক ব্যক্তির উপর ইহার কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিতে সাংখ্যশাস্ত্র প্রস্তুত নহেন। তাঁহাদের মতে—এই জগৎ কাহারও বুদ্ধি, বিবেচনা বা চিন্তা, কিম্বা ইচ্ছার ফল নহে। চিৎসংযোগে জড়ে বিকৃতি বা ক্ষোভ উপস্থিত হইয়া, সংরক্ষিণী শক্তিকে জড়ের কেন্দ্রস্থান হইতে অপসারিত করিলে, জড় অন্য আকার ধারণ করে—পরিণত হয়, ইহা স্বানুভবসিদ্ধ। প্রতিমুহূর্ত্তে জগতে এই পরিণতির প্রবল তরঙ্গ বহিতেছে; কিন্তু কোথাও জড়ে চিৎসত্তার সমাবেশ ব্যতীত অন্যভাব অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ বা বহুজ্ঞের চিন্তা, ইচ্ছা, বা চেষ্টার আবশ্যকতা অনুভব হয় না।

সাংখ্যশাস্ত্র বলেন, জগৎ সৃষ্টি অর্থাৎ জড়ের প্রকারান্তর পরিণতি, বা বৃদ্ধি প্রভৃতি বিকারভাব সংসাধিত হইতে, কেবল চিৎ-সমাবেশ চাই। বীজ বৃক্ষে পরিণত হইতেছে। স্বভাব, কাল উহাকে পরিবর্ত্তিত করিতেছে। রসাকর্ষণ পরিণমন প্রভৃতি এক একটা সোপান—উহা প্রাকৃত নিয়মেই অতিক্রম করিতেছে; কিন্তু কৈ কর্ত্তা ত দেখিনা। জগৎ দেখিয়া, রীতি আবিষ্কার পূর্ব্বক তাঁহারা জগৎ সৃষ্টি ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রকৃতিপুরুষযোগে সৃষ্টিনিষ্পত্তি হয়, এজন্য ঈশ্বরকল্পনার অবকাশ সাংখ্যশাস্ত্রে দেখা যায় না।

সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন,—"ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞাদি-প্রভৃতি, সুতরাং তাঁহার কার্য্য জ্ঞানীর ন্যায় হইবে। আমরা জ্ঞানীর কার্য্য প্রবৃত্তি বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাই, তাহার অভ্যন্তরে দুইটী উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। একটী স্বার্থ সম্পাদন প্রয়াস, অন্য করুণার্দ্র হৃদয়ের আবেগ। কোনও জ্ঞানীর কার্য্য,

কখনও স্বার্থশূন্য বা কারুণ্যবিহীন হইতে পারে না। এখন ভাবিয়া দেখি, ঈশ্বর সৃষ্টি করেন কেন? অবশ্য বলিতে হইবে, হয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য, না হয় ত হৃদয়ের কারুণ্যস্রোত প্রবল হওয়ায়। আমরা দেখিতে পাই, উক্ত উভয় কারণেই বর্ত্তমান জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে না। স্বার্থ অসম্পূর্ণতার আত্মীয়। অভাবের আহ্বানে স্বার্থপ্রবৃত্তি প্রথম জাগরিত হয়। যদি জগদীশ্বরের এই জগতের দ্বারা স্বার্থ সাধন করিতে হয়, তবে তাহা তাঁহার ঈশ্বরত্বসিদ্ধির অনন্ত অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। স্বার্থ, আকাঙ্ক্ষার অনুগামী, আপ্তকাম সর্ব্বেশ্বরের তাহা আসিতে পারে না। দরিদ্র ঈশ্বর নহে, অক্ষয় ভাণ্ডারই ঈশ্বরের লক্ষণ। আর একটী কারুণ্য;—তাহাও এই দুঃখদহনজ্বালামালা-সঙ্কুল সংসারের উৎপত্তির অনুকূল নহে। ঈশ্বর কাহার প্রতি করুণা করিবেন? বলিতে হইবে, সংসারতাপদগ্ধ জীবকুলের প্রতি। এখন মনে করা যাউক্, জীবসৃষ্টির পূর্ব্বে আর জীব নাই, সুতরাং করুণার পাত্রাভাবে করুণাও নাই। তখন সৃষ্টি অসম্ভব। আবার জীবোৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণের মত পরক্ষণেও করুণাবির্ভাব নিস্প্রয়োজন। কারণ, তখন ত জীবসৃষ্টি হইয়াই গিয়াছে। আর একটী কথা সৃষ্টির পরে করুণোদয় বলিতে হইলে, সৃষ্টির কারণরূপে ঈশ্বরের করুণাকে গ্রহণ করা গেল না। কারণ কার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, পশ্চাদুৎপন্ন নহে। সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবাভাবে দুঃখাভাব; এভাবে সহানুভূতি-মূলক করুণাবির্ভাব সম্ভব নয়। আরও দেখা যায়, যদি করুণাবশতঃ পরমেশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন, তবে দুঃখময় জগৎ সৃষ্টি অস্বাভাবিক। দুঃখদর্শনে করুণার উদ্রেক; সেই করুণা-বলে সুখময় জগৎ সৃষ্ট হওয়াই অধিক সম্ভব এবং সঙ্গত। যদি বলা যায়, জগৎ প্রবাহরূপে অনাদিকাল হইতে বিদ্যমান, জীবভাবও চিরন্তন। এক একবার প্রলয়াক্লিষ্টবসানে, নিস্পিষ্ট জীব-কুলের ক্লেশমূল ছেদনের জন্য ঈশ্বর সৃষ্টি করেন। জীবের অদৃষ্ট অর্থাৎ পূর্ব্বসর্গের কর্ম্মসূত্র তাহাকে এমন ভাবে বদ্ধ করে যে, সে আপনা হইতে সুখের পথ ছাড়িয়া দুঃখের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। এ কথার প্রত্যুত্তরে বক্তব্য—জীব চিরন্তন হইলে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন কি? জীব আছে; কর্ম্ম আছে; কর্ম্মফল জীবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান রহিয়াছে; আর আছে ভোগায়তন নির্ম্মাণের উপকরণ সামগ্রী জড়তত্ত্ব। সবই যদি থাকিল, তবে এগুলিকে মিশাইতে গুছাইতে ঈশ্বর লাগিবে কেন? কর্ম্ম, আপনি মিশাইবে। স্বভাব ও কাল তাহার সাহায্য করিবে। চৈতন্য অধিষ্ঠিত রহিবে। জড়ে আপনিই পরিবর্ত্তন সংমিশ্রণ উপস্থিত হইবে। জগতে সতত আমরা এরূপ উদ্বর্ত্তন দর্শন করিতেছি; ঈশ্বরের এ বিষয়ে আবশ্য-কতা কোথায়? কর্ম্ম ফলের অনিবার্য্য প্রভাবে, অদৃষ্টের অসীম ক্ষমতায়, জগতের যে বৈচিত্র্য দুঃখ দারিদ্র্য ঘটিবে, জীবকুল যদি অদৃষ্টের আকর্ষণে তাহাই অনুমোদন করে, এবং ঈশ্বর তাহাতে 'ডিটো' দিতে থাকেন; তবে তাঁহার ঈশ্বরত্ব কেমন? অপ্রতিহত ইচ্ছাশক্তি না থাকিলে, অদৃষ্টের পশ্চাৎগামী পরমেশ্বর কেবল 'কথায় ঈশ্বর'।

যদি অদৃষ্টই তাঁহার ইচ্ছার অনুরূপ হয়, তবে তিনি কখনও দুঃখবিনাশোদ্দেশে জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন নাই। বস্তুতঃ কাহারও ইচ্ছায় সৃষ্ট হইলে, সে ইচ্ছার অধীশ্বরে অনেক অসম্পূর্ণতা আছে।

কাঁচের বাসনপূর্ণ গৃহে অজ্ঞ বালককে ছাড়িয়া দিয়া, সে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, পরে তাহাকে কঠোর দণ্ড বিধান—যেমন নিজেরই দোষ ঘোষণা করে, তদ্রূপ অজ্ঞ জীবগণকে স্ব-ইচ্ছায় সংসারের প্রলোভন মধ্যে পাঠাইয়া, তাহাদের অপরিহার্য্য দোষের শাস্তি দেওয়া, পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশে অসমর্থ। যতই আলোচনা করা যায়, ততই বুঝা যায়, এজগতের কর্ত্তা কেহ থাকিলেও, তিনি জ্ঞানসাগর গুণসাগর নহেন। প্রকৃতপক্ষে জগৎ-সৃষ্টিতে কর্ত্তা-ই চাইনা।

আর একটু চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, মানবের স্বাধীনতা, এবং ঈশ্বরেচ্ছা-পরতা—এই দুইটীর একত্র সমাবেশের স্থানাভাব। হয়—জীব স্বাধীন ইচ্ছায় কর্ম্ম করে, পাপ করে, সমদর্শী ঈশ্বর শাস্তি দেন। নয়—জীব ঈশ্বরেচ্ছার অধীন হইয়া কার্য্য করে, ইহার একরূপ বলিতে হইবে। জীবের স্বাধীনতা থাকিলে, আর ঈশ্বরের দরকার নাই। কেননা, জগৎসৃষ্টিতে ঈশ্বর অনাবশ্যক। পাপপুণ্যফলপ্রদানের কর্ত্তা হইয়াও, যদি তিনি পাপেচ্ছার নিবৃত্তি করিতে অনিচ্ছুক বা অপারগ হন, তবে তিনি দণ্ডদাতাই বা কিরূপে হইবেন? ন্যায়পরায়ণ শাস্তা কুকর্ম্মকারীকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করেন। অজ্ঞাতসারে বোধ হয় জীব কিছু করিতে পারে না, কারণ তাহাতে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্বব্যাঘাত হয়। যদি জানিয়া—দেখিয়া—পাপাচরণপ্রবৃত্ত জীবকে তিনি নিষেধ না করেন, এবং শেষে উচিত বিচারও করেন; তবে অজ্ঞাতসারে তিনি পাপে অনুমোদন করিয়া, পশ্চাতে উচ্ছৃঙ্খল ক্ষমতা পরিচালন দ্বারা নিজের ঈশ্বরত্ব কলঙ্কিত করেন, এবং প্রচ্ছন্নভাবে সমদর্শিতার অনাদরও করেন ইত্যাদি।

ঈশ্বর না থাকিলেও, মানুষ ঈশ্বরের কল্পনা করিতে বাধ্য হয়। যখন নিজের ক্ষুদ্র-শক্তি প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষুণ্ণ অকর্ম্মণ্য দেখে, তখন মানুষের মন আশ্রয়ভরসাবিহীন হইয়া, বৃহৎ বা মহৎ শক্তির দ্বারা নিজেকে অভিভূত মনে করে। আমি অজ্ঞতা-বশতঃ একটী কার্য্যে অপারগ হইলাম। মনে করি, পরমেশ্বরের ইচ্ছা দ্বারা আমার এই কার্য্য বাধাপ্রাপ্ত হইল। বস্তুতঃ উহা আত্মাপরাধ ভিন্ন কিছু নহে। পূর্ব্বে অনেক কার্য্য লোকে ঈশ্বরানুগ্রহপ্রসূত বলিয়া মনে করিত, পরে জগতের বয়োবৃদ্ধি এবং জ্ঞানপরিপাকের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝিতে পারিয়াছে, তাহা স্বেচ্ছায় সর্ব্বদা সংসাধিত হইতে পারে। অজ্ঞতা বা অল্পশক্তি অব-সন্ন হইলেই, লোকের মনে ঈশ্বর বা সম্পূর্ণ-অগাধজ্ঞানশক্তির চিন্তা উদিত হয়; বস্তুগত্যা ইহা অজ্ঞতার স্বভাব। সামাজিক সমুন্নয়নের সঙ্গে এই নির্ভরভাব অনেক অল্প হইয়াছে। যখন মানুষ সম্পূর্ণতা লাভ করিবে, তখন দেখিবে, আর ঈশ্বর বিশ্বাসের দরকার নাই। এখন বলা যাইতে পারে, মানুষ নিজের সদ্‌গুণগুলিকে অনন্ত অসীম রূপে কল্পনা করিয়া তাহা দ্বারা 'ঈশ্বর'

সৃষ্টি করিয়াছে। জগৎসৃষ্টি ঈশ্বর করেন নাই। 'ঈশ্বর' মানবকল্পনাসৃষ্ট কাল্পনিক-সদ্‌গুণের কল্পনাময়মূর্ত্তি মাত্র।

মানুষের জ্ঞান, ক্ষমতা, ইচ্ছা, ক্ষুদ্র; মানুষ বাধ্য হইয়া মহৎজ্ঞান, অনন্ত-ক্ষমতা, ও অবাধ-ইচ্ছাময় একজনকে কল্পনা করিয়া, সেই জ্ঞান, ক্ষমতা, ইচ্ছার দ্বারা, নিজেদের অজ্ঞতা মূঢ়তা ইত্যাদি শত দোষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে চেষ্টা করে। সকলেই দোষক্ষালন করিতে যত্নবান্ হয়, এ উদ্যম জীবে স্বাভাবিক। দোষ আর কোথায় দিব, কেহই গ্রহণ করিতে সম্মত নয়! সুতরাংই "ঈশ্বরের অবাধ-ইচ্ছা আমার কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে দেয় নাই, আমি নিরপরাধ। ঐশীশক্তিবলে আমার ক্ষুদ্রচেষ্টা সংযত হইয়াছে, আমার দোষ নাই" বলিয়া মানুষ শান্তিলাভ করে। এরূপ না করিলে, মানব অশান্তির প্রবল অনলে অনবরতঃ দগ্ধান্তঃকরণ হইয়া, হয়ত শেষে আত্মহত্যা করিতে বাধ্য হয়; এজন্য অনেক নীতিবাদীও ঈশ্বর স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তবে সে কেবল—কথার কথা।

আমরা দেখিয়াছি, সাংখ্যকারের মতে সৃষ্টিতে ঈশ্বর চাই না। সামাজিকভাবে একটা পেশাদারী ঈশ্বর স্বীকারেও ফল নাই।

জগতের উৎপত্তি—বিনাশ--ইহার কোনওটী মীমাংসকমতে স্বীকৃত নয়। ঈশ্বরের দুই প্রমাণ- জগৎসৃষ্টি এবং বেদ-রচন। জৈমিনি দুটাই 'না' বলিয়াছেন। জৈমিনিমতে জগতের উৎপত্তি নাই, বিনাশও তথৈবচ। "ন কদাচিদনীদৃশং" জগৎ কখনও অনীদৃশ হইবার নহে। ঈদৃশ ছিল, আছে, থাকিবে। আংশিক পরিবর্ত্তন হইলেও, মোটের উপর হ্রাসবৃদ্ধি নাই, কারণ ইহার উপকরণ দ্রব্য বাড়িতে বা কমিতে পারেনা। সুতরাং জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর জৈমিনির মতে অসম্ভব, বেদকর্ত্তাও তাই। বেদ তাঁহার মতে নিত্য, তাহার কর্ত্তাকরণের উপযোগিতা কি? জৈমিনি কর্ম্ম, এবং অপূর্ব্ব বা অদৃষ্ট—অর্থাৎ কর্ম্মের সূক্ষ্মাবস্থা দ্বারাই কার্য্য বা বিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা করেন।

পতঞ্জলি মহোদয় যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরাস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। "ক্লেশকর্ম্ম বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" এই পাতঞ্জল সূত্রে—দুঃখ-কর্ম্মফল-চিন্তাদি-পরিহীন পুরুষ বিশেষের কথা বলা হইয়াছে। আমরা দুঃখী, কর্ম্মবদ্ধ, ফলসম্বদ্ধ সান্তঃকরণ জীব। আমাদের—দুঃখশূন্য, নিষ্কাম, ফলসম্বন্ধবিহীন দুঃখপ্রভৃতিচিন্তশূন্য একজন মহাপুরুষকে ঈশ্বররূপে কল্পনা করাই সঙ্গত। পতঞ্জলি স্বয়ং এই ঈশ্বর পুরুষের জগৎকর্ত্তৃত্বাদি বলেন নাই। আমরা যোগসাধনের চিত্তস্থিরীকরণের আলম্বন রূপে ঈশ্বরকে গ্রহণ করিতে পারি, এ কথা বলিয়াছেন। "ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা" এই সূত্রে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ঈশ্বর যে ব্রহ্মাদিরও গুরু, অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ জীবগণেরও উপদেষ্টা, এ কথাও "স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ * * *" ইত্যাদি সূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। জগৎসৃষ্টিতে ঈশ্বরের আবশ্যকতা বোধ হয় পতঞ্জলিও দেখেন নাই। টীকাকারগণ বলিয়াছেন, "প্রকৃতি পুরুষ সংযোগস্ত ঈশ্বরেচ্ছাধীনত্বাৎ" প্রকৃতিপুরুষযোগে সৃষ্টি,

কিন্তু ঐ সংযোগ ঈশ্বরেচ্ছাধীন। এ কথা সাংখ্যনয়ে স্বীকৃত নহে, তাঁহাদের মতে সম্পূর্ণ অসম্ভব। যে মতেই হউক, জ্ঞানোপদেশক বা জগৎস্রষ্টা যেরূপই হউন, যোগশাস্ত্রে ক্লেশাদিশূন্য পুরুষ ঈশ্বর।

সাংখ্য দ্বিবিধ—কাপিল এবং পাতঞ্জল। কাপিল সাংখ্যে ঈশ্বর অস্বীকৃত, পাতঞ্জল সাংখ্যে স্বীকৃত। এখন বলা যাইতে পারে, সাংখ্যশাস্ত্রে ঈশ্বর স্বীকার আছে। জগৎস্রষ্টা না থাকিলেও জ্ঞানোপদেষ্টা আছেন।

কাপিলসাংখ্যে জগৎস্রষ্টার বিরুদ্ধে বহু যুক্তি আছে, তাহার প্রণালী সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। প্রথমতঃ—সাংখ্যের মূল গ্রন্থ তত্ত্বসমাসে ঈশ্বরের নাম নাই, সে গ্রন্থে তত্ত্বোপদেশই আছে। ঈশ্বর উপাসনকাণ্ডের সামগ্রী, তাহা সেখানে না থাকা দোষাবহ নহে, যেহেতু ঐ গ্রন্থে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুক্তি নাই।

দ্বিতীয়তঃ—সাংখ্যপ্রবচনে প্রথমাধ্যায়ে প্রত্যক্ষপ্রমাণাধিকরণে "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" "মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্নতৎসিদ্ধিঃ" "উভয়থাপ্যসৎকরত্বং" "মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা" এই কয়টী সূত্রে ঈশ্বরাস্তিত্বে দোষার্পণ করা হইয়াছে। প্রত্যক্ষপ্রমাণনিরূপকসূত্রে "সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষানুভবের" কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে প্রধানতঃ দুটী আপত্তি। একটী এই যে, যোগীগণ প্রয়াগে বসিয়া, ৺কাশীধামস্থ বিশ্বেশ্বরের মূর্ত্তিদর্শন করিতে পারেন, এবং ভবিষ্যৎ ও অতীতবৃত্তান্ত দেখিতে পান; এখানে বিষয়েন্দ্রিয়ান্তঃকরণসম্বন্ধ কিরূপে সংস্থাপিত হইতে পারে? আর একটী এই যে, ঈশ্বর সদা সর্ব্ববিধ প্রত্যক্ষ অনুভব লাভ করিতেছেন, তিনি নিত্যপ্রত্যক্ষশালী, কিন্তু তাঁহার ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদি অসম্ভব। অতএব প্রত্যক্ষলক্ষণের "যৎসম্বন্ধংসৎ" অর্থাৎ 'ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজন্যত্ব' কথাটা যোগিপ্রত্যক্ষ এবং ঈশ্বরপ্রত্যক্ষে উপযুক্ত হইতে পারে না। এখানে বলা হয়, যোগিগণের প্রত্যক্ষ মানসপ্রত্যক্ষ বা অলৌকিকপ্রত্যক্ষ। তাঁহারা বাহ্য-দর্শী নহেন, সুতরাং তাঁহাদের প্রত্যক্ষে আমাদের লক্ষণের 'সন্নিকর্ষজন্যত্ব' না থাকিলে হানি কি? যোগিপ্রত্যক্ষের আর একটী উত্তর এই যে, যোগফলে তাঁহাদের মনের এমন একটী সামর্থ্য আবির্ভূত হয়, যাহাতে তাঁহারা দূরস্থ, গৃহাভ্যন্তরস্থ, ব্যবহিত—এমন কি অতীত, অনাগত ও সূক্ষ্মভাবের বস্তুতে পর্য্যন্ত চিত্তসন্নিকর্ষ প্রাপ্ত হন। সুতরাং আমাদের নয়নে অসন্নিকৃষ্ট হইলেও, ঐ সকল প্রত্যক্ষবস্তুতে যোগিদের মনঃসংযোগ ঘটিতে পারে বলিয়া, প্রত্যক্ষলক্ষণে 'সন্নিকর্ষজন্যত্বের' কথা বৃথা হয় নাই। এই দুইটী উত্তর দ্বারা যোগিপ্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ লইয়া বিবাদের মূলোচ্ছেদ করা হইল, কিন্তু ঈশ্বরপ্রত্যক্ষের কথা উপস্থিত হইলে, একেবারে ঈশ্বরাস্বীকার ঘোষণা করা হইল—"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ"। ঈশ্বর-প্রত্যক্ষে গোলযোগ, সে ঈশ্বরই প্রমাণসিদ্ধ নহেন। যদি ঈশ্বর অস্তিত্বশূন্য হন, তবে ঈশ্বর-প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষজন্যত্ব সম্ভব নয়, এ তর্কের মূল্য থাকে না। এখানে প্রত্যক্ষলক্ষণের 'সন্নিকর্ষজন্যত্ব' বজায় রাখিতে গিয়া, প্রতিবাদীকে নিরুত্তর করাই আবশ্যক হইল।

ঈশ্বরপ্রতিষেধ যে কাপিল-সাংখ্যে

অভিপ্রেত, একথা ভাষ্যকার বিজ্ঞানাচার্য্য স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—এক কথায় বাদীনিরাস করাই উদ্দেশ্য। ঈশ্বর অস্বীকার করিতে হইলে, 'ঈশ্বরাভাবাৎ' সূত্ররচনা দরকার হইত। বিজ্ঞানাচার্য্য যাহাই বলুন, আমাদের মনে বড় ভাল বোধ হয় না। যোগীর প্রত্যক্ষে উপায় করা হইল, ঈশ্বরপ্রত্যক্ষে কি গত্যন্তর ছিলনা? ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিত্য, আর লক্ষ্যপ্রত্যক্ষ—জন্য। জন্যের কারণচিন্তা বা উৎপত্তিচর্চ্চা করিতে গেলে, তন্নামধারী নিত্যপদার্থটী আশ্রয়সমেত সংচূর্ণিত করিতে হয়, ইহা কি সঙ্গত কথা? যোগীর বেলা—সর্ব্বপদার্থে যোগজসামর্থ্যে সন্নিকর্ষ সম্ভব হইল, আর সর্ব্বসামর্থ্যের অগাধ-সমুদ্রস্বরূপ ঈশ্বরের সময়—"নিত্য-প্রত্যক্ষের লক্ষণনির্ব্বাচন আমাদের উদ্দেশ্য নহে, জন্য-প্রত্যক্ষই লক্ষ্য, সুতরাং নিত্যপদার্থে জন্যবস্তুর লক্ষণ সমন্বিত হইল না, ইহা দোষের কি?" এই কথা টুকু বলিবার সুবিধা হইল না? ইহা কি ঈশ্বরের অস্তিত্বে অভিসন্ধিমূলক অস্বীকার নহে?

এইখানেই বিশ্রাম নহে—আবার দেখুন, "মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবাৎ ন তৎসিদ্ধিঃ।" সাংখ্যমতে চেতনের নাম পুরুষ। যদি ঈশ্বর কেহ থাকেন, তবে তিনি কি মুক্ত-পুরুষ না বদ্ধপুরুষ? পুরুষ দ্বিবিধ—মুক্ত ও বদ্ধ, অন্যরূপ অসম্ভব। ঈশ্বর মুক্ত হইলেও জগৎস্রষ্টা হইতে পারেন না, বদ্ধ হইলেও সম্পূর্ণ অপারগ হওয়া সঙ্গত। কপিল বলিতেছেন, "উভয়থাপ্যসৎকরত্বং।" যদি ঈশ্বরকে মুক্ত-পুরুষ মনে করা যায়, তবে বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডরচনা কার্য্যে তাঁহার অনুরাগ থাকিতে পারে না, কারণ মুক্তিতে সর্ব্ববাসনাবিনিবৃত্তি সংঘটিত হয়। মুক্ত-পুরুষ কার্য্যকারণতরঙ্গরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইতে অঙ্গীকার করেন না। ঈশ্বরকে বদ্ধজীব বলিলে, তিনি জগজ্জননসামর্থ্যশূন্য, ইহাও মানিতে হয়। বদ্ধজীব অল্পজ্ঞ। নিজের শান্তির পথ যে খুঁজিয়া পায় না, অন্ধকারে অন্ধ হইয়া বসিয়া আছে, সে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-শক্তি জগদীশ্বর হইতে পারে না; অতএব ঈশ্বরাস্তিত্ব উভয়পক্ষেই অসিদ্ধ।

এখানে একটী তর্ক—যদি ঈশ্বর না থাকেন, তবে অভ্রান্তবেদবাণীর গতি কি? "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্যজ্ঞানময়ংতপঃ" ইত্যাদি অশেষ বেদবাক্যের উপায়? শুধু বেদ কেন? স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি তাবৎ শাস্ত্রবাক্যই কি বন্ধ্যাপুত্র বা আকাশকুসুমের কল্পনায় ব্যতিব্যস্ত? কপিল বলিতেছেন—তাহা নয়, "মুক্তাত্মনঃ প্রশংসা উপাসাসিদ্ধস্য বা।" শাস্ত্রোক্ত ঈশ্বরপ্রতিপাদক বাক্যাবলী, মুক্তাত্মা এবং সিদ্ধপুরুষগণের প্রশংসা বাক্যমাত্র। মুক্তি হইলে দুঃখদারিদ্র্য কর্ম্ম-পারতন্ত্র্য সকলই ঘুঁচিয়া যায়, তখন সেই পুরুষকে ঈশ্বর বলা যাইতে পারে। অল্পজ্ঞতা বা ভ্রম দূরে গেলে, তাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলা যাইতে পারে। সিদ্ধমহাত্মাদেরও ঈশ্বররূপে নির্দ্দেশ করা যায়। 'মুক্তাত্মা' মহর্ষিমণ্ডলী, 'সিদ্ধাত্মা' বলিতে হরিহরহিরণ্যগর্ভাদি গ্রাহ্য। ইহাদের মুক্তভাব ও সিদ্ধভাবের প্রশংসা করিয়া, মুক্তির দিকে অগাধ ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া, মানবমন আকর্ষণ করাই উদ্দেশ্য। ঐ-

সকল বাক্যের আভ্যন্তরীণ তাৎপর্য্য মুক্তি ও ঔপাসনশক্তিতে নিহিত।

পাঠক মহোদয়গণ ! এই একস্থানে নহে, পঞ্চমাধ্যায়ে একক্রমে একাদশটী সূত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্বে আপত্তি, অদৃষ্ট বা কর্ম্মাধিষ্ঠাতৃরূপে ঈশ্বরসিদ্ধিতে দোষারোপ, ঈশ্বরে অনুমান প্রমাণের অযোগ্যতা বা অসদ্ভাববর্ণনা, প্রকৃতি হইতে জগৎসৃষ্টির সমর্থন এবং তাহার শ্রৌতপ্রমাণোল্লেখ ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধি ভয়ে সেগুলি উদ্ধৃত এবং ব্যাখ্যাত হইল না। কাপিলসাংখ্যপ্রবচনের পঞ্চমাধ্যায়ে—দ্বিতীয় হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ সূত্র পর্য্যন্ত পাঠ করিলে, ইহার রহস্য অবগত হইতে পারিবেন। কপিল যে বিশেষ আগ্রহ, এবং নির্ব্বন্ধের সহিত ঈশ্বরপ্রতিষেধে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এখন একটী কথা - কপিল মুক্তাত্মা বা হিরণ্যগর্ভাদি সিদ্ধাত্মাকে 'ঈশ্বর' নামে অভিহিত করিতে অনিচ্ছুক নহেন। তিনি নিত্য-ঈশ্বর মানেন না, জন্য-ঈশ্বর স্বীকার করেন। সাংখ্যপ্রবচনের তৃতীয়াধ্যায়ে, জন্য-ঈশ্বর সম্বন্ধে "ঈদৃশেশ্বরসিদ্ধিঃ সিদ্ধা" বলিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। উপাসনায়, যোগে যাগে, ঐশ্বর্য্যলাভ করা যাইতে পারে। মুক্ত হইলে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইহাও স্বীকার করা যায়। ইহার অতিরিক্ত অনাদি নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর তাঁহার মতে নাই। বুঝিলাম—কপিল ঈশ্বর মানেন, তবে নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বর মানেন না।

পতঞ্জলি নিজে ঈশ্বরের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহার ভাব সুন্দর রূপে অবধারণ করা যায় না। তিনি ঈশ্বরাস্তিত্বে সন্দেহ করেন না, যুক্তি তর্কও নাই। কেবল ঈশ্বরের পরিচয় দিয়াছেন। সে পরিচয় কৈবল্যপ্রাপ্ত পুরুষেরই স্বরূপ। তবে আদিমুক্ত এক পুরুষই সেই ঈশ্বরত্বের দাবী করিতে পারেন। টীকাকারগণ যাহাই বলুন, পতঞ্জলির ঈশ্বর এবং আদিমুক্ত জীব একই রূপ বোধ হয়। কপিল মতে ঈশ্বরত্ব জন্য, সুতরাং একত্বাবধারণ সেখানে সহজ সাধ্য নহে, এইটুকু বিবেচনা ও চিন্তার বিষয়। কপিল নিজে আদিবিদ্বান্, স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান ঐশ্বর্য্য লইয়া তিনি আবির্ভূত হন, ইহা বেদে আছে। ঈশ্বরের যতটুকু পাতঞ্জলে পরিচয়, তাহাতে কপিল নিজেকে 'ঈশ্বর' মনে করিয়া, জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের সত্তায় অবিশ্বাস করিবেন আশ্চর্য্য নহে। কপিল আদিবিদ্বান্, একথা সর্ব্বশাস্ত্রে ঘোষিত আছে। সে কপিল আবার জ্ঞানৈশ্বর্য্যশীল ঈশ্বর মানিবেন কেন ? জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর-ত সম্ভবই নয়, সুতরাং কপিল ঈশ্বর মানিতেন নিজের অবস্থাপর্য্যালোচনায় ; কাজেই জন্য-ঐশ্বর্য্য ও ঈশ্বর তাঁহার গ্রন্থে পাই, নিত্য-ঈশ্বর পাই না।

ষড়্দর্শনের মধ্যে বৈশেষিক নীরব। ন্যায়ের ঈশ্বর নিত্যগুণশালী সর্ব্বেসর্ব্বা। ন্যায় মতে ইনিই শেষ আশ্রয়, অতঃপর ন্যায়ের কল্পনা নাই। বেদান্তের ঈশ্বর মায়িক শক্তিশালী পুরুষ। অজ্ঞানের সত্ত্বপ্রধান ভাবই মায়া, ব্রহ্ম তদুপহিত হইলে ঈশ্বর হন। বেদান্তমতে ঐশ্বর্য্য চরমস্থান নহে, তাহার আর এক সোপান ঊর্দ্ধে

সর্ব্বাতীত নিরঞ্জন সত্যশিব সুন্দর ব্রহ্ম; তাহার পর আর নাই। সেই সচ্চিদানন্দ 'ভূমা' ই প্রতিষ্ঠা। মীমাংসায় ঈশ্বর নাই, মন্ত্রাত্মক দেবতা আছে। সাংখ্যে জন্য-ঈশ্বর আছেন। পাতঞ্জলে ক্লেশাদিশূন্য তত্ত্বোপদেশক মহাপুরুষ ঈশ্বর আছেন, ইহাই সংক্ষেপে অবধারণ।

সাংখ্য আত্মানাত্মবিবেকশাস্ত্র, কপিল ভগবান্ ঈশ্বরের অবতার, ইহাও শাস্ত্রে আছে। এখন কি বুঝিব যে 'কপিল আপনা ব্যতীত অপর ঈশ্বর অস্বীকার করিতেন?'

তর্ক যুক্তিতে ঈশ্বর বিলম্বে প্রতিপাদিত হউন্, স্ব-মহিমায় তিনি স্বতঃসিদ্ধ আছেন। জীব-জগৎ তাঁহাকে চিরদিনই আপনা হইতে বিশ্বাস করে ও করিবে। বাদ প্রতিবাদে বস্তুর হানি নাই, সত্যের অপলাপ নাই। ঈশ্বররূপী কপিল বিশ্বাসীর বিশ্বাস পরীক্ষা করিতে, কিম্বা প্রৌঢ়িবাদে অনধিকারীর নিকট হইতে ঈশ্বরতত্ত্ব রক্ষা করিতে আসিয়াছিলেন, তিনিই জানেন! তিনি ভক্তি, বিশ্বাস, উপাসনা, অনুষ্ঠান ইত্যাদি ধর্ম্মমার্গে আপন প্রভায় আপনি প্রকাশিত হইবেন, আর কথার তরঙ্গে—বিচারের রঙ্গে—অঙ্গ লুকাইবেন; ইহাই রীতি—গতি—পদ্ধতি। ভক্ত, বিশ্বাসী, হৃদয়ের বলে অগ্রসর হইবেন, আর অকৃপাভাজন অভাজন সন্দেহে চির-কুহেলিকায় অন্ধ হইয়া, ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবেন। তর্ক বা যুক্তিশাস্ত্র বুদ্ধি-মার্জ্জনের সহায়তাকারী। বিশ্বাসী নীরস-কুতর্ক পরিহার করিবেন। অন্ধজীবের পক্ষে ঈশ্বরতত্ত্ব "নিহিতংগুহায়াং।" ভাগ্য-গুণে——বহুজন্মার্জ্জিতসাধনে——তাঁহারই দয়ায়—তাঁহার সংবাদ পাওয়া যায়, কথায় নয়। দয়াময়! তোমার তত্ত্ব তুমিই জান, তোমার অস্তিত্বে তুমিই প্রমাণ। কপিলদেবের ঈশ্বরাসিদ্ধির যথার্থমর্ম্ম কি ধর্ম্ম-কর্ম্মজ্ঞানবিহীন দীনহীন লেখককে বুঝাইয়া দিবে? কে তুমি, কেমন, কিছুই জানি না। অবসন্ন প্রাণে—বিষণ্ণ মনে বলি,—

যাদৃশস্ত্বং মহাদেব! তাদৃশায় নমোনমঃ।

ওঁ শান্তিঃ।

ঈশ্বরতত্ত্বজিজ্ঞাসোঃ তীর্থপদাশ্রিতস্য—
কস্যচিৎ। যশোহর।

উপদেশ-শতকম্।

ত্রিষু দেবেষু মহান্তং ভৃগুর্ব্বুভুৎসুঃ পরীক্ষ্য হরিমেকম্।
মেনেঽধিকং মহিম্না সেব্যঃ সর্ব্বোত্তমো-বিষ্ণুঃ ॥১॥

রুক্মাঙ্গদঃ স্বপুত্রং নিহত্য খড়্গেন মোহিনী-বচসা।
সত্যাং ররক্ষ বাচং ন সঙ্কটেঽপিত্যজে-দ্ধর্ম্মম্ ॥২॥

বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব এই তিন দেবতার মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? ইহা জানিবার জন্য ভৃগু-মুনি হরিকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন, ও হরিকে মহিমাতে শ্রেষ্ঠ জানিয়াছিলেন; সর্ব্বোত্তম বিষ্ণুকে সেবা করা কর্ত্তব্য। (শ্রীভাগবতে ১০স্কন্ধে ৮৯অধ্যায়ে) ॥১॥

রুক্মাঙ্গদ মোহিনী-বাক্যে খড়্গ দ্বারা স্বপুত্রকে হত করিয়া, সত্যবাক্য রক্ষা করিয়াছিলেন; সঙ্কটেও ধর্ম্মত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে ॥২॥

নির্বাসিতো হিতেপ্সু-বিভীষণো রাবণেন লঙ্কায়াঃ।
তন্নাশহেতুরাসীন্নহি নিজবন্ধু-বিরোদ্ধব্যঃ ॥৩॥
হৃতরাজ্য দর্পসারং সুযোধনং নিগ্রহীতুমপি শক্তাঃ।
প্রোষুর্বনেষু পার্থা বীরঃ সময়ং প্রতীক্ষেত ॥৪
মণিহেতোরভিশপ্তঃ কৃষ্ণঃ সত্রাজিতাথ জাম্ববতঃ।
জিত্বা দদৌ তমস্মৈ জনাপবাদাদ্ ভজেদ্ ভীতিম্ ॥৫॥
স্বারাজ্য মশ্নুবানঃ প্রকোপ্য নহুষো মুনী-নহিভূত্বা।
ন্যপতৎ ত্বরিতমধস্তাৎ প্রাপ্যৈশ্বর্য্যো ন দৃপ্তঃ স্যাৎ ॥৬॥

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বিভীষণ—রাবণ কর্ত্তৃক লঙ্কা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া, তাঁহার নাশের হেতু হইয়াছিলেন; নিজ বন্ধুর সহিত বিরোধ করা কর্ত্তব্য নহে ॥৩॥

পাণ্ডবগণ হৃতরাজ্য হইয়া, অহঙ্কারী সুযোধনকে (দুর্য্যোধনকে) নিগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেও, বনে বাস করিয়াছিলেন; বীর ব্যক্তি সময়কে অপেক্ষা করিবেন ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণ (স্যমন্তক) মণির জন্য সত্রাজিত দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া, জাম্ববানকে জয় করিয়া (তাঁহা হইতে মণি প্রাপ্ত হইয়া) সত্রাজিৎকে দান করিয়াছিলেন; জনাপবাদ হইতে ভয় করিবে ॥৫॥

নহুষরাজা স্বর্গরাজ্য ভোগ করিয়া, মুনিগণের কোপ উৎপাদন করিয়া দিয়া, সর্প হইয়া শীঘ্র স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছিলেন; ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া অহঙ্কারী হইবে না ॥৬॥

সহধর্ম্মিণীং বনান্তাদ্দশরথসূনোর্জ্জহার দশবক্ত্রঃ।
বন্ধনমাপ সমুদ্রো ন দুর্জ্জনস্যান্তিকে নিবসেৎ ॥৭॥
হন্তুং দেবকতনয়াং বসুদেবেনোদ্যতায়ুধঃ কংসঃ।
মধুরোক্তিভিরনুনীতঃ সাম্না মূর্খংবশে কুর্য্যাৎ ॥৮॥
ভ্রাতর্ম্মহদতিচারো ন যুক্ত ইতি বাদিনং দশগ্রীবঃ।
ধনদং ববন্ধ যুদ্ধে মূঢ়মতির্নোপদেষ্টব্যঃ ॥৯॥
বিশ্রব্ধশ্চাটুবচনৈঃ কৈকেয্যা দশরথো বরং দত্ত্বা।
সংকট মাপ দুরন্তং স্ত্রীষু ন কুর্ব্বীত বিশ্বাসং ॥১০

দশানন শ্রীরামচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীকে (পঞ্চবটী) বন হইতে হরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সমুদ্র বন্ধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; দুর্জ্জন-সন্নিধানে বাস করিবে না ॥৭॥

কংস দেবকীকে অস্ত্র দ্বারা বধ করিতে উদ্যত হইলে, বসুদেব মধুর বাক্য দ্বারা অনুনয় করিয়াছিলেন; সুমধুর বাক্য দ্বারা মূর্খকে বশ করিবে ॥৮॥

"ভ্রাতঃ! নিয়মাতিরিক্ত কর্ত্তব্য নহে" কুবের এই কথা বলিলে, দশানন কুবেরকে যুদ্ধে বন্ধন করিয়াছিলেন; মূঢ় ব্যক্তিকে উপদেশ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে ॥৯॥

দশরথ কৈকেয়ীর তোষামোদ বাক্যে বিশ্বস্ত, হইয়া অত্যন্ত শঙ্কট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে ॥১০॥

গর্ব্বাদ্ যোদ্ধুমুপেতঃ পৌলস্ত্যঃ সপদি কার্ত্তবীর্য্যেণ।
ক্রীড়ামৃগ ইব বদ্ধো ন বলোদ্রিক্তেন যোদ্ধব্যং ॥১১॥
সন্দীপিতাগ্রপুচ্ছো বদ্ধতনুস্তাড়িতোঽপি রক্ষোভিঃ।
লঙ্কাং মারুতিরদহৎ বিপদি বিজহ্যান্ন শূরত্বম্ ॥১২॥
রুক্মী ছলেন দীব্যন্ বলং বিজিত্যাথ পরিহসন্নুচ্চৈঃ।
প্রাগ্ বধমাপ সভায়াং নোপহসেন্নির্জ্জিতং দ্যূতে ॥১৩॥
শকুনিসুযোধনকর্ণৈ র্জিতোঽক্ষধূর্ত্তৈঃ যুধিষ্ঠিরো দ্যূতে।
নির্ব্বাসিতঃ স্বরাষ্ট্রাৎ কিতবৈঃ সহ নাচরেদ্‌দ্যূতম্ ॥১৪॥

রাবণ গর্ব্ব বশতঃ যুদ্ধার্থে, উপস্থিত হইলে কার্ত্তবীর্য্য অর্জ্জুন কর্ত্তৃক তৎক্ষণাৎ ক্রীড়ামৃগের ন্যায় বদ্ধ হইয়াছিলেন; বলশালীর সহিত যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে ॥১১॥

হনুমানের পুচ্ছের অগ্রভাগ জ্বালাইয়া দিলে, ও রাক্ষসগণ তাঁহার শরীরকে বদ্ধ করিয়া তাড়না করিলেও, তিনি লঙ্কা দাহন করিয়াছিলেন; বিপদ্‌কালে শূরত্ব ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে ॥১২॥

রুক্মী ছলে বলদেবকে পাশা খেলায় পরাজয় করিয়া, উচ্চহাস্য করিয়া, সভায় তৎক্ষণাৎ হত হইয়াছিলেন; অক্ষক্রীড়ায় নির্জ্জিত ব্যক্তিকে উপহাস করিবেনা ॥১৩॥

যুধিষ্ঠির—শকুনি, দুর্য্যোধন ও কর্ণ প্রভৃতি অক্ষধূর্ত্ত ব্যক্তিদিগের দ্বারা অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া, স্ব-রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন; তজ্জন্য শঠের সহিত দ্যূতক্রীড়া কর্ত্তব্য নহে ॥১৪॥

মখরক্ষণায় পুত্রং বিশ্বামিত্রায় দশরথোঽর্থয়তে।
প্রাযচ্ছদ্ গতশঙ্কং দুস্ত্যজমপ্যর্থিনে দেয়ম্ ॥১৫
ত্যজ পার্থৈঃ সহ রণমিতি বিদুরেণোক্তোঽম্বিকাসুতঃ সততম্।
তদমত্বা ক্ষয়মাপ কর্ত্তব্যং ভাষিতং সুহৃদাম্ ॥১৬॥
শিশুপালঃ ক্রতুকালে হরিমর্হং গর্হয়ন্নরূক্ত্যা।
তৎক্ষণমিয়ায় নাশং ন মহান্তং ক্কাপি গর্হেত ॥১৭॥
অজ্ঞদ্বিজায় মোহান্নৃগো বদান্যো দ্বিজস্ব গাং দত্বা।
সম্বোঽভূৎ কৃকলাসো ব্রহ্মস্বং দূরতো বিসৃজেৎ ॥১৮॥

বিশ্বামিত্র যজ্ঞরক্ষণের জন্য দশরথের নিকট রামচন্দ্রকে যাচ্ঞা করিলে, দশরথ নির্ভীক পুত্রকে দান করিয়াছিলেন; অর্থীকে দুস্ত্যজ দ্রব্যও দান করা কর্ত্তব্য ॥১৫॥

বিদুর, সর্ব্বদা "পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ পরিত্যাগ কর" এই কথা কহিলেও, তাহা অমান্য করিয়া ধৃতরাষ্ট্র নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সুহৃৎ ব্যক্তিগণের বাক্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য ॥১৬॥

শিশুপাল যজ্ঞকালে দুর্ব্বাক্য দ্বারা পূজ্যাস্পদ হরিকে নিন্দা করিয়া, তৎক্ষণেই নাশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; মহৎলোকের নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে ॥১৭॥

বদান্য নৃগরাজা অজ্ঞান বশতঃ স্বদত্ত ব্রাহ্মণগাভী অন্য ব্রাহ্মণকে দান করিয়া, তৎক্ষণাৎ কৃকলাস হইয়াছিলেন; ব্রহ্মস্ব দূরে ত্যাগ করিবে ॥১৮॥

সুগ্রীবোরঘুপতিনা হৃতদারেণোপগম্য হৃতদারঃ।
দৃঢ়মাববন্ধ সখ্যং সমানদুঃখঃসখা কার্য্যঃ ॥১৯॥
বীরো বৈতনিকঃ সন্ বিরাটনগরোষিতঃ কুমারীণাম্।
নর্ত্তয়িতার্জ্জুন আসীদ্ভজেদবস্থোচিতাং বৃত্তিম্ ॥২০॥
দুষ্মন্তঃ স্ববধূমপি কণ্বানীতাং শকুন্তলাং সমুত্তাম্।
সুচিরংবিমৃশ্যভেজে কার্য্যং সহসা ন বিদধীত ॥২১॥
যমদগ্নিনা নিযুক্তঃ সদ্যোনিজঘান মাতরং রামঃ।
নির্দ্দোষঃ পুনরাসীদ্ গুরুক্রমবিচারিতং কুর্য্যাৎ ॥২২॥
শতযোজনততমব্ধিং বিলঙ্ঘ্য বাতাত্মজো হবিশল্লঙ্কাং।
বীরাগ্রতঃসরোঽভূদ্ যশোঽর্জ্জয়ন্ সাহসং কুর্য্যাৎ ॥২৩॥

হৃতদার সুগ্রীব, হৃতদার রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, দৃঢ়ভাবে সখ্যবদ্ধ হইয়াছিলেন; সমানদুঃখী ব্যক্তির সহিত সখ্য করা কর্ত্তব্য ॥১৯॥

বীর অর্জ্জুন, বিরাটনগরে বাস করিয়া কুমারীগণের বেতনভোগী নর্ত্তয়িতা হইয়াছিলেন; অবস্থোচিত বৃত্তি ভজনা করা কর্ত্তব্য ॥২০॥

কণ্ব কর্ত্তৃক আনীতা সমুতা শকুন্তলাকে, আপনার বধূ হইলেও গ্রহণ করিতে দুষ্মন্ত দীর্ঘকাল চিন্তা করিয়াছিলেন; সুতরাং কার্য্য সহসা করা কর্ত্তব্য নহে ॥২১॥

যমদগ্নি কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া, পরশুরাম মাতাকে সদ্য বধ করিয়া নির্দ্দোষ হইয়াছিলেন; সুতরাং গুরুবাক্য বিচার না করিয়া করিবে ॥২২॥

হনুমান্ শতযোজন বিস্তীর্ণ সাগরকে উল্লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, ও বীরগণের অগ্রগামী হইয়াছিলেন; যশ উপার্জ্জন করিতে সাহস করিবে ॥২৩॥

প্রহিতঃ সুরৈর্জিগীষুর্হরং প্রহর্ত্তুং স্মরোঽভ্যয়াদ্ যাবৎ
ভস্মীবভূব তাবন্নচিকীর্ষেদ্ দুষ্করং কর্ম্ম ॥২৪॥
সংকুট্য পাদঘাতৈঃ কালিন্দ্যাং কালীয়ং কৃতাগস্কম্।
নিরবাপয়ন্ মুকুন্দো দুষ্টেদণ্ডঃ প্রযোক্তব্যঃ ॥২৫॥
কুলিশাহতিহৃতশিরসেঽপ্যদাৎ কবন্ধায় জীবতে শক্রঃ।
অশনায়োরসি বদনং দীনো রিপুরপ্যনুগ্রাহ্যঃ ॥২৬॥ (১)

মদন, দেবতাগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া, মহাদেবকে জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া যেমন আগমন করিয়াছিলেন, অমনি ভস্মীভূত হইয়াছিলেন; দুষ্করকর্ম্ম বাসনা করিবে না ॥২৪॥

শ্রীকৃষ্ণ কৃতাপরাধ কালীয়কে কালিন্দীতে পদাঘাত দ্বারা পেষণ করিয়া দূর করিয়া দিয়াছিলেন; দুষ্টজনে দণ্ডদান কর্ত্তব্য ॥২৫॥

ইন্দ্র বজ্রাস্ত্রের দ্বারা হৃতশিরঃ কবন্ধকে জীবনধারণার্থ ভোজনজন্য বক্ষঃস্থলে বদন দান করিয়াছিলেন; শত্রু ও দীন হইলে তাহাকে অনুগ্রহ করা কর্ত্তব্য ॥২৬॥

(১) এই উপাখ্যানটি বাল্মীকি রামায়ণে আরণ্যকাণ্ডে ৭১ সর্গে——
অনাহারঃ কথং শক্তো ভগ্নসক্থিশিরোমুখঃ।
বজ্রিনা নিহতঃ কালং সুদীর্ঘমপি জীবিতুম্ ॥১২॥
স এবমুক্তঃ শক্রোমেবাহূ যোজনমায়তৌ।
স তদাস্যঞ্চমেকুক্ষৌ তীক্ষ্ণদংষ্ট্রমকল্পয়ৎ ॥১৩॥
কবন্ধ কহিল—আমি ইন্দ্রকে কহিলাম, বজ্রদ্বারা আমার জঙ্ঘা, মস্তক ও মুখ ভগ্ন হইয়াছে, আমি কি প্রকারে দীর্ঘকাল অনাহারে জীবিত থাকিব। এই কথা কহিলে, তিনি যোজনায়ত বাহুদ্বয় ও আমার কুক্ষিতে এই তীক্ষ্ণদন্তযুক্ত মুখ করিয়া দিলেন।

সুগ্রীবায় শুকঃখাদশমুখসন্দেশ মাদিশন্ কপিভিঃ।
সন্তাড্য সপদি বদ্ধো ন দূতভাবং ভজেদসতঃ ॥২৭॥
"অশ্বত্থামা হত" ইতি যুধি গিরমনৃতাং যুধিষ্ঠিরোঽবাদীৎ।
পুনরনুতাপমবাপৎপাপং কৃত্বানুতপ্যেত ॥২৮॥১০
ভোগান্ বহূন্ যযাতির্ভুক্ত্বা বয়সা সুতস্য চিরকালম্।
নিরবিদ্যতাবিতৃপ্তঃ কামং মন্যেত দুষ্পূরম্ ॥২৯ ১
বলিরিন্দ্রজিৎ ত্রিলোক্যাং ভুঞ্জন্ ভোগাংশ্চিরাদ্বিনষ্টশ্রীঃ।
সুতলেঽবধ্যত পাশৈর্ভোগান্ ক্ষণভঙ্গুরান্ বিদ্যাৎ ॥৩০॥

রাবণদূত শুক, শূন্য হইতে সুগ্রীবকে রাবণের সংবাদ আনিয়া দিয়া, বানরগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া তৎক্ষণাৎ বদ্ধ হইয়াছিলেন, তজ্জন্য অসৎ ব্যক্তির নিকট দৌত্য গ্রহণ করিবে না ॥২৭॥

যুধিষ্ঠির—যুদ্ধে "অশ্বত্থামা হত ইতি" এই মিথ্যা কথা কহিয়া, পুনরায় অনুতাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; পাপ করিলে অনুতাপ করিতে হয় ॥২৮॥

যযাতি পুত্রের বয়সে বহুকাল বহু বিষয় ভোগ করিয়া, তৃপ্তি লাভ না করিয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সুতরাং বাসনা কখন পূর্ণ হয় না ॥২৯॥

ইন্দ্রজিৎ বলি ত্রিলোকে ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া নষ্টশ্রী হইয়া, সুতলে পাশবদ্ধ হইয়াছিলেন; সুতরাং ভোগ্যবস্তুকে ক্ষণভঙ্গুর জানিবে ॥৩০॥

(১০) মহাভারত দ্রোণপর্ব্বণি ১৯১ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

(১) শ্রীহরিবংশে হরিবংশপর্ব্বণি ৩০ অধ্যায়ে। বিষ্ণুপুরাণে ৪অংশে ১০অধ্যায়ে। মহাভারতে আদিপর্ব্বণি ৮৫অধ্যায়ে। মৎস্যপুরাণে ৩৪ অধ্যায়ে।

বিলপন্তং হতপুত্রং ধৃতরাষ্ট্রং বীক্ষ্য করুণয়া কৃষ্ণঃ।
ক্ষণমমুঞ্চশোচ সাস্রং দুঃখিতমনু দুঃখিতো ভূয়াৎ ॥৩১॥
নিঃক্ষত্রিয়াং ন চক্রে যাবদ্রামো ভুবং রুষা তাবৎ।
আসীদ্রণৈকতানো বিরমেদসমাপ্য নারব্ধং ॥৩২॥
দুহিতা বিদেহভর্ত্তুর্দাশরথের্ভামিনী সীতা।
বধমাপ রাক্ষসীনাং বিধের্বিচিত্রা গতির্বোধ্যা ॥৩৩॥
নিগমাগমৈকবেত্তা দ্রোণস্তপ্ত্বা তপোঽর্থমন্বিচ্ছন্।
ধানুষ্কবৃত্তিরাসীদ্ধর্ম্মং চার্থং চ সেবেত ॥৩৪॥

কৃষ্ণ, হতপুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে বিলাপ করিতে দেখিয়া, করুণাবশতঃ ক্ষণকাল অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া দুঃখ করিয়াছিলেন; কাহাকেও দুঃখিত দেখিলে তাহার সহিত দুঃখী হওয়া কর্ত্তব্য ॥৩১॥

পরশুরাম যতক্ষণ না ক্রোধভরে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, ততক্ষণ যুদ্ধে একাগ্র ছিলেন; কার্য্য সম্পূর্ণ না করিয়া ক্ষান্ত দেওয়া কর্ত্তব্য নহে ॥৩২॥

বিদেহরাজার কন্যা ও শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী হইয়াও, সীতাদেবী রাক্ষসীদিগের নিকট হইতে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন; বিধাতার বিচিত্রগতি বুঝিতে হইবে ॥৩৩॥

নিগম ও আগমবেত্তা দ্রোণ, তপস্যা করিয়া অর্থপ্রাপ্তি ইচ্ছা করিয়া ধানুষ্কবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন; ধর্ম্ম ও অর্থ কামনা করা কর্ত্তব্য ॥৩৪॥

অধিশম্ভুমৌলি নিবসন্নেককলাত্মা যথা
ঽর্চ্যতে চন্দ্রঃ।
ন তথা স পূর্ণবিম্বঃ শ্রয়েন্মহান্তং মহত্ত্বায় ॥৩৫
শরতল্পমধিশয়ানাদ্ভীষ্মাদাকর্ণ্য ধর্ম্মজোধর্ম্মান্।
দুঃখংজহৌ দুরন্তং প্রষ্টব্যাঃ সৎপথং
বৃদ্ধাঃ ॥৩৬॥
কর্ণেন ঘাতয়িত্বা ঘটোৎকচং শক্রশক্তি-
নির্ম্মোক্ষাৎ।
জীবিতমরক্ষি পার্থৈঃ স্বাত্মানং সর্ব্বতো
রক্ষেৎ ॥৩৭॥
পৃথুকোপহারপাণির্হরিং সখায়ং প্রপদ্য
দীনাত্মা।
শ্রীমানভূৎসুদামা শ্রয়েতসন্মিত্রমাপৎসু ॥৩৮॥
দৃষ্ট্বা হরিঃসমক্ষং বাণত্রাণায় কোটবীং
নগ্নাম্।
সমরে পরাঙ্মুখোঽভূৎস্ত্রিয়ং বিবস্ত্রাংন
বীক্ষেত ॥৩৯॥

মহাদেবের মস্তকে বাসকরিয়া এককলা চন্দ্র যেরূপ পূজিত হন, চন্দ্র পূর্ণ হইয়াও সেরূপ শোভা পান না; অতএব মহত্ত্বজন্য মহতের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য ॥৩৫॥

যুধিষ্ঠির শরতল্পে শয়ান ভীষ্মদেবের নিকট ধর্ম্ম সকল শ্রবণ করিয়া, দুরন্তদুঃখ ত্যাগ করিয়াছিলেন; বৃদ্ধসকলকে সৎপথের বিষয় জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য ॥৩৬॥

ঘটোৎকচকে কর্ণদ্বারা নষ্ট করাইয়া, ইন্দ্র-শক্তিপরিত্যাগ হইতে পাণ্ডবগণ জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন; নিজের শরীর সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে ॥৩৭॥

দীন সুদামা সামান্য উপহার হস্তে লইয়া গিয়া, সখা হরিকে দিয়া, লক্ষ্মীমান্ হইয়াছিলেন; আপৎকালে সৎমিত্রের আশ্রয় লওয়া কর্ত্তব্য ॥৩৮॥

হরি, স্বীয় পুত্র বাণকে রক্ষার জন্য নগ্না কোটবীকে সম্মুখে দর্শন করিয়া, যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন; তজ্জন্য বিবস্ত্রা স্ত্রীকে দর্শন করা কর্ত্তব্য নহে ॥৩৯॥

অদিশল্লক্ষ্মণহেতোর্মারুতি মানেতুমোষধীঃ
রামঃ।
তামানয়ৎ স দ্রাদ্ধুর্যঃ কার্য্যে নিযোক্তব্যঃ ॥৪০
আরাধ্য কৈতবজ্ঞো রৌদ্রং রুদ্রাদ্বৃকো
বরংলব্ধ্বা।
গৌরীমিয়েষ হর্ত্তুং ন বিনীতং বিশ্ব-
সেদ্ধূর্ত্তম্ ॥৪১॥ (২)
দশকণ্ঠরক্ষিতায়াং লঙ্কায়াং রক্ষসামভূদ্ধ-
সতাম্।
গৃহবিত্তবন্ধুনাশো বসেন্নরাষ্ট্রেকুভূপালে ॥৪২॥
শপ্ত্বাম্বরীষমার্যং দুর্ব্বাসাঃ কোপনো-
নিরাগস্কম্।
চক্রেণ তাপিতোঽভূন্ন বিদধ্যাৎ ক্রোধ-
মস্থানে ॥৪৩॥ (৩)

লক্ষ্মণহেতু ঔষধী আনিবার জন্য রাম হনুমানকে আদেশ করিয়াছিলেন, হনুমান্ তাহা আনয়ন করিয়াছিলেন; তজ্জন্য পরাক্রমশালীকে কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য ॥৪০॥

শঠ বৃকাসুর মহাদেবকে আরাধনা করিয়া, তাঁহার নিকট বরলাভ করিয়া গৌরীকে হরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল; তজ্জন্য বিনীতধূর্ত্তকে বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে ॥৪১॥

রাবণ কর্ত্তৃক রক্ষিত লঙ্কাতে বাসকারী রাক্ষসদিগের গৃহ, বিত্ত ও বন্ধুনাশ হইয়াছিল; তজ্জন্য কুৎসিতরাজার রাজ্যে বাসকরা কর্ত্তব্য নহে ॥৪২॥

ক্রোধী দুর্ব্বাসা, নির্দ্দোষী মাননীয় অম্বরীষ রাজাকে অভিশাপ প্রদান করিয়া, চক্রদ্বারা তাপিত হইয়াছিলেন; তজ্জন্য অস্থানে ক্রোধ করা কর্ত্তব্য নহে ॥৪৩॥

(২) এই উপাখ্যান ভাগবতের ১০ম স্কন্ধে ৮৮ অধ্যায়ে।

(৩) ঐ ঐ ৯স্কঃ ৫অধ্যায়ে।

মখশিখিনি হূয়মানং তক্ষকমবিতুং প্রপন্ন-
মসমর্থঃ।
অজহান্নতু পুরুহূতঃ শরণমুপেতো ন
হাতব্যঃ ॥৪৪॥
হত্বা স্বসৃস্তনুজান্ সদ্যোজাতান্ বহূন্
খলঃ কংসঃ।
উৎসন্নঃ সহসাভূন্ন কুৎসিতং কর্ম্ম
কুর্ব্বীত ॥৪৫॥
সীতাং বিসৃজ্য রামঃ সাকং মুনিভিঃ মুনি-
ব্রতো রাজ্যম্।
শাসন্নুবাসপুর্য্যাং নেয়ঃসদ্ভিঃ সমং সময়ঃ ॥৪৬॥
কৃষ্ণধনঞ্জয়ভীমান্ দ্বিজবেশস্থান্ জরা-
সুতশ্চিহ্নৈঃ।
ক্ষাত্রৈঃ ক্ষিপ্রমজানাদাকারৈরিঙ্গিতং
বিদ্যাৎ ॥৪৭॥

যজ্ঞাগ্নিতে হূয়মান শরণাগত তক্ষককে রক্ষা করিতে পুরুহূত (ইন্দ্র) অসমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ত্যাগ করেন নাই; তজ্জন্য শরণাগতকে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে ॥৪৪॥

খল কংস, নিজের ভগিনীর অনেকগুলি সদ্যোজাত সন্তানকে বধ করিয়া সহসা উৎসন্ন হইয়াছিলেন; তজ্জন্য কুৎসিত কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য নহে ॥৪৫॥

মুনিব্রত রামচন্দ্র সীতাকে বিসর্জ্জন দিয়া, মুনিগণের সহিত রাজ্য শাসন করিয়া অযোধ্যায় বাস করিয়াছিলেন; তজ্জন্য সাধুগণের সহিত সময় অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য ॥৪৬॥

দ্বিজবেশধারী কৃষ্ণ, অর্জ্জুন ও ভীমকে জরাসন্ধ—ক্ষত্রিয়চিহ্নদ্বারা শীঘ্র জানিতে পারিয়াছিলেন; আকারে, ইঙ্গিত জানা কর্ত্তব্য ॥৪৭॥

যাং যাং দিশং গতোঽভূদ্ধিরণ্যকশিপু
র্যদৃচ্ছয়াবিচরন্।
তাং তাং সুরাঃ প্রণেমুর্দুষ্টজনং দূরতঃ
প্রণমেৎ ॥৪৮॥
কুর্ব্বন্নপি মুনিশপ্তঃ স্বজীবিতার্থী পরীক্ষিতো
যত্নং।
দষ্টোঽহিনাবিনষ্টো জ্ঞেয়ো মৃত্যুঃ সুদু-
র্ব্বারঃ ॥৪৯॥
সদিতি প্রতীয়মানং জগন্মৃষৈবেতি কেবলং
বুদ্ধা।
জনকো বিমুক্তিমাগাৎ স্বপ্নবদন্তর্জগদ্বো-
ধ্যম্ ॥৫০॥
বিহরন্ বধূভিরন্তঃপুরেঽগ্নিবর্ণোদিবানিশং
কামী।
প্রস্তোঽথ যক্ষ্মণাভূদ্ বিষয়ান্ বিষভীষণান্
বিদ্যাৎ ॥৫১॥ (৪)

হিরণ্যকশিপু যদৃচ্ছাক্রমে যে যে দিকে বিচরণ করিয়াছিলেন, সেইদিকের দেবতাগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ছিলেন; দুষ্টজনকে দূর হইতে প্রণাম করা কর্ত্তব্য ॥৪৮॥

শৃঙ্গী মুনি কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া, নিজ জীবনজন্য যত্ন করিয়াও, পরীক্ষিৎ—সর্প দ্বারা দষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন; মৃত্যু দুর্ব্বার বলিয়া জানিবে ॥৪৯॥

জনকরাজা, "সত্যের ন্যায় প্রতীয়মান কিন্তু জগৎ মিথ্যা," কেবল ইহা জ্ঞান করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; অন্তর্জগৎ স্বপ্নবৎ বলিয়া জানিবে ॥৫০॥

কামী অগ্নিবর্ণরাজা দিবানিশি বধূগণের সহিত অন্তঃপুরে বিহার করিয়া যক্ষ্মাগ্রস্ত হইয়াছিলেন; বিষয় সকলকে ভীষণ বিষের ন্যায় জানিবে ॥৫১॥

(৪) এই উপাখ্যান রঘুবংশে ১৯ সর্গে।

বিপ্রঃপতির্বৃষল্যা হিংস্রোঽপ্যভিবাদনান্মহর্ষীনাম্।
বাল্মীকির্মুনিরাসীৎ পুরুষানভিবাদয়েন্মহতঃ ॥৫২॥

নিশি কাময়ন্ দুরাত্মা দ্রুপদসুতাং কীচকো রহঃ প্রাপ্তাম্।
বধমাপভীমসেনাৎ পরস্ত্রিয়ং নাভিকাঙ্ক্ষেত ॥৫৩॥ (৫)

যুধি কুরবঃ কৃতবৈরা বীরং ব্যূহং বিশন্তমভিমন্যুম্।
বহবো নিজঘ্নুরেকংনৈকো রিপুমণ্ডলং প্রবিশেৎ ॥৫৪॥ (৬)

পুষ্করনির্জ্জিতরাজ্যঃ পুরমৃতুপর্ণস্য নৈষধোগত্বা।
সারথিরভূন্নিগূঢ়ো দুরবস্থো ন প্রকাশঃ স্যাৎ ॥৫৫॥ (৭)

ব্রাহ্মণ, বৃষলীপতি ও হিংস্র হইয়াও, মহর্ষিগণের অভিবাদনহেতু বাল্মীকি 'মুনি' হইয়াছিলেন; মহৎপুরুষকে অভিবাদন করা কর্ত্তব্য ॥৫২॥

দুরাত্মা কীচক নির্জ্জনে প্রাপ্তা দ্রৌপদীকে রাত্রে কামনা করিয়া, ভীমসেন হইতে বিনষ্ট হইয়াছিল; পরস্ত্রীকে কামনা করিবে না ॥৫৩॥

যুদ্ধে কৃতবৈর কুরুগণ বীর অভিমন্যুকে ব্যূহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, সকলে মিলিত হইয়া বধ করিয়াছিল; একা রিপুমণ্ডলে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য নহে।৫৪॥

নল, পুষ্কর কর্ত্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া, ঋতুপর্ণ রাজার বাড়ীতে গিয়া গুপ্তভাবে সারথি হইয়াছিলেন; দুরবস্থা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে ॥৫৫॥

ক্ষাত্রং বিমৃষ্য ধর্ম্মং মান্যৈর্গুরুভি র্দ্বিজৈঃ সমং সমরে।
যুযুধেঽর্জ্জুনো ধনুষ্মান্ ঘোরমপি স্বং চরেদ্ধর্ম্মং ॥৫৬॥ (৮)

হরিরম্বুধিমথনোত্থাং সুধাং সুরেভ্যঃ সুরাং সুরারিভ্যঃ।
ব্যতরৎ সমং যথার্হং যোগ্যং যোগ্যায় দাতব্যং ॥৫৭॥ (৯)

(ক্রমশঃ)

শ্রীবিধুভূষণ দেব।

অর্জ্জুন, নিজের ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া, মান্যগুরু ব্রাহ্মণের সহিত যুদ্ধে ধনুর্ধারী হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন; স্বধর্ম্ম ভয়ানক হইলেও তাহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে ॥৫৬॥

হরি সমুদ্রমন্থনোত্থিত সুধা দেবতাগণকে, ও সুরা অসুরগণকে যথাযোগ্য সমান বিভক্ত করিয়া দিয়াছিলেন; যোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যদ্রব্য দান করা কর্ত্তব্য ॥৫৭॥

---

(৫) এই উপাখ্যান মহাভারতে বিরাটপর্ব্বণি ২২ অধ্যায়ে।

(৬) ঐ ঐ দ্রোণপর্ব্বণি ৪৯ অধ্যায়ে।

(৭) ঐ ঐ বনপর্ব্বণি ৬৭ অধ্যায়ে—

তস্মিন্নন্তর্হিতে নাগে প্রযযৌ নৈষধোনলঃ।
ঋতুপর্ণস্য নগরং প্রাবিশদ্দশমেঽহনি ॥
সরাজানমুপাতিষ্ঠদ্ বাহুকোঽহমিতি ব্রুবন্।
অশ্বানাং বাহনে যুক্তঃ পৃথিব্যাং নাস্তি মৎসমঃ।

*   *   *   *

যানি শিল্পানি লোকেঽস্মিন্ যচ্চৈবান্যৎ সুদুষ্করম্।
সর্ব্বং যতিষ্যে তৎ কর্ত্তুমৃতুপর্ণ ভরস্ব মাম্ ॥

(৮) তজ্জন্যগীতায় কহিয়াছেন—
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫॥
৩ অধ্যায়ে।

(৯) মহাভারতে আদিপর্ব্বণি ১৮ অধ্যায়ে—দ্রষ্টব্যং।

গৃহস্থের সদাচার।

(বিষ্ণুপুরাণ।)

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

মাত্রে প্রমাত্রে তন্মাত্রে গুরুপত্ন্যৈ তথানৃপ!
গুরবে মাতুলাদীনাংস্নিগ্ধমিত্রায় ভূভুজে। ২৯
ইদঞ্চাপিজপেদম্বু দদ্যাদাত্মেচ্ছয়া নৃপ!
উপকারায় ভূতানাং কৃতদেবাদিতর্পণঃ। ৩০

বঙ্গার্থ মাতা, প্রমাতা ও তন্মাতা, গুরুপত্নী, গুরু, মাতুলাদি, স্নেহসম্পন্নমিত্র এবং রাজা ইহাদিগের জন্যও ইচ্ছা হইলে জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে। সর্ব্বভূতের উপকারের জন্য দেবতর্পণাদি সমাপ্ত করিয়া ইচ্ছানুসারে পরে এই তর্পণ করিবে। সর্ব্বভূতোপকারক দেবাদিতর্পণ যথা,--

দেবাসুরাস্তথা যক্ষা নাগাগন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ।
পিশাচা গুহ্যকাঃ সিদ্ধাঃ কুষ্মাণ্ডাস্তরবঃ খগাঃ। ৩১
জলেচরা ভূমিলয়া বায্বাহারাশ্চ জন্তবঃ।
প্রীতিমেতে প্রযান্ত্যাশু মদ্দত্তেনাম্বুনাখিলাঃ। ৩২

বঙ্গার্থ। দেবতা, অসুর, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণ, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ, কুষ্মাণ্ড, তরুগণ ও খগগণ, জলচর, ভূমির অভ্যন্তরস্থ, বায়ুভক্ষক জন্তুগণ, ইঁহারা সকলেই আমার প্রদত্ত জলাঞ্জলি দ্বারা শীঘ্র তৃপ্তি লাভ করুন। (এই বলিয়া জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে।)

নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যেস্থিতাঃ।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলংময়া। ৩৩

বঙ্গার্থ। নরক সমস্ত মধ্যে যাতনাতে যে সকল জীব অবস্থিতি করিতেছে, তাহাদের প্রীতির জন্য আমি জলপ্রদান করিতেছি। (এই বলিয়া জলাঞ্জলি দিতে হইবে।)

যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তেসর্ব্বে তৃপ্তিমায়ান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ। ৩৪

বঙ্গার্থ। যাঁহারা অবান্ধব, অথবা বান্ধব, কিম্বা যাঁহারা অপর জন্মেও বান্ধব ছিলেন, তাহারা সকলেই তৃপ্তি লাভ করুন। যাঁহারা আমার প্রদত্ত জল আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা তৃপ্তি লাভ করুন। (এই বলিয়াও জল দিতে হইবে।)

যত্রক্কচনসংস্থানাং ক্ষুৎতৃষ্ণোপহতাত্মনাং।
ইদমপ্যক্ষয়ঞ্চাস্তু ময়া দত্তং তিলোদকং। ৩৫

বঙ্গার্থ। ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর—যে কোনও জীব যেখানে থাকুক না কেন, এই

মৎপ্রদত্ত তিলোদক তাহাদের পক্ষে অক্ষয় হউক। (এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ও পূর্ব্ববৎ জলাঞ্জলি প্রদান করিতে হইবে।)

কাম্যোদকপ্রদানান্তে ময়ৈতৎ কথিতং নৃপ।
যদ্দত্ত্বা প্রীণয়ত্যেতৎ মনুষ্যঃ সকলং জগৎ। ৩৬
জগদাপ্যায়নোদ্ভূতং পুণ্যমাপ্নোতি চানঘ!
দত্ত্বা কাম্যোদকং সম্যগেতেভ্যঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। ৩৭

বঙ্গার্থ। কাম্যোদক প্রদানের পর তোমাকে এই জগদাপ্যায়ন তর্পণের কথা বলিলাম। হে মহারাজ! এই তর্পণ দ্বারা মানব সমস্ত জগৎ প্রীতিযুক্ত করিতে পারে। হে নিষ্পাপ! এই সকলের প্রীতির জন্য শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া যে ব্যক্তি কাম্যোদক প্রদান করে, সে জগদাপ্যায়নসমুত্থ পুণ্য প্রাপ্ত হয়।

আচম্য চ ততো দদ্যাৎ সূর্য্যায় সলিলাঞ্জলিং।
নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে!
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে। ৩৮

বঙ্গার্থ। অতঃপর আচমন করিয়া, সূর্য্যদেবকে জলাঞ্জলি প্রদান করিবে। হে ব্রহ্মন্! তেজঃ সম্পন্ন আদিরূপ তোমাকে নমস্কার। তুমি বিষ্ণুতেজঃ স্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি জগজ্জনক, তুমি শুচি, তুমি সবিতা, তুমি কর্ম্মপ্রবর্ত্তক,—হে সূর্য্য! তোমাকে নমস্কার। (এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক জল দিতে হইবে। ইহাকে সূর্য্যার্ঘ্যপ্রদান বলে।)

ততো গৃহার্চ্চনং কুর্য্যাদভীষ্টসুর-পূজনং।
জলাভিষেকপুষ্পাণাং ধূপাদেশ্চ নিবেদনৈঃ। ৩৯

বঙ্গার্থ। সূর্য্যার্ঘ্য প্রদানানন্তর গৃহস্থ অভীষ্ট দেবতাগণের পূজা করিবে। জলাভিষেক পুষ্প ধূপাদি নিবেদন পূর্ব্বক ঐ পূজা করিতে হইবে।

অপূর্ব্বমগ্নিহোত্রঞ্চ কুর্য্যাৎ প্রাগ্ ব্রহ্মণে ততঃ।
প্রজাপতিংসমুদ্দিশ্য দদ্যাদাহুতি-মাদরাৎ। ৪০
গুহ্যেভ্যঃ কাশ্যপায়াথ ততোঽনু-মতয়ে ক্রমাৎ।

বঙ্গার্থ। তদনন্তর অপূর্ব্ব অর্থাৎ অন্য যাহার প্রকৃতিভূত নহে, এবম্ভূত "অগ্নিহোত্র" যজ্ঞ করিবে। প্রথমে ব্রহ্মাকে, পরে প্রজাপতিকে, তৎপরে কাশ্যপকে ও শেষে অনুমতিকে আহুতি প্রদান করিবে। (ইহাই এখানকার অগ্নিহোত্র, ইহারই নাম দেব-যজ্ঞ হবির্হোম।)

তচ্ছেষং প্রণিকেঽস্ত্যোঽথ পর্জ্জন্যায় ক্ষিপেৎততঃ। ৪১
দ্বারে ধাতুর্বিধাতুশ্চ মধ্যে চ ব্রহ্মণঃ ক্ষিপেৎ।
গৃহস্য পুরুষব্যাঘ্র দিগ্দেবান্ অপি মে শৃণু। ৪২

বঙ্গার্থ। হুতশেষ, জলাধার সমীপে পর্জন্য দেবের জন্য নিঃক্ষেপ করিবে। গৃহের দ্বারে ধাতা এবং বিধাতার জন্য, এবং মধ্যে ব্রহ্মার জন্য হুতশেষ নিঃক্ষেপ করিতে হইবে। হে পুরুষব্যাঘ্র! আমি গৃহের দিগ্দেবতাগণের নাম ও তাঁহাদের হুতশেষ প্রদান কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ কর। ৪২

ইন্দ্রায় ধর্ম্মরাজায় বরুণায় তথেন্দবে।
প্রাচ্যাদিষু বুধো দদ্যাৎ হুতশেষাত্মকং বলিং। ৪৩

বঙ্গার্থ। ইন্দ্র, ধর্ম্মরাজ, বরুণ ও ইন্দু ইঁহাদিগের জন্য প্রাচ্যাদিদিকে পণ্ডিতব্যক্তি হুতাবশেষ অন্ন বলিরূপে প্রদান করিবেন।

প্রাগুত্তরে চ দিগ্ভাগে ধন্বন্তরিবলিং বুধঃ।
নির্ব্বপেদ্ বৈশ্যদেবঞ্চ কর্ম্ম কুর্য্যাদতঃপরম্। ৪৪

বঙ্গার্থ। পূর্ব্বোত্তর দিকে ধন্বন্তরি-বলি প্রদান করিবে। ধন্বন্তরি-বলি প্রদানের পর, কথ্যমান বৈশ্যদেব কর্ম্ম সম্পাদন করিবে।

বায়ব্যে বায়বে দিক্ষু সমস্তাসু ততো দিশাম্।
ব্রহ্মণে চান্তরীক্ষায় ভানবে প্রক্ষিপেদ্বলিম্। ৪৫

বিশ্বেদেবান্ বিশ্বভূতান্ অথোভূতপতীন্ পিতৄন্।
যক্ষাণাঞ্চ সমুদ্দিশ্য বলিং দদ্যাৎ নরেশ্বর! ৪৬

বঙ্গার্থ। হে নরশ্রেষ্ঠ! বায়ুকোণে বায়ু দেবতার জন্য বলি প্রক্ষেপ করিবে। তৎপরে পূর্ব্ব, উত্তর, দক্ষিণ প্রভৃতি দিক্ সকলকে বলি অর্পণ করিবে। ব্রহ্মা, অন্তরীক্ষ ও সূর্য্যদেবকে বলি প্রদান করিবে। (ব্রহ্মা, অন্তরীক্ষ ও সূর্য্যদেবের জন্য প্রদত্ত বলির উত্তরদিকে) বিশ্বেদেব সংজ্ঞক দেবতাগণের জন্য বলি দিবে। (দক্ষিণদিকে) ভূতপতি, পিতৃগণ ও যক্ষগণকে উদ্দেশ করিয়া বলি প্রদান করিবে।

ততোঽন্যদন্নমাদায় ভূমিভাগে শুচৌ বুধঃ।
দদ্যাদশেষভূতেভ্যঃস্বেচ্ছয়া তৎ সমাহিতঃ। ৪৭

বঙ্গার্থ। তাহার পর অন্য অন্নগ্রহণ করিয়া, শুচি ভূমিদেশে জ্ঞানী ব্যক্তি তাহা সর্ব্বভূতের জন্য সমাহিত চিত্তে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দিবে। (বৈশ্বদেববলি, ভূতবলি, যক্ষবলি ইত্যাদি দৈনন্দিন কর্ত্তব্য, অন্ন পাক করিলেই ইহাদিগকে দিতে হয়, বলি অর্থ উপহার।)

(ক্রমশঃ)

দীনস্য কস্যচিৎ

যশোহর।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১০ম বর্ষ, ১০ম খণ্ড, ৮ম সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ। | ১৩১০ সাল, ১৮২৫ শকাব্দা।

মীমাংসা-দর্শনম্। *

জৈমিনি-সূত্রম্।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পূজ্যপাদ পরমর্ষি জৈমিনি পূর্ব্বে "বিধি-বন্নিগদ" নামক অর্থবাদ বাক্যগুলির রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন, অধুনা "হেতুবন্নিগদ" নামক বাক্যগুলির বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বকার বাক্যগুলি বিধি-বাক্যের ন্যায় প্রতীত হইয়াছিল বলিয়া, তাহারা বিধিবন্নিগদ নামে অভিহিত হই-য়াছিল, অধুনাতন বাক্যগুলি হেতুর ন্যায় প্রতীত হয়, এজন্য ইহারা হেতুবন্নিগদ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এইগুলি হেতুবাক্যের ন্যায় বোধ হইলেও, বস্তুতঃ স্তাবক মাত্র। পূর্ব্বপক্ষে এই গুলিকে হেতুবাক্য মনে করিয়া বলা হইতেছে।

সূত্র। হেতুর্ব্বা স্যাদর্থবত্ত্বোপ-পত্তিভ্যাম্। ২৬

পদপাঠঃ। হেতুঃ। বা। স্যাৎ। অর্থ-বত্ত্বোপপত্তিভ্যাম্। (অর্থবত্ত্ব-উপপত্তিভ্যাম্ ইতি বিশ্লেষণং)

বঙ্গার্থঃ। হেতুঃ—হেতুবাক্য। বা—ই। (বৈ অবধারণে, তাহারই রূপান্তর 'বা' ইহার

*বহুদিন নানা দৈবদুর্ব্বিপাকে "মীমাংসা-দর্শন" প্রকাশিত করিতে পারি নাই। পাঠক-মহোদয়গণের মধ্যে অনেকে তজ্জন্য পত্রাদি দ্বারা উৎকণ্ঠা ও অসুবিধা জানাইয়াছেন। তাঁহাদের নিকট বিনীত ভাবে ত্রুটী স্বীকার করিতেছি। আশা করি, অতঃপর যথানিয়মে সহৃদয় পাঠক-মহোদয়গণের উৎকণ্ঠা নিবৃত্তি করিতে পারিব। ত্রুটীজন্য সহৃদয় মহোদয়-বর্গের নিকট ক্ষমার আশা করি।

বিনীত লেখক।

অর্থ—নিশ্চয়।) স্যাং—হইবে। অর্থবত্ত্বোপপত্তিভ্যাং—অর্থবত্ত্ব অর্থাৎ প্রয়োজনবত্তা এবং উপপত্তি এতদুভয় প্রযুক্ত। (অর্থবত্ত্বাদি প্রযুক্ত হেতুবন্নিগদ বাক্য হেতুপ্রতিপাদকই হইবে, স্তুতিবোধক হইবে না; এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের অভিপ্রায়।)

বিশদব্যাখ্যা। "শূর্পেণ জুহোতি তেনহি অন্নং ক্রিয়তে" ইত্যাদি বাক্যগুলি হেতুবন্নিগদ নামে খ্যাত। এইগুলি স্তুতিবোধক, কি হেতুবোধক, ইহাই প্রথম সন্দেহ। পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে হেতুবোধক। তিনি বলিতেছেন—"শূর্পের দ্বারা হোম করিবে, যেহেতু তাহা দ্বারা অন্ন নিষ্পাদন হয়"। এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, শূর্পের দ্বারা অন্ননিষ্পত্তি হয়, এই হেতু শূর্পদ্বারা হোম কর্ত্তব্য। এখানে অন্নকরণ, শূর্পদ্বারা হোমকরণে হেতু। যদি বলা যায়—এরূপ কার্য্যকারণভাব প্রসিদ্ধ নহে, তাহার উত্তরে বক্তব্য—লোকে অপ্রসিদ্ধ হইলেও, বেদবচন তাহা বিধান করিতে সমর্থ। যদি প্রশ্ন হয়, এরূপ হেতুনির্দ্দেশের প্রয়োজন কি? তদুত্তরে বলা যাইবে, অন্ননিষ্পাদনের কেবল শূর্পই একমাত্র কারণ নহে, আরও কারণ আছে, যেমন—দর্ব্বী ও পিঠর ইত্যাদি। তাহাদের দ্বারা ও অন্নসম্পাদন হয়, তাহাদের দ্বারাও হোম করা যাইতে পারে। শূর্পদ্বারা হোম করিবার কথায়, শূর্পদ্বারা অন্ন নিষ্পাদন হয়, এইরূপে 'অন্নকারণত্ব' হোমে হেতু বলা হইয়াছে। আরও দ্রষ্টব্য—হেতুবাক্য স্বীকার করিলে, লক্ষণাদি দোষ গ্রহণ করিতে হয় না, আর স্তুতি বুঝাইতে হইলে লক্ষণাদোষ গ্রহণ করিতে হয়। যেহেতু স্তুতিবাচক শব্দ নাই, কিন্তু হেতুবাচক শব্দ আছে। যদি বলা হয় যে, দর্ব্বী পিঠর ইত্যাদি সাক্ষাৎ অন্নসম্পাদক নহে; তাহারা অন্নকরণ বলিয়া আশঙ্কা করা না। তদুত্তরে এইমাত্র বলা যাইবে যে, যদি দর্ব্বীপিঠরাদি অন্নকরণ না হয়, তবে শূর্পস্তুতিও ব্যর্থ। যেহেতু, শূর্প ও সাক্ষাৎ অন্নসম্পাদক নহে। অতএব শূর্প অন্নসম্পাদন রূপ প্রয়োজন নিষ্পাদন করে বলিয়া, এবং হেতু পক্ষে লক্ষণাদি দোষ স্বীকার না করিয়া উপপত্তি হয়—এইজন্য হেতুবাক্য অবধারিত হয়। "যেহেতু শূর্প দ্বারা অন্ন সম্পন্ন হয়, সুতরাং শূর্প দ্বারা হোম করিবে" এই বাক্যে যে 'অন্নকরণতা হোমের হেতু' তৎসম্বন্ধে আর সংশয় থাকিতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষের এই খানেই বিশ্রাম, অতঃপর সিদ্ধান্তবাদী বলিতেছেন।

সূত্র। স্তুতিস্তু শব্দপূর্ব্বত্বাৎ, অচোদনাচ তস্য। ২৭

পদপাঠঃ। স্তুতিঃ। তু। শব্দপূর্ব্বত্বাৎ। অচোদনা। চ। তস্য।

বঙ্গার্থঃ। স্তুতিঃ—স্তুতি, স্তব বা প্রশংসা। তু—কিন্তু। (তু শব্দ পূর্ব্বপক্ষ হইতে পক্ষান্তরের সূচনা করিতেছে; এইরূপ আচার্য্য মত। অন্যপক্ষে ভাব এইরূপ—হেতু নয়, কিন্তু স্তুতি।) শব্দপূর্ব্বত্বাৎ—শব্দ দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে এই জন্য। অচোদনা—অবিধান। চ—আরও। তস্য—দর্ব্বী পিঠর প্রভৃতির। (শব্দ দ্বারা অন্নকরণ শূর্পহোমে হেতু ইহা প্রতিবাদিত বলিয়া স্তুতিপক্ষ স্থির। দর্ব্বীপিঠরাদির শব্দদ্বারা বিধান নাই, সুতরাং "দর্ব্বীপিঠরাদিহোমে

অন্নকরণ হেতু” ইহা শব্দপ্রতিপাদ্য নহে। অতএব হেতু নহে স্তুতি।)

বিশদব্যাখ্যা। শব্দদ্বারা প্রতিপন্ন হয়, সূর্পহোমে অন্নকরণ হেতু, সুতরাং দর্ব্বী-পিঠরাদিহোমের কথা এখানে উঠিতেই পারে না সূর্পের দ্বারা হোম করিতে হইবে, অন্য কিছুর দ্বারা নহে।

সূত্র। ব্যর্থে স্তুতিরন্যায্যেতি চেৎ। ২৮

ব্যর্থ—অর্থাৎ দর্ব্বীপিঠরাদির অন্নকরণত্ব না হইলে, সূর্পস্তুতি ও অন্যায়, যেহেতু সূর্প সাক্ষাৎ অন্নকরণ নহে; এই আপত্তির কথা যদি উল্লেখ কর, তাহার উত্তর দিতেছি। (পূর্ব্বপক্ষবাদীর উক্ত আপত্তির উত্তর দেওয়া হইবে পরসূত্রে। এ সূত্রে তাহার কথা উদ্ধৃত করিয়া, প্রতিজ্ঞা মাত্র করা হইল। সুতরাং এ সূত্রের পদপাঠ ব্যাখ্যাদির আবশ্যকতা নাই।) এই সূত্রোক্ত আশঙ্কার সমাধানে বলা হইতেছে।

সূত্র। অর্থস্তু বিধিশেষত্বাৎ যথালোকে। ২৯

পদপাঠঃ। অর্থঃ। তু। বিধিশেষত্বাৎ। যথা। লোকে।

বঙ্গার্থঃ। অর্থঃ—প্রয়োজন (আছে।) তু—কিন্তু। বিধিশেষত্বাৎ—বিধির শেষ-ভাগত্ব নিবন্ধন। যথা—যেমন। লোকে—ভুবনে (দেখা যায়।)

বিশদব্যাখ্যা। সূর্পস্তুতি অনর্থক, এই যে কথা পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছিলেন; তদুত্তরে বক্তব্য—সূর্পস্তুতি আমাদের পক্ষে ব্যর্থ নহে। আমাদের পক্ষে তাহাতে প্রয়োজন আছে। ঐ স্তুতিবচনকে আমরা বিধি-বাক্যের শেষাংশরূপে গ্রহণ করিয়া, বিধির সহিত একবাক্যতা সম্পাদন করিতে পারিব। হেতুবাদীর পক্ষে এই দোষ যে—“তেনহি অন্নংক্রিয়তে” অর্থাৎ সেই সূর্প দ্বারা অন্ন-নিষ্পাদন হয়, এখানে ‘ক্রিয়তে’ এই বর্ত্ত-মানকালীন উক্তি দ্বারা, বেদবাক্য, শক্যার্থ বিধান করিতে বাধ্য হয়; সুতরাং ‘ক্রিয়তে’ কথাটী তাহার যথোচিত বর্ত্তমানকাল-বোধকতা পরিত্যাগ করিয়া, কর্ত্তব্যার্থ-প্রতিপাদক হইয়া যায়। এটী প্রবল দোষ। কেন না “বিধৌ ন পরঃ শব্দার্থঃ প্রতীয়তে।” বিধিপক্ষে শক্যতাবচ্ছেদকাতিরিক্ত অর্থ প্রতীত হওয়া অসঙ্গত। আমাদের পক্ষে স্তুতিবাক্যে সে দোষ নাই। অবর্ত্তমান পদার্থের স্তুতির জন্য বর্ত্তমানের উপদেশ অন্যায় নহে। যেমন আমরা সূর্পের দ্বারা অন্ন ক্রিয়মাণ জানি, সেইরূপ সূর্প দ্বারা অন্ন কৃত হইতেছে; এই ভাবে বুঝিতে দোষ নাই। লোকে যেমন দেখা যায়, “বলবান্ দেবদত্ত যজ্ঞদত্তাদির আক্রমণ সহ্য করিতে পারে” এরূপ বলিলে, দেবদত্তের বিশেষণ ‘বলবান্’ শব্দ ‘প্রকৃষ্টবলশালী’ অর্থ বুঝাইয়াও, সিংহশার্দ্দুলাদি বলবান্ জন্তুর অপেক্ষায় প্রকৃষ্টবলবত্তা বুঝায় না। যাহারা দেবদত্ত অপেক্ষা হীনবল, তাহাদের অপেক্ষায় প্রকৃষ্টবলতা বুঝায়। তদ্রূপ, সূর্পদ্বারা অন্ন করা হয়, এই প্রকৃষ্ট-অন্নকরণত্ব দ্বারা সূর্পের স্তুতি করা হইলে, যাহারা সূর্প অপেক্ষা নিকৃষ্ট-অন্নকরণ, তাহাদের অপেক্ষায় সূর্পের প্রকৃষ্ট-অন্নকরণতা বুঝা যায়। সূর্প একমাত্র শ্রেষ্ঠ বা সাক্ষাৎ অন্নকরণ এরূপ বুঝা উচিত

নয়। সুতরাং সূর্পস্তুতির ব্যর্থতা কোথায়?

পূর্ব্বপক্ষবাদীর আশঙ্কার উত্তর দেওয়া হইল, সম্প্রতি স্বসিদ্ধান্তে যুক্তি প্রদর্শন করা হইতেছে। কেবল অপরপক্ষের আক্ষেপের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেই স্বপক্ষ সংস্থাপিত হয় এরূপ নহে, স্বপক্ষসংস্থাপক যুক্তিজালেরও অবতারণা করিতে হয়। অধুনা আচার্য্য এই সুসঙ্গত প্রণালীর অনুসরণ করিতেছেন।

সূত্র। যদিচ হেতুঃ অবতিষ্ঠেত নির্দ্দেশাৎ, সামান্যাদিতিচেৎ অব্যবস্থা বিধীনাং স্যুঃ। ৩০॥

পদপাঠঃ। যদিচ। হেতুঃ। অবতিষ্ঠেত। নির্দ্দেশাৎ। সামান্যাৎ। ইতি। চেৎ। অব্যবস্থা। বিধীনাং। স্যুঃ।

বঙ্গার্থঃ। যদিচ—যদিও। (যদ্যপি) হেতুঃ—অন্নকরণত্ব হোমে হেতু হয়)। অবতিষ্ঠেত—(সূর্পেই) তাহা অবস্থিত হইবে। নির্দ্দেশাৎ—(বেদবাক্যে "সূর্প" শব্দ দ্বারা) তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এই জন্য। সামান্যাৎ—সামান্য নির্দ্দেশ হইতে (নির্ণয় করিব)। ইতি—এইরূপ। চেৎ—যদি বলা যায়। অব্যবস্থা—ব্যবস্থার অভাব, বিশৃঙ্খলতা। বিধীনাং—বিধিসমূহের। স্যুঃ—হইবে। (যদি অন্নকরণত্ব সামান্য ভাবে গ্রহণ করা হয়, তবে বিধি সমূহের ব্যবস্থা রক্ষা হইবে না। আমাদের পক্ষে স্তুতিবাদে ব্যবস্থা আছে। সূর্প দ্বারা হোম করিতে অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির প্রতি সূর্পের "অন্নকরণত্ব" উল্লেখ দ্বারা স্তুতি করিলে, প্ররোচনা জন্মিতে পারে; ইহাই এতৎপক্ষের স্বরসতা।)

বিশদব্যাখ্যা। যদিবা 'অন্নকরণত্ব' হোমের হেতু বলা যায়, তথাপি দর্ব্বীপিঠরাদি হোমসাধন হইতে পারিবে না; সূর্প হইবে। শব্দ দ্বারা সূর্পের অন্নকরণত্ব হোমে হেতু জানা যায়, দর্ব্বীপিঠরাদির অন্নকরণত্ব হোমে হেতু, এরূপ জানা যায় না, কারণ তাহাদের বাচক শব্দ নাই। নির্দ্দেশ দেখা যাইতেছে—যেমন "যেহেতু অগ্নি অত্যন্ত উপধ্মাত হইয়াছে, তজ্জন্য তাহাদ্বারা গৃহ দগ্ধ হইয়াছে" এরূপ বলিলে, অত্যন্ত উপধ্মাত—অগ্নি ব্যতীত অন্য পদার্থ দ্বারা দগ্ধ হওয়া বুঝা যায় না। তদ্রূপ "যেহেতু সূর্প দ্বারা অন্ন নিষ্পন্ন হয়, তজ্জন্য সূর্প দ্বারা হোম করিবে" বলিলে, সূর্পব্যতীত অন্য অন্ন-নিষ্পাদকের দ্বারা হোম করা বুঝা যায় না। আর যদি বলা হয় যে, যাহা যাহা দ্বারা অন্নসম্পাদন হয়, (প্রণালী সম্বন্ধে অর্থাৎ পরম্পরায় যাহারা অন্ননিষ্পাদক) তাহাদের দ্বারা হোম করিবে; তাহাতে বিধিবাক্যে ব্যবস্থা থাকে না। কারণ, কোনওটীর দ্বারা হোম করা হইতে পারে না। এখানে 'হোম করিবে' বলিলেই অন্নকরণের দ্বারা হোম বুঝা যায়, কিন্তু নির্দ্দেশ না থাকায় কাহারও দ্বারা হোম হয় না। আমাদের পক্ষে সে অব্যবস্থা নাই। কারণ সূর্পের স্তুতি করা হইতেছে। "যেহেতু তাহা দ্বারা অন্ন করা হয়," এই বাক্য বৃত্তান্তজ্ঞাপনের জন্য নহে; বৃত্তান্তের অনুকথনজন্য। বৃত্তান্তানুকথন দ্বারা সূর্পের প্রশংসা করায় প্ররোচনা হয়। প্রশংসিত সাধনের প্রতি প্ররোচনা উৎপন্ন হওয়া স্বভাবিক। সুতরাং স্তুতির ফল প্ররোচনা, তাহার ফল হোমে প্রবৃত্তি। হেতুপক্ষে লাভ নাই। বিশেষতঃ বিধির অব্যবস্থা

ান অসম্ভব। অতএব "হেতুবন্নিগদ" স্তাবকবাক্য মাত্র। হেতুবন্নিগদাধিকরণ পরিসমাপ্ত হইল। আগামিতে মন্ত্রলিঙ্গাধিকরণের আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীকেদারনাথ ভারতী
যশোহর বেদবিদ্যালয়।

ব্রহ্ম-স্তুতি।*

(শ্রীমদ্ভাগবত)
(ব্রহ্মা কর্তৃক শ্রীভগবানের স্তব)

যুগান্ত-জলধি জলে—অনন্ত-শয়নোপরি,
শয়িত, শ্যামলকান্তি বিরাট্ পুরুষ হরি।
যোগ-বলে ব্রহ্মা তাঁর লভি পুণ্য দরশন,
পূর্ণ-জ্ঞানী হ'য়ে স্তবে তুষ্ট করে নারায়ণ।

১।

জ্ঞাতোঽসি মেঽদ্য সুচিরান্নমু দেহভাজাং
ন জ্ঞায়তে ভগবতো গতিরিত্যবদ্যং।
নান্যত্ত্বদস্তি ভগবন্নপি যন্ন শুদ্ধং
মায়াগুণ ব্যতিকরাদ্ যদুরু বিভাসি॥

বহুদিন পরে উপাসনা ক'রে
চিনিনু তোমারে আজি নারায়ণ।
চেনেনা তোমায় কেন হায় হায়!!
অভাগা—এভবে যত জীবগণ।
তুমি বই আর নাহি কিছু সার,
অসার সংসার ভাবেনা কেন?
মায়ার ছলনে এ তিন ভুবনে
সত্য বলি সব মনে হয় যেন!

*ব্রহ্মার স্তোত্র। এই স্তবটি অতিদুর্লভ। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সন্ন্যাসিগণ এই স্তব স্বরসংযোগ বিশুদ্ধ তানলয়ে যখন গান করেন, তখন কিরূপ শ্রুতিসুখকর হয়; তাহা যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন তাঁহারাই অনুভব করিতে পারেন। আমরা বহু যত্নে এই স্তব সংগ্রহ করিয়া তাহার পদ্যে বঙ্গানুবাদ করিয়া মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ভরসা করি ভগবানের স্তব পাঠকারী প্রত্যেক সহৃদয় ব্যক্তিই এই স্তবও তাহার বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইবেন। নিবেদন মিতি।

নিবেদক—

রূপং যদেতদববোধ রসোদয়েন
শশ্বন্নিবৃত্ততমসঃ সদনুগ্রহায়।
আদৌ গৃহীতমবতারশতৈকবীজং
যন্নাভিপদ্মভবনাদহমাবিরাসং॥

তুমি সে নির্গুণ ব্রহ্ম পরাৎপর,
তব্ ধর রূপ অতি মনোহর।
উপাসকে দয়া করিতে প্রচার,
কত শত শত তব অবতার।
সে সবার মূল এই মূর্ত্তি তব,
যাঁর নাভি-পদ্মে আমার উদ্ভব।

৩।

নাতঃ পরং পরম যদ্ভবতঃ স্বরূপং
আনন্দমাত্র মবিকল্পমবিদ্ধবর্চ্চঃ।
পশ্যামি বিশ্বসৃজমেক মবিশ্বমাত্মন্
ভূতেন্দ্রিয়াত্মকমদস্ত উপাশ্রিতো ঽস্মি॥

হে পরম, তব রূপ দেখিনু আঁখিতে যাহা,
নির্বিকল্প নিত্যজ্যোতিঃ আনন্দস্বরূপ তাহা।
ছিল যাহা অপ্রকাশ, ইহা সেই স্বপ্রকাশ,
ইহা সেই পরব্রহ্ম নাহি অন্য ইহা ছাড়া।
হে আত্মন্! এ ভুবন যে রূপে কর সৃজন
সেই তব এইরূপ কিন্তু ইহা বিশ্ব ছাড়া।
ভূত বা ইন্দ্রিয় সব ইহা হ'তে সমুদ্ভব
তাই তব এইরূপ করিয়াছি উপাশ্রয়,
উপাস্য-গণের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ অতিশয়।

৪।

তদ্বা ইদং ভুবনমঙ্গল মঙ্গলায়
ধ্যানে স্ম নো দর্শিতং ত উপাসকানাং।
তস্মৈ নমো ভগবতে হনুবিধেম তুভ্যং
যো নাদৃতো নরকভাগ্ভিরসৎ প্রসঙ্গৈঃ॥

ভুবন-মঙ্গল! করিতে মঙ্গল
ধ্যানে উপাসকে যেরূপ দেখাও।
এই সেইরূপ চিদানন্দরূপ
নিত্য সত্য ইহা, আর কি ভুলাও!
তাই নমস্কার করি অনিবার,
মায়াতীত! তুমি নহ মায়াময়;
তোমার এরূপ মায়ার স্বরূপ
বলিয়া যেজন পুজেনা, নিশ্চয়
নারকী সেজন ঘৃণিত দুর্জ্জন
অজ্ঞানতিমিরে মগ্ন দুরাশয়।

৫।

যে তু ত্বদীয়চরণাম্বুজ কোষগন্ধং
জিঘ্রন্তি কর্ণ-বিবরৈঃ শ্রুতিবাতনীতং।
ভক্ত্যা গৃহীতচরণঃ পরয়া চ তেষাং
নাপৈষি নাথ হৃদয়াম্বুরুহাৎ স্বপুংসাং॥

শ্রুতি-সমীরণ করিয়া বহন
তব পদাম্বুজ-গন্ধ সুশোভন।
আনি দেয় নরে, শ্রবণ বিবরে
করে ঘ্রাণ তাই যে জন সুজন।
পরা ভক্তি ডোরে পদে বাঁধা প'ড়ে
থাক তার হৃদি সরোজে তখন।
সুজন বলিয়া তারে ধরা দিয়া,
স্বজন বলিয়া করহে গ্রহণ।

৬।

তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহ সুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো বিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্ত্তিমূলং
যাবন্নতে হ ঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ॥

তব পদাশ্রয় করিলে নিশ্চয়
যায়—দূরে যায় যত সব ভয়।
ধন প্রাণ ল'য়ে পত্নী বা তনয়ে
বিনাশের ভয়ে আকুল হৃদয়।
সে সবার তরে শোক এ অন্তরে
স্পৃহা তায়, তার লাগি পরাভব।
অতি লোভ তাতে আবার লোভেতে
"আমার" বলিয়া মমতা-উদ্ভব।
ক্লেশের এ মূল হইবে নির্ম্মূল
তুমি যার হৃদে হইবে উদয়,
হৃদয় জুড়িয়া রয়েছ উদিয়া
যার কাছে, তার ক্লেশে কিবা ভয়।

৭।

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ
সর্ব্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।
কুর্ব্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা
লোভাভিভূত মনসো হকুশলানি শশ্বৎ॥

হায়! হত-বুদ্ধি তারা তোমার প্রসঙ্গে যারা
অশুভ করিতে ক্ষয় সর্ব্বদা বিমুখ,
বিফল ইন্দ্রিয় ধরি, হরি, তোমা পরিহরি,
সুখভ্রমে আলিঙ্গন করিতেছে দুখ।
অহো! কিবা দৈব গতি, এরা দীন হীন মতি
লোভে বশীভূত হ'য়ে হারাইতে সুখ,
সঞ্চয়ে অশুভ রাশি নিত্য নিত্য শুভনাশী
লবমাত্র কামসুখে হ'য়ে অভিমুখ।

৮।

ক্ষুত্তৃট্ ত্রিধাতুভিরিমা মুহুরর্দ্যমানাঃ
শীতোষ্ণবাতবর্ষৈ রিতরেতরাচ্চ।
কামাগ্নিনাচ্যুতরুষাচ সুদুর্ভরেণ
সংপশ্যতো মন উরুক্রম সীদতে মে॥

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বড়ই কাতর,
শ্লেষ্মা, পিত্ত, বাতে জীর্ণ কলেবর।
শীত, গ্রীষ্ম, বায়ু, বর্ষাতে পীড়িত,
কামানলে দগ্ধ, ক্রোধে অভিভূত।
পুত্র পত্নী হ'তে পাইতেছে ক্লেশ,
এ হেন প্রজারে দেখিয়া পরেশ!
ভাবি মনে, এরা কেমনে নিস্তার
পাবে, তাই বড় সহি দুঃখ ভার।

৯।

যাবৎ পৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থ—
মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ! পশ্যেৎ।
তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত
ব্যর্থাপি দুঃখ নিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা॥

যত কাল ধরি এ সংসারে হরি!
দেখিবে মানব তব মায়া বল,—
(যার ফাঁদে পড়ি আত্মা, দেহ ধরি
অবিশ্রান্ত ভবে ঘুরিছে কেবল।)
না হবে সংসার নিবৃত্ত তাহার,
তাবৎ বহিতে হবে দুঃখ ভার,
হইবে বিফল করম সকল
দুখ বই কিছু না দেখিবে আর।
কতবার ভবে আসিতে হইবে,
না হবে আবৃত্তি নিবৃত্তি তাহার।
যাবৎ তোমারে মায়ার আঁধারে
দেখিয়াও জীব দেখিবে না আর।

১০।

অহ্ন্যাপৃতার্ত্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থ রচনা ঋষয়োঽপি দেব!
যুষ্মৎ-প্রসঙ্গ-বিমুখা ইহ সংসরন্তি॥

তোমার ভজনে হইয়া বিমুখ,
সিদ্ধ ঋষিগণ নহে পূর্ণসুখ।
ধ্যান, তপঃ, যোগ, সকলি বিফল,
সংসারের দুখ জ্বলিছে প্রবল।
বিষয়ে ব্যাপৃত—সারাটি বাসর,
তাই ক্লেশে শ্লথ ইন্দ্রিয় নিকর।
নিশাযোগে নাহি শয়ন শয্যায়,
যদিবা শয়ন, নিদ্রা কৈ তায়!
যদি আসে নিদ্রা, ভাঙ্গে ক্ষণে ক্ষণে,
বৃথা মনোরথ জাগে যবে মনে।
ভাবিলে কি হবে ধনের ভাবনা,
করিছে তাহাতে দৈব প্রতারণা।
তাই বলি দেব, তোমাকে ছাড়িয়া,
যাইবে সাধন বিফল হইয়া।

১১।

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎ-সরোজ!
আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো নন্থু নাথ পুংসাং
যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥

অভক্তের কথা কেন কই বৃথা!
ভক্তি বিনা নাই সাধনা আর।
হৃদয়-কমলে ভক্তি-যোগ-জলে,
যে জন ক্ষালিত করে বার বার;
সেজন তখন করিয়া শ্রবণ
তব গুণ; তবে সুপথ পায়,
হৃদয় উজলি শ্যামরূপ ঢালি,
দাও, হে শ্যামল-সুন্দর-কায়!
যদি ভক্তজনে কদাপি না শুনে
তব গুণাবলী, হে ভক্তবৎসল,
তব ধ্যান-বলে আনে হৃদি স্থলে,
নব নব রূপ তব ভক্ত-দল।
সেইরূপ ধরি দেখা দাও হরি,
যেরূপের ভক্ত, ভকত তোমার,
ভকতের তরে নানারূপ ধ'রে
পুরাইছ নাথ! বহু আশা তার।

১২।

নাতিপ্রসীদতি তথোপচিতোপচারৈঃ
আরাধিতঃ সুরগণৈর্হৃদিবদ্ধ-কামৈঃ।
যৎ সর্ব্বভূত-দয়য়া সদলভ্যয়ৈকো
নানাজনেষ্ববহিতঃ সুহৃদন্তরাত্মা॥

কামনাবিহীন হইয়া যে জন
ডাকে জনার্দ্দন! বারেক তোমায়;
দাও তারে তব শুভ দরশন
অবিলম্বে নাথ! হইয়া উদয়।
কিন্তু, দেবগণ সকাম মানসে
সুরভি কুসুম উপহার দিয়া,
পূজে যদি তোমা প্রসাদের আশে,
তবু না তাকাও প্রসন্ন হইয়া।
অথচ বিরাজ তুমি সর্ব্ব-ভূতে—
কৃপাময়, কৃপা করিয়া বিস্তার,
সকলের সখা তুমি এ জগতে
অন্তরাত্মা রূপে করহে বিহার।

১৩।

পুংসামতো বিবিধ-কর্ম্মভিরধ্বরাদ্যৈঃ
দানেন চোগ্রতপসা পরিচর্য্যয়া চ।
আরাধনং ভগবতস্তব সৎক্রিয়ার্থো
ধর্ম্মোঽর্পিতঃ কর্হিচিদ্ম্রিয়তে ন যত্র॥

কিন্তু তব প্রীতি করিতে সাধন,
সকাম হৃদয়ে সুধী সাধুগণ,
যাগ-যজ্ঞ-আদি নানাকর্ম্ম করি,
দান, উগ্রতপঃ, ব্রতচর্য্যা ধরি,
ভগবন্! তব আরাধন তরে
যে যে সৎক্রিয়া অনুষ্ঠান করে,
সেই ক্রিয়া-ধর্ম্ম তোমাতে অর্পিলে
বিলীন হইয়া না যায় বিফলে।

১৪।

শশ্বৎ স্বরূপমহসৈব নিপীতভেদ-
মোহায় বোধধিষণায় নমঃ পরস্মৈ।
বিশ্বোদ্ভবস্থিতিলয়েষু নিমিত্তলীলা-
রাসায়তে নম ইদং চক্রমেশ্বরায়॥

স্ব-রূপের শক্তি তুমি করিয়া প্রকাশ,
জীব ব্রহ্মে ভেদ——এ মোহের অবসান
করিয়াছ, তাই তোমা করি নমস্কার।
জ্ঞানের স্বরূপ তুমি পরাৎপর অন্তর্যামী,
জীববৎ নহ তুমি অজ্ঞানে আবৃত।
এ বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের এই রীতি—
ইহার নিমিত্ত যিনি, সেই মায়া তব,
করিছেন যে বিলাস, তাই ল'য়ে তব বাস,
প্রণতি শ্রীপদে তব ওহে পীতবাস!

১৫

যস্যাবতারগুণকর্ম্মবিড়ম্বনানি
নামানি যেঽসুবিগমে বিবশা গৃণন্তি।
তে হনেকজন্মশমলং সহসৈব হিত্বা
সংযান্ত্যপাবৃতমৃতং তমজং প্রপদ্যে॥

যে নামেতে পড়ে মনে তব অবতারগণে,
যে নাম লইলে মনে হয় তবগুণ রাশি;
যে নাম স্মরিলে তব মনে জাগে সেই সব—
গোবর্দ্ধনধারণাদি কর্ম্মসমুদয় আসি।
বিবশ এ প্রাণিচয় যদি তব নাম লয়
প্রাণান্ত সময়ে, নাথ! অজামিল আদি যথা;
বহুজন্মার্জ্জিত পাপ যায় তার মনস্তাপ,
পায় সে সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মে, সত্য কথা।
ভগবন্! সেই তুমি নিত্য চিদানন্দভূমি
মায়াতীত পরব্রহ্ম নয়নসমক্ষে মম,
পেয়েছি তোমায় প্রভু, ছাড়িব না আর কভু,
শরণ লইনু পদে, আশ্রয়ণ। মোনমঃ।

১৬।

যো বা অহঞ্চ গিরিশশ্চ বিভুঃ স্বয়ঞ্চ
স্থিত্যুদ্ভব-প্রলয়-হেতব আত্মমূলং।
ভিত্ত্বা ত্রিপাদ্ববৃধ এক উরুপ্ররোহ
স্তস্মৈ নমো ভগবতে ভুবনদ্রুমায়॥

আছি মোরা তিন জন
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,—
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়েতে
হ'য়ে প্রভো! অগ্রসর।
এই তিন—তিন স্কন্ধ,
যে তরুর আছে আর,
মরীচিপ্রভৃতি শাখা—
প্রশাখা—মন্বাদি যার।
নিজ অধিষ্ঠান-ভূমি
প্রকৃতিরে করি ভেদ,
হয়েছ প্রকাশ তুমি
ত্রিগুণে হ'য়ে ত্রিভেদ।
সেই সে ভুবন-তরু
তুমি, করি নমস্কার
ভগবন্! আমি আজ
তব পদে বার বার।

১৭।

লোকো বিকর্ম্মনিরতঃ কুশলে প্রমত্তঃ
কর্ম্মণ্যয়ং ত্বদুদিতে ভবদর্চ্চনে স্বে।
যস্তাবদস্য বলবানিহ জীবিতাশাং
সদ্যশ্ছিনত্ত্যনিমিষায় নমোঽস্তু তস্মৈ॥

বল তুমি, তোমারে পূজিতে দেব! নিরন্তর,—
তাহে নহে মনোযোগী, কুকর্ম্মেতে রত নর!
হেন দুরাশয় জীবে যে জীবনে সংহারিবে,
তুমি সেই কালরূপী মহাবল ভগবান্;
প্রণমি তোমারে নাথ! সদা তুমি বর্ত্তমান।

১৮।

যস্মাদ্বিভেম্যহমপি দ্বিপরার্দ্ধধিষ্ণ্য
মধ্যাসিতঃ সকল-লোক-নমস্কৃতং যৎ।
তেপে তপো বহুসবো হ বরুরুৎসমান
স্তস্মৈ নমো ভগবতে হধিমখায় তুভ্যং॥

দ্বিপরার্দ্ধ-কালস্থায়ী সর্ব্বলোক-নমস্কৃত
এই 'সত্যলোকে' বসি, হ'য়েছি যে কালে ভীত।
যাহাকে করিতে বশ, কত তপঃ আরাধনা
করিয়াছি—কত যজ্ঞ, কত ব্রত উপাসনা।
সেই কালরূপী তুমি যাগাদির অধিষ্ঠাতা;
করি নমস্কার তোমা, তুমি এ বিশ্বের ধাতা।

১৯।

তির্য্যঙ্ মনুষ্যবিবুধাদিষু জীবযোনিষ্বা-
স্মেচ্ছয়াত্মকৃত-সেতু পরীপ্সয়া যঃ।
রেমে নিরস্তবিষয়োঽপ্যবরুদ্ধ-দেহ
স্তস্মৈ নমো ভগবতে পুরুষোত্তমায়॥

নিজ-ইচ্ছাক্রমে ধরি নানারূপ।
মনুষ্য, দেবতা, তির্য্যগ্-যোনিতে;
স্বধর্ম্মমর্য্যাদা করিতে পালন
করিতেছ ক্রীড়া কত শত রূপ।
বিষয়েতে মত্ত কখন'ত নও,
বিষয়ীর মত তবু যেন হও।
বিদিত ভুবনে, তব দেহ নাই
অদেহ! এদেহ তব ভক্ত-ঠাঁই,
'পুরুষ-উত্তম' বলিয়া তোমায়,
গাইছে ত্রিলোক, বেদ, সদা গায়।
'নমো ভগবতে' বলি, নমস্কার
করিতেছি পদে দেব! অনিবার।

২০।

যো বিস্ময়ানুপহতোঽপি দশার্দ্ধবৃত্ত্যা
নিদ্রামুবাহ জঠরীকৃত-লোক-যাত্রঃ।

অন্তর্জলে হি কশিপুস্পর্শানুকূলাং
ভীমোর্ম্মিমালিনি জনস্য সুখং বিবৃণ্বন্ ॥

নিজ বৃত্তি ধরি, অবিদ্যা সুন্দরী
যদিও তোমাকে করেনি বশ,
তবুও প্রলয়ে জলধি নিলয়ে
জঠরে ত্রিলোক করিয়া বশ,—
জলের ভিতরে সর্প শয্যা' পরে
ভীম-উর্ম্মিমালা দোলায় শুয়ে,
নিদ্রাতে বিমুখ, তবু নিদ্রাসুখ
কর অনুভব স্বসুখে র'য়ে।

২১।

যন্নাভিপদ্মভবনাদহ মাসমীড্যঃ
লোকত্রয়োপকরণো যদনুগ্রহেণ।
তস্মৈ নমস্ত উদরস্থ-ভবায় যোগ-
নিদ্রাবসান-বিকসন্নলিনেক্ষণায় ॥

নাভি-পদ্মগৃহে যাঁর
ছিনু আমি জন্ম ল'য়ে,
ত্রিলোকের সৃষ্টিরূপ
করি নানা উপকার।
যোগ-নিদ্রা-অবসানে,
নলিননয়ন দুটী
হয় বিকসিত যাঁর,
পদ্মসম দিনমানে।
বিপুল-উদরে যিনি
ত্রিলোক করিয়া গ্রাস,
যেন ক্লান্তি-পরিশূন্য—
মিতাহারী জনে জিনি!
যাঁর নাভিপদ্মগৃহে
হ'য়ে আমি আবির্ভূত,
ত্রিলোকের উপকার
করি যাঁর অনুগ্রহে।
সেই তুমি নারায়ণ
করি নমস্কার পদে,
দাও কৃপাকরি শক্তি
সৃজিতে এ ত্রিভুবন।

শ্রীজানকীনাথ পাল বি, এল।

ধর্ম্ম-পদ।

বাল-বর্গ।

দীঘা জাগরতো রত্তি দীঘং সন্তস্স যোজনং
দীঘো বালানং সংসারো সদ্ধম্মং অবি-
জানতং ॥১॥

অনুবাদ। যে জাগরিত থাকে, তাহার নিকট রাত্রি দীর্ঘ বোধ হয়; যে শ্রান্ত হয়, তাহার নিকট যোজনপথ দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়; সেইরূপ যে সকল মূর্খ সত্য-ধর্ম্ম জানে না, তাহাদের নিকট জীবনও অতি দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়।

চরঞ্চে নাধিগচ্ছেয়্য সেয্য সদিসমত্তনো।
একচরিয়ং দল্হং কয়িরা নত্থি বালে
সহায়তা ॥২॥

যদি কোন ব্যক্তি ভ্রমণ করিতে করিতে, আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিম্বা আপনার সমান কোন ব্যক্তিকে না পান, তবে তাঁহার একাকী ভ্রমণ করাই কর্ত্তব্য; কারণ মূর্খের সঙ্গ কিছুতেই উচিত নহে। মূর্খের সহিত সঙ্গ করা না করা উভয়ই সমান।

পুত্তামত্থি ধনম্মত্থি ইতি বালো
বিহঞ্ঞতি।
অত্তাহি অত্তনো নত্থি কুতো পুত্তো কুতো
ধনং ॥৩॥

অনুবাদ। 'আমার পুত্র আছে, আমার ধন আছে'—মূর্খেরা এই চিন্তা করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করে। যখন আপনি-ই আপনার নহে, তখন পুত্র কিম্বা ধন কিরূপে আপনার হইবে?

যো বালো মঞ্ঞতী বাল্যং পণ্ডিতো বাপি তেন সো।
বালো চ পণ্ডিতমানী স বে বালো হুতি-বুচ্চতি ॥৪॥

অনুবাদ। যে মূর্খ আপনার মূর্খতা অবগত আছে, সে সেই পরিমাণে জ্ঞানী, কিন্তু যে মূর্খ আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাকেই যথার্থ মূর্খ বলা যায়।

যাবজীবম্পি চে বালো পণ্ডিতম্ পয়িরু-পাসতি।
ন সো ধম্মং বিজানাতি দব্বী সূপরসং যথা ॥৫॥

যেমন দর্ব্বী (চিরকাল সূপরসের মধ্যে থাকিলেও) কখন সূপরস আস্বাদন করিতে পারে না, সেইরূপ মূর্খ ব্যক্তি চিরজীবন পণ্ডিতসন্নিধানে বাস করিলেও "ধর্ম্ম কি" তাহা জানিতে পারে না।

মুহুত্তমপি চে বিঞ্ঞূ পণ্ডিতম্ পয়িরু-পাসতি।
খিপ্পং ধম্মং বিজানাতি জিহ্বা সূপরসং যথা ॥৬॥

অনুবাদ। যেমন জিহ্বা মুহূর্ত্তমধ্যে সূপরস আস্বাদন করিতে পারে, সেইরূপ বিজ্ঞ ব্যক্তি পণ্ডিতসন্নিধানে ক্ষণকাল থাকিলেও, 'ধর্ম্ম কি' তাহা শীঘ্রই জানিতে পারেন।

চরন্তি বালা দুম্মেধা অমিত্তেনেব অত্তনা।
করোন্তা পাপকং কম্মং যং হোতি কটুকপ্-ফলং ॥৭॥

অনুবাদ। অল্পমেধা মূর্খ ব্যক্তিগণ, যাহার ফল কটু, (তিক্ত) এরূপ পাপকর্ম্মের শত্রুভাচরণ করে।

ন তং কম্মং কতং সাধু যং কত্বা অনুতপ্পতি।
যস্‌স অস্‌সুমুখো রোদং বিপাকং পটি-সেবতি ॥৮॥

অনুবাদ। যে কর্ম্ম করিয়া লোকের অনুতাপ করিতে হয়, এবং যাহার ফল রোদনোন্মুখে গ্রহণ করিতে হয়, সে কর্ম্ম করা ভাল নয়।

তঞ্চ কম্মং কতং সাধু যং কত্বা নানুতপ্পতি।
যস্‌স পতীতো সুমনো বিপাকং পটি-সেবতি ॥৯॥

অনুবাদ। যে কার্য্য করিয়া লোকের অনুতাপ করিতে হয় না, এবং যাহার ফল আনন্দে ও প্রফুল্লমনে গ্রহণ করিতে পারা যায়, সেই কর্ম্ম করা ভাল।

মধুবা মঞ্ঞতী বালো যাব পাপং ন পচ্চতি।
যদা চ পচ্চতী পাপং অথ বালো দুক্খং নিগচ্ছতি ॥১০॥

অনুবাদ। যতক্ষণ পাপ পরিপক্ক না হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ পাপের ফল না ফলে, ততক্ষণ মূর্খ ব্যক্তি তাহাকে মধুর বলিয়া বিবেচনা করে। কিন্তু যখন পাপ পরিপক্ক হয়, তখন তাহাকে দুঃখ পাইতে হয়।

মাসে মাসে কুশগ্গেন বালো ভুঞ্জেথ ভোজনং।
ন সো সঙ্খতধম্মানং কলং নাগ্ঘতি সোলসিং ॥১১॥

অনুবাদ। মূর্খ ব্যক্তি মাসে মাসে কুশাগ্র দ্বারা অন্ন ভোজন করিলেও, যে সকল ব্যক্তি ধর্ম্ম জ্ঞাত আছেন—তাঁহাদের ষোড়শাংশের একাংশেরও উপযুক্ত নহে।

নহি পাপং কতং কম্মং সজ্জুখীরং ব
মুচ্চতি।
ডহন্তং বালমন্বেতি ভস্মাচ্ছন্নো ব
পাবকো ॥১২॥

অনুবাদ। যেমন সদ্যঃপ্রাপ্ত দুগ্ধ শীঘ্র ছাড়ে না, (অর্থাৎ নষ্ট হয় না) তেমনি কৃত পাপকর্ম্ম শীঘ্র ছাড়ে না। ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় দহন করিতে করিতে মূর্খকে অনুসরণ করে।

যাবদেব অনত্থায় ঞত্তং বালস্‌স জায়তি।
হন্তি বালস্‌স সুক্কংসং মুদ্ধমস্‌স বিপাতয়ং॥১৩

অনুবাদ। যখনই পাপকর্ম্ম প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তখনই উহা মূর্খের অনর্থ ঘটায়; মূর্খের মস্তকে আঘাত করিয়া তাহার সৌভাগ্য হরণ করে।

অসতং ভাবনামিচ্ছেয্য পুরেক্‌খারঞ্চ
ভিক্‌খুসু।
আবাসেসু চ ইস্‌সরিয়ং পূজা পরকুলেসুচ॥১৪

অনুবাদ। মূর্খ ব্যক্তি মিথ্যা খ্যাতি লাভ করিতে ইচ্ছা করুক, ভিক্ষুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের ইচ্ছা করুক; বিহারে কর্ত্তৃত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করুক; এবং অন্য লোকের পরিবারবর্গের নিকট পূজা লাভ করিতে ইচ্ছা করুক।

মমেব কতমঞ্ঞন্তু গিহী পব্বজিতা উভো।
মমেবাতিবসা অস্‌সু কিচ্চা-কিচ্চেসু কিস্মিচি
ইতি বালস্‌স সঙ্কপ্পো ইচ্ছা মানো চ
বড্‌ঢতি ॥১৫॥

অনুবাদ। গৃহী এবং ভিক্ষু উভয়েই, ইহা আমি করিয়াছি বিবেচনা করুক। কার্য্যাকার্য্য সকল বিষয়েই আমার একান্ত বশবর্ত্তী হউক। মূর্খ ব্যক্তি, এইরূপ সঙ্কল্প করে এবং তাহার সঙ্কল্প ও অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

অঞ্ঞাহি লাভূপনিসা অঞ্ঞা নিব্বান-
গামিনী।
এবমেতং অভিঞ্ঞায় ভিক্‌খু বুদ্ধস্‌স
সাবকো।
সক্কারং নাভিনন্দেয্য বিবেকমনুব্রূহয়ে॥১৬

অনুবাদ। লাভের পথ এক, নির্ব্বাণের পথ আর। বুদ্ধশিষ্য ভিক্ষু ইহা জানিয়া সম্মান আকাঙ্ক্ষা করেন না, বিবেক অবলম্বন করেন। অর্থাৎ সংসার, অসচ্চিন্তা, এবং উপাধি পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণ অনুসন্ধান করেন। ক্রমশঃ---

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

গান।

ধরার কীট—প্রভু!
তোমারি পদধূলি,
অসার মোহ-মদে
তোমারে থাকি ভুলি';

সলিল-কণা সম
উঠে'ছি ফুটে ভবে,
নিমেষে মিলাইব
কখন জানি কবে?

ভুলিয়ে থাকি তবু,—
ভুলনা তুমি মোরে,

পড়িলে ধ'রে তোল
তোমারি নিজ-করে।

মুছা'য়ে আঁখিজল
স্নেহেতে কর কোলে;
করনা ঘৃণা কভু
অধম দীন বলে।

বেদনা—প্রাণে শুধু
যাতনা—তাপ—দুঃখ;—
ধরার কোলাহলে
তবুও ভাবি সুখ।

মজিয়ে থাকি শুধু
লইয়ে ধূলিখেলা,
নীরবে ধীরে ধীরে
পড়িয়া আসে বেলা।

সকলি দেওয়া তব,
সকলি জান তুমি,
ধরার কীট—প্রভু!
অনাথ দীন আমি।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।
রাজসাহী।

আপস্তম্বীয় গৃহসূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্যপরিত্যাগী সমাবৃত্ত ব্রহ্মচারীর ছত্র, অঞ্জন, অনুলেপন, মালা, উপানৎ প্রভৃতি গ্রহণের কথা বলা হইয়াছে, সম্প্রতি তাঁহার আরও কর্ত্তব্য কর্ম্ম কথিত হইতেছে। এই সমস্ত কার্য্য বর্ত্তমানে লুপ্ত হইয়াছে।

বাচং যচ্ছত্যানক্ষত্রেভ্যঃ ॥১২॥

সমাবৃত্ত ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত অঞ্জনাদি ধারণ পূর্ব্বক নক্ষত্রোদয় পর্য্যন্ত বাগ্‌যমন করিয়া থাকিবেন, অর্থাৎ কাহারও সহিত কথা কহিবেন না, নীরবে রহিবেন। এই প্রকারে নীরবে অবস্থিতির কারণ, বোধ হয় তাঁহাকে পূর্ব্বাবস্থা এবং বর্ত্তমান কর্ত্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য চিন্তা করিবার অবসর দেওয়া। আপাততঃ একটা বিসম পরিবর্ত্তনে তিনি কিংকর্ত্তব্যচিন্তায় ব্যাকুল হইতে পারেন, কাজেই তাঁহাকে ভাবিবার অবকাশ দেওয়া হইতেছে। শাস্ত্রজ্ঞ চরিত্রবান্ পুরুষের জীবনের নূতনস্তরে উপস্থিত হইতে যে সকল চিন্তা চাই, তাহার জন্য একটুসময় অনন্যচিত্তে অবস্থিতি—সহায়, সন্দেহ নাই।

নক্ষত্রোদয়ের পর তিনি যাহা করিবেন, মহর্ষি আপস্তম্ব তাহা বলিতেছেন—

উদিতেষু নক্ষত্রেষু প্রাচীমুদীচীং বা দিশমুপনিষ্ক্রম্য উত্তরেণ অর্দ্ধর্চেন দিশ উপস্থায় উত্তরেণ নক্ষত্রাণি চন্দ্রমসমিতি ॥১৩॥

সূত্রের সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই যে, নক্ষত্রসকল উদিত হইলে, প্রাচী অর্থাৎ পূর্ব্বদিকে, অথবা উদীচী অর্থাৎ উত্তরদিকে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, "দেবীঃ শড়ুর্বীঃ" ইত্যাদি অর্দ্ধ-ঋক্‌মন্ত্র দ্বারা সকল দিক্ উপস্থান করিয়া, অনন্তর "মাহাস্মমি" ইত্যাদি ঋগর্দ্ধ উচ্চারণ পূর্ব্বক চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহের উপস্থান

করিবেন। চন্দ্র এবং নক্ষত্রোপস্থান একই মন্ত্রে এক সঙ্গে করিতে হইবে। হরদত্ত বলেন "নক্ষত্রাণি চন্দ্রমসং চ সহোপতিষ্ঠতি।' এখানকার 'সহ'শব্দ সাহিত্য প্রকাশ করে।

অনন্তর অন্য কর্ত্তব্য কথিত হইতেছে।

রাতিনা সংভাস্য যথার্থংগচ্ছতি ॥১৪

এই সকল উক্ত-কার্য্য সম্পাদন করিয়া, বন্ধুবান্ধবের সহিত পরামর্শ করিয়া, অবধারিত আশ্রমধর্ম্মাদি গ্রহণ করিবে। স্থত্রের 'রাতি' শব্দের অর্থ বন্ধু। সুদর্শনাচার্য্য লিখিয়াছেন "রাতিঃ মিত্রং রময়তি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা।" নবপ্রবিষ্ট ব্যক্তি, অভিজ্ঞ বন্ধু বান্ধবের নিকট ভালমন্দ সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহন করিয়া, পশ্চাৎ অবধারিত কার্য্যে প্রযত্ন করিবেন; ইহাই যুক্তিসিদ্ধ। ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিয়া, এখন কি করিব? কোন্ আশ্রম গ্রহন করিব? ইত্যাদি প্রশ্ন—হিতেচ্ছু বন্ধুগণের নিকট হইতে মীমাংসা করিয়া লইয়া, যাহা স্থির হয়, তাহাই করিতে হইবে। অবস্থা, আকাঙ্ক্ষা এবং উপযোগিতা অনুসারে প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্যাবধারণ করা শ্রেয়স্কর। শাস্ত্র এখানে বেশ সুন্দর মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং সামর্থ্যের বিপরীতে, কাহারও নিয়োগ শাস্ত্রের অভিমত নহে। স্বকীয় স্বাধীনতাকে শাস্ত্র এখানে তিরস্কার করেন নাই। পরাধীনতাকে প্রশ্রয় দেন নাই। কিন্তু হিতাকাঙ্ক্ষী অপরের সহিত আলোচনায় অবধারিত কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন। হরদত্ত স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন "বন্ধুনা সংভাষ্য কিং ময়া কর্ত্তব্যং ক আশ্রমঃ প্রতিপত্তব্য ইতি সংভাষণং কৃত্বা অবধৃতমাশ্রমং প্রতিপদ্যত ইতি।"

(পঞ্চম পটল দ্বাদশখণ্ড পরিসমাপ্ত।)

পঞ্চম-পটল।

ত্রয়োদশখণ্ড।

যদি ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক গার্হস্থ্য-ধর্ম্মগ্রহণ অভিলষিত হয়, তবে যাহা কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে পরমর্ষি আপস্তম্ব মহোদয় উপদেশ দিতেছেন।

অথৈতদপরংতুষ্ণীমেব তীর্থে স্নাত্বা তুষ্ণীং সমিধমাদধাতি।১।

অনন্তর গৃহস্থাশ্রম প্রবেশার্থী ব্যক্তি, নীরবে তীর্থে স্নান করিয়া, আবার সমিধ্ আধান করিবেন। এখানে 'তুষ্ণীং' স্নান করিবার উপদেশ থাকায় বুঝা যায়, এই স্নানে কোনও মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে না। "তীর্থে স্নাত্বা" এই কথাটীর অর্থ লইয়া ব্যাখ্যাতৃসমাজে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন "তীর্থে স্নান করিয়া অর্থ—গঙ্গা, যমুনা ইত্যাদি পুণ্যনদী বা জলাশয়ে স্নান করিয়া। 'তীর্থ' বলিলে আপাততঃ তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ স্থানই বুঝায়।" অপর সম্প্রদায় বলেন—"তীর্থ অর্থে ঘাট, ঘাটে স্নান করিবে। সমাবৃত্ত যদি এমন স্থানে অবস্থিত থাকেন যে, সেখান হইতে কোন ও তীর্থই নিকটে নয়, তবে তাঁহাকে যতদূর হউক্ না কেন, স্নান করিতে তীর্থেই যাইতে হইবে, এরূপ কথার মূল্য নাই। 'তীর্থঃ শাস্ত্রেঽধ্বরে যোনৌ জলাবতারেচ' এই অভিধান বাক্যের দ্বারা অবগত হই, তীর্থ শব্দে জলাবতার

অর্থাৎ যাহা দিয়া জলে অবতরণ করিতে হয়, সুতরাং ঘাট। তীর্থে স্নান করিতে বলায়, তাঁহাকে অঘাটে স্নান করিতে নিষেধ করা হইল।" সুবুদ্ধি পাঠকমণ্ডলীর উপর ভাল মন্দ বিবেচনার ভার রহিল। অঘাটে কে সাধে স্নান করে, বলিতে পারি না। ঘাটে স্নান করিতে হইবে, এরূপ আদেশের অভিপ্রায় বোধ হয়—বাড়ীতে তোলাজলে স্নান না করিয়া, অবগাহন করিবার কথা বলা। নচেৎ, অঘাটে স্নান না করে, এই মর্ম্মে ঘাটে স্নানের উপদেশ কষ্টকল্পনা বোধ হয়। বস্তুতঃ তীর্থস্নান পবিত্রতা কামনায়; তীর্থ দূরবর্ত্তী হইলেও কর্ত্তব্য। যে দিনে আর্য্যমহর্ষিরা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সে সময় তাঁহারা পুণ্যনদীর তীরেই বাস করিতেন। দূরবর্ত্তী হইলেও কর্ত্তব্যের সংকোচ কল্পনা করা সুসঙ্গত নহে।

তীর্থ-স্নানের পর, বন্ধুগৃহ গমনের কথা। ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ, গুরুগৃহ হইতে বিদায় গ্রহণ, কর্ত্তব্যকর্ম্মের অবধারণ, তীর্থস্নানে পবিত্রতা লাভ, এই সকলের পর—স্বজনের কাছে গিয়া স্বজনের সহিত মিলিত হইয়া, আশ্রমধর্ম্ম পালন করিতে হইবে।

যত্রাস্মা অপচিতিং কুর্ব্বন্তি তত্‌-কূর্চ্চ উপবিশতি যথা পুরস্তাৎ।২

যে স্থানে ব্রহ্মচর্য্যত্যাগোত্তর গৃহাগত ব্যক্তিকে, আত্মীয়স্বজনেরা আদর অভ্যর্থনা পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন, সেই স্থানে তাঁহাদের প্রদত্ত দর্ভাসনে ঐ আগত ব্যক্তি উপবেশন করিবেন। যেমন উপনয়নে আচার্য্য "রাষ্ট্রভৃদসি" ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক উপবেশন করিয়াছিলেন তদ্রূপ। "রাষ্ট্রভৃদসি" ইত্যাদি মন্ত্র যজুর্ব্বেদীয়। এখানে একটী কথা বলা আবশ্যক, এই সমাবৃত্ত ব্রহ্মচারী, শাস্ত্রে 'স্নাতক' নামে অভিহিত হন। 'স্নান অর্থ সমাবর্ত্তন' একথা, এবং ইহার কারণ বহু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। স্নাতক অর্থ সমাবৃত্ত, একথা আর বুঝাইবার বোধ হয় দরকার নাই। এই সূত্রে যে 'অপচিতি' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার অর্থ অবশ্য 'পূজা'। আগত স্নাতককে আত্মীয়েরা মধুপর্ক ইত্যাদির দ্বারা পূজা করিবেন। 'পূজা' বলিলে যেন কেহ মনে করেন না যে, স্নাতকের চরণে পুষ্পচন্দনাদি দেওয়া হইবে। প্রথম—উপবেশনের আসন প্রদান, পরে মঙ্গল জিজ্ঞাসা করা, পরে চরণ প্রক্ষালনের জল প্রদান ইত্যাদি—এবং ভক্ষ্য মধুপর্কাদি প্রদান প্রভৃতিই মানবীয় পূজা। দেবপূজায় এই সকল অঙ্গ অপেক্ষা আরও কতকগুলি অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে।

ব্রাহ্মণ-স্নাতক সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইল, রাজন্য-বৈশ্যস্নাতক বিষয়ে মহর্ষি বলিতেছেন,—

এবমুত্তরাভ্যাং যথালিঙ্গং রাজ্ঞা স্থপতিশ্চ।৩।

এইরূপ স্বজনপ্রদত্ত কূর্চ্চাসনে, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য স্নাতকেরা, যথালিঙ্গ পরবর্ত্তি-মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ পূর্ব্বক উপবেশন করিবেন। মন্ত্রদ্বয়ের যথালিঙ্গ বিনিয়োগ, অর্থাৎ যাহাতে রাজপরিচায়ক শব্দ আছে, তাহা উচ্চারণ পূর্ব্বক রাজন্য, এবং যেটীতে বৈশ্যপ্রতিপাদক শব্দ আছে, সেটী পাঠ করিয়া বৈশ্য—উপবেশন করিবেন। 'লিঙ্গ' অর্থ—শব্দ-সামর্থ্য। "সামর্থ্যং সর্ব্বশব্দানাং লিঙ্গমিত্যভিধীয়তে"

ইহা মীমাংসকেরা বলেন। ফলিতার্থে রাজন্য-স্নাতক "রাষ্ট্রভৃদসি সম্রাড়াসন্দীতি" এই মন্ত্র পাঠ সহকারে, এবং বৈশ্যস্নাতক "রাষ্ট্রভৃদসি অধিপত্যাসন্দীতি" মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক উপবেশন করিবেন। সূত্রে "স্থপতি" শব্দ আছে, তাহার অর্থ বৈশ্য। শিল্প, বাণিজ্যের সহিত সম্বন্ধ।

উপবিষ্ট স্নাতকের প্রতি আত্মীয়ের কর্ত্তব্যাবলী ক্রমে কথিত হইতেছে।

আপঃ পাদ্যা ইতি প্রাহ ।৪।

যজ্ঞকর্ত্তা আত্মীয় জল লইয়া, "পাদ্যা আপঃ" অর্থাৎ "পাধোবার জল (আনিয়াছি)" এইরূপ বলিবেন। স্নাতক, ঐ জল আনয়নের পর—

উত্তরয়াভিমন্ত্র্য দক্ষিণং পাদং পূর্ব্বং ব্রহ্মাণায় প্রযচ্ছেৎ সব্যং শূদ্রায় ।৫।

উত্তর ঋক্‌মন্ত্র অর্থাৎ "আপঃ পাদাবনেজনীঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক, আনীত জল অভিমন্ত্রিত করিয়া, পাদপ্রক্ষালয়িতা ব্রাহ্মণের উদ্দেশে প্রথমে দক্ষিণ চরণ প্রসারিত করিয়া দিবে, আর বামপাদ শূদ্রের জন্য প্রসারিত করিবে। এখানে একটু চিন্তনীয় বিষয় আছে। আগত স্নাতকের চরণ প্রক্ষালনার্থ জল লইয়া, উপচিতি-কর্ত্তা ব্রাহ্মণ স্বয়ংই আসিয়াছেন। তিনি নিজে প্রথমে স্নাতকের দক্ষিণ চরণ প্রক্ষালন করিয়া দিলে, পরে তাঁহার ভৃত্য বা আশ্রিত শূদ্র, স্নাতকের বামপদ প্রক্ষালন করিবে। কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, কর্ত্তা ব্রাহ্মণ স্বয়ং জল আনিয়া দিয়া, যদি নিজে স্নাতকের চরণ ধৌত করিতে উপস্থিত হন, তবে স্নাতক আগে 'ডান্' পা-খানি' বাড়াইবেন। আর ব্রাহ্মণ কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইয়া স্বয়ং অনুপস্থিত থাকায়, তাঁহার ভৃত্য শূদ্র যদি পা ধোয়াইতে আসে, তবে স্নাতক আগে "বাঁ পা-খানি" বাড়াইবেন। আবার অন্যে বলেন, ব্রাহ্মণস্নাতক ব্রাহ্মণের উদ্দেশে ডান্ পা বাড়াইবেন, এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্য স্নাতক—শূদ্রের উদ্দেশে বাঁ পা বাড়াইবেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতীয় স্নাতকের চরণ প্রক্ষালন, অবশ্য ব্রাহ্মণ স্বহস্তে করিবেন না। কেহবা এই 'শূদ্রায়' শব্দ দর্শনে অনুমান করেন, ত্রৈবর্ণিক স্নাতকেরা, আতিথ্য গ্রহণ করিতে শূদ্র-ভবনেও যাইতেন, তখন শূদ্রকে ঘৃণা করা হইতনা। শূদ্র-ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিলে শূদ্র পা ধোয়াইবে, তখন বাঁ পা আগে দিতে হইবে; ইহাই সূত্রাংশের তাৎপর্য্য। এই সকল উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট মতামতের সমালোচনায় আমার ইচ্ছা নাই। বিজ্ঞগণ বিবেচনা করিবেন।

প্রক্ষালয়িতারং উপস্পৃশ্য উত্তরেণ যজুষা আত্মানং প্রত্যভিমৃশেৎ ।৬

স্নাতক, পাদপ্রক্ষালনকারীর হস্ত দুটীকে হস্তদ্বারা ধরিয়া, সেই ধৃত হস্তদ্বয়দ্বারা বিপরীত ভাবে নিজের হৃদয়স্থান স্পর্শ করাইবেন। "আত্মানং" কথার অর্থ হৃদয়। হরদত্ত বলেন 'প্রতীচীনমভিমর্শনম্, তচ্চ হৃদয়দেশে ভবতি, আত্মস্থানং হি তত্।" এই স্পর্শনে উত্তরবর্ত্তী যজুর্মন্ত্র অর্থাৎ 'ময়ি মহ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। স্নাতক নিজেই

মন্ত্র পাঠ করিবেন। পাদ প্রক্ষালয়িতা মন্ত্র পাঠ করিবেন না, যেহেতু প্রক্ষালয়িতা শূদ্রও হইতে পারেন, সুতরাং মন্ত্রপাঠ অনুচিত। ব্যাখ্যাকর্ত্তাদের উপর নির্ভর করিয়া এই কথা বলা হইল।

অনন্তর কর্ত্তব্য ব্যাপার বিষয়ে পরমর্ষি আপস্তম্ব বলিতেছেন।—

কূর্চ্চাভ্যাং পরিগৃহ্য মৃন্ময়েণার্হণীয়া আপ ইতি প্রাহ।৭।

তৎপরে প্রদাতা, অর্থাৎ যিনি মধুপর্কাদি দ্বারা স্নাতকের পূজন সম্পাদন করিবেন, তিনি মৃত্তিকা নির্ম্মিত পাত্রে জল লইয়া, পাত্রের উপরিভাগে এবং নিম্নভাগে দুই খানি কূর্চ্চ অর্থাৎ কুশাসন স্থাপন দ্বারা উহাকে ঢাকিয়া আনিয়া, "অর্হণীয়া আপঃ" অর্থাৎ অর্হণার্থ জল আনয়ন করিয়াছি, এই কথা বলিবেন। ব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে কেহ বলেন, এই জল পুষ্পবাসিত স্নিগ্ধ সুপরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক। যে জলের উপর নীচে ঢাকিয়া আনা হইতেছে, তাহা ভাল হওয়াই সম্ভব।

জল আনয়নের পর স্নাতক ঐ জল যেভাবে গ্রহণ করিবেন, তাহার বিধান কথিত হইতেছে।—

উত্তরয়াভিমন্ত্র্য অঞ্জলৌ একদেশে আনীয়মান উত্তরং যজুর্জপেৎ।৮।

অতঃপর স্নাতক "আপঃ আমাগন্" এই ঋকমন্ত্র দ্বারা আনীত অর্হণীয় জল অভিমন্ত্রিত করিলে, জলদাতা আস্তে আস্তে অল্প অল্প করিয়া ঐ জলের কিয়দংশ স্নাতকের অঞ্জলিতে প্রদান করিবেন। তখন স্নাতক "বিরাজো দোহোঽসি" ইত্যাদি যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। স্নাতকের হস্ত অঞ্জলীকৃত হইলে, তাহাতে জল ঢালিয়া দিবার কথা বলায় বুঝাযায়, এখানে পাত্রে জলদান বিহিত নহে।

স্নাতকের গ্রহণ সম্পন্ন হইলে, অবশিষ্ট জল দাতা লইয়া যাইবেন। তৎসময়ে স্নাতকের কর্ত্তব্য বিবৃত করা হইতেছে।

শেষং পুরস্তান্নিনীয়মানং উত্তরয়ানুমন্ত্রয়তে।৯।

শেষ জল, যাহা দাতা ফিরাইয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহা, "সমুদ্রংব" ইত্যাদি ঋক্ মন্ত্রদ্বারা স্নাতক অভিমন্ত্রিত করিবেন। স্নাতককে জল প্রদানের পর, দাতা শেষজল পূর্ব্বদিকে লইয়া যাইবেন। বৃত্তিকার হরদত্ত মহোদয়ের মত এইরূপ। "পুরস্তাৎ" শব্দের অর্থ অগ্রে। এখানে উহার তাৎপর্য্য পূর্ব্বাভিমুখে। স্নাতক যখন প্রথম কূর্চ্চাসনে উপবেশন করিয়াছেন, তখন সূত্রকার বলিয়াছেন, "যথাপুরস্তাৎ।" আচার্য্য, উপনয়নে যেরূপ উপবেশন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ। উপনয়নে দেখিতে পাই, কুমার আচার্য্যের সম্মুখে পশ্চিমাভিমুখ বসিয়াছেন, এবং আচার্য্য পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া উপবেশন করিয়াছেন। চতুর্থ পটল—একাদশ খণ্ডের অষ্টম সূত্রে ইহার পরিচয় আছে। এখানেও স্নাতক আচার্য্যের মত পূর্ব্বমুখে বসিয়াছেন, তাহার সম্মুখে হইলে পূর্ব্বদিকেই হয়, সুতরাং 'পুরস্তাৎ' অর্থ এখানে পূর্ব্বদিকে। স্নাতককে মধুপর্ক প্রদান প্রকার ব্যাখ্যাত হইতেছে। প্রথম মধুপর্ক প্রস্তুতির প্রকার যথা,—

দধি মধ্বিবতি সংসৃজ্য কাংস্যেন বর্ষীয়সাপিধায় কূর্চাভ্যাং পরিগৃহ্য মধুপর্ক ইতি প্রাহ ।১০।

দধি এবং মধু মিশাইয়া, তৎপরে তাহা বৃহৎ একটী কাংস্য পাত্রে রাখিয়া, কূর্চ্চদ্বয় দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া, দাতা "মধুপর্ক" (আনিয়াছি) এই কথাটী উচ্চারণ করিবেন। এ সূত্রটী পাঠ করিলে প্রতীতি হয়, মধুপর্ক বলিতে কেবল কাঁসার পাত্রে মধু ও দধির সম্মিশ্রণই বুঝায়, কিন্তু শাস্ত্রান্তরে—মধুপর্ক আরও কতকগুলি পদার্থের সম্মিলন দ্বারা সম্পাদ্য, এরূপ উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। এখানে পরবর্ত্তিসূত্রে মতান্তর কথনোপলক্ষ্যে তাহার আর কয়টীর কথা পাওয়া যাইবে, কিন্তু সবগুলির নহে।

ত্রিবৃতমেকে ঘৃতংচ ।১১।

কাহারও কাহারও মতে পূর্ব্বোক্ত দধি ও মধু, এই দুইটী, এবং ঘৃত, এই তিনটীর সম্মিশ্রণের নাম মধুপর্ক।

পাঙ্‌ক্তমেকেধানাঃ সক্তূংশ্চ ।১২

আবার অনেকের মতে দধি, মধু, ঘৃত, এই তিনটী, এবং ধানা ও সক্তু, এই দুইটী, একত্রে পাঁচটীর নাম মধুপর্ক। "পাঙ্‌ক্ত" কথার অর্থ পঞ্চাবয়ব। হরদত্ত বলেন "পঞ্চানাং সমুদায়ঃ।" ছাতুওয়ালা মধুপর্ক-বাদী ছাতুখোর্ ছিলেন কি না, সে অনুসন্ধানে আধুনিক উদীয়মান ঐতিহাসিকের অধিকার; আমরা ব্যাখ্যাতা মাত্র।

উত্তরাভ্যামভিমন্ত্র্য যজুর্ভ্যামপ আচামতি পুরস্তাৎ উপরিষ্টাচ্চ উত্তরয়া ত্রিঃপ্রাশ্য অনুকম্প্যায় প্রযচ্ছেত্ ।১৩।

ঐ প্রদত্ত মধুপর্ক, "ত্রৈষ্যো বিশ্বায়ৈ" ও "আমাগন্" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্র দ্বয় পাঠ দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া, স্নাতক তাহা গ্রহণ করিবেন। তৎপরে "যন্মধুনঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক, তিনবার ঐ মধুপর্ক ভক্ষণ করিবেন। একমন্ত্রে তিনবার ভক্ষণ হইতে পারে না, এজন্য প্রথমবার উক্ত মন্ত্রে ভক্ষণও শেষ বারদ্বয় অমন্ত্রক তুষ্ণীম্ভাবে ভক্ষণ করিতে হইবে; ইহা হরদত্তের অভিপ্রায়। ভোজনের প্রথমে "অমৃতোপস্তরণমসি" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিবেন। আর ভোজনের শেষে "অমৃতাপিধানমসি" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিবেন। ভক্ষণের পরে অবশিষ্ট মধুপর্ক অনুকম্প্য অর্থাৎ ভ্রাতা বা মিত্র ইত্যাদি অপর কোনও সমাবৃত্ত ব্যক্তিকে ভোজনের জন্য প্রদান করিবেন। হরদত্ত বলেন—"সোঽপিতং প্রাশ্নাতি" যাঁহাকে দিবেন, তিনি মধুপর্ক খাইয়া ফেলিবেন; অপরকে দিবেন না। আচমনের মন্ত্র দুইটী যজুর্ব্বেদীয়। ভক্ষণের শেষে যে আচমন করিতে হয়, অর্থাৎ আঁচাইতে হয়, তাহাকে শৌচাচমন বলে, ইহা শৌচার্থে করা হয়। ভক্ষণের প্রথমে ও পরে সামান্য মাত্রায় বারি পান দ্বারা আচমন করিতে হয়। শৌচাচমন সেরূপ নহে, কারণ যতক্ষণে শৌচ নিষ্পত্তি না হয়, ততক্ষণ আচমন করিতে হইবে। পরিষ্কৃত না হইলে এ আচমন বৃথা হয়। স্নাতক তিনবার মাত্র তুলিয়া লইয়া গ্রহণ করিবেন,

অপর সকলটা মধুপর্ক অনুকম্প্যাকে দিবেন; স্বেচ্ছাধীন ব্যবহার করিতে পারিবেন না। প্রাচীনকালে মধুপর্ক প্রদান বড় আদরের ছিল। অধুনা এ গৌরবকর প্রথা ক্রিয়া-কাণ্ডে দৃষ্ট হয়, কিন্তু পূর্ব্ববৎ ভাব আর নাই। মধুপর্ক প্রাশনের পূর্ব্বে ও পরে যে আচমনের মন্ত্র দুইটী উক্ত হইয়াছে, অদ্যাপি আমরা ভোজনের অগ্রে ও পরে এই দুই মন্ত্রেই আচমন করিয়া থাকি। সে গৌরব নাই, এখন তাহার অনুস্মৃতি মাত্র আছে।

প্রতিগৃহ্যৈব রাজা স্থপতির্বা পুরোহিতায়।১৪।

ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য স্নাতক মধুপর্ক গ্রহণ করিয়া, পুরোহিতকে প্রদান করিবেন। নিজেরা অভিমন্ত্রণ বা ভক্ষণ করিবেন না। ঐ সকল কার্য্য পুরোহিতই করিবেন। পূর্ব্বোক্ত সূত্রের বিধান—ব্রাহ্মণ স্নাতকের জন্য, এইরূপ বুঝিতে হইবে। মধুপর্ক প্রদান ব্যাখ্যাত হইল, আগামী সংখ্যায় গোনিবেদন, সিদ্ধান্ন সম্প্রদান ইত্যাদি বিষয় বিবৃত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ।
যশোহর, বেদবিদ্যালয়।

পুরুষোত্তম।

"পুরুষোত্তম"—পুরী'—"শ্রীক্ষেত্র" "নীলাচল" প্রভৃতি নামগুলি পর্য্যায়-শব্দরূপে এই মহাতীর্থের পরিচায়ক। এক মহাক্ষেত্রই এই মহা চতুঃসংজ্ঞা।

"পুরীষু শেতে—ইতি পুরুষঃ"। এই বাক্যের নিপাতনসিদ্ধ শব্দার্থে পুরীতে অর্থাৎ এই শরীরে শয়ন করেন যিনি, তিনি পুরুষ। অর্থাৎ দেহী—কিনা দেহ-গেহ-অধিকারী জীবাত্মা। আর "পুরুষেষু উত্তমঃ—ইতি পুরুষোত্তমঃ।" পুরুষের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ, তিনিই পুরুষোত্তম। এখন এই পুরুষ বা জীবাত্মা সম্বন্ধে উত্তমতা কোথায়?—যখন ইনি দেহোপাধিবিনির্ম্মুক্ত, ফলিতার্থে দেহাত্ম-বুদ্ধি-বিমুক্ত, কেবল লীলাতত্ত্বে নিজ যোগমায়িক দেহযুক্ত, তখনই ইনি উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম। ভগবান লীলায় দেহধারী—অর্থাৎ পুরুষরূপী হইলেও, সাধারণ জীবাত্মার ন্যায় দেহাত্মবোধযোগী ও তজ্জনিত সুখ-দুঃখাদিভোগী নহেন। তিনি নিত্যস্বরূপতঃ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। এই তত্ত্বেই তাঁহার উত্তমতা সিদ্ধ। অতএব লীলায় তিনিই উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম। তিনি স্বীয় যোগমায়া-বলে লীলাছলে দেহী হইয়াও স্বরূপতঃ জড়সত্তাশূন্য, সোপাধিক হইয়াও নিত্য নিরুপাধি-গণ্য; মায়িক কায়িক সত্তা সত্ত্বেও তিনি মায়াধীশ, কিন্তু মায়াধীন নহেন; সুতরাং পুরুষ হইলেও তিনিই উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম। এইরূপ ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণই 'পুরুষোত্তম' আখ্যায় শাস্ত্রের বুকে ও মহাজনের মুখে বিরাজিত ও বিখ্যাত। এতাবতা পুরীধামের "পুরুষোত্তম" নামের তাৎপর্য্য চিন্তায় বোধ হয় যে, শ্রীকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় মানবদেহধারী ও মানব-ক্রিয়াকারী না হইয়াও, জড় নিষ্ক্রিয় কাষ্ঠের দেহ মাত্র ধরিয়াও, অর্থাৎ "কাষ্ঠ-পুত্তলিকা" মাত্র হইয়াও যিনি "দারুব্রহ্ম" সংজ্ঞা-সত্যতায় সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান, তিনি কাষ্ঠ-পুরীর বাহ্য-নিশ্চেষ্ট পুরুষ হইয়াও, তিনিই প্রকৃত

পুরুষোত্তম। এই জন্য পুরীধামের দারুব্রহ্ম জগন্নাথ এবং শাস্ত্রমতে তাঁহারই অঙ্গস্বরূপ তাঁহার ক্ষেত্র বা পুরীও "পুরুষোত্তম" নামে প্রখ্যাত।

"পুরী" শব্দের স্বতন্ত্র সার্থকতা-বিচার বাহুল্য মাত্র। "পুরুষ" শব্দের বিচারেই তাহার অনেকাংশে নিষ্পত্তি হইয়াছে। জীবের দেহই পুরী, আবার জীবের দেহের বাসস্থান বা ধামও পুরী। সামান্য পুরুষের দেহ বা গেহ পুরী হইলেও, শুদ্ধ "পুরী" সংজ্ঞামাত্রেই সাধারণার্থে তাহা বুঝায় না, কিন্তু শাস্ত্রমতে পুরুষোত্তম ভগবানের সাক্ষাৎ শরীরসদৃশ এই পুরীধামই একমাত্র "পুরী" সংজ্ঞায় ভারতের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। ইতিহাস, ভূগোল, মানচিত্র ও রাজকীয় কাগজপত্রেও "পুরী" সংজ্ঞাই সমধিক প্রচলিত। আবার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য-বিদ্যার বিচারেও পুরুষোত্তম জগন্নাথদেবের এই পুরীই পুরোত্তম—পৃথ্বীতলে অনুপম। এমন বিশাল—বিরাট—বিচিত্র—বিস্ময়কর প্রকাণ্ডকারুকাণ্ডময় মহাপুরী মর্ত্ত্যে আর দ্বিতীয় নাই; তাই সেই পুরুষোত্তমের ইচ্ছায় এক কথায় "পুরী" নামে এই পুরীই চিরপরিচিত।

"শ্রীক্ষেত্র" শব্দের অর্থ লক্ষ্মীর লীলাস্থল বা শোভাময় স্থল। যেহেতু 'শ্রী' শব্দের অর্থই লক্ষ্মী ও শোভা। পুরুষোত্তম তীর্থের এই "শ্রীক্ষেত্র" নামটী সর্ব্বথা সার্থক। এমন বহু ও বিবিধ প্রকার ধান্য-ধনময় দেশ ভারতে অতি বিরল। "উৎকলখণ্ড" প্রভৃতি পৌরাণিক শাস্ত্রে এ স্থান লক্ষ্মীর পীঠস্থান স্বরূপে অভিনন্দিত হইয়াছে। তারপর, কি স্বাভাবিক, কি কৃত্রিম, অর্থাৎ নর-কর-নির্ম্মিত, উভয়বিধ শোভারই পরম পরাকাষ্ঠা এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। নদ-নদী-হ্রদ-সরোবর-বন-পর্ব্বত-পাথার-ভবন-উপবন-মন্দির-চত্বর-পুরী-মহাপুরী প্রভৃতি সমস্ত শোভাময় সত্তার একত্র সমাবেশ এই স্থানে। এই পুরীধামেই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের বামপার্শ্বেই শ্রীদেবী বা লক্ষ্মীর বিচিত্র মন্দির বিরাজিত। এখানেও নিত্যোৎসবের ধুমধাম, শোভা, সম্পদ ও সেবা-সম্ভারের অবধি নাই; সুতরাং সর্ব্ব প্রকারেই এই পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের "শ্রীক্ষেত্র" নাম সার্থক।

"নীলাচল" শব্দটি লইয়া কিছু বিচার-বিতর্ক আছে বটে। "নীলাচল" শব্দের শাব্দিক ব্যুৎপত্ত্যর্থ নীলবর্ণের পর্ব্বত বা পাহাড়। এখন ভূগোলে বা মানচিত্রে যে পর্ব্বতকে আমরা "নীলগিরি" নামে পরিচিত দেখিতে পাই, তাহা এই পুরুষোত্তম ধাম হইতে বায়ুকোণে অনেকটা দূরে অবস্থিত। প্রচলিত "পঞ্চক্রোশী" পুরীক্ষেত্রের মধ্যে কোন পাষাণময় পর্ব্বত পরিদৃষ্ট হয় না। তবে তাহার আশেপাশে ইতস্ততঃ ছোট ছোট শৈলস্তূপাদি ও ক্ষেত্র-ধাম মধ্যে সাগর-সন্নিকর্ষে কতিপয় বালু-গিরি বা "বালিয়াড়ি" অবস্থিত। ফলে কথা এই যে, উড়িষ্যাপ্রদেশে প্রকৃতপক্ষে নীলগিরিই একমাত্র গিরি-পদ-বাচ্য, আর কতকগুলি গণ্ডশৈল মাত্র। এইজন্য এ অঞ্চলকে সাধারণতঃ নীলগিরি-প্রদেশ বলা যায় বলিয়া, এই প্রদেশের সর্ব্বপ্রধান [illegible] পুরীধামকেও [illegible]

নীলাচল বলা যায়। অপর, "উৎকলখণ্ড" "পুরুষোত্তমমাহাত্ম্য" প্রভৃতি পৌরাণিক শাস্ত্রীয় গ্রন্থেরও তাৎপর্য্যানুসারে বোধ হয়, বর্ত্তমান পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের ঠিক পুরীধাম-স্থানটি পাহাড়ের ন্যায় উচ্চই ছিল, কাল-ক্রমে কোনরূপ প্রাকৃতিক বিপ্লব-বিশেষে ভগবদিচ্ছায় স্থানটি অনেক নিম্ন হইয়া পড়িয়াছে। বোধ হয়, কলির কাতর জীবের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়াই কৃপাময় ভগবান স্বীয় ভুবন-পাবন দারুব্রহ্ম-বিগ্রহের শুভদর্শন সুলভ করণার্থেই আপন প্রিয়-লীলাসন নীলাচল প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনযোগে যুগে২ ক্রম-নিম্ন-নত করিয়া, এ যুগে এরূপ সুখারোহ করিয়াছেন। হিন্দু-প্রকৃতি-সুলভ ভক্তি-ভাবুকতার অধিকারে এ বিশ্বাস অবৈ-জ্ঞানিক নহে। ফলে এখনও সিন্ধু-সমতলস্থ হইতে ঠিক জগন্নাথ-পুরী স্থানটি অনেকটা উচ্চে অবস্থিত। স্কন্দ পুরাণের মতে এই উচ্চ স্থানটিই পুরাকাল হইতে "নীলাচল" নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত পুরাণের মতে রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্নের এই মহাপুরী-মন্দির ও জগন্নাথ দেবের "দারুব্রহ্ম" বিগ্রহ-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এই পুণ্যক্ষেত্রে 'শ্বেতমাধব' (বলরাম) ও "নীলমাধব" (কৃষ্ণ) আখ্যায় বিখ্যাত দুই ভগবদ্বিগ্রহ পূজিত হইতেন। উক্ত "শ্বেতমাধব" এখন পুরীক্ষেত্রস্থ "শ্বেতগঙ্গা" নামক সরোবর সন্নিকর্ষে এবং শ্রীমন্দিরে "বলরাম" নামে বিখ্যাত এবং স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ দেবই নীলবর্ণরঞ্জিত দারুমূর্ত্তিতে নীলকান্ত-মণিকান্তিতে শ্রীপুরী আলোকিত করিয়া বিরাজিত আছেন। ক্রমে এই শঙ্খক্ষেত্রী পুণ্যক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রের বিভূতীরস্থ যে উচ্চ ভূখণ্ডে শ্রীভগবান নীলকান্তিমান্ অচল দারু-প্রতিমারূপে প্রতিষ্ঠিত, তাহাই পুরাণোক্তি-মতে প্রকৃত ও পুরা-প্রখ্যাত নীলাচল।

এবার গত ৺শারদীয়া পূজার অব-কাশে এ দীনের প্রতি এই মহাতীর্থের কৃপা হইয়াছিল। অকালে প্রথম তীর্থ-সেবা প্রশস্ত নহে, এইরূপ শাস্ত্রীয় প্রবাদ প্রচলিত আছে; কিন্তু আমার সে পক্ষে লক্ষ্য ছিলনা। অবশ্য সিদ্ধর্ষি-সেবিত শাস্ত্রের কোন বিধানই অতাত্ত্বিক নহে, ইহাই আমার স্বাভাবিক বিশ্বাস; কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, এই পুরীযাত্রা বিষয়ে কাল-শুদ্ধ্যশুদ্ধির কথা স্মরণেই আসে নাই। ভগবানের কি কৃপা! অপর বিবিধ অভা-বনীয়—অথচ অনিবার্য্য অপরিহার্য্য কার্য্য যোটাইয়া, বিলম্ব ঘটাইয়া, সেই অকাল-দোষ কাটাইয়া, ঠিক তৎপর দিনই পুরী পাঠাইয়া দিলেন! রেল্-গাড়ীতে যদৃচ্ছা পঞ্জিকা খুলিয়া জানিলাম, অকালদোষ ছিল, গতকল্য কাটিয়াছে। হইতে পারে, ইহা "কাকতালীয়" বটে; কিন্তু বলিতে কি, তখন এ পাষাণ-বক্ষও একটু গলিয়া-ছিল, এ কাষ্ঠ-চক্ষুও একটু ভিজিয়াছিল! ইহাও কৃপার পরিচয়; কারণ ভগবৎ-কৃপা-স্মরণানন্দ যে ভাবেই হউক, তাহাতে লাভ ভিন্ন লোক্‌সানের কোন কারণ নাই।

সে যাহা হউক, একটি ধর্ম্মানুরাগী সুশিক্ষিত সহযাত্রী বন্ধু সহ পুরুষোত্তম যাত্রা করিলাম। কলিকাতা-হাবড়ায় রাত্রি দশটার মাদ্রাজ-মেল-ট্রেণে চাপিয়া, সারা-রাত্রি উভয়ে পুরুষোত্তম-ধ্যান-তরঙ্গে ভাসিয়া, পুরী প্রসঙ্গ রঙ্গে রসিয়া, প্রায় বসিয়া বসিয়া

আনন্দ-মনে ও আগ্রহ-জাগরণে কাটাইয়া দিলাম। উভয়ের অন্তরেই পুরীযাত্রার উৎসুক-উচ্ছ্বাস ছুটিতেছে। যেন উড়িষ্যা-ভূমি দেখিলেও পুরীর অর্দ্ধেক দেখা হয়, মনে এমনই ভাব-তরঙ্গ উঠিতেছে! উড়িষ্যার প্রত্যেক বালু-কণাকে—প্রত্যেক বৃক্ষ-পত্রকে যেন ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি, এমনই বোধ হইতেছে। দেখিতে দেখিতে নিশা অবসান প্রায়; আমাদের ট্রেণও বঙ্গ-অঙ্গ ছাড়াইয়া উড়িষ্যা-সীমায়। সুন্দর ওড্রদেশে আমাদের সুপ্রভাত হইল। আমাদের চক্ষে উড়িষ্যার কঙ্কর-বালু বন্ধুর বক্ষে প্রভাত-প্রকৃতি যেন কি ঐন্দ্রজালিক রূপের হাট খুলিয়া দিল! যাহা দেখি তাই সুন্দর! যে দিকে চাই, সেই দিকই মনোহর! সেই পকাপক-শস্য-সম্ভার-শোভিত হরিৎ-পীত ক্ষেত্র, সেই কোথাও সুনির্ম্মল স্রোত, কোথাও স্বর্ণচূর্ণবৎ সুচিক্কণ সিকতাময় বিস্তৃত নদী-বক্ষ, সেই শাল--তাল--তমাল--নারিকেল--কদলী---বৃক্ষ--বহুল বিমোহন বন-উপবন; সেই ময়ূরের মোহন নর্ত্তন, কুরঙ্গের সুরঙ্গ-ধাবন, বিচিত্রাঙ্গ বিহঙ্গকুলের মধুর কূজন, এই সমস্তের সমবায়ে, সেই স্থানে স্থানে গণ্ডশৈল-তরঙ্গান্বিত ও স্থানে স্থানে শ্বেত কৃষ্ণ রক্ত পীত পাটল ধূমল ধূসর প্রভৃতি বিবিধ রঙ্গে রঞ্জিত উড়িষ্যার ভৌম নিসর্গ কি স্বর্গীয় শোভাই ধারণ করিয়াছিল! ওড্র-প্রকৃতির প্রতি অপাঙ্গ-ভঙ্গেই রূপের তরঙ্গ-রঙ্গ উঠিতেছিল। এমন বুঝি আর কখনও দেখি-নাই—হয়ত দেখিবওনা। ফলে, বোধ হয় বহুদিনের বাঞ্ছিত পুরুষোত্তম-দর্শনের সম্মোহিনী কল্পনার কুহক-বলে সন্ধ্যা যেন শতগুণে সজ্জিত—রঞ্জিত বা পল্লবিত হইয়া উঠিতেছিল! ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল, প্রথম প্রভাতের রজত কান্তি-ছটা ক্রমশঃ স্বর্ণবর্ণধর ও উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল।

বেলা ৮টার সময় ট্রেণ কটকে পৌছিল। কটক দেখিয়া, মনের ভাব-তরঙ্গ আর আটক মানিল না; হৃদয়-ফাটক ভাঙ্গিয়া, যেন বাহ্য-সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া বেগে বাহির হইতে লাগিল। আমার চির-মরুক্ষেত্র চিত্ত-নেত্রও আর্দ্র হইল! আহা! এই সেই কটক! পুরীর পবিত্রছায়ায় পরমগৌরব-পালিত এই সেই কটক নগর! কটক জেলার পরই জেলা—পুরী! পুরী জেলারই পূর্ব্ব-দক্ষিণ-প্রান্তসীমাস্থলে অকূল সিন্ধু-কূলে সেই প্রেমসিন্ধু পুরষোত্তমের প্রেমানন্দময়ী পুরী-নগরী! আহা কতক্ষণে পাইব! কতক্ষণে যাইব! কতক্ষণে সেই জগতে অতুল বিপুল দেউলের গগনস্পর্শী চূড়া-চক্র আমার তৃষিত নয়ন পথে উদিত হইতে দেখিব! চিত্তে এইরূপ ভাব-চিন্তার প্রভাব-প্রবাহ চলিতে লাগিল! চকিতে বামপার্শ্বে পাহাড়ময় প্রদেশে "ভুবনেশ্বরের" ভুবন-বিখ্যাত মহামন্দিরের মেঘস্পর্দ্ধী চূড়া আকাশ-ক্রোড়ে প্রকাশ পাইল! "ভুবনেশ্বর" দর্শনে যেন আনন্দের বিদ্যুৎ-স্পর্শন প্রাণে আসিয়া লাগিল! সেই শিবলীলায় নিত্যশিবময় সর্ব্বশুভ-নিলয় ভুবনেশ্বরের অল্প দূরেই সেই শিবসর্ব্বস্বধন শ্রীপুরুষোত্তমের পুরোত্তম "পুরী" নগরী!

ক্রমশঃ দক্ষিণ পার্শ্বে সেই সর্ব্ব-ভারতীয় ভক্তসমাজে সুবিখ্যাত "সত্যবাদী গ্রাম্য-

গোপাল" দেবের সুমহান্ ও সুন্দর মন্দির-দৃশ্য নেত্র-পথে চিত্রিত হইল! আহা ধন্য সত্যবাদী! ধন্য দয়াল সাক্ষীগোপাল! ধন্য তোমার এই ধাম! আর ধন্য ধন্য ধন্য তোমার সেই ভক্তবাৎসল্য-বশে ভারত-বিখ্যাত সত্য-সাক্ষ্যদান!

"সাক্ষীগোপাল" দর্শনের পরেই অমনি ঈষৎ দক্ষিণে—প্রায় সম্মুখে—অক্ষিপথে সেই লক্ষ লক্ষ চিত্ত-চক্ষুর ধ্যানলক্ষিত ধন শ্রীপুরুষোত্তমের ভূতলে অতুল বিপুল দেউলের বিশাল চূড়া বিকাশিত হইল! অমনি ট্রেণ হইতে শতকণ্ঠে যুগপৎ "জয় জগন্নাথ" ধ্বনি উঠিল! শত শত যুক্তকরের উপরে শত মস্তক নত হইল! দেখিতে দেখিতে "মালতীপত্ পুর" ছাড়াইয়া পুরীর ষ্টেশনে ট্রেণ আগত। অমনি আবার বিমান-বিদারী "জয় জগন্নাথজীকি জয়!" রবে শতকণ্ঠ-ভেরী নিনাদিত! আহা! সে সময়ের ভাব অবর্ণনীয়। সেই পুরীধাম নাকি এই! সেই বহুভাগ্য-লভ্য,—বহুদিনের তৃষিতধ্যানে মাত্র সেব্য সেই দিব্য-ধাম পুরুষোত্তম নাকি এই! আর অকিঞ্চন অধম সেই আমিও নাকি এই!

ট্রেণ থামিবামাত্র অমনি জগন্নাথ-যাত্রীদের উৎফুল্ল বয়ন, উৎসুক নয়ন, আগ্রহ-অবতরণ। পবিত্র পুরী-ভূতলে অবতরণ সময়ে বেশ একটু বৃষ্টি আসিল! আহা! পুরী-প্রকৃতি যেন স্নেহ-সমপ্রাণতাময়ী জননীর ন্যায় ভক্তযাত্রীদের ভাবোচ্ছ্বাসে মিশিয়া একটু প্রেমানন্দাশ্রু বর্ষণ করিলেন। বন্ধু বলিলেন "এ বিষ্টি বড় মিষ্টি!" আমি বলিলাম—"ঐ যে প্রেমময়ের স্নেহ!"

বৃষ্টি-বর্ষণকে আমরা স্বর্গীয় পুষ্প-বর্ষণ এবং সুখ-স্পর্শন ভাবিতে চেষ্টা করিয়া, সেই বর্ষা-মাথায় আমাদের অতুল হর্ষালম্ব,—আমাদের কঠিন চিত্ত-লৌহের চুম্বক-স্তম্ভ শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের দিকে আগ্রহে অগ্রসর হইলাম। পথে প্রথমেই আমরা আমাদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বাসা প্রাপ্ত হইলাম, এবং অবিলম্বে আমাদের ব্যাগ-বোঁচকা রাখিয়া, বন্ধুবরের অভিপ্রায়ানুসারে সমুদ্র-স্নানান্তেই ৺জগন্নাথ-দর্শনে যাওয়া স্থির করিয়া, আমরা সমুদ্রাভিমুখে দ্রুতবেগে চলিলাম। ক্রমে নীরনিধির নিকটস্থ। সম্মুখের বালিয়াড়িতে জল দেখা যাইতেছে না, কিন্তু এমনই একটা ভাব লাগিতেছে, যেন ঐ বালিয়াড়ির পরে আর পৃথিবী নাই! পৃথিবী যেন ঐখানেই খসিয়া-ধসিয়া-নামিয়া কোথায় পড়িয়া গিয়াছে! যেন ব্যোম-সৃষ্টি ব্যতীত ভৌমসৃষ্টির ঐ খানেই শেষ হইয়াছে! বন্ধুবর ঐ দিকে চাহিয়াই চমকিয়া বলিলেন—"এ কি এ?" বন্ধু এই সর্ব্বপ্রথম সিন্ধুতীরবর্ত্তী। কিন্তু আমার আগে আর দু-একবার সমুদ্র দেখা ছিল। প্রায় দ্বাদশবর্ষ পূর্ব্বে শ্রীশ্রীচন্দ্রশেখরের কৃপায় তীর্থরাজ চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের চূড়া হইতে, অর্থাৎ চন্দ্রশেখরের শ্রীমন্দিরের পাদমূল হইতে বঙ্গসাগর প্রথম দেখিয়াছিলাম। তখনও এই রকম—যেন পৃথিবী ওখান হইতে একেবারে ভাঙ্গিয়া কোন্ অতলে নামিয়া গিয়াছে, এমনই অসাধারণ দৃশ্য দৃষ্ট হইয়াছিল। বন্ধুবর অকস্মাৎ এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ভীমকান্ত অনন্তের দৃশ্য দর্শনে কিঞ্চিৎ বিহ্বলপ্রায় হইয়া উঠিলেন। ছবি বড়ই কোমল প্রকৃতির

পুরুষ। ইনি এতই সরল যে, ইঁহার চক্ষের জানালা দিয়া যেন ইঁহার মনের মুখটী সর্ব্বদাই দেখা যায়। আমি দেখিলাম, বন্ধু আনন্দে—বিস্ময়ে—এবং যেন একটু ভয়ে অভিভূতপ্রায় হইয়া আর বেগে অগ্রসর হইতে পারিতেছেন না। ওঃ! শত মেঘ-মন্দ্র, শত বাষ্পযন্ত্রযানের ঘোর ঘর্ঘর শব্দ-কেও পরাভবকারী সিন্ধুর সেই গভীর গর্জ্জনে অননুভূতপূর্ব্ব ভয়-বিস্ময়ানন্দে বন্ধুর অপূর্ব্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইল। আমার সমুদ্র-বিষয়িণী একটু পূর্ব্বাভিজ্ঞতার ফলে ততদূর না হউক, অন্ততঃ "এই সেই পুরীর সমুদ্র! যে সমুদ্রে আমাদের প্রেম-সমুদ্র গোরাচাঁদ প্রেমোন্মাদে প্রেমানন্দে ঝাঁপ দিয়াছিলেন!" এইরূপ ভাবোচ্ছ্বাস আসিয়া এ দীনের হীন চিত্তকেও সেই ভক্তচিত্তহারীর ভাব-রসে লীন করিল।

ক্রমে আমরা বালিয়াড়ি অতিক্রম করিয়া বেলায় অবতীর্ণ। শ্রীমানের মূর্ত্তি দেখিয়া আমার ধীমান্ বন্ধু যেন হতশ্রী হইয়া গেলেন। আমিও তথৈবচ; কারণ সমুদ্র নিত্যই নূতন। সমুদ্র বিধাতার এমনই সুমহৎ সুবিপুল সৃষ্টি যে, সমুদ্রদৃশ্য কখনও পুরা-তন হইবার নহে। সেই সতত উচ্ছ্বাসিত অনন্ত অশান্ত নিবিড় নীলিমার দিগন্ত-বিশ্রান্ত ধূ ধূ বিস্তার! সেই সমুদ্র ও আকাশে অনন্ত অশ্রান্ত আলিঙ্গন! সেই সুনীল ফেনিল অকূল অতল অপরিমেয় জল-রাশির নিত্য বিচিত্র বিলাস-উচ্ছ্বাসময় বিরাটদর্শন!

সেই—

"উর্ম্মির উপরে উর্ম্মি—উর্ম্মি তদুপরে!
উন্মত্ত অনন্ত বুঝি গ্রাসে চরাচরে!"

সে দৃশ্য কি কখনও পুরাতন হয়? আমরা ক্ষণমাত্র উভয়ে অভিভূতপ্রায় সমুদ্র দর্শন করিয়া, ধীরে ধীরে সেই অধীর সিন্ধুর উন্মত্ত বক্ষে অবগাহন করি-লাম। আমরা সেই সচল গণ্ডশৈলমালা সদৃশ উত্তাল তরঙ্গমালা অতিক্রম করিয়া অধিক অগ্রসর হইতে পারিলাম না। প্রায় হাঁটু-জলেই সন্ধ্যা-তর্পণাদি নাভি-জলের কাজ সারিতে হইল। শাস্ত্র বলেন— "পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি সর্ব্বাণি সাগরে"। সাধারণতঃ পৃথিবীর সমস্ত তীর্থ-শক্তিই সমুদ্রে সমবেত; বিশেষতঃ ঐই মহাতীর্থ পুরীর পুরোবর্ত্তী এই "স্বর্গদ্বার" সমাখ্যাত সমুদ্রের ত কথাই নাই। ফলে আমরা সেই সর্ব্বতীর্থময় সমুদ্র-নীরে স্নানা-হ্নিক-তর্পণাদি করিয়া পরিতর্পিত ও চরিতার্থ হইলাম।

তারপর শ্রীমন্দির ও শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন। সমুদ্র-স্নানান্তে যেন নবজীবন পাইয়া, সেই জগজ্জীবন জগন্নাথের জগৎ-জাগ্রত বিগ্রহ দর্শনে আগ্রহে ছুটিলাম। দেখিতে দেখিতে সেই রথযাত্রার মহারথ্যা "বড় দাঁড়ী"তে উঠিলাম। এত বড় প্রশস্ত পথ বোধ হয় এখন আর ভূতলে দ্বিতীয় নাই। কেননা তাহার প্রয়োজনই নাই। প্রাচীন ভার-তের "ইন্দ্রপ্রস্থ" প্রভৃতি মহানগরে এরূপ এইরূপ রাজপথ ছিল; আধুনিক ভগ্নাব-শেষ অনুসন্ধানে তাহা এখন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ফলে প্রাচীন ভারতের সেই অষ্টাশ্ব-ষোড়শাশ্ব-যোজিত স্যন্দনসমূহের অবাধ-গতিবিধি সম্পাদনার্থে ঐরূপ প্রশস্ত-তম পথেরই প্রয়োজন ছিল বটে। আর

একমাত্র এই পুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেবের মহা রথযাত্রার উপলক্ষে সেই মহা রথ্যার আদর্শ রক্ষিত হইতেছে। শ্রীমন্দির হইতে "গুণ্ডিচা-বাটী" পর্য্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে অর্দ্ধ ক্রোশাধিক দীর্ঘ ও প্রায় দুই 'রসী' প্রস্থ এই "বড় দাঁড়ী"র দক্ষিণ প্রান্তে পূর্ব্ব-সিংহদ্বারী শ্রীমন্দিরপুরী প্রতিষ্ঠিত।

এই শ্রীমন্দিরপুরীর সম্যক্ বর্ণনা বর্ণের অসাধ্য। বলিতে গেলেই কম বলা হয়। "বলিতে পারিনা" বলাতেই বরং কিছু বলা হয়। শুধু মানুষের অসাধারণ যত্ন ও অজস্র রত্ন ব্যয়ে যে এই সুমহান্ ব্যাপার সুসম্পাদিত হইয়াছে, তাহা যেন সহসা বিশ্বাসই করিয়া উঠা যায় না। "বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ" যে পৌরাণিক প্রবাদ, তাহাই যেন নিরর্থবাদে সত্য হইলে শোভা পায়। পুরাণশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় যে, রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন এই "পুরী" নির্ম্মাণার্থ তাৎকালিক ভারতের তাবৎ হিন্দুনরপতিকেই সাহায্যার্থে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহারাও সকলেই অর্থ দিয়া, দ্রব্য দিয়া, শিল্পী পাঠাইয়া, যথাশক্তি ও যথাসম্ভব সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। ফলে একদিন সমগ্র ভারতের সমস্ত আর্য্যরাজশক্তির সমবেত চেষ্টায় এই মরধামের অমরপুরী তুল্য এই মহাপুরী পরিনির্ম্মিত হইয়াছিল। পুরীর বাহিরের দৃশ্য বিশাল বিরাট—সুমহান্—সুন্দর। আভ্যন্তরিক দৃশ্য বিপুল—বিস্ময়কর—মনোহর—মোহহর।

পুরাণ-মতে রাজর্ষি ইন্দ্রদ্যুম্ন এই পুরুষোত্তম-প্রাসাদ নির্ম্মাণে সর্ব্বস্ব পণ করিয়া, দেবর্ষি নারদের [illegible] কৃপায়, স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা দেবের [illegible] কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। অপরিমেয় ধন, অসংখ্য জন, তদুপরি দেবশক্তি, এবং সর্ব্বোপরি বোধ হয় ভক্তপ্রবর ইন্দ্রদ্যুম্নের ভগবদ্ভক্তি; এই সমস্তের সংপূর্ণ সমবায়ে এই অতুল দেউল-সংগঠন সংপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। বঙ্গীয় মহাভারতকার শ্রীমৎ কাশীরাম দাসের অনুজ শ্রীমৎ গদাধর দাস-বিরচিত ("উৎকল খণ্ড" গ্রন্থের অনুবাদ স্বরূপ) "জগন্নাথ মঙ্গল" বা "জগৎ-মঙ্গল" গ্রন্থ হইতে এ বিষয়ের একটু বর্ণনা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"মুনি বলে রহিলাম তোমার কারণ।
শীঘ্রগতি কর রাজা দেউল গঠন॥
রাজা বলে মুনিরাজ কর অবধান।
নর-শিল্পী কি করিবে দেউল বিধান॥
বিনা বিশ্বকর্ম্মা নহে দেউল গঠন।
শুনি বিশ্বকর্ম্মারে ডাকিল তপোধন॥
ততক্ষণে বিশ্বকর্ম্মা হৈল উপনীত।
বিশ্বকর্ম্মে দেখি রাজা পূজিল বিহিত॥
লক্ষ লক্ষ বিশ্বকর্ম্মা* আনাইল রাজা।
একে একে সবাকারে কৈল তবে পূজা॥
পৃথিবীতে যত অর্থ হইল সঞ্চয়।
সঙ্কল্প করিল রাজা প্রাসাদের ব্যয়॥
লোকযান গোযান গর্দ্দভযান আদি।
মহিষ-তুরঙ্গযান মাতঙ্গ অবধি॥
অনুক্ষণে নানা যানে আইসে পাথর।
বিশ্বকর্ম্মা করে চিত্র সহ অনুচর॥
নানা উপহার রাজা আনায় যতনে।
যে যাহার ইচ্ছা রাজা দেই শিল্পিগণে॥

* এখানে এই "বিশ্বকর্ম্মা" শব্দের অর্থ সর্ব্ব-কারুকর্ম্মতৎপর উত্তম শিল্পী।

নিরন্তর নৃপতি প্রাসাদে মন দিয়া।
সেইখানে থাকে রাজা আহার ত্যজিয়া॥
আপন সাক্ষাতে করে প্রাসাদ গঠন।
কোন স্থানে হীরা মণি করিল রচন॥
কোনখানে কনকের রচিল পুথলী।
মরকত মাঝে যেন পড়িছে বিজুলি॥
নানাবর্ণ পাষাণেতে করিছে গঠন।
স্ফটিক প্রবাল মুক্তা চন্দ্রের কিরণ॥
অগ্নিপ্রায় সূর্য্যবর্ণ বিবিধ পাথর।
দেউলের মূর্ত্তি দেখি বিস্ময় অমর॥
বিস্ময় গন্ধর্ব্ব নাগ মনুষ্য কিন্নরে।
এ হেন অদ্ভুত কর্ম্ম মানুষে না করে॥"

বস্তুতঃ স্বচক্ষে সে দেউলের ব্যাপার না দেখিলেই এই বর্ণনাকে কবি-কল্পনার অতিরঞ্জনা বোধ হইতে পারে।

সিংহদ্বারের সম্মুখেই কষ্টি-পাথরে সুগঠিত উচ্চ অরুণ-স্তম্ভ। তথায় প্রায় প্রতিদিনই দিন-রাত্র মহাজনতা! শ্রী-মন্দিরপুরীর অন্তরে বাহিরে পার্শ্বে সম্মুখে অহর্নিশ যেন মহামেলা! সিংহদ্বার পার হইলেই "আনন্দ বাজার"। আহা! কোন্ রসিক এ নাম রাখিয়াছিল? আনন্দবাজরই বটে। এই স্থানে অজস্র অফুরন্ত প্রসাদ "মহাপ্রসাদ"রাশি অবিশ্রান্ত বিক্রীত—বিতরিত—আহরিত ও আস্বাদিত হইতেছে। এখানে দেশ-কাল-পাত্র—জাতি-কুল-গোত্র কিছুরই বিচার নাই! এখানে—

"চণ্ডালে ব্রাহ্মণে ভেদ নাহি মানে,
এ দেয় উহার মুখে!
সুধাধিক স্বাদ সে মহাপ্রসাদ
সবাই আস্বাদে সুখে।
ফেলি সুধাপাত্র, আসি পুরীক্ষেত্র,
স্বর্গ হতে সুর সবে।
সে মহাপ্রসাদে অতুল আস্বাদে
অনন্ত আনন্দ লভে।"

এই বর্ণনার প্রথমাংশ সবারই বহিশ্চক্ষে—আর শেষাংশ সুধু ভক্ত জনের মনশ্চক্ষেই লক্ষিত হয়। ফলে হিন্দু জানেন ও হিন্দু মানেন যে, শাস্ত্রবাক্য কখনও মিথ্যাসাক্ষ্য নয়। বস্তুতঃ মহাপ্রসাদের উক্তরূপ মহাভিনন্দন শাস্ত্রেরই সানন্দ-সংঘোষণ।

আনন্দবাজার আনন্দে অতিক্রম করিয়া, আনন্দময়ের আনন্দ-কোলাহলপূর্ণ মহা-মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। প্রথমেই সেই সুবিখ্যাত গরুড়স্তম্ভ দর্শন, স্পর্শন, আলিঙ্গন, প্রণাম, প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সেই স্তম্ভের পশ্চাদ্বর্ত্তী সেই স্থলে, যে স্থলে শ্রীগৌরাঙ্গ দাঁড়াইয়া জগন্নাথ-দর্শন করিতেন, সেই গৌর-প্রসাদী পরম স্থলে দাঁড়াইয়া এ দীনও জগন্নাথ দর্শন পাইল!

আহা! সেই "মণি-কোঠা"য় রত্নবেদিকায় ভক্তের হৃদয়-রত্নত্রয়! জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা! দর্শনমাত্রেই পুলক-লোমহর্ষণে আপাদ-মস্তক আনন্দ-বিদ্যুৎ বহিল! তাঁহাদের রূপ দেখিয়া এ বিরূপ হৃদয়েও যে কিরূপ ভাবের উদয় হইল, তাহা তাঁহারাই জানেন। আমার নিজেরই ধারণার অতীত; সুতরাং অন্যকে সে ভাবাস্বাদের অতুলতা বুঝাইবার বাক্য-চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। কেহ২ বলেন, গরুড়স্তম্ভের পশ্চাত্ হইতে ভাল দর্শন হয় না। তবে স্বয়ং গৌরহরির সে আত্ম-দর্শনের কথা স্বতন্ত্র। কোথায় মহাপ্রভুর দর্শন, আর কোথায় দীনহীন দাসাভাসাধমের দর্শন!

ফলে সমীপস্থল অপেক্ষা সে স্থল হইতে কিছু অস্পষ্ট দর্শন অবশ্য স্বাভাবিক; কিন্তু এই স্থান হইতেই জগন্নাথের চাঁদমুখ দেখিয়া অজস্র ভাবাশ্রুধারে আমাদের গোরাচাঁদের চাঁদমুখ ভাসিয়া যাইত, এই মধুর ভাব-চিন্তা চর্চ্চিত চিত্তে সেখান হইতে যাহা দেখিলাম, তাহাতেই ধন্য ও কৃতার্থমন্য হইলাম। পরেও আমি এই স্থান হইতেই প্রায় দর্শন করিতাম; সম্মুখে খুব কমই গিয়াছি। সেই স্থানের পাষাণ-ভিত্তিতে সেই পাষাণ-দ্রাবী প্রেমময় গৌরাঙ্গের করপদ্মের তিনটি অঙ্গুলীর অগ্রভাগস্পর্শ-চিহ্ন অঙ্কিত আছে। সেই স্থলের হর্ম্ম্যতলের প্রস্তর খণ্ডের উপরেও পাদপদ্মাঙ্ক অঙ্কিত হইয়াছিল; তাহা এখন মন্দিরের বাহিরে চত্বরে ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র মন্দিরাকারে গঠিত গৃহে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত। তাহা দর্শন করিলে, আমার বোধ হয়, তাহাতে কোনরূপ কৃত্রিমতার সন্দেহ কল্পনায়ও আসিতে পারে না। অন্যান্য অনেক কৃত্রিম ক্ষোদিত পাদপদ্মের চিহ্নও এইরূপ ক্ষুদ্র ২ মন্দির-গৃহে ও অন্যান্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে; তাহা দেখিলে, "নির্ভাজ পাড়াগেঁয়ে ভাল মানুষ"ও কৃত্রিম বলিয়া বুঝিতে পারে; কিন্তু গৌরাঙ্গ-চরিতে বর্ণিত মহাপ্রভুর সেই মহাকৃতির অনুরূপ-পরিমিত এই অতি স্বাভাবিক স্বতঃপ্রামাণ্য পদচিহ্ন দেখিলে, বোধ হয় সদাসন্দিগ্ধ-চিত্ত ঘোর তার্কিক বৈজ্ঞানিকেরও সহসা কৃত্রিম বলিবার সাহস হয় না। ফলতঃ ভক্ত বিশ্বাসীর পক্ষে এ পদচিহ্ন যে সেই কৃপাময়ের কিরূপ কৃপা-প্রসাদ তাহা স্বচক্ষের সাক্ষ্য ব্যতীত বাক্যে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। আমার বোধ হয়, বর্ত্তমানে গৌরাঙ্গ-মহিমার ইহা একটি সুবর্ত্তমান স্বতঃপ্রমাণ সুস্পষ্ট নিদর্শন।

শত গৌর-চরিত গ্রন্থের কার্য্যকারিতাও বুঝি এই এক গৌর-পদচিহ্নের নিকট অধঃকৃত! আধুনিক রাধাকান্ত-মঠে—(যে বাটী তাৎকালিক পুরীরাজগুরু শ্রীমৎ কাশী মিশ্রের বাটী ও শ্রীগৌরাঙ্গের বাসাবাটী) শ্রীগৌরাঙ্গের সেই "গম্ভীরা"-আখ্য শয়ন-কক্ষ ও তাঁহার কন্থা, করোয়া ও কাষ্ঠপাদুকা প্রদর্শিত হইয়া থাকে; কিন্তু সে সমস্ত এ সুলভ-বিশ্বাস-বিরহিত সন্দেহ-সঙ্কুচিত পোড়াপ্রাণে যেন ঠিক প্রকৃত বলিয়া লাগিল না। বিশেষতঃ সেই প্রকাণ্ড পাদপদ্ম চিহ্নের সহিত এই মধ্যম-পরিমিত কাষ্ঠপাদুকার সামঞ্জস্যই সম্ভবেনা। যদি ধরা যায় যে, ইহা মনেরই দোষ; কিন্তু এই মনেইত সেই পাদপদ্ম-চিহ্ন দর্শনে সন্দেহের 'স'ও আসে নাই! ফলে পুরীস্থিত গৌর-পদচিহ্ন যে গৌরভক্ত-সমাজের কিরূপ উপকারী, কিরূপ প্রাণমনোহারী, কিরূপ সুখসেব্য - অথচ সুখলভ্য, তাহা বর্ণনে দূরে থাক্—মননেও এ অধম অক্ষম।

তারপর, গৌরাঙ্গের অপর পরকৃপা প্রকাশন অপূর্ব্ব ষড়ভুজরূপ-প্রদর্শন-স্থল শ্রীমৎ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বাসাবাটী আধুনিক "গঙ্গামাতা-মঠ" দর্শন করিলাম। এখন সে স্থল রম্য হর্ম্ম্যময়। শ্রীবাসুদেবের ঠিক স্থানটি কোথায় ছিল, কোথায় সেই সর্ব্ব-স্বরূপ ষড়ভুজ রূপের অপরূপ উদয় হইয়াছিল, কোথায় সেই শ্রীভাগবতের শ্রীগৌর-মুখোক্ত অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা-বিচার-প্রবাহ বহিয়াছিল, তাহা বুঝিবার সৌভাগ্য-সুহৃনাশা

আমাদের কিরূপে আসিবে? একটি প্রকোষ্ঠের প্রাচীরে অধুনা গৌরাঙ্গের ষড়ভুজমূর্ত্তি ও প্রাচীরান্তরে বাসুদেবের প্রতিকৃতি চিত্রিত। আমরা তথায় গৌরচিন্তাচর্চ্চিত চিত্তে প্রণত হইয়া, গৌরপ্রিয়-পার্শ্বদ-সপ্তকের সিন্ধুতীরবর্ত্তী আধুনিক "সপ্তাসন" সংজ্ঞক ভজনকুটীর-সমূহ সন্দর্শনে যাত্রা করিলাম। এখন আর তথায় কুটীর নাই। সবই পাকা প্রকোষ্ঠময় দালানে পরিপূর্ণ। তথায় সেই গৌরহরির স্বশ্রীকর-সংস্থাপিত হরিনামসর্ব্বস্ব হরিদাসের সমাধি দর্শনে ক্ষণিক ভাব-বিহ্বল হইলাম। প্রণত হইতেই প্রাণে প্রার্থনা আসিল—"হে হরিনামসর্ব্বস্ব-হরিদাস-সমাধে! তোমার দর্শন স্পর্শনে এ অধমাধমের হরিনামে অন্ততঃ অনুমাত্র রতি-গতি-মতি হউক্।"

শঙ্করাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের সংস্থাপিত সহস্রাধিক বৎসরের সুপ্রাচীন সেই "গোবর্দ্ধন-মঠ" দর্শন করিলাম। স্থানটি সুপ্রাচীন বটে, কিন্তু আবাস-গৃহাদি ক্রমশঃ সংস্কৃত ও নবীভূত হইয়া আসিয়াছে। বর্ত্তমানে হর্ম্ম্যময়। তন্মধ্যে একটি প্রকোষ্ঠ অতি প্রাচীন, অথচ প্রশস্ততর বোধ হইল। সেইটিতেই বর্ত্তমান মোহান্তের গদী ও গ্রন্থালয়। প্রচুর সংখ্যক প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ সংগৃহীত দেখিয়া প্রচুর আনন্দোল্লাস অনুভব করিলাম। অধুনাও অনেক বেদ-বেদান্তের ছাত্র এই মঠের আশ্রিত। বর্ত্তমান আচার্য্য মোহান্তের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলাপে সুখী হইলাম। পুরীতে অদ্যাপি বিস্তর মঠ এইরূপ শাস্ত্রাধ্যয়নাধ্যাপনার সুব্যবস্থায় অবস্থাপিত।

তারপর, যমেশ্বর টোটায় সেই সুবিখ্যাত "যমেশ্বর" শিবলিঙ্গ ও শ্রীগোপীনাথ-মন্দিরে সেই চির-গৌরাঙ্গ-অঙ্গ-আবরক সুত্রিভঙ্গ গোপীনাথ বিগ্রহ আকুল আগ্রহে দর্শন করিলাম। হরি হরি! সেই ভূতলে অতুলা শ্রীগৌরলীলার এই খানেই পার্থিব পর্য্যবসান! এই মন্দিরেই সেই ভক্তজনের নিরন্তর অন্তরের নিধি অনন্ত প্রেমময়ের অনন্তে অন্তর্ধান! এই সেই দিগন্তপ্রসারী দুরন্ত সিন্ধু; ঐ সেই বালুরাশি-বিনির্ম্মিত চটক পর্ব্বত!

আহা! বোধ করি, ভক্তজনের ভাবাক্ত হৃদয়ে এখানকার প্রতি সাগর-তরঙ্গে, বেলা-বালিয়াড়ির প্রতি বালুকণার সঙ্গে, তরুলতার প্রতি পত্র-অঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের অমিয়-লীলা-স্মৃতির উদ্দীপনা উদিত হয়। গোপীনাথের মন্দিরটী সুপ্রাচীন,—যেন সেই সময়েরই বলিয়া বোধ হইল। এই স্থানে আসিয়া, সেই গোপীনাথের সম্মুখে বসিয়া, ক্ষণকাল যেন আত্মহারা হইয়া রহিলাম। যেন প্রাণ আকুল হইল, মন উদাস হইল; হৃদয় ভাবে ভাসিল, নয়নে জল আসিল! 'হা গৌরাঙ্গ! কোথা গৌরাঙ্গ'! বলিয়া যেন চীৎকার করিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হইল। কষ্টে সে উচ্ছ্বাস সম্বরণ করিয়া, যেন নবীভূত গৌর-বিরহ-বিদগ্ধ হৃদয়ে সন্তপ্ত সিকতাকীর্ণ সিন্ধুতীর বাহিয়া "স্বর্গদ্বার" ঘাটের পথে সেই লোকবিখ্যাত শ্রীলোকনাথ শিব দর্শন পূর্ব্বক, অন্য অনেকগুলি খণ্ডতীর্থ ও দেবস্থলী দেখিয়া জগন্নাথ-মন্দিরে প্রত্যাগত হইলাম। সন্ধ্যারতির পর গরুড়স্তম্ভের পার্শ্বস্থ সেই গৌরাঙ্গের দর্শন-স্থান হইতে দীপালোকে জগন্নাথ দর্শন দিবাভাগ অপেক্ষাও সুস্পষ্টতর বোধ হইল। আহা! ঐ রূপের যে কিরূপ অপরূপ ভাব, তাহা বুঝিতে না

বুঝাইতে এরূপ ভাবাভাবগ্রস্ত অনধিকারী বা অধমাধিকারীর সমুচিত শক্তি-সম্ভাব বা ভক্তিপ্রভাব কদাচ সম্ভাবিত নহে। তবু দেখিয়া দেখিয়া দেখিবার আশা পূরে না— তৃষিত আঁখি ফিরে না। মোটামুটি আমার এইরূপ মনে হয় যে, এ জগতে জড়াধারে জগদাধার জগদীশ্বরের যতটা বিকাশ বা বিভূতির প্রকাশ সম্ভাবিত, তাহাই বা ততোধিক এই দারুময়ী জগন্নাথ-মূর্ত্তিতে জীবন্ত ও মূর্ত্তিমন্ত।

তারপর, সেই মার্কণ্ডেয় সরোবর, নরেন্দ্র-সরোবর, ইন্দ্রদ্যুম্ন-সরোবর প্রভৃতি প্রেম-পুণ্য-পবিত্রতাকর সুপ্রসর সরোবর নিকরে সপরিকরে সেই গৌর-কলেবরের জল-কেলি-লীলা স্মরণ করিতে ২ স্নান-সন্ধ্যা-তর্পণাদি করিয়া যে প্রীতি ও পরিতৃপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছি, বচনে তাহা বলিবার নহে, জীবনে তাহা ভুলিবার নহে।

"মার্কণ্ডেয়-বটৌ কৃষ্ণ-রৌহিণেয় মহোদধী।
ইন্দ্রদ্যুম্নসরশ্চৈব পঞ্চতীর্থং প্রকীর্ত্তিতম্॥

৺পুরীধামে এই পুরাণ-প্রমাণ-বাক্য-বিখ্যাত এই পঞ্চতীর্থ বিদ্যমান। সর্ব্বোপরি স্বয়ং শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর মহামন্দির; তৎপর উৎকল-মহাপীঠের মহাদেবী শ্রীবিমলার মন্দির, শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দির, গুণ্ডিচাবাটী-স্থলে শ্রীনৃসিংহ দেবের মন্দির, তদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক বিভিন্ন দেব-দেবীর মন্দির, মঠ, চৈত্য, চত্বর, চিত্র-ক্ষেত্র প্রভৃতি শ্রীক্ষেত্রের সর্ব্বাবয়বে সংস্থিত। বর্ত্তমান সন্দর্ভে সুবিস্তার বর্ণনার শক্তি, সম্ভাবনা ও অবকাশের অভাব। সুতরাং উপ-সংহারে, আমার পুরী হইতে পুত্র হরিদাসের নিকট লিখিত একখানি পত্রের পুরী-বিবরণাংশ এখানে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিয়া অদ্য বিদায় গ্রহণ করিলাম।

"স্নেহের হরি!

এখানকার ব্যাপার অসাধারণ। দর্শনাদি করিয়া আশ মেটে না। যত দেখি, ততই পিপাসা বর্দ্ধিত হয়।—যেন নিত্য-নূতনতাময়! সাধে কি শ্রীগৌরাঙ্গ সকল স্থান ত্যাগ করিয়া এই স্থানেই স্বীয় জীবনের অসাধারণ প্রেমানন্দ-লীলার চরম ও পরম পরিণাম প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন? জগতে যদি পাপী তাপীর জুড়াইবার— প্রেমিক ভক্তের ভগবৎ-ভজিবার ও ভাবুক কবির ভাবে মজিবার কোন স্থান থাকে, তবে বুঝি তাহা এই শ্রীক্ষেত্র ধাম। শ্রীবৃন্দাবন ধাম দর্শন ভাগ্যে ঘটে নাই; ঘটিবে কি না, তাহা সেই বৃন্দাবনবিহারীই জানেন; কিন্তু এই পুরীধামেই বোধ হয় সে ধামের আস্বাদ ভাগ্যবান জন পূর্ণভাবেই পাইতে পারেন; শ্রীগৌরাঙ্গ তাহা দেখাইয়া ও শিখাইয়া গিয়াছেন।

আহা! আমি সেই "জগন্নাথ" দেখিলাম! যে জগন্নাথ দেখিয়া, ভক্তের জীবন গৌরাঙ্গ উন্মত্ত হইয়া, ছুটিয়া গিয়া, জগন্নাথকে কোল দিয়াছিলেন! আমি সেই গরুড়স্তম্ভের কাছে দাঁড়াইয়া সেই জগন্নাথ দেখিলাম!—যে গরুড়স্তম্ভের কাছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, ভাব-সমাধিতে নিজেও স্তম্ভের ন্যায় হইয়া আমাদের (পাপীদের) প্রাণ গৌরাঙ্গ যে জগন্নাথ দেখিতেন,—সেই জগন্নাথ! সেই গরুড়স্তম্ভ! সেই গৌরাঙ্গ-পদচিহ্ন, সেই গৌরাঙ্গ-কর-চিহ্ন! যোগ

হয়, গৌর-প্রেমে পাষাণ দ্রব হইয়াই গৌরের শ্রীকর-পদ-চিহ্ন পাষাণে অঙ্কিত হইয়াছে! ভবিষ্যৎ-ভক্তদের প্রতি ইহা পরমকৃপা-প্রসাদও বটে। আহা! সে পদ-চিহ্ন দেখিলে পাষণ্ডের পাষাণ-প্রাণেও প্রেমের অঙ্কুর হয়!

সেই শ্রীমন্দির! বহু দূর হইতে যাহার চূড়া-চক্র দর্শন করিয়া গৌরাঙ্গ উন্মত্তবৎ ছুটিয়াছিলেন! সেই মন্দির--কি অদ্ভুত—কি অপূর্ব্ব! কি অসাধারণ—কি অনুপম! মানুষের চেষ্টায়—মানুষের হাতে কি এমন বিরাট ব্যাপার সম্পন্ন হইতে পারে? "বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত" বলিয়া যে পৌরাণিক প্রবাদ আছে, তাহা অন্ততঃ এই ভাবে নিশ্চয় সত্য যে, মানুষের হাত "উপলক্ষ" থাকিলেও, স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মাদেবের শক্তি-প্রেরণাই তাহার প্রকৃত নির্ম্মাণকর্ত্রী। ইংরাজেরাও ইহাকে পৃথিবীর "অষ্টম আশ্চর্য্য পদার্থ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আহাহা! সেই মন্দির! সেই জগন্নাথ! সেই গৌরাঙ্গ-চিহ্নসমূহ! সেই অসংখ্য সাধুভক্তের ভাবাবেশ-ভূমি! সেই অকূল নীলজলনিধি! আহা! অন্যত্রেও এই সমুদ্র দেখিয়াছি—কিন্তু সে যেন এমন নয়; অথচ সেই একই সমুদ্র বটে; কিন্তু পুরীর পুরোভাগের এই সমুদ্র দর্শনে যেন ভাব-সমুদ্র আপনি উছলিয়া উঠে! এই সমুদ্রেই আমাদের প্রেম-সমুদ্র শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমোন্মাদে ঝাঁপ দিয়াছিলেন! সেই চটক পর্ব্বত, যাহাতে "গোবর্দ্ধন-গিরি" ভ্রমে গৌরাঙ্গ কণ্টক-কঙ্করাঘাত তুচ্ছ করিয়া ছুটিয়া যাইতেন; সেই নরেন্দ্রসরোবর! যেখানে ভক্তগণ সঙ্গে পরম প্রেমরঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ জলকেলি করিতেন! সেই কাশী-মিশ্রের বাটী শ্রীগৌরাঙ্গের আশ্রম-বাটী, অধুনা "রাধাকান্ত মঠ" নামে খ্যাত। সেই বাসুদেব সার্ব্বভৌমের বাসাবাটী, অধুনা "গঙ্গামাতা-মঠ" আখ্যায় বিখ্যাত। সেই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রিয় সপ্ত পার্শ্বদের সপ্ত ভজন-কুটীর অদ্যাপি "সপ্তাসন" নামেই সুপরিচিত। সেই শ্রীগৌরাঙ্গের প্রাণপ্রিয় "হরিদাসের সমাধি" সেই অনন্ত সমুদ্রতীরে যেন অনন্ত ভাবরত্ন বক্ষে ধরিয়া নীরবে বিরাজিত বা ধ্যানমগ্ন! সে সমাধির কাছে বসিলে, বুঝি পাষণ্ডের প্রাণেও ভাব-সমাধির আবেশ আসিয়া লাগে! তার পর—ওঃ কি বিরাট বিস্তৃত রথ-যাত্রার পথ! এত বড় প্রশস্ত রাস্তা বোধ হয় পৃথিবীর কোন মহানগরে আর নাই। যেন রাস্তারূপী মাঠ! অথবা মাঠরূপী রাস্তা—বলিলেই হয়। আহা! এই পথে কতই গৌরাঙ্গ-পদ-ধূলি পড়িয়াছে! রথযাত্রার সময়ে এই পথেই গৌরাঙ্গের মহাসংকীর্ত্তন—মহাভাব—মহাঅষ্ট-সাত্ত্বিক বিকার দেখিয়া, ৪১৮ বৎসর পূর্ব্বে পুরীর লোক বিস্মিত—বিমোহিত—কৃতকৃতার্থ হইয়াছে! আজ এই ৪১৮ বৎসর পরে সেই পথের ধূলা মাথে লইয়া, সেই চরণ-ধূলা স্মরণ করিয়া এ অধমাধমও কৃতার্থ হইল। হরিদাস! অধিক কি বলিব? বহির্জগতের যত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য ও অন্তর্জগতের যত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য, সব যেন এই পুরীধামে একাধারে পাইলাম—একত্রে আস্বাদন করিয়া ধন্য হইলাম। পুরীর কথা কিছুই লিখিতে পারিলাম না; কে লিখিতে পারে, জানি না। পুরীর ক্ষেত্র

"মহাপ্রসাদ"এর ব্যাপারই মহামহিমাময় ! মহাপ্রসাদের ক্রয়-বিক্রয়, আদান-প্রদান, আস্বাদন-আপ্যায়ন, তাহাই এক চমৎকার ব্যাপার ! জগতে কোথাও ইহার তুলনা নাই। কার সাধ্য পুরী-মাহাত্ম্য পত্র-পৃষ্ঠে বা অধর-ওষ্ঠে বর্ণনা করে ? ফল কথা, পুরীর সকলই বিচিত্র, সকলই অদ্ভুত, সকলই অপূর্ব্ব, সকলই অতুল্য ! পুরীনাথ শ্রীজগন্নাথ এ আত্মদোষ-অনাথকে কৃপা করিবেন কি" ?

শ্রীশরদিন্দু মিত্র।

হিন্দু রাজা সীতারাম রায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

পরিশিষ্ট।

সীতারাম আবুতোরাবের উপর বিরক্ত ছিলেন। আবুতোরাবের চরিত্র সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রস্তাবে বিশেষ করিয়া লিখিত আছে, সে জন্যও সীতারাম তাহার উপযুক্ত শাস্তি বিধানের চেষ্টা করিতে ছিলেন, এরূপ সময়ে আবুতোরাবের এই মর্ম্মভেদী উক্তিতে সীতারামের ক্রোধানল একেবারেই বিদ্যুৎ-বেগে প্রজ্বলিত হইল। তিনি আবুতোরাবকে কোন উত্তর না দিয়া, তদীয় প্রধান সেনাপতি মেনাহাতী ও কোতয়াল আমন-বেগকে (হামলা বাঘা) আহ্বান পূর্ব্বক আদেশ করিলেন "তোরাবের কাটা মাথার দাম দশ হাজার টাকা ! যে ত্রিরাত্রির মধ্যে তোরাবের মাথা কাটিয়া আনিয়া দিবে, সেই [illegible] দশ হাজার টাকা পাইবে।" আমন বেগ সাহসী হইয়াছিল না। মেনাহাতী রাজাদেশ প্রাপ্তি মাত্র সম্মত হইয়া, রাজাকে অভিবাদন পূর্ব্বক সসৈন্যে ভূষণায় গিয়া, তোরাবকে পরাজয় পূর্ব্বক তদীয় কাটা মাথা সীতারাম সমীপে আনয়ন করে। পঞ্জীতে লিখিত আছে যে, রাজা ঐ মস্তক রাণীদিগকে দেখাইয়া কাটামুণ্ডে পদাঘাত করেন। এই ভয়ঙ্কর সংবাদ মুরাসদাবাদ "মসনদে" পহুঁছিলে, নবাব কুলিজাফর খাঁ। (মুরশিদকুলী খাঁ।) অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া সীতারামকে বন্দী করিবার জন্য নৌকাপথে দুই দল প্রবল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। সেনাপতি কে ছিলেন, কিছুই উল্লেখ নাই। সৈন্যদের প্রতি আদেশ থাকে যে, পদ্মা বাহিয়া গড়ই নদী হইয়া অগ্রে সীতারামের কেল্লা ভূষণা দখল করে; পরে যে কোন উপায়ে হউক, সীতারামকে বন্দী করিয়া মুরসিদাবাদে লইতে হইবে। নবাব-প্রেরিত সৈন্য দল "আল্লাহো আকবর" রবে চতুর্দ্দিক বিকম্পিত করিতে করিতে ভূষণায় আগমন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ সীতারামকে আহ্বান করে। প্রথমে কতিপয় যুদ্ধে মেনাহাতীর যুদ্ধ-নিপুণতায় নবাব-সৈন্য পরাজয় স্বীকার করে। শেষে কৌশলে মেনাহাতীর বিনাশ সাধনে যত্নবান্ হয়। মেনাহাতীর হত্যা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে। যাহাহউক, নবাব-সৈন্য মহম্মদপুরে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক মেনাহাতীকে ধরিয়া, তাহার বাহুবদ্ধ শিকড় উঠাইয়া, তাহাকে নৃশংসরূপে হত্যা করে এবং অবশেষে সমস্ত সৈন্য একত্র হইয়া মহম্মদপুর রাজধানীতে আগমনপূর্ব্বক রাজার অসাবধানাবস্থায়

রাত্রিতে রাজবাড়ীর গড় আক্রমণ করে। সীতারামের সৈন্য-সংখ্যা তখন অতি অল্প থাকায়, সুতরাং তিনি পরাস্ত হইয়া নবাবসৈন্য হস্তে ধৃত ও বন্দী হন। অন্তঃপুরস্থ স্ত্রীলোকবর্গ উপস্থিত বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য খিড়্‌কী দ্বার দিয়া কোনরূপে পলাইয়া, রাজবাড়ীর নিকটবর্ত্তী "চক্র বার" নামক একজন রাজপুতের (ক্ষত্রিয়) বাটীতে গোপনে অবস্থিতি করেন। পরে নবাব-সৈন্য সীতারামকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলে, রাজপরিবারস্থ স্ত্রীলোকবর্গ অতি গোপনে হরিহর নগরের বাটীতে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মনে মনে আশা ছিল যে, তথায় লক্ষ্মীনারায়ণ সপরিবারে বাস করিতেছেন; তাঁহারা তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিবেন। কিন্তু বিপদ কখনও একাকী উপস্থিত হয় না। যখন দুঃখের সময় উপস্থিত হয়, তখন শত চেষ্টা করিলেও দুঃখের অবসান হয় না; বরং উত্তরোত্তর দুঃখের বৃদ্ধিই হইতে থাকে। রাজপরিবারবর্গের অদৃষ্টেও তাহাই ঘটিল। হরিহরনগরে লক্ষ্মীনারায়ণ মুসলমান সৈন্যের মহম্মদপুর আক্রমণ ও অগ্রজের দুরবস্থার সংবাদ শ্রবণে সপরিবারে বাটী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বাঞ্চলে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন। রাজপরিবারবর্গ অগত্যা বাধ্য হইয়া কিছু দিন হরিহরনগর রাজবাটীতে পুরোহিত-বাসায় গোপনে বাস করিতে লাগিলেন। হরিহরনগর রাজবাটীও খুব বড় বাড়ী ছিল। পাকাবাড়ী, প্রকাণ্ড দীঘিকা ইত্যাদি এবং বাড়ীতে দেববিগ্রহাদি স্থাপিত ছিল। অদ্যাপি সেই বাড়ীতে ৺শ্রীধর শালগ্রাম চক্র বিগ্রহ বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

সীতারাম নবাব-দরবারে উপস্থিত হইলে, নবাব সীতারামের যুদ্ধপটুত্ব ও বীরত্ব প্রভৃতি গুণে আপাততঃ প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করিলেন। রাজা নজরবন্দী অবস্থায় রহিলেন। প্রত্যহ বন্দীবেশে নবাব-দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইত। এরূপ অবমানিত অবস্থায় জীবিত থাকা অপেক্ষা মৃত্যু সহস্র গুণ শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়া, সীতারাম আত্মহত্যার সংকল্প করিলেন। তখন সীতারাম সর্ব্বদা প্রহরীগণ কর্তৃক বেষ্টিত থাকিতেন, কোনও সময়ের জন্য প্রহরীহীন থাকিতেন না; সুতরাং আত্মহত্যার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। এই অবস্থায় কিছু দিন থাকিয়া, নবাবের তদানীন্তন দেওয়ান নাটোর রাজবংশের আদি পুরুষ রঘুনন্দনের সহিত গোপনে মুক্তির পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রঘুনন্দন ২ দুই লক্ষ টাকা উৎকোচ প্রার্থনা করেন। সীতারাম সমভিব্যাহারী জনৈক ব্যক্তিকে মহম্মদপুরে লক্ষ্মীনারায়ণের নিকট প্রেরণ করেন এবং লক্ষ্মীনারায়ণকে সমস্ত বিষয় লিখিয়া পাঠাইলেন। লক্ষ্মীনারায়ণও দুই লক্ষ টাকা সংগ্রহপূর্ব্বক মুরশিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই সময়ে নবাব-দরবারে এরূপ একটা চক্রান্ত হইল যে, তাহার দ্বারা সীতারামের আশা ভরসা এককালে বিনষ্ট হইল। রঘুনন্দন কর্ত্তৃকই এই ষড়্‌যন্ত্র হয়; সে সমস্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীবরদাকান্ত দে।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

১৩১০ সালের ১লা বৈশাখ হইতে ৪ঠা কার্ত্তিক পর্য্যন্ত
যে সমস্ত গ্রাহকের টাকা পাওয়া গিয়াছে তাঁহাদিগের নাম।

নং		নাম	
৩৪৬৭	বাবু	নীলচন্দ্র রায়	১৩০৯
২৭৬১	,,	নিত্যগোপাল মিত্র	১৩০৯
৮৮	,,	অমরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	,,
৩৫৫৪	,,	মতিলাল মুখোপাধ্যায়	৯, ১০
৩১৫৫	,,	দেবেন্দ্রনাথ আঢ্য	১০
২৫১৫	,,	সুরনাথ চৌধুরী	৬, ৭, ৮
৩২৪৬	,,	গৌরমোহন রায়	৮
২৪২	,,	বিশ্বেশ্বর দাস গুপ্ত	৯, ১০
১৭২৩	,,	প্রতাপচন্দ্র দে	১০
১২৯৬	,,	খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৯
১০২৫	,,	কিশোরীকিশোর গোস্বামী	৮.৯
১৩৭১	,,	কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য	৮, ৯
১৬৬৭	,,	প্যারীমোহন সরকার	১০
৩১৬৬	,,	রজনীকান্ত বসু	৯
৫১৫	,,	দুর্গানন্দ সেন	৯
১৫৪২	,,	নন্দকুমার বসু	,,
১৭৯	,,	বৈকুণ্ঠনাথ রায়	,,
১২৭১	,,	কৃষ্ণচরণ আচার্য্য	,,
১২৮৪	,,	কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	,,
১৫৬২	,,	নিত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়	,,
১৫৬৮	,,	নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	,,
১৭৬৫	,,	পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ	,,
১৮০	,,	বিপিনবিহারী সেন	,,
৬৬৬	,,	শক্তিনাথ সরকার	,,
১১৪৯	,,	কুঞ্জবিহারী ঘোষ	,,
১১১১	,,	কুলদানন্দ রায়	৬, ৭, ৮, ৯

নং		নাম	
১৩১০	বাবু	কুঞ্জবিহারী লাহিড়ী	৯
১২৫৩	,,	কালীপদ ডাঙ্গরা	৯
১১৫৯	,,	কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়	,,
১৩৮৩	,,	ললিতকিশোর মিত্র	,,
১৪৭৩	,,	মহিমাচন্দ্র ঘোষ	৬, ৭, ৮, ৯
১৪৮১	,,	গোকুলদাস মিত্র	৯
১৪৮৫	,,	মণিমোহন সেন	,,
১৪৮৮	,,	মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	,,
১৪৯০	,,	মহাতাপচন্দ্র ঘোষ	,,
১৫৩৭	,,	মহেন্দ্রনাথ বসু	,,
১৫৪৭	,,	নবীনচন্দ্র চৌধুরী	,,
১৬২৬	,,	গণেশনাথ চট্টোপাধ্যায়	৮, ৯
১৬৯৭	,,	গোপালকৃষ্ণ দত্ত	৯
১৭১২	,,	শ্যামচন্দ্র রায়	,,
১৮১৩	,,	রাজেন্দ্রলাল দাস	,,
১৯১৬	,,	রাজেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	,,
১৯৯৮	,,	শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায়	,,
২১৫৫	,,	তারিণীচরণ দাস	৮, ৯
৪৪৬	,,	চন্দ্রকান্ত গুপ্ত	৯
১১৭৯	,,	কেদারনাথ বক্সী	,,
১১৪২	,,	কামিনীমোহন দাস গুপ্ত	,,
১৫৫৩	,,	নবদ্বীপচন্দ্র কর্ম্মকার	,,
১৫৭০	,,	নীলকমল রায়	,,
১৮০৩	,,	রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়	,,
১৮৯৬	,,	রামচরণ সিংহ	৬, ৭, ৮, ৯
২১৯৬	,,	উমেশচন্দ্র ঘটক	[illegible]

১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০ ইত্যাদি অঙ্ক দ্বারা [illegible]

১১৯৮ বাবু উগ্রকণ্ঠ রায় ৯
১১৬৪ ,, জ্ঞানেন্দ্রমোহন রায় ,,
২৭৭১ ,, রজনীকান্ত ঘোষ ৯, ১০
৩১৫৭ ,, রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী ৯
১৩৩৯ ,, ক্ষীরোদনাথ সিংহ ,,
১৫২৭ ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ৭,৮,৯
১৫৬৩ ,, নীলকান্ত দাস ৯
১৬৯৪ ,, প্রসন্নকুমার পাল ,,
১৮৬৯ ,, রমেশচন্দ্র রায় ,,
২০১৬ ,, ভূপেন্দ্র সবিজ কুমার ৭, ৮, ৯
২০৯২ ,, শ্যামলাল দত্ত ৯
২২৫২ ,, ত্রৈলোক্যনাথ দাস ,,
২৩৮৯ ,, হরেন্দ্রলাল চৌধুরী ,,
২৪৩২ ,, গঙ্গাপ্রসন্ন গুহ ,,
৩৫৮৪ ,, শিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ,,
১৫২০ ,, মহেশ্বর সিংহ দেব ,,
১৩২৪ ,, কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায় ,,
১৬৮৫ ,, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ,,
১৭৪৮ ,, পার্ব্বতীচরণ দাস ,,
১৮০৬ ,, রজনীকান্ত বসু চৌধুরী ,,
১৮১০ ,, আর. কে. মুখোপাধ্যায় ,,
১৮১৩ ,, রামগোপাল বক্সী ,,
১৮৪৬ ,, রামগোপাল মুখোপাধ্যায় ,,
১৯৬৩ ,, রাজেন্দ্রনাথ দে ,,
২০৫৮ এস, এন, চৌধুরী স্কয়ার ৯
২০৬৭ বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
২০৮৫ ,, শ্যামাপদ চৌধুরী ,,
২০৮৮ ,, সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় ,,
২২৭৫ ,, তারকনাথ বাগচী ,,
২৫৫২ চৌধুরী শ্রীপতিনাথ কর মহাপাত্র ৯, ১০
৩০৯১ বাবু রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৯
৩১১৫ ,, ত্রৈলোক্যনাথ নন্দী ,,
৩১২১ ,, গোপালচন্দ্র লাহিড়ী ,,
৩১২০ ,, রাজেন্দ্রনারায়ণ সাহা ,,
৩১২৫ ,, কালীমোহন বসু ,,
৩১৩২ ,, গুরুচরণ বসু ,,
৩১৪২ ,, আনন্দচন্দ্র রায় ,,
৩১৪৩ ,, ভৈরব প্রসাদ ,,

৩১৫০ বাবু হরিনাথ সরকার ৯
১৭৮৬ ,, রামদাস সরকার ১০
১৯৭ ,, ভগীরথ সেন ,,
২৬৫২ ,, রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য ১৩০৭ মূল্য মধ্যে
১৭ ,, গোপালচন্দ্র কর ,,
১৫০৭ ,, মতিলাল দাস ৯
১৯১২ ,, রামদাস ব্রহ্ম ৯
২১০৯ ,, শীতলচন্দ্র ধর ,,
২১৫৫ ,, সোনারাম দাস ,,
২২৪১ ,, ত্রৈলোক্যনাথ কাঞ্জিলাল ,,
২৩১৯ শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজা উদ্ধবচন্দ্র দেব বাহাদুর ৯
৩০৪৮ বাবু বনমালী ঘোষ ৮
১৩৬৭ ,, কালাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ৯
১৩০০ ,, কামদাচরণ ঘোষ ৮, ৯
১৩৩৬ ,, কালীকিশোর ভট্টাচার্য্য ৯
২০৩৭ ,, শ্যামাচরণ সিংহ ৯
২১০৩ ,, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ,,
২২১১ ,, শশীভূষণ বসু মজুমদার ৮, ৯
২২৯০ ,, উমেশচন্দ্র সমদ্দার ৮, ৯
২৩০৪ ইউ, সি, মুখার্জ্জি স্কয়ার ৯
২৫২২ বাবু সতীন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় ,,
২৮৮২ ,, গোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ,,
২৯৯৬ ,, শরচ্চন্দ্র ঘোষ ,,
৩১৫৯ ,, বঙ্কবিহারী গোস্বামী ,,
৩২৩৪ ,, দ্বিজপ্রসন্ন সেন ,,
৩২৪১ ,, ভবানীনাথ চক্রবর্ত্তী ৮, ৯
৩৪৪৯ ,, বিপিনবিহারী হালদার ৯
৩৪৫৫ ,, বঙ্কবিহারী দত্ত ,,
১২৩১ ,, কালীপদ মৈত্র ,,
১৪৪৮ ,, মেঘনাদ চৌধুরী ,,
১৫১৮ ,, মুকুন্দনাথ দাস ৮, ৯
১৫৮৯ ,, নিত্যানন্দ রায় ৯
১৬৫৭ ,, প্রিয়নাথ দাস ,,
১৬৭৬ ,, প্রসন্নকুমার ঘোষ ,,
১৮১৬ ,, রামচন্দ্র চূড়ামণি ,,
১৮৩২ ,, রাজকুমার তর্করত্ন ,,
১৮৪৯ ,, রুক্মিণীকান্ত চক্রবর্ত্তী ৮, ৯

২০১৪	বাবু ষষ্ঠীবর ভটাচার্য্য	৯
২৪১৮	„ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০
২৪৮৮	„ রাসকলাল সেন	৯
২৬০৬	„ পূর্ণচন্দ্র ঘোষ	৯, ১০
২৭৩৫	„ কৃষ্ণনাথ রায়	„
২৭৫৭	„ অমৃতলাল রায়	„
২৭৮২	„ ভবানীপ্রসাদ লাহিড়ী	„
২৭৯৩	„ কুমুদচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১০
৩০০৩	„ গোপালচন্দ্র সিংহ	৯
৩০১৪	„ হরিচরণ সেন	৯, ১০
৩০২০	„ বৃন্দাবন চৌধুরী	৮, ৯
৩০২৯	„ যোগেন্দ্রনাথ সিংহ	৯
৩০৪৪	„ রজনীকান্ত রুদ্র	৯, ১০
৩১২৩	„ জ্ঞানদাগোবিন্দ চৌধুরী	৮,৯
৩১৫৯	„ রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	৯
৩২৩৮	„ জহরলাল নন্দী	৯, ১০
৩৪৪৭	„ যোগেন্দ্রনাথ বসু	৯, ১০
৫৫০	ডাক্তার দিননাথ সান্যাল	১০
১৪৯৭	শ্রীযুক্ত মহীধর ভূঁইয়া	৯
১৭৯৮	বাবু রামমোহন নাথ	„
১৮৫৬	„ রসিকলাল বসাক	„
১৯৭১	„ রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	„
২০৩৫	„ সুরেন্দ্রনাথ দত্ত	„
২০৭৪	„ সূর্য্যকান্ত চক্রবর্ত্তী	„
২০৯৬	সেক্রেটারী ব্রাহ্মণবাড়িয়া	„
২৯৮৯	বাবু যাদবচন্দ্র তলাপাত্র	„
৩০৭৯	„ যদুনাথ রায়	„
৩১৯০	„ রাজেন্দ্রনাথ বাগ	„
৩৪৭৮	„ কালাচাঁদ ভট্টাচার্য্য	„
১২৩৫	„ কৈলাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৮,৯
১৩৮১	„ ললিতমোহন ঘোষাল	৯
১৬৭৪	„ প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য	„
১৮০৮	„ রসিকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	„
১৮৭৭	„ রামলাল দত্ত	„
১৯৮৮	„ সারদাচরণ বসু	„
২০২০	„ সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী	„
২১৩৩	„ শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়	„
২১৪০	„ সর্ব্বানন্দ সরকার	„
২১৪৫	„ সৌরেশচন্দ্র সরকার	„
২৪২০	বাবু যদুনাথ দাস	৯
২৪৮১	„ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়	„
২৪৯৪	„ ক্ষেত্রনাথ পাল	„
২৭২৫	„ শ্যামাপ্রসাদ পাইন	„
২৭৫৮	„ শরচ্চন্দ্র দত্ত	„
২৭৮৪	„ খগেন্দ্রনারায়ণ দাস	„
২৮৯৭	„ আশুতোষ ভটাচার্য্য	„
২৯০৭	„ যদুনাথ বসু	„
২৯৯৮	„ হরিদাস ঘোষ	৮, ৯
৩০০২	„ শ্রীশচন্দ্র ভাদুড়ী	৯
৩১০০	„ দিননাথ দাস গুপ্ত	„
৩১৮২	„ রজনীকান্ত সেন গুপ্ত	„
৩১৯৬	„ বিপিনবিহারী ঘোষাল	„
১৩৫০	„ কমলানন্দ বর্ম্মা	„
১৭০৯	„ পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	„
১৭৩৭	„ পাঁচুগোপাল বিশ্বাস	„
১৮৯১	„ কামিনীকান্ত শর্ম্মা তালুকদার	„
১৯২২	„ রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	„
২০৪৯	„ শ্রীনাথ করেঙ্গাই	৮, ৯
২২৩৪	„ শশীভূষণ সরকার	„
২৪১৯	„ যদুনাথ মিত্র	„
২৪৪৬	„ নগেন্দ্রনাথ মিত্র	৯
২৪৫৭	„ বিপিনবিহারি মিত্র	„
২৪৬০	„ কৃষ্ণনাথ চক্রবর্ত্তী	„
২৬১১	„ নগেন্দ্রনাথ রায়	„
২৬৩৯	„ খগেন্দ্র সিংহ	„
২৬৫৬	„ কিশোরীমোহন বকসী	„
২৬৫৯	„ দুর্গারাম বসু	„
২৭০৬	„ হিরালাল সিংহ	„
২৭৫০	„ রামস্বরূপ শর্ম্মা	৮, ৯
২৭৫১	„ শ্রীশচন্দ্র তেওয়ারী	৯
২৭৬৫	„ যতীন্দ্রনাথ খাঁ	৭, ৮, ৯
২৭৯৭	„ রাধিকাপ্রসাদ পাল	৯
২৮২৪	„ চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	„
২৮৩৮	„ উপেন্দ্রনাথ বসু	„
২৮৫০	রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর	„
২৮৫১	বাবু প্রিয়নাথ দত্ত	„
২৮৫২	„ রাজকৃষ্ণ রায়	৮, ৯
২৮৬১	„ শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী	৯

২৯০০ বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৯
২৯০১ ,, জয়চন্দ্র সান্যাল ,,
২৯১৭ ,, তারিণীপ্রসাদ রায় ,,
২৯৮৮ ,, মধুসূদন বসু ,,
৩২৪৫ ,, গোবিন্দচন্দ্র সেন ,,
৩১৫২ ,, রামদাস দাস ৮, ৯
৩৩৯০ ,, পূর্ণচন্দ্র সাহা ৯
৩৪৩৯ ,, বিপিনবিহারী বসু ,,
৩৫২২ ,, গোবিন্দচন্দ্র ভাওয়াল ,,
৩৫৭৬ ,, [illegible] ,,
১৪৩১ ,, এম, এন, মিত্র কুমার ,,
২১৫০ ,, সারদাকিশোর রায় ,,
২১৯১ ,, শ্রীনাথ রায় ,,
২৮১৪ ,, তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী ,,
১৫৭১ ,, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
১৬৫৫ ,, প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ,,
২১২৭ ,, সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য ,,
১৫৬৭ ,, ভবানীমোহন রায় ,,
২৬০৯ ,, মৃত্যুঞ্জয় দাস ৮, ৯,
২৬১৮ ,, ত্রৈলোক্যনাথ মল্লিক ৯
২৭০০ ,, গিরিশচন্দ্র মাইতি ,,
২৭২২ ,, বৃন্দাবনচন্দ্র বণিক ,,
২৮৫৭ ,, অমরনাথ মুনসী ,,
২৮৮১ ,, চন্দ্রকান্ত ঘোষ ,,
২৯১৫ ,, প্রসন্নকুমার পোদ্দার ৭, ৮, ৯
৩০৮৭ ,, রাজেন্দ্রকুমার গুপ্ত ৯
৩২২৫ ,, অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ,,
৩৩৬১ ,, হরিজীবন দত্ত ,,
৩৩০৩ ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ ,,
৩৩৫০ ,, ভবানীপ্রসাদ কুণ্ডু ,,
৩৩৯৫ ,, আশুতোষ গোস্বামী ,,
৩৪১৬ ,, বৃন্দাবনচন্দ্র ঘোষ ,,
১৩৯৯ ,, লক্ষ্মীচন্দ্র মজুমদার ৮, ৯
১৬৩৬ ,, নীলমণি চৌধুরী ৯
১৭৮৮ ,, রামনারায়ণ সরকার ,,
১৯৬৬ ,, রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
১৯৯৪ ,, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
১২৬৪ ,, ত্রিপুরাচরণ ভট্ট ,,

২২৯৯ বাবু ঈশ্বরচন্দ্র বর্ম্মা ৯
২৩৮ ,, উপেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী ৬, ৭, ৮, ৯
১২৬৪ ,, নিত্যগোপাল পাণ্ডে ৯
১৫১০ ,, চণ্ডীপ্রসাদ চৌধুরী ,,
২১২০ ,, ক্ষীরোদচন্দ্র দাস ,,
২২৮০ ,, নবীনচন্দ্র চৌধুরী ৮, ৯
২২৬৭ ,, উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ৯
৩০৩১ ,, গোষ্ঠবিহারী মিত্র ,,
৩১৯৯ ,, রামগোপাল চক্রবর্ত্তী ,,
৩১২৮ ,, [illegible] চট্টোপাধ্যায় ,,
৩১১১ রাজা কিশোরচন্দ্র বীরবর ,,
৩১১৮ বাবু রঞ্জনবিলাস রায় ,,
৩৩৬৬ ,, কুঞ্জবিহারী দে ,,
৩৩৯৭ ,, নবগোবিন্দ সেন গুপ্ত ,,
৩৪১৫ ,, ভবকুমার আদক মজুমদার ,,
৩৪৭৬ ,, অন্নদাচরণ তালুকদার ,,
৩৭৫৭ ,, কাশীকান্ত রায় ১০
১৪৬২ ,, মদনমোহন রায় ৯
১০১৮ ,, শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী ,,
২২৭৫ ,, তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
২৭৬১ ,, হরিদাস দাস ১০
২৪১১ ,, কৃষ্ণবল্লভ শিকদার ৯
২২৭২ ,, নিত্যগোপাল ভট্টাচার্য্য ,,
২৪৮২ ,, দীনেশচন্দ্র রায় ,,
২৬০৩ ,, মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী ,,
২৮১৬ ,, প্রিয়নাথ পালিত ৭, ৮, ৯
২৮৭৬ ,, নরনারায়ণ ভট্টাচার্য্য ৯
৩০১২ ,, ললিতচন্দ্র সেন ,,
৩০১৪ ,, নিশিকান্ত সেন ,,
৩১৬৮ ,, নীলাম্বর চন্দ্র ,,
৩১৭৮ ,, কালীচরণ দাস ,,
৩৪১০ ,, অক্ষয়কুমার পণ্ডিত ,,
২১৩২ ,, সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
২৫৮৪ ,, রাধাবিনোদ দাস ৮, ৯
২৬৭০ ,, পূর্ণচন্দ্র রায় ৯
২৭৪৬ ,, শিবপ্রসাদ জানা ,,
৩৩৫১ ,, সরোজরঞ্জন সরকার ,,

১৭২৭	বাবু	পরেশনাথ দাস	৬, ৭, ৮, ৯
১৮৪৪	,,	বহিন্দ্রনাথ বাগছি	৯
২২৯৪	,,	উপেন্দ্রচন্দ্র সরকার	,,
২৭২৪	,,	কুশপ্রসাদ জানা	,,
২৮৩৩	,,	পরেশনারায়ণ বিশ্বাস	৮, ৯
২৯১৯	,,	কানাইলাল বসু	৯
২৯২২	,,	চিন্তামণি মিশ্র	,,
৩০৮৫	,,	ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী	,,
৩২০৭	,,	জগৎমোহন ঘোষ	,,
৩২২৬	,,	দামোদর ভট্টাচার্য্য	,,
৩২৮২	,,	শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,,
৩২৯১	,,	কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য্য	,,
৩৩০৪	,,	নুটবিহারি গোস্বামী	,,
৩৩৮৬	,,	মতিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	,,
৩৪১৯	,,	শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়	,,
৩১৬৭	,,	শ্রীনারায়ণ রায়	৮, ৯
৩৫৬০	,,	পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য	১০
২৯২৮	,,	রজনীনাথ দাস	৯
৩৩৩৪	,,	উপেন্দ্রনাথ গোস্বামী	,,
২৪২৫	,,	রাজেন্দ্রনাথ নিয়োগী	১০
২৪৮২	,,	নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৯
২৭২৮	,,	শীতলপ্রসাদ মণ্ডল	,,
২৭৬৭	,,	সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	,,
২৮২৫	,,	কুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী	,,
২৮৮৯	,,	বিশ্বেশ্বর গুপ্ত	,,
৩১৪৫	,,	পৃথিনাথ সরঙ্গী	৯
৩১৭৩	,,	অঘোরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	,,
৩৩১৫	,,	রজনীকুমার রায়	,,
৩৩২০	শ্রীযুক্ত	উমাকান্ত শর্ম্মা	,,
৩৪৩৭	বাবু	কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	,,
৩৪৫৬	,,	ষষ্টিচরণ মুখোপাধ্যায়	,,
১৪৮৬	মহারাজা	মণিন্দ্রচন্দ্র নন্দী	১০, ১১অং
৫৫৮	বাবু	বিশ্বনাথ রায়	৯
১৯৩	,,	ব্রজেন্দ্রনাথ রায়	১০
২৩০৩	,,	উমাচরণ হালদার	৯
২৬২৩	,,	অন্নচন্দ্র দত্ত	,,
২৬৭১	,,	গোবিন্দপ্রসাদ দাস	,,
২৭৭০	,,	বিপিনবিহারি গুপ্ত	,,
[illegible]	,,	[illegible] বন্দ্যোপাধ্যায়	,,

৩১১১এ	বাবু	ত্রৈলক্যনাথ মৈত্র	৮, ৯
৩১৪৮	,,	ননীলাল মুখোপাধ্যায়	৯
৩২৮৩	,,	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র	,,
৩৩২২	,,	শ্যামসুন্দর দাস	,,
৮১৭	,,	গৌরহরি চক্রবর্ত্তী	৮, ৯
১৫৩৯	,,	মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়	,,
১৯৮৬	,,	সীতানাথ শিকদার	৯
২২৬৫	,,	তারিণীপ্রসাদ ধর	,,
২৬৪১	,,	রামদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	,,
২৭৭১	,,	রজনীকান্ত ঘোষ	১১
২৮০১	,,	শিবেশ্বর কুণ্ডু	৯
৩০৬৬	,,	রামবন্ধু চট্টোপাধ্যায়	,,
৩৪১৫	,,	মহেন্দ্রনাথ দে	,,
১৩৩৪	,,	কাশীরাম দাস	৮, ৯
২৯২১	,,	নগেন্দ্রনাথ ওরফে সনাতন ঘোষ	৯
৩৫২৬	,,	অধরচন্দ্র দাস	১০
৩৫৬১	,,	বিনয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১০
৪৫০	,,	চণ্ডীপ্রসাদ সান্যাল	৮, ৯
১২৯৫	ডাক্তার	কালীকুমার সেন	৯
১৫০০	বাবু	মহিমাচরণ দাস গুপ্ত	,,
১৫০১	,,	মতিলাল মুখোপাধ্যায়	,,
১৭৫৫	,,	পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়	৮, ৯
২২৭৯	,,	ত্রৈলক্যনাথ ভট্টাচার্য্য	,,
২৭৪১	,,	পতিতপাবন রায়	৯
৩২৫৮	,,	গিরিজাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী	,,
৩৩১৮	,,	মহেশচন্দ্র বসু	৮, ৯
৩৩৬৫	,,	কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	৯
৩৩৭২	,,	উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,,
৩১৩৭	,,	লালমোহন পাকড়াশী	,,
৩৫১০	,,	গোষ্ঠবিহারি সিংহ	,,
১৫৬৪	,,	নন্দলাল চৌধুরী	,,
৩৩৭১	,,	মহেশ্বর দাস তাম্বুলি	,,
৩৩১	,,	বৈদ্যনাথ সেন গুপ্ত	,,
১৩২৩	,,	কৃষ্ণপ্রাণ চকমণটকি	,,
১৯২৩	,,	রঘুনাথ দাস	,,
২৫৫২	চৌধুরী	শ্রীপতিনাথ কর	১১
২৯৮৪	বাবু	কুঞ্জবিহারি কর	৯
[illegible]	,,	[illegible]	[illegible]

১৪০৭	বাবু	ললিতমোহন দে	১০
৩৪০৬	প্রহরাজ	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা	৯
১৫৯৮	রাজা	নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর	”
২৯১৭	বাবু	ননীমাধব মুখোপাধ্যায়	”
৩৪৫১	„	শরৎচন্দ্র পাইক	৮, ৯
৩৩৩০	”	কালীপ্রসন্ন ভদ্র	৯
২১৬০	”	সৌরেশচন্দ্র সেন	”
২৯৬৪	”	নীলকান্ত দে মৌজাদার	”
৩১৮১	„	জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়	১০
২৫১৭	„	শরতচন্দ্র কাব্যতীর্থ	৯
৩৫৬২	„	রাধিকাপ্রসাদ ঘোষ	
		১, ২, ৩, ৪, ৫. ৬, ৭, ৮, ৯, ১০	
২৩৪৭	”	বেণীমাধব চটোপাধ্যায়	১০
২৫৫৩	„	বৈকণ্ঠনাথ মুখোপাধ্যায়	”
৩৫৬১	”	সোণারাম বেড়া	৯
৩৫২৪	”	উমেশচন্দ্র ঘোষ	”
৩০৪৩	”	হিরণ্ময়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	”
৩২৯৪	„	মুকুন্দলাল দেব	”
৩৫৪৯	„	বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ৯, ১০অং	
৩৫৫৯	”	যোগেন্দ্রনাথ বসু	১০
২৮৪৫	„	মণীচরণ মহাপাত্র	৯
৩৫৫৮	„	লাইব্রারিয়ান ছাপরা হিন্দু	
		বএজ অ্যাছোচিএশন্	১০
১২২৭	„	কৈলাশচন্দ্র ঘটক	১১
২৬৭৪	„	হ্মশিকেশ দাস গুপ্ত	১০
৩৩১৯	”	নীলরতন মল্লিক	”
৩৫০৮	„	মনহরলাল দেব	”
৩৫৬৪	„	বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	”
৩২২৯	„	বিমলাচরণ সোম	৯
২৭৯১	”	রতিকান্ত বসু	”
১৪২৮	”	মহেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	”
স্থা ৪	„	অক্ষয়কুমার মিত্র	”
১০৬৬	”	যোগেন্দ্রলাল চৌধুরি	১০
৩৫৫৭	”	কোকারাম পাল	”
১৪৫৮	”	মহিমচন্দ্র সরকার	”
৩২০০	„	বিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৮ ৯
৩৫৬৫	„	মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়	১০
৮৩	”	অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	”
৬৮৪	”	গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	[illegible]

৯৭৯	বাবু	যাদবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১০
১৪৫০	”	মহেশ্বর নাথ	”
২৫০১	”	গৌরহরি বাগ	”
৫৫৬১	”	চন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী	”
৩৫৬৬	”	মাধবচন্দ্র চৌধুরি	”
৩৫৬৮	”	জগৎচন্দ্র কাব্যতীর্থ	”
৩২০৫	”	পার্ব্বতচীরণ দাস	৯
৩২৮১	”	প্রফুল্লনাথ লাহিড়ী	”
৩৩২৫	„	অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১০
৩৫৭০	„	ব্রজেন্দ্রকুমার ঘোষ	”
৩৪৩৯	„	বিপিনবিহারী বসু ১০, ১১অং	
৩১২৯	”	নরেন্দ্র নাথ সরঙ্গী	৯
২৫৬	”	বরদাকান্ত রায়	১০
৩৫৭১	”	প্রকাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	”
৪৪০	”	চন্দ্রনাথ বসু	”
৯৮৫	„	জগদ্বন্ধু ভদ্র	”
৯৯৪	”	জগতচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	”
৩৫০০	”	উমাচরণ ভূঁইয়া	”
২১৭	”	বিনোদবিহারী লাহিড়ী	”
২৬২০	„	বৈকুণ্ঠচন্দ্র গুপ্ত	১০ ১১
৩১৮০	„	পরমানন্দ সাহা	১০
৮৮২	„	হিরেন্দ্রনাথ দত্ত	”
৩৪৯০	„	যাদবচন্দ্র পালিত	”
৩৫৭২		সেক্রেটারি, শান্তিকুটীর সমিতি,	
		বালি	”
৪১৫	বাবু	ভোলানাথ বন্দোপাধ্যায়	”
১০৫৮	„	জগৎচন্দ্র দাস	”
১১২৯	„	যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়	”
১৩৬১	„	কৃষ্ণপ্রসাদ রায়চৌধুরি ৬,৭,৮,৯	
১৬৪২	রাজা	প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়	১০
১৩৯১	বাবু	ললিতমোহন বাগচি	৯
৩৪৭৫	„	পূর্ণচন্দ্র দত্ত	১০
৩৫৭৩	„	সারদানাথ দত্ত	”
১১৩৮	„	চন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	৮ ৯
১৭৯৫	„	রাজেন্দ্রনারায়ণ নন্দী	১০
৩০৫৭	„	সেক্রেটারি, রাজলাইব্রারি,	
		বর্দ্ধমান	”
৫২০৪	„	রাজা জনার্দ্দন সিংহ	”
৪০৩	„	[illegible] চৌধুরি	[illegible]

১৬২৯	বাবু	রায়সাহেব নবকিশোর সেন	১০
১৯৫৮	,,	রাম যাদু রায়	,,
৩১০২	,,	ক্ষীরোদনাথ চট্টোপাধ্যায়	,,
৩১৬০	,,	বিপিনবিহারী নাগ	১০ ১১
৩৫০৯	,,	রামনাথ দাস	১০
৩৫৭৪	,,	বেণীমাধব দত্ত	,,
৩৫৭৫	,,	কালীপদ বিশ্বাস	,,
৩৫৭৬	,,	মহেন্দ্রলাল রায়	১০
৩৫৭৭	,,	রমণীমোহন রায়	,,
৪৬	,,	অম্বিকাচরণ মজুমদার	৯
২৪১৬	,,	হারাণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	১০
৩৫১৩	,,	নীলমাধব চক্রবর্ত্তী	,,
৩২৭	,,	বিনোদবিহারী সিংহ	,,
৯৮৭	,,	যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়	,,
১৩৩৬	,,	কালীকিশোর ভট্টাচার্য্য	,,
৩০৮০	,,	নৃসিংহচন্দ্র দাস	৯
৪৫৭৮	,,	রসময় প্রামাণিক	৯ ১০
৩১৬৪	,,	অক্ষয়কুমার পোদ্দার	৬ ৭
		মূল্য মধ্যে	
১৪৬৬	,,	মাধবচন্দ্র ঘোষ	১০
১৬৫২	জাচুটিস্	প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,,
২০৩৯	বাবু	শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	,,
২৯৫৭	,,	বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়	৯
১১৫৮	,,	কালীপ্রসন্ন রায়	,,
১২১৭	,,	কৈলাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১০
১৪৩৬	,,	মহেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,,
৩৪	,,	অভয়চরণ সমদ্দার	,,
৩২৬	,,	বামনদাস চট্টোপাধ্যায়	,,
২৪৮২	,,	নলিনীচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	১০
		মূল্য মধ্যে	
২৫৫৮	,,	শিবচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	১০
৩৪২৬	,,	আশুতোষ নিয়োগী	,,
৩৪৭২	,,	পান্নালাল সাহা	,,
৩৫৭৯	,,	যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	৯
২৯০	,,	বঙ্কচরণ সরকার	,,
৮২৬	,,	গোবিন্দচন্দ্র দাস	,,
১২৫২	,,	কুঞ্জবিহারী গোস্বামী	,,
১৫৯৮	,,	রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুর	,,
[illegible]	,,	[illegible] মুখোপাধ্যায়	,,

৩৫৬৩	বাবু	শোনারাম বেড়া	১০
১০৫০	,,	জ্যোতিষপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	,,
৩৫৮১	,,	রাজারাম রায়	,,
১১৮৩	,,	কালীপ্রসন্ন আচার্য্য	,,
২৫১৬	রায় বাহাদুর	সংসারচন্দ্র সেন	,,
৩২২৩	বাবু	পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়	,,
১০১৮	,,	যোগেন্দ্রনাথ বসু	,,
৩১২২	,,	ভুবনেশ্বর বন্দোপাধ্যায়	,,
৩১৩৫	,,	এ, পি, কর ক্ষয়ার	৯।১০
৩৪৪০	,,	বিহারিলাল বন্দোপাধ্যায়	১০
৩০	,,	অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	১০
৩৯	,,	অমৃতলাল রায়	,,
৬৯	,,	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	,,
১৮২০	,,	রামজয় বাগচী	,,
২১৯৫	,,	শশধর সরকার	,,
২৭৭৮	,,	বরদাপ্রসাদ বাগছী	,,
২১	,,	অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়	,,
৩২	,,	অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়	,,
৭৭	,,	অনুকূলচন্দ্র শেঠ	৯ ১০
৫২৮	,,	দিননাথ বিশ্বাস	১০
৫৩৬	,,	দেবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়	১০
৫৭৩	,,	দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ	,,
২০৯০	,,	শশীভূষণ শীল	১১
২৫২৪	,,	রসিকলাল পাল	১০
৫২	,,	অন্নদাপ্রসাদ সেন	,,
৫৩	,,	অম্বিকাচরণ সরকার	,,
৩০৫	,,	বঙ্কবিহারী কর্ম্মকার	৯ ১০
৩১০	,,	ব্রজনাথ পালচৌধুরী	১০
৪৫৯	,,	চন্দ্রকুমার গুহ	,,
৪৬৬	,,	চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	,,
৪৭৩	,,	চন্দ্রকান্ত রায়	,,
৪৭৪	,,	চন্দ্রকুমার রায়	,,
৪৯৫	,,	চারুদেব বন্দ্যোপাধ্যায়	,,
৩৫৮২	,,	দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়	,,
৩৫	রায়সাহেব	অন্নদাপ্রসাদ সরকার	,,
৪২	বাবু	আনন্দচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	৯ ১০
৭৯	,,	আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য	১০
১০৩	,,	অক্ষয়গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য	,,
১২০	,,	অম্বিকাদাস রায়	,,

নং		নাম	টাকা
১৫৬	বাবু	আনন্দনাথ মজুমদার	১০
১৭৩	,,	অনন্তনাথ মহালানবিশ	,,
২০৯	,,	বসন্তকুমার মিত্র	,,
২৮৫	,,	বিজয়লাল দত্ত	,,
৪৬৭	,,	চন্দ্রকিশোর রায়	,,
৪৮৪	,,	চিদানন্দ চৌধুরী	,,
৪৯৩	,,	চণ্ডীচরণ চট্টোপাধ্যায়	,,
৩৪২১	,,	বিশ্বেশ্বর সেন	,,
১২১	,,	অভয়চরণ সেন	১০
১৫৫	,,	অভিলাষচন্দ্র বিশ্বাস	,,
১৬৭	,,	অভয়চরণ সান্যাল	,,
৩৩৫	,,	ব্রজসুন্দর সান্যাল	,,
৪৫৩	,,	চারুচন্দ্র ঘোষ	,,
৭১২	,,	জ্ঞানচন্দ্র রায়	,,
১১৯৯	,,	কৈলাসচন্দ্র সেনগুপ্ত	,,
৩৫৫২	,,	নরেশচন্দ্র চৌধুরী	,,
১১৭	,,	আদ্যনাথ ন্যায়ভূষণ	,,
১৮৪	,,	ভবানীচরণ দত্ত	,,
১৯৫	,,	বিহারিলাল মুখোপাধ্যায়	,,
২৮৮	,,	বলাইচাঁদ মল্লিক	,,
২৯৬	,,	বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায়	,,
৩০৪	,,	ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি	,,
৩৫৪	,,	ব্রজগোপাল ঘোষ	,,
৪২১	,,	জয়্‌টিশ্‌ বেনার্জি	,,
৫১৯	,,	দ্বারিকানাথ সরকার	,,
৫২৪	,,	দেবেন্দ্রনাথ বসু	,,
৫৪৩	,,	ধীরকৃষ্ণ সরকার	,,
৬৬৭	,,	গতিনাথ মিত্র	,,
৬৬৯	,,	গোপালচন্দ্র বসু	,,
৬৭১	,,	গতিকৃষ্ণ নিয়োগী	,,
৭৩৬	,,	গোপালচন্দ্র সেন	,,
৭৫২	,,	জ্ঞানেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী	,,
৮০৯	,,	গোবিন্দচাঁদ মাহাজন	,,
৮১৬	,,	গিরিশনারায়ণ শর্ম্মামুনশী	,,
১৭০৬	,,	পূর্ণচন্দ্র সিংহ	,,
১৬৮৮	,,	প্রিয়শঙ্কর ঘোষ	,,
২৮৮৫	,,	শশীভূষণ সেন	,,
২৯০১	,,	জয়চন্দ্র সান্যাল	,,
২৯০০	,,	যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	,,
২৯১৩	বাবু	তারিণীপ্রসাদ রায়	১০
২৯০৭	,,	যদুনাথ বসু	,,
৩৪৬৩	,,	নীলচন্দ্র রায়	১০
৩৪৮১	,,	হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	,,
৩৪৪৪	,,	আর, সি, এণ্ড ছন্‌	,,
১৭৯	,,	বৈকুণ্ঠনাথ রায়	,,
৭৮৭	,,	গজেন্দ্রনারায়ণ দত্ত	,,
৩৬৮	,,	ভাগবতপ্রসাদ মহাপাত্র	,,
৬৮৮	অনারেবল	জষ্টীশ্‌ গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়	,,
৪৩৭	বাবু	বলদেবপ্রসাদ ক্ষয়ার	,,
৫০৯	,,	দেবনারায়ণ দত্ত	,,
২৩৮৮	,,	বিচিত্রকুমার দত্ত	,,
৭৪২	,,	গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,,
১৯১	,,	বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়	,,
৩৬	,,	আশুতোষ চক্রবর্ত্তী	,,
৫০২	,,	দীননাথ ধর	,,
৭৫৭	,,	গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	,,
৪১৮	,,	বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য	,,
৭৩৩	,,	জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	,,
৬৯৩	কবিরাজ	গোপালচন্দ্র সিংহ	,,
৩৩২	বাবু	ব্রজনাথ সান্যাল	,,
২৭৮	,,	বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী	,,
৬৯১	,,	গোপালচন্দ্র সাহা	,,
৫২৯	,,	দুর্গাসুন্দর রায়	,,
৫৫১	,,	চন্দ্রশিখর কর	,,
৬৫	,,	অশ্বিনীকুমার গুহ	,,
৪৯০	,,	চক্রধর বড়ুয়া	,,
৬৭৯	রায়	গুরুচরণ দাস গুপ্ত বাহাদুর	,,
৭৫৮	বাবু	গিরিশচন্দ্র চৌধুরী	,,
২৫৩	,,	ভুবনমোহন ঘোষ	,,
৩১৭	,,	অনারেবল বৈকণ্ঠনাথ সেন	,,
৬৯৯	,,	গগণচন্দ্র রায়	,,
৩৬৭	,,	ভগবানচন্দ্র দাস	,,
২০০	,,	বি, চক্রবর্ত্তী ক্ষয়ার	,,
১৯৯০	,,	শ্রীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	,,
৮২৯	,,	হরিদাস চট্টোপাধ্যায়	,,
৮৪৬	রায়	হরিমোহন সান্যাল সাহেব	[illegible]

৯৫ বাবু আশুতোষ সরকার ১৩১০
৩৪৬৭ কবিরাজ বিপিনবিহারী দে „
৬৬৭ বাবু গগনচন্দ্র বিশ্বাস „
১৬৯১ „ প্রাণকৃষ্ণ সরকার „
১৯৯৮ „ শশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় „
৫৪৭১ „ চিত্তসুখ সান্যাল „
১১৬ „ অভয়নাথ চক্রবর্ত্তী „
৫৭১ „ দ্বারিকানাথ সিংহরায় „
৭৬৬ „ গঙ্গাচরণ সেন „
৬৭০ „ বোধীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য „
৬৯১ „ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ „
৩৩৮ „ ভুবনরাম দাস „
৫১ „ অক্ষয়নারায়ণ দাস „
১৬৪৬ „ পুলিনবিহারী রায় „
২৫৭ „ ভুবনমোহন সান্যাল ১৩০৯।১০
৮০০ „ গোপালচন্দ্র দাস ১৩১০
১৭১১ পণ্ডিত প্রমথনাথ কাব্যরত্ন „
৩৪৫২ বাবু দ্বিজপদ রায় „
৮৬৮ „ হরেন্দ্ররূপ গোস্বামী „
৮৫২ „ হরেন্দ্রনারায়ণ রায় „
১৪২৪ „ মহেন্দ্রনাথ দাস „
১৬৯২ „ প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় „
৩৪৬৮ রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু „
৩২৩৮ বাবু রসবিলাস নন্দী „
৬৮৯ „ গিরিশচন্দ্র মণ্ডল „
৩৪৮৩ কুমার শিবেন্দ্র দেব „
৫৭ বাবু অভয়াচরণ চক্রবর্ত্তী „
৩৫৮৪ „ অক্ষয়চন্দ্র কুণ্ডু „
৮৭০ „ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় „
৩৩০১ „ হরিজীবন দত্ত „
১৭৪৮ „ পার্ব্বতিচরণ দাস „
২৯৯৯ „ সন্তোষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় „
১৬৯৭ „ প্রাণকৃষ্ণ দত্ত „
৩৪৭৩ „ অবিনাশচন্দ্র মিত্র „
৫৪৫ „ দেবেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ „
১৬৭০ „ প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরি „
৪৩৮ „ ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় „

২০১ বাবু ভবতারণ মল্লিক ১৩১০
১৫৪২ „ নন্দকুমার বসু „
১৪১৩ „ মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় „
১৬৬১ „ পূর্ণচন্দ্র বসু „
৬৬৬ „ গতিনাথ সরকার „
১৮০ „ বিপিনবিহারী সেন „
১৪৮৩ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার এম্ ডি. „
২০৮৫ বাবু শ্যামাপদ চৌধুরি „
২৫৩৪ „ মহেন্দ্রলাল মিত্র „
২৯২৯ „ ভগবতীচরণ ঘোষ „
৫৯৯ „ দুর্গাদাস মল্লিক „
৭৬৩ „ গৌরচন্দ্র বড়ুয়া „
৩১৬৭ „ শ্রীনারায়ণ রায় „
৬৯৮ „ গঙ্গাগোবিন্দ নন্দী „
২০৬ „ বৈকুণ্ঠচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় „
২৫০ „ বিশ্বেশ্বর বিশ্বাস „
২৬৮১ „ শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী „
৩৪৩১ „ নৃসিংহদাস চট্টোপাধ্যায় „
৯৩৭ „ হরিনাথ রায় „
২০৬৯ „ শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় „
৩১২১ „ গোপালচন্দ্র লাহিড়ী „
৩৩০২ „ কীর্ত্তিচন্দ্র রায় সেক্রেটারি শান্তিপুর মিউনিশিপালিটী „
৩১২০ „ রাজেন্দ্রনারায়ণ সাহা „
১১১৩ „ জানকীনাথ সাহা „
১৪২৭ „ মহিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় „
২২৯৬ „ উমেশচন্দ্র ঘোষ „
৩৫০৪ „ হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় „
৩৩৩৬ „ কৃষ্ণধন রায় চৌধুরি „
৩১২৭ „ গোবিন্দলাল দত্ত সেক্রেটারি সাবিত্রীলাইব্রারি, কলিকাতা „
৩৫৪৭ ডাক্তার কালীকুমার সেন „
৮৯৩ বাবু হরিশঙ্কর ভট্টাচার্য্য „
৮৯৭ „ হরিশ্চন্দ্র মজুমদার „
১০৮৭ „ জয়নারায়ণ চৌধুরি „
৩০১৪ „ হরিচরণ সেন „

৩১৭৭	বাবু মহেন্দ্রনাথ মাইতি	১৩১০
৩৪৭	ডাক্তার ভুবনেশ্বর মিত্র	"
৩১১৫	বাবু ত্রৈলোক্যনাথ নন্দী	"
৩১১৬	" বিপিনবিহারী সাহা	"
৩৮৭	" বিপিনবিহারী ঘোষ	"
৯০৫	" রামনাথ দাস	"
৮৯৪	" হেমচন্দ্র ঘোষ	"
৮৫৪	" রমাকান্ত চৌধুরী	"
১৫৬৮	" নলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	"
১০৪৪	অনারেবল্ মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর	"
৩১৬৬	বাবু রজনীকান্ত বসু	"
২৭৬৩	" হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	"
১০৩০	" যজ্ঞেশ্বর রায়	"
২৯০৬	" কালীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	"
৯৯৬	" জয়গোপাল মুখোপাধ্যায়	"
৩২৪১	" ভবানীনাথ চক্রবর্ত্তী	"
৫৭৪	" ধর্ম্মদাস পালিত	"
৩২৬২	" শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর	"
২০৬৭	" সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	"
৩২৫১	" শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর	"
৩২৫৬	" কালিদাস দাস	"
৮৩৪	" যাদবনাথ মজুমদার	"
২৫২৩	" মন্মথনাথ রায়	"
২১৫	" ভুবনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	"
৯৫১	" হরমোহন গুপ্ত	"
৩৪৫৯	" অবিনাশচন্দ্র সরকার	"
২৫৫৫	" অবিনাশচন্দ্র বালিয়াল	১৩০৯।১০
৪০৮	কবিরাজ বামনদাস গুপ্ত	"
১৯৯	বাবু বরদাদাস গুপ্ত	"
১৮৮৮	" শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা রণজিৎ সিংহ	১৩১০
৯১৮	" হরিবল্লভ রায়	১৩০৯
২৯১১	" দীননাথ গোস্বামী	"
৫৩১	" দেবেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরি	১৩০৯।১০
২৯৯৫	পণ্ডিত শশিভূষণ তর্কালঙ্কার	
২৫২১	বাবু গুরুদাস সান্যাল	১৩০৯
৪০৬	" বি, এন্ দাস কুমার	১৩১০
৫১২	" দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	"
১৯২৬	" রাজেন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	"
২০২৪	অনারেবল জষ্টিস সারদাচরণ মিত্র	"
৩৪৮৬	পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র তত্ত্বনিধি	"
৩০২	বাবু বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	"
২৭৮৬	" উপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক	"
২২৪৫	" তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	"
৩০২৯	" যোগেন্দ্রনাথ সিংহ	"
১৪৮৮	" মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	"
৯৪৯	" হরদয়াল নাগ	"
২১১০	" শ্রীনাথ দাস	"
৩১৮৫	" কালীপ্রসন্ন সিংহ	"
৩০০৯	" মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	"
২১৩৭	কবিরাজ শ্রীচরণ রায়	"
২৯১৬	বাবু রামদাস চক্রবর্ত্তী	"
১০৬৩	" যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	"
১৫৮৯	" ললিতকিশোর মিত্র	"
২৬১১	" নগেন্দ্রনাথ রায়	"
৮০২	মুনশী গোরক্ষ নাথ	"
২৬৭	বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র দত্ত	"
১৭৭৬	ডাক্তার প্রাণদাস মল্লিক	"
২৭৯৪	বাবু ভামিনীরঞ্জন সেন	"
৩০৭৫	" আশুতোষ সেন	"
৭৯০	" গণপতি দাস	"
২৩১৯	শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা উদ্ধবচন্দ্র দত্ত বাহাদুর	"
৩১৪২	বাবু অন্নদাচরণ রায়	"
২৪৩২	" গঙ্গাপ্রসন্ন গুহ	"
৩১২৩	" জ্ঞানদাগোবিন্দ চৌধুরি	"
৩৩০৪	" জুটবিহারী গোস্বামী	"
৩১৪৩	" ভৈরবপ্রসাদ	"
৮৬২	" হরিলাল চট্টোপাধ্যায়	"
১৪৮৯	" মোক্ষদাদাস মিত্র	"
১৩৮৫	" ললিতকুমার সেন	"
১১৪৫	" [illegible]	

৭৮২ বাবু গুরুদাস ভট্টাচার্য্য ১৩১০
১৪৭৫ ,, মহেন্দ্রচন্দ্র দেব ,,
২০৯৬ সেক্রেটারি, বার লাইব্রেরি-ব্রাহ্মণবাড়িয়া ,,
১৫৭০ বাবু ব্রজকমল রায় ,,
২৩৭৪ মহারাজ-কুমার নবদ্বীপচন্দ্র দেব শর্ম্মা বাহাদুর ,,
১৬৫৫ বাবু প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় ,,
১৯৯৪ ,, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
২৪১০ ,, তারকনাথ দত্ত, সেক্রেটারি ডি, বোর্ড, সারন ,,
৮৫৩ ,, হরচন্দ্র রায় ,,
৩৪৬০ ,, নৃসিংহচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
১০১৪ কুমার জগদিন্দ্র দেব ,,
১৬৭৫ বাবু পরেশনাথ বিশ্বাস ,,
১৫৩৩ ,, মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
১৪৮৯ ,, মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
৩২৫৮ ,, গিরিজাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ,,
৩৭৪ ,, বঙ্কবিহারী সরকার ,,
৬১১ ,, ফণিচন্দ্র চৌধুরি ,,
২০৮৯ ,, সত্যজীবন লাহিড়ী ,,
৮৫৮ ,, হরেন্দ্রনারায়ণ রায় ,,
১৬৫৬ ,, পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় ,,
১৫৩৭ ,, মহেন্দ্রনাথ বসু ,,
৩২৩ ,, বরদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ,,
২৪৮৮ ,, রসিকলাল সেন ,,
১০৩২ ,, যদুপতি চট্টোপাধ্যায় ,,
৩৪৬২ ,, অন্নদাশঙ্কর দাসগুপ্ত ,,
১৩৫৫৩ " কৃষ্ণসুন্দর সেন গুপ্ত ,,
১০৩৩ " জগদ্দুর্লভ মজুমদার ,,
৯৯৭ রায় যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বাহাদুর ,,
২৯৩৯ বাবু চন্দ্রকুমার মজুমদার ,,
২৯৯২ ,, হরসুন্দর মজুমদার ,,
২৯৩৬ ,, চন্দ্রকমল গুপ্ত ,,
২৬৯৪ ,, খগেন্দ্রনারায়ণ দাস ,,
২৭৭৩ ,, গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ,,
২৭৮২ ,, ভবানীপ্রসাদ লাহিড়ী ,,
২৯৭ ,, আশুতোষ মল্লিক (unclear) ,,

৩২৬৮ বাবু যদুনাথ ঘোষ ১৩১০
৩২৪৮ ,, গোবিন্দচন্দ্র সেন ,,
২৮৯৭ ,, আশুতোষ ভট্টাচার্য্য ,,
৩৩৫৭ ,, ভগবতীচরণ ঘোষ ,,
২৬৯১ ,, চন্দ্রহরি পাল ,,
২১৯১ ,, শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
২০৫৮ এস্, এন্ চৌধুরী স্কয়ার ,,
১২৮৩ বাবু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ,,
৩০৯১ ,, শ্রীকুমার চৌধুরী ,,
৩৪০৩ সেক্রেটারি, ভিক্টোরিয়া পাবলিক লাইব্রেরি, নাটোর ,,
২৪৭৫ বাবু মণিমোহন সেন ,,
২১০৪ ,, শরচ্চন্দ্র সেন গুপ্ত ,,
১১১৩ ,, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য ,,
৮৯৩ ,, হেমচন্দ্র সেন ,,
২২২০ ,, যদুনাথ দাস ,,
১৫৩১ ,, মতিলাল কর ,,
১৩৭৭ ,, ললিতমোহন সেন ,,
১৩৬১ ,, নিহারচন্দ্র মিত্র ,,
৯৪৮ ,, হরিচরণ চট্টোপাধ্যায় ,,
২২৩ ,, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ,,
১৭৬৫ ,, পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ ,,
৩৩৫০ ,, করালীপ্রসাদ তোপদার ,,
২৯৮৯ ,, যাদবচন্দ্র কলাপাত্র ,,
৪৯৯ " চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য ,,
২২৯৫ ,, উমাচরণ উপাধ্যায় ,,
২৬৩৭ ,, উমেশচন্দ্র রায় ,,
২২৮৬ ,, ত্রৈলোক্যনাথ হালদার ,,
৯১২৪ ,, শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ ,,
১৪৭৬ ,, মদনমোহন গুহ ,,
২২৫২ ,, ত্রৈলোক্যনাথ দাস ,,
২৫২২ ,, মণীন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায় ,,
১৫৬৩ ,, নীলকণ্ঠ দাস ,,
৩৯৫৯ ,, শ্রীধর মুখোপাধ্যায় ,,
৪০৬৮ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা বর্দ্ধমান ,,
১৭৭ বাবু বিপিনবিহারী বসু ,,
২২৯৮ ,, উগ্রকণ্ঠ রায় ,,
২০১৪ [illegible] ,,

৩৪১৭	বাবু	নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১৩১০
৩০৪৮	,,	বনমালী ঘোষ	১৩০৯. ১০
৩৭৪	,,	বংশীধর দাস	,,
৩৫০৬	সেক্রেটারি, বর্দ্ধমান-লাইব্রেরি	হুগলী	১৩১০
১৭৬১	বাবু	প্রভাসচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	,,
১৫৬২	,,	নিত্যগোপাল চট্টোপাধ্যায়	,,
২৫৬২	,,	নবীনচন্দ্র চৌধুরী	,,
২০৯৮	,,	শিবচন্দ্র ভাদুড়ী	,,
১৩৭২	,,	কালীপদ মুখোপাধ্যায়	,,
৩ ৯৬	,,	বিপিনবিহারী ঘোষাল	,,
১২৮৪	,,	কুলদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	,,
৩৩৯১	,,	ভূতনাথ বিশ্বাস	,,
৩০৯১	,,	রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	,,
১২২৪	,,	কালীপ্রসন্ন রায়	,,
২২৭৫	,,	তারকনাথ বাগচী	,,
৯৮২	,,	যদুনাথ বিশ্বাস	,,
৩২৮২	,,	শীতলচন্দ্র চৌধুরী	,,
২০৯২	,,	শ্যামলাল দত্ত	,,
১৮০৯	পণ্ডিত	রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	,,
১৪১৪	বাবু	মতিলাল মুখোপাধ্যায়	,,
৩৪৯৪	,,	গিরিজাকুমার ঘোষ	,,
২৮৪৪	,,	প্রসন্নকুমার মিত্র	,,
২৪২৭	,,	আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	,,
১৬৩৬	,,	নীলমণি চৌধুরী	,,
৩৫৪০	,,	যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়	,,
৩০৩৪	,,	নিশিকান্ত সেন	,,
২৬৭০	,,	পূর্ণচন্দ্র রায়	,,
৮০২	,,	গণেশরাম আগরওয়ালা	,,
৭৮৩	,,	ঘনশ্যাম বড়ুয়া	,,
১১৫৪	,,	ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	,,
১৭৮৯	,,	রামলাল দাস	,,
১৫৭১	,,	কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য	,,
২৮২৭	,,	যাদবানন্দ চক্রবর্ত্তী	,,
১৫৮৪	,,	ননীলাল মুখোপাধ্যায়	,,
৩৪৯৭	,,	দ্বারকানাথ চৌধুরী	,,
৩৩৫৫	,,	গিরীশচন্দ্র দাঁ হড়া	,,
৩৭৪	,,	ইন্দ্রনারায়ণ রায়	,,
১৪৮৩	বাবু	নিতাইচাঁদ বরাট	১৩১০
৩১৫৯	,,	বঙ্কিমবিহারী কোয়ার	,,
২৮৫৩	,,	প্রমোদারঞ্জন বক্সী	,,
২৮৪৭	,,	সতীশচন্দ্র মুস্তফী	,,
২৮৫০	রায়	কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর	,,
২৮৫১	বাবু	রাজকৃষ্ণ রায়	,,
৯৬২	,,	ইন্দ্রনারায়ণ ঘোষ	,,
৩২০৭	,,	জগৎমোহন ঘোষ	,,
১৫৭১	,,	নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	,,
১৭২২	,,	প্রসন্নচন্দ্র রায়	,,
২৪০৭	,,	সত্যকৃষ্ণ সেন	,,
৯১২	,,	হরিচরণ রায়	,,
২২১১	,,	শশিভূষণ মজুমদার	,,
২৫৫৭	,,	চন্দ্রকান্ত দাস	,,
২০৫২	,,	নারায়ণচন্দ্র ঘোষ	,,
১৭০৭	,,	পটকেশ্বর মুখোপাধ্যায়	,,
১৩৬৮	,,	কেদারনাথ চক্রবর্ত্তী	,,
২২৩৪	,,	শশিভূষণ সরকার	,,
৩৩৪০	,,	বসন্তকুমার দত্ত	,,
১২৪৭	,,	কার্ত্তিকচন্দ্র রায় চৌধুরী	,,
১৪৯৫	,,	মন্মথনারায়ণ দাস	,,
২১৫৫	,,	সোনারাম দাস	,,
১৩০১	,,	কালীপ্রসন্ন চৌধুরী	,,
১১৫৩	,,	কালীপদ হাজরা	,,
১৯২৩	,,	রঘুনাথ দাস	১০
৯৭১	,,	ঈশানচন্দ্র সিংহ	,,
৯৬০	,,	ঈশানচন্দ্র বেড়া	,,
২৭৫১	,,	শ্রীশচন্দ্র তেওয়ারি	,,
৩১২৫	,,	অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	,,
৩৪১৫		ভুদকুমার আদক সুমাদার	,,
২৬৫৯	বাবু	তুর্গারাম বসু	,,
২৬৬০	,,	কুলচন্দ্র রায়	,,
২৬ ০	,,	শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	,,
১১৭৭	,,	কালীচরণ সেন	,,
৩৫০২	,,	রামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	,,
২১০৯	,,	শীতলচন্দ্র ধর	,,
৩৩৯৫	,,	আশুতোষ গোস্বামি	,,
২৫৬৭	,,	[illegible] রায়	

নং	নাম	টাকা
৩৪৪৯	বাবু বিপিনবিহারি তালুকদার	১০
১১০৫	,, কেদারনাথ চৌধুরী	,,
৯২১	,, হরেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী	,,
১১১২	,, যোগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	,,
৩০৭৪	,, পূর্ণচন্দ্র দোবে	,,
১১৭১	,, কেশবানন্দ পরিব্রাজক	,,
২৬৩৯	,, খগেন্দ্র সিংহ	,,
২৮৫১	,, প্রিয়নাথ দত্ত	,,
১১৫৭	,, কেদারনাথ মজুমদার	,,
৩৪০৬	সেক্রেটারি, হরিনামমন্দির শাহাগঞ্জ, এলাহাবাদ	,,
৭৭৫	বাবু গগণচন্দ্র সেন	,,
২৪০০	ঠাকুর গোপীকৃষ্ণ দেব	,,
১৬৫৪	বাবু নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	,,
১৯৮১	,, রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	,,
২৪১৩	,, দেবেন্দ্রনাথ দত্ত	,,
২৩০৯	মহারাণা রাধাকিশোর দেব বর্ম্মা বাহাদুর	,,
২৬৫৬	বাবু কিশোরিমোহন বক্সী	,,
৩৫৭২	,, শ্যামকিশোর বসু	,,
১৫৭৫	,, মথুরচন্দ্র মজুমদার	,,
৩৫৫১	কুমার সচ্চিদানন্দ তীর্থস্বামী	,,
৩৪৮৫	বাবু হরিমোহন দত্ত	,,
৩২০০	,, বিহারিলাল বন্দোপাধ্যায়	,,
৭৩২	,, গুরুদাস দাস	,,
২৮৩৮	,, উপেন্দ্রনাথ বসু	,,
১৭২৭	,, পরেশনাথ দাস	,,
২৭৬৫	,, যতীন্দ্রনাথ খাঁ	,,
৩২০৫	,, প্যারীচরণ দাস	,,
৩০২৮	,, নীলাম্বরচন্দ্র গুই	,,
৩৬০	,, বৈকুণ্ঠনাথ মহাপাত্র	,,
৩১৯০	,, রাজেন্দ্রনাথ বাগ	,,
১৫২০	,, মহেশ্বর সিংহ দেব	,,
৯১৩	,, হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়	,,
১২৭১	,, কৃষ্ণচরণ আচার্য্য	,,
১৩৬১	,, রাজেন্দ্রলাল শর্ম্মা	,,
১৬১৫	,, রাজকুমার সেন	,,
১২২৯	,, কৃষ্ণনাথ ধর	,,
২০৫৬	মহারাজা সূর্য্যকুমার আচার্য্য চৌধুরী	,,

নং	নাম	টাকা
২৬০৭	বাবু উমেশচন্দ্র মৈত্র	
৮৭৯	,, হরনাথ শাস্ত্রী	
১০১৬	,, জ্যোতিষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৯,
১৮০১	,, দয়ারাম ঘোষ	
৩২৯২	,, বিধুভূষণ বন্দোপাধ্যায়	
৩৫৭৪	,, শরৎচন্দ্র দাস	
৯২০	,, রামনাথ মুখোপাধ্যায়, [illegible]	৯,
৩১৩৪	,, হিমপ্রসন্ন সেন	
৩০৭৭	,, হরিচরণ দত্ত	
৩৫৮৫	,, চণ্ডীচরণ মিত্র	
৩৪৯৮	,, অতুলচন্দ্র দত্ত	
১০৬	,, রামমোহন চৌধুরী	
১০২৫	,, শ্যামাপ্রসাদ গাইন	
৭৯৮	,, রাধামোহন নাগ	
১৫৩৮	,, মোক্ষদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৯,
১০৮৩	,, যোগেন্দ্রনাথ বাগচি	
১৮৩৮	,, রাজেন্দ্রকুমার বটব্যাল	
২৫৬০	,, হেমচন্দ্র ঘোষাল	
৩৭৯	,, বংশীলাল দে	
১৪৯৩	,, মাখনলাল ঘোষ	
২০৫৪	,, তারকেশ্বর সরকার	
১৩৫৬	,, কেদারনাথ বাগচি	
১৪১৫	,, মতিলাল ভট্টাচার্য্য	
১১১৮	,, কালীচরণ সেন	
৩৩৩৮	,, গগণচন্দ্র তর্কানন্দ ভট্টাচার্য্য	
৩৫০৭	,, উমানাথ মদক	
১১০১	,, কালীশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়	
২৭৭২	,, প্রিয়নাথ মিত্র	
২৭১৪	,, কুঞ্জপ্রসাদ জানা	
২৭৯	,, ইন্দ্রনারায়ণ মাইতি	
৩৯১	,, বামনচন্দ্র ভৌমিক	
১৭৬৩	,, প্রাণকৃষ্ণ ডাক্তার	
১০৭৬	,, রামধন মুখোপাধ্যায়	
৪২৪	,, ব্রজলাল চক্রবর্ত্তী	
১১৭০	,, কালীপদ বসু	
২৬৬৬	,, প্রতাপচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	
১১৮৪	,, কিশোরিমোহন চৌধুরী	
২০৯৮	,, [illegible]	

সংখ্যা	নাম	
১২৮২	বাবু গোকুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১০
১০৭৭	” জয়গোপাল বন্দোপাধ্যায়	”
১৫৬৭	” নন্দলাল দাস	”
১৯৯৫	” সূর্য্য কুমার গঙ্গোপাধ্যায়	”
৩৫০৫	” শ্যামাচরণ দে	”
২০৩৫	” সুরেন্দ্রনাথ দত্ত	”
১৮৩০	” রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ	”
৩৩৯৭	” বরদাগোবিন্দ সেন গুপ্ত	”
৮৭১	” হরিদাস বন্দোপাধ্যায়	”
৩০৩০	মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর	”
২০৮৮	বাবু সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়	”
৯৫১	” হরিকিশোর রায়	”
১০৮১	” যোগেন্দ্রকুমার চক্রবর্ত্তী	”
২৯৫৪	” নীলকান্ত দে মৌজাদার	”
৩৪৩৬	” অভয়চরণ হালদার	”
২০২০	” সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী	”
৩১৯৪	” হেমচন্দ্র মিত্র	”
২৫৭৬	” মহিমচন্দ্র বসু	”
১৫৪৫	” নবীনচন্দ্র বিশ্বাস	”
১৬৭৬	” প্রসন্নকুমার ঘোষ	”
৩৪০১	” শিবকিশোর বিশ্বাস	”
৩৩০৭	” পার্ব্বতীচরণ রায়	”
২৪৫৭	” বিপিনবিহারি মিত্র	”
২৮৭৮	” ক্ষেত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়	”
৩০৮৭	” রাজনারায়ণ বসু	”
২৬৬৮	” কামদাচরণ দাস	”
৩৫৪৪	” শশীভূষণ মিত্র	”
২৪৯২	” শ্রীনাথ শিরোমণী	”
২০৪১	” শিবনাথ ভট্টাচার্য্য	”
৬৬৯	” হারানচন্দ্র বিশ্বাস	”
১৫০৭	” মতিলাল দাস	”
২১০	” বেনোয়ারিলাল বসু	”
২৭৬১	” নিত্যগোপাল মিত্র	”
২৮৫৪	” তারিণী চরণ চক্রবর্ত্তী	”
২৮৬০	” শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী	”
৩১৭৯	” রামগোপাল চক্রবর্ত্তী	”
৩২৬৬	” মোহিনীকান্ত সরকার	”
৩০৪৬	” অক্ষয়কুমার দাস	”
৩৩৬১	সরস্বতানন্দ সরস্বতী পরিব্রাজক	১০
১২২৯	বাবু কামাক্ষানাথ ভট্টাচার্য্য	”
১৮৪৬	” রামগোপাল মুখোপাধ্যায়	”
১৮৯৫	” রামহরি সেন	”
২৫৭৭	” হরিপ্রসাদ দাসগুপ্ত	”
১৩৩৮	” কুলদাপ্রসাদ মজুমদার	”
১০৬৪	” জানকীনাথ পাণ্ডে	”
৩০০২	” শ্রীশচন্দ্র ভাদুড়ী	”
৬৮৫	” গুরুপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী	”
৩৪১৯	” রমনীমোহন দত্ত	”
৬৬	” অমৃতলাল চট্টোপাধ্যায়	”
৫৩১৮	” মহেশচন্দ্র বসু	”
১৮১২	” রেবতীমোহন দাস	”
৩০৮৩	কবিরাজ রাজেন্দ্রকুমার গুপ্ত	”
১৮১৩	বাবু রামগোপাল বক্সী	”
৩০৫৪	” রজনীকান্ত রুদ্র	”
২৫৭৬	” ক্ষেত্রমোহন ভক্ত	”
৩১৪৭	” তুলসী দত্ত	”
৩২৭১	” কেশবচন্দ্র দাস	১০
১১৬০	” কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়	”
৩০৮৫	” ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী	”
৩০৭১	” গোষ্ঠবিহারি মিত্র	”
১৬২৩	” নিবারণচন্দ্র দে	”
১২০৮	” কৃষ্ণানন্দ বন্দোপাধ্যায়	”
১২৬৭	” কুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	”
২৬০৮	” বসন্তকুমার সরকার	”
৩৫৩৯	” নারায়ণচন্দ্র মিশ্র	”
২৫২৯	” বিষ্ণুপদ বসু	”
১০৫১	” জ্যোতির্ম্ময় চট্টোপাধ্যায়	৯, ১০
৩০৮১	” বৈদ্যনাথ সান্যাল	”
২১২০	” উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	”
৩৫৮৬	” নবকিশোর কর	১০
৩৫৮৩	” ক্ষীরোদকুমার মুখোপাধ্যায়	”
৭২৪	শ্রীশ্রীগরমুড়িয়া ছত্রাধিকারী	”
২০৪৯	বাবু শ্রীনাথ করণজাই	”
৯৯১	” যদুনাথ মুনসী	”
২৩৬৪	” জ্ঞানেন্দ্রমোহন রায়	”
১১৯২	” কালীনাথ রায়	”

গ্রাহকগণ !
বর্ত্তমান বর্ষের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

পত্র লিখিতে, টাকা পাঠাইতে বা ঠিকানা-বদল জানাইতে, গ্রাহকগণ অবশ্য অবশ্য স্বীয় স্বীয় গ্রাহক-নম্বর দিবেন।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

যশোহর।
হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে
শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২৫।

[illegible]

শাণ্ডিল্য-সূত্র।

বা

ভক্তি-মীমাংসা।

ভক্ত-সাধক সমাজের হৃদয়ের ধন শাণ্ডিল্য-ঋষির শতসংখ্যক ভক্তিসূত্র, হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল্ মহাশয় কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত, এবং মূল সংস্কৃত সূত্র ও প্রয়োজনীয় টীকা-টীপ্পনীরসহ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া সুলভ মূল্যে (কাপড়ে বাধাই ১৷৷০ টাকা ও কাগজে বাধাই ১৲ টাকা মূল্যে) যশোহর হিন্দু-পত্রিকা-কার্য্যালয়ে আমার নিকট বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

Probudha Bharata Almora, বলেন :—

"The Sandilya Sutra is a very ancient work on Bhakti : both philosophy and practice. Mr. Mozoomdar, has translated it beautifully, giving a runing commentary, mostly drawn from Svapneswar, the commentator of Sandilya and explaning difficult passages and references in footnotes. The book is dedicated to Swami Vivekananda and opens with an able and learned introductoin by the translator. It is prettily got up.

Luzac's Oriental Series London বলেন :—

Mr. Jadunath Mozoomdar has translated from the Sanskrit Hundred Aphorisms of Sandilya or Religion of Love. Until recently this side of Indian religious thought has been greatly overlooked, but the publication and translation of the Narada and Sandilya Sutra have lately thrown a flood of light on Bhakti-Marga or the phath of Love. When the Maya or Avidya has been removed from the eyes of Paramahansa, he becomes a Bhakta, odevoted lover of Deity. The difference between Sandilya and Narad is between the monist and the dualist. Whilst the ecstatic devotion of the Dvaitavadi is for Saguna Isvara, that of the Advaitavadi is for Nirguna Brahman. Whether we can always agree with the commentary or not. Mr. Mozoomdar deserves our best thanks for this interesting contribution to the literature of divine love.

The Indian Mirror says:—

The book makes an important addition to the religious publications of the day.

The Tribune says:—

" * * Babu Jadunath has been devoting much of his time and thought to the popular exposition of abstruse Sanskrit works and his facile pen and cultured understanding cast a peculiar glow on all his writing in the department of religious and phiiosophical enquiry" * *

Journal of M. B. S. * * "the book is an interesting study through-

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১০ম বর্ষ, ১০ম খণ্ড, ৯ম সংখ্যা। | পৌষ। | ১৩১০ সাল, ১৮২৫ শকাব্দা।

জাতি-ভেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

ব্রাহ্মণগণ এখন পঞ্চগৌড়ীয়, পঞ্চ-দ্রাবিড়ীয়, কান্যকুব্জীয়, গৌড়ীয়, উৎকলীয়, মৈথিলী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। এ সমস্ত বিভাগের মূলে ভৌগলিক বিভাগই দৃষ্ট হয়। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা আবার নানাবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া গেলেন। কেহ বারেন্দ্র, কেহ রাঢ়ী, কেহ বৈদিক। আবার ইহার ভিতরেও বিভাগ আছে। কেহ বা কুলীন, কেহ বা শ্রোত্রীয়, কেহ বা কাপ প্রভৃতি। কুলীনের ভিতরেও আবার অনেক অন্তর্বিভাগ দৃষ্ট হয়। কেবল বঙ্গদেশে নহে, ভারতের প্রায় সকল স্থলেই এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ ছিল না।*

ক্ষত্রিয়দিগের অবস্থাও স্বতন্ত্র নহে। পূর্ব্বে একমাত্র ক্ষত্রিয়—তাহার পর চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়ের নামই শুনিতে পাওয়া যায়। অধুনা সেই ক্ষত্রিয় জাতি ৫৯০ বিভাগে বিভক্ত। টড্ সাহেব তাঁহার রাজস্থানে ইহার বিশদ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন।*

রায় বাহাদুর লালা বৈজনাথ বলিয়াছেন—

"Out of about 1 crore 21 laks of persons belonging to the trader caste, 31,86,666 returned themselves as Banias or Mahajans, 89,226 as Vaisyas, 3,54,177 as Agarwalas, 1,57,716 as Oswalus, 20,899 as Shirnalis, the rest comprised among others Agralvaris, Kasundhans, Kamdus, of N. W. P;

* প্রাচীন এবং আধুনিক অভিধান সমূহ দেখিলেই জাতিবিভাগবৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে।

* Todds Rajasthan, vol 1. pp 596-97.

Gandhabaniks, Suwarnabaniks, of Bengal ; Aroras and Khattris of the Panjab ; Bhatias of Bombay, and Chettis of Madras."*

কায়স্থদিগের মধ্যেও দ্বাদশ প্রকার বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

"They are divided into (1) the Mathuras, (2) the Saksenas, (3) the Srivastavas, (4) the Bhatnagaras, (5) the Asthanas, (6) the Nigams, (7) the Ambashtas, (8) the Gours, (9) the Surajdwhajas, (10) the Karanas, (11) the Sreshtas and (12) the Valmikis. None of these intermarry or interdine."*

এইখানেই জাতিভেদের শেষ নহে। ইহা ভিন্ন আরও অসংখ্য প্রকার শ্রেণী ও বিভাগ দৃষ্ট হয়। এমন কি, "চামার" এবং মুচির ভিতরেও প্রভেদ বর্ত্তমান আছে।

"A chamar, who makes shoes, belongs to a different caste from "*Plochi* who makes harness. A Bhangi who is a sweeper claims to be a member of a different order from a sweeper whose patron saint is Lal-Beg."†

এইরূপে তুলনা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, বর্ত্তমান জাতিভেদ এবং পূর্ব্বকালের জাতিভেদ, এতদুভয় ঠিক এক রকম নহে—পরন্তু নানা বিষয়ে স্বতন্ত্র। উভয়কে এক স্থানে রাখিলে, বর্ত্তমান জাতিভেদকে পূর্ব্ববর্ত্তী জাতিভেদের অপত্য বলিয়া চিনিয়া উঠা দুষ্কর। বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রাচীন জাতিভেদের মৃত দেহ মাত্র।

এই স্থলে একটী কথা স্মরণ হইল। জেমস্ মিল প্রভৃতি কতকগুলি পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে, ভারতে কর্ম্মবিভাগ (division of labour) করিবার জন্যই স্মৃতিকারকগণ জাতিভেদের এত কঠিন অনুশাসন সমূহ বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। তাহা হইলে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণে মনুষ্য-সম্প্রদায় বিভক্ত না হইয়া, অগ্রে সামাজিক কর্ম্মের হিসাবে তাহারা বিভক্ত হইত। আমরা হয়ত, কর্ম্মকার, সূত্রধর প্রভৃতির নামোল্লেখই সর্ব্বাগ্রে দেখিতে পাইতাম। মনুসংহিতায় শুধু যে কার্পাস বস্ত্রের কথাই লিখিত আছে, তাহা নহে, অনেক মূল্যবান বসন-ভূষণেরও নামোল্লেখ আছে। কিন্তু তাহাতে কি? শুধু মনুসংহিতায় কেন,—ভারতের সেই আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদের অনেক ঋকে নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বহুমূল্য প্রস্তর ও হীরকাদি যেরূপ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, তখনও ঐ সকল সামগ্রীর বহুল প্রচলন ছিল; কিন্তু ঋগ্বেদের সময়ে, তাহার পর অনেক দিন পর্য্যন্তও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি চারি বর্ণ ভিন্ন পঞ্চম বর্ণের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না।

কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যেমন জাতিভেদের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তেমনি

* 'Tusion of sub castes in India' by Rai Bahadur Lala Baijnath.

† "Fusion of sub castes in India".

আবার প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মনুষ্য বিশেষেরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণদিগের কথা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ যজন, যাজন, অধ্যাপন এবং অধ্যয়ন করিয়াই সময় কাটাইতেন। কিন্তু এখন আর তাহা হয় না; তাহা হইতেও পারে না। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে প্রায় সার্দ্ধ এক কোটি ব্রাহ্মণের বাস। কিন্তু ইঁহাদিগের মধ্যে কতজন শাস্ত্রোক্ত উপায়ে জীবন যাপন করিয়া থাকেন? উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে শতকরা প্রায় দশজন ধর্ম্ম-কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন এবং শতকরা ২০।২৫ জন ধর্ম্মচর্চ্চা ও পৌরহিত্য করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সকলে পৌরহিত্যও করেন না, অধ্যাপন ও অধ্যয়নও করেন না। তাঁহারা কেহবা যোদ্ধা, কেহবা দুগ্ধবিক্রেতা, কেহবা পাচক, কেহ ।। গোরক্ষক (রাখাল), কেহবা জলবাহক, কেহবা গায়ক, কেহবা নর্ত্তক, কেহবা কুস্তিগীর। এইরূপ সহস্র কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অধিকাংশ ব্রাহ্মণই জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশেও এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, বরং বহুল। কলিকাতাই তাহার অন্যতম প্রমাণ। সকল প্রকার ব্যবসায়েই বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মণেরা প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত। সেই রায় বাহাদুর লালা বৈজনাথ বলিতেছেন :—

"In fact there is no trade, in which a Brahman will not now engage and the statisteics of crime of the seaports show that there is no crime which he will not commit. What a fall for those, who profess to act as mediators between man and god!"*

ক্ষত্রিয়দিগের অবস্থাও এইরূপ হীন হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে যাঁহারা বাহুবলে দেশ রক্ষা করিতেন, প্রজা শাসন করিতেন, পূর্ব্বে যাঁহারা রাজছত্র-মুকুটশোভী হইয়া গৌরবের উচ্চ সোপানে আরূঢ় হইয়াছিলেন, এখন সেই সকল অতীত গৌরবের কথা অলীক স্বপ্নমাত্র। এখন আর যুদ্ধ নাই, রণক্ষেত্রে সে আত্মবিসর্জ্জন নাই, রাজকার্য্য প্রতিপালনের সে সুবিধা নাই, সে সাহস নাই, সে শক্তি নাই, এখন অনেকেই কৃষিব্যবসায়ী। পূর্ব্বকার সে উন্নত চরিত্রও এখন ধীরে ধীরে লুপ্ত হইতেছে। এখন অনেকেই ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অলস ও হীনমতি। সেই ক্ষত্রিয়জাতির স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ যে এক কোটী রাজপুত এখন ভারতে বাস করিতেছে, তাহাদিগের নৈতিক, আর্থিক এবং সামাজিক অবস্থা এখন এত হীন!

"Now a days they chiefly concern themselves with agriculture or engage in petty quarrels, or pass their time in indolence or debauchery or take to menial occupations." *

একজনকে লইয়া সমাজ নহে, দশজনের সমষ্টিই সমাজ। সময়ের পরিবর্ত্তনে যেমন বাহ্য জগতের পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়,

* "Fusion of sub-castes in India"

তেমনি সমাজেরও পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। সময় সমাজের অনুবর্ত্তী নহে, সমাজই সময়ের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া থাকে। তাই এক কালের রীতি নীতি, আচার ব্যবহার অন্যকালের ঠিক উপযোগী হয় না। সেই বল্কলপরিহিত, গিরিকন্দর-বাসী, আমমাংসাশীদিগের কথা স্মরণ কর; আর তোমাদের দিকে চাহিয়া দেখ। এখন যদি তোমাকে কেহ সেই বেশে, সেই অবস্থায়, সেইরূপ আহার্য্য ও পেয় দিয়া, সেইরূপ অলঙ্কারাদিতে ভূষিত করিয়া আধুনিক সভ্য সমাজের উচ্চ মঞ্চের উপর আনিয়া উপস্থিত করে, তাহা হইলে তুমি হয়ত লজ্জায় মরিয়া যাও। কালের পরিবর্ত্তনে সমাজের এত পরিবর্ত্তন, আর সমাজের পরিবর্ত্তনে তোমার আমারও এত পরিবর্ত্তন।

তাই তখনকার সেই শাস্ত্রালোচনার দিনে, সেই ধর্ম্মচর্য্যার দিনে সেই শান্ত, শুদ্ধ, মৌন মনীষীদিগের দিনে যে নিয়মে সমাজ চলিত, রাজ্য চলিত, দেশ শাসিত হইত, এখন আর তাহা হইতে পারে না। এখন আর নীবার ধান্যের ষষ্ঠ-ভাগমাত্র লইয়াই রাজা ক্ষান্ত হন না। অনায়াসলব্ধ ফলমূলে—তরঙ্গিনীর স্বাদু সলিলে—বল্কল পরিধানে বা স্বল্প বসনে আমাদের চলেনা। অভাব এত বৃদ্ধি হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন সমাজ প্রভৃতির সহিত মিলিয়া মিশিয়া আমাদিগের এই পরিবর্ত্তন। দিন দিন জনসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত জীবিকার জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহ ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে। সুবিধা পাইলেই তুমি আমাকে তাড়াইয়া দিয়া আমার স্থানে আসিয়া দাঁড়াইতেছ, আর আমিও যে তোমাকে ছাড়িয়া কথা কহিতেছি, তাহা নহে।

সুতরাং বর্ত্তমান যুগে শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবসায়-বিচার সম্পূর্ণ বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। তাহা রাখিতে গেলে চলে কই? তাই এখন হিন্দু আর্য্য কায়স্থ হইয়াও জুতার দোকান করে, ব্রাহ্মণ হইয়াও সূত্রধর হয়। যেরূপ ব্যবসায় করিয়াই হউক, অর্থই এখন প্রধান লক্ষ্য। অর্থ আসিলেই হইল অর্থেই সম্মান। জাতিগত ব্যবসায়ের ভেদ এখন আর বড় টিকিতে পারে না।

সেকালে আর একালে এখন কত পরিবর্ত্তন। সেকালে যাহা ছিল, এখন তাহা নাই। যাহাও আছে, তাহাও লুপ্ত হইতে যাইতেছে। একালে নূতন যাহা হইয়াছে, কোন দিন যে তেমন হইবে, সেকালে তাহা কেহ মনেও ভাবে নাই।

"The old world looseness of the relations of married life and of affiliation of sons has been purged from us. The old world slavery of the Sudra-millions has been quietly abandoned, the ere while Sudra-classes have been elevated in to Vaishyas, our Brahmains have become warriors and statesmen, Kshatriyas have become philosophers and guides and our Vaishyas have become our prophets and saints ... ... our voracious love of flesh and

wine has made room for an ideal of obstinence, charity, and mercy unknown all over the world ... The patriarchal forms of society have made room for communal organizations all over the country. The sanctity of woman's place if not as wife, yet as mother, daughter, and sister,— has been realized in a way unknown before elsewhere." *

অষ্টম অধ্যায়।

জাতিভেদের দোষ, গুণ।

ভিন্ন ভিন্ন মনুষ্যসম্প্রদায়কে একত্র করিয়া যখন প্রথমে সমাজ সৃষ্ট হইয়াছিল, তখনকার যুগে জাতিভেদ আবশ্যক বলিয়া মনে হইত। একজনের কর্ম্মে বা একের চেষ্টায় কোন প্রকার সামাজিক উন্নতিই সম্ভবপর নহে। সামাজিক উন্নতির মূলে সকলের সমবেত যত্ন নিহিত রহিয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সেই পুরাকালের জাতিভেদ এবং বর্ত্তমান জাতিভেদ, এতদুভয়ে অনেক পার্থক্য। কিন্তু তখনকার বর্ণভেদ সৃষ্টি করিতে হয় নাই—তাহা আপনিই হইয়াছিল। সামাজিক মঙ্গলের জন্য, সমাজের উন্নতির জন্য, সমাজান্তর্গত সকলের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য তাৎকালিক জাতিভেদ আপনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছিল। সমাজের তখন শৈশবাবস্থা। তাই প্রাত্যহিক নূতন নূতন অভাব অভিযোগ সমূহে সেই শিশু সমাজ অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সেই সকল দৈনন্দিন অভাব মোচন অবশ্য কর্ত্তব্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন অভাব মোচনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করা আবশ্যক—নূতন নূতন দ্রব্য-সামগ্রী প্রস্তুত করা আবশ্যক; তাই তখনকার সমাজ আপন দেহকে খণ্ড বিখণ্ড করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু সেই প্রত্যেক ছিন্ন খণ্ডই সমাজের মঙ্গলের জন্য কার্য্য করিত।

আমরা প্রত্যহই দেখিতে পাই, সহস্র রকমের দ্রব্যজাত না হইলে আমাদিগের দৈনন্দিন কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। সহস্র প্রকার দ্রব্যের অর্থই সহস্রাধিক ব্যক্তির পরিশ্রম। সমবেত পরিশ্রম নহে— স্বতন্ত্র পরিশ্রম। এখনও যেমন, তখনও তেমনি—প্রাত্যহিক কার্য্যের জন্য সহস্রের সাহায্য আবশ্যক হইত। যদি এমন হয় যে, আমার আবশ্যক মত আমিই শিক্ষক [illegible] আমিই শিষ্য—আমিই যোদ্ধা, আমিই কৃষক—আমিই শিল্পী, আমিই শাস্ত্রকার— যদি সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আমি কোন কারণেই আর অন্যের সাহায্য প্রাপ্ত না হই—যদি আমাকে দিয়াই আমার সমাজ ও সংসার গড়িয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে তখন আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিলে তেমন অবস্থা হয় না। আমার জন্য তুমি পরিশ্রম করিতেছ—

* "The seventh social conference—Lahore"—Mr. Justice Ranade's speech on "Social reform."

তোমার জন্য আমি পরিশ্রম করিতেছি। উভয়েরই স্বার্থ আছে—কিন্তু উভয়ের কার্য্যই উভয়ের মঙ্গল সাধন করিতেছে এবং উভয়ের মঙ্গলেই সমাজের মঙ্গল হইতেছে।

প্রাচীন জাতিভেদ-প্রথার আলোচনা করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, শূদ্রগণ দাস বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। তাই বলিয়া তাহাদিগের অবস্থা নিতান্তই যে হীন ছিল, এমন বোধ হয় না। সাম্যবাদী ইংলণ্ডের মজুরদিগের অপেক্ষা তাহারা অনেকাংশে সুখীই ছিল।

The treatment which the Sudras received was no less humane, and infinitely less calculated to produce friction than the tretment which, at the present day, the "black" receive at the hands of the "whites" in parts of the united states after a century's war-cry of liberty, equality, and fraternity, and after so many centuries of the altruistic influence of christianity."*

শাস্ত্রে যেমন শূদ্রের প্রতি আদেশ হইত "ব্রাহ্মণের সেবা করিবার জন্যই তোমরা সৃষ্ট হইয়াছ"—তেমনি আবার ব্রাহ্মণের প্রতিও আদেশ ছিল "দাসের আহার না হইলে তুমি আহার করিওনা।" তাই তখনকার ব্রাহ্মণাধিকার অনেকটা সুখের ছিল। তখনকার সমাজের দিকে চাহিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, তখন একদিকে যেমন পালন ও রক্ষণ, তেমনি অপরদিকে আবার বশ্যতা ও সেবা ছিল। শূদ্র ব্রাহ্মণের সেবা করিত—কিন্তু ব্রাহ্মণ শূদ্রকে পালন করিতেন। তখনকার ব্রাহ্মণগণ প্রভু হইয়াও ত্যাগী ছিলেন—ধর্ম্মচর্চ্চাই তখন তাঁহাদিগের একমাত্র কার্য্য ছিল। বশ্যতা ও সেবার সহিত পালন ও রক্ষণ ছিল; আমেরিকার "স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী"র ধ্বজা ভারতবর্ষে উড়িবার অবসর ও সুযোগ পায় নাই। তখন রাজা ও প্রজায়, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে, প্রভু ও ভৃত্যে সর্ব্বদাই একদিকে রক্ষা, অন্য দিকে বশ্যতা, একদিকে লালনপালন, মঙ্গল বিধান এবং অপরদিকে সেবা দৃষ্ট হইত। কিন্তু এ ভাব কতদিন ছিল?

মানবজীবনে চরিত্রোন্নতিই সর্ব্ব প্রথম ও প্রধান বিষয়। সমাজে চরিত্রবান ব্যক্তির সংখ্যা অধিক হইলেই সেই সমাজ পূজনীয় হয়। তখন প্রত্যেক জাতি তাহার অন্তর্গত ব্যক্তিগণের চরিত্রের উপর সর্ব্বদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত। এখন যেমন কথায় কথায় আদালতে যাইতে হয়, তখন সেরূপ ছিল না। কেহ কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে, অপরাধীর স্বজাতি মিলিয়া তাহাকে উপযুক্ত দণ্ড দিত—তখনকার বিচার স্বজাতীয়ের নিকট হইত। তাহারাই বিবাদের মীমাংসা করিত, দীনের দুঃখ মোচন করিত, কুচরিত্রের চরিত্র সংশোধন করিত। সেকালে বর্ত্তমান সাম্যবাদী সোসিয়ালিষ্টিকদিগের কোন আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু কত দিন সেকাল ছিল?

ইউরোপে যেমন "পুওর ল" (Poor

* "Hindu civilisation under British Rule"

Law) আছে, আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে তেমন কিছু আবশ্যক হয় নাই। তাহার কারণই সেই প্রাচীন জাতিভেদ। ব্যবসায়-সঙ্ঘের কার্য্য ভারতীয় পুরাতন জাতিভেদেই চলিয়া যাইত। যাহার যে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল, সে তাহাই করিত। তখন সম্প্রদায়-ভেদে কার্য্যেরও ভিন্নতা ছিল। যে যুদ্ধ-ব্যবসায় করিত; সে হলচালনা করিত না—যে হলচালনা করিত, সে দর্শনের আলোচনা করিত না—শিল্পী তাহার আপন ব্যবসায় লইয়াই ব্যস্ত থাকিত। তাই তখন কার্য্যের অভাব হইত না—তখন বিলাতী "Trades union" আবশ্যক হইত না।

সংসারের সকল প্রকার সুখাস্বাদন হইতে যাহাতে কেহই বঞ্চিত না হয়—যাহাতে নিম্ন জাতি চির দৈন্য ও পাপরাশি হইতে দূরে থাকিতে পারে—জাতিভেদ তাহারই পথ মুক্ত করিয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে প্রাচ্য জগতে এই বিষয়ের আন্দোলন হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে সেরূপ আন্দোলন ও বিচারের আবশ্যক হয় নাই।

"It (the caste-system) was probably the best solution possible at the time it was formed, of the great social problem which is at present exercising the minds of western philosophers, the problem, namely, how to distribute the good things of the world so as to liberate the lower classes from the vices and miseries of destitution."*

যদিও জাতিভেদে বৈষম্য দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু এ বৈষম্যের মূলে এমন কিছু ছিল না, যাহাতে নিম্নশ্রেণী উচ্চশ্রেণী কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত বা পীড়িত হইত।

"It is a system of organised in equality, but of in equality so adjusted as not to press very severely upon the classes affected by it" *

কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, এ অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।

জাতিভেদ প্রথার যতই দোষ থাকুক না কেন, ইহা সকলেই দেখিতেছেন যে, এই প্রথা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও সেকালের সামাজিক উন্নতির পথ রোধিত হইয়াছিল না; বরং সমাজ উন্নতই হইয়াছিল। তখন সেই সামাজিক উন্নতি যাহাতে স্থির থাকে, জাতিভেদ তাহারও সহায়তা করিয়াছিল। হিন্দুসমাজ নানাবিধ মতাবলম্বীর সমষ্টি। জাতিভেদ সেই বিভিন্ন মতাবলম্বীদিগকে চিরদিনের জন্য একত্র করিয়া দিয়া, হিন্দুসমাজের এ ধ্বংসের পথ রোধ করিয়াছিল। সমাজের প্রত্যেক অংশকে এক একটী কার্য্যের ভার দিয়া, এই প্রথা বরং সেকালে সমাজকে উন্নতির পথেই লইয়া গিয়াছিল। সুতরাং সেকালের কথা বিবেচনা করিলে, তাৎকালিক জাতিভেদ সেই শিশু সমাজের মঙ্গল সাধনই করিয়াছিল। সেকালে যখন বৈদেশিক শত্রুর অত্যাচারে সকলে উৎপীড়িত হইত, তখন আত্মরক্ষার জন্য ভিন্ন ভিন্ন দলভুক্ত হওয়া

* "Hindu civilisation under British Rule."

* Hindu civilisation under British Rule.

নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। তখন সামাজিক ও প্রাত্যহিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য ব্যবসায়বিশেষের কৌশল (Trade secret) সাম্প্রদায়িক হওয়াও বিপজ্জনক নহে।

"It had its uses in the earlier stages of society when inroads of foreigners necessitated its forming itself into compact and well-organized groups and when the condition of the arts of life required that trade secrets should be kept confined to a limited circle."‡

এইরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ করিয়া অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, সেকালে সেই পুরাতন জাতিভেদ-প্রথা সামাজিক মঙ্গল বিধানই করিয়াছিল।

কিন্তু সেকাল আর এখন নাই—সে জাতিভেদও আর এখন নাই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান জাতিভেদ সেই সেকালের জাতিভেদের ছায়া মাত্র। সুতরাং বর্ত্তমান জাতিভেদ হিন্দুসমাজের উপর কিরূপ ক্রিয়া করিতেছে, তাহার আলোচনা আবশ্যক।

এখন আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক জেলার আচার, রীতি নীতি অনেকাংশে বিভিন্ন—প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন জাতিবিশেষের মধ্যেও আচার নিয়ম স্বতন্ত্র। পরস্পরের সামাজিক সম্বন্ধ অত্যন্ত অল্প—নাই বলিলেও চলে। কিন্তু যেখানেই সামাজিক সম্বন্ধ অল্প, সেই খানেই আত্মীয়তা বৃদ্ধি হইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই। এখন আমরা দেখিতে পাই, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাব আমাদের দেশে অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। অনেকেই বোধ হয় দেখিয়াছেন, যদি কর্ম্মোপলক্ষে কোন বাঙ্গালী পঞ্জাব প্রদেশে বাস করেন, তবে তিনিও যেমন পঞ্জাবীকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, আবার তাহারাও তেমনি বাঙ্গালী "বাবু"কে ঘৃণার চক্ষে দেখে। জাতীয় অমিত্রতা এখন অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। যে স্থলে আত্মীয়তা নাই, সে স্থলে এক জনের জন্য আর একজনের প্রাণ কাঁদে না; একজনের জন্য আর এক জনের মমতা হয় না—একজনের নয়নে অশ্রুবিন্দু দেখিলে, আর একজনের নয়নে জল আসে না; কারণ যেখানে যত আত্মীয়তা, সেইখানেই তত প্রাণের টান, সেইখানেই তত সহানুভূতি। এই মনে করুন, যে গ্রামে আমার আত্মীয়ের বাস, সেই গ্রামখানি আমার কত আপন—সেই গ্রামের প্রত্যেক ধূলিকণার সঙ্গে যেন আমার একটা আমরণ সম্বন্ধ। কিন্তু এই সকল অমিত্রতার হেতু বর্ত্তমান জাতিভেদ।

Again the principle of caste has throughout our history operated in such a way that each caste has now come to from a separate community with distinct usages, even as to the kind of food that is eaten and the manner on which it is cooked. And there is no social inter-communication between them of a nature to bind them together into one whole. Hence instead of there being a

‡ 'Fusion of sub-castes in India' by Rai Bahadur Lala Baijnath.

feeling of sympathy between different castes, there is often a feeling of antipathy." *

পরবর্ত্তী যুগে এই আত্মীয়তা ও ঐক্যের অভাবেই ভারতবর্ষের এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। ইহারই জন্য এত সহজে ভারতবর্ষ বিদেশীয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাভূত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিতর এই বৈষম্য থাকিবার জন্যই পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসও অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল, এক জাতি আর অন্য জাতির সাহায্যের জন্য আগ্রহের সহিত অগ্রসর হইত না। কিন্তু এখন জাতিভেদের কঠোরতা একটু একটু শিথিল হইতেছে, তাই জাতীয় মহা সমিতিতে আমরা সমগ্র ভারতবর্ষের একপ্রাণতার আংশিক চিহ্ন পাইয়া থাকি।

বর্ত্তমান জাতিভেদ সম্বন্ধে রায় বাহাদুর লালা বৈজনাথের মত বড় মূল্যবান। তিনি বলিতেছেন ——

"Caste therefore, as now prevailing in Hindu-society cannot but undermine the race physically, intellectually and morally—physically by narrowing the circle of selection in marriages, intellectually by cramping the energies and morally by destroying mutual confidence and habits of co-operation."* আমরা ধীরে ধীরে এই কথার সত্যতা দেখাইতে চেষ্টা করিব।

নেস্‌ফিল্ড সাহেব আশঙ্কা করেন যে বর্ত্তমান ভারতবাসীর চরিত্রগত আত্মনির্ভরতার এবং অন্যের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার সাহসের অভাব বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথারই অন্যতম ফল। সাহেবের আশঙ্কা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় কি? উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের জাতিভেদ প্রথার সমালোচনায় তিনি বলিতেছেন:—

"Society, instead of being constituted as one organised whole, is divided aganist itself by inorganic sections like geological strata. The sense of insecurity thus engendered could not but lead to a less of independence and courage in the characters of individuals. For a man soon ceases to rely on himself, if he thinks that no reliance is to be placed on the good will and fair dealing of those around him and that evry thing which he may sayor do is liable to be suspected or misconstrued. Thus the two great defects in the Indian character—a want of reliance on one's self and a want of confidence in others have sprung from a common source, the terror-striking influence of caste."*

বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথা যে কেবল সমগ্র সমাজকে পূর্ব্বাপেক্ষা অবনত করিয়াছে

* "The Ninth Social Conference"—Presidenteal address by Dr. R. G. Bhanderkar.

* "Fusion on sub castes in India"

* Mr. Nesfield's "Review of the caste-system prevailing in the North western provin Oces and oudh."

তাহা নহে—ইহারই প্রভাবে প্রত্যেক জাতির ভিতর সময়ে সময়ে নিষ্ঠুর উৎপীড়নের কথাও শুনিতে পাওয়া যায়।

কোন্ জাতির কি কি ব্যবসায় করা উচিত সে সম্বন্ধে মনুর গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। যে জাতির যে কর্ম্ম সে তাহা না করিয়া অন্য কর্ম্ম করিলে তাহাকে সামাজিক দণ্ড দিবার বিধিও দৃষ্ট হয়। আমি একটী সাধারণ (General) শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

"যোহনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ।"*

যে সকল দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্যত্র অর্থাৎ ঐহিক বিদ্যাদি লাভে যত্নবান হয়, তাহারা জীবিতাবস্থাতেই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

সেকালে এইরূপ নিয়ম থাকিবার জন্য ব্যবসায় বাণিজ্যের সুতরাং শিল্পের উন্নতি পক্ষে বিষম বাধা পড়িয়াছিল। মনু বলিয়াছিলেন 'ব্রাহ্মণ চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে পারিবেন না।' সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও ব্রাহ্মণ সন্তান চিকিৎসক হইতে পারিত না।

কিন্তু যে যে ব্যবসায়ই করুক না কেন—তাহা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আপন হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিতে হয়। কারণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে, নিতান্ত দায়ে পড়িয়া কোন একটী কার্য্য আরম্ভ করিলে সেই কার্য্যে কোন দিনই সফলকাম হওয়া যায় না। যেখানেই ইচ্ছার অভাব, সেই খানেই আগ্রহের অভাব। যেখানেই আগ্রহের অভাব সেই খানেই পরিশ্রম ও কৌশলের অভাবও লক্ষিত হইয়া থাকে। তাই আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে নাই। তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্যক্তিবিশেষকে আপন জাত্যানুমোদিত কার্য্যই করিতে হইত। হয়ত সেই কার্য্যে তাহার প্রকৃতিগত কোন কৌশল ছিলনা। হয়ত কার্য্যক্ষেত্রে তাহার জন্য শূন্য স্থান আর ছিলনা। কিন্তু বাধ্য হইয়া তাহাকে সেই কার্য্যই করিতে হইত। ইহাতে তাহার নিজের কোন উন্নতি হওয়া দূরে থাকুক বরং অবনতি হইত—সুতরাং সমাজেরও উন্নতি হইত না। কারণ প্রত্যেকের উন্নতিতেই সমাজের উন্নতি। সমাজ উন্নত না হইলেই দেশেরও উন্নতি হয় না, ধীরে ধীরে সমাজ ও দেশ দরিদ্র হইয়া উঠে। এখন যদিও ব্রাহ্মণ চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছে, হিন্দু জুতার দোকানও করিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দু সমাজে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা এখনও নিঃসন্দেহে, নির্ভয়ে আপন ইচ্ছানুযায়ী ব্যবসায় অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হন কারণ কোন স্থানে বা সমাজ কোন স্থানে বা দেশাচার তাঁহাদিগকে শাসন করে।

ভাণ্ডারকর মহোদয় একবার বলিয়াছিলেন—

"To tie men down to certain occupations, even when they have no aptitude for them, renders

* মনুসংহিতা, ২।১৬৮

those men less useful to the country. When all men belonging to a certain caste must follow certain occupations only, the field is overstocked and poverty is the result. You can get a Brahmin school master for five or Six rupees a month, but a good carpenter or stone moson can not be had unless you pay from twenty or twentyfive rupees per mensem. And unless perfect freedom is allowed to men in this respect, and each allowed to make the best possible each of his own powers the country can not economically advance."*

সুতরাং দেশের অর্থবল বৃদ্ধি করিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আপন আপন শক্তির সদ্ব্যবহার করিতে দেওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বে তাহাই হইত বলিয়া সামাজিক উন্নতিও হইয়াছিল। কোন জাতি বা সম্প্রদায়কে যদি কোন কার্য্য করিবার একটী বিশেষ ক্ষমতা (special privilege) দেওয়া যায়, তাহা হইলে অন্যান্য সম্প্রদায় বা জাতি সমূহের বিশেষ অনিষ্ট করা হয়। কারণ তদ্রূপ বিশেষ অধিকার বা ক্ষমতা অপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের জীবন সংগ্রাম অনেক খানি আয়াস সাধ্য হইয়া উঠে। কার্য্যক্ষেত্র কমিয়া যাওয়াই তাহার অন্যতম কারণ।

ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগের শারিরীক ও মানসিক দুর্ব্বলতার হেতু বর্ত্তমান জাতি-ভেদ প্রথা। কারণ জাতিভেদের কঠিন নিয়মে আবদ্ধ থাকিবার জন্যই আমাদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের সীমা ক্রমশঃই সংকীর্ণ হইয়া যাইতেছে। প্রত্যেক জাতির ভিতর যে সকল স্বতন্ত্র বিভাগ আছে তাহাদিগের মধ্যে বৈবহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারা যায় না। কিন্তু "ইহা একটী প্রাণীজগতের পরীক্ষিত সত্য যে অল্প পরিসর ক্ষেত্রের মধ্যে যদি ক্রমাগত বিবাহ সম্বন্ধ ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে সে জাতি ত্বরায় হীনতেজ হইয়া যায় এবং কালে উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হয়।" রক্তের বিমিশ্রনাভাবে যে শারিরীক দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। কিন্তু শারিরীক তেজের উপরেই উদ্যম, সাহস, কর্ম্মকুশলতা, শ্রমদক্ষতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, স্বাধীন চিন্তার শক্তি প্রভৃতি বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। তাই যাহাতে আমরা প্রতি-দিন এরূপ হীনবল না হইয়া পড়ি সমাজের তদ্বিধানে চেষ্টিত হওয়া আবশ্যক। বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের সীমা বিস্তৃতি লাভ করিলে রক্তের সহিত নানাবিধ গুণ এবং শক্তি সঞ্চারিত হইয়া দুর্ব্বলকেও সবল এবং গুণশালী করিতে পারে। পূর্ব্বে বিবাহাদি বিষয়ে আধুনিক কালের ন্যায় কোন কঠিন নিয়ম ছিল না। ব্রাহ্মণও চারি জাতির কন্যাকেই বিবাহ করিতে পারিত।*

অধুনা আমাদিগের দেশে যত অকাল মৃত্যু ঘটিতেছে বাল্যবিবাহই তাহার অন্যতম কারণ। বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের স্থান দিন দিন সীমাবদ্ধ হইতেছে বলিয়াই বালবিবাহও এত অধিক দেখা যাইতেছে। শাস্ত্রে নিয়ম আছে দশমবর্ষের পর কন্যাকে

---

* "Tth Ninth Social Conference"—Presidential addres by Dr. R- G. Bhandarkar.

অবিবাহিতা রাখা অনুচিত। কিন্তু প্রত্যেক জাতির ভিতর যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ আছে তাহাদিগের মধ্যেও আচার রীতি নীতির অনেক পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এক বিভাগের কন্যা অপর বিভাগ গ্রহণ করিতে চাহে না। তাই কন্যা বয়স্থা হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাহার বিবাহের আয়োজন করিতে হয়—নহিলে পাত্র পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে। সুতরাং উপযুক্ত অনুপযুক্ত কিছু বিবেচনা না করিয়াই সময় থাকিতে থাকিতে একটী পাত্র দেখিয়া তাহার হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিতে হয়। সেইরূপ বালবিবাহের ফলে যাহারা পৃথিবীতে আসে তাহারা সহজেই হীনবল, হীনবুদ্ধি, রুগ্ন এবং ক্ষীণজীবী হয়। বালবিবাহ যে অতীব অনিষ্টকর তাহা এখন সকলেই বুঝিয়াছেন। তথাচ কর্ত্তব্য বোধে কয়েক-জন বিখ্যাত চিকিৎসকের মত নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

(১) Early marriage, in my humble opinion, is the greatest evil of our country. It has stood so to say, at the very springs of the life of the nation, and prevented the normal expanse of which it is capable. And I am inclined to date 'the fall and degeneracy of my country from the day Angira uttered the fatal words, and these words became law, or custom which is stronger and more mischievous than law itself."*

Dr. Mahendra Lal Sircar.

(২) 'The generations, that are being born under the present system of things in the eye of modern science and even of our own ancient Ayurveda, are no better than abortions and premature births. What can be expected of such human beings, ushered in to the world under such unfavourable circumstances? How can they be expected to compete in the hard struggle for existence, not to say, for intellectual' and moral superiority ?*

(৩) "Physiological science, common sense and observation all teach that an immature mother is likely to produce weak and imperfect offspring. Before the parent gives birth to a child she should herself have attained her full growth and a much more complete development and vigour than can be looked for in female children of 10 to 14 years of age."*

(৪) "The early betrothal system and the bringing together of persons of immature age must be bad, as involving a disturbance of imperceptibly gradual sexual development and as lighting up, what in medical physiology might be called, an unnatural "Erythism."†

(৫ "I am fully convinced that the evils attendant on child-

* Dr. Mahendra Lal Sircar.

* T. Fayrer, M. D.

† Dr. D. B. smith.

bearing at such an early period are much greater than when the bodily frame of the mother has arrived at more perfect maturity, ... constitutions shattered by early child-bearing cannot be made to appeal so strongly to the intellect of others who have not been witnesses of the extensive mischief caused, as figures caloulated on a death rate."*

বাল্য বৈধব্য আমাদিগের দেশে বিরল নহে, পরন্তু বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাল্যবিবাহই তাহার অন্যতম কারণ। কিন্তু বিবাহের স্থান বৃদ্ধি হইলে, পাত্রও বৃদ্ধি হইবে, তাহা হইলে আর এরূপ হইবে না।

এস্থলে আরও একটী কথা বিবেচনা করা একান্ত আবশ্যক। কন্যার বিবাহ দিতে বসিয়া আজকাল অনেকেই ঋণজালে জড়িত হইতেছেন। পাত্রের পিতা অম্ল মূল্যে পুত্র বিক্রয়ে অসম্মত। তিনি বেশ জানেন যে তাঁহার গরজ নহে। এই দিকে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের স্থানও অল্প, তাই প্রাণের দায়ে ঋণজালে জড়িত হইয়াও কন্যার বিবাহ দিতে হয়। বিলম্ব করিবার উপায় নাই—অনুসন্ধানের সময় নাই, সময় হইলেও স্থান নাই। বর্ত্তমান প্রতিযোগীতার যুগে ইহাও একটী বিবেচ্য বিষয়।

ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিতর বিভাগ থাকিবার জন্য আমাদিগের আধ্যাত্মিক উন্নতিরও অনেক ব্যাঘাত হইতেছে। "ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী এক জাতীয় ও একই ব্যবসায়ী লোকের মধ্যে আহার ব্যবহার ও বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রচলিত না থাকিলে হিন্দু সমাজ, একটী সমাজ বলিয়া কাহারও মনে উপলব্ধি হয় না। বর্ণাশ্রম-স্থ হিন্দু সমাজ পূর্ণ একটী সমাজ হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলে আধ্যাত্মিক উন্নতির একতানতা থাকে—কুমারিকা হইতে হিমাদ্রি এবং কাশ্মীর হইতে মণিপুর, সমগ্র ভারতবাসীর জীবনের লক্ষ্য সমান হয়। ধর্ম্মশাখা ভেদের জন্য একতানতা নষ্ট হওয়াতে লক্ষ্য হারা হইতে হইয়াছে।"*

বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথা আমাদিগের জাতীয় উন্নতির পথে একটী দুরারোহ পাষাণস্তূপ বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহারই জন্য হিন্দু সভ্যতা আরও পূর্ণাঙ্গী হইতে পারিতেছে না। সমাজের সহিত সমাজের—জাতির সহিত জাতির, এমন কি একই জাতির অন্তর্গত একাংশের সহিত অপরাংশের বৈষম্য থাকিবার জন্য কোন কারণেই তাহাদিগের ভিতর প্রতিযোগীতার ভাব আসিতে পারে না। এই কারণেই জাতীয় উন্নতিও হয় না। জাতিভেদের ফলে ক্রমে ক্রমে ভারতবাসীর জীবন প্রতিযোগীতাহীন এবং তাহাদিগের জীবনযাত্রা অপেক্ষাকৃত সহজ ও আয়াস শূন্য (Easy—going) হওয়ায় এখন আর তাহারা কোন প্রতিযোগীতার ভিতর যাইতে চাহে না—আয়াস সাধ্য শিল্প বা বাণিজ্যেও হস্তক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক। তাই আর শিল্পের উন্নতি

*Dr. T. Edmonstoin Charles.

* বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম।

আমরা দেখিতে পাইতেছি না। অভাব-জ্ঞান এখন আমাদিগের যথেষ্টই হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল অভাব মোচনের জন্য এখন আমরা ভিন্ন দেশের মুখাপেক্ষী হইয়া চাহিয়া থাকি।

"It protected the different classes of Hindu society from the stress and strain of strenuous competetion ; but in doing so it rendered a halt in its on ward march inevitable. It made life easy and contented ; but it did so freeing it, to a considerable extent, from ceaseless struggle, the hard, inexorable condition of continued intellectual and industrial progress It promoted spirituality and quietism, but it suppressed industrialism and combativeness which are among the principal motive forces of modern progress.'*

ব্রাহ্মণজাতি ঐহিক সুখের দিকে কোন দিনই দৃষ্টি করিত না। রাজ্যশাসন সংরক্ষণ প্রণালী, ব্যবসায়, বাণিজ্য প্রভৃতি সকল বিষয়ই ব্রাহ্মণেতর জাতির হস্তে ন্যস্ত ছিল। এমনি করিয়া তাহারা আধ্যাত্মিকতায় এবং চিন্তা শক্তিতে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সাধারণ্য এদিকে বড় দৃষ্টি করিত না—তাহারা ইহকালের সুখ দুঃখ অভাব প্রভৃতি লইয়াই ব্যস্ত ছিল। অন্যদিকে মন দিবার অবসর তাহাদিগের ছিল না। কিন্তু শিক্ষা নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণগণ সমাজের বড় অপকার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেতর জাতি শেষে একরূপ নিরক্ষর বা অল্প শিক্ষিত থাকিতে লাগিল। সুতরাং শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের দিকে তাহাদিগের আদৌ কোন লক্ষ্যই ছিল না—তাহারা সেজন্য মুহূর্ত্তমাত্রও চিন্তা করিত না। কিজন্য করিবে?—তাহারা নিজে যে অল্প শিক্ষিত বা নিরক্ষর। সুতরাং জ্ঞান ও শিক্ষার, তত্ত্বালোচনায় ও শাস্ত্রালোচনায় ব্রাহ্মণদিগের আর কেহ প্রতিদ্বন্দী রহিল না। তাঁহারা যাহা করিতে লাগিলেন তাহাই বরেণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে লাগিল। ইহাতেই কুফল ফলিল। দিন দিন শিল্পের অবনতি হইল। কারণ জ্ঞান ও কৌশল উভয়ের সমাবেশ না হইলে সূক্ষ্ম শিল্প প্রভৃতি কিছুই উন্নত হইতে পারে না। যাহারা শিক্ষিত তাহারা ঐহিক সুখ চাহে না। তাই নিরক্ষর বা অর্দ্ধ শিক্ষিতের হস্তে শিল্পের ভার পড়িল। শিল্পোন্নতি হইল না। শিল্পের উন্নতি ও বাণিজ্যের উন্নতি সম্বন্ধবদ্ধ। বাণিজ্যের উন্নতির সহিত দেশের কল্যান ও শ্রীবৃদ্ধি একসূত্রে গ্রথিত। সুতরাং একের অভাবে সমস্তই নষ্ট হইল।

যদিও কনাদ বা কপিল হইতে জ্ঞানে কুভিয়ায় (Cuvier) এবং দার্ব্বিণ (Darwin) বড় নহেন—কিন্তু বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতগণ অসংখ্য পর্ব্বত শ্রেণী মধ্যে অত্যোচ্চ শৈল এবং সেকালের ভারতীয় পণ্ডিতগণ সমতলক্ষেত্রে সামান্য কয়েকটী মহা উচ্চ গিরিরাজ। একালে ও সেকালে এই প্রভেদ! সময়ে অবশ্য কিছুই থাকিবেনা। শৈল ও ধ্বংশ হইবে—গিরি-

*"Hindu civitisation under British Rule."

রাজ্যও ধ্বংশ হইবে। কিন্তু ইহা নিশ্চয়ই যে কালে প্রাচ্য পণ্ডিতগণের সংখ্যায় পণ্ডিতদিগের তুলনায় অধিক হইবে।

ভগবদ্গীতা

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

উপরুক্ত অষ্টাবিংশ শ্লোক হইতে পঞ্চ ত্রিংশত শ্লোক পর্য্যন্তের প্রাচীন পণ্ডিতগণের টীকাগুলি অতি মধুর অর্থাৎ কাব্যাংশে অতি চমৎকার। তর্ক যুক্তি গুলিও কোন কোন অংশে উৎকৃষ্ট। শ্লোক গুলির অর্থ ও তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিয়া প্রাচীন টীকাদারগন তদনুরূপ ব্যাখ্যা এবং যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। উপরোক্ত শ্লোক গুলিতে এক পক্ষে অর্জ্জুনের যেরূপ নিঃস্বার্থ মহত্ত্বাবের বিকাশ দেখা যায়, তাহা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অতি দুর্লভ, ইতিহাস দূরে থাকুক প্রাচীন বা আধুনিক কার্য্য জগতেও কোন কবির কল্পনায় তদ্রূপ বিকাশ দৃষ্টি গোচর হয় না, পক্ষান্তরে উপরোক্ত শ্লোকগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, অর্জ্জুনের ন্যায় বীরের পক্ষে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনের ধ্বংশ আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত ও কর্ত্তব্য কার্য্য হইতে বিচলিত হওয়া অসঙ্গত ও তাঁহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতার পরিচায়ক, এই জন্য প্রাচীন টীকাকারগণ তাঁহার একটী কৈফিয়ৎ (বর্ত্তমানকালে যাহাকে Explanation বলে) দিয়াছেন, ৩১ হইতে ৩৫ শ্লোকের উপর লক্ষ্য করিয়া মধুসূদন সরস্বতী এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে যুদ্ধে জয় হইলে পাণ্ডবেরা রাজ্য লাভ করিবেন তাহাতে তাঁহারা সুখী হইবেন কিন্তু পরম পূজ্য পাদ পিতামহ ভীষ্ম, ভক্তি ভাজন আচার্য্য দ্রোণ, মাতুল শকুনি, জ্ঞাতি ভ্রাতা দুর্য্যোধনাদি, পরম স্নেহভাজন তদীয় পুত্র, পৌত্র অর্থাৎ ভ্রাতস্পুত্র পৌত্র প্রভৃতি স্বজনগণের কোমল কলেবরে বাণবিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে নিহত না করিলে, যুদ্ধে জয় লাভের সম্ভাবনা নাই, যুদ্ধে জয় লাভ না হইলে, রাজ্য লাভ হইবেনা, পক্ষান্তরে এই যুদ্ধে স্বপক্ষীয় ভ্রাতা স্নেহাস্পদ পুত্র, পৌত্র, ভ্রাতঃস্পুত্র, শ্বশুর, শ্যালকাদি সুহৃদবর্গের প্রাণ নাশের সম্ভাবনা, ইহ সংসারে নিতান্ত স্বার্থপর হৃদয়হীন জনগণই স্বকীয় সুখ সৌভাগ্যের জন্য স্বজনদিগকে বঞ্চনা করিয়া স্বকীয় ইষ্ট সাধনের উপায় অবলম্বন করে, কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানবান, তত্ত্বজ্ঞ বিবেক বুদ্ধি সম্পন্ন তাঁহারা সততঃ আত্মীয় স্বজনাদির সুখ সাধনের উপায় অন্বেষণ করিয়া আপনিও সুখী হন, এবং আত্মীয় স্বজনের সহিত সুখ ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হন ও পরমানন্দ উপভোগ করেন, এস্থলে যখন এই যুদ্ধে সেই স্বজনগণের বিনাশ অবশ্যম্ভাবি ও বিপক্ষ আত্মীয়গণকে নিজে বধ করিয়া রাজ্য লাভ করিতে হইবে, তখন ঐ রাজ্যলাভে সুখ বা তৃপ্তি কোথায়? অতএব পার্থিব রাজ্য দূরে থাকুক আত্মীয় স্বজনকে বধ করিয়া ত্রৈলোক্য রাজ্যও আমি উপেক্ষা করি।

ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানিচ,
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগ সুখানিচ,
ত ইমেব স্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানিচ ॥
ইত্যাদি,

বাক্যগুলি স্বাধীন জাতি ইউরোপের ও আমেরিকার প্রতিগৃহে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখা উচিৎ। এই উপদেশ ইউরোপে প্রচারিত থাকিলে অষ্ট্রীয়া রাজার সাহায্যে উদার নীতিক মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টির রাজ্যচ্যুতি ও অবশেষে সেন্ট হেলেনার নির্ব্বাসিত কারাগৃহে মৃত্যু সংঘটিত হইত না, এবং ভারতে এই উপদেশ মত কার্য্য হইলে ক্ষত্রিয় রাজগণ পরস্পর আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে বিবাদ করিয়া বিদেশীয় মুসলমান কর্ত্তৃক পরাজিত রাজ্যচ্যুত এবং তাহাদের পদদলিত হইতেন না, এখনও স্বজনগণের মধ্যে বিবাদ মামেলা মোকদ্দামা করিয়া উৎসন্ন যাইতেন না, যাহা হউক কবিকৃত অর্জ্জুনের উদ্দেশ্য ও টীকাকারের কৈফিয়ৎ অতি চমৎকার বটে, কিন্তু ঐ শ্লোক কয়েকটীর পরেই কবির দুর্য্যোধন ও তৎপক্ষীয়গণকে আততায়ী আখ্যা দিতে বাধ্য হইয়াছেন, আততায়ী অর্থে—

অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ।
ক্ষেত্রদারাপহারীচ যড়েতে আততায়ীনঃ ॥

বঙ্গার্থ—গৃহদগ্ধকারী (যে ঘরে আগুন দেয়) বিষদাতা শস্ত্র পাণিধনাপহারী ভূমি অপহারী ও বণিতাপহারী এই ছয়জন আততায়ী।

দুর্য্যোধন যে আততায়ী তৎপক্ষে সন্দেহ নাই, দুর্য্যোধন বারণাবতে পাণ্ডবদিগকে হত্যার জন্য জতুগৃহ দগ্ধ করে, ভীমকে বিষ খাওয়ায় দ্যূতক্রিয়ায় জয় লাভ করিয়া দ্রৌপদীরে হরণের চেষ্টা করে, রাজ্য ধন অপহরণ করে, তদন্তর যুদ্ধক্ষেত্রে শস্ত্রপানিও বটে সুতরাং দুর্য্যোধন ও তাহার সহায়কারীগণ শাস্ত্রমতে অর্জ্জুনের বধ্য তথাপি অর্জ্জুন বলিতেছেন যে, এ সকল আততায়ীদিগকে বধ করিলে আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে, এইস্থানে অর্জ্জুনের ন্যায় কর্ত্তব্য পরায়ন বীরের মত কথাটা হইল না। "কবির" অর্জ্জুনের মুখ দিয়া ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশের অভিপ্রায় ক্রমে বিশদ ও স্পষ্টীকৃত হইবে কিন্তু প্রাচীন টীকাকার মহাশয়গণের অর্জ্জুনের ঐ বাক্য ন্যায় সঙ্গত বলিয়া সমর্থন করিতেই হইবে তজ্জন্য তাঁহারা (আততায়ীকেও বধ করিলে পাপাশ্রয় করিবে) অর্জ্জুনের এই বাক্যেরই কৈফিয়ৎ দিতে ত্রুটী করেন নাই।

টীকাকারগণ বলেন যে অর্থশাস্ত্রানুসারে আততায়ী অবশ্য বধ্য কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে নহে, "ন হিংস্যা সর্ব্বভূতানি

ইতি ধর্ম্মশাস্ত্র" অর্থশাস্ত্র হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র বলবান এবং স্মৃতি হইতে ন্যায় বলবান। এস্থলে সামান্য অর্থের জন্য পূজ্যপাদ পিতামহ, আচার্য্য ও বন্ধুগণকে বধ করা কখনই ন্যায়সঙ্গত নহে; তদ্রূপ করিলে নিশ্চয়ই পাপাশ্রয় করিবে, ইহাই অর্জ্জুনের অভিপ্রায়।

আনন্দগিরি আর এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন "অথবা গুরু ভ্রাতৃ সুহৃদ্‌ প্রভৃতী নেতান্‌ হত্বা, বয়মাততায়িনঃ স্যামে" গুরু-ভ্রাতা-সুহৃদ্‌ প্রভৃতিকে বধ করিলে আমরাই আততায়ী হইব, "ততঃ স্বৈতান্‌ হত্বা তৎকৃতং পাপমাততায়িনোঽস্মানেব সমাপ্রযোদিতি"—অতএব ঐ গুরুদিগকে বধ করিলে, আমাদের পাপাশ্রয় করিবে। আধুনিক বাঙ্গালা টীকাকার বঙ্কিম বাবু বলেন "একালে আমরা Law এবং morality র মধ্যে যে প্রভেদ করি—এ বিচার ঠিক সেইরূপ। ইংরাজের পিনাল কোডেও লেখে যে, অবস্থাবিশেষে আততায়ীর বধ জন্য দণ্ড নাই; কিন্তু সেই সকল অবস্থায় আততায়ীর বধ সর্ব্বত্র আধুনিক নীতিশাস্ত্র-সঙ্গত নহে।"

উপরোক্ত প্রাচীন টীকাকারদিগের মতটী বঙ্কিম বাবুও প্রকারান্তরে সমথন করিয়াছেন। "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্‌ হত্বৈতানাততায়িনঃ" কথাটা অর্জ্জুনের উক্তি। ইহা ভগবদুক্তি নহে; ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ মতটী যে সমর্থন করেন নাই; তাহা পরে প্রকাশ হইবে।

শ্রীকৃষ্ণ যে যুদ্ধ বাধাইবার জন্য অর্জ্জুনের ন্যায়সঙ্গত উক্তির সমর্থন করেন নাই, ইহা কখনই হইতে পারে না। প্রাচীন টীকাকারগণ সর্ব্বত্রই ভগবদুক্তির সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন; বঙ্কিম বাবুও তাঁহার কৃত "কৃষ্ণচরিত্রে" স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ আদৌ যুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন না। যাহাতে স্বজনগণ পরস্পর যুদ্ধ করিয়া ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন; এমন কি, যখন সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইল, তখন যুদ্ধ অনিবার্য্য জানিয়া দুঃখ ও ক্ষোভের সহিত দ্বারকায় প্রস্থান করিয়াছিলেন এবং নিজে যুদ্ধ করিবেন না, অর্থাৎ নিজ হস্তে লোকক্ষয় করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। সেই শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জ্জুনের ন্যায় ও নীতিসঙ্গত বাক্য কলে কৌশলে কাটিয়া দিয়া, অহিতজনক স্বজনধ্বংসকর ও লোকক্ষয়কর যুদ্ধ করিতে অনুমোদন করিবেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে; সুতরাং এস্থলে অর্জ্জুনের উক্তি ও টীকাকারদিগের তৎসম্বন্ধীয় ব্যাখ্যার একটু সমালোচনা আবশ্যক।

কিন্তু আমার কৃত এই গীতার ভূমিকায় কর্ম্ম কি ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের কি আবশ্যকতা ছিল, তৎসম্বন্ধীয় প্রশ্ন মীমাংসা কালে উপরোক্ত তর্কের মীমাংসা ও তাহার সমালোচনা বিষদভাবে করিয়াছি। ঐ তর্কের সারসংগ্রহ এই যে, এক পক্ষে ভারতে কয়েকজন পরস্বাপহারী ক্রূরকর্ম্মা ধর্ম্মরাজ্যের কণ্টক স্বরূপ দুর্নীতিপরায়ণ নৃপতিগণের অধর্ম্ম-রাজ্যের পৈশাচিক অভিনয় দ্বারা ভারতসমাজ পুতিগন্ধময় নরক সদৃশ হওয়ায় ও তাহাদের ধ্বংস ব্যতীত তদাদর্শে নীতিমার্গ ভ্রষ্ট বর্ত্তমান ও ভবিষ্যদ্‌ বংশীয় কোটি২ লোকের উদ্ধারের ও

ভারতকে চির পাপপঙ্ক হইতে মোচনের উপায় না থাকায়, ভারতসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলার্থে তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম-রাজ্য সংস্থাপন অতীব আবশ্যক। পক্ষান্তরে, ঐ পরস্বাপহারী দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণ আত্মীয় স্বজন বিধায়, তাহাদিগকে ধ্বংস করিলে, মনের অশান্তি ও জ্ঞাতিবধ-জনিত পাপাশঙ্কা; এস্থলে কোন্‌টী শ্রেয়ঃ, তাহার মীমাংসা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই করিয়াছেন। ঐ মীমাংসার্থে নিষ্কাম ধর্ম্ম ও কর্ম্মযোগ শিক্ষায় আদর্শ জগৎপূজ্য ভগবদ্গীতার সৃষ্টি। ঐ গীতার সংস্কৃত ভূমিকায় তাহার বিশদ ব্যাখ্যা আছে। * পুনরুক্তি অনাবশ্যক, তবে স্বর্গীয় বঙ্কিম বাবুর কথিত Law এবং morality সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন। অবশ্যই যেস্থানে প্রচলিত আইন এবং সুনীতির বা নীতিমূলক বিবেকের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়—তৎস্থলে যদি আইনের আশ্রয় না লইয়া, সুনীতি বা নীতিমূলক বিবেকের উপদেশ গ্রাহ্য করিলে নিজের ক্ষতি ব্যতীত ধর্ম্ম ও নীতিবিগর্হিত কার্য্যে প্রশ্রয় ও তদ্ধেতু বা তদাদর্শে সমাজ কলুষিত ও পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন না হয়, সেস্থলে আইন অপেক্ষা সুনীতি বা নীতিমূলক বিবেকের উপদেশ গ্রাহ্য করা উচিত। সুনীতি আইনের ভিত্তি, আইন সুনীতি-প্রসূত। সুনীতি হইতে ধ্রুব বা সত্যের জন্ম, আইন সত্য বা নীতিবহির্ভূত নহে, এজন্য Law এবং moralityর মধ্যে প্রায়ই বিরোধ উপস্থিত হয় না; তবে মনুষ্যসমাজ যাহা উত্তম বিবেচনা করে, তাহারই অধিক পক্ষপাতী হয়। সুরুচি হইতেই উত্তমের জন্ম। যদিও সুনীতিমূলক সত্য বা ধ্রুব সার্ব্বভৌমিক, কিন্তু সুরুচি বা উত্তম আশু মানবের অন্তর-রাজ্য এতই অধিকার করিয়া ফেলে যে, তৎপ্রভাবে নীতিজ্ঞ শাস্ত্র বা আইন-প্রণেতাগণও ভ্রমে পতিত হইয়া সুনীতি বা ধর্ম্মনীতির সীমাতিক্রম করেন; এইজন্য অর্থনীতি-শাস্ত্রের সহিত সুনীতি বা ধর্ম্ম-নীতির এবং এইক্ষণকার বর্ত্তমান ভাষায় Law এবং moralityর সঙ্গে কদাচিৎ দুই একটী স্থানে বিরোধ উপস্থিত হয়। এইজন্য শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, স্মৃতি হইতে ন্যায় বলবান; কিন্তু বর্ত্তমান স্থলে যে অর্থনীতির সহিত ধর্ম্মনীতির কোন বিরোধ নাই, তাহা পূর্ব্বোক্ত ভূমিকায় বিশদরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। সংক্ষেপতঃ উপস্থিত ক্ষেত্রে এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য কেবল পাণ্ডবদিগের স্বার্থের নিমিত্ত নহে; জগতের হিতের নিমিত্ত। অধর্ম্ম দূরীভূত করিয়া ধর্ম্ম-রাজ্য পুনঃসংস্থাপনই এই যুদ্ধের মহদুদ্দেশ্য। ঐ মহদুদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে ন্যায় মতে যদি রাজ্যলাভ ও তদ্দ্বারা সুখভোগ হয়, তবে তাহা নিজের সুখ ভোগের উদ্দেশ্য নহে। কর্ত্তব্যপালনই উদ্দেশ্য; সুতরাং এস্থলে Law এবং moralityর মধ্যে কোন বিরোধ নাই এবং অর্জ্জুনের জ্ঞাতিবধাদি

* হিন্দু-পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষ ষষ্ঠ খণ্ড ১১ সংখ্যা ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে সংস্কৃত গীতার্থে কর্ত্তব্য কর্ম্মের ব্যাখ্যা ৩৫৪। ৩৫৫ পৃষ্ঠা এবং ৭ম বর্ষ ৭ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা ১৩০৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ, সংস্কৃত ঐ গীতার্থে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আবশ্যকতা ১১৯ পৃষ্ঠা হইতে ১৩০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

জনিত পাপাশঙ্কা নিতান্ত অমূলক। কিন্তু তাঁহার পাপাশঙ্কা অমূলক ও তদ্ধেতু যুদ্ধে নিবৃত্ত হওয়া অনুচিত হইলেও, তাঁহার স্বার্থত্যাগসূচক "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানিচ" ইত্যাদি উক্তিগুলি—আবার বলি—স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া প্রতি ঘরে রাখা উচিত।

তৎপরে অর্জ্জুন এই যুদ্ধে কুলক্ষয়, সনাতন কুলধর্ম্ম নাশ; ঐ কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে, অবশিষ্ট সমগ্র কুল অধর্ম্মে অভিভূত তদ্ধেতু কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইবে ও ঐরূপে ব্যভিচারিণী হইলে, বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়; ঐ বর্ণসঙ্কর হইতে কুল নরকে পতিত, ও পিতৃগণের পিণ্ডলোপ হওয়ায়, তাঁহারাও পতিত হন; অতএব ঐ বর্ণসঙ্কর দ্বারা কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম উৎসন্ন হয়। এমত স্থলে আমরা রাজ্য-লোভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া কি মহৎ পাপ করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি! যদি আমি প্রতীকার-পরাঙ্মুখ ও অশস্ত্র হইলে, অস্ত্রধারী দুর্য্যোধন প্রভৃতি আমাকে বধ করে, তাহাও আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর।" পার্থ এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে ধনুর্ব্বাণ ত্যাগপূর্ব্বক সংগ্রাম-স্থলে রথোপরি উপবেশন করিলেন।

আবার অর্জ্জুনের সেই সুর যে—"রাজ্য লোভে স্বজনগণকে বধ করিলে, মহাপাপে লিপ্ত হইতে হইবে" কিন্তু এবারের আপত্তি-গুলি কেবল স্বজনবধ-জনিত পাপাশঙ্কা নহে; তদতিরিক্ত গুরুতর অনিষ্টের আশঙ্কা। যথা রাজ্যলোভে স্বজনগণকে বধ করিলে, স্বজনবধজনিত পাপের অতিরিক্ত নিম্নোক্ত গুরুতর অনিষ্টগুলি সংঘটিত হইবে; যথা স্বজনগণের ধ্বংস হইলে, অবশিষ্ট কুল অধর্ম্মে অভিভূত হইবে, তদ্ধেতু কুলস্ত্রীগণ অভিভাবক অভাবে ভ্রষ্টা হইবে, বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইবে, তাহা হইলে (১) কুলধর্ম্ম (২) জাতিধর্ম্ম উৎসন্ন হইবে, (৩) কুল নরকে পতিত হইবে, (৪) পিণ্ডলোপ হেতু পিতৃগণও পতিত হইবেন।

অর্জ্জুনের এই কয়েকটী আপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন টীকাকারগণ প্রথমতঃ স্বজনগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, অবশিষ্ট কুল কেন অধর্ম্মে পতিত হইবে, তাহার কারণ এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, বংশের প্রধান ও অভিজ্ঞ জনগণের ধ্বংস হইলে, ঐ প্রাচীন ও সুশিক্ষ জনগণের অভাবে বংশের অবশিষ্ট জনগণ সুশিক্ষা লাভে বঞ্চিত এবং ক্রমশঃ জ্ঞান-বুদ্ধির অবনতি হেতু উত্তরোত্তর উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী হইয়া পতিত, অধর্ম্মাক্রান্ত ও হীন দশাপন্ন হইবে এবং অপালন ও অজ্ঞতা হেতু স্মৃতি ও বেদ-বিহিত ধর্ম্ম কর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া, সাধু বংশ কাল সহকারে অধার্ম্মিক ও অসাধু হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ পুরুষগণ আচারভ্রষ্ট ও ধর্ম্মবিহীন হইলে, কুলকামিনীগণ মনে মনে নানা প্রকার কুতর্ক করিতে থাকিবে। স্বামী বা অভিভাবকগণ যদি ধর্ম্মত্যাগী ও বিপথগামী হন, তবে কুলকামিনীগণ কুমার্গগামী স্বামী বা ভ্রাতা প্রভৃতি স্বজনগণের কুদৃষ্টান্তের অনুকরণে অবশ্যই নানা পাপ-পঙ্কে পরিলিপ্ত হইবে। কামিনীগণ ঐরূপ বিপথগামিনী হইলে নিশ্চয়ই জারজ সন্তানের আবির্ভাব হইবে এবং মনুষ্যের মহিমা এককালে উৎসন্ন হইয়া যাইবে।

কিন্তু নীলকণ্ঠ ৪১ শ্লোকের টীকায় অর্জ্জুনের উপরোক্ত উক্তির একটী আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন যে, পাণ্ডবগণের পিতৃ-পিতৃব্যরাও পিতার অবর্ত্তমানে ব্যাস কর্ত্তৃক জাত। পরশুরাম ক্ষত্রিয়-বংশ ধ্বংস করিলে, ক্ষত্রিয়াগণ ব্রাহ্মণের ঔরসে পুত্রবতী হইয়াছিলেন। দীর্ঘতমা নামক অন্ধ বিপ্রের ঔরসে বলীরাজমহিষী সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরাদিও অন্যের ঔরসজাত, ইত্যাদি রূপ বহুল দৃষ্টান্ত থাকিতেও অর্জ্জুন এস্থলে কুলক্ষয় হইলে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইবে বলিয়া কেন আশঙ্কা করিতেছেন, এবং পিতৃকুল জল-পিণ্ডাভাবে নরকস্থ হইবেন ভাবিয়া কেনইবা কাতর হইতেছেন, এই আপত্তি উত্থাপন করিয়া, ঐ টীকাকার ঐ আপত্তির খণ্ডনে এইরূপ কহিতেছেন যে, উল্লিখিত দৃষ্টান্ত সকল অনুলোম-পদ্ধতি-* সম্মত। অনুলোমানুসারে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তান মাতৃ বর্ণাপেক্ষা নীচবর্ণ হয় না, এবং তৎকর্ত্তৃক পিতৃকুলের পিণ্ডদানের ব্যাঘাত হয় না; বিশেষতঃ ঐ সকল অনুলোম পদ্ধতি বিশেষ অবস্থায় শাস্ত্রসঙ্গত; তদ্রূপ স্থলে পুত্রার্থ ব্যতীত ইন্দ্রিয়লালসা উদ্দেশ্য নহে।

কিন্তু প্রতিলোমজ বিবাহ তদ্রূপ নহে; বিশেষতঃ বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অর্জ্জুন আশঙ্কা করিতেছেন যে, স্ত্রীগণ যদিচ্ছা বিহারানুরাগিণী হইয়া অনুলোম প্রভৃতি শাস্ত্র-বিহিত পদ্ধতির মস্তকে পদাঘাত করিবে। তাদৃশী যদিচ্ছা-ভোগনিরতা কামিনীগণের গর্ভে যে বর্ণসঙ্কর-উৎপত্তি হইবে, তদ্দ্বারা জাতিধর্ম্ম কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যাইবে।

বঙ্কিমবাবুও বর্ণসঙ্করের আপত্তি সম্বন্ধে এই বলেন যে, "৩৯ ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, এই পাঁচটী শ্লোক আধুনিক কৃতবিদ্য পাঠকগণের কাণে ভাল লাগিবে না; ইহা বর্ণসঙ্কর-বিরোধী প্রাচীন কুসংস্কার-পূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে। তার উপর "লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়া" প্রভৃতি অলঙ্কার আছে। বর্ণসঙ্করের উপর গীতাকারের বিশেষ বিদ্বেষ দেখা যায়; ইনি স্বয়ং ভগবানের মুখেও বর্ণসঙ্করের নিন্দা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আমরা যখন তদ্বিষয়িণী ভগবদুক্তির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব, তখন তদুক্তির তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করিব, এক্ষণে অর্জ্জুনোক্তির স্থূল মর্ম্ম বুঝিলেই যথেষ্ট হইল। কুলের পুরুষগণ মরিলে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হয়, ইহা সচরাচর দেখা যায়। কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে, তাহাদিগের গর্ভে নীচ লোকের ঔরসে সন্তান জন্মিতে থাকে; বংশ নীচ সন্ততিতে পরিপূর্ণ হয়, কাজেই কুলধর্ম্ম লোপ পায়। বর্ণসঙ্করে যাঁহারা দোষ না দেখেন এবং পিণ্ডাদির স্বর্গ-কারকতায় যাঁহারা বিশ্বাসবান নহেন, স্বর্গ-নরকাদিও যাঁহারা মানেন না, তাঁহারাও বোধ করি এতটুকু স্বীকার করিবেন; বাকীটুক কালোচিত ভাষা এবং অলঙ্কার। কথাটা অতি মোটা কথা বটে; কথা অর্জ্জুনের মুখে বসাইবার একটু কারণ আছে।

* উচ্চ বর্ণের ঔরসে নীচ বর্ণা স্ত্রীর গর্ভে যে সন্তান জন্মে, তাহাকে অনুলোমজ বলে, আর নীচবর্ণ পুরুষের ঔরসে উচ্চবর্ণা নারীর গর্ভে জাত সন্তানকে প্রতিলোমজ বলে।

অর্জ্জুনের এই "কুলধর্ম্ম" বড়াইয়ের উত্তরে ভগবান্ স্বধর্ম্মের কথাটা তুলিবেন, এইটুকু গ্রন্থকারের কৌশল। এই বর্ণসঙ্কর সম্বন্ধে (Thomson's translation of the Bhagavatgita P. 7.) দ্রষ্টব্য।

"The women, for instance, whose husbands, friends ro relations have been all slain in battle, no longer restrained by law seek husbands among other and lower castes or tribes, causing a mixture of blood, which many nations at all ages have regarded as a most serious evil, but particularly those who like the Aryans, the Jewes and the Scotch, were at first surrounded by foreigners, very different to themselves and thus preserved the destruction and yemologies of their races more effectively than any other."

কথাটা বড়ই গুরুতর। এক্ষণকার পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের অধিকাংশের মত এই যে, Inter marraige জাতীয় উন্নতির একটী প্রধান উপাদান। ঐ মতাবলম্বী হইয়া জনৈক বঙ্গীয় প্রধান কবি বাবু নবীনচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার "রৈবতক"এর উপসংহার "প্রভাস" নামক কাব্যে ব্যাসের মুখ দিয়া নিম্নোক্ত উক্তি করিয়াছেন, যথা—

"গাণ্ডীবীর, পরাভব যাদবী-হরণ,
সকলি তাঁহার লীলা মহিমা পূরিত,
দুই ভাবী ইতিহাস পার্থ! নিরুপম
এই দুই ঘটনায় হয়েছে সূচিত।
যাদবী-হরণ আশু হইয়া মিশ্রিত,
রক্ত আর্য্য অনার্য্যের—ব্যাপিয়া ভারত,
কিছু দিন পরে হবে কি শান্তি স্থাপিত,
ধর্ম্মরাজ্য ছায়াতলে আলোকি জগৎ।
দর্শনের বিজ্ঞানের নক্ষত্র অমর—
শান্তির আকাশে কত উঠিবে ভাসিয়া;
শিল্প-বাণিজ্যের কুঞ্জে পিক মধুকর
সাহিত্যের সঙ্গীতের, উঠিবে গাহিয়া।
আর্য্য অনার্য্যের রক্ত হইয়া মিশ্রিত
কত নব জাতি—কত সাম্রাজ্য মহান্,
করিবে সৃজন পার্থ! যুগ যুগান্তর।"
(প্রভাস ২২৬ পৃষ্ঠা)

ঐ কাব্যে উক্ত কবি সত্যভামা এবং শ্রীকৃষ্ণের মুখ দিয়া যথাক্রমে এই এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, যথা—

সত্যভামার উক্তি—

"কি বিদ্বেষে যাদবের কি হিংসা অনল
কক্ষে কক্ষে বক্ষে বক্ষে জ্বলে অনিবার।
এ অনলে সুরাপান করিছে আহুতিদান।
কি ভীষণ! নিরন্তর বিনা হৃষীকেশ,
নর নারী সুরাপানে মত্ত নির্ব্বিশেষ।
পরস্পর কি বিদ্বেষ, ব্যভিচার কি অশেষ!
পিতা-পুত্র পতি-পত্নী-পবিত্র বন্ধন
প্রবঞ্চনা ব্যভিচারে করেছে ছেদন॥

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—

"ভ্রমিয়া কহিলা দেব শান্তি অমঙ্গল,
সকলই মানবের নিজ কর্ম্মফল।
সেই কর্ম্ম-ফল-রেখা—উহাই অদৃষ্ট-লেখা,
মানব আপনি যদি না করে খণ্ডন,
কার সাধ্য সেই লেখা করিবে মোচন?
অধর্ম্মের যে উত্থান জ্বালাইল যে শ্মশান,
যে অধর্ম্ম যাদবের অস্থি-মাংসগত,
বহিতেছে শোণিতের সঙ্গে অবিরত।
এ অশান্তি অমঙ্গল জানিও তাহার ফল।

কেমনে নিবারি—কেন নিবারিব আমি ?
নহি যাদবের "আমি মানবের স্বামী"।

☛ বর্ণসঙ্কর সম্বন্ধে উপরোক্ত কবিতাগুলি—যাহা আমি ইতঃপূর্ব্বে সমালোচনা করিয়াছিলাম, তাহার কিয়দংশ এস্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিলে যথেষ্ট হইবে, যথা—

"তৎকালে যাদব-যাদবীগণের অত্যাচার, বিদ্বেষ, প্রবঞ্চনা ও ব্যভিচার প্রভৃতি পূর্ণ মাত্রায় অনুষ্ঠিত না হইলে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কখনও নিজ কুল-ধ্বংস নিবারণের চেষ্টা হইতে বিমুখ হইতেন না। যদি ঐ বঙ্গীয় কবির কথিত মত যাদবীগণের নীচ অনার্য্য-সংসর্গ ঘটিয়া থাকে, তবে তাহাদের স্বীয় কার্য্যের কর্ম্মফল*, যথা—"প্রসক্তা কাম ভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ" "ততো যান্ত্যধমাং গতিম্"।

যাহারা নরকের গন্ধ ভালবাসে, নরক তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া লয়। এস্থানে একপক্ষে কামাসক্তা পাপিনীদিগের পাপের দণ্ডভোগ, পক্ষান্তরে অনার্য্য পাষণ্ড তস্কর-গণের মধ্যে সর্ব্বভূতহিতকর উদার বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বা আর্য্য-সভ্যতার আলোক প্রবিষ্ট হইতে না পারায়, আর্য্য রমণীগণ পাপিনী হইলেও, তাহাদের সংসর্গে আর্য্য-সভ্যতার কিঞ্চিৎ আলোক তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং তাহাদের ঔরসে ঐ আর্য্য-রমণী-গর্ভজাত সন্তানগণ ক্রমে ক্রমে সভ্যতার সোপানে আরোহণ করিয়া, কাল-ক্রমে উন্নত হইয়াছেন; এই মন্তব্য অসত্য বলা যায় না। তাহা বলিয়া উপরোক্ত ব্যভিচার অবশ্য অনুমোদনীয় নহে; তবে অমঙ্গলের মধ্যে মঙ্গল এবং মঙ্গলের মধ্যে অমঙ্গল আছে। উপরোক্ত কার্য্য "ক্ষত্রিয় কুলের অবনতি—কিন্তু অনার্য্য কুলের উন্নতিবিধায়ক; অতএব উচ্চ ক্ষত্রিয় বংশের পক্ষে যাহা অমঙ্গল, নীচ অনার্য্য জাতির পক্ষে তাহাই মঙ্গল। ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে কি শূদ্রাণী বা বৈশ্যার গর্ভে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে যে সকল সন্তান জন্মে, তাহারা মাতৃ ও পিতৃ—উভয় কুলের গুণ ও ধর্ম্মের উত্তরাধিকারী হইতে পারে, এই জন্য অনুলোম বিবাহ তৎকালের সমাজে নিন্দনীয় ছিল না। নীচ কুল যাহাতে উন্নত ও পবিত্র হইয়া উচ্চ গুণ-কর্ম্মের অধিকারী হইতে পারে, ইহা কখনই অসঙ্গত নহে। ক্রমোন্নতিই যখন জগতের মৌলিক নিয়ম, তখন সর্ব্বনিয়ন্তা কখনই কাহারও উন্নতির পথ রুদ্ধকারী হইবেন না; তবে নীচ সংসর্গে উন্নতের নীচগামী হইতে না হয়, ইহার বিধান অবশ্যই কর্ত্তব্য। অর্জ্জুন ঐ আশঙ্কায় যুদ্ধ শ্রেয়স্কর নহে, এই সিদ্ধান্ত করিলেন।

কিন্তু অর্জ্জুনের কথিত কুলধর্ম্মাপেক্ষা যে স্বধর্ম্মপালন (duty) শ্রেয়স্কর, তাহা স্বয়ং ভগবানের উক্তিতে প্রকাশিত হইবে; তবে এস্থানে এই এক কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, সমাজে অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে এবং ধর্ম্মের স্থান অধর্ম্ম অধিকার করিলে,

* প্রকৃত পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের মাতা, পত্নী, কন্যা বা সহোদরা প্রভৃতি যে দস্যুহস্তে পতিত হন নাই, তাহা মৎকৃত সমালোচনায় বিশদ ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। প্রমাণগুলিও যুক্তিমূলক এবং ইতিহাস-সঙ্গত। শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র পত্নীর গল্প যে প্রক্ষিপ্ত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

তদাদর্শে বা তৎসংসর্গে মানব-সমাজ কলুষিত এবং নীচ হইতে ক্রমে নীচতর হইতে থাকে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। সুতরাং অধর্ম্ম ধ্বংস করিয়া, তৎস্থানে ধর্ম্মসিংহাসন সংস্থাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মরাজ্যের প্রতিষ্ঠাদ্বারা পতনোন্মুখ মানব-সমাজকে উত্তোলন করিয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন সুখ, উন্নতি ও মঙ্গল সাধন করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত; এবং যাঁহার বা যাঁহাদের উপর ঐ ভার ন্যস্ত হয়, তাঁহার ও তাঁহাদের ঐ মহৎ কার্য্য সংসাধন করাই স্বধর্ম্ম (duty) বলা যায়।

শ্রীশশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পুণ্যভূমি মিথিলা।

বঙ্গদেশের মহামান্য ছোটলাট সাহেব বাহাদুরের শাসনভুক্ত রাজ্যমধ্যে যে অংশের নাম সুবে বেহার, তাহারই একটি বিভাগের নাম ত্রিহুত; ত্রিহুতের যে অংশ গঙ্গাতীরবর্ত্তী সামেরিয়া ষ্টেশন হইতে জনকপুর তীর্থক্ষেত্র পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে, তাহারই প্রকৃত নাম মিথিলা। সংক্ষেপতঃ সমগ্র দ্বারভাঁগা জেলা এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কিয়দংশ স্থান পুণ্যভূমি মিথিলা নামে পরিচিত। রামায়ণ পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়, মিথিলার রাজাগণ চন্দ্রবংশ হইতে উৎপন্ন। চন্দ্রের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র পুরুরবা, পুরুরবার পুত্র শত্তাবর্ত্ত, শত্তাবর্ত্তের সন্তান স্বর্গ, স্বর্গের সন্তান শ্বেত এবং শ্বেতের সন্তান নিমি। কবি কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

"সকলে মিলিয়া নিমির মথিল শরীর।
তাহাতে জন্মিল পুত্র মিথি নামে বীর॥
সেই বসাইল এই মিথিলা নগর।
বীরধ্বজ কুশধ্বজ তাঁহার কুমার॥"

রামায়ণানুবাদক কবিগুরু কৃত্তিবাস অন্যত্রে লিখিয়াছেন—

"যে স্থানেতে বেদবতী ছাড়িলা জীবন।
সে স্থানে হইল দিব্য মিথিলা ভুবন॥"

(আদিকাণ্ড)

নানা কারণে ভারতের ইতিহাসে এবং হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রে মিথিলাপুরী অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রখ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছে। এই দেশে রাজর্ষি জনকের জন্ম, রাজত্ব, তপস্যা, সিদ্ধিলাভ, সীতার জন্ম, হরধনুভঙ্গ, রামের বিবাহ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত প্রখ্যাত ঘটনাসমূহ সংঘটিত হইয়াছিল। এতদঞ্চল বাস্তবিক অতি পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র।

আমরা কলিকাতা হইতে মিথিলা অঞ্চলে গমন করিয়াছিলাম। আমাদের পথে সর্ব্ব প্রথম দর্শনযোগ্য স্থানের নাম সমস্তীপুর। সমস্তীপুরে বাষ্পীয় শকট হইতে অবতরণ করিয়া আমরা যে দিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দলে দলে বাঙ্গালী বাবুকে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্য হইতে থাকি। "এখানে এত বাঙ্গালী কেন" একথা জিজ্ঞাসা করায় অবগত হইলাম যে, সমস্তীপুর ষ্টেশন এতদ্দেশীয় রেলওয়ে লাইনের সর্ব্বপ্রধান আড্ডা; বাঙ্গালী বাবুরা

রেলওয়ে কারখানার কেরাণী। ইঁহাদের সংখ্যা প্রায় ছইশত। সমস্তীপুর একটি ক্ষুদ্র মহকুমা, ইহা নগর বা নগরীর সমতুল্য নহে। কিন্তু রেলওয়ের কারখানা ও নীলের চাষের জন্য প্রায় সার্দ্ধ দুইশত ইংরাজ এই ক্ষুদ্র স্থানে বাস করেন। আমরা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে বাজারে প্রবেশ করিলাম; বাজারটি ষ্টেশন হইতে তিন মিনিটের পথ। বাজারে প্রবেশ করিয়া প্রথমে যাহা দেখিলাম, তাহাতে মনোমধ্যে বিশেষ কৌতুক ও আনন্দের উদয় হইল। দেখিলাম, বাজারের প্রথমাংশে এবং ষ্টেশনের দ্বারের অতি নিকটে কয়েক জন সুন্দরকায়, সুসভ্য পরিচ্ছদ-শোভিত এবং তরুণবয়স্ক বাঙ্গালী ভদ্র লোক একটি বৃহৎ দোকানে উপবেশন করিয়া স্বহস্তে মণ্ডা-মিঠাই-মুড়ি প্রভৃতি বিক্রয় করিতেছেন। ইঁহারা সকলেই সুশিক্ষিত, ধনবান, সম্ভ্রান্ত বংশের লোক এবং জাতিতে ব্রাহ্মণ। পরিচয়ে জ্ঞাত হইলাম, বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত কালনা মহকুমার নিকটবর্ত্তী একটি গ্রাম ইঁহাদের জন্মস্থান। ইঁহারা কহিলেন "যখন এদেশে রেলওয়ে, ডাকঘর, টেলিগ্রাফ ছিলনা, তখন আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ এতদঞ্চলে আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহারা স্বাধীন-প্রকৃতিক ছিলেন, সুতরাং চাকরী বা গোলামী করিয়া উদর পূরণ করিতে সম্মত হয়েন নাই। বহুকাল হইতে আমাদের এই দোকান চলিতেছে; এই দোকানের দৌলতে আমরা এখানে ও আমাদের জন্মস্থানে ভূসম্পত্তি খরিদ করিয়া ধনবান ও সম্ভ্রান্ত হইতে সক্ষম হইয়াছি।" কথা শুনিয়া প্রাণ শীতল হইল। সুদূর মিথিলা রাজ্যে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের স্বাধীন প্রকৃতির পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইলাম। অতি অল্প সময় পরেই শুনিলাম, সম্প্রতি একজন বাঙ্গালী কায়স্থ যুবা একটি দশ টাকা বেতনের চাকুরীর জন্য কলিকাতা হইতে দিল্লী গমন করিয়াছেন! ভাবিলাম, ইহা অপেক্ষা জাতীয় দুরবস্থার আর কি অধিক অধোগতি হইতে পারে? যে জাতির মধ্যে এতই দরিদ্রতা যে, উদরের এক মুষ্টি অন্নের জন্য—কেবল দশটি টাকার গোলামী জন্য—বাঙ্গালা দেশান্তর্গত কলিকাতা হইতে পঞ্জাব প্রদেশান্তর্গত দূরবর্ত্তিনী দিল্লী নগরীতে যাইতে হয়, ভাবিয়া দেখ দেখি, সে জাতির লক্ষ্মীশ্রীভ্রষ্টতার আর কি বাকি আছে? ধর্ম্মবলের হীনতা হইলেই ধনবল, বিদ্যাবল, দৈহিক বল প্রভৃতি সকল বলেরই হ্রাস হইয়া যায়। অধঃপতিত বাঙ্গালী হিন্দু আবার যদি কখনও উন্নতির সুখময় আসনে সমাবিষ্ট হইবার যোগ্য হয়, তাহাহইলে ধর্ম্মকেই বল ও ভরসা স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে; ইহাই ঋষিদিগের অভিমত এবং ইহাই সনাতন শাস্ত্রের অনুজ্ঞা।

আমরা সমস্তীপুরের পার্শ্বস্থ গণ্ডক নামক নদ পার হইয়া অপর তটে উপনীত হইলাম। নদের উপরে দুইটী লৌহ-সেতু আছে; একটীর উপর দিয়া বাষ্পীয় শকট গমনাগমন করে এবং অন্যোপরে মনুষ্য ও পশ্বাদি যাতায়াত করিয়া থাকে। গণ্ডক অতিক্রম করিয়া আমরা কয়েক ক্রোশ দূরবর্ত্তী আকবরপুর নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলাম। এই গ্রামের

পার্শ্বদেশস্থ প্রান্তরে এবং নানাবিধ তরুলতার মধ্যে, একটি সামান্য পর্ণকুটীরে এক মহাপুরুষ বাস করিতেছিলেন; তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবার জন্য, সেই গ্রামে আমরা উপনীত হইয়াছিলাম। এই মহাপুরুষের নাম "অলকৃঝলকৃসা;" ইনি হিন্দু, কি মুসলমান, এপর্য্যন্ত তাহা কেহ জানে না। "সা" উপাধি মুসলমান ফকিরের অন্যতম উপাধি, কিন্তু ইঁহার আচার ব্যবহার ঠিক হিন্দুর মত। অধিকন্তু, পঞ্জাব প্রদেশীয় একটি হিন্দু যুবক ইঁহার শিষ্য, তাঁহার নাম পরমানন্দ। যাহাহউক, লোকমুখে শুনিয়াছি, বৃটীশ বীরকেশরীগণ যখন রাজপুতানান্তর্গত ভরতপুরের সুপ্রসিদ্ধ দুর্গ আক্রমণ করেন, তখন ইনি ঐ দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছিলেন। ইতিহাসে পাঠ করা যায়, বৃটীশ সেনা, ভরতপুরের যুদ্ধে দুইবার পরাজিত, প্রহারিত, অপমানিত এবং প্রকৃষ্ট রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তাহার পরে, কি কারণ বশতঃ বলা যায় না, ইনি ভরতপুর পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছিলেন। অতি অল্পদিন হইতে, ইনি মিথিলা অঞ্চলে পুনরায় দৃষ্ট হইতেছেন। এই মহাপুরুষ সম্বন্ধে নানা লোকের মুখে নানা প্রকার অপূর্ব্ব কথা সমূহ শ্রবণ করা গিয়াছে, কিন্তু আমরা স্বচক্ষে কিছু দেখি নাই। ইঁহাকে লোকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে; হিন্দু ও মুসলমানগণ সমভাবে ইঁহাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিয়া থাকেন। অনেক জমিদার, শিক্ষিত, কর্ম্মচারী, রাজা, নবাব প্রভৃতি ইঁহাকে দর্শন করিতে এই ক্ষুদ্র স্থানে আগমন করেন। আশ্চর্য্য নিয়ম এই যে, ইঁহার সম্মুখে মনুষ্য উপস্থিত হইলেই, ইনি তাহাকে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন। কখনও কখনও তীব্রকটুবাক্য প্রয়োগ, ভয়-প্রদর্শন এবং প্রহারোদ্যোগ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। যে কেহ পালাইয়া যায়, অথবা অপমানিত বোধ করিয়া চলিয়া যায়, তাহার সহিত ইঁহার কোনও সম্পর্ক থাকে না, কিন্তু যে ভক্তপুরুষ তথায় কিছুতেই বিচলিতচিত্ত হয়েন না, তিনিই পরিণামে ইঁহার প্রসাদসুখসম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়েন। শুনা গিয়াছে, ইঁহার শ্রীমুখ হইতে যাহা কিছু আশীর্ব্বাদ রূপে নিঃসৃত হয়, তাহাই সত্বরে ফলদায়ক হইয়া থাকে।

আকবরপুর গ্রাম হইতে সমস্তীপুরে প্রত্যাগমন করিয়া, আমরা দ্বারবঙ্গ (দ্বারভাঁগা) নগরে গমন করিলাম। মিথিলা প্রদেশে দ্বারভাঙ্গা সর্ব্বপ্রধান দর্শনীয় স্থান। দ্বারভাঁগায় কিছু দিন অবস্থান না করিলে, মিথিলা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ হয় না। আমরা সর্ব্বপ্রথমে দ্বারভাঙ্গা শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে গিয়া বুঝিলাম, অগ্রে "ত্রিহুত" (Tirhoot) শব্দের মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। মিথিলার ইতিহাসে লিখিত আছে, রাজা দশরথ পুত্রকামনায় ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনিয়া যজ্ঞ সমাধা করিবার পরে, যখন ব্রাহ্মণ দিগকে "দক্ষিণা" দিতে অগ্রসর হয়েন, তখন ব্রাহ্মণগণ কহিয়াছিলেন "আমরা ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও দান গ্রহণ করি না, সুতরাং ক্ষত্রিয়ের দান

অগ্রাহ্য"। যজ্ঞ সমাপন করিয়া ব্রাহ্মণকে দান ও দক্ষিণা না দিলে যজ্ঞ বৃথা হয়, ইহাই শাস্ত্রোক্তি, অতএব রাজা দশরথ মহাচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া গুরুপদ ধ্যান করিতে লাগিলেন। ঘটনা ক্রমে তিন জন ব্রাহ্মণ আসিয়া দান ও দক্ষিণা গ্রহণ করিলেন। এই তিন জন বিপ্র দান গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া সরযু নদীর অপরপারে দূরীকৃত হইয়াছিলেন। এই তিন ব্রাহ্মণ সরযু পার হইয়া যে স্থানে বাস করেন, তাহার নাম হয় "ত্রিহোতা"। 'ত্রি' অর্থে তিন; 'হোতা' অর্থে (যজ্ঞে) আহুতিদাতা অথবা পুরোহিত। ত্রিহোতা শব্দ অপভ্রংশে ত্রিহুত নামে উচ্চারিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ তিনজন শর্ব্বরীকালে (রাত্রে) নদী পার হইয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহাদের বংশধরগণ আজি পর্য্যন্ত "শর্ব্বরীয়া ব্রাহ্মণ" নামে প্রখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন। ঐ তিনজন হোতার মধ্যে একজনের নাম শুকপতি, অপর দুইজনের নাম পাওয়া যায় নাই। অতঃপর দ্বারভাঁগার কথা লিখিব। যাহাকে আমরা দ্বারভাঁগা বলি, তাহার প্রকৃত নাম দ্বারবঙ্গ (The Door of Bengal)। পূর্ব্বকালে নেপাল হইতে গঙ্গাতটবর্ত্তী হাজিপুর পর্য্যন্ত নেপালাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের অধিকারভুক্ত ছিল। সে সময়ে তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি স্থান হইতে বঙ্গদেশে আসিতে হইলে, যে স্থান দিয়া আসিতে হইত, তাহাই ক্রমে "দ্বারবঙ্গ" (Darbhanga) নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। হাজীপুরে গঙ্গাতটে রামচৌরা ঘাটের নিকটে "নেপালী বাংগলো" এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তথায় যে সকল আম্রবৃক্ষ আছে, তাহা এখনও নেপালের রাজার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য; ঐ গাছ সমূহের ফল বিক্রয় হইয়া যে মূল্য পাওয়া যায়, বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তাহা নেপাল মহারাজ সমীপে প্রেরণ করিয়া থাকেন। মুসলমানেরা কখনও নেপাল আক্রমণ করেন নাই, কিন্তু মুসলমান সেনার সহিত নেপাল রাজার সমর সংঘটন হইবার উপক্রম হওয়ায়, যে সন্ধি স্থির হয়, তদনুসারে সমগ্র দ্বারভাঙ্গা জেলা মুসলমানের হস্তগত হয়। তদনন্তর ইংরাজগবর্ণমেণ্ট মুসলমানকে পরাস্ত করিয়া, সমগ্র বিহার, বৃটীশ রাজার শাসনভুক্ত করেন। মুসলমান শাসনকালের প্রাথমিক সময়ে, যে সকল পাঠান দ্বারবঙ্গে বসতি করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে "খাঁ সাহেবের বংশ" সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম, ঐ পুরাতন বংশ এখনও বর্ত্তমান আছে। হিন্দুর সহিত যবনের যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে লিখিত ছিল "হিন্দুরা মুসলমান-ধর্ম্মের উপর কিম্বা মুসলমানেরা হিন্দু-ধর্ম্মের উপর অত্যাচার করিতে অধিকারী হইবে না"। কিন্তু, ধর্ম্মবিষয়ে মুসলমানেরা চিরকালই যেরূপ অত্যাচারী ও অনুদার, দ্বারভাঙ্গাতে তাহারা সেইরূপ। এই সময়ে ধনীরাম মাহাতা নামে এক ক্ষত্রিয় এখানে বাস করিতেন। মুসলমানদিগের খাঁ সাহেবেরা যেমন প্রাচীনতম, হিন্দুর মধ্যে মাহাতা বংশ তেমনি প্রাচীনতম এবং সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান্ ছিল। মুসলমানেরা গোহত্যাদি অশান্তির কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হওয়ায়, হিন্দু ও মুসলমানে ঘোরতর লড়াই উপস্থিত

হয়। এই লড়াইয়ে হিন্দুগণ কর্ত্তৃক অসংখ্য মুসলমান নিহত হয়, এবং সমগ্র দ্বারভাঙ্গা যবনরক্তে আপ্লুত হইয়া যায়। হিন্দুরা ম্লেচ্ছদিগকে সম্পূর্ণ রূপে পরাজিত করিয়া, মুসলমানদিগের বহু সংখ্যক কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে একটা বৃহদাকার পুরাতন মশ্‌জীদ ভিন্ন দ্বারভাঙ্গায় মুসলমানশাসনসাময়িক আর কোনও কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সময়ে হিন্দু ও মুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে হিন্দুরা এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, তন্মধ্যে "ম্লেচ্ছমর্দ্দিনী" নামে ভগবতীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ অতীব পুরাতন মন্দির, এবং ঐ মূর্ত্তি, দ্বারভাঙ্গায় আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভারতবর্ষে আর কোনও স্থানে এই নামের দেবীমূর্ত্তি নাই; এই দৃশ্য বাস্তবিক অত্যন্ত বীররসের উদ্ভাবক। দ্বারভাঙ্গার ভক্ত হিন্দুরা, আজিও মহাভক্তি সহকারে এই ম্লেচ্ছমর্দ্দিনী দেবীর পূজা করিয়া থাকেন; তাঁহারা যখন 'মা' 'মা' রবে দেবীর মন্দির প্রতিধ্বনিত করেন, তখন নগরের মুসলমান দিগের হৃদয় আতঙ্কে পরিপূর্ণ হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

শ্মশান।

শ্মশান, কে বলে তোমা ঘৃণিত অসার?
পবিত্র তোমার সম কে আছে ধরায়?
মহা-দার্শনিক তুমি নর-জগতের;
দেখিতেছ অবিরাম, দেখা'তেছ হায়!
জগতের—মানবের—দগ্ধপরিণাম!
দেখা'তেছ কতক্ষুদ্র শক্তি, অহঙ্কার,—
—অসার প্রলাপ;—অনন্ত আঁধার মাঝে,
কতক্ষীণ জীবনের আলোক-সঞ্চার!
অপার সংসারচিন্তা,—পাষাণের রেখা—
মুছে যায় পরশে তোমার; অবিকৃত
পাপের পিপাসা,—জ্বলন্ত অনলশিখা,-
শীতল সলিলে তব হয় নির্ব্বাপিত।
মহাসাম্য সংস্থাপক, এ বিশ্ব মাঝারে,
নাহিক তোমার সম; অনলে তোমার,
লঘুগুরু ভেদ জ্ঞান চ'লে যায় দূরে;-
দাম্ভিকতা, অহঙ্কার—রহে নাকো আর।
সুপবিত্র শিক্ষাস্থান তুমি সর্ব্ব দেশে;
নিশিদিন মহাসত্য করিছ প্রচার।
তোমার মহিমা হায়, সে বুঝিবে কিসে,
স্বার্থচিন্তা নিরবধি হৃদয়ে যাহার।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বি এ।

অদৃষ্ট দেশভেদে জন্মের হেতু।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

৩৩। বিষ্ণুপুরাণ ২ অং ৩ অধ্যায়ে আছে।

উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রে শ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥
নবযোজনসাহস্রো বিস্তারোঽস্য মহামুনে।
কর্ম্মভূমিরিয়ং স্বর্গমপবর্গঞ্চ গচ্ছতাম্॥

যে বর্ষ, সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয়ের দক্ষিণ দিকে আছে, তাহার নাম ভারতবর্ষ।

এইস্থানে ভরতবংশীয়েরা প্রচুর রূপে বাস করেন। মহর্ষে! এই বর্ষ নবসহস্র যোজন বিস্তৃত, যাঁহারা স্বর্গ ও মোক্ষরূপ ফলভোগ করেন, এই স্থানটী তাঁহাদের কর্ম্মভূমি স্বরূপ। অপরঞ্চ—

অতঃ সম্প্রাপ্যতে স্বর্গো মুক্তিমস্মাৎ প্রয়ান্তি বৈ।
তির্য্যক্ত্বং নরকঞ্চাপি যান্ত্যতঃ পুরুষা মুনে॥
ইতঃ স্বর্গশ্চ মোক্ষশ্চ মধ্যশ্চান্তশ্চ গম্যতে।
নখল্বন্যত্র মর্ত্ত্যানাং কর্ম্ম ভূমৌ বিধীয়তে॥

লোক এই স্থান হইতেই স্বর্গ, এবং এইস্থান হইতেই মুক্তি লাভ করে। এই স্থান হইতেই নরকে, বা তির্য্যগ্‌যোনিতে গমন করিয়া থাকে। লোকে এইস্থান হইতেই স্বর্গলোক, এই স্থান হইতেই মোক্ষ-পদ, এইস্থান হইতেই অন্তরীক্ষ-লোক এবং এইস্থান হইতেই পাতাল লোক প্রাপ্ত হয়। কারণ ভারতবর্ষ ব্যতীত অন্য কোন স্থান মনুষ্যের পক্ষে কর্ম্মভূমি নহে; অর্থাৎ অন্য কুত্রাপি বৈদিক যাগাদিকর্ম্মের ব্যবস্থা নাই। অপিচ।

চত্বারি ভারতে বর্ষে যুগান্যত্র মহামুনে।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চান্যত্র ন কচিৎ॥
তপস্তপ্যন্তি মুনয়ো জুহ্বতে চাত্র যজ্বিনঃ।
দানানি চাত্র দীয়ন্তে পরলোকার্থ মাদরাৎ॥

এই ভারতবর্ষেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই চারি যুগ। অন্য কোন বর্ষে এরূপ যুগভেদ নাই। এখানে মুনিগণ তপস্যা করেন, যাগশীল ব্যক্তিরা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, এবং এইখানেই পরলোকার্থ আদর পূর্ব্বক নানাবিধ দান প্রদত্ত হইয়া থাকে।

অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা ততোঽন্যা ভোগভূময়ঃ॥
অত্রজন্ম সহস্রানাং সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্ম্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥

মহামুনে! জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই পরলৌকিক কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই কর্ম্মভূমি, অন্যান্য সমুদয় স্থান ভোগভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। সাধো! প্রাণিগণ সহস্র সহস্র জন্মের পর, কদাচিৎ পুণ্যবলে এই ভূমিতে মানব-জন্ম লাভ করিয়া থাকেন।

৩৪। ভারতবর্ষের এই সকল প্রশংসা অর্থবাদ নহে। ইহার মধ্যে গভীর সত্য নিহিত আছে। সকলেই দেখিতেছেন যে, অন্যান্য বর্ষের লোকেরা কেবল ভোগ সুখেই উন্মত্ত, কিন্তু ভারতবাসীগণ ধর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান সাধনে বিব্রত। এই সকল অনুষ্ঠানে এতদুর নিষ্ঠা বহুজন্মের সুকৃতির ফল, এবং বিধাতার নিয়মে ভারতই একমাত্র সেই অনুষ্ঠানের ভূমি।

৩৫। বহুলোকের সুকৃতি সমষ্টি দ্বারা, স্বয়ম্ভু বিধাতার প্রসাদে, ভারতভূমি ও ভারতসমাজ এবং ভারতীয় জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিরচিত হইয়াছে। ধর্ম্মের গুণে ভারত-বাসিরা দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা যেমন সরলহৃদয়ে, নিঃসন্দেহচিত্তে, জলে—স্থলে—অন্তরীক্ষে, জীব—মৃত্তিকা—পাষাণ-বক্ষে, গ্রহতারাচন্দ্রতপনে, পর্ব্বতে—অরণ্যে, মেঘে—বর্ষণে, সর্ব্বাবস্থায় ভগবানের জীবন্ত জলন্ত বিভুতি সকল দেখিতে পান, অন্যবর্ষীয় লোকদিগের সে চক্ষু নাই। ধর্ম্মের বলে মৃত্যুর পরেই, ভারতবাসীদিগের স্বর্গলাভ,

মুক্তি, বা জন্মান্তর পরিভ্রমণ হইয়া থাকে। জন্মান্তর পরিভ্রমণ ও কর্ম্মক্ষয়দ্বারা ক্রমে বৈরাগ্য জন্মে ও মুক্তি হয়। কিন্তু অন্য-বর্ষে সে নিয়ম নাই। বিশেষতঃ মুসলমান, ইহুদী, খৃষ্টান প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতি সকলকে, ভগবান্ যে সকল ধর্ম্মপুস্তক প্রদান করিয়াছেন, তদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, উক্ত সম্প্রদায় সকল মৃত্যুর পরেই স্বর্গ বা মুক্তিলাভের অধিকারী নহেন, এবং জন্মান্তর ভ্রমণ দ্বারাও শীঘ্র শীঘ্র ভোগ সমাধা করিতে পারেন না।

৩৬। যে যত ভোগী, সে তত রোগী। তাহার তত বিশ্রামের প্রয়োজন। আহার বিহার অল্প কর, আলস্য জয় করিতে পারিবে। অধিক করিলে, মৃতদেহসমান ঘোর নিদ্রাতে বা রোগে অভিভূত হইবে। ভোগরূপ অপার বিলাস হইতে মুক্তিলাভের পক্ষে যাঁহাদের সুকৃতি নাই, তাঁহারাই ঈশ্বরের নিয়মে আরব্য, তুরস্ক, ইউরোপ প্রভৃতি ভোগভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন। সে ভোগক্ষয় অল্পে হয় না। মৃত্যুর পর তাঁহাদের ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিশিষ্ট ভোগময় আত্মার, ভোগজনিত দীর্ঘবিরামরূপ মহা সুষুপ্তির প্রয়োজন। এইজন্য তাঁহারা স্বীয় স্বীয় শাস্ত্রানুসারে, মৃত্যুর পর অন্তিম কল্পান্ত পর্য্যন্ত, স্ব স্ব কবর গহ্বরে অবান্তর মৃত্যুশয্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সেই কল্পান্ত-সময়ে, তাঁহাদের নিমিত্ত একটী মহাবিচার-দিন উপস্থিত হয়। সেই দিন তাঁহারা দীর্ঘ নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করেন। তখন যাঁহাদের পাপের ভাগ বেশি, তাঁহারা চির-যন্ত্রণাভোগার্থ নরকে নিক্ষিপ্ত হন। আর যাঁহাদের পুণ্য বেশি, তাঁহারা স্বর্গে যাইবার অনুমতি পান। সে স্বর্গ এক প্রকার কর্ম্মোপভোগের স্থান মাত্র। এই উভয় বিধ ভোগের অন্ত নাই। ইহাকে "রোজ-কেয়ামত" কহে। অর্থাৎ শেষ দিনের চিরস্থায়ী হুকুম। কায়মী বন্দোবস্ত। পৃথিবীতেও যেমন তাঁহাদের কামনার অন্ত নাই ও ভোগের শেষ নাই, স্বর্গ ও নরকেও সেইরূপ তৎফলভোগের ক্ষয় নাই। সুতরাং পুনরাবর্ত্তনশীল স্বর্গীয় গতি, এবং সগুণ বা নির্গুণ কোন প্রকার মুক্তির—তাঁহারা অধিকারী নহেন। তাঁহাদের শাস্ত্রেও তাহার কোন ব্যবস্থা নাই। তাহা না থাকার কারণ এই যে, যত ভোগীরোগীর নিমিত্ত বিধাতাকর্ত্তৃক তাঁহাদের বাসভূমি, সমাজ ও শাস্ত্র সকল রচিত হইয়াছে। সে সকল দেশ ও সমাজের পক্ষে, স্বর্গসাধন দেবার্চ্চনাদি যজ্ঞ, এবং মুক্তিসাধন বৈরাগ্য, যোগ ও ব্রহ্মজ্ঞান শোভা পাইবে না জানিয়াই বিধাতা তাহার ব্যবস্থা দেন নাই। তাহাতে বিধাতার দোষ নাই। সেই ভোগীরোগীগণের সমষ্টি অদৃষ্টই তাহার উপাদান।

৩৭। কিন্তু তাদৃশ ভোগাড়ম্বরের মধ্যে থাকিয়া, যে মহাত্মারা বিরক্তি বোধ করেন, এবং তাহা হইতে মুক্তিলাভের নিমিত্তে সতৃষ্ণ হন, সে অবস্থায় হিন্দুধর্ম্মের মর্ম্ম জানা থাকিলে, স্বভাবতঃ তাঁহাদের মন হিন্দুধর্ম্মেরই পক্ষপাতী হইয়া থাকে। ভগবানের এমনি আশ্চর্য্য নিয়ম যে, তাদৃশ মহাত্মাদের হৃদয় হিন্দুধর্ম্মাশ্রয়ে আগ্রহান্বিত হইবা মাত্রেই ভারতে হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণের নিমিত্ত তাঁহাদের অদৃষ্ট প্রস্তুত হয়। সেই অদৃষ্ট কালেতে পুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষে হিন্দুবংশে জন্মদান করে।

৩৮। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে জেনেরেল ষ্টুয়ার্ট নামক একজন বৃটীশ সেনাপতি স্বরচিত হিন্দুদিগের পক্ষসমর্থক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যথা—

"To India then as the source of this glorious doctrine let us return with becoming reverence, and pay due homage at the Shrine of that profound genius which unfolded this great truth (Immortailty of the Soul) and divesting our minds of unworthy prejudices of education, ever hostile to improvements, let us contemplate with awe and with respect that remote period when this Sublime tenet with its manifold system of Theology and Sceince irradiated the Eastern Hemisphere and exhibited the pious Brahmin as the most enlightened of the Human race ; * * that remote period in which, our savage ancestors were perhaps, unconscious of a God ; and were doubtless, strangers to the glorious doctrine of the immortality of the soul, first revealed in Hindoostan" (Vindication of the Hindoos by a Bengal officer 1808 London.)

"যে ভারতবর্ষ 'মানবের আত্মা অমর' এই উজ্জ্বল সিদ্ধান্তের আকর-স্থান, এস, আমরা সেই ভারতের প্রতি নম্রতা পূর্ব্বক শ্রদ্ধা প্রকাশ করি, এবং তথা যে মহাত্মা ঐ পরমসত্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার পবিত্র সমীপে উপযুক্ত পূজা প্রদান করি। যে বিদ্যাভিমান উন্নতির চির-বিরোধী— তাহা হইতে আমরা মনকে উদ্ধার করিয়া, সেই প্রাচীন কালকে গম্ভীরভাবে ও ভক্তি-পূর্ব্বক ধ্যান করি—যে কালে উক্ত মহোচ্চ সিদ্ধান্ত, নানা ধর্ম্ম-মত ও দর্শন-শাস্ত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া, পূর্ব্বদিকের গগন-মণ্ডলকে আলোকিত করিয়াছিল, এবং তৎকালীন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-কুলকে পৃথিবীর সমগ্র মানব-সমাজের মধ্যে পরমোজ্জ্বল-জ্ঞান-সম্পন্ন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিল—যে কালে আমাদের অসভ্য বন্য পূর্ব্বপুরুষগণ সম্ভবতঃ ঈশ্বর-জ্ঞান-শূন্য ছিলেন, এবং আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে যে উজ্জ্বল মত সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তৎপক্ষে নিশ্চয়ই অজ্ঞ ছিলেন।"

৩৯। অপরঞ্চ, পাদ্‌রী মরিস্‌ ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে স্বীয় ভারতীয় প্রাচীন তত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়াছেন যথা—

"Mr. Forbs, of Stanmore-Hill, in his elegant musuem of Indian rarities, numbers two of the bells that have been used in devotion by the Brahmins. They are great curiosities, and one of them in particular appears to be of very high antiquity, inform very much resenbling the cup of the lotus and the tune of it uncommonly soft and melodious. I could not avoid being deeply affected with the sound of an instrument which had been actually employed to kindle the flame of that superstition which I have attempted so extensively to unfold my transported thoughts ravelled back to the remote period when the Brahmin religion blazed forth in all its splendour the caverns of Elephanta ; I was for a moment, entranced, and caugh the ardour of enthusiasm. A tribe of venerable priest, arrayed in flowing stoles and decorated with high tiaras, seemed assembled arohnd me ; the mystic song of initiation vibrated in my ear ; I breathed an air fragrant with the richest perfumeds ; and contemplated the deity in the fire that symbolished him" (Maurice on Indian Antiquilies Vol V. P. 532-1806.*

ষ্টানমুর্‌হিলনিবাসী ফরবস সাহেবের একটি সুন্দর চিত্রশালিকায় ভারতীয় দুর্লভ প্রাচীন দ্রব্য সকল সংগৃহীত আছে। তন্মধ্যে

*For reply and remarks, if you like, read at P. P. 305 to 310 Wards account of the Hindoos Vol I 1811.

দুইটী ঘণ্টা দৃষ্ট হয়। সে দুটী অতি চমৎকার! তাহার একটি বিশেষরূপে অতি-প্রাচীন কালের বলিয়া বোধ হয়। তাহার আকার অনেকটা পদ্মকলিকলিকার সদৃশ, তাহার ধ্বনি অতি মিষ্ট ও মনোহর। যে দেবার্চনার বিবরণ আমি বিস্তারিতরূপে লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার উৎসাহ-অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার নিমিত্তে উক্ত ঘণ্টা সত্য সত্য নিনাদিত হইত। তাহা মনে করিয়া, আমি উক্ত চিত্রশালিকায় তাহার রব শ্রবণে মোহিত না হইয়া থাকিতে পারিলামনা৷ যে আদি কালে ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম মহারাষ্ট্রদেশের গিরিগহ্বরে মহা-সমারোহে প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, আমার আনন্দবিস্মিত মন তৎক্ষণাৎ সেই আদি কালের ধ্যান নিমগ্ন হইল। আমি ক্ষণকাল স্পন্দরহিত হইলাম। আমার বোধ হইল, যেন পূজনীয় প্রবৃদ্ধ ঋত্বিকগণ সুদৃশ্য উত্তরীয় ও মস্তকাভরণ ধারণ পূর্ব্বক আমার সম্মুখে সমবেত হইয়াছেন। তাঁহাদের মন্ত্রময় গীত যেন আমার কর্ণপুটে প্রবেশ করিল। আমি যেন তথাকার মনোহর গন্ধপুষ্পের আঘ্রাণ পাইলাম, এবং ঈশ্বরের মূর্ত্তিস্বরূপ সম্মুখের যজ্ঞীয় অগ্নিতে ভগবানকে ধ্যান করিতে লাগিলাম।

৪০। সে দিন লুইস্ জ্যাকোলিয়ট সর্ব্ব-বর্ষোত্তম ভারতপ্রেমে হৃষ্ট হইয়া, স্বরচিত বাইবেল বিষয়ক পুস্তকে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এইরূপ মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যথা—

Soil of ancient India, cradle of humanity hail! Hail venerable and efficient nurse whom centuries of . . inrasions have not yet buried under the dust of oblivion! Hail father land of faith of love, of poetry and science. May we hail a revival of thy past in our Western future (Bible in India by M. Louis Jacolliot.—London 1870)

হে প্রাচীন ভারতভূমি! হে মানবের আদি প্রতিপালিকে! তোমাকে আরাধনা করি। হে পূজনীয় সুনিপুণধাত্রিস্বরূপিণি! শত শত বর্ষের বিজাতীয় আক্রমণ তোমাকে অদ্যাপি বিলুপ্ত করিতে পারে নাই। হে ধর্ম্ম, প্রেম, কাব্য ও পারমার্থ শাস্ত্রের জননি! তোমার পূজা করি॥ সকাতরে প্রার্থনা করি, যেন উত্তর কালে আমাদের পাশ্চত্য রাজ্যে তোমার প্রাচীন জ্ঞান ধর্ম্ম পুনর্ব্বিকশিত হয়।

৪১। হে সাধো! এই সকল ভিন্ন-বর্ষীয় ভারত-প্রেমিক মহাত্মাদিগের প্রেম, বাসনা, তৃষ্ণা, ব্যাকুলতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা চিন্তা-পূর্ব্বক বলদেখি—যে, বিধাতা পুরুষের লেখনী তাঁহাদের ললাটে কোনবর্ষে ও কোন বংশে তাঁহাদের পুনর্জ্জন্ম লিখিয়াছেন? যিনি বাঞ্ছাকল্পতরু, জগদ্‌গুরু, ও শুভপ্রার্থনার ফলদাতা, তিনি কি তাঁহাদিগকে হিন্দুকুলে জন্মদিয়া প্রকৃতরূপে ভারতের জ্ঞান ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি দেখাইবেন না! ঐ সকল মহাত্মা-দিগের ভারতীয় জ্ঞান-ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রার্থনা যতদিন পূর্ণ না হইবে, ততদিন তাঁহাদের স্বর্গভোগ হওয়াও যন্ত্রণা। সুতরাং স্ব স্ব বাসনা বিরচিত অদৃষ্ট বলে, শ্রীহরির প্রসাদে তাঁহারা অবশ্য ভারতে বিশিষ্টহিন্দুকুলে জন্ম লাভের অধিকারী। কোন দেশের মনুষ্য এইরূপে হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে মুক্তির সোপান প্রাপ্ত হইবেন না, ইহা অশাস্ত্র নহে। সেই মুক্তির পথে—হিন্দু-ধর্ম্ম—কবাট বন্ধ করিয়া রাখেন নাই। কেন না, যিনি স্ব স্ব জাতীয় ধর্ম্মসাধন দ্বারা ক্রমে সেই ধর্ম্মের প্রতি বৈরাগ্যোপার্জ্জন পূর্ব্বক সেই বৈরাগ্যরূপ সৌভাগ্য বলে হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় কামনা করিবেন, তিনি অবশ্যই হিন্দু শাস্ত্রের নিয়মাধীনে আসিয়া ভারতে জন্মগ্রহণ করিবেন। সুতরাং তাদৃশ সকল ব্যক্তির নিকটেই ভারতীয় শাস্ত্রোক্ত মোক্ষ-পথ উক্ত নিয়মে অবারিত আছে। নতুবা যে ব্যক্তি ভোগে উন্মত্ত, বৈরাগ্যবিহীন,

তাহার পক্ষে ঐপথ অবারিত থাকা সম্ভব নহে। কারণভোগও অভিমানই তাহার প্রতিবন্ধক।

৪২। সেই মুক্তিলাভের প্রথম সোপান ভারতে জন্মগ্রহণ। দ্বিতীয় সোপান ব্রাহ্মণ-কুলে জন্মগ্রহণ, এবং তৃতীয় সোপান ব্রাহ্মণ-যোগী অথবা সন্ন্যাসপরায়ণ ব্রহ্মবিৎ ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মলাভ। কিন্তু যেমন, ভারতে জন্ম ব্যতীত উপর্য্যুপরি কোন সোপানই লাভ হয় না,—(কেননা, অন্যবর্ষে ব্রাহ্মণও নাই, যোগীও নাই, ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয়ও নাই।) সেইরূপ ভারতে জন্মিয়া ভারতীয় ধর্ম্মে, বেদাগমবিহিতরূপে, সুদৃঢ়ভাবে গুরুদেব কর্ত্তৃক দীক্ষিত না হইলে কোন ফল হয় না। কেননা, তাদৃশ লক্ষণাক্রান্ত ধর্ম্ম, ও তৎসঙ্গে আগম ও স্মৃতিবিহিত শিষ্টাচার পালন জন্যই ভারতের প্রতিষ্ঠা। মনুষ্যের তো কথাই নাই, দেবতারা পর্য্যন্ত মুক্তির প্রার্থী হইলে, ভারতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। কেননা, যে নিয়মাধীনে অন্যান্যবর্ষীয় লোকদিগের মর্ত্ত্যপুরীর সুখভোগ ও বিদ্যানন্দ সকল মুক্তির বাধ স্বরূপ, সেই নিয়মেই সুরপুরীর দেবসেব্য সুখভোগসমূহ দেবতাদের মুক্তি-পথের প্রতিবন্ধক বিশেষ। কিন্তু ভোগক্ষয় ব্যতীত মুক্তির অধিকার হয় না। এজন্য যে সকল স্বর্গবাসী দেবগণ, মুক্তির মর্ম্ম জানেন, তাঁহারাও উপরি উক্ত ভারত-প্রেমিক অন্যবর্ষীয় মহাত্মাদের ন্যায় ক্রমে সুখভোগে বিরক্ত হইয়া, মোক্ষকামনায় এই রূপ গান করিয়া থাকেন।

"গায়ন্তি দেবাঃ কিলগীতকানি। ধন্যাস্তু তে ভারত ভূমিভাগে। স্বর্গাপবর্গাস্পদমার্গ-ভূতে, ভবন্তিভূয়ঃ পুরুষাঃ সুরত্বাৎ॥ কর্ম্মাণ্য-সঙ্কল্পিত তৎফলানি; সংন্যস্য বিষ্ণৌ পর-মাত্মভূতে। অবাপ্য তাং কর্ম্ম মহীমনন্তে—তস্মিল্লয়ং যেত্বমলাঃ প্রয়ান্তি॥ জানীম নৈতৎ ক্বয়ং বিলীনে, স্বর্গপ্রদে কর্ম্মণি দেহবন্ধনে। প্রাপ্স্যামঃ ধন্যাঃ খলুতে মনুষ্যা, যে ভারতে নেন্দ্রিয়-বিপ্রহীনাঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ ২ অং ৩ অং।)

"দেবগণ এইরূপ গান করেন। ভারত-বর্ষীয় লোকেরা দেবগণ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং ধন্য, কারণ তাঁহাদের জন্মভূমি ভারতভূমি স্বর্গ ও অপবর্গ লাভের আস্পদ। নির্ম্মল নিষ্পাপলোকেরা এই কর্ম্মভূমিতে জন্ম পরি-গ্রহ পূর্ব্বক, ফলকামনার সন্ন্যাস করত যে সকল ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাহা পরমাত্মা অনন্ত বিষ্ণুতে সমর্পণ করিয়া তাঁহাতে বিলীন হন। আমরা ইহা বলিতে পারি না যে, কবে আমাদের স্বর্গপ্রদ পুণ্যক্ষয় হইবেক, এবং কবে আমরা ভারতবর্ষে জন্ম পরিগ্রহ করিব। কারণ, যাঁহারা সমুদয় ইন্দ্রিয়সৌষ্ঠব দেহ সহকারে ভারতবর্ষে জন্ম লাভ করিতে পারেন তাঁহারাই ধন্য।"

৪৩। অতএব হে ভারতবাসিগণ! শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ধ্যান কর; ভিন্নবর্ষীয় সাধুদিগের রোদন শ্রবণ কর; এবং দেবতাদের গান হৃদয়ঙ্গম কর। এই সকল হৃদয়ঙ্গম পূর্ব্বক ভারতধর্ম্মে বিধিবিহিতরূপে দীক্ষিত হও। ভগবানের নিত্য সেবাকর। পর্ব্বে পর্ব্বে প্রচ-লিত প্রতিমা-উপলক্ষিত পুরাণতন্ত্র বিহিত ঈশ্বর ও ঈশ্বরীগণের অর্চ্চনা-যজ্ঞ কর। সর্ব্ব কর্ম্ম তাঁহাদের পাদপদ্মে সযতনে অর্পণ করত, ভারতীয় কর্ম্ম ও কর্ম্মভূমির মর্য্যাদা রক্ষাকর, এবং ধীরে ধীরে মুমুক্ষুত্ব উপার্জন কর। শাস্ত্রের সারতাৎপর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার বন্ধন মুক্ত কর। মোক্ষমার্গ পরিষ্কার কর এবং আত্মজ্ঞান সহকারে মুক্তির অভিন্ন স্বরূপ পরমাত্মভূত ভগবানকে লাভ পূর্ব্বক, স্বীয় স্বীয় তাপিত প্রাণ শীতল করত ভারত মাতার আনন্দবর্দ্ধন কর।

শ্রীচন্দ্রশেখর বসু
নিবাস উলা।

প্রাপ্তিস্বীকার।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

৩৪২০	বাবু অক্ষয়কুমার পণ্ডিত	১০		৯৭৮	বাবু যাদবচন্দ্র বসু	১০
১৯৯৭	,, মহিধর ভুয়া ফৌজাদার	,,		১০৩৯	,, যজ্ঞেশ্বর ভৌমিক	,,
২৪৮৫	,, দীনেশচন্দ্র রায়	,,		১১৬৩	মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ	,,
৩০৭৯	,, যদুনাথ রায়	,,		১২৩৫	বাবু কৈলাশচন্দ্র চটোপাধ্যায়	,,
৩২৯৩	,, কৃষ্ণকিশোর ভট্টাচার্য্য	,,		১৩৪২	,, কৈলাশচন্দ্র দত্ত	,,
২৬৪১	,, রামদাস বন্দোপাধ্যায়	,,		১৪০১	,, ললীতমোহন পাল চৌধুরী	,,
২২৬৪	,, ত্রিধারাচরণ ভট্ট	,,		১৪৪৩	,, মোহিনীমোহন তলাপাত্র	১০
২৯৭	,, বসন্তকুমার মিত্র	,,		১৪৭৩	,, মোহিনীচন্দ্র ঘোষ	১০
৩০১৮	,, মহানন্দ ঠাকুর	,,		১৭৮৩	,, রমনীকান্ত বন্দোপাধ্যায়	,,
১৫৮০	,, নিত্যানন্দ ঘোষ	,,		১৮১৬	,, রাজেন্দ্রলাল দাস	,,
৩১৮২	,, রজনীকান্ত সেন গুপ্ত	,,		১৯৬৩	,, রাজেন্দ্রনাথ দে	,,
৩১৭৩	,, অঘোরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	,,		২২৯১	,, উমাচরণ সেন	৯ ১০
২৭২৮	,, শীতলপ্রসাদ মণ্ডল	,,		২৩৬৪	,, নিতাগোপাল পাণ্ডে	১০
১৩৩৯	,, ক্ষীরোদনাথ সিংহ	,,		২৭৩১	,, উপেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	,,
১৮০৬	,, রজনীকান্ত বসু চৌধুরী	,,		২৭৮৮	,, রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য	৯ ১০
১৯৮৮	,, সারদাচরণ বসু	,,		২৮২৪	,, চন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	১০
৩৫৪৬	ডাক্তার সতীশচন্দ্র রায়	১০		৩২০৬	,, রামলাল দত্ত	,,
৩৫২০	বাবু জলধর ভৌমিক	,,		৩২২৬	,, দামোদর পাটনায়ক	,,
২৭৩৫	,, কৃষ্ণনাথ রায়	,,		৩৪৩৩	,, ভগবতীচরণ মিত্র	৯ ১০
৩১৫০	,, হরিনাথ সরকার	,,		৩৪৫১	,, শরতচন্দ্র পাইক	১০
৩৫৩৭	,, বেণীমাধব হালদার	৯, ১০		৩৪৫৮	,, বাসুদেব কানুনগু	৯ ১০
৩৫৪৮	,, বিপ্রদাস চক্রবর্ত্তী	১০		৩২১২	,, কান্তিকুমার বসু	১০
১৭৩৭	,, পাচুগোপাল বিশ্বাস	১০		৩৫৪৫	,, ধরণীধর পাল	,,
১৮২	,, বসন্তকুমার বসু	,,		৫৮১	,, দেবেন্দ্রনাথ দাস	১০
১৯৪	,, বিপিনবিহারি সমাদ্দার	,,		৭১৬	,, গোলকনাথ কাব্যতীর্থ	,,
২৭৬	বি, ভেনকাটাছার কয়ার	,,		৭১৭	,, গোলকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	,,
৩৪০	বাবু বৈকুণ্ঠেশ্বর দাস গুপ্ত	,,		৯৩৪	,, হিরালাল হাতি	,,
৫২৬	,, দাশরথি সিংহ	,,		১১০৮	,, জানকিনাথ নিউগী	,,
৭৭৬	,, গৌরাঙ্গচন্দ্র ভৌমিক	,,		১১৪২	,, কামিনীমোহন দাস গুপ্ত	,,
৯৩৮	,, হেমচন্দ্র দাস	,,		১১৬৮	,, কুমদনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	,,

১।২।৩।৪।৫।৬।৭।৮।৯।১০ ইত্যাদি অঙ্ক যাহা দেখিবেন, তাহা ১৩০১-২ এর হিসাবে বুঝিয়া লইবেন।

১১৬৯ বাবু কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী ১০

১২৭৬ ,, কাঙ্গালচন্দ্র গুপ্ত ,,

১৭২৩ ,, কৃষ্ণপ্রাণ স্তাঙ্গকর্টিক ,,

১৫১৮ ,, মুকুন্দনাথ দাস ,,

১৫৮৯ ,, নিত্যানন্দ রায় ,,

১৬০৭ ,, নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ,,

১৬৬৯ ,, প্রতাপচন্দ্র সরকার ,,

১৭৪৬ ,, পদ্মকান্ত শর্ম্মা বড়ুয়া ,,

১৮২৫ ,, রাধাশ্যাম বাগ ,,

১৯৭৯ ,, রামকৃষ্ণ মণ্ডল ,,

২৩০৫ ই, সি, মুখার্জি স্কয়ার ,,

২৪৬০ বাবু কৃষ্ণনাথ চক্রবর্ত্তী ,,

২৪৭৮ ,, সারদাচরণ মজুমদার ,,

২৫১৭ ,, শরৎচন্দ্র কার্য্যকার্থ ,,

২৬৪৮ ,, রামচন্দ্র কর্ম্মকার ,,

২৭৯৭ ,, রাধিকাপ্রসাদ পাল ,,

২৮২৫ ,, কুঞ্জবিহারি চক্রবর্ত্তী ,,

২৮৭৬ ,, নয়নাঞ্জন ভট্টাচার্য্য ,,

৩০৬৬ ,, রামবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ,,

৩১১৫ ,, রজনীকান্ত রায় ,,

৩১৬০ ,, যজ্ঞেশ্বর ঘোষ ৯

৩৪০০ রাজা শরদিন্দু রায় ১০

৩৪১৪ বাবু আনন্দহরি বসাক ,,

৩৪২৮ ,, সুরেন্দ্রকুমার দেব রায় ,,

৩৫১৯ ,, হৃষিকেশ রায় ,,

৩৫৮৭ ,, শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ,,

২৪০ ,, বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী ,,

৩১৭৪ ,, কালীকৃষ্ণ মজুমদার ,,

১২০৯ ,, কেদারনাথ দেব ১০

১২৯৬ ,, খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ,,

১৩৫০ শ্রীযুক্ত কমলানন্দ বড়ুয়া ,,

১৪৩১ এম্ এন মিত্র স্কয়ার ,,

২৫৮০ বাবু নবীনচন্দ্র চৌধুরি ,,

২৯১৯ " কানাইলাল বসু ,,

৯৯ ,, অমৃতলাল কবিরত্ন ,,

৩১১ ,, বিপিনবিহারি গঙ্গোপাধ্যায় "

৫১৫ ,, দুর্গানন্দ সেন ,,

৯০১ ,, হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ,,

৯৪০ ডাক্তার হরিচরণ ভট্টাচার্য্য ,,

১৮৩৪ বাবু রবীন্দ্রনাথ বাগছি ১০

২০৭৭ " শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ,,

২২৯৩ " উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ,,

২৫৯০ ,, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য ,,

২৬৩৬ ,, শ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়া ,,

২৮৪৬ ,, নিবারণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ,,

২৯৯৬ " শরৎচন্দ্র ঘোষ ,,

৩৪০৪ ,, অক্ষয়কুমার চৌধুরী ৯, ১০

৩৪০৬ পণ্ডরাজ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শর্ম্মা ১০

৩৪৭০ বাবু দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তী ,,

৩৫৫৩ ,, মহেশচন্দ্র শর্ম্মা ,,

৯৯৩ " যদুনাথ দাস ,,

১৩৮০ " কামদাচরণ ঘোষ ,,

১৫৯৯ ,, নিত্যানন্দ ঘোষ ,,

১৭৫৫ ,, পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ,,

১৮৯১ ,, রুক্মিণীকান্ত শর্ম্মা ,,

১৯১৩ ,, রাজকৃষ্ণ ঘোষ ,,

২২৪৭ " ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ,,

২৫৫০ ,, ক্ষীরোদচন্দ্র দাস ,,

২৮০১ ,, শিবেশ্বর কুণ্ডু ,,

৩০৪৩ ,, বিশ্বাকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ,,

৩১৭৫ " রাজকুমার দে ,,

৩১৯৮ ,, ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ,,

৩৩৮৯ ,, অক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় ,,

৩৪১৫ ,, মহেন্দ্রনাথ দে ,,

৩৫৮৫ ,, দ্বারিকানাথ ঘোষ ,,

৩৫৮৯ সেক্রেটারি, বিদ্যানন্দকাটি স্কুল, যশোহর ,,

৬২ বাবু অমূল্যকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ,,

৫১১ ,, দুর্গাপ্রসাদ ১০

৬০৯ ,, দুর্গাচরণ সেনগুপ্ত ,,

২২৬৫ ,, তারিনীপ্রসাদ ধর ,,

২১৯৪ ,, উপেন্দ্রচন্দ্র সরকার ,,

২৭০০ ,, গিরিশচন্দ্র মাইতি ,,

২৯২২ ,, চিন্তামনা মিশ্র সর্দ্দার ,,

৩১৩৯ ,, রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ,,

৩১৪৫ ,, পৃথ্বীনাথ সরঙ্গা ,,

৩২৩৬ ,, শশীভূষণ চট্টোপাধ্যায় ,,

৩৭৮৬ ,, হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ,,

৩৪০৮ বাবু মতিলাল বিশ্বাস ১০
৩৫৯০ " যোগেন্দ্রনাথ গোস্বামি ,,
৮৯৮ ,, হেমনাথ দাস ,,
১৩২০ ,, কুঞ্জবিহারি লাহিড়ী ,,
২১২৭ ,, সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য্য ৯ ১০
২৪১৯ ,, যদুনাথ মিত্র ১০
২৪২২ ,, নগেন্দ্রচন্দ্র বসু ,,
২৯১৭ ,, ননীমাধব মুখোপাধ্যায় ,,
৩১৩৭ ,, লালমোহন পাকড়াশী ,,
৩১৬৫ ,, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ,,
২৩১ ,, ভুবনমোহন কর ,,
১০৫৭ ,, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ,,
১৩৯৯ ,, লক্ষ্মীচন্দ্র মজুমদার ,,
১৪৪৮ ,, মেঘনাদ চৌধুরী ,,
১৪৭৪ ,, মহেন্দ্রকুমার রায় ৯ ১০
২৭২০ ,, কালীপ্রসাদ মাইতি ,,
৩১৪৮ ,, ননীলাল মুখোপাধ্যায় ১০
১৩২৪ ,, কিশোরিমোহন চট্টোপাধ্যায় ,,
১৪০৩ ,, ললীতরাম দাস পাঠক ৯ ১০
২১৮৮ ,, শ্যামচাঁদ বসাক ১০
৯৬২ ,, ইন্দুভূষণ বসু ,,
২৪৮১ ,, নিশীকান্ত চটোপাধ্যায় ,,
২১২১ ,, শ্রীকান্ত রায় ,,
২৯২৮ ,, রজনীনাথ দাস ,,
৩৫৩০ ,, রেবতীমোহন ভটাচার্য্য ,,
১২৯৫ ,, কালীকুমার সেন ,,
১৫৬৪ ,, নন্দলাল চৌধুরী ,,
২৭৪৬ ,, শিবপ্রসাদ জানা ১০
৩২৯৪ ,, মুকুন্দলাল দেব ,,
৩৫৯২ ,, গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ,,
১৩৮১ ,, ললীতমোহন ঘোষাল ,,
১৪১৪ রাজা মহিমারঞ্জন রায় ৯ ১০
২০২৩ সেক্রেটারি, বান্ধব লাইব্রারি নওদহা ১০
২১৪৫ বাবু সৌরেশচন্দ্র সরকার ,,
২২৭১ ,, তারিনীচরণ শর্ম্মা ৯ ১০
৩৪৩০ কে, পি, ভদ্র ক্যার ১০
৩৫২৭ বাবু তারিনীকান্ত দাস ,,
৩৫৯৩ ,, চন্দ্রমোহন চৌধুরী ,,

৩৫৯৪ বাবু রজনীকান্ত কবিরাজ ১০
১১৫০ ,, কৈলাসচন্দ্র কর্ম্মকার ,,
১৭৮৮ ,, রামনারায়ণ সরকার ,,
২১৬২ ,, শ্যামাচরণ খাঁ ,,
২৭২২ ,, বৃন্দাবনচন্দ্র বারিক ,,
৩৩১০ ,, শরতচন্দ্র সিংহ ,,
৩৫৯৫ ,, দুর্গাদাস চন্দ ,,
৪২২ ,, বনমালী চরণ দত্ত ,,
১৮১৯ ,, বুমাপ্রসাদ বিশ্বাস ,,
৩১৩৮ ,, রঞ্জনবিলাস রায় চৌধুরী ,,
১০০৪ ,, জগতবন্ধু রায় ৮ ৯
১৬৯৪ ,, প্রসন্নকুমার পাল ,,
১৮২৪ ,, রাজীবলোচন চন্দ ,,
২২৯০ ,, উমেশচন্দ্র সমাদ্দার ,,
২৭৫৮ ,, শরতচন্দ্র দত্ত ,,
২৪১ ,, বানেশ্বর পত্রনবিশ ৯ ১০
২৬৩ সম্পাদক, ধর্ম্মসভা, ময়মনসিংহ
১৬৭৪ ,, প্রসন্নকুমার ভটাচার্য্য ১০
২৫৩৯ ,, কুঞ্জবিহারি রায় ৯ ১০
২৬৮ ,, বিহারিলাল কর্ম্মকার ৯, ১০
১৪৬০ ,, মহেশ্বর চক্রবর্ত্তী ,,
৩১৮৯ ,, শ্যামাচরণ ঘোষ ৯ আং
৩৬০০ ,, রজনীকান্ত সরকার ১০
৪২৬ ,, বিপিনবিহারি বসু ,,
৩৭৯৬ চেয়ারম্যান, লোকালবোর্ড, ধুবড়ি (কটন লাইব্রারির জন্ম)
৭০৫ বাবু গোপালচন্দ্র চটোপাধ্যায় ,,
১৮০৩ ,, রাসবিহারি চটোপাধ্যায় ,,
১৬০৬ এন্ চাটুর্জী ক্যার ৯ ১০
২২৭৯ বাবু ত্রৈলক্যনাথ ভটাচার্য্য ,,
১৫৭৪ ,, নরহরি মুখোপাধ্যায় ১৩, ১৪, ১৫ আং
১৯৭১ ,, রাজেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় ১০
৩২১৭ ,, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ ৭ ৮
৩৪৬৫ ,, কুঞ্জবিহারি দাস ১০
১৫৯৯ ,, রামপ্রসাদ নন্দী ,,
৩৬০১ ,, সিতানাথ গোস্বামি ,,
৩৬০২ ,, পঞ্চানন দাস ,,
২৮৭৪ " হরকৃষ্ণ মহান্তি ৭ ৮ ৯

১০ম বর্ষ | মাঘ। | ১০ম সংখ্যা।

১৮২৫, ১৩১০।

গ্রাহকগণ!

☞ বর্ত্তমান বর্ষের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

☞ পত্র লিখিতে, টাকা পাঠাইতে বা ঠিকানা-বদল জানাইতে, গ্রাহকগণ অবশ্য অবশ্য স্বীয় স্বীয় গ্রাহক-নম্বর দিবেন।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২৫।

শাণ্ডিল্য-সূত্র।

বা

ভক্তি-মীমাংসা।

ভক্তি-সাধক সমাজের হৃদয়ের ধন শাণ্ডিল্য-ঋষির শতসংখ্যক ভক্তিসূত্র, হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল্ মহাশয় কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত, এবং মূল সংস্কৃত সূত্র ও প্রয়োজনীয় টীকা-টীপ্পনীসহ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া, সুলভ মূল্যে (কাপড়ে বাধাই ১৷৷০ টাকা ও কাগজে বাধাই ১৲ টাকা মূল্যে) যশোহর হিন্দু-পত্রিকা-কার্য্যালয়ে আমার নিকট বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

Probudha Bharata Almora, বলেন :—

"The Sandilya Sutra is a very ancient work on Bhakti : both philosophy and practice. Mr. Mozoomdar has translated it beautifully, giving a runing commentary, mostly drawn from Svapneswar, the commentator of Sandilya and explaning difficult passages and references in footnotes. The book is dedicated to Swami Vivekananda and opens with an able and learned introductoin by the translator. It is prettily got up.

Luzac's Oriental Series London বলেন :—

Mr. Jadunath Mozoomdar has translated from the Sanskrit Hundred Aphorisms of Sandilya or Religion of Love. Until recently this side of Indian religious thought has been greatly overlooked, but the publication and translation of the Narada and Sandilya Sutra have lately thrown a flood of light on Bhakti-Maιga or the phath of Love. When the Maya or Avidya has been removed from the eyes of Paramahansa, he becomes a Bhakta, odevoted lover of Deity. The difference between Sandilya and Narad is between the monist and the dualist. Whilst the ecstatic devotion of the Dvaitavadi is for Saguna Isvara, that of the Advaitavadi is for Nirguna Brahman. Whether we can always agree with the commentary or not. Mr. Mozoomdar deserves our best thanks for this interesting contribution to the literature of divine love.

The Indian Mirror says:—

The book makes an important addition to the religious publications of the day.

The Tribune says:—

" * * Babu Jadunath has been devoting much of his time and thought to the popular exposition of abstruse Sanskrit works and his facile pen and cultured understanding cast a peculiar glow on all his writing in the department of religious and phiiosophical enquiry" * *

Journal of M. B. S. * * "the book is an interesting study throughout. *

শ্রীহরিঃ।

(১৮৬৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১০ম বর্ষ, ১০ম খণ্ড, ১০ম সংখ্যা। | মাঘ। | ১৩১০ সাল, ১৮২৫ শকাব্দা।

বিবিধ বিষয়ক সংবাদ

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ লইয়া বিভিন্ন স্থানের বহু সভা সমিতিতে বিপুল আন্দোলন স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোকে, বিপত্তির কারণ প্রদর্শন পূর্ব্বক আপত্তি করিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে এই প্রসঙ্গই প্রধান আলোচ্য বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তন ব্যাপারে সদাশয় গবর্ণমেণ্ট ধীর স্থির গম্ভীর ভাবে সর্ব্বদিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করিবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস; সহসাই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, এরূপ মনে হয় না।

—×—

রুষ ও জাপানের সমরশঙ্কা সম্যক্‌রূপে দূর হয় নাই। মুখে উভয়েই শান্তির গীত গাহিতেছেন; পক্ষান্তরে, স্বার্থ সিদ্ধির প্রতিজ্ঞায়ও পথে অবিচলিত রহিয়াছেন। উভয়েরই উদ্দেশ্য, বিনা রুধিরপাতে স্বীয় স্বার্থসংরক্ষণ, কিন্তু তাহা সুসম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। রুষের আশা, মাঞ্চুরিয়ায় তিনি একাধিপত্য করেন, এবং কোরিয়ার দ্বার সকল জাতির জন্য অনর্গল রাখেন। জাপানের বাসনা ইহার বিপরীত; কোরিয়ায় স্বীয় প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখা, এবং মাঞ্চুরিয়ার ভাণ্ডার সমস্ত জাতির নিমিত্ত উন্মুক্ত রাখা। মাঞ্চুরিয়ায় চীনের প্রাধান্য রক্ষাও জাপানের লক্ষ্য। দুজনেই স্ব স্ব স্বার্থচিন্তায় ব্যগ্র, সুতরাং সম্ভাবিত সময়ই ইহার মীমাংসা করিবে।

চীন এখনও নীরব। মাঞ্চুরিয়া চীনের রাজ্য, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না, কারণ চীন, রুষের ভয়ে অধীর। রুষের রোধকষায়িত লোচন দর্শন করিলে চীন চমকিত হয়েন। চীনের রাজনৈতিকগণ নিস্তব্ধ নীরধির ন্যায় অবিচলিত ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। জাপানের জয়ের সম্ভাবনা দেখিলে, তখন বোধ হয় সেই দিকেই গড়াইবেন। আত্মরক্ষার্থ চীন জাপানে সন্ধি সংস্থাপিত হইলে, সমগ্র প্রাচ্যভুমির নব অভ্যুদয়ের সূচনা হয়, এরূপ অনেকে আশা করেন।

—x—

কোরিয়া স্বাধীন রাজ্য, কিন্তু হীনবীর্য্য। রুষ বা জাপান, কাহারও কার্য্যে বা কথায় প্রতিবাদ করা কোরিয়ার সাধ্য নহে। শক্তি ও সাহস উভয়েরই অনটন। জাপান চাহেন, কোরিয়াকে আপনার করিয়া রাখেন। কোরিয়ার তাহাতে বড় বেশী আপত্তিও নাই, কিন্তু রুষের সমরসজ্জা দর্শন করিয়া, সে কথা কহিতেও সাহসে কুলাইতেছে না।

—x—

রুষ ও ফরাসীর প্রণয় ক্রমশঃ প্রগাঢ়ভাব ধারণ করিতেছে। এদিকে জাপানবৃটনেও সন্ধিবন্ধন সুস্থির রহিয়াছে। বৃটন্, জাপানের বিপদে সহায়তা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও প্রস্তুত, সুতরাং রুষ জাপানের সমর যে সঙ্কীর্ণ সীমায় সংবদ্ধ থাকিবে, এরূপ সম্ভাবনা সুদূর পরাহত।

—x—

জর্ম্মণী ও আমেরিকা, আসন্ন সংগ্রামের দর্শক শ্রেণীভুক্ত। এখনও ইঁহারা কোনও দিকে কিছু বলেন নাই। কোরিয়া এবং মাঞ্চুরিয়ায় ইঁহাদেরও সামান্য স্বার্থ আছে, কিন্তু "সহসা বিদধীত ন ক্রিয়াং" ভাবিয়া আপন ভাবে আছেন। সহায় সম্পদ্ অনিশ্চিত, জয় পরাজয়ও অস্থির। জাপান অল্পকালে যেরূপ অভ্যুদয়ের অধিকারী হইয়াছেন, তাহাতে বিজয়লক্ষ্মী যে রুষেরই অঙ্কলক্ষ্মী হইবেন, ইহা কোনও বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি বলিবেন না।

—x—

তিব্বত কমিশন চুম্বি উপত্যকা পর্য্যন্ত গিয়াছেন। এই চুম্বির উত্তরেই তিব্বতীয়দিগের ত্রিতল কেল্লা বিদ্যমান। শিবিরে প্রায় দুই সহস্র সৈন্য সংস্থিত। তিব্বত-কমিশন, বাণিজ্যের নিষ্পত্তি করিতে যাইতেছেন এরূপ প্রকাশ, কিন্তু তিব্বতের ভাগ্য পরিবর্ত্তনেরও প্রয়াস আছে, এরূপ আভাস পাওয়া যায়। আমরা আশা করি আকাশে আলোক দেখিতে পাইব, ঘনঘটা ছটায় দেশ অন্ধকার হইবে না।

—x—

কোনও কোনও বৃটীশ রাজনীতিজ্ঞের অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায়, রুষ তিব্বত গ্রাস করিতে পারেন, এই বিশ্বাসে বা শঙ্কায় তিব্বত কমিশনের ব্যবস্থাবিধি। এ রহস্য পরিপাক করা সুকঠিন। তবে ইহার অভ্যন্তরে যে কিছু অপ্রকাশ্য উদ্দেশ্য আছে কিনা, তাহা আপাততঃ অনির্ণেয়।

—x—

পূর্ব্বতন সন্ধি সর্ত্তের অবমাননা তিব্বতের অপরাধ। সেই সর্ত্তে বাধ্য করাইয়া, স্বার্থসিদ্ধির পথ পরিষ্কার করাই সন্দর্শে গুরু-

সংবাদের মুখ্য লক্ষ্য, এরূপও প্রকাশ আছে; কিন্তু সন্ধিসর্ত্ত ও বন্দীসংবাদে সামঞ্জস্য সংরক্ষিত হওয়াই যে বিষম! শ্রাদ্ধ যে কতদূর গড়াইবে, তাহা ভারত-ভাগ্যবিধাতা ও কমিশননেতার মধ্যে নিবদ্ধ কি না ভগবান্ জানেন।

— × —

সীমান্তের মোমন্দ প্রদেশের কতটুকু আমীরের, আর কতটাই বা ইংরেজের, এই সীমানির্দ্দেশ কার্য্যে কমিশন যাইবে। আফগান্ সীমান্তজাতি যাহাতে ইংরেজ পক্ষের কোনও অপচয় সাধন করিতে না পারে, তজ্জন্য কাবুলের আমীর মহোদয় আগেই আয়োজন আরম্ভ করিয়াছেন। জেলালাবাদের শাসনকর্ত্তা, কমিশনের আদর অভ্যর্থনা ও আপদ্ বিপদে রক্ষা করিবার জন্য, পূর্ব্বাহ্নেই আদিষ্ট হইয়াছেন। সুমঙ্গলে ফেসাদ্ মিটাইয়া ঘরের ছেলে ঘরে আসিলেই আমাদের আনন্দ।

— × —

শিখ জাতির বীরত্ববার্ত্তা জগতে জাগরূক রাখিবার জন্য পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে এক স্মৃতিমন্দির সংস্থাপিত হইয়াছে। প্রায় বর্ষদ্বয় পূর্ব্বে, সামানাশৈল সানুস্থ সারাগড়ী সৈনানিবাসে, অসংখ্য পার্ব্বত্যশত্রু সমাক্রান্ত হইয়া, বিংশতি সংখ্যক শিখ, সমরযজ্ঞে প্রাণ পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়াছিল। সেই স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য এই ব্যাপার। স্মৃতি-মন্দিরের নির্ম্মাতা ও জনৈক শিখবীর। পাঞ্জাবের লাট্ সাহেব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সময়ে, শিখবীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। হিন্দুস্থানের প্রত্যেক মৃত্তিকাকণার হৃদয়ে শিখবীরত্ব অঙ্কিত আছে। এমন্দির ভারতের প্রকৃত দেবমন্দির!

— × —

পুরীযাত্রীগণের উপর কর প্রবর্ত্তন সংকল্প, সরকার বাহাদুর এখনও সম্যক্ প্রকারে ত্যাগ করেন নাই। বিস্ময়ের বিষয় বটে! প্রাচীনকালে প্রজাপুঞ্জ পুণ্যকার্য্যে রাজার সমধিক সাহায্য লাভ করিত। সম্প্রতি অপ্রীতিকর করনির্দ্ধারণেই অত্যন্ত আগ্রহ উপলব্ধি করা যায়। পুণ্যপ্রার্থী ধর্ম্মপ্রাণ দরিদ্র তীর্থযাত্রীর পক্ষে পথের ব্যয় বহনই কষ্টকর, ইহার উপর যদি আবার সরকার হইতে কর ধরিয়া টানাটানি করা হয়, তবে বেচারাদের উপায় কি? কর্ত্তৃপক্ষ দরিদ্র প্রজার পুণ্যধর্ম্মকার্য্যে অন্তরায় উপস্থিত না করিলে, সমগ্র হিন্দুসমাজ তাঁহাদের নিকট অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ হইবে।

— × —

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট, বঙ্গবাসীকে শিল্প শিক্ষার্থ বৃত্তি প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। বর্ত্তমানে ভারতীয় শিল্প যেরূপ অদর্শন-নগরের অধিবাসী হইতে চলিয়াছে, তাহাতে এসময় গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতিসমুদ্রেক শুভলক্ষণ বলিয়া বিশ্বাস করি। সূক্ষ্মশিল্পে ভারতের গৌরব জগতে প্রথিত, কিন্তু কাল-চক্রের অনিবার্য্য পরিবর্ত্তনে ভারতীয় সমাজ পরশিল্পের প্রত্যাশী হইয়া পড়িয়াছে। ভারতের মান সম্ভ্রম, অশন বসন, সবই বিদেশের অনুগ্রহে। সদাশয় গবর্ণমেণ্টের দয়ায় যদি এ স্রোতের পরিবর্ত্তন হয়, সৌভাগ্য—সন্দেহ নাই, কিন্তু আশা অল্প।

— × —

মাসিডোনিয়ায় আগুণ অভ্যন্তরে ধিক্ ধিক্ জ্বলিতেছে। আশঙ্কা হয়, আবার সহস্র শিখা বিস্তার করিবে। বুলগেরিয়ান্‌দিগের ভাবে অনুভব হয়, প্রস্তাবিত সংস্কার সাধনের পরেও তাহারা শান্ত হইতে সম্মত নয়। মাসিডোনিয়ার খৃষ্টানগণ মুসলমান-তুরস্কের হস্ত হইতে সর্ব্বতোভাবে নিষ্কৃতি না পাইলে, স্থিরতা অবলম্বন করিবে বোধ হয় না। ধর্ম্মজীবন জাতীয়জীবনের সম্বন্ধ লইয়া, আ'জকা'ল সর্ব্বত্র সঙ্কট উপস্থিত হইতেছে। বিধির বিধান!

—×—

সরকারী গোপনীয়সংবাদনিবারণ বিষয়ক আইন্ সম্প্রতি সংশোধিত হইতেছে। অনেকে ইহার এ প্রকার সংশোধনের আবশ্যকতা অনুভব করেন না। জানি না, কর্ত্তৃপক্ষ কিরূপ অভিপ্রায়ে এই পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন পরিশোধনে ব্যগ্র হইয়াছেন। পরিবর্ত্তন আশঙ্কাজনক হইলে, তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া প্রকৃষ্টপ্রথা নহে। এ সমস্ত বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট হঠকারিতার পরিচয় প্রদান না করেন, ইহাই আমরা বলি।

ধম্ম-পদ।

পণ্ডিতবগ্‌গো ছট্‌ঠো।

নিধীনং ব পবত্তারং যং পস্‌সে বজ্জদস্‌সিনং।
নিগ্গয়্হবাদিং মেধাবিং তাদিসং পণ্ডিতং ভজে ॥
তাদিসং ভজমানস্‌স সেয্যো হোতি ন পাপিয়ো ॥১।

অনুবাদ—গুপ্তধন প্রদর্শকের ন্যায় যিনি সত্যধর্ম্ম প্রদর্শন করেন, যিনি বর্জ্জনীয়-বিষয় দেখাইয়া দেন, যিনি দোষ দেখিলে ভর্ৎসনা করেন, যিনি মেধাবী, এরূপ ব্যক্তি যাঁহাকে দেখিবে, তাঁহাকে পণ্ডিত জ্ঞানে অনুসরণ করিবে; তাদৃশ ব্যক্তিকে অনুসরণ করিলে অমঙ্গল হয় না, মঙ্গলই হয়।

ওবদেয্যানুসাসেয্য অসব্ভা চ নিবারয়ে।
সতংহি সো পিয়ো হোতি অসতং হোতি অপ্পিয়ো ॥২।

অনুবাদ - পণ্ডিত ব্যক্তি তিরস্কার করিবেন, শাসন করিবেন, অন্যায়াচরণ হইতে নিবৃত্ত করিবেন। ইহাতে তিনি নিশ্চিত সৎলোকের প্রিয়পাত্র হইবেন, এবং অসৎ লোকের অপ্রিয় হইবেন।

ন ভজে পাপকে মিত্তে ন ভজে পুরিসাধমে।
ভজেথ মিত্তে কল্যাণে ভজেথ পুরিসুত্তমে ॥৩।

অনুবাদ—পাপীকে মিত্র করিবে না। পুরুষাধমকে মিত্র করিবে না। ধার্ম্মিককে মিত্র করিবে, পুরুষোত্তমকে মিত্র করিবে।

ধম্মপীতী সুখং সেতি বিপ্পসন্নেন চেতসা।
অরিয়প্পবেদিতে ধম্মে সদা রমতি পণ্ডিতো ॥৪।

অনুবাদ—ধর্ম্মপানকারী অর্থাৎ ধার্ম্মিক ব্যক্তি, সুখে—প্রসন্নান্তঃকরণে বাস করেন। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ, আর্য্যগণ (বৌদ্ধ সাধন-মার্গে আরূঢ় ব্যক্তিগণ) কর্ত্তৃক প্রদর্শিত ধর্ম্মে সর্ব্বদা বিচরণ করেন।

উদকং হি নয়ন্তি নেত্তিকা উসুকারা নময়ন্তি তেজনং।

দারুং নমযন্তি তচ্ছকা অত্তানং দমযন্তি পণ্ডিতা ॥৫।

অনুবাদ মৃত্তিকাখননকরিগণ জলকে (ইচ্ছানুরূপ) লইয়া যায়, বাণপ্রস্তুতকারীরা বাণ (যেরূপ ইচ্ছা) নমিত করে, সূত্রধারেরা কাষ্ঠখণ্ডকে (ইচ্ছানুযায়ী আকারে প্রস্তুত করে; (সেইরূপ) পণ্ডিতগণ আপনাকে (নিজ মনকে) যেরূপ ইচ্ছা চালিত করেন।

সেলো যথা একঘনো বাতেন ন সমীরতি।
এবং নিন্দাপসংসাসু ন সমিঞ্জন্তি পণ্ডিতা ॥৬।

অনুবাদ—যেমন ঘন প্রস্তরময় কঠিন পর্ব্বত বায়ুতে বিচলিত হয় না, সেইরূপ পণ্ডিতগণ নিন্দা ও প্রশংসাতে বিচলিত হন না।

যথাপি রহদো গম্ভীরো বিপ্পসন্নো অনাবিলো।
এবং ধম্মানি সুত্বা ন বিপ্পসীদন্তি পণ্ডিতা ॥৭।

অনুবাদ—পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া, গভীর, নিস্তরঙ্গ, স্থির হ্রদের ন্যায় প্রশান্ত হইয়া থাকেন।

সব্বথ বে সপ্পুরিসা বজন্তি ন কামকামা লপয়ন্তি সন্তো।
সুখেন ফুট্‌ঠা অথবা দুখেন উচ্চাবচং পণ্ডিতা দস্‌সয়ন্তি ॥৮।

অনুবাদ—পণ্ডিত ব্যক্তি সকল প্রকার অবস্থার মধ্যে সৎপথে অগ্রসর হন। সাধু ব্যক্তি কাম্য বস্তুর বিষয় আলাপ করেন না; সুখে অথবা দুঃখে পড়িয়া তাঁহারা উচ্চাবচ অর্থাৎ উদ্ধত বা অবনত আকার ধারণ করেন না।

ন অত্তহেতু ন পরস্‌স হেতু ন পুত্তমিচ্ছে ন ধনং ন রট্‌ঠং।
ন ইচ্ছেয্য অধম্মেন সমিদ্ধিমত্তনো স সীলবা পঞ্‌ঞবা ধম্মিকো সিয়া ॥৯।

অনুবাদ—যিনি আপনার কিম্বা পরের জন্য পুত্র, বা ধন, বা রাজ্য, কিছুই ইচ্ছা করেন না, যিনি অধর্ম্ম দ্বারা আপনার সমৃদ্ধি ইচ্ছা করেন না, তিনি সচ্চরিত্র, জ্ঞানী, এবং ধার্ম্মিক হয়েন।

অপ্পকা তে মনুস্‌সেসু যে জনা পারগামিনো
অথায়ং ইতরা পজা তীরমেবানুধাবতি ॥১০।

অনুবাদ—মনুষ্যগণের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি নির্ব্বাণসাগরের পারগামী হইতে পারেন; অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ কেবল তীরে দৌড়িতে থাকে।

যে চ খো সম্মদক্‌খাতে ধম্মে ধম্মানুবত্তিনো।
তে জনা পারমেস্‌সন্তি মচ্চুধেয্যং সুদুত্তরং ॥১১

অনুবাদ—ধর্ম্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হইলে যাঁহারা ধর্ম্মের অনুসরণ করেন, তাঁহারা নিশ্চিত সুদুস্তর যমরাজ্য অতিক্রম করিবেন।

কন্‌হং ধম্মং বিপ্পহায় সুক্কং ভাবেথ পণ্ডিতো।
ওকা অনোকং আগম্ম বিবেকে যত্থ দূরমং ॥১২।
তত্রাভিরতিমিচ্ছেয্য হিত্বা কামে অকিঞ্চনো।
পরিয়োদপেয্য অত্তানং চিত্ত ক্লেসেহি পণ্ডিতো ॥১৩।

অনুবাদ—পণ্ডিত ব্যক্তি সংসারের

(কৃষ্ণবর্ণ) দুঃখময় জীবন পরিত্যাগ করিয়া, (শুক্লবর্ণ) বৈরাগ্যপূর্ণ শান্তিময় জীবন যাপন করেন, ও ভিক্ষুব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক ক্লেশকর ও মোহোৎপাদক বাসনাসমূহ পরিত্যাগ করিয়া, বিবেক আশ্রয় পূর্ব্বক চিত্তের আনন্দে জীবন অতিবাহিত করেন।

——

যেসং সম্বোধি অঙ্গেসু সম্মা চিত্তং সুভাবিতং।
আদানপটিনিস্সগ্গে অনুপাদায় যে রতা।
খীনাসবা জুতীমন্তা তে লোকে পরি-
নিব্বুতা ॥১৪॥

পণ্ডিতবগ্গো ছট্ঠো।

অনুবাদ যাহাদের চিত্ত সপ্ত বোধি-জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত, যাঁহারা বাসনাতে আবদ্ধ না হইয়া চিত্তে আনন্দ উপভোগ করেন, যাঁহারা মনের দুর্ব্বলতা জয় করিয়াছেন, সেইরূপ ব্যক্তি ইহলোকে শাশ্বত আনন্দ লাভ করেন।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

মুণ্ডক-শ্রুতি।

শৌনক ও অঙ্গিরা

জ্ঞানময় উপনিষৎশাস্ত্র ভারতবর্ষের অতীত গৌরবের সাক্ষী। এই উপনিষদেই জগতের সর্ব্বোচ্চ চিন্তার উৎস উপলব্ধি করা যায়। কর্ম্ম জ্ঞানসামঞ্জস্যে অসমর্থ জগৎ, উপনিষদের অনুগ্রহে অন্ধকারমার্গে আপন কর্ত্তব্যরেখা দেখিতে পাইয়াছিল। ভারতের দুরদৃষ্ট, ভারতসন্তানগণ উপনিষৎ পাঠে, পরমানন্দ লাভ করিবার অবসর পান না; দূরদূরান্তরের সৌভাগ্যশালীগণ সেই পরম পবিত্র ঔপনিষদ আনন্দে বিভোর হইতে পারেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপে পাশ্চাত্য প্রদেশীয় পণ্ডিতবর Schopenhauer মহোদয়ের একটী কথা উদ্ধৃত না করিয়া পারিলাম না। তিনি বলিয়াছেন "In the whole world there is no study so beneficial and so Elevating as that of the Upanishads—It has been the solace of my life, it will be the solace of my death." এহেন গৌরবান্বিত উপনিষৎশাস্ত্রের আলোচনা বৃদ্ধি হওয়া, ভারতের অত্যধিক কল্যাণকর, সন্দেহ নাই। আমরা ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সংক্ষেপে ঔপনিষদ সত্যের আলোচনা করিব।

শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবদুপসন্নঃ প্রপ্রচ্ছ। কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বং ইদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।

তস্মৈ সহোবাচ, দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হস্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পরাচৈবাপরাচ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো ঽথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি, অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।

যত্ তত্ অদ্রেশ্য মগ্রাহ্যমগোত্রবর্ণম্, অচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদং, নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদ্‌ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ, যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি, যথা সতঃপুরুষাৎ কেশলোমানি, তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং।

তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে, অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসু চামৃতং। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নাম রূপমন্নঞ্চ জায়তে। ইতি প্রথম মুণ্ডকে।

বঙ্গানুবাদ—শৌনক নামক একজন গার্হস্থধর্ম্মাবলম্বী ঋষি, যথানিয়মে মহর্ষি অঙ্গিরার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! কোন্ পদার্থ অবগত হইলে, জগতের যাবদীয় বিষয় বিজ্ঞাত হইবে? ঋষিপ্রবর অঙ্গিরা তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—বিদ্যা দ্বিবিধা, এক পরাবিদ্যা অন্য অপরাবিদ্যা. বেদার্থবিৎ পূর্ব্বাচার্য্যগণ জ্ঞাতব্যবিষয়ে এই দ্বিবিধ বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত ছন্দ ও জ্যোতিষ এই কয়টী অপরা বিদ্যা। আর, যাহা দ্বারা সেই অক্ষরস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারই নাম পরা বিদ্যা। যাহাদ্বারা অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, গোত্রবর্ণরহিত, চক্ষুঃশ্রোত্রবিহীন, পাণিপাদশূন্য, নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম, ভূতযোনি স্বরূপ সেই পরমাত্মাকে ধীরগণ দর্শন করিতে পান, তাহাই পরাবিদ্যা। যেমন উর্ণনাভি নিজে তন্তুসৃজন করিয়া, তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক নিজেই অপরানপেক্ষ হইয়া জালপ্রস্তুত করে, এবং যেমন পৃথিবী আপন অভ্যন্তর হইতে আপনিই ওষধিগণকে প্রসব করে, আর যেমন পুরুষের শরীর হইতে কেশলোমাদি অপরের সাহায্য ব্যতীত উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ সেই অক্ষর পরমাত্মা হইতে অন্যাপেক্ষা ব্যতীত বিশ্ব সমুদ্ভূত হয়। ব্রহ্ম, তপস্যা দ্বারা উপচিত হইলে, তাহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। অন্ন হইতে প্রাণ, তাহা হইলে মন, মন হইতে সত্য অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূত, তাহা হইতে সপ্তলোক, এবং তাহাতে বর্ণাশ্রমানুযায়ী কর্ম্ম ও কর্ম্মানুরূপ ফল—(অমৃত) জ্ঞান উদ্ভূত হয়। যিনি সামান্যতঃ সর্ব্বজ্ঞ, বিশেষতঃ সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বজ্ঞলক্ষণ তপ যাঁহার জ্ঞানময় অর্থাৎ জ্ঞানবিকার, তাহা হইতে কার্য্য-ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ, 'হরি'রাম' ইত্যাদি নাম, কৃষ্ণ-শ্বেতাদিরূপ, ব্রীহি যবাদি অন্ন—এই সকল পূর্ব্বোক্তক্রমানুসারে উৎপন্ন হয়।

বিশেষ তাৎপর্য্য। শৌনকের প্রশ্নটী বড় গভীরার্থ। শৌনক কি কখনও কাহার মুখে শুনিয়াছিলেন যে এমন একটী জিনিষ আছে, যাহা অবগত হইলে সংসারের সকল জ্ঞাতব্য পদার্থের জ্ঞান লব্ধ হয়? সম্ভবতঃ প্রশ্নের ভাব ঐরূপ নহে। তিনি কোনও একটী নাম শুনিবার আশায় বিধিবদ্ গুরূপগমন করেন নাই। একটী মৌলিক সত্য আবিষ্কারার্থে আসিয়াছেন। সে জিনিষটী কি? শুনিলেই, তাঁহার তৃপ্তি হইবে না। প্রত্যুত্তরের ভঙ্গীতে বোধ হয়, শৌনক বিশ্লেষণপ্রণালীমূলক প্রশ্ন উপস্থিত করেন। সুবর্ণতত্ত্ব অবগত হইলে, সুবর্ণনির্ম্মিত যাবতীয় পদার্থ যেমন অবগত হওয়া যায়, তদ্রূপ জগৎকারণীভূত কোন্ পদার্থকে জানিলে জগতের জ্ঞান লব্ধ হইবে, ইহাই বোধ হয় তাঁহার প্রশ্ন। একভাবে বুঝিতে গেলে প্রশ্ন—"কি জানিলে সকল জানা হয় অর্থাৎ এই সকলের প্রকৃত স্বরূপ কি?" ইহা বুঝাইতে গেলে জগতের ব্রহ্মভাব বুঝান আবশ্যক হয়। এপ্রশ্নে জগতের

প্রকৃতি বিশ্লেষণ দ্বারা কি প্রণালীতে জগৎ-কারণে পৌঁছাগায়, সেই সার সত্যের স্বরূপ-নির্ব্বাচন উদ্দেশ্য। মানব জীবনের প্রথম অনুসন্ধেয়—কারণ। কার্য্যদর্শনে অনুসন্ধিৎ-সুপ্রাণে স্বতই সে জিজ্ঞাসার উদ্ভাস উপ-স্থিত হয়। নৈসর্গিক নিয়মে কার্য্য কারণা-ত্মক, সুতরাং কারণ জানিলে তাবৎকার্য্যের জ্ঞান লাভ সুলভ হয়। লৌকিক সত্য নির্দ্ধা-রণের নিয়মের দ্বারা, জগতের বিশ্লেষণ সুসিদ্ধ হইবে কি না, তাহাই শৌনক জানিতে চাহেন। অঙ্গিরা ও প্রশ্নকর্ত্তার মনোভাব বুঝিয়া, ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ নির্ণয় দ্বারা পক্ষান্তরে শিষ্যের প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতেছেন। প্রশ্নের ভাষাতে এরূপ বুঝিবার সুবিধা নাই, এইজন্য উত্তরের দিকে লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন স্থির করিতে হইবে।

এখন বুঝিবার বিষয় অঙ্গিরার উত্তর। গুরুর কথায় আরও সুগভীরতা। প্রশ্ন হইল একরূপ, উত্তর অন্যরূপ। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি জানিলে সকল জানা যায়?" উত্তর হইল—"ব্রহ্মবিদেরা বলেন বিদ্যা দুই প্রকার পরা ও অপরা।" আপা-ততঃ অন্যরূপ প্রতীয়মান হইলেও উত্তরের মৌলিকতা আছে। অপরাবিদ্যা অবিদ্যা, তাহার নিরাকরণ আবশ্যক। অবিদ্যার বিষয় অবগত হইলে কিছুই জানা যায় না, বিদ্যার বিষয় অবিষয় ব্রহ্ম অবগত হইলে সর্ব্বাবগম সুসিদ্ধ হয়। ভঙ্গ্যন্তরে অবিদ্যা বিনাশার্থ এরূপ অবতারণার আবশ্যকতা আছে। পূর্ব্বাভাস ও পূর্ব্বপক্ষ নিরাস করিয়া পরে সিদ্ধান্তোল্লেখ করিতে হয়, এই ক্রম আশ্রয় করায় সর্ব্ব-প্রথমে সুস্পষ্ট প্রত্যুত্তর পাওয়া যাইতেছে না।

চারিটী বেদসংহিতা এবং বেদের ষড়ঙ্গ এই কয়টী অপরা বিদ্যা; এইগুলি "ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধনতৎফলবিষয়া" বলিয়া শ্রীশঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরা বিদ্যা পরমাত্মবিদ্যা বা ঔপনিষদী ব্রহ্মবিদ্যা। উপনিষৎ নামক পুস্তকগুলি ব্রহ্মবিদ্যা নহে, তৎপ্রতিপাদ্য পূতব্রহ্মজ্ঞানই পরাবিদ্যা। উপনিষদের একমাত্র প্রতিপাদ্য পরমব্রহ্ম। বেদসংহিতা ও বৈদিক ষড়ঙ্গে ধর্ম্মাধর্ম্ম তৎসাধন কর্ম্মফল ইত্যাদি প্রতিপাদিত হইয়াছে; তাহাতে পরমতত্ত্ব ব্রহ্মসত্ত্ব বিবেচিত হয় নাই। ধর্ম্মা-ধর্ম্মাদি নানাকর্ম্ম প্রতিপাদক শাস্ত্র ত্রিগুণ তত্ত্ব লইয়াই নাড়াচাড়া করিয়াছেন। গীতায় ভগবদ্‌বাক্য —"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈ-গুণ্যো ভবার্জ্জুন।" বেদ অর্থ এখানে সংহিতা-পুস্তকরূপ স্থূলতত্ত্ব। কর্ম্মবোধক অংশ ত্যাজ্য, ও ব্রহ্মবোধক ভাগ গ্রাহ্য, ইহাই আচার্য্য শঙ্করের অভিপ্রায়। কর্ম্মদ্বারা নিঃশ্রেয়স লাভ হয় না। অবিদ্যা বা অপরা বিদ্যার বিষয় অবগত হইলেও, যাবদীয় বিষয়বিজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না, এজন্য ঐ অপরা বিদ্যা এখানে হেয়া।

শিক্ষাগ্রন্থে বৈদিকমন্ত্রপাঠের স্বর-মাত্রাদি জ্ঞান উক্ত আছে। কল্পসূত্র দ্বিবিধ, শ্রৌতসূত্র ও গৃহ্যসূত্র। অনুষ্ঠানে অধিকার ভেদে ইহার আবশ্যকতা; এই শাস্ত্র ব্যতীত বেদোক্ত কার্য্যানুষ্ঠান নিঃসন্দেহে সম্পন্ন হয় না। ব্যাকরণ না হইলে বৈদিক শব্দের সমাসাদিব্যুৎপত্তিজ্ঞান হয় না। নিরুক্ত বৈদিক অভিধান; অব্যুৎপন্ন ব্যুৎপন্ন সকল শব্দেরই বহুবিধ অর্থ ইহাতে পাওয়া যাইবে। ছন্দঃশাস্ত্র দ্বারা যথাযথ উচ্চারণে

সহায়তা সম্পাদন এবং অক্ষরচ্যুতি নিবারিত হয়।

পরাবিদ্যা দ্বারা পরমাত্মাকে অবগত হওয়া যায়। পরমাত্মার স্বরূপ—অদৃশ্য অর্থাৎ দর্শনাতীত, তাৎপর্য্যতঃ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অগোচর। অগ্রাহ্য অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অতীত। গোত্রহীন বলায়, তাহার অপূর্ব্বত্ব বা সনাতনত্ব বোধ হয়। বর্ণশূন্য অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত; বর্ণ—শ্বেতকৃষ্ণ প্রভৃতি—সত্ত্বাদিগুণের ধর্ম্ম। চক্ষুশ্রোত্রহস্তপদবিহীন। আত্মস্বরূপের হস্তপদাদি নাই। স্থূল ও দৃশ্যমান পদার্থেরই করচরণাদি থাকা সম্ভব। উৎপত্তিবিনাশশূন্য, বিভু, সর্ব্বত্রাবস্থিত আকাশবৎ, আবার 'অণোরণীয়ান্'। আরও ভূতযোনি, জগতের জীবজাত তাঁহারই হইতে উদ্ভূত।

এখন প্রশ্নের ভাবাবিষ্কারক উত্তর। জীবজগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ কুণ্ডলবলয়াদির সহিত সুবর্ণের সম্বন্ধের মত। ব্রহ্ম হইতে জগৎ উদ্ভূত হয়, আর কিছুরই অপেক্ষা করেনা। উর্ণনাভির দৃষ্টান্ত বড় সুন্দর। কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণ করে, কিন্তু মৃত্তিকা চাই। উর্ণনাভি জাল প্রস্তুত করে, সূত্রও নিজ শরীর হইতে বাহির করে; ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টিও তদ্রূপ। পৃথিবী ওষধি প্রসব করে, ওষধিবীজও পৃথিবীর নিজস্ব। কেশ লোম উৎপন্ন হইতে, পুরুষশরীর ভিন্ন অন্য কোনও উপাদান দ্রব্যের আবশ্যকতা নাই। ব্রহ্ম, উভয়কারণ। বেদান্তশাস্ত্র বলেন "স্বপ্রধানজগতের তয়া নিমিত্তং স্বোপাধিপ্রধানতয়া উপাদানঞ্চ ভবতি"। প্রকৃতপক্ষে যদিও সুবর্ণকুণ্ডলের মত প্রকৃতিবিকৃতিভাব ব্রহ্ম ও জগতে অসম্ভব, তথাপি জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত ও অধ্যস্ত ইহা নিঃসন্দেহ, সুতরাং জগতের ব্রহ্মসত্তা ব্যতীত অন্য প্রকৃতসত্তা নাই বিধায়, ব্রহ্মজ্ঞানে জগতের জ্ঞান সুসম্ভাবিত। অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেওয়ার অভিপ্রায় বিশদীকরণ। সহসা সকলদ্রব্যসম্পন্ন জগৎ উৎপন্ন হয় নাই, ক্রম পরম্পরায় হইয়াছে, ইহাই লক্ষ্য।

উৎপত্তি ক্রমের আভাস দেওয়া হইতেছে। তপস্যা অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম উপচিত হন, জগদুৎপত্তির কারণ সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিসম্পন্নত্ব সত্যসঙ্কল্পত্বাদিবিশিষ্ট হন। পিতায় যেমন অঙ্কুরভাবাপন্ন পুত্র বিদ্যমান থাকে, ব্রহ্মেও কারণাত্মক জগৎ বিরাজমান হয়। উপচিত ব্রহ্ম হইতে অন্ন অর্থাৎ অব্যাকৃততত্ত্ব উৎপন্ন হয়। সমস্ত জগতের অবিতর্ক্য—সাধারণ সমবায় স্বরূপ সূক্ষ্ম পার্থক্যানুভবহীন অবুদ্ধভাবই অব্যাকৃততত্ত্ব। এই তত্ত্ব হইতে হইল প্রাণ। প্রাণ হিরণ্যগর্ভ। জ্ঞানক্রিয়াশক্তিসম্পিণ্ডিত জীবসাধারণ হিরণ্যগর্ভ, এক কথায় শক্তিমৎসূক্ষ্মশরীরসমষ্টি। তাহা হইতে সঙ্কল্পবিকল্পসংশয়নির্ণয়স্বভাব মন। সূক্ষ্ম মানসজগৎ পরিণত হইয়া স্থূল বাহ্যজগৎ হইল; মন হইতে সত্য অর্থাৎ ভূতপঞ্চক উৎপন্ন হইল। ভূতের বিকাশ সপ্তলোক স্থূলসংস্থান। স্থূল লোকে কর্ম্ম, কর্ম্মফলাদি ক্রমে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। বাহ্যজগৎ মানসজগতের প্রতিনিধি, মানসজগৎ ব্রহ্মের সঙ্কল্পসংজাত, সুতরাং কার্য্যকারণসম্বন্ধ ক্রমাধীন হইলেও স্থির।

ব্রহ্ম সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ। সামান্যতঃ এবং বিশেষতঃ সর্ব্বজ্ঞান প্রভৃতি। তাঁহার জ্ঞানবিকার সর্ব্বজ্ঞত্বলক্ষণতপ। সেই

সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্ম হইতে কার্য্যব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ ক্রমে উৎপন্ন। নাম, রূপ, তাহাহইতে উৎপন্ন। অব্যাকৃত দশা হইতে ব্যাকৃতাবস্থা প্রাপ্তি হইতে নামরূপ আসিয়া পড়ে। "তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাকরবানি" শ্রুতিবাক্য। তৎপরে ব্যাকৃতাবস্থা হইতে অন্ন অর্থাৎ ব্রীহ্যাদি উৎপন্ন হইল। উদ্ভিজ্জসৃষ্টি ব্যাকৃতাবস্থার অল্প পরে, একথা অধুনাতন বিজ্ঞান শাস্ত্র ও স্বীকার করেন। এখানে অব্যাকৃত ভাবের পরবর্ত্তী অবস্থা, ব্যাকৃত হইবার প্রণালীগত পরিবর্ত্তন, এবং ব্যাকৃত হওয়ার অল্পপরবর্ত্তী উদ্ভিজ্জসৃষ্টি এই সংক্ষিপ্ত অবস্থা সমালোচন দ্রষ্টব্য। ব্রহ্মও জগতের সম্বন্ধ নির্ণয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞানে জগৎ-জ্ঞান হইবার রহস্যোদ্ধার করা হইল।

শ্রীকেদারনাথ ভারতী।

আপস্তম্বীয় গৃহ্যসূত্র।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

পঞ্চম পটল। ত্রয়োদশ খণ্ড।

গৌরিতি গাং প্রাহ। ১৫

মধুপর্ক প্রাশন পরিসমাপ্তির পরে, গোদান-ব্যাপার ব্যাখ্যাত হইতেছে। মধুপর্ক প্রাশন শেষ হইলে, দাতা "গৌঃ" অর্থাৎ গরু (আনয়ন করিয়াছি) এই কথাটী বলিবেন। বেদজ্ঞ অতিথি গোমাংসমধুপর্ক পাইবার যোগ্য। শাস্ত্রে আছে "গোমধুপর্কার্হো বেদাধ্যায়ঃ।" অতিথির অন্য নাম গোঘ্ন।

উত্তরয়াভিমন্ত্র্য তস্যৈ বপাং শ্রপয়িত্বোপস্তীর্ণাভিঘারিতাং মধ্যমেনান্তমেন বা পলাশপর্ণেনোত্তরয়া জুহোতি। ১৬

সেই গরুকে প্রথমে "গৌরস্যপহতপাপ্মা" ইত্যাদি মন্ত্রে অভমন্ত্রিত করিয়া, পরে গরুর বপা উৎখেদ পূর্ব্বক বপাশ্রপণীদ্বয় দ্বারা গ্রহণ করিয়া, ঔপাসন অগ্নিতে বা পাকার্থ-লৌকিকাগ্নিতে পাক করিয়া, উপস্তীর্ণ এবং অভিঘারিত (উল্টাইয়া ঘৃত ধারায় প্লাবিত) করিয়া, পলাশপত্র সহ সেই পাকার্থ অগ্নি-তেই 'অগ্নিঃ প্রাশ্নাতু' এই মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক হোম করিবে। পলাশপত্রের একটু বিশেষত্ব আছে। "মধ্যমেন অন্তমেন বা" হয় মধ্যমটী, না হয় অন্তিমটী দ্বারা। দুই পত্রযুক্ত শাখা হইলে, তাহা হইতে পত্র গ্রহণ করা চলিবে না। কারণ তিনটীর কম হইলে মধ্যম থাকা সম্ভব নহে। এই স্থলে অবশ্য ইহা বুঝিতে হইবে যে, গরুকে হত্যা না করিয়া বপাহোম করা অসম্ভব। বপা, চর্ব্বিজাতীয় সামগ্রী। জীবিত রাখিতে হইলে, বপা উৎখেদ করিবার প্রত্যাশা করা যায় না, কারণ চর্ব্বি লইতে হইলেই তাহার মরণ অবশ্যম্ভাবী। প্রাচীনকালে এই প্রথা দূষণীয় ছিল না। শাস্ত্রে নানাস্থানে গোহত্যার উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়; ব্যাস বসিষ্ঠের জন্য রাজভবনের গোবৎস সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। আদিপুরাণে দৃষ্ট হয়—কলির প্রথমভাগে তৎসাময়িক পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ইহা নিবারিত হইবার পূর্ব্বাভাস আছে। বস্তুতঃ যবনসংসর্গে হিন্দুজাতি স্বতন্ত্রতা

রক্ষার জন্য গোখাদক মুসলমানদিগের মধ্যে আদৃত—গোবধপ্রথা পরিবর্ত্তন করেন। অধুনাতন হিন্দুসমাজে ইহা অতীব অপকার জনক, সন্দেহ নাই। মহর্ষি আপস্তম্বের সময়ে ইহা সার্ব্বজনীন ছিল না। ব্যাখ্যা-কার সুদর্শনাচার্য্যের সময়েও ইহা ইচ্ছাধীন ছিল, অর্থাৎ কেহ কেহ ইহা করিতেন না। সুদর্শন বলেন "যদি প্রতিগ্রহীতা সংজ্ঞপনমিচ্ছেৎ তদা" ইত্যাদি।

সূত্রস্থ 'তস্যৈ' পদের অর্থ তাহার (তস্যাঃ) অর্থাৎ সেই গরুর। এখানে বিভক্তিব্যতিক্রম হইয়াছে; ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থীর প্রয়োগ নূতন নহে। এরূপ বিভক্তিবিপরিণাম ব্যাকরণের ইঙ্গিতে সমর্থিত।

যদি উৎসৃজেৎ উপাংশু উত্তরান্ জপিত্বা "ওমুত্সৃজ" ইত্যুচ্চৈঃ।১৭

যদি প্রতিগ্রহীতা গাভীকে হত্যা করিতে অনিচ্ছুক হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহেন, তবে "যজ্ঞোবর্দ্ধতাং" ইত্যাদি উত্তরবর্ত্তী মন্ত্র তিনটী নীরবে পাঠ করিয়া, "ওঁ উৎসৃজ" এই কথাটী উচ্চারণ পূর্ব্বক ত্যাগ করিবেন। এখানে "উৎসৃজেৎ" এই সূত্রস্থ পদটীর অর্থ—ত্যাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এখানকার লিঙ্ প্রত্যয়টী কামপ্রবেদনে অর্থাৎ স্বাভিপ্রায় প্রকাশনে, সুতরাং অর্থ—যদি ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এখানে সকলেরই মনে রাখা উচিত যে, গোহত্যায় বিরত হইলেও মাংসানয়ন আবশ্যকীয় হইবে, কেন না "নামাংসো মধুপর্কো ভবতীতি" শাস্ত্র বাক্যে অবগত হওয়া যায় যে, আতিথ্য কর্ম্মে মাংসাদিহীন মধুপর্ক অগ্রাহ্য। প্রতিগ্রহীতার অমত মতে গোমাংস ত্যক্ত হইল, কিন্তু অন্য মাংস চাই।

অন্নং প্রোক্তং উপাংশু উত্তরৈরভিমন্ত্র্য ওঁ কল্পয়তেত্যুচ্চৈঃ।১৮

ততঃপর প্রদাতা "ভূতং" ইত্যাদি মন্ত্র নীরবে পাঠ করিয়া, পূজ্যের নিকট সিদ্ধ অন্ন প্রদান করিবেন। ঐরূপে প্রদত্ত অন্ন প্রতিগ্রহীতা তৎপরস্থ পাঁচটী মন্ত্র পাঠ সহকারে অভিমন্ত্রিত করিয়া, "ওঁ কল্পয়ত" এই কথাটী উচ্চরবে উচ্চারণ করিবেন। এই ব্যাপারটী সুদর্শনাচার্য্যের মতে "সিদ্ধান্ন-সম্প্রদান"। হরদত্ত ইহাকে "মধুপর্কগ্রহণ"ই বলেন। তাঁহার মতে এই সূত্রের "অন্ন" শব্দের অর্থ মাংস। অন্ন অর্থ ভক্ষ্যবস্তু, এখানে প্রসঙ্গতঃ মাংস। ফলতঃ যাহাই হউক, প্রতিগ্রহীতার জন্য ভক্ষ্যপ্রদানই এই সূত্রের প্রতিপাদ্য। সে ভক্ষ্য প্রসিদ্ধ অন্ন অথবা মাংস, তাহার বিচার-প্রসঙ্গে ব্যবহারের সাহায্য পাওয়া যায় না। অতএব সময়ানুসারে উভয়মতই সঙ্গত মনে করি।

আচার্য্যায় ঋত্বিজে শ্বশুরায় রাজ্ঞ ইতি পরিসম্বৎসরাৎ উপতিষ্ঠদ্ভ্যঃ এতাবৎকার্য্যম্।১৯

এই যে সকল কার্য্য কথিত হইল, এই গুলির অন্যত্র উপযোগিতা কথিত হইতেছে। স্নাতক আগত হইলে, তাহার উপবেশন জন্য 'কূর্চ্চ' নামক কুশাসন প্রদান হইতে, এই সিদ্ধান্ন সম্প্রদান পর্য্যন্ত—সকলগুলি কার্য্যই বৎসরান্তে গৃহাগত আচার্য্য, ঋত্বিক্, শ্বশুর এবং রাজার প্রতি করিতে হইবে।

এখানে একটী দ্রষ্টব্য বিষয় এই যে, সূত্রস্থ "রাজ্ঞে" পদের অর্থ রাজাকে, কিম্বা ব্রাহ্মণকে। ব্যাখ্যাকারগণের মতে উভয় অর্থই সঙ্গত। একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মত, সময় ভেদে উভয়ের আগমনেই উক্তরূপ অনুষ্ঠান সঙ্গত হইতে পারে বটে, কিন্তু সমকালে ব্রাহ্মণ এবং রাজা আগমন করিলে, উভয়ের প্রতি কিরূপ করিতে হইবে, ইহা টীকাকারগণ বলেন নাই। একটী শব্দের বিভিন্ন প্রয়োগে বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে, কিন্তু যুগপৎ বহু-অর্থবোধে সকৃদুচ্চারিত শব্দের সামর্থ্য নাই। এখন বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, কোনও সময়ে রাজা অর্থে ব্রাহ্মণ গৃহীত হইতেন, তখন প্রকৃত রাজা ঐ প্রসঙ্গে ঐ শব্দের বাচ্য ছিলেন না, সুতরাং প্রকৃত রাজার প্রতি ঐরূপ সপর্য্যা প্রদত্ত হইত না। আবার এক সময়ে, এই সূত্রস্থ 'রাজা' শব্দের অর্থ ব্যতিক্রম হইয়া, প্রকৃত রাজাই বাচ্য হইয়াছিলেন, তখন আবার ব্রাহ্মণ উক্তরূপ সপর্য্যার অধিকারী হইতেন না। বস্তুতঃ এরূপ আলোচনায় বিশেষ ফল লাভের প্রত্যাশা নাই। আমরা এক জন খ্যাতনামা পণ্ডিতের কথা প্রকাশ করিয়া নিরস্ত হইলাম। সূত্রস্থ "পরিসংবৎসরাৎ" শব্দের অর্থ "সম্বৎসরাদূর্দ্ধং।" সম্বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বে যদি আচার্য, ঋত্বিক, বা শ্বশুর ও রাজা মহাশয়ের পুনরাগমন হয়, তবে এ সকল ব্যাপার কিছু করিতে হইবে না।

সকৃৎপ্রবক্ত্রে চিত্রায় ।২০

বেদবাক্যের প্রবক্তা লোকপ্রসিদ্ধ কোনও ব্যক্তি গৃহে আগমন করিলে, তাঁহার জন্য একবার মাত্র ঐরূপ সপর্য্যা-বিধান। পূর্ব্বের সূত্রে যে সপর্য্যার কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রতিবর্ষান্তে আগত আচার্য্যাদির প্রতি প্রত্যেক আগমনেই করিতে হইবে, কিন্তু বর্ত্তমানসূত্রপ্রতিপাদিত বিষয়, কেবল মাত্র একবার কর্ত্তব্য, বারম্বার নহে। চিত্র অর্থ প্রকাশ, অর্থাৎ লোকবিখ্যাত ব্যক্তি।

পঞ্চম পটল পরিসমাপ্ত।

ত্রয়োদশখণ্ড সম্পূর্ণ।

ষষ্ঠপটল। চতুর্দ্দশ খণ্ড।

সীমন্তোন্নয়নং প্রথমে গর্ভে চতুর্থে মাসি ।১

এই প্রকরণে সীমন্তোন্নয়ন নামক সংস্কার কর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইবে। সীমন্ত শব্দের অর্থ কেশমধ্যস্থ রেখাবিশেষ, যাহাকে প্রচলিত ভাষায় "সিঁতি" বলে। মস্তকের কেশ-রাশি দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, মধ্যদেশে সীমন্ত বা "সিঁতি" রাখার প্রথা রমণীমহলে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সীমন্তের উন্নয়ন ব্যাপার যে সংস্কার কার্য্যে সম্পাদিত হয়, তাহাই সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার। গর্ভাবস্থায় প্রথমে রমণীকে কোনও প্রকার বিলাসসম্পর্ক স্পর্শ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, এই জন্য প্রথমাবধি কেশপ্রসাদন প্রভৃতি রহিত করা হয়, পরে চতুর্থ মাসে শাস্ত্রীয় প্রথানুসারে শুদ্ধিকামনায় গর্ভবতীর সীমন্তোন্নয়ন বা সিঁতিপাড়ান কার্য্য করা হয়। এই ব্যাপারের জন্য প্রথমগর্ভই

নির্দ্ধারিত, প্রতিবার গর্ভধারণেই যে গর্ভবতীর সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার আবশ্যক হইবে এরূপ নহে। শাস্ত্রীয় সংস্কারজশুদ্ধি একবার করিলেই হয়। এই মন্ত্রযুক্ত শাস্ত্রীয় সংস্কার দ্বারা, গর্ভের বিশুদ্ধি হয়, বিশ্বাসী হিন্দুর এইরূপ সিদ্ধান্ত।

ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা আশিষো বাচয়িত্বা অগ্নেরুপসমাধানাদি আজ্যভাগান্তে হন্বারব্ধায়ামুত্তরা আহুতীর্হুত্বা জয়াদি প্রতিপদ্যতে।২

প্রথমে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে, পরে তাহাদের দ্বারা আশীর্ব্বাচন করাইবে; অনন্তর অগ্নির উপসমাধান হইতে আরম্ভ করিয়া, আজ্যভাগ হোম পর্য্যন্ত সমস্ত কার্য্যগুলি সম্পাদন করিয়া, প্রকৃত কার্য্যের আটটী প্রধানাহুতি প্রদান পূর্ব্বক জয়, অভ্যাতান, নারিষ্ট প্রভৃতি হোমগুলি করিতে হইবে। আটটী প্রধানাহুতির 'ধাতাদদাতু নোরয়িম্" ইত্যাদি মন্ত্রে চারিটী, আর "যস্ত্বা হৃদা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা চারিটী। এই সাকল্যে অষ্টাহুতিই প্রধান-আহুতি।

পরিষেচনান্তং কৃত্বা অপরেণাগ্নিং প্রাচীমুপবেশ্য ত্রেণ্যা শললা ত্রিভির্দর্ভপুঞ্জীলৈঃ শলালুগ্রপ্সেনেতি ঊর্দ্ধং সীমন্তং উন্নয়তি ব্যাহৃতীভিরুত্তরাভ্যাং চ।৩

পরিষেচনান্ত কর্ম্মসমূহ সমাপন পূর্ব্বক, অগ্নির অপর দিকে গর্ভবতী স্ত্রীকে পূর্ব্বাভিমুখে বসাইয়া, ত্রেণী শললী, দর্ভপুঞ্জীল অর্থাৎ; শলালুগ্রপ্স এই তিনটী বস্তুর দ্বারা, যুগপৎ ঐ স্ত্রীর সীমন্ত দেশের কেশকলাপ উন্নমিত করিয়া দিবে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ; এই তিনটী ব্যাহৃতি মন্ত্র ও "রাকামহংযাতে রাক" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্ব্বক এই কার্য্য করিতে হইবে। ত্রেণী শললী অর্থ—যাহার তিনটী স্থান শ্বেতবর্ণ এতাদৃশ সজারুর কাঁটা। হরদত্ত বলেন "ত্রিষু প্রদেশেষু এণী শ্বেতা ত্রেণী, ইকার লোপশ্ছান্দসঃ।" ত্রি + এণী = ত্র্যেণী হওয়াই সঙ্গত, কিন্তু বৈদিক অনুশাসন বলে, ইকারের লোপ হওয়ার; আর কাহার স্থানে 'য' হইবে! দর্ভপুঞ্জীল অর্থ শাস্ত্রোক্ত দর্ভপিঞ্জলী। বিশাখ কুশলতাত্রয় ঘটিতা দর্ভপিঞ্জলীই এই দর্ভপুঞ্জীলের স্বরূপ, ক্রিয়াকাণ্ডে সকলেই বোধ হয় দর্শন করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসু, উপনয়নাদিতে দর্শন করিতে পারেন। শলালুগ্রপ্স অর্থ গোষ্ঠোডুম্বর-স্তম্ব, পিশাচোডুম্বর নামক বৃক্ষবিশেষের অপরিণত ফলের ছড়া। এই বৃক্ষের অনেকগুলি শাস্ত্রোক্ত নামের মধ্যে 'খরপত্রোডুম্বর' একটী। ব্যবহারযুক্ত স্থানে এই সকল সামগ্রীর পরিচয় সহজে পাওয়া যায়।

গায়তমিতি বীণাগাথিনৌ সংশাস্তি।৪

এই কার্য্যের জন্য প্রথমেই দুইজন বীণাগায়ক আনাইয়া রাখিতে হয়। সীমন্তোন্নয়নের পরে তাহাদিগকে "তোমরা দুজনে বীণায় গানকর' এইরূপ আদেশ করিতে হইবে। তাহারা আদিষ্ট হইয়া যত্ন সহকারে শুচিভাবে বীণাযোগে গান করিবে।

উত্তরয়োঃ পূর্ব্বা সাম্বানাম্।৫

পরবর্ত্তি ঋক্‌মন্ত্র দ্বয়ের মধ্যে যেটী পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ প্রথম "যৌগন্ধরায়ণি" ইত্যাদি, সেই মন্ত্রটী সাল্বদেশবাসিগণের সীমন্তোন্নয়ন উপলক্ষে বীণার গান স্বরূপ হইবে। সাল্বদেশীয়গণ সীমন্তোন্নয়নে ঐ মন্ত্রটী গান করাইবেন। ঋক্‌মন্ত্রে যে গান হয়, তাহা সুপ্রসিদ্ধ 'সামগীতি' যাঁহারা শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। সাধারণত ঋগ্বেদের মন্ত্রেই স্বরযোগে সামগান হয়। সাল্বদেশবাসী ত্রৈবর্ণিক ব্যক্তিবর্গের গৃহে সীমন্তোন্নয়নে এই ঋককে গান করিতে হইবে।

ব্রাহ্মণানাং ইতরা নদীনির্দ্দেশশ্চ যস্যাং বসন্তি।৬

অন্যদেশবাসী ব্রাহ্মণগণের (মতান্তরে সাল্বদেশবাসি ব্রাহ্মণগণের) গৃহে সীমন্তোন্নয়নে, পূর্ব্বোক্ত 'যৌগন্ধরায়ণি ইত্যাদি প্রথমমন্ত্র ব্যতীত, আর একটী (পরবর্ত্তী) মন্ত্র অর্থাৎ 'সোম এব নো রাজা, ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রে গান করিতে হইবে। গাতব্য ঋক্‌মন্ত্রে "নদীনির্দ্দেশ" অর্থাৎ মন্ত্রস্থ "অসৌ' শব্দেরস্থানে সম্বোধনান্ত নদীর নামটী বসাইয়া গান করিতে হইবে। এখানে প্রশ্ন হইতেছে, কোন্ নদীর নামটী বসাইতে হইবে? উত্তর এই যে "যস্যাং বসন্তি" অর্থাৎ যাহার তীরে সে দেশের ব্রাহ্মণগণ বাস করেন। সুদর্শনাচার্য্য বলেন, যস্যাং অর্থ যাহার সমীপে। এখানকার সপ্তমী সামীপ্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্যতঃ যে দেশের অধিবাসিব্রাহ্মণগণ ঐ দ্বিতীয় ঋক্‌মন্ত্রে গান করাইবেন, তাঁহারা স্বদেশের যে নদীর তীরে বাস করেন, মন্ত্রের "অসৌ" শব্দের স্থানে সেই নদীর সম্বোধনান্ত নাম সংযোগ করিয়া লইবেন।

যবান্ বিরূঢ়ান্ আবধ্য বাচংযচ্ছতি আনক্ষত্রেভ্যঃ।৭

কতকগুলি অঙ্কুরিত যব সূত্রদ্বারা গ্রথিত করিয়া, ঐ গর্ভবতী স্ত্রীলোকের শিরোদেশে কেশে বাঁধিয়া দিবে। ঐ গর্ভবতী নারী সীমন্তোন্নয়ন দিনে, নক্ষত্রোদয় পর্য্যন্ত বাগ্‌যম (কথাবন্ধ) করিয়া থাকিবেন। নক্ষত্র উদিত হইলে, পরে কথা বলিতে পারিবেন। এই নীরবতায় গভীর রহস্য আছে। ঐ দিবসে তিনি কথা বলিতে পারিলে, বহুলোকসমাগমে নানাপ্রসঙ্গে তাঁহার মানসিক পবিত্রভাবের বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হইতে পারে; সুতরাং গর্ভের বিশুদ্ধি ও হিতকামনায় উৎসবদিনে সমাগতা নানাভাবের রমণীর সহিত আলাপ করিবার সুযোগ না হওয়াই ভাল। সন্ধ্যার পর যখন সকলে স্বগৃহে গিয়াছে, তখন বলায় আশঙ্কা নাই। বারান্তরে অপরাংশ আলোচিত হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ ভারতী
যশোহর বেদবিদ্যালয়।

পুণ্যভূমি মিথিলা।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

দ্বারভাঙ্গা নগরীতে মহারাজার দুইটী উদ্যান দেখিবার উপযুক্ত; একটির নাম

রামবাগ, অপরটির নাম আনন্দবাগ। প্রথমটিতে মহারাজা স্বয়ং, এবং দ্বিতীয়টিতে মহারাণী বাস করেন। দ্বারভাঙ্গার রাজবংশ মৈথিলী ব্রাহ্মণ। এই পুরাতন রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে শুনা যায়, মহেশঠাকুর নামে এক ব্রাহ্মণাধ্যাপক চতুষ্পাঠী মধ্যে ছাত্রদিগকে বেদ বেদান্তাদি অধ্যাপনা করাইতেন। তাঁহার রঘুনন্দন নামে এক ছাত্র নানা বিদ্যায় অপূর্ব্ব পারদর্শিতা লাভ করিয়া, বহুদেশে অতুল যশোপার্জ্জন পূর্ব্বক পরিণামে দিল্লীতে মুসলমান সম্রাটের সভায় উপনীত হয়েন। বাদসাহ, তাঁহার নানা ভাষায় অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়া, "ভোর পরগণা" জায়গীর স্বরূপে দান করেন। ভোর পরগণা, দ্বারভাঙ্গা জেলার অধীন মধুবনী মহকুমায় অবস্থিত। রঘুনন্দন দেশে প্রত্যাগত হইয়া, তাঁহার শিক্ষাগুরু মহেশ ঠাকুরকে ঐ জায়গীর গুরুদক্ষিণা রূপে অর্পণ করেন। এই মহেশ ঠাকুর দ্বারভাঙ্গা রাজবংশের আদি পুরুষ। মহেশ ঠাকুর ক্রমে ভৌপুর হইতে ঝল্লারপুর, এবং ঝল্লারপুর হইতে রাজনগর গ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। আরও কিছু কাল পরে হাটী নামক গ্রামে রাজধানী স্থাপিত হয়, তথায় নানা কারণে অসুবিধা হওয়ায়, রাজগ্রামে—রাজারা আসিয়া বাস করেন। তদন্তর বর্ত্তমান দ্বারবঙ্গে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দ্বারভাঙ্গায় যে কয়েকজন রাজা বাস করিয়াছেন, তাঁহাদের পুরুষানুক্রমে নামের তালিকা দেওয়া যাইতেছে—মাধো সিং, ছত্র সিং, রুদ্র সিং, মহেশ্বর সিং, লক্ষ্মীশ্বর সিং, এবং (বর্ত্তমান রাজা) রামেশ্বর সিং। দ্বারভাঙ্গা নগরীর পার্শ্বে কমলেশ্বরী নদী প্রবাহিত।

মিথিলা অঞ্চলে ভাদ্র মাসে বৎসর শেষ হয়, এই বর্ষের নাম "ফসলী"; কিন্তু মিথিলাবাসী মহাজন (ব্যবসায়ী) দিগের নিয়মানুসারে বিজয়া দশমী দিবসে বৎসর শেষ হইয়া থাকে। এই মহাজনগণের অধিকাংশ আগরওয়ালা বেণে, ইহারা উগ্রসেন রাজার বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। দ্বারভাঙ্গার আগরওয়ালারা বিশেষ ধনবান ও সম্ভ্রান্ত। রায় সাহেব গঙ্গা প্রসাদ, রায় সাহেব গোবর্দ্ধন লাল, লালা যুগল কিশোর, লালা ব্রজবিহারী লাল, গোবিন্দপ্রসাদ প্রভৃতি প্রখ্যাত বণিয়াগণ যেমন ধনবান, তেমনি বিশিষ্ট 'হিন্দু' এবং পরোপকারী। এই আগরওয়ালাদিগের মধ্যে অতি পুরাকাল হইতে নিয়ম আছে যে, ইহারা কন্যার শ্বশুরালয়ে কখনও পদার্পণ করে না; নিতান্ত বাধ্য হইয়া বিবাহিতা কন্যার শ্বশুরালয়ে গেলেও, সেই বাটীতে একবিন্দু জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করে না। যদি সমস্ত পৃথিবী উল্টাইয়া যায়, তাহাতেও ক্ষতি নাই, কিন্তু আগরওয়ালাগণের এই নিয়ম কদাপি পরিবর্ত্তিত হইবেনা, ইহা নিশ্চয়।

মিথিলা অঞ্চলে ইংরাজি টাকা ও পয়সা ব্যতীত, নেপালের পয়সা প্রচলিত আছে। ঐ পয়সার সাধারণ নাম ঢেবুয়া বা ঢেউয়া; কেহ কেহ কাঁচা, ঠুব্রী এবং লোইয়া কহিয়া থাকে। এদেশে আম্র, কাঁঠাল, লিচু যেমন প্রচুর, তেমনি সস্তা। মৈথিলী ব্রাহ্মণেরা শাক্ত। ইহাদের উপাধি—সিংহ, মিশ্র,

ঝা, ওঝা, পাঠক, তেওয়ারী, শুকুল, চৌবে, দোবে, খাঁও, পাড়ে, মণ্ডল, হাজরা, আচার, পরিহস্ত প্রভৃতি। ব্রাহ্মণদিগের মৃতদেহ যে স্থানে দাহ হইয়া থাকে, অন্য জাতির মৃতদেহ সেস্থানে দাহ হইবার প্রথা নাই। দ্বারভাঙ্গানগরীতে মহারাজাদিগের মৃতদেহ দাহন করিবার জন্য স্বতন্ত্র স্থান আছে; দাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে সেই স্থানে অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপিত হইয়া থাকে। এদেশে কায়স্থেরা দ্বাদশ সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তদ্‌যথা—সূর্য্যধ্বজ, অম্বষ্ঠ, করণ, শ্রীবৎস, ভটনাগর, শকসেনা, মৈথিলী, মাথুর প্রভৃতি। কায়স্থের উপাধি -লাল, সিংহ, সহায়, প্রসাদ, মুন্সী, চৌধুরী, দাস, ইত্যাদি। শাকলদ্বিপী ব্রাহ্মণেরা চিকিৎসাব্যবসায়ী। অযোধ্যার মহারাজা শাকলদ্বিপী ব্রাহ্মণ। গুজর গৌড়, আদিগৌড় ও গৌড় এই নামে তিন সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ আছেন; সম্ভবতঃ ইহাদের আদিপুরুষ গৌড়-(বাঙ্গাল) দেশবাসী। দ্বারভাঙ্গা জেলান্তর্গত সৌরাট গ্রামে "কুসুমাঞ্জলি" প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ উদয়নাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন; বিস্‌ফি নামক গ্রাম ইনি ব্রহ্মোত্তর স্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পীতাম্বর বিদ্যানিধি, মিথিলার অন্যতম প্রধান কবি ও পণ্ডিত; মধুবানী মহকুমার মাংগোরিণী গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। বিহারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির নাম হরিশ্চন্দ্র। "পুরুষ পরীক্ষা" গ্রন্থের প্রণেতা বিদ্যাপতি ঠাকুর, মিথিলায় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বারভাঙ্গা নগরীতে একটি বাঙ্গালী বংশ "জমিদার" বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছেন, এই বংশ জাতিতে তাম্বুলী— নাম বাবু মহেশচন্দ্র সিংহ, বাবু রাজেন্দ্র লাল সিংহ। এদেশে ইঁহাদের জমিদারী আছে। বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা গৌরবের কথা বটে। মহারাজা লক্ষ্মীশ্বর সিংহ মহাশয়, একজন বাঙ্গালী ব্রহ্মচারীকে দ্বারভাঙ্গা নগরে আনয়ন পূর্ব্বক, এখানে তাঁহার অবস্থানের জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দেন, ঐ ব্রহ্মচারী যাবজ্জীবন মাসিক অর্দ্ধশত মুদ্রা হিসাবে বৃত্তি পাইবেন এরূপ পাকা বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

মিথিলার সর্ব্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্রের নাম জনকপুর। রাজর্ষি জনক ও তাঁহার কন্যা সীতার ইহাই জন্মস্থান। এই স্থানেই হরধনুর্ভঙ্গ করিয়া, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র জনকদুহিতাকে বিবাহ করেন। জনকপুরের বিবরণ প্রস্তাবান্তরে লিখিত হইবে।

সমাপ্ত।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

কর্ম্ম ও চিত্রগুপ্ত।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

"আকাশস্তু বিজ্ঞেয়ঃ শব্দো বৈশেষিকো গুণঃ।" শব্দই আকাশের বিশেষগুণ; শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাই বলিয়া যে আকাশের অন্যান্য গুণ নাই, ইহা আর্যশাস্ত্রের উপদেশ নহে। সূক্ষ্মবায়ুর উৎপাদিকা শক্তি সূক্ষ্মাকাশে ছিল বলিয়াই সূক্ষ্মাকাশ হইতে সূক্ষ্মবায়ুর উৎপত্তি। সেইরূপ সূক্ষ্মবায়ুর মধ্যে সূক্ষ্ম

জ্যোতিঃ, সূক্ষ্মজ্যোতির মধ্যে সূক্ষ্মজল, সূক্ষ্মজলের মধ্যে সূক্ষ্মক্ষিতির উৎপত্তির বীজ নিহিত ছিল বলিয়াই "আকাশাদ্বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ, অগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।" কিন্তু এই সূক্ষ্ম অবস্থায়, তাহারা জগৎনির্ম্মাণের উপযোগী হয় নাই; এবং এই অবস্থায় তাহাদের বহুকাল পরস্পর স্বতন্ত্রভাবে থাকিবার কথা, স্মৃতি ও পুরাণাদির অনেক স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। এতদবস্থাপন্ন আকাশাদিকে শাস্ত্রে সূক্ষ্মভূত, মহাভূত, পঞ্চতন্মাত্র এবং অপঞ্চীকৃত ভূত কহে। * তাহার পর কালক্রমে, এক সূক্ষ্মভূত অপর চারিটীর কিছু কিছু গুণ গ্রহণ করিয়া, জগৎরচনার উপযুক্ত হইয়াছিল। এই অবস্থায় তাহারা স্থূলভূত বা স্থূলপ্রপঞ্চ নামে উক্ত হয়, এবং তাহাদের এইরূপ পরিণতিকে "পঞ্চীকৃতভূত" কহে।

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে:—"ঈশ্বরের শক্তিস্বরূপ মহত্তত্ত্বাদি পরস্পর একীভূত না হওয়াতে, বিশ্বসৃষ্টি বিষয়ে তাহারা অসমর্থ; ভগবান্ তাহাদের মুখে তাহাদের এইগতি অবগত হইলেন; সেই সময়ে তিনি সংহনন-কারিণী প্রকৃতির সহিত অন্তর্য্যামী রূপে একেবারে ত্রয়োবিংশ তত্ত্বে প্রবেশ করিলেন। এই তত্ত্বসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহাদের ক্রিয়া অথবা জীবের অদৃষ্ট, যাহা বিলীন ছিল, তাহার বিকাশ করণান্তর, সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্বকে একত্র সংযুক্ত করিয়া দিলেন। যখনই ঐ মহদাদিতত্ত্বগণের ক্রিয়াশক্তি বিকশিত হইল, তখনই তাহারা পরমেশ্বর ভগবানেরই প্রেরণায় আপনাদের অংশ দ্বারা অধিপুরুষ অর্থাৎ বিরাড়্দেহ উৎপন্ন করিল, অর্থাৎ সেই বিশ্বস্রষ্টা মহদাদি তত্ত্বসকল, আত্মপ্রবেশকারী পরমেশ্বরের সম্বন্ধ থাকাতে, পরস্পর মিলিত হইয়া স্ব স্ব অংশে ক্ষুভিত হইল, তাহাতেই এই চরাচর লোক সকল অবস্থিত রহিয়াছে। অধিপুরুষ নামে হিরণ্ময়—সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ আপনার সহিত শায়িত জীবসমূহ সহ পরিবর্দ্ধিত হইয়া, এই ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত জলমধ্যে বাস করিয়াছিলেন। তাহাতে উল্লিখিত মহদাদি তত্ত্ব সকলের কার্য্য-স্বরূপ গর্ভ অর্থাৎ ঐ বিরাড্-মূর্ত্তি, দৈবশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও আত্মশক্তি বিশিষ্ট, এক, দশ ও তিনপ্রকারে বিভক্ত হইল, অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি হৃদয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপে একপ্রকার, এবং ক্রিয়াশক্তি দ্বারা প্রাণরূপে দশ প্রকার, আর আত্মশক্তি অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূত ভেদে আপনাকে তিনপ্রকার করিল। *

* "ইমান্যেব সূক্ষ্মভূতানি তন্মাত্রাণ্যপঞ্চীকৃতানি চোচ্যন্তে। এতেভ্যঃ সূক্ষ্মশরীরাণি স্থূলভূতানি চোৎপদ্যন্তে॥" (বেদান্তসার।)

* সৃষ্টি ত্রিবিধ অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈব। মহত্তত্ত্বের বিকার অহঙ্কার ত্রিবিধ—বৈকারিক, তামস ও ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয়জ্ঞানও তিনের পরস্পর সাপেক্ষভাবে প্রকাশিত হয়। চক্ষু, রূপ ও জ্যোতিঃ, এই তিনের মধ্যে একটীর অভাব হইলে দর্শন জ্ঞান হয় না। সেইরূপ "জিহ্বা, রস ও বরুণ, নাসিকা, গন্ধ ও অশ্বিনী কুমার, চিত্ত, চেতয়িতব্য, ও বাসুদেব, এবং মন, মন্তব্য ও মন্ত্র ইত্যাদি আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক।" সুতরাং একের বর্ণনায়

জনৈক নাগা সন্ন্যাসী এই পঞ্চীকরণ প্রস্তাবদ্ধ রূপে, আমার নিকট অতিপ্রকৃষ্ট রূপে বর্ণনা করেন। কিন্তু তাহা কোনও শাস্ত্রগ্রন্থে আমার নয়নগোচর হয় নাই বলিয়া, এস্থলে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইলাম না—কিন্তু এই পঞ্চীকরণ সম্বন্ধে "তত্ত্বপ্রদীপ" গ্রন্থে যেরূপ আছে তাহা এই :—

ততশ্চেশ্বরকলাযুক্তাঃ সর্ব্বে সংহত্যকারিণঃ।
অণ্ডমুৎপাদয়ামাসুরীশ্বরায়তনম্ শুভম্ ॥২৬
তদণ্ডে পঞ্চভূতেভ্যঃ শরীরাণীশ্বরোঽসৃজৎ।
পঞ্চীকৃতেভ্যো জীবানাং গুণাদৃষ্টবশাৎ বশী ॥২৭
দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈঃ যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চতে ॥২৮

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বাদি, ঈশ্বরের সংহননকারিণীশক্তি সংযুক্ত হওয়ায় অণ্ডরূপে পরিণত হইল।* ঐ অণ্ডমধ্যে অপঞ্চীকৃত ভূতাদি নিম্নলিখিত রূপে পঞ্চীকৃত হইয়া, জীবের গুণাদৃষ্টবশাৎ শরীর উৎপন্ন করিল। প্রত্যেক তত্ত্ব আপনাকে প্রথম দুইভাগে বিভক্ত করিল, এবং প্রথমার্দ্ধকে পুনরায় চারিভাগে বিভাগ করিয়া, অপর চারিটীকে এক এক ভাগ দান করায়, প্রত্যেকেই পঞ্চগুণসম্পন্ন হইল। আকাশ স্বকীয় গুণ—শব্দকে দ্বিধা করিয়া, একার্দ্ধাংশ নিজে রাখিয়া, অপরার্দ্ধাংশের এক চতুর্থাংশ বায়ুকে, এক চতুর্থাংশ তেজকে, এক চতুর্থাংশ জলকে এবং এক চতুর্থাংশ পৃথিবীকে দান করিল। এইরূপে পঞ্চভূত উল্লিখিত প্রণালীতে বিভক্ত হওয়ায়, প্রত্যেকেই পঞ্চগুণই প্রাপ্ত হইল। কিন্তু এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে, যদি আকাশে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ পঞ্চ গুণই বিদ্যমান থাকে, তবে আকাশকে কেবল শব্দগুণেরই—আশ্রয়ীভূত কেন বলা যায়? ইহার উত্তরে, ইহা বলা যাইতে পারে যে, শব্দগুণের আধিক্য বশতঃ আকাশকে শব্দগুণের আশ্রয় বলা গিয়া থাকে।

উপরি উক্ত সূক্ষ্মাকাশের সহিত বৈজ্ঞানিকগণের ঈথারের তুলনা হইতে পারেনা।

বা শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে অপরের অস্তিত্ব কদাচ বিলুপ্ত হয় না। আমাদের শরীরও ত্রিবিধ—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ; মতান্তরে স্থূল, লিঙ্গ ও সূক্ষ্ম। জ্ঞানদৃষ্টিতে স্থূলশরীর অনিত্য ও মিথ্যা হইলেও "আকাশ কুসুম" বা "বন্ধ্যাপুত্র" বৎ মিথ্যা নহে। রামায়ণ মহাভারতাদির আধ্যাত্মিকবর্ণনে তত্তৎগ্রন্থোক্ত মহাপুরুষগণের অস্তিত্ব বিলোপ কদাচ হয় নাই। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে দাশুর কথিত অশ্বত্থরাজোপাখ্যানে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও রুদ্রাদি দেবতা "সংকল্পের অবয়ব" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তজ্জন্য আশাকরি, চিত্রগুপ্তের আধিদৈবিক বা আধ্যাত্মিক বর্ণনায়, কেহ যেন পুরাণোক্ত আধিভৌতিক চিত্রগুপ্তের অস্তিত্ব বিলোপ আশঙ্কা না করেন। বিনীত লেখক।

* অণ্ডোৎপত্তির কথা বেদান্তশাস্ত্রে বড় অধিক দেখিতে পাওয়া যায়না; কিন্তু পুরাণাদিতে তাহা সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, তত্ত্বাদির পরস্পরে সংহতিতে একাকার হইয়া অণ্ডোৎপন্ন হওয়ায় তাহা অত্যন্ত তরল ছিল, এবং তাহার সাতটী আবরণ ছিল। লেখক।

স্থূলাকাশের সহিত ঈথারের তুলনা হইতে পারে। তান্ত্রিকগণের "অ্যাষ্ট্রাল লাইট" (Astral light) এই ঈথারেরও সূক্ষ্মাংশ। এইজন্য তাঁহারা বলেন যে "If the scientists recognize a distincton between bound ether and free ether, it amounts to the same kind of distincton as that between astral fluid and akas" যদি বৈজ্ঞানিকগণ "সসীম ও অসীম ঈথারের" পার্থক্য স্বীকার করেন, তাহাহইলে তাঁহাদের সহিত যথাক্রমে "অ্যাষ্ট্রাল লাইট" ও আকাশের (স্থূলাকাশ) সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। "সসীম" ঈথারকে সাধারণতঃ ঈথার ও "অসীম" ঈথারকে বায়ুশূন্য ঈথার বলা যাইতে পারে। কারণ স্থূলাকাশ বা বায়ুশূন্য ঈথার অতি সূক্ষ্ম, (tenuous) ও জগতের আদি পরমাণু (original matter) এবং যদিও তাহা সর্ব্বব্যাপী ও অতি সূক্ষ্ম কিন্তু "It is more dense around certain objects by reason of their molecular action" নানাবিধ পদার্থের সংহতিতে ও তাহাদের আণবিক আকর্ষণে অপেক্ষাকৃত ঘনীভূত হইয়া পড়ে। তাঁহারা আরও বলেন যে, কঠিন ও সান্দ্র পদার্থের অণু-মধ্যস্থ সূক্ষ্মতম অন্তর, অথবা গ্রহ নক্ষত্রাদির মধ্যবর্ত্তী বিশাল ব্যবধান, অথবা এই পরিদৃশ্যমান অবকাশময় স্থান, যদি বৈজ্ঞানিকগণের ঈথার হয়, এবং যদি সেই ঈথারকে পরমাণুময় স্বীকার করা যায়, তবে সেই পরমাণু ও নিরগতি সঞ্চালন জন্য অপর এক দ্বিতীয় ঈথারের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।*

থিয়সফী সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদিতে, এই দ্বিতীয় ঈথার বা অসীম ঈথারকে, কোথায় "অ্যাষ্ট্রাল লাইট" কোথায়ও "অ্যাষ্ট্রাল ফ্লুইড্" আখ্যা দিয়াছেন। স্বর্গীয় ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কী দ্বিতীয় নীলাকাশ (Second blue Sky) আখ্যায় ইহাকে বিশেষিত করিয়াছেন।*

* "To explain transmission of motion between atoms or stars, science is compelled to admit the existence of ether which very closely approaches our astral fluid but this hypothesis only puts back the difficulty instead of offering a solution for ether, in its turn, must be atomic if not, its elasticity will be inconceivable, and if it is atomic, then, the transmission of motion between atoms can only be explained by admitting the existence of a second ether, more subtle than the first, thus proceeding upto an element which is obsolutely homogeneous, obsolutely rarified which we identify with space and call the Mul prakrati". (Vide seven principles of man translated from French by S. Raghindroo.)

"We also fi * that their ether is elastic and has a definite density ; and that it is capable of transmitting energy in the form of vibration or waves. According to Fresnel, half this energy is in the form of potenteal energy due to the distortion of elementary portions of the meduim, and half in the form of Kinetic energy, due to the motion of the medium (Psychometry and thought transference.)

*"The astral light is tablet of the memory of the animal man."

আমাদের আর্য্য শাস্ত্রে উল্লিখিত বায়ুশূন্য ঈথার বা বায়ুস্তরস্থ ঈথারের প্রতিপাদক বিভিন্ন নাম পরিলক্ষিত হয় না। যোগীবাশিষ্ট রামায়ণে তিন প্রকার আকাশের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু, তাহা অন্যবিধ। ঋকবেদ সংহিতায় অন্তরীক্ষকে যমপুরী যাইবার পথরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শিবসংহিতায় নভোমণ্ডলে স্বপ্রতীক দর্শনের উল্লেখ আছে। শব্দকল্পদ্রুমে আকাশের যেসকল বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়, তাহা আকাশের প্রতিশব্দ ভিন্ন বিভিন্ন অবস্থা বলিয়া বুঝিতে পারা যায় না। যাহাহউক এই সকল আলোচনা যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইবে। এক্ষণে আকাশ "উপাধি ভেদেন নানা ভবতি।"* উপাধি ভেদে নানা রূপ হইলেও, সাধারণতঃ আমরা সকলকেই আকাশ বলিয়া থাকি, এইরূপ উক্তিও একেবারে অযৌক্তিক নহে। কারণ, জল ও তৈল এই উভয়ের মধ্যে পরমাণুর ন্যূনাধিক্য এবং ভারিত্বের ইতর বিশেষ থাকিলেও, সাধারণতঃ আমরা উভয়কেই তরলপদার্থ বলিয়া থাকি। সেইরূপ ঘনত্বের তারতম্যে আকাশ নামান্তরে বিভক্ত হইলেও, সাধারণতঃ তাহাকে আকাশ বা মহাকাশ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকি।

"বাহ্যবস্তুবৎ চিত্তমপি বহুপরিণামি" কিনা? এবং, এক পুরুষ ভিন্ন প্রকৃতি, সম্ভূত প্রত্যেক পদার্থ কি স্থূল, কি সূক্ষ্ম, প্রতিক্ষণেই পরিবর্ত্তিত ও অবস্থান্তরিত হইতেছে কিনা? তাহা আমরা ক্রমশ যথাসাধ্য আলোচনা করিব। এক্ষণে আকাশের ধর্ম্ম ও তাহার প্রতিবিম্ব-গ্রহণ-সামর্থ্য সম্বন্ধে পাশ্চাত্যবৈজ্ঞানিক মহারথীগণের ও তত্ত্ববিদ্যাবিৎ মনীষীগণের কি উক্তি ও উপদেশ তাহাই দেখা যাউক।

"The magazine Light for August, 1893 (I quote from modern Theosophy by C. E. Wright Page 93) reports an interview with Mr. G. Bell, the inventor of the improved telephone, who, after expounding his method of seeing by electricity, discussed seriously the possibility of thinking at a distance by electricity. Prof. Bell premises that the human mind is a kind of electrical reservoir, and that thinking is an electrical disturbance, therefore the possibility of setting up in one brain a disturbance corresponding to what is going on in another: so that though the persons be thousands of miles apart, the one receives instantly the thoughts of the other : appears to him mainly to depend upon the discovery

---

It has been taken too literally, to mean some sort of a second blue sky. This imaginary space, however, on which are impressed the countless images of all that ever was, is, and will be, is but a too sad reality." (Secret Doctrine.)

*"ন্যায়মতে অস্য সামান্য গুণাঃ সংখ্যাদি পঞ্চ। বিশেষ গুণঃ শব্দঃ। সতু নিত্যঃ অশরীরীচ। অস্যেন্দ্রিয়ং কর্ণঃ। সত্বেকঃ কিন্তু উপাধি ভেদেন নানা ভবতি। বেদান্তমতে স জন্যঃ।" (শব্দ কল্পদ্রুম)।

of a sevitable medium. This medium has long been discovered by the occultists. It is the astral light, (Vide the Lamp reproduced in Theosophic Gleaner Vol IV Page 186) Camille Flammarion says : "our psychic force gives rise to an etheric movement which is transmitted to a distance like all other etheric vibrations and become perceptible to other brains in harmony with ours. The transformation of a psychical action into etheric motion and vice versa may be analogous to that which is observed in the telephone where the receiver which is identical with the recorder, reconstructs the sonorons vibrations."—("Annales Psychiques")

"Prof : Tyndall in submitting vapours of volatile liquids to the action of concentrated lights in an experimental tube, showed that there exists a vast store house of pictures inivisible to us under ordinary circumstances. In the tube the vapours formed into shapes of bottles, cones, shells, scrolls &c. once into a serpent's head and once into a fish. These were the same on both sides. (See "Isis unveiled"). Another experience of his was to pass a beam of light through a chunk of ice, the reflection on a screen showing forms of ferns, &c.

"Prof : Bableage declared that every thought is photographed in the ether ; and he looks forward to the time when they may be made visible * * *

"Hertz claims that thoughts may one day be made objective, in some such way as electrical waves can be condensed by a large concave mirror."

("The Theosophist," January 1893)

ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়া, প্রবন্ধের কলেবর পুষ্টিসাধন উদ্দেশ্য নহে। এইরূপ মহাজনোক্তি অনেক উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। নলের (tube) মধ্যে বা ঘটের মধ্যে, "সূচীভেদ্য অন্ধকারে" বা "নির্জ্জন কুটীরে"—"দিগন্ত বিস্তৃত বন মধ্যে" অথবা "পর্ব্বত গুহায়" সর্ব্বত্রই আকাশ বিদ্যমান। "ঘটাকাশ" "মঠাকাশ" ইত্যাদি বাক্য আর্য্যশাস্ত্রে অভাব নাই। এই সকল স্থানে যে সকল ভৌতিক ঘটনা অনবরত সংঘটিত হইতেছে—তাহা আমরা অল্পধীসম্পন্ন মানব, জানিতে না পারি, কিন্তু তাহা উন্নত যোগী—বা সূক্ষ্মদর্শী মনীষীগণের অগোচরীভূত নহে। "ভুবন-জ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ" সূর্য্যমণ্ডলে মনসংযম করিলে, ভুবন-জ্ঞান হয়। "প্রাতিভাদ্বা সর্ব্বম্" প্রতিভা শক্তি লাভ হইলে, সর্ব্বজ্ঞতত্ত্ব লাভ হয়। "প্রত্যয়স্য পর-চিত্ত জ্ঞানম্" অপরের দেহস্থ চিহ্নে মন সংযম করিলে, তাহার সমুদায় মনোভাব জানিতে পারা যায় ; ইত্যাদি উপদেশ যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। আর্য্যঋষিগণ পরের চিত্ত হস্তস্থিত মালার ন্যায় প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। আর্য্যশাস্ত্রে নানাস্থানে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। আমরা যাহা জানিনা

অথবা প্রত্যক্ষ করি নাই। তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না, এইরূপ উক্তি সুধী-জনের পক্ষে শোভনীয় নহে। "প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি"। (পাতঞ্জলযোগসূত্রম্) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিনটী প্রমাণ। মহর্ষি কপিল বলেন ঃ—

"দৃষ্টমনুমানমাপ্তবচনং চ সর্ব্ব প্রমাণসিদ্ধত্বাৎ। ত্রিবিধং প্রমাণমিষ্টং প্রমেয় সিদ্ধিঃ প্রমাদ্ধি ॥"

দৃষ্ট, (perception) অনুমান (inference) ও আপ্তবচন (right affirmation) এই তিনটী প্রমাণরূপে প্রসিদ্ধ হেতু, ইহাদের দ্বারাই প্রমেয় সিদ্ধ হয়। পাশ্চাত্যবিজ্ঞান জড়বিজ্ঞান। তবে তাহার সাহায্য আমরা যতটুকু পাইতে পারি, তাহাই গ্রহণ করিব। অবশিষ্ট অনুমান ও যাঁহারা প্রত্যক্ষানুভূতি দ্বারা প্রকৃত সত্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের বাক্যের সাহায্যে গ্রহণ করিতে হইবে। এই "আপ্তবচন" লইয়া দার্শনিকগণ নানাবিধ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের বচন সত্য কেন? কারণ তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, নিজের মধ্যেই চৈতন্যকে দর্শন করিয়াছেন। প্রসঙ্গগত কথায় আমরা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয় দেখা যাউক।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ দে।

প্রাণতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, প্রাণ বিশ্বকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এতৎসম্বন্ধে শ্রুতি উল্লেখ করেন। মহর্ষি বরুণতনয় ভৃগু, পিতার উপদেশক্রমে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া, বহুকালের পর উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি প্রাণময় তিনিই ব্রহ্ম। সেই প্রাণময় ব্রহ্ম হইতেই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থ যাবতীয় জীব উৎপন্ন হইয়াছে। সেই প্রাণময় ব্রহ্মের কৃপাবলেই বিশ্বস্থ ভূতমাত্র জীবিত থাকে। সেই প্রাণময় ব্রহ্মের কৃপা শক্তিতেই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ প্রকৃষ্টরূপে সংযম শক্তিতে নিয়ন্ত্রিত হয়। এবং সেই প্রাণময় ব্রহ্মেই বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থের অভিসংবেশ হইয়া থাকে। (অর্থাৎ সকলেই বীজ ও সংস্কাররূপে প্রকৃতিতে প্রসুপ্ত থাকে।)

সেই প্রাণময় ব্রহ্মলাভের জন্য প্রাণতত্ত্বে শাস্ত্র বহুপ্রকার আদেশ করিয়াছেন। ভগবদ্বাক্যে ভগবান ব্যাসদেব বলিয়াছেন, "অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথা পরে। প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়াম পরায়ণাঃ। অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।"

প্রাণতত্ত্বে, প্রাণ ও অপান তত্ত্ব এক স্বতন্ত্র যোগ। প্রাণ ও অপানতত্ত্বে সমাধি ঘটিলে মানবের ব্রহ্মসংস্থিতি লাভ হইতে পারে। প্রাণ ও অপানের স্থিতি সম্বন্ধে "প্রাণো নাম প্রাগ্‌গমনবান্ নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী। অপানো নাম অবাগ্‌গমনবান্ পায্বাদিস্থানবর্ত্তী"।

এই প্রাণ ও অপান বায়ু, শরীরস্থ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাসমূহের আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক জগতের রাজসিক তামসিক রস পানে পরিতৃপ্তি-হেতু উহাদের মধ্যে প্রাণ

ও অপানের প্রবাহ তত্তক্রত নহে। প্রাণ ও অপান শরীরস্থ পরিপোষক একই সমষ্টি বায়ুর অন্তঃপ্রবাহ হইলেও উহাদের মধ্যে তিনটি গ্রন্থি আছে। ব্রহ্ম, বিষ্ণু, রুদ্র এই ত্রিতয়গ্রন্থি সাধক যখন ভেদ করিতে সমর্থ হন, তখন তাঁহার প্রাণ ও অপান বায়ু সংযুক্ত হয়। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অপর ত্রিতয়বায়ু প্রাণবায়ুর সহিত মিলিত হয়। তখন প্রাণও অপান একীভূত হয়, ঈড়া পিঙ্গলা মরিয়া যায়, সুষুম্নাতে তখন বায়ু প্রবেশ করে ও কুলকুণ্ডলিনীশক্তি প্রবুদ্ধা হন। সাধক এই অবস্থায় পরাশক্তি-সাহায্যে নির্ম্মলানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন।

এই প্রাণ ও অপান সংমিলনের নামই প্রাণায়াম। প্রাণবায়ু প্রশ্বাস কালে (অন্যূন) দ্বাদশাঙ্গুলি স্থান অধিক গমন করে। এই জন্যই প্রত্যেক জীবদেহ স্ব স্ব অঙ্গুলির ষন্নবতি পরিমাণ, এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। প্রাণবায়ুকে আকর্ষণ করিয়া, অপান বায়ুর সহিত মিলিত করিতে কিম্বা কিরূপে অপান বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া প্রাণবায়ুর সহিত সংমিলিত করিতে হয়, প্রাণায়ামতত্ত্বে তাহার বিশেষ উপদেশ আছে। প্রকৃত প্রাণ ও অপান মূলে সমস্ত সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি বসতি করে। প্রাণই উৎসাহ প্রদান করে। অপান বায়ুই নিরুৎসাহ আনয়ন করে। কর্ম্ম-মাত্রে যে কিছু উৎসাহ ভাব, তাহা সমস্তই প্রাণের কার্য্য, আর যাহা কিছু নিরুৎসাহ-জনক তাহা অপানের কার্য্য। প্রাণই ঊর্দ্ধগতি, অপানই অধোগতি। সত্য, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, পরিগ্রহ-ত্যাগ, পবিত্রতা, বা যে কোনও সদনুষ্ঠানপ্রবৃত্তি প্রাণ মূলে অবস্থিতি করে। আর কাম, ক্রোধ, লোভ, দ্বেষ, হিংসাদি বহুবিধ ক্লেশবীজ অপান মূলে অবস্থিতি করে।

প্রাণ ও অপানের ক্রিয়াজাত মনের এই (সৎ ও অসৎ) বৃত্তিগুলি সকলেই মূর্ত্তিমতী। দেব ও অসুরদিগের সদসৎ-বৃত্তিজাত এই দেহ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তৈজস ও তামস অণুতে গঠিত। প্রাণের ক্রিয়া প্রবল হইয়া, অপান ক্রিয়ার পরিভব ঘটিলে জ্ঞান, ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য আদি ধর্ম্ম-ভাবই প্রকাশ পায়।

সংসারানল সন্তপ্ত মুমুক্ষুজীব সমিৎপাণি হইয়া গুরু সন্নিধানে গমন করিলে, তদ্রূপ অধিকারীকে 'মূলবন্ধ' নামক ক্রিয়ার উপদেশ দিয়া থাকেন। অপান বায়ুকে আকর্ষণ করিয়া কিরূপে প্রাণবায়ুর সহিত সংযুক্ত করিতে হয়, 'মূলবন্ধ' নামক ক্রিয়া ও অন্যান্য ক্রিয়াতেও তাহার বিশেষ উপদেশ আছে। যাহা হউক প্রাণায়ামকালে প্রাণ ও অপান সংমিলন-সংঘটিত মণিপুর-স্থিত বহ্নি উদ্দীপ্ত হয়। প্রাণ ও অপান বায়ু, ত্রিকোণমণ্ডলস্থ বহ্নিসাহায্যে সুষুম্না-পথে প্রবেশ করে, ও ত্রিতয়গ্রন্থি ভেদে সমর্থ হয়; তখনই সাধকের কুলকুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধা হন ও তাঁহার প্রাণায়াম সিদ্ধ হইয়া থাকে। কুলকুণ্ডলিনী প্রবুদ্ধা হইলে, সাধকের নিকট আধ্যাত্মিক রাজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। তখনই সাধক সিদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন। তখন সেই সিদ্ধ মহাপুরুষের নিকট আধ্যাত্মিক জগতের বিশ্বতঃ বিসারীজ্যোতি

নয়ন গোচর হয়। তখন সেই মহাপুরুষের অন্তঃকরণ সত্ত্বময় আলোকে বা প্রজ্ঞা-জ্যোতিতে আলোকিত হয়। তখন তিনি এক স্থানে বসিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাবৎ পদার্থ নিরীক্ষণে সমর্থ হ'ন। এক স্থানে বসিয়া কোটী তীর্থস্নানের ফলানুভব করেন। তখন সেই সিদ্ধ মহাপুরুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ততত্ত্বই অপরোক্ষ করিতে পারেন। তজ্জন্য সাধক যত্ন সহকারে প্রাণ ও অপান সংযোজনসংবিধান গুরুর নিকট অবগত হইবেন। পরম মহিমান্বিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পতি প্রাণনাথ প্রাণময় পরব্রহ্ম, প্রাণও অপানতত্ত্ব অবগত হইলে সাধককে সিদ্ধত্ব প্রদান করিয়া থাকেন। প্রাণও অপান তত্ত্বে প্রাণায়ামই প্রধান অবলম্বন। প্রাণ ও অপানের ক্রিয়া বিশেষপ্রকারে সংযমনের নামই প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম বহুবিধ উপায়ে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে নানা জাতীয় সৎপ্রবৃত্তি দেখা যায়। যে জাতির সৎ-প্রবৃত্তিতে সত্ত্বগুণের পরিমাণ অধিক পরিমাণে অনুভব হয়, প্রাণের সেই জাতীয় ক্রিয়া বৃত্তিতে সংযমন শক্তি অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। একজন সতত ঈশ্বরচিন্তা-পরায়ণ তাপস, ও আর একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতবিদ্য সাধক বি এ যুবক, উভয়ের মধ্যে সৎপ্রবৃত্তির অভাব না থাকিলেও উঁহাদের মধ্যে সাত্ত্বিক গুণের তারতম্য আছে।

প্রাণ ও মনের একটি সম্বন্ধ আছে, প্রাণ সংযুক্ত হইলে মন ও সংযত হইবে। মনঃ সাত্ত্বিকচিন্তায় ব্যাপৃত থাকিলে, প্রাণ চঞ্চল স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া স্থিরভাব অবলম্বন করিবে। মনঃ রাজসিক ক্রিয়া লইয়া আলোচনা করিতে থাকিলে, প্রাণও চঞ্চল স্বভাব অবলম্বন করিবে। মনঃ তামসিক ক্রিয়ায় রত থাকিলে, প্রাণের ক্রিয়াও চঞ্চল ও আচ্ছন্ন হইবে। উৎকট স্বপ্নদর্শন-কালে, জীবের ভয়প্রাপ্তি ও নাড়ীর দ্রুত-প্রবাহ তাহার কারণ। মনে করুণ যামিনীর তৃতীয় যামার্দ্ধ অতীত হইয়াছে অতি উচ্চ বিভূতিশুভ্র, কৈলাসশিখর পূর্ণিমাকৌমুদীর আলোকমালায় বিভূষিত; খেচরলোকে বিবিধ বিহঙ্গ গান করিতেছে। পূর্ব্বদিকে শুচিস্মিতা উষাদেবী ব্রহ্মাণীমায়ের স্তোত্রার-ত্রিক সম্পাদন করিবার জন্য, প্রস্ফুটিতোন্মুখ মিত্ররূপ জবা অরুণবর্ণ স্থালীতে গ্রহণ করিতেছেন। সেই পবিত্র ভগবদ্বিভূতি দর্শন করিতে২ বাহ্যজ্ঞান যেন অজ্ঞাতসারে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। সম্মুখে একটি শুভ্র শ্বেতসমুদ্র সেই অনুত্তম সুধাসাগরে একটি রত্নদ্বীপ। মরকত বৈদূর্য্য প্রভৃতি মণিগণ ঐ সুশোভিত দ্বীপে বালুকারাশিরূপে শোভা পাইতেছে। বহুবিধ পুষ্পপ্রতরু ঐ রত্নদ্বীপের চারিদিকে শোভা পাইতেছে। কদম্ব, মালতী, চম্পক, মল্লিকা, বকুল, পারিজাত, স্থলপদ্ম প্রভৃতি প্রসূনিচয় বহুপরিমাণে প্রস্ফুটিত হইয়া রত্নদ্বীপকে পরিখাকারে বেষ্টন করতঃ ভগবান্ বাসুদেবের সুদর্শনচক্রশ্রী অনুকরণ করিয়াছে। আদিঙ্মণ্ডল রত্নদ্বীপস্থ পরমাণু-সমূহ কুসুমরাশির আমোদে অতিশয় সুরভীকৃত হইয়াছে। মনেকরুণ যেন ঐ সুরভিবনে একটি মহান্ কল্পতরু। সেই

শাখাচতুষ্টয় চতুর্ব্বেদময়। সদ্যোজাত পুষ্পরাশি সততই বৃক্ষশাখায় শোভা পাইতেছে। ভ্রমরগণ গুন গুন স্বরে পরিমল-লোভে শাখাসন্নিধানে গুঞ্জন করিতেছে। কোকিলগণ পরম কোবিদগণের ন্যায় সেই অদ্ভুত কল্পবৃক্ষের শাখোপরি সমাসীন হইয়া, কুহু কুহু স্বরে কূজন করিতেছে। ব্রাহ্ম্য-মূহুর্ত্তে মনের এরূপ শান্ত সমাহিত অবস্থায়, শুদ্ধপবিত্র ভাবে উক্ত বহুবিভূতিপূর্ণ কল্প-বৃক্ষমূলে বসিয়া, দুইদণ্ড আত্মতত্ত্ব আলোচনা করিলে, কতদূর আত্মকল্যাণ লাভ হইতে পারে, প্রাণী ও মননশীল জীব-মাত্রেরই তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে প্রাণময় কোষ ক্রিয়াশক্তিমান্ কার্য্যরূপ, ও মনোময় কোষ ইচ্ছাশক্তিমান্ করণরূপ। বিজ্ঞানময় জ্ঞানশক্তিমান্ কর্ত্তৃরূপ। ইনিই ব্যবহারিক জীব নামে অভিহিত। ব্যবহারিক কর্ত্তা, করণ, কার্য্যে যেরূপ সম্বন্ধ, বিজ্ঞান-ময় কোষ, প্রাণময় কোষ ও মনোময় কোষে সেইরূপ সম্বন্ধ। উক্ত ত্রিবিধ কোষের সংমিশ্রণেই সূক্ষ্মশরীর উৎপন্ন হইয়াছে। প্রাণ, মনঃ, ও বিজ্ঞান ইহার যে কোন ক্রিয়া হইলে, সমস্তস্থানে তাহা ব্যক্ত হইবে। প্রকৃতির কোন এক সুন্দরী মূর্ত্তিতে, যদি উক্ত প্রকার সাত্ত্বিকচিন্তা মনে মনে করা যায়, তাহা হইলে প্রাণের স্থিরতা বশতঃ মনঃ ও স্থির হইয়া আসে। প্রাণও মনঃ স্থির হইয়া উক্ত প্রকার ভাব, (ধ্যান প্রবাহ) অভ্যস্ত হইলে, চিত্তে এক প্রকার সাত্ত্বিকী 'উষ্মা' উৎপন্ন করে। পতঞ্জলিঋষি "সমানজয়াৎ প্রজ্বলনম্" সূত্রে ঐ উষ্মা বা ব্রহ্মতেজের কথা বলিয়াছেন। ধারণ, ধ্যান, সমাধি আশ্রয়পূর্ব্বক, সমান-বায়ুতে সংযম প্রযুক্ত হইলে, উক্ত ব্রহ্ম-তেজ প্রাবির্ভূত হয়। চিত্ত তখন বিশুদ্ধ ও চঞ্চলতাশূন্য হয় বলিয়া, অন্তঃকরণের সর্ব্বপ্রকাশক ধর্ম্ম আবির্ভূত হয়। ঐ সাত্ত্বিকী উষ্মারক্ষা, আর্য্যস্থানবাসী মুমুক্ষু জীবগণের একান্ত কর্ত্তব্য। ঐ সাত্ত্বিকী উষ্মা না থাকিলে, জীব, আধ্যাত্মিক জগতের ভাবপুঞ্জ সংরক্ষণ করিতে পারে না। আবার আধ্যাত্মিক জগতের উন্নতি ও কল্যাণ কামনা না করিয়া, আধিদৈবিক ও আধি-ভৌতিক জগতের সার্ব্বভৌম কল্যাণ লাভ কখনই সম্ভবপর নহে। ঐ সাত্ত্বিকী উষ্মা রক্ষিত না হইলে, জীব, আত্মসম্বন্ধী দেবা-সুরযুদ্ধে অসুর কর্ত্তৃক পরাভূত হয়। উক্ত সাত্ত্বিক তেজঃ না থাকিলে, জীবের মনোবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়গ্রামের উপর স্বাধীনতা থাকে না। ঐ সাত্ত্বিক ব্রহ্মতেজঃ না থাকিলে, জাতি দাসে পরিণত হয়। ঐ সাত্ত্বিকী উষ্মা রক্ষিত না হইলে, আর্য্য, অনার্য্যত্বে পরিণাম প্রাপ্ত হ'ন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত।
যশোহর।

হিন্দুরাজা সীতারাম।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

কুলপঞ্জীতে সীতারামের মৃত্যুসম্বন্ধে লিখিত আছে যে, এই সময়ে কতিপয় মুসল-মান সওদাগর শালবিক্রয়ের ছলনা করিয়া

দরবারে উপস্থিত হইয়া, দরবারস্থ একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে পূর্ব্ববৈরিতা বশতঃ আক্রমণ করে। সীতারাম তখন দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তিনি জনৈক সৈন্যের কটিদেশ হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া, সওদাগরদিগকে আক্রমণ করেন। তখন তাহারা কর্ম্মচারীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সকলেই সীতারামের প্রতি নিদারুণ আঘাত করিতে আরম্ভ করিল। সীতারাম, তাহাদের সাংঘাতিক আঘাতে ভূমিতে নিপতিত হইলেন। দরবারের হুকুম অনুসারে দস্যুগণ ধৃত হইল। সীতারাম, কাতর স্বরে নবাবের প্রতি চাহিয়া, মুক্তির প্রার্থনা করিলেন। নবাব, সীতারামের আবেদনে, তাঁহার সেই অন্তিম সময়ে মুক্তির হুকুম দিয়া, বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ পুনর্ব্বার আদেশ প্রদান করেন যে, তিনি সুস্থ হইলে তদীয় রাজ্য তাঁহাকে দেওয়া হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই দিনই সন্ধ্যার পূর্ব্বে গঙ্গাতীরে সূর্য্যাস্তের সহিত রাজা সীতারামের জীবন-সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল। লক্ষ্মীনারায়ণ, রাজার সংকারাদি করণানন্তর স্বয়ংই হরিহরনগরে এই নিদারুণ সংবাদ প্রকাশ করিলেন। রাণীত্রয়ের মধ্যে কনিষ্ঠারাণী তখন গর্ভবতী ছিলেন বলিয়া, আত্মহত্যা করিতে পারেন নাই। কয়েক দিবস পরেই জ্যেষ্ঠা পুষ্করিণীতে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন। মধ্যমাসম্বন্ধে অন্য উল্লেখ কিছুই নাই। সম্ভবতঃ তিনি জীবিতা ছিলেন।

সীতারামের মৃত্যুর পরে, দেওয়ান রঘুনন্দন, চাকলা ভূষণার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। নবাব "কৌত জমিদারের" অর্থাৎ সীতারামের পুত্রদের সহিত বন্দোবস্তের আদেশ দিলেন। কিন্তু রঘুনন্দনের চক্রান্তে সমস্তই বৃথা হইল। পূর্ব্ব প্রস্তাবে তাহা সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। নবাব-দরবারে তখন প্রকাশ হইয়া পড়িল যে, সীতারামের পুত্রগণ অনেকেই আত্মহত্যা করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতা ইত্যাদি উত্তরাধিকারীগণ জমিদারী চালাইতে অক্ষম। রঘুনন্দন নবাব বাহাদুরকে এইরূপ কুহক-জালে বদ্ধ করিয়া, স্বয়ংই তাঁহার ভ্রাতা রামজীবনের নামে চাকলা ভূষণা বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন।

সীতারামের গুরুদেবের বাটীতে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছিল, তাহা উল্লিখিত হইল। এতদ্দৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তিনি আত্মহত্যা করেন নাই, বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। তিনি হীরকের অঙ্গুরী চুষিয়া মুরসিদাবাদে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, ইহাই কল্পিত প্রবাদ। তিনি মুরসিদাবাদেই যে দেহত্যাগ করেন, তাহার আর কোন সন্দেহ-ই নাই। রঘুনন্দনের চক্রান্তে যে তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ জমিদারী হইতে বঞ্চিত হন, তাহাও নিশ্চিত। পূর্ব্বপূর্ব্ব প্রস্তাবের সহিত এই প্রস্তাবের বিশেষ অনৈক্য নাই। যে সকল স্থানে পার্থক্য দৃষ্ট হয়, তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। প্রথম প্রস্তাবে লিখিত হইয়াছে যে, সীতারাম কোন যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া, নবাবের তৃপ্তি সম্পাদন পূর্ব্বক মহম্মদপুর প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ প্রাপ্ত হন, এরূপ প্রবাদ আছে। সেই প্রবাদের মূলঘটনা এই প্রস্তাবে বর্ণিত হইল যে, তিনি কতাবাদে

করিম খাঁ পাঠানবিদ্রোহীকে পরাজয় করিয়া, নলদী পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন। জনরব সম্পূর্ণ মিথ্যা হয় না, মূলে কিয়ৎ-পরিমাণে সত্য নিহিত থাকে ; "অলমতি বিস্তরেণ।"

শেষপ্রস্তাব।

রাজা সীতারাম সম্বন্ধীয় প্রবাদে, ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্তপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, মেনাহাতী ও আমনগে (হামলা বাঘ) ব্যতীত বক্তার খাঁ, মুচরাসিং ও সবর-দালান নামীয় তাঁহার অপর তিনজন সেনাপতি ছিল। এই সৈন্যাধ্যক্ষদিগের শেষ জীবনচরিত কিছুই অবগত হওয়া যায় না।

সীতারামের রাজধানী সম্বন্ধে পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। তিনি রাজবাটীর চতুর্দ্দিকে সুদীর্ঘ ও গভীর পরিখা খনন করিয়া, একটী মৃণ্ময় রাজদুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই রাজদুর্গের ভিতরই বাজার ছিল। কোন বিদেশী অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি রাজ-দুর্গাভ্যন্তরে স্থান পাইত না। সীতারাম পদ্মপুকুর, চুণপুকুর প্রভৃতি কতকগুলি জলাশয় খনন করিয়া গিয়াছিলেন। পদ্ম-পুকুরে অদ্যাপি পদ্মগাছ রহিয়াছে। তিনি দুর্গের সম্মুখে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা 'রামসাগর' খনন করিয়া, রাজদুর্গ অধিকতর নিরাপদ করিয়াছিলেন। রামসাগর সম্বন্ধে প্রচলিত প্রবাদ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। মিষ্টার জে ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব (Mr. J westland) লিখিয়াগিয়াছেন যে, উত্তর-তীরে একটী দরিদ্রা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বাস করিত, তাহার পুত্রের নাম সীতা ছিল। একদিন কোন প্রয়োজন বশতঃ বৃদ্ধা তাহার পুত্রকে "সীতা, সীতা" বলিয়া ডাকিতেছিল। রাজা সীতারামও ঘটনা-বশতঃ সেই সময় উহার নিকট দিয়া যাই-তেছিলেন। তিনি বৃদ্ধার "সীতা সীতা" সম্বোধনে, তাহার কুটীরদেশে গমন পূর্ব্বক বৃদ্ধাকে তাঁহার আহ্বানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধা রাজা সীতারামকে দেখিয়া সচকিতে ভীতস্বরে বলিল যে, সে তাহার পুত্র 'সীতা'কে ডাকিয়াছে, রাজা সীতারামকে ডাকে নাই। বৃদ্ধা নিতান্ত দীন-দরিদ্রা, রাজা তাহার কুটীরে দণ্ডায়মান ; কি উপায়ে রাজসম্মান রক্ষা করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল ; অবশেষে নিরুপায় হইয়া রাজাকে তাহার দৈন্যদশা জানাইয়া, রাজ-সন্তোষ সাধনের চেষ্টা করিতেছিল। রাজা সীতারাম, বৃদ্ধার দুরবস্থা দেখিয়া ও তাহার বিনয়নম্র বচনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, বৃদ্ধার প্রাঙ্গণে কোনৈকদেশে যে ছোট লাউগাছটী আছে, উহা পাইলেই তিনি সন্তুষ্ট হইবেন। বৃদ্ধা তখন সহর্ষে লাউগাছটী তাঁহাকে উঠাইয়া লইতে অনুরোধ করিলেন। রাজা সীতারাম তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, বৃদ্ধার এমন কি কোন মানসিক গুপ্ত-বাসনা নাই, যাহা রাজানুগ্রহে পূর্ণ হইতে পারে। তিনি বৃদ্ধার মানসিক ভাব অব-গত হইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে জানিতে পারিলেন যে, বৃদ্ধার অত্যন্ত জলকষ্ট, যে স্থানে লাউগাছটী, ঐস্থানে একটী কূপ খনন করাইয়া দিলে তাহার মহৎ উপকার হয়। রাজা সীতারাম স্বহস্তেই লাউ গাছটী উঠাইয়া,

ঐ স্থানে কূপখননের আদেশ দেন। সামান্য খননের পরে, রাজা দেখিতে পাইলেন যে, তথায় অনেক গুলি টাকা রহিয়াছে। তখন সীতারাম আদেশ দিলেন যে, এই টাকা দিয়া সুবৃহৎ দীঘি খনন করাইতে হইবে। মেনাহাতী রাজ সমীপে দণ্ডায়মান ছিল, এবং রাজগোচরে নিবেদন করিল যে, দীর্ঘিকা কত দূর বিস্তৃত হইবে? সীতারাম উত্তর করিলেন "তোমার নিক্ষিপ্ত শর যতদূরে পড়িবে, ততদূরব্যাপী জলাশয় খনন করাইতে হইবে।" রাজাদেশানুসারে মেনাহাতী সেই স্থান হইতে তীর নিক্ষেপ করে, তীর বহুদূরে গিয়া পতিত হয়। রামসাগরের বর্ত্তমান দক্ষিণতীরের দক্ষিণে রাজপুরোহিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল। রাজার দেওয়ানের পাকাবাড়ী ও তন্মধ্যে পতিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ রাজসন্নিধানে তাঁহাদের ব্রহ্মোত্তর জমির কথা বলিলে, স্বধর্ম্মপরায়ণ রাজা সীতারাম ব্রাহ্মণগণের সম্পত্তি বাদ দিয়া, অবশিষ্ট অংশে "রামসাগর" খনন করিবার আদেশ দেন। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব লিখিত এই প্রবাদটী সত্য বলিয়া অনুমিত হয় না। স্থানীয় কেহ কেহ এই জনশ্রুতির কথা বলেন বটে, কিন্তু তাহা অমূলক। সীতারাম তাঁহার রাজত্বের শেষ অংশে রাজদুর্গ অধিকতর নিরাপদ করিবার অভিলাষে, ও সাধারণ লোকের জল কষ্ট নিবারণের জন্য, এই সুবৃহৎ "রামসাগর" খনন করেন। মদীয় পূর্ব্ব প্রস্তাবে লিখিত প্রবাদটীই সত্য বলিয়া বিবেচিত হয়। যখন সীতারামের ইতিবৃত্তটী প্রবাদমূলক, এবং ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন তখন বাধ্য হইয়া লিখিতে হইল। রাজা সীতারামের দেওয়ানের নাম "যদুনাথ মজুমদার"। রামসাগরের দক্ষিণ তীর হইতে কিছু দূরেই তাঁহার প্রকাণ্ড পাকা বাড়ী; এক্ষণ তাঁহার বংশে কেহই নাই। বাবু গঙ্গাকুমার মিত্র মহাশয় সেই তালুক খরিদ করিয়া, এক্ষণ সেই দেওয়ানবাটীতে নিজের বসতিবাটী প্রস্তুত করিতেছেন। বাটীতে দীঘি, পুষ্করিণী ও মন্দিরটী অদ্যাপি রহিয়াছে।

সীতারামের জন্মস্থান কেহ কেহ হরিহরনগর লিখিয়াগিয়াছেন বটে, কিন্তু সীতারাম, ভূষণার নিকট গোপালপুর গ্রামে ভূমিষ্ঠ হয়েন, এইরূপই শুনা যায়। শেষে হরিহরনগর আসিয়া কিছু দিন বাস করেন, পরে মহম্মদপুরে রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া, স্বাধীন হিন্দুরাজ্য গঠন করিয়া মহম্মদপুরে বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন।

বর্ত্তমান পাংশা রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট সীতারামের অনেক কীর্ত্তি কলাপ রহিয়াছে। বরিশাল জেলার অন্তর্গত কাশীপুর গ্রামে সীতারামের একটী বাড়ী, দীঘি ও বিগ্রহ এবং অনেক জলাশয় আছে শুনিতে পাওয়া যায়। উক্ত বিগ্রহের বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল, অদ্যাদি তাঁহার পূজা-আদি চলিতেছে। সীতারামের কীর্ত্তি কলাপ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ হইতে মুসলমান পর্য্যন্ত সীতারাম প্রদত্ত নিষ্কর-সম্পত্তি ভোগ করিতেছে। এরূপ দানশীল পুণ্যাত্মা মহাবীর বাঙ্গালীর চির গৌরবের ধন, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাসলেখকগণ কেন যে এরূপ স্বাধীন রাজার নাম, তাঁহাদের

লিখিত ইতিহাসে উল্লেখ করেন নাই, তাহাই দুঃখের বিষয়! ইহা বাঙ্গালীর দুরদৃষ্ট ভিন্ন অন্য কিছুই নহে!

সীতারামের রাজত্বের প্রথম সময়ে, সম্রাট্ আরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমওসান বাঙ্গলার নবাব ছিলেন, ও মুরশিদ কুলি খাঁ রাজস্ব সংগ্রহের জন্য দেওয়ান বা রাজস্বসচিব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজস্ব সংগ্রহের জন্য মুরশিদ কুলি খাঁর আন্তরিক চেষ্টা ছিল। তিনি বাঙ্গলা দেশ ১৩ চাকলা ও ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত করিয়া, বার্ষিক ১৪২৮৮১৮৬, টাকা রাজস্ব নির্দ্ধারণ করেন, এবং প্রত্যেক চাকলায় একজন করিয়া ফৌজদার নিযুক্ত করেন।

(Grant's analysis of finances of Bengal.)

মুরসিদ কুলি খাঁ তাহার দৌহিত্রী-পতির উপর রাজস্ব আদায়ের ভারার্পণ করেন। তাহার অত্যাচারে জমিদার বর্গ প্রপীড়িত হয়েন। রাজস্ব রীতিমত আদায় না হইলে, একের জমিদারী অন্যকে দেওয়া হইত। অনেক জমিদার বন্দীভাবে মুরশিদাবাদে নীত হইয়া, একটী পূতিগন্ধময় নরক হ্রদে নিপাতিত হইতেন। আত্মাহঙ্কারী মুসলমানগণ এই নরক-হ্রদের নাম "বৈকুণ্ঠ" রাখিয়াছিল। (হিন্দুর অবমাননার জন্যই এইরূপ নাম রাখিয়াছিল)। হিন্দু জমিদারগণ এই নরকহ্রদে, বৈকুণ্ঠে বাস করিয়া মান, সম্ভ্রম, ধর্ম্ম ও স্বাধীনতা হারাইতে লাগিলেন; মুসলমান শাসনের উপর ক্রমশঃ লোকের মন বিচলিত হইতে লাগিল।

(Stewart's History of Bengal).

সীতারাম এই সময়ে ধীরে ধীরে মহম্মদপুরে রাজ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, স্বীয় অধিকার সংস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মুসলমান অত্যাচার সীতারামের অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মুসলমান রাজত্ব নষ্ট করিয়া, বাঙ্গলার দক্ষিণ অংশে হিন্দু-রাজ্য সংগঠন করিবেন, ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। তাঁহার অন্তঃকরণ মহৎ ছিল। তাঁহার যদি পুত্রপৌত্রদিগকে ধন-গৌরবে গৌরবান্বিত করিবার উদ্দেশ্য থাকিত, তাহা হইলে রাজত্বের শেষ সময়ে সামান্য ভাবে মস্তক অবনত করিয়া সন্ধি করিলে, অথবা বার্ষিক কিছু রাজস্বের বন্দোবস্ত করিলে, আজ মহম্মদপুর শ্মশানে পরিণত হইত না। অদ্যাপি তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ 'রাজা' কিম্বা 'মহারাজা' উপাধি লাভ করিয়া, মহম্মদপুরের রাজধানীতে থাকিয়া, সুখ ভোগ করিতে পারিতেন। বিশেষতঃ তখন সম্রাট্ এবং নবাবগন রাজস্ব পাইলেই সন্তুষ্ট থাকিতেন, অন্য কোন দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন না। সীতারামের হৃদয় যদি এতদূর উন্নত না হইত, তাহাহইলে তাঁহার নাম এরূপ চিরস্মরণীয় ও সাধারণের আদরের ধন হইত না। অন্য পক্ষে মহম্মদপুরের গৌরবসূর্য্য ও চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইত না। সীতারাম উন্নতমনা বীরপুরুষ, তিনি যবনঅত্যাচার হইতে জন্মভূমিকে বিমুক্ত করিবার জন্যই উদ্যোগী হইয়াছিলেন। মুরসিদ কুলি খাঁ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া, মুরসিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন, সীতারামও তখন মহম্মদপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া, স্বীয়

অধিকার বিস্তারের প্রয়াস পাইতে ছিলেন। সীতারাম প্রতিষ্ঠিত ৺দশভূজা মন্দিরে যে প্রস্তরাঙ্কিত কনকলিপি ছিল, তদৃষ্টে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ১৬২১ শকে ৺দশভূজার মন্দির স্থাপিত হয়। ১৬২১ শক ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী; তখন বাঙ্গলার মুসলমান-রাজধানী ঢাকায় ছিল, দিল্লীর সম্রাট্ আরঙ্গজীব; সুতরাং সীতারামের রাজত্ব দিল্লীর সম্রাট্ আরঙ্গজীবের সময়। ৺লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরের মন্দির ১৬২৬ শকে নির্ম্মিত হয়, তখন মুরশিদাবাদে মুসলমান রাজধানী ঢাকা হইতে উঠিয়া আইসে। ১৬২৬ শক ১৭০৪ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়। ৺হরেকৃষ্ণ রায় বিগ্রহের মন্দিরে প্রস্তরাঙ্কিত কনকলিপিতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, ১৬২৫ শকে অর্থাৎ ১৭০৩ খৃষ্টাব্দের নিকট-সময়ে এই মন্দির প্রস্তুত হয়; বাঙ্গালার তখন মোগলদিগের আত্মবিবাদ; সম্রাট্ পৌত্র আজিমওসান বাঙ্গলার নবাব ছিলেন, তাঁহার সহিত মুরসিদকুলিখাঁর বিবাদ হয়। সম্রাট্ আরঙ্গজীব বিচার করিয়া, মুরসিদ-কুলিখাঁর উপর বাঙ্গলার শাসনভার অর্পণ করেন।

এদিকে সীতারাম ক্রমশঃ স্বীয় অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং চাকলাভূষণার তদানীন্তন ফৌজদার সীতারামের প্রবল প্রতাপ হ্রাস করিতে পারিলেন না। ভূষণা অঞ্চলে সীতারামের আধিপত্য সংস্থাপিত হইল। ভূষণাই সীতারামের যুদ্ধক্ষেত্র ছিল। ভূষণা প্রদেশ দখল করিতে, সীতারামের ভূষণার ফৌজদারের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। সীতারাম যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, অধিকতর উৎসাহে স্বীয় অধিকার দৃঢ় করিতে লাগিলেন। সীতারামের নাম দিল্লীর দরবারে রাষ্ট্র হইল। আবুতোরাপ তখন দিল্লীতে বাস করেন। আবুতোরাপ দিল্লীর দরবারে বিশেষ প্রতিপন্ন ছিলেন, তিনি সীতারামকে পরাজয় করিতে সম্মত হওয়ায়, দিল্লীর দরবার হইতে চাকলা ভূষণার ফৌজদার নিযুক্ত হইলেন। দিল্লীর দরবারে তাহার অনেক পৃষ্ঠপোষক লোক ছিলেন, সুতরাং সহজেই চাকলা ভূষণার ফৌজদারের সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। আবুতোরাপ নবাবের জামাতা বলিয়া বিখ্যাত। নবাব তখন পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমনে ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। তোরাপ মুরশিদাবাদে আগমন পূর্ব্বক অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ ভূষণায় যাত্রা করিলেন; নবাব তখন তোরাপের সাহায্যার্থ বেশী সৈন্য দিতে পারেন নাই। আবুতোরাপ সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয় পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

Stewort's History of Bengal এ লিখিত আছে যে, সীতারাম যুদ্ধে আবু-তোরাপের শিরশ্ছেদ করিয়া, নবাবভয়ে ভীত হইয়া, তোরাপের মৃতদেহ সমাদরে সমাহিত করিবার আদেশ দেন। কোন কোন লেখক লিখিয়াছেন যে, সীতারাম বীর, তিনি বীরের ন্যায় বীরদেহ সমাহিত করিতে আদেশ প্রদান করেন। তোরাপের মৃত্যুসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রবাদ এই, বীর সীতারাম তোরাপের মাথা কাটিয়া আনিতে মেনা-হাতীকে আদেশ দেন, তদনুসারে মেনাহাতী যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তোরাপের মস্তক সীতারামসমীপে আনয়ন করে। মুনীর

১০ম বর্ষ | ফাল্গুন। | ১১শ সংখ্যা

১৮২৫, ১৩১০।

গ্রাহকগণ!

বর্ত্তমান বর্ষের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২৫।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য——সমেত ডাকমাশুল ২৲ মাত্র। এই সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০

পত্র লিখিতে, টাকা পাঠাইতে বা ঠিকানা-বদল জানাইতে, গ্রাহকগণ অবশ্য অবশ্য স্বীয় স্বীয় গ্রাহক-নম্বর দিবেন।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১০ম বর্ষ, ১০ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা। | ফাল্গুন। | ১৩১০ সাল, ১৮২৫ শকাব্দা।

পঞ্চমকার। (১)

"ত্রিপঞ্চকায় সর্ব্বায় শঙ্করায় শিবায় চ।
সর্ব্বলোকপ্রধানায় শঙ্করায় নমো নমঃ।"

পার্ব্বতীপতি পঞ্চাননের আনন নির্গত শাস্ত্রের নাম তন্ত্র। তন্ত্রশাস্ত্রে প্রশ্নকর্ত্রী সর্ব্বার্থসাধিনী সর্ব্বমঙ্গলা, উত্তরকর্ত্তা জগদ্‌গুরু দেবাদিদেব মহাদেব। সেই তন্ত্রশাস্ত্রে সাধনের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ পঞ্চমকার উক্ত হইয়াছে। পঞ্চমকার অর্থাৎ পাঁচটি দ্রব্যের আগ্ন অক্ষর 'ম'। যথা—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। এই পাঁচটিকে পঞ্চমকার কহে। পঞ্চমকার সাধনের ফলও অসীম।

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রা মৈথুনমে বচ।
মকার পঞ্চকং কৃত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন—এই মকার পঞ্চক সাধকের পুনর্জ্জন্ম হয় না।

তন্ত্রোক্ত এই পঞ্চমকারের নামে তান্ত্রিক সাধকগণ শুড়ির দোকানের মদ, কশাইএর দোকানের মাংস, মৎস্য উদরস্থ করিয়া বারাঙ্গনা সঙ্গে নানারঙ্গে বীরাচারী বা কৌল বলিয়া পরিচয় দেন।

ইহা তো বড় সুবিধা! মদ, মাংস খেয়ে রমনী সঙ্গে রঙ্গে কাটাইলে একেবারে

(১) হিন্দু-পত্রিকার কতিপয় শিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ গ্রাহক পঞ্চমকারের প্রকৃত অর্থ জানিবার জন্য আমাকে পত্র লিখিয়াছেন। প্রত্যেক পত্রের পৃথক উত্তর দেওয়া অসম্ভব। এজন্য জিজ্ঞাসু পাঠক মহোদয়গণের পত্রের উত্তর স্বরূপ পঞ্চমকার প্রকাশ করিলাম। হিন্দু-পত্রিকায় বহু পূর্ব্বে একবার পঞ্চমকারের অর্থ কতকাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল। (বিনীত লেখক।)

মোক্ষ যদি হয়, তবে আতপতণ্ডুল ও নিরামিষ ভক্ষণাদি সাত্বিক আহার ব্যবস্থা এবং কঠোর তপস্যার বিধান কেন? জগদ্‌গুরু মহাযোগী মহেশ্বর সত্যই পাগল নাকি? "অভ্রান্ত কেবল শিবঃ।"—সেই অভোলা সর্ব্বজ্ঞ ভোলানাথের ভুল?—না, কখনই নহে। কলিযুগে মানবগণ স্বভাবতঃ মদমত্ত,—অনাচারে রত,—অসত্য প্রবৃত্ত এবং প্রমদাপ্রসঙ্গে প্রমত্ত ও সতত মদনোন্মত্ত; তদুপরি মদ মাংস ভক্ত ও ভামিনীসহ মৈথুনাশক্ত হওয়া ভক্তি ও সাধনার অঙ্গ এবং একে মনসা, তায় ধূনার গন্ধ!! এরূপ অবস্থায় বিরূপ ব্যবস্থা মহেশ্বর কখন করেন নাই। তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকার মদ, মাংসাদি নয় এবং পঞ্চমকার সাধন রমণীসহ মদ মাংস ভক্ষণ নহে।

সর্ব্বনাশক কালের গুরুতর সংঘর্ষণে, মতিগতির পরিবর্ত্তনে, শিক্ষা সংসর্গগুণে, প্রকৃত তন্ত্রজ্ঞ গুরুবিহনে যোগেশ্বর মহেশ্বরোক্ত পঞ্চমকার সাধনের নামে লম্পট মাতালের হুড়া হুড়ি, গড়াগড়ী। আর মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত পবিত্র ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে ও মহান্ ভাবের অভাবে নেড়া নেড়ীর ছড়াছড়ী, গোঁড়ামীর বাড়াবাড়ি! বাস্তবিক গৌড়ী, পৈষ্ঠী প্রভৃতি যে সুরা সে মদ্য নহে। ছাগ, মেষাদির মাংসও মাংস নহে এবং পঞ্চমকারান্বিত হওয়া মদ্য মাংসাদির অনুসঙ্গী সঙ্গিনীর সহিত নক্তে মিথুনাশক্ত হওয়া নয়। পঞ্চমকার কাহাকে বলে শুনুন;—

"যদুক্ত পরমং ব্রহ্ম নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
তস্মিন্ প্রমর্দন জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥"
(মহা নি, যন্ত্র।)

নির্ব্বিকার নিরঞ্জন পরমব্রহ্মেতে যোগ সাধন দ্বারা যে প্রমদন জ্ঞান, তাহার নাম মদ্য।

"এবং মাং সনোতি হি যৎকর্ম্ম তন্মাংসং পরিকীর্ত্তিতম্।
নচ কায় প্রতীকস্ত যোগিভির্ম্মাংস মুচ্যতে॥"
(ঐ)

যে সব সংকৃত কর্ম্ম নিষ্ফল পরমব্রহ্ম আমাকে সমপণ করে, সেই কর্ম্ম সমর্পণের নাম মাংস।

"মৎস্য মানং সর্ব্বভূতে সুখ দুঃখ মিদং প্রিয়ে।
ইতি যৎ সাত্বিক জ্ঞানং তন্ মৎস্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥"

সর্ব্বভূতে আমার ন্যায় সুখ দুঃখে সমজ্ঞান এই যে সাত্বিক জ্ঞান তাহার নাম মৎস্য।

"সৎসঙ্গেন ভবেন্মুক্তি রসৎ সঙ্গেষু বন্ধনম্।
অসৎ সঙ্গং মুদ্রণং যৎ তন্মুদ্রা পরিকীর্ত্তিতা॥"

অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎসঙ্গ সহবাসের নাম মুদ্রা।

"কুলকুণ্ডলিনী শক্তি র্দেহিনাং দেহধারিণী।
তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্ত্তিতম্।"

মূলাধারস্থিত কুণ্ডলিনী শক্তি যোগসাধন দ্বারা ষট্‌চক্র ভেদ পূর্ব্বক শিরঃস্থিত সহস্র দল কমল কর্ণিকান্তর্গত বিন্দুরূপ পরমশিবের সহিত সংযোগ করার নাম মৈথুন।

এই হইল পঞ্চমকার। মহাদেব বলিয়াছেন যে, "পঞ্চমে পঞ্চমাকারং পঞ্চানন সমং ভবেৎ।" পঞ্চম স্ত্রী সংসর্গ নহে। পরমশিবের সহিত কুণ্ডলিনীর সংযোগকেই পঞ্চম কহে। ইহার নাম লয় যোগ। এজন্য পঞ্চমকার যৌগিক ক্রিয়া।

পঞ্চমকারের প্রকৃত কার্য্য যোগের ক্রিয়া তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। পঞ্চমকারের উপরোক্ত স্থূল অর্থ ব্যতীত সূক্ষ্ম প্রকৃতার্থ এই যে,—মদ্য অর্থ অগ্নিতত্ত্ব=নাভিদেশে মণিপুর চক্র; মাংস-বায়ুতত্ত্ব=হৃদয়স্থিত অনাহত চক্র; মৎস্য-জলতত্ত্ব=লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান চক্র; মুদ্রা—পৃথ্বিতত্ত্ব=মূলাধারে কুণ্ডলিনী; মৈথুন—আকাশতত্ত্ব=সহস্র দল কমলস্থ শিবের সহিত কুণ্ডলিনী শক্তির যোগ।

মদ্যরূপ অগ্নিতত্ত্ব নাভিস্থান (২) হইতে প্রথম যোগের ক্রিয়া আরম্ভ করিলে পরম-ব্রহ্মে প্রমোদন জ্ঞানাদি উপরোক্ত ফল সমূহ ক্রমশঃ প্রকাশ হইবে। পরিশেষে কুণ্ডলিনী, উত্থিত হইয়া সহস্রারে শিবের সহিত সংযুক্ত হইয়া মৈথুন নিষ্পন্ন হইবে।

ইহাই প্রকৃত পঞ্চমকার। এ পঞ্চম-কারের ক্রিয়া করিতে জানিলে অতি সহজে প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়। দোকানের মদ্য পান করিলে অনতিবিলম্বেই যেমন মদের ক্রিয়া, গুণ প্রকাশ হইতে থাকে, তেমনি নাভিস্থান হইতে সাধন ক্রিয়া আরম্ভ করিলে অতি সহজে অত্যল্পকাল মধ্যে প্রত্যক্ষ ফল দেখা যায়। মদ্য পানান্তে যেমন আনন্দানু-ভব হয়, নাভিচক্রে যৌগিক ক্রিয়া করিলে তেমনি অপার্থিব অনির্ব্বচনীয় অপার আনন্দ অনুভব হয়। মানবদেহের নাভিমণ্ডলে মণিপুর চক্র আছে। নাভি মণ্ডলের মাহাত্ম্য ও গুণ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। মনঃস্থির করিবার সহজ উপায় নাভিচক্র এবং সুষুম্না-মুখ খুলিবার ও স্বল্পদিন মধ্যে কুণ্ডলিনী চৈতন্য হইবার অপূর্ব্ব ও সহজপন্থা নাভি-চক্র;—আত্মজ্যোতি দর্শনের প্রথমসূত্র ও সহজ উপায় নাভিচক্র; নাদের অভিব্যক্তি ও নাদধ্বনি শ্রবণাদির সুগম ও সহজ উপায় নাভিচক্র (৩)। এই কারণে তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রে নাভিচক্রের অসীম মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। নাভিস্থান হইতে ক্রিয়া আরম্ভ করিলে কুণ্ডলিনী জাগরিতা হন, শেষে ষট্‌চক্র ভেদ পূর্ব্বক সহস্রারে পরমশিবের সহিত সংযুক্ত করিতে হয়। ইহারই নাম মৈথুন,—ইহাই লয় যোগ। এইরূপ মৈথুন করিলে সাধকের আর পুনর্জন্ম হয় না।

সকলেই জানেন যে, সুরাদি পঞ্চমকারের

(২) মানবদেহের গুহ্যদেশের ২ অঙ্গুলি নিম্নে মূলাধার নামক পদ্মে পৃথ্বিতত্ত্ব ও লিঙ্গ-মূলে স্বাধিষ্টান পদ্মে জলতত্ত্ব, নাভিস্থানে মণিপুর চক্রে অগ্নিতত্ত্ব, হৃদয়ে অনাহতপদ্মে বায়ুতত্ত্বের অধিষ্ঠান। ইহার বিস্তৃত বিবরণ মৎপ্রণীত 'যোগের সোপান' নামক পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) নাভিস্থলে কিরূপে ক্রিয়া করিলে কুণ্ডলিনী জাগরিত হন, তাহা এবং আত্ম-জ্যোতিঃ দর্শনাদি সমস্ত বিষয়ের ক্রিয়া উপদেশ সহ ষট্‌চক্র ও গুপ্ত তিন চক্রাদির বিস্তৃত বিবরণ মৎপ্রণীত "যোগ সোপান" নামক পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক ইহ-পরকালের সুখ লাভের সহজ উপায় নাভিচক্র। এরূপ আর কিছু নাই। অজীর্ণ (Dyspepsia) ও অন্যান্য পীড়া আরোগ্য হইবার এবং শরীর নির্ব্যাধি ও সুস্থ হইবার উপায় নাভিচক্র। আর পরমার্থ সাধনের কথাই নাই। তবে, এমন সুন্দর ও সহজপথ দেখাইয়া দিবার গুরু অতি দুর্লভ।

ও শক্তি পূজাদি বাহ্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠান সমস্ত তন্ত্রে বর্ণিত। কিন্তু তন্ত্র মধ্যে যোগোপদেশ ও যোগসাধনের সুগম ও সহজপন্থা নির্দ্দিষ্ট আছে! অবশ্য তাহা সাঙ্কেতিক। গুরু-মুখী না হইলে তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। তবে যোগশাস্ত্রজ্ঞ যোগীগণ বুঝিতে পারেন সন্দেহ নাই। তন্ত্র, যোগ ও স্বরোদয় শাস্ত্র গুরুমুখে উপদেশ প্রাপ্ত না হইলে পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধি জোরে কাহারো বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

নির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে—"ত্রিসন্ধ্যাং মানসং যোগং নাভিকুণ্ডে প্রযত্নতঃ।" অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যা যত্নসহকারে নাভিকুণ্ডে যোগসাধন করিবে। মন্ত্র জাপকদিগের জন্য তন্ত্রে ব্যক্ত আছে যে,—"মণিপুরে সদা চিন্তাং মন্ত্রানাং প্রাণরূপকং।"—মন্ত্রের প্রাণরূপ মণিপুরচক্রে সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। এই যে মন্ত্রের প্রাণ ও যোগসঙ্কেত মন্ত্ররূপ নাভিকুণ্ড—মণিপুর চক্রে কি প্রকারে ক্রিয়া করিতে হয়, তাহা কোন পণ্ডিতব্যক্তি বুঝাইয়া দিতে পারেন কি? তন্ত্র ও যোগ-শাস্ত্রজ্ঞ সাধক ব্যতীত অপর কেহই পারিবেন না। কিন্তু আমাদের দেশে এখন ঐ দুই শাস্ত্রের আলোচনা ও অভিজ্ঞ ব্যক্তি একেবারে নাই। তন্ত্র ও যোগশাস্ত্রজ্ঞ সাধকের অভাবে মন্ত্ররূপ নাভি আদি স্থানে যোগ সঙ্কেত না জানায় বাজারের মদ্যাদি কুৎসিৎ উন্মত্তকর রাজস দ্রব্য পঞ্চমকারের স্থান অধিকার করিয়াছে।

ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আরো দেখুন। অনেক তান্ত্রিক গৈরিক বসন পরিধান ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করিয়া পরাঙ্গনা কিম্বা বেশ্যাকে ভৈরবী সাজাইয়া সঙ্গিনী করিয়া থাকেন। ইহা তো তন্ত্র বিধি বিরুদ্ধ। শ্রীমন্মহাদেব বলিয়াছেন,—

"বিনা পরিণীতা বীরং শক্তি সেবা সমাচরন্।
পরস্ত্রীগামিনাং পাপ প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ॥"
(ম, নি, তন্ত্র।)

বিবাহিতা পত্নী ব্যতীত অন্য শক্তি গ্রহণ করিলে পরস্ত্রী গমনের পাপ হইবে সন্দেহ নাই।

তন্ত্রে স্পষ্টতঃ নিষেধ সত্ত্বের অনেক তান্ত্রিক মহাত্মা বেশ্যাকে ভৈরবী সাজাইয়া উপভোগ করেন এবং তন্ত্রোক্ত ভৈরব ভৈরবী বলিয়া পরিচয় দেন। ইহা কি তন্ত্রোক্ত সাধন না, সমাজের চক্ষে ধুলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক লম্পটতা সাধন!!

শ্রীউমানাথ চট্টোপাধ্যায়।

বিদেশীর মর্ম্ম-কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তামুরা হায়দারি একজন প্রসিদ্ধ জাপানী পুরোহিত। ঘটনাক্রমে তাঁহার সঙ্গে এক দিন পরিচয় হইল। তিনি অত্যন্ত শান্ত ও ক্ষমাশীল ছিলেন। তাঁহার সহিত যতই ঘনিষ্টতা হইতে লাগিল, ততই আমার তাঁহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল; কিন্তু আমার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল না। সুবিধা পাইলেই আমি তাঁহার

ধর্ম্ম কথায় ব্যঙ্গোক্তি করিতাম। কিন্তু তিনি কখন ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই। আমি যে একজন ঘোর নাস্তিক, তাহা বুঝিতে না পরিয়া "অপেক্ষাকরুন, বুঝিতে পারিবেন।" তিনি এই সদুত্তর দিতেন। কারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ে নাস্তিক ও সন্দেহ বাদী-লোক যে থাকিতে পারে, অথবা শিক্ষিত ব্যক্তিগণ যে বিজ্ঞানাবিষ্কৃত তত্ত্ব ব্যতীত অদৃশ্য জগতে ভূত-প্রেত যক্ষ-দানব ও দেবতাদিগের অস্তিত্ব অবিশ্বাস করে; তাহা তাঁহার বুদ্ধির ধারণাতীত ছিল। জেরিমি কলিয়ারের মত * "মানব যে একটা চলৎ-শক্তি-বিশিষ্ট যন্ত্র ও চৈতন্য রহিত বচন পটু মস্তক" তিনি কদাচ স্বীকার করিতেন না। তিনি বলিতেন যে "মানব চৈতন্যময় জীব; মানবের চিন্তা প্রবাহ যদি আপনার কথানুযায়ী অখণ্ডনীয় এক প্রকার ধারা বাহিক গতি-নিয়মের অধীন হইত এবং তাহার গতি পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা যদি মানবের কিছু মাত্র না থাকিত, তাহা হইলে জীবের 'শুভাশুভ কর্ম্ম' নামাভিধেয় নিগূঢ় অদৃষ্ট-বাদ মূর্খের সান্ত্বনা রূপে পরিনত হইত।"

এইরূপে আমার সেই অধ্যাত্ম জ্ঞানী বন্ধুবর সময়ে সময়ে অদৃষ্টতত্ব, জীবের পরলোক গমন ও দেহান্তর প্রাপ্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, কিন্তু তৎসময়ে তৎসমুদায় আমার নিকট অলীক স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইত।

একদিন তিনি বলিয়াছিলেন যে "যদি এই চৈতন্যে বিশিষ্ট জড় দেহ প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে আমরা চৈতন্যের অবস্থানোপযোগী একটী সুদৃঢ় অধ্যাত্ম ভিত্তি নির্ম্মাণ না করি তবে চৈতন্যর বিমল আনন্দ লাভের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।" এই সকল প্রলাপ-বাক্য মনে করিয়া আমি অত্যন্ত হাসিয়া ফেলিলাম। কিন্তু তামুবার হৃদয় প্রশান্ত সরোবর বৎ—কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া উত্তর করিলেন—"অবিশ্বাসী বন্ধুবর, হাস্য সম্বরণ করুন, ভাবিয়া দেখুন—এই দুর্লভ মানব জীবন প্রাপ্ত হইয়া যদি ইহ জীবনে আত্ম-চৈতন্য-জ্ঞান লাভ না হয়, তবে মৃত্যু কর্ত্তৃক এই জড় দেহ বিনষ্ট হইলে, চৈতন্যময় জীবাত্মা কোথায় থাকিবে? জড়ের অভাবে জীবাত্মাকে চৈতন্যময় লোকে অবস্থান করিতে হইবে।"

"সেই চৈতন্যময় লোক কোথায়?" তিনি উত্তর করিলেন "বৌদ্ধগণ তাহাকে 'তুষিত দেবলোক' কহেন। এই যে মন, যাহাকে আপনারা মস্তিষ্কস্থ যন্ত্র বিশেষ কহেন; এই মনের সাহায্যে মানব কি না করিতে পারে? ইহ জীবনেই স্বর্গ-নরক রচনা করিতে পারে—মনের সাহায্যে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে—এমন কি, সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিতে পারে।"

"সম্পূর্ণ অসম্ভব! কি উপায়ে তাহ হইতে পারে?" "প্রগাঢ় ধ্যান ও দেবতাস্বরূপ

* "Like Jeremy Collier, he refused to admit that he was no better than a stalking machine, a speaking head withont a soul in it' and whose 'thoughts are all bound by the lows of motion." (Lucifer)

স্বত্বগুণের পরিস্ফুরণে সেইসব লাভ হইতে পারে।„

"আপনার অভিপ্রায় এই যে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি-স্থাপন; কিন্তু যদি কেহ সেইরূপ আধ্যাত্মিক কর্ম্মে পরাঙ্মুখ হয়, তবে তাহার উপায় কি?"

"ইহজীবনের অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্ম্মানুযায়ী তাহাকে ফলভোগ করিতে হইবে। হয়, অবিলম্বে পুনর্জন্ম না হয়—'অবিচি' (নরক) অর্থাৎ মানসিক যন্ত্রণাময় অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু আমার মতে প্রত্যেক মানবের পরলোকের জন্য প্রস্তুত হওয়া ও চৈতন্যের নিকট অগ্রসর হইতে চেষ্টাকরা অতীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সত্বর তাঁহার নিকটবর্ত্তী হওয়া যায় তাহাই মঙ্গল; অনর্থক কাল বিলম্বে প্রয়োজন কি?"

"যদি কেহ সেই চৈতন্য বিশ্বাস না করে, তবে তাহার কি হইবে?"

"বিশ্বাস করিতে না পারে, কিন্তু সন্দেহ থাকিতে পারে। এবং সেই সন্দেহ যদি তাহার মানস-মন্দিরে যৎসামান্য স্থানও লাভ করিয়া থাকে এবং একবারও যদি মুহূর্ত্তেকের জন্য সেই মানস মন্দির উন্মোচনের চেষ্টা-করে তাহা হইলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।"

"আপনি কি? কবি, না, দার্শনিক! আপনার প্রত্যেক কথাই কেমন যেন দুর্ব্বোধ্য ও রহস্য পূর্ণ।"

"রহস্য কিছুই নহে—তথাচ আপনার কৌতুহল চরিতার্থ করা কর্ত্তব্য। মনে করুন, কোনস্থানে একটী মন্দির আছে; সেই মন্দির আপনি কখন দেখেন নাই, এবং সেই মন্দিরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার আপনার যথেষ্ট কারণ আছে। এক্ষণে যদি কেহ বল পূর্ব্বক আপনাকে সেই মন্দির সমীপে লইয়া যায় এবং আপনি যদি কৌতুহল পরবশ হইয়া সেই মন্দির-দ্বার উন্মোচন করিয়া মুহূর্ত্তেকের জন্য তন্মধ্যে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন; তাহা হইলে সেই মন্দিরের সহিত আপনার একপ্রকার সম্বন্ধ স্থাপিত হইল আপনি কখন সেই মন্দিরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে পারিবেন না অথবা মন্দিরে প্রবেশ এবং মন্দিরস্থ ব্যাপার দর্শন ইত্যাদি ঘটনা কখনই অবিশ্বাস করিতে পরিবেন না। এক্ষণে আপনি এই পবিত্র মানস মন্দিরে যেরূপ কর্ম্ম করিবেন, এই রক্ত মাংস জড়িত জড় দেহের অবর্ত্তমানে জীবাত্মা সেই সকল কর্ম্মের প্রকৃতি অনুযায়ী পরলোকে ফলভোগ করিবে।"

তামুরা হায়দারি জিওনিন (temple of Ize-onene) মঠ ভুক্ত ছিলেন। এই মঠ কেবল জাপানে নহে, চীন ও তিব্বত দেশ মধ্যে অত্যন্ত বিখ্যাত ছিল। কাইটো-নগর বাসীগণ এই মঠের প্রতি যেরূপ ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন, অন্যান্য মঠের প্রতি সেইরূপ নয়ন গোচর হইত না। ইহার সন্ন্যাসীগণ জেনেডু (Sect of Dzene-doo) সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন; এবং অন্যান্য ভ্রাতৃমণ্ডলী অপেক্ষা ইঁহারা বিশিষ্ট জ্ঞানী ও শিক্ষিত ছিলেন। লেওটজ (Lootze) মতাবলম্বী সংসার ত্যাগী যমাবুশী (yamabooshi) গণের সহিত ইঁহাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ও বন্ধুত্ব ছিল।

সুতরাং আমার ধর্ম্ম বিদ্বেষের সামান্য উত্তেজনাতেই তামুর উত্তেজিত হইয়া আমার সন্দেহ ব্যধি দূরীকরণ জন্য প্রাণ পণে যত্ন করিতেন।

তিনি বহুকাল এমন কি জীবনের দুই তৃতীয়াংশ অধ্যাত্মজ্ঞানালোচনায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন; এবং ধ্যান সমাধি ইত্যাদি ক্রিয়াতেই দিবসের অধিকাংশ সময় কাটাইয়া ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস পরিশ্রম কখন বিফল হয় না। পরিশ্রমানুরূপ ফল অবশ্যই তিনি পাইবেন। এমন কি ইহজীবনে পরিশ্রমানুরূপ যেরূপ পুরস্কার পাইতে পারেন, পরজীবনে তাহার শত সহস্রগুণ অধিক পরিমাণে পাইবেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে আমার সম্বন্ধে তিনি যে মন্দিরের উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন, সেই মন্দিরে যদি আমি একবার মাত্র দৃষ্টিপাত করিয়া আর সেখানে কখন পাদার্পণ না করি তাহা হইলে তাহার ফল কি হইবে? প্রত্যুত্তরে তিনি বলিয়া ছিলেন—

"আমরা ইহজীবনে যে সকল কর্ম্ম করি তাহা ভালই হউক আর মন্দই হউক, তাহার সংস্কার আমাদের মানসক্ষেত্রে অঙ্কিত হইবে। যদি আপনি ক্রোধভরে বা ঘৃণা সহকারে সেই মন্দিরে প্রবেশ করেন, তবে আপনি ক্রোধ ও ঘৃণাই প্রাপ্ত হইবেন। আপনার জীবন দুঃখময় হইবে। আপনাকে পুনঃ পুনঃ ক্রোধ ও ঘৃণা সহকারেই সেই মন্দির দ্বার উন্মোচন করিতে হইবে।"

"যদি আমার পুনরায় জন্ম না হয়, তবে আমাকে কিরূপে সেই কাজ পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে।"

আমার এই প্রশ্ন শুনিয়া তামুরা অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন; পরে ধীরে ধীরে অতি মৃদুস্বরে কহিলেন যে "আমার বোধ হয়, তাহা হইলেও আপনাকে পুনঃ পুনঃ দ্বার উন্মোচন করিতে হইবে এবং সেই কাল অতি অল্প হইলেও আপনার নিকট অতি দীর্ঘ কাল রূপে প্রতীয়মান হইবে।"

এইবার আমি আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলাম না, উচ্চস্বরে হাসিয়া ফেলিলাম। সরল তামুরা অবাক্ ও অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক আলোচনার পরিণাম যে এই হইবে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। তিনি অধিকতর সস্নেহ ও কৃপাদৃষ্টিতে আমার প্রতি চাহিতে লাগিলেন। প্রকৃত পক্ষে আমিও অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিলাম। তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম :——

"যে পরলোক সম্বন্ধে আপনার এতাধিক দৃঢ়বিশ্বাস, সেই পরলোকে আমাদের ইহজীবনের অনুষ্ঠিত কর্ম্মই কি পুনরভিনীত হয়?"

"কেবল পুনরভিনয় নহে—ইহজীবনে আমরা যে সকল কর্ম্মের অভিনয় করিয়া থাকি, সেই অভিনীত কর্ম্মের শুভাশুভ প্রকৃতি অনুযায়ী ফল লাভ হইয়া থাকে—যে সকল প্রবল বাসনা আমরা ইহজীবনে পূর্ণ করিতে না পারি, তাহা সেইখানে পূর্ণ হয়। কিন্তু আপনি অবিশ্বাসী ও

জড়বাদী; এই সকল সূক্ষ্ম তত্ত্ব আপনি কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন না এই জন্যই আপনাকে স্থূল একটা মন্দিরের দৃষ্টান্ত দেখিয়াছিলাম। এবিষয়ে আপনার কোন অপরাধ নাই। আমিই সম্পূর্ণ অপরাধী। যাহা হউক আমি প্রার্থনা করি আপনার মঙ্গল হউক। এই বলিয়া তামুর ছায়দারি জাপানি পদ্ধতি অনুসারে বিদয় গ্রহণ পূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু হায়।

বৃথা আত্মগ্লানি, বৃথা অনুতাপ এবে,
বৃথা গোঁয়াইনু কাল, বৃথা আসা ভবে।
বৃথা উচ্চশিক্ষা, বৃথা বিজ্ঞান আলোক,
বৃথা অভিমানে, গেল ইহ পর-লোক।
তামুরা স্বর্গীয় জীব, তন্মহের খাতিরে,
কত যে অধ্যাত্ম কথা, শুনাত আমারে।
কেবল নাস্তিক্য-বাদে, উপেক্ষা করেছি,
তামুরায় মনঃ পীড়া, অনেক দিয়েছি।
এখন বিদ্বেষ-বিষ, বিজ্ঞান-ছলনা,
ছুটেছে নাস্তিক্য বাদ, রয়েছে যন্ত্রনা।
যমবুশীর বাক্য যদি, হইত প্রত্যয়,
কেনবা মরিবে, মম প্রিয়জন হায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ দে।

প্রাণতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তজ্জন্যই পণ্ডিতগণ সতত প্রাণায়ম প্রাণায়ম পর হইবার উপদেশ দিয়া থাকেন। প্রাণকে 'আয়াম' বা বিশেষ সংযমনের জন্য কোন স্থান গমন করিতে হয় না। শাস্ত্র বাক্য জ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক বলিয়া থাকেন এই শরীরই একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডস্থ তাবৎ পদার্থই এই শরীরে উপ-কল্পিত হয়। অনন্ত ঐশ্বর্য্য অনন্ত দেবতা ও অনন্ত তীর্থ এই শরীর মধ্যেই বিরাজিত আছেন। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী আধ্যাত্মিক চক্ষুতে অন্বেষণ করিলে এই শরীর মধ্যেই পাওয়া যায়। এই অপূর্ব্ব ঘট মধ্যে বরণা ও অসী সঙ্গম স্থল পরম পবিত্রক্ষেত্র বরা-ণসী। সৃষ্টিস্থিতি সংহার কারিণী ঐই ত্রিতয়শক্তি দেবীব্রহ্মাণী, দেবীবৈষ্ণবী ও দেবীরুদ্রাণী এই শরীর মধ্যেই বসতি করিয়া থাকেন। সাধনা সিদ্ধ হইলে সাধক এই অপূর্ব্ব ঘট মধ্যেই যুক্ত ও মুক্ত ত্রিবেণী স্নানে সকল তীর্থ স্নানেরই ফব পাইতে পারেন। শরীরের অপর নাম সাধন চক্র বা ঘট। জলাদি আহরক ঘটের ন্যায় জীবের জীবন আহরণ উপযোগী কার্য্যাদি নিষ্পন্ন হয় বলিয়া দেহের নাম 'ঘট' হইয়াছে। তত্ত্ব জ্ঞান হইলে নাশ পায় বলিয়া উহার আর এক নাম শরীর। কারণ শরীর লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীর এই ত্রিবিধ অতিরিক্ত আর শরীর নাই। প্রাণ ও মনঃ এর দেহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে স্থূল দেহবিনাশ পায়। আমাদের ঘর, বাড়ী যেমন আমাদের স্থূল দেহের ভোগায়তন স্বরূপ সূক্ষ্ম শরীরের ভোগায়তন সেইরূপ স্থূল দেহ। জ্ঞান বা মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মাকে সূক্ষ্ম শরীরাশ্রয়ে সংসারে পুনঃ সংখ্যারণ বপবর্ত্তী হইতে হয়। শরীর পূর্ব্ব কথাও এই শরীর নামক ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডটি যেন বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অনুরূপ।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতিশচন্দ্র দত্ত।

জাতি-ভেদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তখনকার যুগে দেশের অধিকাংশ লোকই অশিক্ষিত ছিল—তখন শিক্ষা করিবার স্বাধীনতা ও তাহাদিগের অনেকের ছিল না। কিন্তু জাতীয় জ্ঞানোন্নতি ভিন্ন জাতিবিশেষের উন্নতি কবে হইয়াছে—জাতিবিশেষের সভ্যতা কবে পূর্ণাঙ্গী হইয়াছে? যে জাতি যতই সভ্য হয়, সেই জাতির শিল্পোন্নতি ততই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধুনা দেখিতে পাওয়া যায়, তখনকার ব্রাহ্মণদিগের তুলনায় এখন ব্যক্তিবিশেষের জ্ঞান এবং শিক্ষা যে অধিক তাহা নহে। কিন্তু শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তৃতির সহিতই দেশের মঙ্গল যত সম্বন্ধ,—ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়-বিশেষের উন্নতির সহিত তত নহে। সর্ব্বকালেই "mass education" আবশ্যক।

পাশ্চাত্য-জগতের ইতিহাস পাঠে আমরা দেখিতে পাই যে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট হইতে, দেশের সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি কত উন্নতিলাভ করিয়াছে। যে সমস্ত লোক সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থান করিত, এমনকি তাহারাও বিজ্ঞান, শিল্প প্রভৃতির এমত হিতসাধন করিয়া গিয়াছে, তাহাদিগকে এত উন্নত করিয়া গিয়াছে যে, তাহা অত্যাশ্চর্য্য। যাঁহারা প্রথমে হয়ত নিতান্ত নীচ কার্য্য করিয়া করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, শিক্ষা ও জ্ঞানের সাহায্যে, তাঁহারাই কালে পাশ্চাত্যজগতের শ্রেষ্ঠদার্শনিক, বা শ্রেষ্ঠ-আবিষ্কর্ত্তা, বা শ্রেষ্ঠবৈজ্ঞানিক বলিয়া সম্মান লাভ করিয়াছেন। নিতান্ত মূর্খ পিতা মাতার পুত্রও, অবশেষে প্রগাঢ়-পণ্ডিত এবং দেশমান্য বৈজ্ঞানিক হইয়াছে। এরূপ দৃষ্টান্ত আমাদিগের দেশে নাই, থাকিলেও হয়ত অতিবিরল। হয়ত যে সময় এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, তখন জাতিভেদ বর্ত্তমান আকার ধারণ করে নাই।

বিখ্যাত কিড্ সাহেব (Kidd) বলিতেছেন :—

"In eastern countries where the institution of caste still prevails, we have indeed only an example of a condition of society in which these groups and classes have become fixed and rigid and in which consequently progress has been thwarted and impeded at every turn by innumerable barriers and which have for ages prevented that free conflict of forces within the community which has made so powerfully for progress among the western peoples." *

জাতিভেদ বর্ত্তমান আকার ধারণ করিবার ফলে, আধ্যাত্মিকতার উপর বর্ত্তমানহিন্দুসমাজের দৃষ্টি হ্রাস হইয়া গিয়াছে। এখন সকলে শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া-কর্ম্মপদ্ধতি লইয়া মহাব্যস্ত। সামাজিক বিভাগের বিষময় ফলে, এখন হিন্দুসমাজ অধিকাংশ সময়েই সামান্য সামান্য বিষয়ের তর্ক ও সিদ্ধান্ত লইয়াই ব্যস্ত থাকে। যাহা অবশ্য-দ্রষ্টব্য, যাহা অবশ্যকর্ত্তব্য, সেদিকে দৃষ্টি করিবার সুযোগ ও সময় কমিয়া আসে। এখন—

"Liturgy and ceremonial observances usurp the place of moral

* "Social Evolution" p. 154.

and spiritual ideas, with the result that the sanction of religion is applied to all the regulations of social intercourse. Rank and occupation are thus crystallized into hereditary attributes, a process which ends in the formation of a practically unlimited number of selfcentered and mutually repellant groups, cramping to the sympathies and the capacity for thought and actions. Within these groups it is hardly possible to speak too highly of the charity and devotion of the members of the community to each other, but beyond them, the learners on all sides preclude co-operation and real comparison and stifle originality in action.' *

সেন্‌সস্ রিপোর্ট হইতে যাহা উদ্ধৃত হইল, সে সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বেও আমরা কিছু কিছু বলিয়াছি। সকলেই ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন যে, অধুনা প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন জাতির এক একটী ভিন্ন ভিন্ন সমাজ আছে। সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন সমাজের ভিতর, অনেক স্থলেই সদ্ভাবের অভাব লক্ষিত হইয়া থাকে। এইরূপ বৈষম্য-বর্ত্তমানে, হৃদয়ে—প্রেমপ্রীতির স্ফূর্ত্তি বাধা-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেহ কাহারও সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় না বলিয়াই, পরস্পরের আভ্যন্তরীণ অবস্থার তুলনা করিয়া, পরস্পর উপকৃত হইতে পারে না। Augusti comti জাতিভেদের কোন কোন সুফল আছে, তাহা স্বীকার করিয়াও বলিয়াছেন:—

"Notwithstanding all these qualities, the theocratic system (caste) could not but be hostile to progress, through its excessive stability, which stiffened into an obstinate immoveableness when new expansions required a change of social classification. The supreme class appropriated all its immense resource of every kind to the preservation of its almost absolute dominion after it had lost by long enjoyment of power, the chief stimulous to its own progression." *

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, সমাজের উচ্চবর্ণই সর্ব্বদা সকলপ্রকার সামাজিক স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছেন। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, সমাজে ব্রাহ্মণাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্যই কত রকম অনুশাসন লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।

যে ভারতবর্ষে এত কোটী মানবের বাস, সেই ভারতবর্ষ প্রায় চিরদিনই পরের দাসত্বশৃঙ্খলপাশে বদ্ধ রহিয়াছে কেন? ইহারও অন্যতম কারণ বর্ত্তমান জাতিভেদ। সর্ব্বকালেই ব্রাহ্মণেতরজাতির সংখ্যা দেশে অধিক ছিল;—এখনও তাহাই আছে। ব্রাহ্মণেতর জাতি চিরদিনই ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিয়া আসিতেছে। সে দাসত্ব আধ্যাত্মিক। এই কঠোর আধ্যাত্মিক দাসত্বের মধ্যে বাস করিবার জন্য, তাহাদিগের মনুষ্যত্ব যে অনেকাংশে কমিয়া গিয়াছে, তাহার

*General census Report, 1891 p 121.

* "The positive Pohilosophy"—translated by H. Martinean. Vol II. p. 240.

আর সংশয় নাই। সুতরাং যখন বিদেশীয় আসিয়া ভারতবর্ষকে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন এই মনুষ্যত্বহীন জাতি আত্মরক্ষা ও দেশরক্ষা করিতে পারে নাই। পূর্বেই আমরা দেখাইয়াছি যে, বর্ত্তমান জাতিভেদ-প্রথার ফলে ভারতবর্ষে—সমাজে সমাজে, জাতিতে জাতিতে, একটা প্রাণের টান নাই—একটা হৃদয়ের মিল নাই। ইহার অভাবও দাসত্বের আর একটী কারণ। ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখনই মুসলমানগণ ভারতকে আক্রমণ করিয়াছে, তখনই ভারতের সমবেত শক্তি এক হইয়া, সেই যবনসেনাতরঙ্গের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করে নাই। আমরা দেখিতে পাই, যখন ক্ষত্রিয়গণ মুসলমানদিগের গতিরোধ করিবার জন্য হৃদয়ের উষ্ণশোণিতে যুদ্ধক্ষেত্র আর্দ্র করিয়াছিল, তখনও ভারতের অন্যান্য সম্প্রদায় ক্ষত্রিয়ের সাহায্য করে নাই। যদি হৃদয়ের মিল থাকিত, তাহা হইলে কি মুসলমান ভারতে আসিতে পারিত? ফরাসী পরিব্রাজক বিখ্যাত টাভারনিয়ার আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন, যে দেশে প্রত্যেক একজন মুসলমানকে পরাস্ত করিতে পাঁচজন করিয়া লোক আছে সে দেশ কেমন করিয়া যবনকরতলগত হইল? অবশেষে তিনি বুঝিয়াছিলেন, ভারতের জাতিগতবৈষম্যই ইহার কারণ।

'The idolators of India are so numerous that for one Mahomedan there are five or six Gentiles. It is astonishing to see how this enormous multitude of men has allowed itself to be subjected by so small a number of persons, and has bent readily under the yoke of the Mahomedan princes. But the astonishment ceases when one considers that these idolators have no union among themselves, and that superstition has introduced so strange a diversity of opinions and customs, that they never agree with one another." *

যাহা হউক, মুসলমানদিগের সময় হইতেই হিন্দুদিগের অবনতি হইয়াছে। হিন্দুর দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি, সেই সময় হইতেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সাবুক্তাগিন্ এবং তাঁহার পুত্র মহম্মদের সম্বন্ধে অল্‌-বেরুণী বলিতেছেন:—

"God be merciful to both father and son! Mahammud utterly ruined the prosperity of the country .... This is the reason too, why Hindu sciences have retired far away from those parts of the country conquered by us, ... †"

মুসলমানগণ যখন ভারতের রাজা হইলেন, তখন ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণাধিকার হ্রাস হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ ম্লেচ্ছদিগের সহবাসে আসিলেন না; কিন্তু শূদ্রগণ এবং অপরাপর জাতি, মুসলমান রাজাদিগের অধীনে কার্য্য করিতে লাগিল। মুসলমান-দিগের সহবাসে থাকিবার নিমিত্ত, ইহারা

*"Travels in India"—Jean Baptiste Tavernier Vol. II. p. 181.
† Alberunis, India"—Vol I. p. 22.

তাহাদিগের ভাষা ও রীতি নীতি শিক্ষা করিতে লাগিল। যে জাতি যখন দেশের রাজা হয়, তখন সেই রাজভাষা শিক্ষা না করিলে, সাধারণলোকের (বিজিত জাতির) চলে না। যাহা হউক, এইরূপে যবন-সহবাসে আসিয়া, এবং যাবনিক সাহিত্যাদি পাঠ করিয়া, ব্রাহ্মণেতর জাতির হৃদয় হইতে 'ব্রাহ্মণে দেবতাজ্ঞান' অনেকটা কমিয়া গেল। শুধু ইহাই নহে, মুসলমান আগমনের পর, বৈশ্য কায়স্থ প্রভৃতির হস্তে ধনসঞ্চয় হইতে লাগিল। এবং ইঁহারা মুসলমানরাজপ্রদত্ত সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া, জমিদার হইতে লাগিলেন। তখন হিন্দু-রাজাদিগের প্রতাপও কমিয়া আসিয়াছিল। দেশে পারস্যভাষা আলোচিত ও প্রচলিত হওয়ায়, সংস্কৃতের চর্চ্চা হ্রাস হইল। তখন ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণগণ মূর্খ ও শাস্ত্রজ্ঞান-বিরহিত হইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ চিরদিনই দরিদ্র—সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ তখন ব্রাহ্মণেতর শূদ্র, বৈশ্য প্রভৃতি ধনী-দিগের ভাগ্যোপজীবী হইতে বাধ্য হইলেন। তাহাই তখন তাঁহারা সাধারণকে তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

"The Brahmins lost the patronage of enlightined Hindu kings, and became more dependant than ever for their living on the gifts of the lower castes, ... They had now to please the mob more than ever." *

তৎপূর্ব্ব হইতেই ধীরে ধীরে হিন্দুদিগের শাস্ত্র-সমূহ অত্যন্ত জটিল হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রাহ্মণগণ ক্রমশঃই শাস্ত্রালোচনার অমনো-যোগী হইয়া উঠিতেছিলেন। কেবল শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকর্ম্মবিধি-সমূহই তাঁহাদিগের শিক্ষণীয় বিষয় হইতেছিল। তখন হইতেই অনেক ব্রাহ্মণ কর্ম্মকাণ্ডজ্ঞানবিহীন ও অধার্ম্মিক হইয়া উঠিলেন। *

এখন আমরা প্রত্যহই দেখিতেছি যে, এমন সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা মুখে একরকম, মনে অন্যবিধ। গোপনে তাঁহারা যদৃচ্ছা ব্যবহার করিয়া থাকেন—কেহ তাহা দেখে না, দেখিলেও কিছু বলে না, বা বলিতে সাহস পায় না। অথচ বাহিরে তাঁহারাই আবার সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহেন। কতক-গুলি সামাজিক রীতি নীতি পালন করিলেই যে, ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব অটুট রহিয়া গেল, তাহা নহে।

---

*"Hindu civilisation under British rule."

*"The influence which had produced the sublime and the grand in Hindu works vanished; the influnce which had produced the base and the rediculous in them, gradually increased, the number and influence of the wise and learned few gradually vanished, while the number and influence of the credulous and igrorant many remained, and increased, and throve. Increasing ignorance brought with it increasing superstition and all its concomitant evils."

Hindu civilisation under British Rule.

এখন এমনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শূদ্র, কায়স্থ, বৈশ্য বন্ধুদিগের সহিত আপন গৃহে বসিয়া, অনেক ব্রাহ্মণ এক পংক্তিতে (কোন কোন স্থলে একই পাত্রে!) আহার করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। রেলপথে গাড়ীতে খাবার কিনিয়া খাইতে, অনেককেই দেখা গিয়াছে। অধুনা যেন বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত জাতিগত পার্থক্য ভুলিয়া মিলিয়া মিশিয়া এক হইবার একটা ইচ্ছা কোন কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সে ইচ্ছা বাহিরে প্রকাশিত হয় না। সমাজ তাহা জানে—কিন্তু জানিয়াও কিছু বলিতে পারে না। আজকাল এমনই হইয়া পড়িয়াছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত তুমি সামাজিক রীতি নীতি মানিয়া চলিবে, ততক্ষণ তুমি গোপনে যাহাই করনা কেন, তাহাতে তোমার কিছু হইবে না। রায় বাহাদুর লালা বৈজনাথও ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন:—

"As it now stands, you can defy caste by eating, drinking, worshipping or occupying yourself in any manner you choose, so long as you outwardly observe your caste-rules. A Brahman, a Kshatriya or a Vaisya may take the most prohibited food or associate with women outside his caste without being outcasted, if he only outwardly observes his caste rules." *

প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জন্য, যে সকল স্বতন্ত্র অনুশাসন: বা বিধি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, কয়জন তাহা মানিয়া চলিতেছেন? কালধর্ম্মানুসারে এখন কয়জনই বা সে সমস্ত বিধি নিয়ম বজায় রাখিয়া চলিতে পারেন? তাহাই আমরা এইরূপে ধীরে ধীরে কপটাচারী বা hypocrites হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু এই 'মনে এক মুখে অন্যভাব' সমাজের পক্ষে বড় অহিতকর। সত্য, চিরদিনই মঙ্গলময়—সত্যের বন্ধনই শ্রেষ্ঠবন্ধন, কারণ ধর্ম্ম ও সত্য সম্বন্ধবদ্ধ। যেখানে সত্যের অভাব, সেখানে ধর্ম্মেরও অভাব। কিন্তু আমরা জানিয়া শুনিয়াও, সেই সত্যের অপলাপ করিতে বাধ্য হইতেছি। অথচ বাহিরে কেহ তাহা বলিতে পারিবে না। যেখানে আমি ইচ্ছা করিয়া সত্যাপলাপ করিতেছি, সেখানেও অন্যের কিছু বলিবার অধিকার নাই, কারণ বাহ্যিক নিয়মরক্ষার ত্রুটি আমার হইতেছে না। এখন অনেক সময় এমনও হয় যে, একটা অন্যায় বা শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্য করিবার পূর্ব্বে আমরা মনে করি 'না হয় প্রায়শ্চিত্ত করিব'। প্রায়শ্চিত্ত করিলেই যে সমস্ত শেষ হইল, এ ধারণাটাই আদৌ ভাল নহে। এইরূপ ধারণা হইতেই অনুমান করা যায় যে, শাস্ত্রোক্ত বিধিনিয়মের উপর আমাদিগের আস্থা অধুনা অনেক কমিয়া আসিয়াছে। তবে লোকাচারের ভয়ে, সমাজের ভয়ে, আমরা প্রকাশ্যে সে কথা কহিতে পারিতেছি না। তবে, আমি যাহা করিতেছি, তাহাও তুমি জানিতেছ, আর তুমি যাহা করিতেছ, তাহাও যে গোপন থাকিতেছে এমত নহে। আমরা জানিয়া শুনিয়াও নির্ব্বাক হইয়া রহিয়াছি। তুমিও

* "Fusion of Sub-castes in India."

প্রতিবাদের আবশ্যক দেখনা—আমিও সংবাদের আবশ্যক দেখিনা। কিন্তু এরূপ স্থলে এ 'মুখে এক মনে অন্যভাব' রাখিয়া সমাজকে কলঙ্কিত করা, এবং নিজের হৃদয়কে ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও পাপাচরণক্ষম করিবার প্রয়োজন কি?

অনারেবল এন্, জি, চন্দভরাকর মহোদয় বড় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—

"I have heard many say—'I shall violate a caste rule and then take 'prayaschitta.' I do not think that those of us who are sincerely anxious for the welfare and progress of Hindu society—who think that morality is a greater cementing bond of society than anything else—ought to be parties to a theory which teaches men that they have a license to sin freely, for every time they sin they can do penance and pass for sinless men. And a prayaschitta has already become licentions, so to say, for many a sin and many a flagrant departure from the path of virtue."

যখনই ভারতবর্ষে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তখনই আমরা দেখিয়াছি যে, বর্ত্তমান জাতিভেদের কঠিন শাসনে নিষ্পেষিত হইয়া, উৎপীড়িত মানুষ দলবদ্ধ হইয়া, জাতিভেদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছে। সকল বিষয়েরই সীমা আছে। সেই সীমা অতিক্রম করিলেই আমরা জ্ঞানশূন্য হইয়া যাই। রায় বাহাদুর লালাবৈজনাথ বলিতেছেন:—

"All non conformistic movements in India from Buddhism downwards, and all success of foreign proselytizing missions whether undertaken by the sword or by persuaion are mostly traceable to the rigidity of the fetters with which caste binds the Hindus." *

"অনেক সময় উদ্দেশ্য সাধু হইয়াও, দেশ কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া, অনুপযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করায়, আশা ফলবতী হয় না। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। অদ্য যেটি অত্যাবশ্যক বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, কালক্রমে তাহা অনাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইবে। অদ্য যে প্রণালীটী প্রকৃষ্ট বলিয়া জ্ঞান হইতেছে, দেশভেদে বা কালভেদে তাহা অপকৃষ্টমধ্যে গণ্য হইতে পারে। অদ্য যেটি অভ্রান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, জ্ঞানের পরিবৃদ্ধির সহিত তাহা প্রমাদপূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। মনুষ্যসমাজের ব্যক্তিগত জ্ঞান সীমাবদ্ধ হইলেও, মনুষ্যসমাজের জ্ঞান অসীম। পূর্ব্বে যাহা অপরিজ্ঞাত ছিল, এইক্ষণ তাঁহার মধ্যে, অনেকবিষয় সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের জ্ঞানের সীমাও যে ভবিষ্যতে পরিবর্দ্ধিত হইবে, তাহাতেও

* 'The 4th Anniversary Meeting of the Madras Hindu Social Reform Association—1896.—The presidential address by Hon'ble N. G. chandavarkar.

* "Fusion of Sub castes in India."

কিঞ্চিন্মাত্র সন্দেহ নাই। ... সুতরাং প্রাচীনশাস্ত্রাদিতে যদি এমন কোন বিধি থাকে, যাহা বর্ত্তমান কালে অহিতকর বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, তাহা দৃঢ় করিয়া ধরিয়া রাখিলে, বুদ্ধিমানের কার্য্য করা হয় না, এবং তাহাতে সমাজের অশেষ অমঙ্গল সংঘটিত হয়। ... ... প্রাচীনশাস্ত্রে যাহা আছে, তাহা সব ভুল বা সব ঠিক, এই উভয় বিশ্বাসই দূষণীয়। প্রাচীনশাস্ত্র, আধুনিকশাস্ত্র উভয় নিরপেক্ষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া, উভয়ের মধ্যে যুক্তিযুক্ত হিতকর বিধি গুলি গ্রহণ কর, এবং উভয়ের মধ্যে তদ্বিপরীত বিধি গুলি পরিত্যাগ কর, তাহা হইলেই সমাজের মঙ্গল, তাহা হইলেই উন্নতিস্রোত অনন্তকাল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইবে, তাহা হইলেই মনুষ্যসমাজ কালে দেবসমাজে পরিণত হইবে। ... ... প্রাচীনশাস্ত্র যদিচ কোন স্থানে ভ্রমপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, শাস্ত্র স্বয়ংই বলিয়া দিতেছেন যে, তাহা মান্য করা উচিত নহে। দেবগুরু বৃহস্পতি বলিয়াছেন যে—

"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যোঽর্থনির্ণয়ঃ
যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥"

শাস্ত্রকারেরা ইহাও বলিতেছেন যে- -

"অস্বর্গ্যং লোকবিদ্বিষ্টং ধর্ম্মমপ্যাচরেন্নতু।'

অধিক কথা কি, শাস্ত্র ইহাও বলিতেছেন যে—

'সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবত্তবেৎ।'

সাধুদিগের নিয়ম বেদের সমান, যুক্তিবিরুদ্ধ শাস্ত্র দ্বারা অর্থ নির্ণয় করিলে, ধর্ম্মহানি হয়, ইহা অপেক্ষা শাস্ত্রে যুক্তির শ্রেষ্ঠত্ববাচক কথা আর কি হইতে পারে?" *

হিন্দু-পত্রিকা হইতে যে সারবান্ কথাগুলি উদ্ধৃত হইল, তাহা স্থিরচিত্তে বিবেচনা করা বিধেয়। সামজিক বল, রাজনৈতিক বল, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বল, সকল বিষয় সম্বন্ধেই ঐ কথা খাটে।

বর্ত্তমানজাতিভেদ প্রথার আলোচনা করিতে বসিয়াও, সময়ের পরিবর্ত্তনানুসারে সামাজিক পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা অবশ্য বিবেচ্য।

জাতিভেদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রার কথা স্বতঃই মনে আসিয়া উদয় হয়। কিন্তু আমরা তদ্বিষয়ের কোন বিচারে প্রবৃত্ত হইব না, কারণ তাহা বর্ত্তমানপ্রবন্ধের ঠিক অন্তর্গত বলিয়া মনে করি না। তবে এই কথা বলিব যে, যে জাতি কালের সাজে আপনাকে গড়িতে পারে, তাহারই উন্নতি হয়।

সমুদ্রযাত্রা হিন্দুশাস্ত্র সম্মত হউক বা না হউক, সে আলোচনা আমরা করিতেছিনা। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, দেশের অর্থ সঞ্চয়ের জন্য এখন তাহা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। অর্থই শক্তি। আমরা আরও দেখিতেছি, শিল্পের উন্নতি, বিজ্ঞানের উন্নতি প্রভৃতির জন্যও, আজ কাল পাশ্চাত্যজগতদর্শন আবশ্যক হইয়াছে। শিল্প বা বিজ্ঞানের উন্নতিতেই অর্থ সঞ্চয় হয়। "কিন্তু বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক-জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই।" আনন্দমঠের সেই মহাপুরুষ "চিকিৎসক"

* হিন্দু-পত্রিকা ১৩০১

"সত্যানন্দ"কে বুঝাইতেছেন :—"তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম......প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক, কর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্ব্বিষয়ক ও অন্তর্ব্বিষয়ক। অন্তর্ব্বিষয়ক যে জ্ঞান, সে-ই সনাতন ধর্ম্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে, অন্তর্ব্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াগিয়াছে, কাজেই প্রকৃত সনাতনধর্ম্মও লোপ পাইয়াছে। সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিতে গেলে, আগে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানের প্রচার করা আবশ্যক। এখন এদেশে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু।"* ইংরাজ আমাদিগের রাজা হইয়াছেন। তাঁহাদিগের সংসর্গে আসিয়া আমরা পূর্ব্বের তুলনায় এখন অনেকাংশে বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞান লাভ করিয়াছি সত্য, কিন্তু আরও আবশ্যক। ইংরাজের দেশে যাইতে না পারিলে সে শিক্ষা কিরূপে হইবে? আমরা আরও দেখিতেছি যে, রাজনৈতিক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবার জন্যও সমুদ্রযাত্রা আবশ্যক—জাতীয় মহাসমিতির সাধু উদ্দেশ্য সফলীকৃত করিয়া, দেশের উপকারের জন্যও পাশ্চাত্যজগতে গমন অধুনা অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, এসকল বিষয়ের বহু আলোচনা পূর্ব্বে হইয়াগিয়াছে, এখনও সময়ে সময়ে হইয়া থাকে। জাপানের দিকে চাহিয়া দেখ, তাহারা পূর্ব্বেই বা কি ছিল, আর এখনও বা কি হইয়াছে! আবার এই সঙ্গে সেই সকল প্রাচীন বিধি নিয়মের লৌহ প্রাচীরে আবদ্ধ চীনের দিকে চাহিয়া দেখ। দেখিবে উভয়ে অনেক পার্থক্য।

তবে আমাদের দেশে, জাতিভেদের কঠিন নিয়মনিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়াও কি অনেকে সমুদ্র পারে যাইতেছেন না? যাইতেছেন, কিন্তু সংখ্যায় কত অল্প! যাঁহারা যাইতেছেন, আমরা তাঁহাদিগকে চিরদিনের মত ছাড়াইতেছি। অথচ তাঁহাদিগেরই প্রতিভাবলে, সম্মানবলে, কার্য্যকুশলতার বলে, আমরা কত উপকারই না পাইতেছি। একটা কোন রাজনৈতিক গোলযোগে পড়িলেই, তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আমরা তাহার প্রতিকার করিতে বলিতেছি। অথচ অন্তরে ইচ্ছা থাকিলেও, বলিতে পারিতেছি না যে, তাঁহারা আমাদিগের আপন। তাঁহাদিগেরই অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ফলে, এদেশে পুরাতত্ত্বের আলোচনা আরম্ভ হইয়াছে। ভারতবর্ষ পূর্ব্বে তাহা জানিত কি না, বলিতে পারি না। এক যদি ম্লেচ্ছের খাদ্যাদি আহার করাই একমাত্র প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলে অবশ্য চেষ্টা করিলে সে প্রতিবন্ধক দূর হইতে পারে। কিন্তু তদগ্রে 'জাতি যাইবার ভয়' দূর করা কি আবশ্যক নহে?

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ,

*"আনন্দ মঠ"—স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

কর্ম্ম ও চিত্রগুপ্ত।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত।)

মহাত্মা 'কর্ণেল অল্‌কট্' বলেন যে –

"It would be sheer folly, in this view of the case, to expect that the casual psychometrical experimenter could acquire a title of the psychical insight of tne Indian Yogi; and though 'The soul of things' is full of most interesting accounts of the recall from the astral light of latent pictures of past races, past languages, forms, species, scenes &c. and one is, as it were crushed by the thought that nothing is lost, while every thing that passes behind a screen, yet one sees how infinitely more could be known by yogi who had fully attained the development of yoga—But all can not be yogis at this stage of cosmic evolution; and it is enough that by the help of Buchanan and Riechenbach we can get at least a glimpse into the galleries of the astral light where Time stores up his unfading pictures." (Vide Psychometry and thought transference.)

অর্থাৎ—আধুনিক অন্তর্দ্রষ্টা তাত্ত্বিকগণ, সময়ে সময়ে আকাশপটে যে সকল আলেখ্য পরিদর্শন করেন, তদ্দ্বারা আর্য্য যোগীগণের অন্তর্দৃষ্টির কনত্বা অবধারণ করা সম্পূর্ণ হঠকারিতা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? অনন্ত কাল হইতে যে সকল ভাষা, জাতি, রূপ, গুণ ইত্যাদি এই আকাশপটে অঙ্কিত হইয়াছে, তত্তাবতের আলেখ্য দর্শনের উপায় "The soul of things" নামক গ্রন্থে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে বটে—কিন্তু সেই উপায় দ্বারা আকাশপট যতই পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহাতে বোধ হয়, যেন এই পার্থিব কোন বস্তুই নষ্ট হয় নাই, সকলই একটা আবরণের অন্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে। যে সকল যোগী সম্পূর্ণ যোগবল লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা না জানি কতই অদ্ভুত ও অলৌকিক বস্তু দর্শন করিতে পারেন। কিন্তু কলিযুগের বর্ত্তমান অবস্থায়, সেইরূপ যোগবল লাভ করা আশাতীত। সুতরাং বচানন্ (Bachanan) এবং রিচেন্‌বাক (Ruchenbach) মহোদয়গণের সাহায্যে, আকাশের বিভিন্ন স্তরস্থ চিত্রসম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারি, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

"But beyond registering images we are told that the astral fluid registers every thought of man, so that it forms, as it were, the book of nature, the soul of the cosmos, the universal mind, a history of the world and all its sciences and schools of thought, from the day when the Parabrahmic breath went forth and the eternal logos awoke into activity * * * (Vide Psychometry and thought transference Page 5)

"কিন্তু শুধু মূর্ত্তি কেন —আমরা শুনিতে পাই যে, মানবের চিন্তাবল ও এই আকাশপটে

অঙ্কিত হয়। এই আকাশ যেন একখানি বিশ্বগ্রন্থ, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরাত্মা ও জগতের মহাপ্রাণ। যে দিন সেই পরব্রহ্মের "একোঽহং বহুস্যাম্" শব্দ উচ্চারিত হয়—যে দিন সেই ভগবান হিরণ্যগর্ভ ঘোর তমসাচ্ছন্ন অব্যক্ত প্রকৃতির অন্ধকার নাশ করিয়া, জগতের অঙ্কুর স্বরূপে আবির্ভূত হন, সেই দিন হইতেই এই মহাকাশ এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান মূলক ইতিহাস রূপে পরিণত হইয়াছে।*

"থিয়সফী" গ্রন্থে আকাশস্থ আলেখ্যের নানা বিবরণ ও উপাখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। মিসেস্ ডেলটন্ (Mrs. Dalton) এই আকশপটে যে সকল ব্যাপার দর্শন করেন, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত "The soul of things" নামক গ্রন্থে সবিশেষে বর্ণিত হইয়াছে।*

আকাশ মণ্ডলে নানারূপ মূর্ত্তি ও জীবের প্রতিমূর্ত্তি তিনি দেখিতে পান। এমন কি, জীবের স্পৃহা ও উদ্যম এবং তৎপ্রসূত ফলের বিচিত্রতা ও তিনি পরিদর্শন করেন। প্রথমতঃ তৎসমুদায় মায়ারূপিনী মরীচিকার

* "This is no new idea—We find traces of it in the earliest times of which there is any written record—It would appear that the Egyptians placed the eternal idea pervading the universe in the Ether, or the will going forth and becoming force and matter. In our own time this same idea about the ether has been revised by the authors of the 'unseen universe' who say that from ether have come all things and to it all return, that the images of all things are indelibly impressed upon it, and that it is the store-house of the germs or of the remains of all visible forms and even ideas (Vide Psychometry and thought transference.)

* "I see forms—people, and the results of these labors; even the very efforts that produced the results. At first I thought it was a species of mirage. It seemed like a picture of all that had ever been; yet now it seems to me that I could step from this planet upon that world (I can call it nothing else), and travel back through all the scenes that have ever transpired in this.

"Something appears to me to be passing continually from our earth, and form all existences on its surface, only to take on there the self-some forms as that from which it emanated here; as if every moment as it passed had borne with it in eternal fixedness, not the record merely of our thoughts and deeds, but the actual imperishable being, quick with pulsing life, thinking the thought and performing the deed, instead of passing away into our nothingness; that which is here and now for ever continuing, an eternized there and then." ("Soul of things" Dalton Vol III Page 345-6).

তাঁর ভ্রম হইয়াছিল বটে—কিন্তু পরে তাহাদের অস্তিত্বে কোন রূপ সন্দেহ করিতে পারেন নাই। তথায় পরমাণুর নিয়তসঞ্চালন ও নানবিধ রূপ সংগঠন ও পরিবর্ত্তন অবলোকন করেন; এবং পরমাণুর ক্রমায়য়িক পশ্চাদভিমুখী অনন্তবিস্তৃতিও তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হয়। জড়-জগতে যে সকল পদার্থ দৃষ্টিগোচর হয়, সূক্ষ্মজগতেও তদনুরূপ পদার্থ ও ঘটনা, তিনি অবলোকন করেন। এই আকাশমণ্ডলে আরও কত অদ্ভুত ও অভিনব ব্যাপার তিনি দর্শন করেন, ভাষার অভাবে তাহা তিনি প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কারণ জগতের মনের ভাব বিজ্ঞাপন জন্য যে সকল স্ফুটাত্মকবর্ণ বা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা এই জড় জগতের ব্যাপারই প্রকাশ করিতে পারে; তদ্দ্বারা সূক্ষ্মজগতের সূক্ষ্মব্যাপার বর্ণন করা দুঃসাধ্য।

অপিচ আকাশস্থ পরমাণু অত্যন্ত গতিশীল। সংযোগ ও বিয়োগ—সামীপ্য ও বীপ্সা, তাহাদের নিত্য ও নৈমিত্তিক ব্যাপার। সুতরাং কোন পদার্থের প্রতিবিম্ব বা অপর কোন রূপ আলেখ্য পরিদর্শন, অনেক বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ সূক্ষ্মদ্রষ্টারও (Clairvoyont) পক্ষে আয়াসসাধ্য ও দুরূহ হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ সংখ্যা পাঠেই অনেক সময়ে অধিকতর ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়া থাকে।*

মহাত্মা লেড্‌বিটার (C. W. Leadbeater) তাঁহার astral place নামক গ্রন্থে, এই আকাশ-আলেখ্য সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, পার্থিব প্রত্যেক পদার্থের প্রতিকৃতি ফটোগ্রাফের ন্যায় এই আকাশ পটে প্রতিবিম্বিত হয়। এই সকল আলেখ্যকে সাধারণতঃ (records of astral light) আকাশ-লিপিকা কহে। তিনি বলেন However complicated and unusual a man's Karma may be, the Lipika are able to give a mould in accordance with which a body exactly suiting it can be formed অর্থাৎ মানবের কর্ম্ম যতই বিচিত্র ও রহস্যপূর্ণ হউক না কেন, এই লিপিকা অনুযায়ীই তাহার দেহ রচিত হইবে।

ফটোগ্রাফ্ যন্ত্রের সমীপে যে বস্তু পতিত হয়, তাহারই প্রতিরূপ যেরূপ প্রতিফলিত হয়—ফণোগ্রাফ যন্ত্র সমীপে যে শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহাই যেরূপ যন্ত্রস্থ হয়, তদনুরূপ এই অন্তর আকাশ পটে প্রত্যেক পদার্থের ও শব্দের প্রতিরূপ অঙ্কিত হইয়া থাকে, ইহাই চিন্তাশীল তত্ত্ববাদীগণের মত।

ফটোগ্রাফ্ যন্ত্রে পদার্থের প্রতিবিম্ব পতন, অথবা ফণোগ্রাফ যন্ত্রে শব্দমুদ্রণ, তত্তৎপদার্থের পরস্পরযোগাকর্ষণ ভিন্ন কি হইতে পারে?

ফটোগ্রাফ্ যন্ত্রস্থ কাচফলকে (dry

*মহাত্মা "লেডবিটার" বলেন :—"A good example of the sort of mistake that is likely to occur is the frequent reversal of any number which the seer has to read from the astral light so that he would be liable to seender say 139 as 931 and so on (Vide Astral Plane by C. W. Lendbeates.)

plate') এমন এক প্রকার পদার্থ—(Silver Haloin flims) সংলগ্ন থাকে, যে তাহার সহিত আদর্শ-পদার্থের বাহ্যরূপের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরামাণুর, অথবা ফণোগ্রাফ এমন এক প্রকার কৌশলে উদ্ভাবিত যে, তদন্তর্গত নরের স্নেহময় কোমল পদার্থের পরমাণুর সহিত শব্দের তাললয়মানময় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণুর যোগাকর্ষণ সংঘটনে, পদার্থ প্রতিবিম্বিত বা শব্দ মুদ্রিত হইয়া থাকে।

ফ্যারাডে (Faraday) সাহেব বলেন যে "আমাকে যদি চৌম্বকাকর্ষণ সম্বন্ধে কেহ জিজ্ঞাসা করেন, তাহার উত্তরে আমি এই বলিতে পারি যে, চুম্বকের আকর্ষণ শক্তির বিকাশ সম্বন্ধে চুম্বকের আভ্যন্তরীণ শক্তি ব্যতীত বহির্জগতে এমন এক প্রকার পদার্থ আছে যে, তাহার আকর্ষণ ও বিক্ষেপণে এই শক্তি অভিব্যক্ত হয়। এই আকর্ষণ ও বিক্ষেপণ ঈশ্বরেরই কার্য্য।"

অনেকেই জানেন, ফটোগ্রাফ যন্ত্রস্থ কাচফলকে (Sensitive plate) যখন আদর্শপদার্থের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তখন তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহার পর রাসায়নিক ক্রিয়া (Chemicals) সহকারে ঐ প্রতিবিম্ব প্রত্যক্ষীভূত হয়। এই অবস্থার মূর্ত্তিগুলিকে "নিগেটিভ্" (negative) বলে। ইহা দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় বিপরীত ভাবে প্রতিফলিত হয়। তাহার পর এক প্রকার কাগজ (Gehatino chloride paper) দ্বারা তাহা মুদ্রিত (printed) হইলে, আদর্শ পদার্থের অনুরূপ হয়।

আকাশপটে যে সকল প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহাও সাধারণের দৃষ্টিগোচর হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। অনেক সাধনা ও কৌশল সহকারে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা নূতন ব্রতী, তাঁহাদের পক্ষে কোন অভীষ্টবিষয়দর্শন বড়ই আয়াস সাধ্য। এমন কি, যাঁহারা উন্নত অন্তর্দ্রষ্টা (trained claiavoyont) তাঁহারা যদি কোন অদৃষ্টচর পদার্থ বা ঘটনা আকাশ পটে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাহইলে সেই পদার্থ বা ঘটনা সম্বন্ধীয় অন্যান্য অনেক বিষয় তাঁহার জানা আবশ্যক। অন্যথা সেই অভীপ্সিত পদার্থ বা ঘটনা সহজে তিনি দেখিতে পাইবেন না।

মনে করুন, রাম জনৈক উন্নত অন্তর্দ্রষ্টা, তিনি বিগত দিল্লীর দরবার দেখেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা যে যে সিংহাসনে বড় লাট বাহাদুর দরবার গৃহে বসিয়াছিলেন, সেই সিংহাসন তিনি আকাশ পটে দেখেন। তিনি যদি বড় লাট বাহাদুরকে স্বচক্ষে দেখিয়া থাকেন, তবে সিংহাসন চিনিতে অধিক কষ্ট হইবে না। কিন্তু যদি তিনি বড় লাট বাহাদুরকে দেখিয়া না থাকেন, তবে দরবারগৃহ ও সিংহাসন সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ তাঁহার জানা আবশ্যক। অন্যথা কোথায় দরবার প্রাসাদ—কোথায় সমবেত রাজন্যবর্গ—কোথায় সিংহাসন আকাশপটে প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, তাহার অবধারণ করা সহজব্যাপার নহে। একটী জানা থাকিলে, তৎসম্পর্কীয় অপরটী জানিতে বড় অধিক কষ্ট পাইতে হয় না।

এইরূপ স্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যখন অনন্ত কাল হইতে এই আকাশ পটে

যাবতীয় পার্থিবঘটনা ও অসংখ্য নর নারীর কর্ম্মাবলী প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তখন তত্তৎ ঘটনাবলীর বিপর্য্যয় সংমিশ্রণ, অথবা একের কর্ম্ম অপরের কর্ম্ম-লিখনের সহিত সংমিলিত হইতে পারে, অথবা হয়তঃ কোন না কোন সময়ে স্থানাভাবও ঘটিতে পারে। কিন্তু এই আশঙ্কা অনাবশ্যক। জগদ্বিখ্যাত রসায়নবিৎ ড্যাল্‌টন সাহেব (Dalton) কহেন—"In a mixture of different gasses where there is equilibrium, each goes behaves as a vacunm to the rest."

অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বাষ্পের সংমিশ্রণে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, প্রত্যেক বাষ্প অপর বাষ্পগুলির পক্ষে শূন্যের ন্যায় কার্য্যকারী হয়। যদি কোন পাত্রে কিয়ৎ পরিমাণ বায়ু (মনে করুন অম্লযান ও যবক্ষারযান বা নাইট্রোজন) রাখা যায়, তাহাহইলে ঐ বায়ুতে অম্লযান না থাকিলে, যবক্ষারজান যেরূপ ভাবে অবস্থিত হইত, অম্লযান থাকাতেও উহা ঠিক সেইরূপ ভাবেই অবস্থান করিবে। এবং যবক্ষারজান না থাকিলে, অম্লযান যেরূপ ভাবে থাকিত, উহা থাকাতেও সেইরূপ অবস্থিতির কোন ব্যত্যয় ঘটিবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ দে।

ব্রজধাম।

(প্রথম প্রস্তাব)

কায়স্থকুলগৌরব ভক্তাধিক ভক্ত শ্রীমৎ লালাবাবু এ পবিত্র, প্রশস্ত ও প্রাচীন ধামকে স্মরণ করিয়া, একদিন অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিয়াছিলেন "যদি কখনও ব্রজধামে গমন করিয়া, মস্তকের কেশগুলিকে ব্রজ গোপিকার পদরজে বিমর্দ্দিত করিতে পারি, তাহাহইলে আমি আমার মানব জনমকে সার্থক জ্ঞান করিব"—এই সেই ব্রজধাম!! ভক্তের মনোবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইহাই সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক লীলাস্থল। ভক্তিরস-প্রধান ভাগবতে, ভুবনবিখ্যাত মহর্ষি ব্যাস-দেব, যে পুণ্যপূর্ণ শ্রীধাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছ"—অর্থাৎ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া এক পদও অগ্রসর হইও না। পাঠক মহাশয়! এই সেই প্রাচীন ও পবিত্র ব্রজধাম। কলকণ্ঠ কবি জয়দেবের কমনীয় কাব্যে, প্রেমাংকুর ভক্ত-বৈষ্ণবের শ্রীমুখে, যোগীর ধ্যানে, কীর্ত্তন-কারীর গানে, এবং আত্মিকজ্ঞানানুসন্ধায়ীর মনে, যে পুরাতন পুণ্যভূমির লীলামালা প্রতিভাত হয়, এই সেই পবিত্র ব্রজধাম! আসুন, আমরা ব্রজেশ্বর হরির নামোচ্চারণ করিয়া, "জয় হরি" "জয় হরি" রবে ব্রজধামে প্রবেশ করি। ঐ দেখুন, বকুল তলায় বসিয়া ব্রজবালকগণ, বাসন্তীয় মধুর স্বরে, দিগ্‌দিগন্ত বিমোহিত করিয়া গাইতেছে—

কালিন্দি কিনারে কালা মদনমোহন।
মধুর মধুর বংশী বাজে, এইত বৃন্দাবন!

পাঠক মহাশয়! আসুন, আমরা আর একবার "হরি হরি বোল" বলিয়া, ব্রজধামে প্রবেশ পূর্ব্বক, ব্রজধামান্তর্গত সুদৃশ্যগুলিকে নিরীক্ষণ করি। ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ এবং ব্রজরাণী রাধিকা সতী আমাদের সহায় হউন।

ব্রজধামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে প্রাচীনশাস্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখা যায়, এই জন্য ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বৃন্দাবনবাসী হইবার জন্য ব্রজধামে আগমন করে। কেবল বৃন্দাবন বা মথুরাই "ব্রজধাম" নহে; প্রায় অশীতিক্রোশ ব্যাপিনী ভূমি লইয়া সমগ্র ব্রজধাম। এই অশীতিক্রোশব্যাপিভূমিময় প্রদেশ শ্রীকৃষ্ণের লীলা স্থল, এই জন্য তিনি ব্রজেশ্বর, ব্রজপতি, ব্রজবল্লভ, ব্রজনাথ প্রভৃতি নামে পরিচিত। এই আশী ক্রোশের মধ্যে যাহারা বাস করে তাহারা সকলেই "ব্রজবাসী" বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু বৃন্দাবন, মথুরা, গোকুল, গোবর্দ্ধন নন্দগ্রাম প্রভৃতি কয়েকটি স্থান সমগ্র ব্রজধামের মধ্যে সমধিক মাহাত্ম্য-পূর্ণ। সমুদয় ব্রজধামের প্রশস্তসীমার অন্তর্দ্দেশে, পঞ্চদশটি স্থান বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার যোগ্য। মথুরা, বৃন্দাবন, গোকুল, মহাবন, মধুবন, রাবল, বর্ষাণ, জাবুৎ, গোবর্দ্ধন, নন্দগ্রাম, কাম্যবন, ফরেণ, বটেণ এবং জ্ঞানপুরী। এই পোনরটি স্থান তীর্থযাত্রীদিগের অবশ্যদর্শনীয়। ইহার মধ্যে বৃন্দাবন ও মথুরা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। মথুরা হইতে বৃন্দাবন তিন ক্রোশ মাত্র দূরবর্ত্তী। উভয় নগরই শ্যামসলিলা যমুনা নদীর তটদেশে অবস্থিত। মথুরা একটি বিস্তৃত জেলা; সমুদয় জেলার পরিমাণ ১৪৫৩ বর্গ মাইল। লোকের সংখ্যা প্রায় ৬৭১৬৯০ জন। নগরমথুরায় ৫৫০১৬ লোকের বসতি আছে; মিউনিসিপালিটির অধিকারের পরিমাণ প্রায় কুড়ি ক্রোশ। মথুরা নগরীর সীমা দ্বাদশ ক্রোশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, অন্যান্য স্থানের মিউনিসিপালিটির সহিত সম্মিলিত আছে। মথুরা নগরী আগ্রা হইতে প্রায় অষ্টাদশ ক্রোশ দূরবর্ত্তিনী; জেলার উত্তরে আলিগড়, দক্ষিণে আগরা, পূর্ব্বে মৈণপুরী এবং পশ্চিমে ভরতপুর রাজ্য।

খাস মথুরা নগরীর পূর্ব্বদিকে হংসগঞ্জ এবং পশ্চিমপ্রান্তে কোটাছরোরা নামক গ্রাম অবস্থিত। ইহার উত্তরে সতুয়া পল্লী এবং দক্ষিণে মধুবন দৃষ্ট হয়। মথুরার যমুনায় ঘাটের সংখ্যা অনল্প, কিন্তু যে সকল ঘাট সমধিক পরিচিত ও পবিত্র বলিয়া পরিগণ্য হইয়াছে, তাহাই আমি এস্থলে উল্লেখ করিলাম—স্বামীঘাট, কৃষ্ণঘাট, দশাশ্বমেধ ঘাট, বৈকুণ্ঠঘাট, ঘণ্টাকর্ণ, ধ্রুব, প্রয়াগ, ভূর্জ্জপিণ্ড, বাঙ্গালী, গৌ, বিশ্রাম, দুর্ব্বাসা, দময়ণ এবং দশারাম। সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, যতী ও পরমহংসগণ প্রায়ই স্বামীঘাটে স্নান করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবগণ কৃষ্ণঘাটে স্নান ক্রিয়া সমাধা করিতে ভাল বাসেন; ঘণ্টাকর্ণ ঘাটে স্নান করিলে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া, পাপীগণ বিগতকল্মষ হয়। ধ্রুবঘাটে বালক ও বালিকারা স্নান করে। ভূর্জ্জপিণ্ডঘাটে পিণ্ড দেওয়া হয়, এবং গোঘাটে গবাদিপশুর গাত্রমল পরিষ্কার করা হইয়া থাকে। বাঙ্গালী ঘাট বঙ্গবাসীদিগের অর্থে ও যত্নে নির্ম্মিত; দুর্ব্বাসাঘাটে স্নান করিলে স্নানকারী জিতেন্দ্রিয় হয়, বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন; বিশ্রামঘাটে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ স্নান করেন, এই ঘাট সমুদয় ঘাটের কেন্দ্র। কংস রাজাকে বধ করিয়া, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এই ঘাটে বিশ্রামসুখ উপভোগ

করিয়া ছিলেন। দশারাম ঘাট রাজা কংসের দশারাম না জনৈক রজকের অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ঘাটে ধোবারা মলিনবস্ত্রাদি পরিষ্কার করে।

মথুরার মন্দিরের মধ্যে এই গুলি সমধিক প্রসিদ্ধ—গোকর্ণনাথ, বটেশ্বরনাথ, পাতালদেবী, পিপলেশ্বর এবং বটুকনাথ, পুষ্করিণীসমূহ মধ্যে পাথরাকুণ্ড, পুত্রতলাও, শিবতাল, বলভদ্র, মহাবিদ্যা, দুর্ব্বাসা, সরস্বতী, বিদ্যাকুণ্ড, এবং ধর্ম্মকুণ্ড বিশেষ প্রসিদ্ধ। রঙ্গভূমি নামক স্থানে কংস রাজা ব্যায়াম করিতেন। সতীজি নামক স্থানে কংসের এক সহধর্ম্মিণীর সহমরণ হইয়াছিল; দুর্ব্বাসাশ্রমটি দুর্ব্বাসা মুনির আশ্রম বলিয়া প্রখ্যাত। মালপুরে, রাজা কংসের মল্ল-(বীর-) গণ বাস করিত; রাজা কংসের দুর্গের ভগ্নাবশেষ যমুনাতটে এখনও দৃষ্ট হয়। বাসুদেব যে স্থান হইতে শ্রীকৃষ্ণকে ক্রোড়ে লইয়া গোপনে পলায়ন করতঃ কংসের অত্যাচার হইতে শিশুকে রক্ষা করিয়া ছিলেন, তাহা বাসুদেবভূমি নামে খ্যাত।

মথুরায় মুসলমানের সংখ্যা কম, খৃষ্টানের সংখ্যাও অল্প। ১৮৫৭ অব্দে বিদ্রোহী সিপাহীরা মথুরার সমুদয় খৃষ্টানকে নিহত করিয়া ছিল। সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইতে দেশীয় খৃষ্টানের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছে। হিন্দুর সংখ্যা সর্ব্বত্র প্রবল, ব্রাহ্মণের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। নগরীমধ্যে শেঠ লক্ষ্মীচাঁদ, গোস্বামী রাধাকিশন, গোঁসাইমল্ বাঞ্ছারাম দাস এবং কেশব দেব বিশেষ সম্ভ্রান্ত, প্রভুত্বশালী ও ধনবান্। শেঠ লক্ষ্মীচাঁদের "যমুনাবাগ" নামক [illegible]হের উদ্যান যমুনা তটে অবস্থিত, ইহা [illegible]বার যোগ্য। প্রবাদ আছে, মধু নামক পুরুষ, এবং তাহার সধি নাম্নী সহধর্ম্মিণী কর্ত্তৃক, দ্বাপর যুগে 'মথুরা' নগরী নির্ম্মিত হইয়া ছিল। তাঁহারা এই নগরীর চারি দিকে সুদৃঢ় প্রস্তরের প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়াছিলেন। ঐ প্রাচীরসমূহের চারিটি দ্বার ছিল, ইহার মধ্যে একটি দ্বারের নাম "বৃন্দাবন দ্বার" (দরওয়াজা।) ঐ দ্বার এখনও বর্ত্তমান আছে, ইহা অতিক্রম করিয়া, মথুরা হইতে বৃন্দাবনাভিমুখে আসিতে হয়।

বৃন্দাবনধামের উত্তরে মাটগাঁ নামক গ্রাম এবং দক্ষিণে গরগাও নামক পল্লী অবস্থিত। পূর্ব্বদিকে রেলওয়েসেতু, এবং পশ্চিমে দিল্লীর পথ ও ছগনদ্বার। বৃন্দাবনধাম, মথুরা হইতে অধিকতর মাহাত্ম্যপূর্ণ, ইহাই কৃষ্ণের বিশেষ লীলাস্থল। বৃন্দাবনের যমুনার যে সকল ঘাট সমধিক প্রসিদ্ধ, তাহার নাম নিম্নে উল্লিখিত হইল। কেশীঘাট, কালীয় ঘাট, বাঙ্গালীঘাট, এবং চিরঘাট। কেশীঘাটে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কেশিনামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়াছিলেন, কালীয়ঘাটে কালীয়দমন হইয়া ছিল; চিরঘাটের কদম্বতরুর শাখায় শ্রীকৃষ্ণ উপবেশন করিয়া, গোপিকার বস্ত্র হরণ করিয়াছিলেন, এবং বাঙ্গালীঘাটটি বৃন্দাবনপ্রবাসী গৌড়ীয়বাসিদিগের অক্ষয়কীর্ত্তি স্বরূপ বর্ত্তমান। বৃন্দাবনের মন্দিরসমূহ মধ্যে নিম্নলিখিত মন্দির গুলি দেখিবার যোগ্য। গোপীনাথ, গোবিন্দ, মদনমোহন, গোপেশ্বর, শ্রীনগরবট, শ্যামসুন্দর, রাধাদামোদর, গোকুলানন্দ,

রঙ্গজী, কিষেণচাঁদ, সাজীজী, ভগবান এবং গোকুলনাথ। রঙ্গজীমন্দির, মথুরার প্রসিদ্ধ শেট্‌ লক্ষ্মীচাঁদের অর্থে নির্ম্মিত। কিশনচাঁদের মন্দির, বাঙ্গালীকুলশোভন ভক্তাধিকভক্ত লালাবাবুর অমর কীর্ত্তি, সাজীজি মন্দির লক্ষ্ণৌ-এর জনৈক সওদাগর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত, এবং "শ্রীভগবান মন্দির" জয়পুরের মহাত্মার গুরু ব্রহ্মচারী গিরিধরদাসের নির্ম্মিত। বৃন্দাবনের অনেক স্থান "বন" নামে খ্যাত। যমুনাপারে এইরূপ দ্বাদশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন আছে, সে গুলিকে দর্শন করিবার জন্য যাত্রীরা যমুনার অপর পারে গমন করিয়া থাকে। খাস বৃন্দাবন মধ্যে সাতটি বন দেখিবার যোগ্য ; তদ্যথা—ললিত, নিধু, তমাল, ভাণ্ডির, কোকিল, লৌহ এবং তালবন। কুণ্ডসমূহের মধ্যে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, ললিতকুণ্ড এবং ব্রহ্মকুণ্ড বিশেষ রূপে পরিচিত।

ব্রজধামের মধ্যে অনেক স্থান দেখিবার আছে, কতকগুলি স্থান বৃন্দাবন হইতে দূরবর্ত্তী। প্রায় ষোল ক্রোশ দূরে ফরেণ ও কোটবন নামক স্থান শ্রীকৃষ্ণের "হোলি" ক্রীড়ার জন্য প্রসিদ্ধ। পঞ্চদশ ক্রোশদূরবর্ত্তী কাম্যবন নামক স্থান, রাধিকার পূর্ব্বানুরাগ ও অভিসারের লীলা স্থল। সার্দ্ধ দুই ক্রোশ দূরে রাবল নামক স্থানে রাধিকার বাল্যাবস্থা অতিবাহিত হইয়া ছিল। সতের ক্রোশ দূরবর্ত্তী বর্ষাণ গ্রামে রাধিকার জন্মভূমি। উনিশ ক্রোশ দূরে জাবট্‌ নামক গ্রামে আয়ানঘোষের সঙ্গে রাধিকার বিবাহ বন্ধন হইয়া ছিল। সপ্ত ক্রোশান্তরে প্রসিদ্ধ গোবর্দ্ধন গিরি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রাখালবালকদিগের রক্ষার জন্য ইহাকে অঙ্গুলির উপরে উত্থিত করিয়া ছিলেন। মথুরা হইতে দুই ক্রোশ দূরে মধুবন। সার্দ্ধ দুই ক্রোশ অন্তরে মহাবন, এই স্থানে পূতনার প্রাণ নাশ হয় ; গোকুল বন নামক স্থানে, ৮৪টি স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। দুই ক্রোশ অন্তরে নন্দগ্রাম নন্দঘোষের জন্ম হইয়া ছিল। সার্দ্ধ ছয় ক্রোশ দূরে জ্ঞানপুরী গ্রাম, এখানে কতকগুলি বৃহদাকার পুষ্করিণী আছে। এই গ্রামে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কয়েক বৎসর বাস করিয়া, শিষ্যবর্গকে জ্ঞানোপদেশ দিয়া ছিলেন। বৃন্দাবনের অতি অল্পদূরে, বিষ্ণুগ্রাম নামক পল্লীর পার্শ্বস্থ অরণ্যে, 'বৃন্দা' নামে এক সন্ন্যাসিনী বাস করিতেন, তিনি একজন প্রধানা পণ্ডিতা ছিলেন, এই স্থানে তিনি তপস্যা করিতেন, কালক্রমে তাঁহার নামানুসারে ব্রজধামের এই অংশের নাম "বৃন্দাবন" হইয়াছে। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের লীলার সময়ে বিদুষী ও যোগিনী বৃন্দা, ব্রজধামে "দূতী" হইয়া পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

গৃহস্থের সদাচার।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

(বিষ্ণুপুরাণ)

দেবামনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি, সিদ্ধাঃ
সগন্ধোরগ দৈত্যসংঘাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তাঃ
যেচান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তং।৪৮

পিপীলিকাকীটপতঙ্গকাদ্যাঃ
বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধবদ্ধাঃ।
প্রযান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং
তেভ্যোবিসৃষ্টং সুখিনোভবন্তু।৪৯।
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধু
র্নৈবান্নসিদ্ধিঃ ন তথান্নমস্তি।
তৎতৃপ্তয়েহন্নংভুবিদত্তমেতৎ
প্রযান্তু তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু।৫০
ভূতানি সর্ব্বানি তথান্নমেতৎ
অহঞ্চ বিষ্ণুর্ণততোঽন্যদস্তি।
তস্মাদহং ভূতনিকায়ভূতং অন্নং
প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাং।৫১
চতুর্দশো ভূতগণো যএষঃ
তত্রস্থিতা যেঽবনিভূতসঙ্ঘাঃ।
তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়া বিসৃষ্টং
তেষামিদংতে মুদিতা ভবন্তু।৫২
ইত্যুচার্য্য নরো দদ্যাৎ অন্নং
শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
ভুবি ভূতোপকারায় গৃহী সর্ব্বা-
শ্রয়ো যতঃ।৫৩

বঙ্গার্থ দেবতা, মনুষ্য, পশুগণ, পক্ষিগণ, সিদ্ধ, যক্ষগণ, সর্প ও দৈত্যসকল, প্রেত, পিশাচ, তরুগণ, এবং অপর যাহারা মৎপ্রদত্ত অন্ন আকাঙ্ক্ষা করে, তাহারা, কীট, পতঙ্গ পিপীলিকা প্রভৃতি যাহারা কর্ম্মনিবদ্ধ হইয়া ক্ষুধিত, তাহারা তৃপ্তিপ্রাপ্ত হউক। আমি তাহাদিগকে যে অন্ন দিতেছি, তাহা গ্রহণ করিয়া সুখী হউক। যাহাদের মাতা, পিতা বন্ধু বান্ধব নাই, যাহাদের অন্নপাকসাধন নাই এবং যাহাদের অন্ন নাই, তাহাদের জন্য এই ভূমিতে অন্ন প্রদত্ত হইল, তাহারা তৃপ্ত হউক, আনন্দিত হউক্। সমস্তজীব, এবং এই অন্ন ও আমি, সকলই বিষ্ণু। যেহেতু বিষ্ণুব্যতীত আর কিছু নাই, সে হেতু আমি ভূতশরীরভূত অন্ন তাহাদিগের মঙ্গলের জন্য অর্পণ করিতেছি। অষ্টবিধ দৈব, পঞ্চবিধ তির্য্যগ্-যোনি এবং মানুষ একবিধ, এই চতুর্দ্দশ প্রকার ভূতগণ, ও ইহাদের মধ্যে যে অসংখ্য অসংখ্য প্রাণী রহিয়াছে, তাহাদের তৃপ্তির জন্য আমি এই অন্ন প্রদান করিতেছি, তাহারা গ্রহণপূর্ব্বক আনন্দ লাভ করুক্।” এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রাণির উপকারার্থে ভূমিতলে অন্ন প্রদান করিবেন; কেন না, গৃহস্থ সকলের আশ্রয়। "দেবাঃ সমস্তাঃ” হইতে আরম্ভ করিয়া, শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া একবারই অন্ন দিতে হইবে; বারবার নহে। ইহা শ্রীধর স্বামী বলেন।

শ্বচণ্ডালবিহঙ্গানাং ভুবি দদ্যাৎ
ততোনরঃ।
যেচান্যে পতিতাঃ কেচিৎ অপাত্রা
ভুবিমানবাঃ।৫৪

বঙ্গার্থ। কুক্কুর, চণ্ডাল ও পক্ষিগণের জন্য তদন্তে ভূমিতে অন্ন প্রদান করিবে, যে সমস্ত মানব পতিত, অথবা যাহাদের শ্রাদ্ধ সম্ভাবনা নাই, তাহাদেরও জন্য এই সময়ে অন্ন প্রদান করিবে।

ততোগোদোহমাত্রং হি কালং
তিষ্ঠেদ্ গৃহাঙ্গণে।

অতিথিগ্রহণার্থায় তদূর্দ্ধং বা যথেচ্ছয়া ।।২৫

বঙ্গার্থ। অন্ন প্রদানের পর গোদোহন কাল পর্য্যন্ত (গোদোহন করিতে যতক্ষণ লাগে, অনুমানিক ততক্ষণ) গৃহাঙ্গণে অতিথির অপেক্ষায় রহিবে। ইচ্ছা হইলে তাহার পর আরও অধিককাল অতিথির জন্য অপেক্ষা করা যাইতে পারে। অতিথি-কর্ম্মাদি বারান্তরে আলোচিত হইবে। এবার স্নানতর্পণ দেবযজ্ঞ ভূতযজ্ঞাদি বর্ণিত হইল।

(ক্রমশঃ)

দীন শ্রীভারতী—
যশোহর।

অরহন্তবগ্‌গো সত্তমো।

গতদ্ধিনো বিসোকস্‌স বিপ্পমুত্তস্‌স সব্বধি।
সব্বগন্থপহীণস্‌স পরিলাহো ন বিজ্জতি ॥১

অনুবাদ—যাঁহার পথ চলা শেষ হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়াছেন, যিনি বিগতশোক হইয়াছেন, যিনি সর্ব্বপ্রকারে মুক্ত হইয়াছেন, এবং যাঁহার সকল গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, তাঁহার কোন দুঃখ নাই।

উয্যুঞ্জন্তি সতীমন্তো ন নিকেতে রমন্তি তে।
হংস'ব পল্ললং হিত্বা ওকমোকং জহন্তি তে ॥২

অনুবাদ—যাঁহারা একাগ্রমনে ধর্ম্মাভ্যাসে নিরত রহেন, গৃহেতে সুখ পান না; হংসগণ যেমন পুষ্করিণী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তাঁহারা সেইরূপ গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

যেসং সন্নিচয়ো নথি যে পরিঞ্ঞাতভোজনা।
সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্খো যস্‌স গোচরো।
আকাসে ব সকুন্তানং গতি তেসং দুরন্নয়া ॥৩

অনুবাদ—যাঁহার অর্থসঞ্চয় নাই, যিনি 'পরিজ্ঞা'ত্রয়ের সহিত ভোজন করেন, শূন্যতারূপ ও অনিমিত্তবিমোক্ষ (অর্থাৎ নির্ব্বাণ) যাঁহার গোচরীভূত হইয়াছে, আকাশে পক্ষিগণের গতি যেমন নিরূপণ করা যায় না, তাঁহাদিগের গতিও সেইরূপ নিরূপণ করা যায় না।

যস্‌সাসবা পরিক্খীণা আহারে চ অনিস্‌সিতো।
সুঞ্ঞতো অনিমিত্তো চ বিমোক্খো যস্‌স গোচরো।
আকাসেব সকুন্তানং পদং তস্‌স দুরন্নয়ং ॥৪

অনুবাদ—যাঁহার কামাদি দোষসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, যিনি 'আহার' চতুষ্টয়ের বশীভূত নহেন, শূন্যতারূপ ও অনিমিত্ত বিমোক্ষ যাঁহার গোচরীভূত হইয়াছে, আকাশে পক্ষিগণের গতি যেমন দুর্জ্ঞেয়, তাঁহার গতিও সেইরূপ দুর্জ্ঞেয়।

যস্‌সিন্দ্রিয়াদি সমথং গতানি অস্‌সা যথা সারথিনা সুদন্তা।
পহীনমানস্‌স অনাসবস্‌স দেবাপি তস্‌স পিহয়ন্তি তাদিনো ॥৫

অনুবাদ—সারথি যেমন অশ্বগণকে দমন করে, সেইরূপ যিনি ইন্দ্রিয়গণকে শান্ত করিয়াছেন, তাদৃশ নিরভিমান নিষ্কলুষ পুরুষকে দেবতারাও ঈর্ষ্যা করেন।

পঠবীসমো নো বিরুজ্ঝতি ইন্দখীল পমো
তাদি সুব্বতো।
রহদো ব অপেতকদ্দমো সংসারা ন ভবন্তি
তাদিনো ॥৬

অনুবাদ—তাদৃশ সুব্রত পুরুষ পৃথিবী এবং ইন্দ্রকীলের ন্যায় শুভাশুভে ও শত্রুমিত্রে সমভাবাপন্ন, তাঁহারা পঙ্কহীন হ্রদের ন্যায় নির্ম্মল এবং শান্ত। তাদৃশ ব্যক্তিকে সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না।

সন্তংতস্স মনং হোতি সন্তা বাচা চ কম্মঞ্চ।
সম্মদঞ্ঞা বিমুত্তস্স উপসন্তস্স তাদিনো ॥৭

অনুবাদ—সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত ধীর তাদৃশ পুরুষগণের (অর্হৎগণের চিত্ত প্রশান্ত হয়, বাক্য শান্ত হয়, এবং কর্ম্মও শান্ত হইয়া যায়।

অস্সদ্ধো অকতঞ্ঞূ চ সন্ধিচ্ছেদো চ যো নরো।
হতাবকাসো বন্তাসো সবে উত্তমপোরিসো॥৮

অনুবাদ—যিনি সহজে হঠাৎ যে কোন বিষয়ে বিশ্বাস করেন না, যিনি নির্ব্বাণতত্ত্ব জানিয়াছেন, যিনি সংসারাবর্ত্তন ছিন্ন করিয়াছেন, যিনি সদসতের হাত হইতে এড়াইয়াছেন, যাঁহার সকল বাসনাই ফুরাইয়াছে, তিনিই যথার্থ সাধুপুরুষ।

গামে বা যদি বা রঞ্ঞে নিন্নে বা যদি
বা থলে।
যত্থারহন্তো বিহরন্তিতং ভূমিং রামণেয্যকং ॥৯

অনুবাদ—গ্রামে কি অরণ্যে, গভীর জলমধ্যে কি শুষ্ক স্থানে, যেখানে অর্হতেরা থাকেন, সেই ভূমি রমণীয়।

রমণীয়ানি অরঞ্ঞানি যত্থ ন রমতী
জনো।
বীতরাগা রমিস্সন্তি ন তে কামগবেসিনো ॥১০

অনুবাদ—অরণ্য সকল রমণীয়; যেখানে লোকে আনন্দ পায় না, উদাসীন ব্যক্তিগণ সেইখানে সুখ পাইয়া থাকেন, কারণ তাঁহারা কামান্বেষী নহেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

মীমাংসা।

পুরাতন ভারতের জ্ঞানগৌরবে, যশঃসৌরভে, মানবসমাজ বিস্মিত, জগৎ আমোদিত ছিল। সে আলোক চলিয়া গিয়াছে, অধুনা তাহার স্থানে গাঢ় তিমির বিরাজিত! আশার সঞ্চার নাই, আশঙ্কার রাজত্ব। এ অধঃপতনের দিনেও ভারত,—প্রাচীন জ্ঞান-ভাণ্ডার বুকে লইয়া, জগতের নিকট আত্ম-পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হয় না। ভারতের গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই, সর্ব্বস্বই গিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বপুরুষগণের আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ জ্ঞানগভীর দর্শনশাস্ত্র, এখনও তাহার আছে। বহ্নি অনেক অমূল্য সামগ্রী গ্রাস করিয়াছে, কিন্তু এতেজঃ—বোধ হয় সহিবে না ভাবিয়াই সম্পূর্ণ গ্রহণ করে নাই। সর্ব্বগ্রাসী কাল, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের বহুল গ্রন্থ আপন কুক্ষিতে রক্ষা করিয়াছে, তথাপি ষড়্দর্শন জীবিত থাকিয়া, প্রাচীন ভারতের পবিত্রকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ভারতবর্ষের দর্শনশাস্ত্র অনেকগুলি; প্রায়ই লোপ পাইয়াছে। তত্তৎ-মতবাদের সামান্য অপরিস্ফুট আভাসমাত্র অধুনা আমরা পাইতেছি, মূলগ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না।

ষড়্দর্শনই ভারতের দর্শন সমাজের শীর্ষস্থানীয়। এই ষড়্দর্শনের মূলগ্রন্থ বিনষ্ট হয় নাই, কিন্তু ইহার মধ্যে কোনও কোনওটী, ছিন্নশাখ বৃক্ষের মত দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভারতের সেই আদরের ধন ষড়্দর্শনের নাম—ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা। যথাক্রমে গোতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি ও বাদরায়ণ নামক ছয় জন জগন্মান্য মহর্ষি, এই ষড়্দর্শনের রচয়িতা। এই ষড়্দর্শনের মধ্যে পূর্ব্বমীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসা একজাতীয়, আবার সাংখ্যযোগ অন্যজাতীয়। আবার ন্যায় বৈশেষিক আর একজাতীয়। সামঞ্জস্যে ষড়দর্শন তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। ন্যায়ও বৈশেষিকের দার্শনিক অংশ, আপাততঃ অবিরুদ্ধ। ঐরূপ সাংখ্য এবং যোগেরও দার্শনিক ভিত্তি এক। পূর্ব্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসার অবলম্বন এক। ন্যায়বৈশেষিকের পরমাণুবাদ অভিন্ন। অন্যান্য অংশেও বিরোধ নাই। কেবল ন্যায় জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের অবতারণা করিয়াছেন, বৈশেষিক অদৃষ্টপর্য্যন্ত গমন করিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন, এই অংশেপার্থক্য। সাংখ্য যোগেও তত্ত্ববাদ অবিরুদ্ধ। সাধন প্রণালীতেও বিরোধ নাই, কেবল সাংখ্য নিত্যেশ্বর মানেন না, যোগদর্শন নিত্যেশ্বর স্বীকার করেন, এইটুকু ইতর বিশেষ। পূর্ব্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসায়, বেদবাক্যের রহস্য-উদ্ধারই উদ্দেশ্য ; উভয়েই বেদের উপর নির্ভর করিয়াছেন, কিন্তু প্রতিপাদ্যাংশে ভিন্নমত হইয়াছেন। জৈমিনি নির্ভর করিয়াছেন, বেদের কর্ম্মকাণ্ডে, বাদরায়ণ নির্ভর করিয়াছেন বেদের ব্রহ্মকাণ্ডে। জৈমিনিমতে কর্ম্মই সব, ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদভাগ অর্থবাদ। বাদরায়ণের মতে কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদভাগের তাৎপর্য্য ব্রহ্মপ্রতিপাদন। কর্ম্ম দ্বারা কখনও নিঃশ্রেয়স লাভ করা যায় না, ব্রহ্মজ্ঞানই সর্ব্ববিধ অনর্থনিবৃত্তির পরম উপায়। বস্তুতঃ উভয়েরই বেদ অবলম্বন, একের লক্ষ্য কর্ম্ম, অপরের লক্ষ্য ব্রহ্ম।

অন্যভাবে ভারতীয় ষড়দর্শন দুইশ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম শাস্ত্রপ্রধান, দ্বিতীয় যুক্তিপ্রধান। পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা শাস্ত্রপ্রধান, অপর দর্শনচতুষ্টয় যুক্তিপ্রধান। প্রথমশ্রেণীতে শাস্ত্রকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, আনুষঙ্গিকভাবে যুক্তির অবতারণা আছে। দ্বিতীয়শ্রেণীতে যুক্তিবলেই পদার্থ প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তবে শাস্ত্রের অপমান করা হয় নাই। স্বকীয় সযুক্তিক মতের অবিরোধে শাস্ত্র ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এবং স্বমতপ্রতিপাদক শাস্ত্রও গৌণভাবে প্রমাণরূপে স্বীকার করা হইয়াছে। প্রথমশ্রেণীতে শাস্ত্রানুসারে যুক্তির নয়ন, দ্বিতীয়শ্রেণীতে যুক্ত্যনুসারে শাস্ত্রের নয়ন দৃষ্ট হয়।

অস্মদ্দেশে যখন দর্শনশাস্ত্র আবির্ভূত হয়, তখন দর্শনশাস্ত্রের অপর নাম ছিল "মোক্ষশাস্ত্র"। সেই শাস্ত্রে প্রাসঙ্গিক আনুষঙ্গিক ভাবে সকল বিষয়েরই আলোচনা হইত। বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্যপ্রদেশে philosophy বলিলে যাহা বুঝা যায়, আমাদের দর্শনশাস্ত্র ঠিক তাহা নহে। তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক বিষয় ইহার অন্তর্নিবিষ্ট, পক্ষান্তরে তাহার অনেক বিষয় ইহাতে

পরিত্যক্ত, এইরূপ দেখা যায়। ভারতের দর্শনশাস্ত্র ও ভারতীয় ধর্ম্মের সম্বন্ধ মজ্জাগত পাশ্চাত্য প্রদেশের দর্শনশাস্ত্রের সহিত তদ্দেশীয় ধর্ম্মের বিশেষ কিছু সম্বন্ধ নাই। এইজন্যই অধুনা পাশ্চাত্যপ্রদেশে ভারতীয় ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তিত হইতেছে। এই গৌরবে একমাত্র ভারতীয় ধর্ম্মই গৌরবান্বিত!

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দর্শনশাস্ত্রের লক্ষণ-নির্ব্বাচন করিব না, অপরদর্শনের বিষয়ও বলিব না, কেবল পূর্ব্বমীমাংসার বিষয় আলোচনা করিব। প্রবন্ধান্তরে দর্শনশাস্ত্রের লক্ষণ প্রামাণ্য বিষয়ে বিশেষ আন্দোলনের বাসনা রহিল।

পূর্ব্বমীমাংসার নাম কর্ম্মমীমাংসা। সাধারণতঃ ইহাকে 'মীমাংসা' বলা হয়। উত্তরমীমাংসার নাম ব্রহ্মমীমাংসা বা বেদান্ত। আমরা এ প্রবন্ধে অতঃপর পূর্ব্বমীমাংসাকে 'মীমাংসা'ই বলিব।

মীমাংসাদর্শন দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম, একাদশ ও দ্বাদশ এই নয় অধ্যায়ের প্রত্যেকের চারিটী, এবং তৃতীয়, ষষ্ঠ ও দশম এই তিন অধ্যায়ের প্রত্যেকের ৮টী পাদ বা উপ-বিভাগ আছে। সমগ্রগ্রন্থে সহস্র অধিকরণ আছে। বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর ও সঙ্গতি এই পাঁচটী অবয়ব একত্রিত হইয়া, একটী সম্পূর্ণ বিচারিত প্রস্তাব গঠন করে, এই পঞ্চাবয়বসমষ্টিকে "অধিকরণ" কহে। এক একটী অধিকরণ, আবশ্যক মত এক, দুই বা বহু সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। 'এই কয়টী সূত্রে একটী অধিকরণ পরিসমাপ্ত করিব' এতাদৃশ বা নিয়ম প্রতিজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া, গ্রন্থকার অধিকরণ রচনা করেন নাই। এই মীমাংসাদর্শন, ষড়্দর্শনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিপুল ও জটিল। বিচার্য্য বিষয়ের গুরুতা যুক্তির সূক্ষ্মতা ও পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ব্বাচনের নিপুণতা, এমন আর কোনও দর্শনে নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না।

মীমাংসাদর্শনের দ্বাদশ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য বিষয় দ্বাদশ প্রকার। প্রথম অধ্যায়ে প্রমাণ নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে কর্ম্মভেদ, তৃতীয়াধ্যায়ে শেষত্ব, চতুর্থাধ্যায়ে প্রযুক্তি, পঞ্চমাধ্যায়ে ক্রম, ষষ্ঠাধ্যায়ে অধিকার, সপ্তমাধ্যায়ে সামান্যাতিদেশ এবং অষ্টম অধ্যায়ে বিশেষাতিদেশ, নবমাধ্যায়ে উহ, দশমাধ্যায়ে বাধ, একাদশাধ্যায়ে তন্ত্র, এবং দ্বাদশাধ্যায়ে প্রসঙ্গ বিবেচিত হইয়াছে। প্রথমাধ্যায়ের প্রমাণনির্ব্বাচন লক্ষ্য। মীমাংসক, শাস্ত্রকেই প্রধানতঃ প্রমাণরূপে স্থাপন করিয়াছেন, এই শাস্ত্র বেদ। বেদের স্বতঃপ্রামাণ্য এবং নিত্যত্ব মীমাংসাচার্য্যেরা স্বীকার করেন। ইঁহাদের মতে বেদবাক্য অভ্রান্ত-সত্যের উৎস, গরিমার আগার, ও জ্ঞানের আকর। বেদবাক্যের অর্থ নির্ণয়, এবং আপাতপ্রতীত বিরোধ পরিহার করিতেই ইঁহারা প্রস্তুত। বৈদিক সত্য যৌক্তিকতার আশ্রয়ে প্রতিপালিত নহে, কিন্তু যৌক্তিকতা আপনা হইতে তাহার অনুসরণ করিতে বাধ্য, এরূপ ইঁহাদের অভিপ্রায়। প্রতিপাদ্য পদার্থ, প্রমাণের বলেই সমর্থিত হয়, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে প্রথমাধ্যায়ে প্রমাণের আলোচনা আবশ্যক। প্রমাণ বেদ। বেদ প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত, এইরূপ মীমাংসকের মত। ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্র, এই দুইটীই

বেদের দুইভাগ। ব্রাহ্মণবাক্যের মধ্যে বিধি প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়। মন্ত্র যজ্ঞাদিতে উচ্চারিত হয়। যেগুলিকে যাজ্ঞিক আচার্য্যগণ 'মন্ত্র' নামে অভিহিত করেন, তাহারাই মন্ত্র, ইহা ব্যতীত মন্ত্রের আর কোনও উপযুক্ত লক্ষণ নিরূপণ করা যায় না। কারণ, নানাভাবের নানারূপ মন্ত্রগণের মধ্যে, এমন একটী অনুগত অসাধারণ ধর্ম্ম পাওয়া দুষ্কর, যাহাদ্বারা ঐ নানাবিধ মন্ত্রসমূহের স্থির লক্ষণ নিশ্চিত হইতে পারে। মন্ত্রভাগ ব্যতীত বেদের অপর যে ভাগটী রহিল, তাহা ব্রাহ্মণ; এই পর্য্যন্তই ব্রাহ্মণের লক্ষণ। বেদবাক্যের প্রামাণ্য বিচারে, বর্ত্তমান যুগে অনেক আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু মীমাংসকগণ সে শঙ্কায় কাতর ছিলেন না। তাঁহারা মন্ত্রের প্রামাণ্য এবং ব্রাহ্মণান্তর্গত বিধি, অর্থবাদ ইত্যাদির প্রামাণ্য, বহুল আলোচনা দ্বারা অবধারণ করিয়াছেন। প্রথমাধ্যায় ৪টী পাদে বিভক্ত। প্রথম পাদে বিধি, দ্বিতীয়ে অর্থবাদ এবং মন্ত্র, তৃতীয়ে বেদ-মূলক স্মৃতি এবং শিষ্টাচার, ও চতুর্থপাদে বিধিবাক্যের অন্তর্গত 'নামধেয়' অংশ প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকেদারনাথ ভারতী।

সকলি সুন্দর!

(১)

প্রভাতের নীল ভালে—
তরুণ অরুণ জলে,
প্রকৃতির চারু শোভা
কিবা মনোহর!
তব সকলি সুন্দর!
বিভো! সকলি সুন্দর!

(২)

কি গভীর ধরি তান,
কি ভীষণ কি মহান্
উথলিত ব'য়ে যায়
অকূল সাগর!
তব সকলি সুন্দর!
বিভো! সকলি সুন্দর!

(৩)

শরতের নীলাকাশে
রজত চাঁদিমা হাসে,
জ্যোছনা উছলি ভাসে
ধরণী-উপর!
তব সকলি সুন্দর!
বিভো! সকলি সুন্দর!

(৪)

সাঁজের বাতাসে হায়!
নলিনী মুদিয়ে যায়,
সরসীর বুকে ভাসে
শত শশধর!
তব সকলি সুন্দর!
বিভো! সকলি সুন্দর!

(৫)

উছলি মানব প্রাণ,
তটিনীর প্রেম-গান!
ধীরে ধীরে ভেসে যায়
মৃদু তর-তর!
তব সকলি সুন্দর,
বিভো সকলি সুন্দর!

(৬)

শ্যাম-লতিকার গায়
ফুটে ফুল, পাখী গায়,
মধু লোভে ছুটে যায়
তৃষিত-ভ্রমর!
তব সকলি সুন্দর,
বিভো! সকলি সুন্দর!

(৭)

যূথিকার মৃদু-হাসি
উঠে ধীরে পরকাশি,
সমীরণ চুমে হাসি
নধর অধর!
তব সকলি সুন্দর!
বিভো। সকলি সুন্দর!

(৮)

নিভৃতে শিখর কোলে
রজতের ধারা ঢেলে,
মৃদু মৃদু বয়ে যায়
বিমল নির্ঝর।
তব সকলি সুন্দর!
বিভো! সকলি সুন্দর!

(৯)

সজল জলদ পাশে
চকিতে চপলা হাসে,
ঘন গরজনে কাঁপে
উদার অম্বর।
তব সকলি সুন্দর!
বিভো! সকলি সুন্দর!

(১০)

কি গভীর প্রেমে ভুলি
নলিনী নয়ন তুলি
চেয়ে থাকি অনিমেষে
চুমে রবিকর!
তব সকলি সুন্দর!
বিভো! সকলি সুন্দর।

(১১)

জননীর প্রাণ ভরা—
স্নেহের অমিয় ধারা—
তনয়ের তরে সদা
বহে ঝর ঝর!
তব সকলি সুন্দর!
বিভো! সকলি সুন্দর!

(১২)

মাতা পিতা ভাই বোন
এ সবার সম্মিলন—
বিচিত্র বন্ধন তব,
ভাবি নিরন্তর!
তব সকলি সুন্দর!
বিভো! সকলি সুন্দর!

(১৩)

প্রভাতে ফুটিয়া উঠে,
সাঁজেতে নীরবে টুটে ;—
তবু হাসে, তবু ছুটে,
মোহময় নর !
তব সকলি সুন্দর !
বিভো ! সকলি সুন্দর !

(১৪)

দু'দিনের তরে আসা,
মিছে শুধু ভালবাসা,
জেনেও বুঝেনা কেন
আকুল অন্তর ?
তব সকলি সুন্দর !
বিভো ! সকলি সুন্দর।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।
(রাজসাহী)

দিবেহে নাকি ?

---

(১)

মম, হৃদিমাঝে সদা
এবাসনা, প্রভু !
তোমারে দেখি।
আমি, অধম বলিয়ে
ও রাঙ্গা চরণ
দিবেহে নাকি ?

(২)

যদি, না জানি ভজন,
ডাকিতে তোমায়,
তুমিই শিখাও ;
যদি, করেছ সৃজন,
মুকতির পথ,
তুমিই দেখাও।

(৩)

তুমি, তুমি না করিলে দয়া
ডাকিব না খলি
'দয়াল হরি',
শুধু, মরম-বেদনা
জানাবে হে মম
নয়ন বারি !

(৪)

তুমি, হইলে নিদয়
ভকতি শৃঙ্খলে
বাঁধিব রাখি ;
তুমি পারকি ছিঁড়িতে
দেখিব হে মম
পরাণ পাখী ?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।
রাজসাহী।

১০ম বর্ষ। চৈত্র। ১২শ সংখ্যা।

১৮২৫, ১৩১০।

গ্রাহকগণ!

বর্ত্তমান বর্ষের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

হিন্দু-পত্রিকা।

(হিন্দুধর্ম্ম-বিষয়ক মাসিক-পত্রিকা।)

শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এম, এ, বি, এল

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।



সূচী।

যশোহর।

হিন্দু-পত্রিকা প্রেসে

শ্রীকালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দা ১৮২৫।

শাণ্ডিল্য-সূত্র।

বা

ভক্তি-মীমাংসা।

ভক্ত-সাধক সমাজের হৃদয়ের ধন শাণ্ডিল্য-ঋষির শতসংখ্যক ভক্তিসূত্র, হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর 'এম, এ, বি, এল্ মহাশয় কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত, এবং মূল সংস্কৃত সূত্র ও প্রয়োজনীয় টীকা-টীপ্পনীসহ বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়া, সুলভ মূল্যে (কাপড়ে বাধাই ১৷৹ টাকা ও কাগজে বাধাই ১৲ টাকা মূল্যে) যশোহর হিন্দু-পত্রিকা-কার্য্যালয়ে আমার নিকট বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

Probudha Bharata Almora, বলেন :—

"The Sandilya Sutra is a very ancient work on Bhakti : both philosophy and practice. Mr. Mozoomdar has translated it beautifully, giving a runing commentary, mostly drawn from Svapneswar, the commentator of Sandilya and explaning difficult passages and references in footnotes. The book is dedicated to Swami Vivekananda and opens with an able and learned introductoin by the Translator. It is prettily got up.

Luzac's Oriental Series London বলেন :—

Mr. Jadunath Mozoomdar has translated from the Sanskrit Hundred Aphorisms of Sandilya or Religion of Love. Until recently this side of Indian religious thought has been greatly overlooked, but the publication and translation of the Narada and Sandilya Sutra have lately thrown a flood of light on Bhakti-Marga or the phath of Love. When the Maya or Avidya has been removed from the eyes of Paramahansa, he becomes a Bhakta, odevoted lover of Deity. The difference between Sandilya and Narad is between the monist and the dualist. Whilst the ecstatic devotion of the Dvaitavadi is for Saguna Isvara, that of the Advaitavadi is for Nirguna Brahman. Whether we can always agree with the commentary or not. Mr. Mozoomdar deserves our bes thanks for this interesting contribution to the literature of divine love.

The Indian Mirror says:—

The book makes an important addition to the religious publications of the day.

যুগধর্ম্ম।

মূল্য বার আনা।

(যন্ত্রস্থ)

শ্রীজানকীনাথ পাল, বি, এল, উকীল, রাজবাড়ি প্রণীত। হিন্দু-পত্রিকা আফিসে পাওয়া যায়।

শ্রীহরিঃ।

(১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে রেজিষ্ট্রীকৃত।)

হিন্দু-পত্রিকা।

১০ম বর্ষ, ১০ম খণ্ড, ১২শ সংখ্যা। | চৈত্র। | ১৩১০ সাল, ১৮২৫ শকাব্দা।

শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের চরম শিক্ষামৃত।

শ্রীকৃষ্ণ গোলকধামে যখন হ্লাদিনী শক্তির সহিত একত্র থাকেন, তখন তিনি দ্বিভুজ-মুরলীধর শ্যামসুন্দর, তখনই তিনি ষোলকলায় পূর্ণ-ভগবান্. সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। আর যখন তিনি হ্লাদিনী শক্তির সহিত, অর্থাৎ রাধার সহিত পৃথক্‌ভাবে বৈকুণ্ঠে বাস করেন, তখন তিনি শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-ধারী চতুর্ভুজমূর্ত্তি, তখন তিনি ভগবান্, পূর্ণ-ভগবান্ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ মথুরা-পুরীতে ভগবান্‌রূপে আবির্ভূত হইলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ, ৩য় অধ্যায়, ৮ম শ্লোকে আছে :—"ভগবান্ আবির্ভূত হইলে বসুদেব দেখিলেন, সেই বালক অতিশয় অদ্ভুত। তাঁহার পদ্মপলাশ তুল্য লোচন, শঙ্খ-চক্র গদাপদ্মধারী চারিহস্ত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎ-সের চিহ্ন, গলদেশে কৌস্তুভমণি, পরিধানে পীতবসন, বর্ণ নিবিড় জলধরসদৃশ সুভগ, মহামূল্য বৈদূর্য্যমুকুট, তথা কুণ্ডলের দ্যুতিতে অপরিমিত কেশ পাশ দেদীপ্যমান, আর তিনি অত্যুৎকৃষ্ট মেখলা, অঙ্গদ, তথা কঙ্কণাদি অলঙ্কারে দীপ্তি পাইতেছেন।" তৎপর ভগবান্ দেবকীর প্রার্থনীয় দ্বিভুজ-মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। পরে ব্রজধামে নীত হয়েন ও তথায় মুরলীধর হয়েন। ব্রজধামে হ্লাদিনী শক্তিরূপিণী শ্রীরাধার, ও অন্যান্য গোপিকাগণের সহিত একত্র বাস কালে, তিনি ষোলকলা পূর্ণভগবান্ ছিলেন এবং ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া, গোপিকাগণকে ও ধড়াচূড়া মুরলী ত্যাগ করিয়া, পুনরায় মথুরায় আসিয়া রাজবেশ গ্রহণ করেন। তাঁহার

ব্রজধামে বাসকলীন পরমভক্তিপরায়ণা ব্রজগোপিকাগণ তাঁহাকে মধুর রসে ভজনা করিয়াছিলেন, এবং মধুর রসে কিরূপে তাঁহাকে ভজনা ও লাভ করা যায়, তাহা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ব্রজধাম ব্যতীত অন্যত্র এই মাধুর্য্যের বাস নাই। ব্রজধামে শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীরাধার পৃথক্ বপু ছিল। কিন্তু নবদ্বীপধামে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা যুগলমূর্ত্তি হইয়া পূর্ণ ভগবান্‌রূপে আবির্ভূত হন, ও তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রথমতঃ ৩৬ বৎসর ঐরূপ যুগলভাবেই বাস করেন, অর্থাৎ কখনও বা তিনি শ্রীকৃষ্ণভাবে, কখনও রাধাভাবে প্রকাশিত হইতেন। শেষ বার বৎসর নীলাচলে গম্ভীরার ভিতর স্বরূপদামোদর ও রামানন্দ রায়ের সহিত অর্থাৎ ললিতা ও বিশাখা সখীর সহিত বাসকরা কালীন, তিনি নিরবধি রাধাভাবে বিভোর থাকিতেন, অর্থাৎ তখন যেন যুগল-মূর্ত্তির ভাব দুইভাগে বিভক্ত হইয়া শুধু রাধাভাব রহিল। তবেই দেখাযাইতেছে, শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ভগবান্, তৎপর ব্রজধামে শ্রীভগবান্, এবং পুনুরায় রাধার সঙ্গবিচ্যুত হইয়া, শুধু ভগবান্‌ভাবে আচরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য প্রথমে শ্রীভগবান্‌রূপে আবির্ভূত হইয়া, কখনও শুধু ভগবান্‌ভাবে, কখনও শুধু শ্রী অর্থাৎ রাধাভাবে এবং শেষ বার বৎসর শুধু রাধাভাবে আচরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "আমি কৃষ্ণ, রাধা শ্রী, তজ্জন্যই আমি শ্রীকৃষ্ণ, রাধা বিহনে আমি শুধুই কৃষ্ণ"। গোবিন্দ অধীকারীর গানে আছে:—"শুক বলে 'আমার কৃষ্ণ মদন মোহন,' সারী বলে 'আমার রাধা বামে যতক্ষণ, নৈলে শুধুই মদন।' শুক বলে 'আমার কৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধরেছিল,' সারী বলে 'আমার রাধা শক্তি সঞ্চারিল, নৈলে পার্ব্বে কেন!"

শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য উভয়েই ধর্ম্ম সংস্থাপন ও দুষ্কৃতদিগের বিনাশের জন্য অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র ও রাজনীতি অবলম্বনে যেমন দুষ্কৃত দুর্দান্ত ক্ষত্রিয়কুল ও যদুবংশ, বিনাশ করেন, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য তদ্রূপ অস্ত্রশস্ত্র ও রাজনীতির সাহায্য ব্যতীত শুধু চক্ষের জলদিয়া ও হরিনাম সংকীর্ত্তন দ্বারা, দুষ্কৃতদিগের দুষ্কৃতি বিনাশ করিয়া দুষ্কৃতদিগকে বৈকুণ্ঠের অধিকারী করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের জীবন অশ্রুময় ছিল, তিনি ক্রন্দনের সহিত অবতরণ করিয়া, সারাটি জীবন কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষ ক্রন্দনের সহিত অন্তর্ধান করেন।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া, জগন্মণ্ডলীকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার লিখিত ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছেন, এবং সর্ব্বরসের সার মধুরভাবে কিরূপে তাঁহাকে ভজনা করিতে হয়, তাহা ব্রজধামে গোপিকাগণের সহিত নিজে আচরণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন মাত্র। এতদ্ব্যতীত তিনি অন্যান্য রসের ও নিষ্কাম-ধর্ম্মেরও আচরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান কর্ম্ম ছিল, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ করা। ব্রজরসের মাধুর্য্য কিরূপে অপরে আস্বাদন করিতে পারে, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য তিনি কোন শিক্ষক রাখিয়া গিয়াছিলেন না, সুতরাং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই

তাহা লুপ্ত হয়। ক্রমে ক্রমে শ্রীবৃন্দাবনও লুপ্ত হন। তৎপর পূর্ণ-ভগবান্ দেখিলেন, ব্রজরসের মাধুর্য্য হইতে তাঁহার প্রিয় মানবগণকে বঞ্চিত রাখা কর্ত্তব্য নহে, এবং শ্রীকৃষ্ণ একা আসিলে রাধিকা মেলে কৈ, এবং শ্রীরাধিকা একা আসিলে শ্রীকৃষ্ণ মেলে কৈ, এই হেতু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা যুগলমূর্ত্তিতে এককালে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিজে আচরণ করিয়া, মানবগণকে ব্রজের মাধুর্য্য কিরূপে আস্বাদন করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহার সময়েই অনেকে উহা শিক্ষা করেন এবং ঐ রসের রসিক হন, তৎপর তাঁহাদের বংশধর ও উত্তরাধিকারীগণ ঐ রসের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া, ভাবী-বংশধরগণের জন্য প্রসাদ রাখিয়া গিয়াছেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অষ্টাদশ অধ্যায় পূর্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অর্জ্জুনকে নানাবিধ যোগ ও নিষ্কাম ধর্ম্মের উপদেশ দিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া অবশেষে বলিলেন !—

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমংবচঃ।"
"মন্মনাভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসিমে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥"

(গীতা, ১৮শ ৬৫ ৬৬)

অর্থাৎ, সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম আমার পরমবাক্য পুনরায় শ্রবণ কর। তুমি মচ্চিত্ত, মদ্ভক্ত ও মদুপাসক হও, আমাকেই নমস্কার কর, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে, আমি এ কথা সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিতেছি, কারণ, তুমি আমার প্রিয়। তুমি সর্ব্বপ্রকার লৌকিক, দৈহিক, বৈদিক, প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকারের পাপ হইতে মুক্ত করিব ; শোক করিওনা।

ইহাই হইল শ্রীকৃষ্ণের শেষ শিক্ষামৃত। এইরূপ ভাবে শ্রীভগবান্‌কে কে ভজনা করিতে পারে ? একমাত্র ব্রজগোপিকাগণ, অথবা তাঁহাদের অনুগতা সখীগণ, অথবা তাঁহাদের ভাবে ভাবিত ভক্তগণ। এইরূপ ভক্তের উদাহরণ স্বরূপ নারদসূত্র ব্রজগোপিকাগণের এবং শাণ্ডিল্যসূত্রও ব্রজ-বল্লবীদিগের নামই উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্-শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে গোপকুমারীগণের বস্ত্র হরণ করিয়া, তৎপর তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া, তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন;

"সঙ্কল্পোবিদিতঃ সধ্ব্যোভবতীনাং মদর্চ্চনং।
ময়ানুমোদিতঃ সো হসৌ সত্যোভবিতুমর্হতি॥
নত্ময্যাবেশিধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জিতাঃ ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে।
যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্থথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যার্চ্চনং সতীঃ।
(শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ম স্কন্ধ ২২অঃ ১৯-২০০)

অর্থাৎ, অহে সাধ্বীগণ ! তোমরা আমার অর্চ্চনা করিয়াছ, তোমাদের সঙ্কল্প জানিতে পারিয়াছি, তাহা আমি অনুমোদন করিলাম, তাহা সত্য হইহার যোগ্য। ক্ষে

সকল ব্যক্তির চিত্ত আমাতে আবেশিত হয়, তাহাদের কামনা বিষয়ভোগার্থ কল্পিত হয় না, কারণ যবাদিবীজ ভর্জিত ও কথিত হইলে, তাহা হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি হইতে পারে না। হে অবলাগণ! তোমরা সিদ্ধ হইয়াছ, অধুনা ব্রজে গমন কর, আগামিনী সমূহরজনীতে আমার সহিত ক্রীড়া করিতে পাইবে, যাহার নিমিত্ত এই ব্রত আচরণ করিলে এবং যাহার জন্য কাত্যায়নী অর্চ্চিতা হইলেন।

ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই ১৭।১৮ শ্লোকে আছে, ব্রজগোপিকারা ভগবৎপদস্পর্শ কামনায় ধৃতব্রতা হইলে, তাঁহাদের মানস জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের চিত্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই ব্রজরস কিরূপে ভক্তগণ আস্বাদন করিতে পারেন? শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য নিজে আচরণ করিয়া, তাহা শিক্ষকস্বরূপ শিষ্য-মণ্ডলীকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়াছেন, এবং তাহাই তাঁহার চরম শিক্ষামৃত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, উভয় যুগের অবতারীর চরম শিক্ষামৃত একই প্রকার। তবে পার্থক্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন উপস্থিত নায়ক ও গোপিকারা ছিলেন উপস্থিত নায়িকা, শ্রীকৃষ্ণের রূপ বহ্নিতে ঝাঁপ দেওয়া গোপিকাদের পক্ষে সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল, গোপিকারা শ্রীকৃষ্ণকে "পরমকান্ত" ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। তারপর যখন এই কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার রূপ সাগরে ঝাঁপ দিয়া, গৌর সাজিয়া শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য-বেশে অসিলেন, তখন নায়ক নায়িকার একত্র মিশ্রণ চিন্তার বিষয়ীভূত ব্যাপার ছিল না। বিশেষতঃ গৌরাঙ্গ ও প্রকৃত নায়ক নহেন, ভক্তেরাও প্রকৃত নায়িকা নহেন, অথবা গৌরাঙ্গ প্রকৃত নায়িকা হইলেও তিনি পুরুষরূপে জন্ম গ্রহণ করেন, এবং নায়ক শ্রীকৃষ্ণ নরচক্ষুর অগোচর। সুতরাং এই অবস্থায় ব্রজলীলার মাধুর্য্য আস্বাদন করা ও শিক্ষা দেওয়া দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু তখনও ভক্তেরা তাঁহার সহবাসে থাকিয়া, তাঁহার হ্লাদিনী-শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন ও বিপুল আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণ বিষম কাল পড়িয়াছে! হতভাগ্য আমরা এমন অসময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছি যে, এখন নাই সে শ্রীকৃষ্ণ! নাই সে গৌরাঙ্গ! নাই সে সজীব ব্রজধাম! আমাদের পক্ষে সমস্তই তীব্রভাবনার সহিত মনে মনে অনুভব করিতে হইবেক, এবং শ্রীভগবানের প্রতি গোপিকার ভাব মনে স্ফুরিত করিয়া লইয়া, ঐ ভাবকে স্থায়ীভাবও ক্রমে স্বভাবে পরিণত করিতে হইবেক। এ কার্য্য সন্ন্যাসীদের ষট্‌চক্রভেদ অপেক্ষা সহজসাধ্য ব্যাপার বলিয়া অনুমিত হয় না। পরম কারুণিক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য আমাদের এই দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহার নিজ-সর্ব্বশক্তি কতিপয় শিষ্যে সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তিনি নিজে শ্রীমুখে ঐ শিষ্য কয়েক জনকে উক্ত গূঢ় রহস্য উপদেশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এই বিষয় পুস্তকে নিবদ্ধ করিতে বলিয়াছিলেন, এবং তাঁহারাও তাহা করিয়া গিয়াছেন। আমি ক্রমে ক্রমে উদাহরণ দিয়া এই বিষয় পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিতেছি।

উক্তরূপ শিষ্য মধ্যে শ্রীরূপগোস্বামী একজন। তিনি বলিয়াছেন যে, সাধক ও সিদ্ধভেদে ভক্ত দ্বিবিধ। তাহার আবার বহু অবান্তর বিভাগ আছে। শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্ত, এবং মুরলীধ্বনি প্রভৃতি রতির আস্বাদনের কারণ। স্তম্ভ, স্বেদ, পুলকাদি আটটি সাত্ত্বিক ভাব। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ভাব আছে। হাস্য হর্ষ প্রভৃতিকে রতির কার্য্য কহে। নৃত্য, বিলুণ্ঠন, গীত, চীৎকার বা হুঙ্কার, গা মোড়ামুড়ি, হাঁই, ঘন ঘন শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ, লজ্জাশূন্যতা, মুখ হইতে লালাস্রাব, অট্টহাস্য, হিক্কা, প্রভৃতি অনুভাব। অনুভাব ও বিভাবাদি জনিত চিত্তবৃত্তি, যদ্দ্বারা শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের বিকার সম্পাদিত হয়, তাহার নাম ভাব। এইরূপ আরও অশেষ বিধ বিভাগ আছে। মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের প্রত্যেক আচরণ ও অঙ্গভঙ্গী সার্থক ছিল, অর্থাৎ ঘোর প্রেমিকের ন্যায় ছিল। আমি এখানে আপাততঃ তিনটি মাত্র উদাহরণ দিতেছি।

১ম। গৌরাঙ্গদেব মধ্যে মধ্যে ভাববিহ্বল ও অচেতন হইতেন, এবং হরিনাম করিলে অথবা নীলাচলে শ্রীজগন্নাথের অধরামৃতস্পৃষ্ট লব মাত্র প্রসাদ (ফেলা) মুখে দিলেও চেতন করা যাইত। এই ভাবের নাম বোধ। শব্দ, গন্ধ, রস প্রভৃতির দ্বারা বোধ জন্মে। শব্দের দ্বারা যথা, নবানুরাগে শ্রীমতীর ইন্দ্রিয়বৃত্তি কবলিত হইলে, ললিতা শ্রুতিমূলে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলে, শ্রীরাধা নয়নযুগল উন্মীলন করিলেন। এ যুগে ললিতা নাই বটে, কিন্তু প্রেমরসের সঙ্গী আছেন, তিনি ভক্তের কানে হরিনাম করিলেই হয়। গন্ধের দ্বারা যথা, বনমধ্যে পরিহাস পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তিনি মূর্চ্ছিতা হইলেন, কিন্তু তদ্দণ্ডেই শ্রীকৃষ্ণের বনমালার সৌরভে চেতন হইলেন। রসের দ্বারা যথা, শ্রীকৃষ্ণ কেলিস্থল হইতে অন্তর্হিত হইলে, রাধিকা বিবশাঙ্গী ও অচেতনা হওয়ায়, তাঁহার মুখে সখীরা শ্রীকৃষ্ণচর্ব্বিত তাম্বুল দিলে, কমলনয়নী রাধা পুলকাঞ্চিত হইয়াছিলেন।

২য়। শ্রীগৌরাঙ্গদেব অল্পবয়সে গৃহত্যাগ করিলেন, এবং সন্ন্যাসীর বেশে দেখাইলেন যে, প্রকৃতির মুখসন্দর্শন নিষিদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও বলিয়াছেন যে, বিবাহের পর প্রথম দুই একটী সন্তান হইলেই স্বামী-স্ত্রী ভ্রাতৃ ভগ্নীবৎ ব্যবহার ও ঈশ্বরারাধনা করিবেন। ইহার নাম জুগুপ্সা রতি। যথা, যে অবধি আমার চিত্ত প্রতিক্ষণ নব নবায়মান রসধামে, শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে, রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে, সেই অবধি নারীসঙ্গম স্মৃতিপথে আসিলে, মুখ বিকার এবং সাতিশয় নিষ্ঠীবন উপস্থিত হয়। এতদর্থে শ্লোক—

যদবধি মম চেতঃ কৃষ্ণ পাদারবিন্দে
নবনবরসধামন্যুদ্যতং রন্তুমাসীৎ।
তদবধি বত নারীসঙ্গমে স্মর্য্যমানে
ভবতি মুখবিকারঃ সুষ্ঠু নিষ্ঠীবনঞ্চ॥

৩য়। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভু অল্পবয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কিন্তু, তিনি সহসা গৃহত্যাগ করেন নাই। প্রায় দুই মাস পূর্ব্বে মাতা, স্ত্রী ও ভক্তগণের নিকট হইতে বিদায় হইয়া, ঐ দুই মাস কাল সমস্ত ভাব সম্বরণ

করিয়া, প্রকৃত গৃহীর ন্যায় আহার বিহার পাশাখেলা প্রভৃতি করিয়া গৃহত্যাগ করেন, ও তৎপর উন্মত্তের ন্যায় বৃন্দাবন পানে ছুটিয়া যান। ইহার নাম ভাব-শাবল্য। যথা, "যে মথুরা দর্শন করিল না সে নয়নকে ধিক্! আমার বিদ্যা সমস্ত নৃপমণ্ডলীর উপকারার্থ দান করিয়াছি বটে, কিন্তু কাল সর্ব্বসংহারক, ঐ বিদ্যা নষ্ট হইবেই। কেন আমার গৃহলক্ষ্মীর বিলাসাস্পদ শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে, তবে কি গৃহে বসিয়াই হরিভজন করিব? কিন্তু বৃন্দাটবী আমার হৃদয় আকর্ষণ করিতেছেন।"

আমি এখানে তীব্রভাবনা সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের একটী উপদেশ লিখিয়াই বক্তব্য বিষয়ে যাইতেছি। আমাকে যখন বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিতেই হইবেক, তখন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া পাঠকগণকে বিরক্ত করিব না। শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধে আছে, শ্রীপ্রহ্লাদ মাতৃগর্ভে থাকার সময় দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে এই উপদেশ করেন;— "(শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধামে বাস করা কালীন গোবর্দ্ধন ধারণাদি ও রাসলীলাদি যে সমস্ত লীলা করিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিয়া) মনুষ্যের যখন অত্যন্ত হর্ষোদয় হওয়াতে পুলকোদ্গাম ও অশ্রুপাত হয়, তখন তিনি গদ্গদ্ স্বরে ঊর্দ্ধকণ্ঠ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করেন, রোদন করেন, নৃত্য করেন, কখন বা ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় হইয়া হাস্য করেন, কখন ক্রন্দন করেন, কখন মৌনী হইয়া ধ্যান করেন, কখন লোকের বন্দনা করেন, কখন বা বারম্বার শ্বাস ত্যাগ করিতে২ নির্লজ্জ হইয়া "হে হরে! হে জগৎপতে! হে নারায়ণ!" এই বাক্য উচ্চারণ করিতে থাকেন, তখন সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হন, এবং "আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস, আমি শ্রীকৃষ্ণের সখা, আমি শ্রীকৃষ্ণের মাতা, আমি কৃষ্ণপ্রিয়া," এইরূপ তীব্র ও উৎকট ভাবনায় মন ও শরীরের দ্বারা সেই সেই কার্য্য অনুকরণ করিতে থাকেন, তখন অজ্ঞান ও বাসনাজাল নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া যায় ও সম্যক্‌রূপে শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তি ঘটে।" ইহার নাম ভাব। অনন্যবুদ্ধি হইয়া গাঢ় সংস্কার দ্বারা ভাবনার বিষয়কে চিত্তে অনুভব করিলে ভাব জন্মে।

ভাবের প্রাবল্যে ব্রজগোপিকাগণ শ্রীকৃষ্ণকে কিরূপ অনুকরণ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৩০শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে। শ্রীভগবান্ জীবকে দেখাইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে সম্মুখে পাওয়া অপেক্ষা তাঁহার বিরহই জীবের অধিক মঙ্গলদায়ক। ব্রজকুমারীগণের বস্ত্র হরণের দিন শ্রীকৃষ্ণ যখন বলরাম ও সখাবৃন্দ সহ দূরবনে গিয়া পড়িলেন, তখন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের পত্নীগণ, তাঁহার দর্শনাশায় তাঁহার নিকট আগমন করিলে, তিনি তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ২৩শ অধ্যায়ে আছে। বিপ্র-পত্নীগণ আসিয়া দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণের শরীর শ্যাম বর্ণ, পরিধান পীতাম্বর, বনমালা, ময়ূরপিচ্ছ, স্বর্ণাদি ধাতু এবং প্রবাল এই সকলে নটবৎ বেশ, তিনি অনুব্রতি সখার স্কন্ধে একটী হস্ত বিন্যস্ত করিয়া আছেন, অন্য হস্তে লীলাকমল ঘুরাইতেছেন, কর্ণ

দ্বয়ে উৎপল, কপোলে অলকা এবং বদন-কমলে মনোহর হাস্য। বিপ্র-পত্নীগণ প্রত্যাখ্যাতা হইয়া বলিলেন "হে ভগবন্! 'আমার ভক্ত কখনই বিনষ্ট হইবে না, আপনার এই প্রতিজ্ঞা সত্য করুন"। তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করেন "হে অবলা-গণ! কেবল অঙ্গসঙ্গ মানবগণের সুখ অথবা অনুরাগবৃদ্ধির কারণ হয় না। আমাতে মনোনিবেশ করিতে থাক, অচিরে আমাকে প্রাপ্ত হইবে। দেখ, শ্রবণ, দর্শন, অথবা অনুকীর্ত্তনে আমাতে যদ্রূপ ভাব জন্মিতে পারে, নিকটে থাকিলে তদ্রূপ হয় না। অতএব বলি, তোমরা নিজ নিজ ভবনে গমন কর।" রাসরজনীতে রাস-রস ভঙ্গ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান করিলে, গোপিকাগণ পাগলিনীর ন্যায় তাঁহাকে বহু অন্বেষণ করিয়া, এবং তরু, গুল্ম, লতা নদী পর্ব্বত প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রীকৃষ্ণের কোন সংবাদ না পাইয়া, অবশেষে প্রলাপ বকিতে বকিতে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন, পরে তদাত্মিকা হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলার অনুকরণ আরম্ভ করিলেন। কোন গোপী পূতনার ন্যায় আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, অন্যা গোপী শ্রীকৃষ্ণবৎ আচরণ করত তাঁহার স্তন পান করিতে লাগিলেন। অপরা গোপী আপনাকে বালকবৎ করিয়া রোদন করিতে করিতে, শকটাসুরের ন্যায় আচরণকারিণী অন্যা গোপীকে পদ দ্বারা আহত করিলেন। একজন গোপী আপ-নাকে তৃণাবর্ত্ত দৈত্যের ন্যায় করিয়া, অন্যা যে গোপী শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা অভিনয় করিতেছিলেন. তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া চলিলেন। কোন গোপী গোপদিগের শব্দে চরণদ্বয় আকর্ষণ করত হামাগুড়ি দিয়া চলিতে লাগিলেন। অন্যা দুই গোপী আপনাদিগকে রাম ও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় করি-লেন, আর কতকগুলি গোপী গোপদিগের ন্যায় কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। একজন গোপী বৎসাসুরের মত আচরণকারিণী অন্য গোপীকে বধ করিতে লাগিলেন, অন্যা গোপী বকাসুরের ন্যায় আচরণকারিণী গোপীর প্রাণবিনাশে রত হইলেন।

অপর যদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ দূরগত গাভী-সকলকে আহ্বান করিয়া বংশী বাজাইতেন, একজন গোপী তদ্রূপে তাঁহার অনুকরণ করত বংশীধ্বনি করিতে করিতে ক্রীড়া আরম্ভ করিলে, অন্যান্য গোপীগণ সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অপর গোপী কোন গোপীর স্কন্ধে হস্তস্থাপন পূর্ব্বক কৃষ্ণগত চিত্তা হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, অহে গোপীগণ! আমি কৃষ্ণ, আমার মনোহর গতি অবলোকন কর।

অপর "তোমরা বাতবৃষ্টিতে ভয় পাই-ওনা, তাহা হইতে তোমাদের পরিত্রাণ বিধান করিতেছি" এই কথা বলিয়া অতিশয় যত্নে এক হস্তে আপনার উত্তরীয় বসন উপরিভাগে ধারণ করিলেন। অন্য একজন গোপী, আর একজন গোপীর উপরে আরোহণ করিয়া, আপনার চরণ দ্বারা তদীয় মস্তক আক্রমণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, "অরে কালিয়নামক দুষ্ট সর্প! এখান হইতে পলায়ন কর, তুই জানিস্ না, আমি খলদিগের উপর দণ্ড ধারণার্থ জন্মগ্রহণ করিয়াছি।"

সেখানে আর একজন গোপী কহিতে লাগিলেন "অহে গোপগণ! ভয়ানক দাবানল অবলোকন কর, শীঘ্র নয়ন নিমীলিত কর, আমি তোমাদের কল্যাণ বিধান করিব।

অন্য গোপী "ভাণ্ডভেদি নবনীত চৌরকে বন্ধন করি" বলিয়া আর এক গোপীকে মাল্য দ্বারা উদূখলানুকারিণী কোন গোপীতে বন্ধন করিলেন। সেই বরাঙ্গী ভীতা হইয়া বদন আচ্ছাদন করত তদ্রূপানুকরণ করিতে লাগিলেন।

তৎপর গোপীগণ পুনরায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের পদ চিহ্ন দেখিতে পাইলেন। সেই অবলাগণ বলিলেন "হে সখীগণ! এই সকল গোবিন্দপদারবিন্দ-রেণু অতিশয় পুণ্য, যেহেতু ব্রহ্মা, মহেশ এবং রমাদেবী পাপাপনোদন নিমিত্ত, ঐ সকলকে মস্তকে ধারণ করেন। হে সখীগণ! আমার এরূপ কহিবার তাৎপর্য্য এই, আমরা এই সকল রেণুতে অভিষিক্ত হই আইস, এতদ্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইতে পারিব"।

এই সকল গোপীগণের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণেই অর্পিত ছিল, তাঁহার কথাই তাঁহাদের আলাপ, তাঁহার চেষ্টাই তাঁহাদের চেষ্টা, এইরূপ সর্ব্বতোভাবে তন্ময়ী হইয়া ছিলেন; তাঁহার গুণসকলই তাঁহারা গান করিতেছিলেন। সুতরাং, এইরূপ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি না হইলেও, তাঁহারা গৃহ স্মরণ করিলেন না। সংসারে এইরূপ ভক্তেরও গৃহের কথা স্মরণ হয় না। সে যাহাহউক গোপীগণ পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া ও তাঁহার গুণ গান করিয়া, কিছুতেই তাঁহার দর্শন না পাইয়া, একান্ত অধীরা হইলেন, এবং শেষে আর কি করিবেন? অবলার যাহা সম্বল, তাহাই করিলেন।

"ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শন লালসাঃ॥"
(ভাগবত, ১০।৩২।১)

অর্থাৎ, গোপীগণ এইরূপে শ্রীকৃষ্ণের গুণ উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া ও নানা প্রকার বিচিত্র প্রলাপ করিয়া, তাঁহার দর্শন না পাইয়া, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লালসা অতিশয় বলবতী হওয়ায়, তাঁহারা সকলে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে জগন্মোহন বনমালী সস্মিতবদনে তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূত হইলেন।

পাঠকগণ! এক্ষণে বিবেচনা করুন, গোপীগণের এইরূপ উৎকট তীব্র অনুরাগ কাম হইতেই উদ্ভূত হউক, অথবা রাসলীলা রূপকই হউক, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতিবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। শ্রীভগবানের প্রতি যে কাম, তাহা সর্ব্বদা নিষ্কাম, কেবলই "মধুরং মধুরং মধুরং"। রূপক হইলেও এইরূপ অনুরাগ লাভ করা ও লাভ করিতে চেষ্টাকরাই জীবের কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মসঙ্গীতে আছে "প্রভু, বিনা অনুরাগ, ক'রে যজ্ঞযাগ, তোমারে কি যায় জানা?"

শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের শেষ দ্বাদশ বৎসরের দিব্যোন্মাদ ও প্রলাপ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে পাঠ করিলে, গোপীগণের বিরহের আতিশয্য বুঝা যাইতে পারে।

অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে তেত্রিশ প্রকার

ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে উন্মাদ একটী প্রধান ভাব। গোপীগণের ও গৌরাঙ্গের এই ভাবের নাম উন্মাদ। মহাপ্রভু নিজে অভিনয় করিয়া, উন্মাদ ভাব বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি নিজে বাস্তবিক উন্মাদ হয়েন নাই। তাঁহার অন্তর্ধানের কিছু পূর্ব্বে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের তরজার অর্থ অন্যে বুঝিতে পারে নাই, তিনিই তাহার অর্থ করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীনাথ পাল।

ব্রজধাম।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রে শ্রীব্রজধাম, আধ্যাত্মিক লীলাক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু ইহাকে রাজনৈতিক লীলার অন্যতম ভূম বলিয়া আখ্যাত করিলে ইতিহাসের অবমাননা করা হয় না। হিন্দু রাজত্বকালে সূর্য্য-বংশীয় মহারাজা ধনেশচন্দ্র এবং চন্দ্রবংশীয় মহারাজা তারাপীড়, এই ব্রজধামে বহু-বৎসর ব্যাপী প্রবল সমরে লিপ্ত হইয়া-ছিলেন। মৌর্য্যবংশের প্রখ্যাত নরপতি শিলুশেখর, বৃন্দাবনের পার্শ্বস্থ প্রশস্ত প্রান্তরে ঘাদশবর্ষকাল ব্যাপী ভয়াবহ আহবে মাত-রিয়া দৈত্যকে বিনাশ করিয়া স্বরাজ্যকে নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। রাজা কংসের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই স্থানেই সংঘর্ষণ হইয়া-ছিল। শ্রীকৃষ্ণের শত্রুদিগের মধ্যে কংস-রাজা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতম ছিলেন।

ইনি ব্রজধামের এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী নানা স্থানের প্রান্তরে বহুল দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া স্বকীয় রাজ্যকে নিরুপদ্রব করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবশেষে কংস শ্রীকৃষ্ণের হাতে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। হিন্দু পুরাণাদি পাঠ করিয়া দেখিতে পাই, বিলোমার পুত্র কপোতরোমা এবং তাহার পুত্র অণুর সন্তানের নাম অন্ধক। অন্ধকের পুত্র দুন্দুভ, দুন্দুভের সন্তান অহুক, অহু-কের পুত্র উগ্রসেন এবং উগ্রসেনের পুত্র কংস। রাজা উগ্রসেনের সাত পুত্র এবং পাঁচ কন্যা ছিল, দেবকী রাণী কংসের খুল্লতাতপুত্রী সুতরাং ভগিনী। মুসলমান শাসনকালে আরংজেব প্রভৃতি সম্রাটের সহিত ব্রজধামে হিন্দুরা কয়েক বার সংগ্রাম করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধে মুসল-মানের নৃসংসতা অবর্ণনীয়। বৃটীশ শাসন-কালে, ব্রজধামের অন্তর্গত হতারশ (Hatras) নামক স্থানের হিন্দুদুর্গে বহু-সংখ্যক হিন্দুবীর একত্র হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। হাট্রা-শের দুর্গ এখনও বর্ত্তমান আছে, ইহা দেখিবার যোগ্য। রাজার কনিষ্ঠ সহোদরের বিশ্বাস ঘাতকতা বশতঃ হিন্দুসেনারা ইংরাজ-বীরের নিকট পরাজিত হয় এবং অতি অল্প দিন হইল হাট্রাশ ভূম ইংরাজের অধিকার ভুক্ত হইয়াছে।

মথুরার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীন প্রাচীরের "বৃন্দাবন দরওয়াজা" নামক দ্বার দিয়া নগরীর বহির্দ্দেশে আগমন করিলে, অল্পদূরে

পথুরাকুণ্ড নামক একটী স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ও পরিচিত। ইহার পার্শ্বে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুণ্ড এবং কয়েকজন বৈষ্ণব সাধুর আশ্রম দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণাদি পাঠ করিয়া দেখা যায়, চিত্ররথের পুত্র বিদূরথ, বিদূরথের পুত্র শূর এবং তাঁহার পুত্র ভজমন। ভজমনের পুত্র শীণ, শীণের সন্তান ভোজ ভোজের পুত্র হৃদিক। হৃদিকের সন্তান দেবমূহ, তাহার সন্তান সৌর, সৌরের পুত্র বাসুদেব এবং বাসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ প্রসিদ্ধ রাজা প্রদ্যুম্ন, শ্রীকৃষ্ণের পুত্র; প্রদ্যুম্নের পুত্র ও পৌত্রের নাম অনিরুদ্ধ এবং বজ্র। দেবভাগ, দেবশ্রবাস, অণক, কৃঞ্জর, শামক, কঙ্ক, সমীক, বৎসক এবং বৃক ইঁহারা বসুদেবের সহোদর। পৃথা, শ্রুতদেবী, অরুতশ্রবা, শ্রুতকীর্ত্তি এবং রাজধীদেবী ইঁহারা বসুদেবের সহোদরী।

বৃন্দাবনে প্রবেশ পূর্ব্বক চারিদিকে অসংখ্যাসংখ্য বাঙ্গালীকে দর্শন করিয়া এমন বোধহয় না যে আমরা বঙ্গদেশ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমোত্তর প্রদেশে আগমন করিয়াছি। যেদিকে চাও সেই দিকেই বাঙ্গালী আর বাঙ্গালী!! অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে যাত্রীগণ জানিতে পারিবেন, বৃন্দাবনের ষোল আনার মধ্যে বার আনা বাঙ্গালী। এখানে বহুসংখ্যক বাঙ্গালীর বাস হইবার কারণ এই যে, বৃন্দাবনধাম এবং তাহার চতুপার্শ্ববর্ত্তী অনেক স্থান একজন ভারত বিখ্যাত বাঙ্গালীর জমিদারী ভুক্ত। বৃন্দাবন মধ্যে যত মন্দির আছে, তাহার সকল গুলির অপেক্ষা বাঙ্গালী মন্দির অধিকতম সুপরিচিত এবং প্রসিদ্ধ, এই মন্দির "লালা বাবুর মন্দির" নামে প্রখ্যাত, এই মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সুবৃহৎ ও মনমোহন মূর্ত্তি আছে, এই জন্য ইহা কিশেন চাঁদের মূর্ত্তি বলিয়া কথিত হয়। বৃন্দাবনে মন্দিরকে এবং দেবালয়ের আশ্রম সমূহকে "কুঞ্জ" বলে, সমুদয় কুঞ্জ মধ্যে লালা বাবুর কুঞ্জ, সমধিক সম্ভ্রান্ত ও পরিচিত। কাশীধামে মন্দিরকে ছত্র এবং নবদ্বীপে আখড়া কহে, বৃন্দাবনে ইহাদের প্রধান নাম "কুঞ্জ"। লালা বাবুর কুঞ্জের নাম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপরিচিত।

যে ভক্তাধিক ভক্ত মহাপুরুষের অর্থে ও যত্নে বৃন্দাবনে কিশেন চাঁদের মন্দির, গৌড়ীয় জমিদারী সম্পত্তি, বাঙ্গালীর গৌরব ও সম্ভ্রম এবং সুবৃহৎ কুঞ্জ সমূহ পরিদৃষ্ট হয়, তাঁহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ; এই ভক্ত মহাত্মা "লালা বাবু" নামে প্রসিদ্ধ। ইনি মুর্শিদাবাদ জেলান্তর্গত কান্দিবাসী উত্তররাঢ়ী কায়স্থজাতীয় রাজবংশের অত্যুত্তম অলঙ্কার। এই বংশের আদিপুরুষের নাম অনাদিবর সিংহ। আমরা নিম্নে এই প্রাচীন ও প্রখ্যাত রাজবংশের একটি তালিকা প্রদান করিয়া লালা বাবুর পূর্ব্ব পুরুষদিগের নামের পরিচয় দিতে আকাঙ্খা করি। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে অনাদিবর সিংহ এই রাজবংশের প্রথম (আদি) পুরুষ, পরবর্ত্তী পুরুষ সমূহের নাম গুলি পরে পরে প্রকাশ করা গেল। অনাদিবর, সূর্য্যধর, বিশ্বরূপ, বরাহ, ভৈরব, ভোরন, ইমন্ত্রি লক্ষীবর, ব্যাসসিংহ, বনমালী, শ্রীপতি,

বিনায়ক, লক্ষ্মীধর, রুদ্রসিংহ, গণপতি, জীবধর, লোহাগড়, রামচন্দ্র, উদয়, গৌরীধর, বিষ্ণুদাস এবং হরেকৃষ্ণ সিংহ। পূর্ব্ববর্ত্তী নাম গুলির মধ্যে লক্ষ্মীধর সিংহ সর্ব্বপ্রথমে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহার সময় হইতে কান্দির কায়স্থবংশ রাজবংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিয়াছেন। রাজা হরেকৃষ্ণ সিংহ মহাশয় লালা বাবুর বৃদ্ধ প্রপিতামহ। হরেকৃষ্ণের পুত্র বিহারী, বিহারীর পুত্র দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ, গঙ্গাগোবিন্দের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ এবং প্রাণকৃষ্ণের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালা বাবু)। কৃষ্ণচন্দ্র সিংহের পরবর্ত্তী পুরুষগণ বর্ত্তমান আছেন, ঐ বংশের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ (লালা বাবু)
।
শ্রীনারায়ণ সিংহ

প্রতাপচন্দ্র	ঈশ্বরচন্দ্র
।	।
শরচ্চন্দ্র	ইন্দ্রচন্দ্র, অধরচন্দ্র
।	।
বীরেন্দ্র, জিতেন্দ্র,	অরুণচন্দ্র

কান্দিরাজবংশের তালিকায় ব্যাসসিংহ নামে যে পুরুষের নামোল্লেখ করা হইয়াছে, ইনি রাজা বল্লাল সেনের প্রধান সচিব ছিলেন। প্রায় আটশত বৎসর পূর্ব্বে কান্দির উত্তররাঢ়ী কায়স্থবংশের সূত্র পাত হয়। ব্যাসের পুত্র বনমালী সিংহ কান্দি গ্রামকে নগরে পরিণত করেন। রাজা হরে কৃষ্ণসিংহ অনেক স্থানে সম্পত্তি খরিদ করিয়া কান্দিবংশের যথেষ্ট আয়বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বৃদ্ধাবস্থায় "ভেক" ধারণ করিয়া উদাসী বৈরাগী হইয়াছিলেন। হরেকৃষ্ণ সিংহের অন্যতম পুত্র গৌরাঙ্গ সিংহ কান্দি রাজধানীর বর্ত্তমান বিখ্যাত রাধাবল্লভ জিউ মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাতা। যাহা-হউক, কান্দিরাজবংশের অনেকে বহু পূর্ব্বকাল হইতে কলিকাতার সন্নিহিত পাইকপাড়ায় বাস করিতেছেন, এখানে ইঁহারা পাইকপাড়ার রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ভক্ত লালা বাবুর নাম ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র সুপরিচিত। হিন্দুসমাজে লালা বাবুর নাম গার্হস্থ্য শব্দ সমতুল্য। প্রথিত আছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ এক সময়ে এক জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন, তথা হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে পথিমধ্যে একস্থানে পাল্কী বেহারারা শিবিকা নামাইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতেছিল। ঐ পথের পার্শ্বে এক ধোবার কুটীর ছিল; সায়ংকালে রজকেরা তাহাদের "ভাটি"তে আগুণ দিয়া বস্ত্রাদি পরিষ্কার করিবার মশালার পাত্র জলসহ অগ্নিতাপে স্থাপন করে। বাঙ্গলাদেশের কোনও কোনও স্থানে ধোবারা "ভাটি"কে 'মানস' বলে; সন্ধ্যা প্রায় অতীত, অথচ মানসে আগুণ জ্বালান হয় নাই দেখিয়া রজককন্যা তাহার পিতাকে সম্বোধন করিয়া কহিল "বাবা! মানসে আগুণ দাও"। ঠিক এই সময়ে লালা বাবু সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়া হরিনামের মালা হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক জপ করিতেছিলেন, রজক কন্যার ঐ মধুময়ী কথাটা তাঁহার প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিল, তিনি

চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "সত্য, সত্য! ধন্য, ধন্য! বাস্তবিক দিন গেল, সন্ধ্যা হলো, কিন্তু আমি আমার মনসে আগুন দিই নাই; মানসকে না পোড়াইলে হরি পাওয়া যায় না!" শুনা যায়, তিনি আর রাজবাটীতে প্রত্যাগমন করেন নাই, ঐ স্থান হইতেই পদব্রজ শ্রীবৃন্দাবনধামে উপস্থিত হয়েন।

বৃন্দাবনে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি ভেক ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি মুণ্ডিত মস্তকে; নগ্নপদে, সামান্য মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া, ব্রজধামে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ক্রমে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বৃন্দাবনে জমিদারী খরিদ করেন এবং ঐ জমিদারীর আয় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কুঞ্জের ব্যয় জন্য, দীন দুঃখীর উপকারার্থে এবং ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, অতিথি প্রভৃতির অন্নসংস্থান জন্য উৎসর্গ করিয়া দেন। এখনও ঐ জমিদারী এবং জমিদারী কাছারী বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই বিস্তৃত সম্পত্তির আয়ের একটি কপর্দ্দকও তাঁহার গৃহে যায় না, সমুদয় টাকাই নিষ্কামভাবে দেবসেবার এবং পরোপকারে ব্যয়িত হইয়া থাকে। কি আশ্চর্য্য স্বার্থত্যাগ!!

বৃন্দাবন দর্শন এবং বৃন্দাবনে-বাস করিবার জন্য লালা বাবুর প্রাণ নিতান্তই বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল। জনৈক সুকবি লালা বাবুর প্রেমসঞ্চার সম্বন্ধে যে সুমধুর গীত গাহিয়াছেন আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করা সুসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করি। গানটি এই—

কতদিনে হবে সে প্রেমসঞ্চার।
বলবো হরি নাম, শুনবো গুণ গান,
অবিরাম নেত্রে হবে প্রেমধার॥
হরি হরি কবে বলিবে রসনা,
জাগিতে ঘুমাতে করিব জপনা,
কবে হবে যুগল মন্ত্রে উপাসনা,
বিষয় বাসনা ঘুচিবে আমার॥
কতদিনে হবে শুদ্ধ মম কায়া,
কতদিনে যাবে গর্ব্ব মোহ মায়া,
কতদিনে হবে সর্ব্ব জীবে দয়া,
জ্ঞানাঞ্জনে যাবে নয়ন অন্ধকার।
কবে যমুনার প্রতি গলি গলি,
প্রেমে বেড়াইব হরি হরি বলি,
প্রেমভরে পিব করি পুটাঞ্জলি,
অঞ্জলি অঞ্জলি জল যমুনার॥
প্রেমে পাগল হয়ে হাসিব কাঁদিব,
সচ্চিদানন্দ সাগরে ভাসিব,
আপনি মাতিয়ে সকলে মাতাব,
হরিপদে নিত্য করিব বিহার॥

ব্রজধামে বাস কালে, মহামতি লালা বাবু ভিক্ষা করিয়া দিনযাপন করিতেন; পিপাসিত হইলে অঞ্জলি দ্বারা যমুনার জল পান করিতেন এবং কখনও কখনও রাত্রে একাকী যমুনা তটে অথবা বৃক্ষতলে সুনিদ্রা সুখ উপভোগ করিতেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার মুণ্ডিত মস্তকোপরে মধু ও যব প্রভৃতি শস্য ছড়াইয়া দেওয়া হইত, কাক প্রভৃতি পক্ষিগণ তাঁহার মাথায় উপবেশন করিয়া নির্ভয়ে মধু ও শস্যাদি গ্রহণ করিত। মহাত্মা লালা বাবু ক্ষুধিত হইলে যতটুকু খাদ্য ক্ষুধা দমনের জন্য প্রয়োজন ততটুকুর অধিক কখনও ভিক্ষা

করেন নাই। তাঁহাকে লোকে "অবতার" বলিত, সমগ্র হিন্দুস্থানে লালা বাবু এখনও বৈরাগ্যের সাক্ষাৎ অবতার বলিয়া সম্মানিত হইয়া আছেন।

তিনি ক্রমে ক্রমে যখন জীবন্মুক্ত অবস্থায় উপনীত হয়েন তখন বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া—লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া—পর্ব্বত প্রান্তে, অরণ্য প্রান্তে, বাস করিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন——

নগর চেয়ে কানন ভাল,
　　　নাইকো হেথায় কোলাহল।
ভক্তিভরে মধুর সুরে, মনরে আমার হরিবল॥
প্রতিধ্বনি গভীর সুরে, বল্‌বে হরি দূরে ঘুরে,
বনের পাখি বল্‌বে হরি,
　　　তুল্‌বে প্রেমে কুসুমদল॥

যাহা হউক, ব্রজধামে লালা বাবুর নাম বাঙ্গালীকুলের গৌরব এবং সমগ্র হিন্দু জাতির অমর সম্ভ্রম বলিয়া গণ্য। ব্রজেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কৃপায় লালা বাবুর কৃষ্ণচন্দ্র নাম সার্থক হইয়াছিল; এরূপ মহাপুরুষ সকল দেশ, সকল জাতি এবং সকল সমাজেরই মহামূল্যবান ভূষণ।

মহামতি লালা বাবুর মত বহু সহস্র ভক্ত পুরুষ এবং ভক্তিময়ী রমণী শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া মুক্তিধনের অধিকারী হইয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণ কহিয়া থাকেন, বৃন্দাবনের তরু সমূহ কল্পবৃক্ষ এবং ইহার ধূলি গোপিকার পবিত্র পদরজঃ। জগদ্বিখ্যাত শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুপাদ লিখিয়াছেন "ব্রজধাম চিন্তামণিময় ক্ষেত্র" শাস্ত্রকারেরা বলেন স্পর্শমণির স্পর্শে যেমন [illegible] সুবর্ণ হইয়া যায়, চিন্তামণি হস্তে ধারণ করিয়া যাহা কিছু চিন্তা করা যায় তাহাই সফল হয়; এই পবিত্র ব্রজধাম প্রকৃত ভক্তের পক্ষে চিন্তামণি স্বরূপ।

একজন সুপ্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ লিখিয়াছেন

"আমরা যাহা কিছু আহার করি, যাহা কিছু দর্শন বা শ্রবণ করি, যাহা কিছু পাঠ বা চিন্তা করি, যাহা কিছু স্পর্শ বা আস্বাদন করি, এবং যে সকল স্থানে ভ্রমণ করি, ইহাদের প্রত্যেক পদার্থ আমাদের শরীর, মন, মস্তিষ্ক ও আত্মার উপরে অল্প বা অধিক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে।" সেই কারণে সাধুসঙ্গ যেমন বাঞ্ছনীয় তেমনি পবিত্র তীর্থস্থান সমূহ দর্শন এবং তাহাতে কালযাপন ও পরিব্রজন, আমাদের বিশিষ্ট কল্যাণের কারণ বলিয়া গণ্য হয়। সমরেচ্ছু অর্জ্জুন যুদ্ধের সমুদয় উপকরণ সঙ্গে লইয়া, কুরুক্ষেত্র আহবে যুদ্ধার্থে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাপবিত্র ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের স্থান মাহাত্ম্যে তাঁহার মনে সাত্বিক ভাবের উদয় হওয়ায় তিনি তীর ধনুঃ পরিত্যাগ পুরসরঃ বিগলিত হৃদয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রজধামের প্রাকৃতিক শোভা, সাধুসঙ্গ, হরিভক্তি, স্বাস্থ্যপ্রদ জলবায়ু, আধ্যাত্মিক লীলা প্রভৃতি কাহার না মনে সাত্বিক ভাবের উদয় করে? বৃন্দাবনের শোভাও নিতান্ত চিত্তহারিণী।

বৃন্দাবনং দিব্যলতা পরীতং
লতাশ্চ পুষ্পস্ফুটিতাগ্রভাজঃ।
পুষ্পানি চ স্ফীত মধুব্রতানি
মধুব্রতাশ্চশ্রুতিহারিগীতাঃ॥

কচিদ্ভৃঙ্গীগীতং কচিদনিলভঙ্গী শিশিরতা।
কচিদ্ বল্লীলাসং কচিদ্ মলমল্লীপরিমলঃ॥
কচিদ্ধারাশালীকরককলপালীরসভরো।
হৃষীকাণাং বৃন্দং প্রমদয়তি বৃন্দাবনমিদং॥

ব্রজধামের মানস সরোবর নামক নির্জ্জন স্থান, পানিঘাট নামক তপোবন, ললিতাকুণ্ড, বিশখাকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, গোবিন্দকুণ্ড, জগৎ শেঠের ঠাকুর বাড়ী, রঙ্গজীর উদ্যান, গরুড়স্তম্ভ, বাউড়ী আশ্রম প্রভৃতি নিতান্ত শোভার আকার। আর স্বয়ং শ্রীধাম বৃন্দাবনের শোভার ত শেষই নাই; শ্যামসলিলা কালিন্দী তীরস্থিতা শ্রীবৃন্দাবন ভূমির শোভা ভক্তের চক্ষে ভূস্বর্গের শোভা হইতেও অধিকতর প্রসাদময়ী।

"রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, গিরি গোবর্দ্ধন।
মধুর মধুর বংশী বাজে, এই ত বৃন্দাবন।"

"পঞ্চকোশী পরিক্রমণ" নামক প্রসিদ্ধ পুরাতন বৈষ্ণবগ্রন্থে শ্রীবৃন্দাবনের নানা স্থানের দর্শনীয় পদার্থ যুক্ত সম্বন্ধে ভক্তেরা যাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

প্রথমে শ্রীযোগপীঠ করিহ দর্শন।
শ্রীরাধাগোবিন্দ রাধার মদনমোহন॥
তবে শ্রীগোপীনাথ জগমনোহারী।
বামে শ্রীজাহ্নবী জীউ দক্ষিণে কিশোরী॥
তার পর সর্ব্বস্থান করিব দর্শন।
ক্রমে ক্রমে দেখিব ও সব বৃন্দাবন॥
সরস্বতীকুণ্ড আর দাবানলকুণ্ড।
বলভদ্রকুণ্ড যার প্রতাপ প্রচণ্ড॥
আদিবরাহ আর মদনটের জবাটবী।
গৌতরি আশ্রম হয় আর মধুটবী॥
অম্বিকা কানন বড় দেখিতে সুন্দরে।
অক্রুর কদম্ব হয় কালীদহতীরে॥
ফলপুষ্প তীর্থস্থানে সমর্পিত করি।
দ্বাদশ আদিত্য ঘাটে বন্দনা আচরি॥
পরেতে গোপালঘাট সূর্য্যঘাট আর।
শ্রীযুগল ঘাট বড় দেখিতে সুন্দর॥
মণিতে রচিত ঘাট দেখিতে বিস্তর।
বেহারি ঘাটের হয় মহিমা বহুতর॥
দ্বাপরের তরু শ্রী আমলীতলা নাম।
আপনে শ্রীমহাপ্রভু করিলা বিশ্রাম॥
শ্রীশিঙ্গার বট সে যে অতি রম্য স্থান।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ যাহা বিরাজমান॥
তবে শ্রীগোবিন্দঘাট পরে চারি ঘাট।
শ্রীভ্রমরঘাট বহু কৃষ্ণ কৈল নাট॥
পরেতে কিশোরীঘাট করি দরশন।
তবে যাব কেশীঘাটে হর্ষযুক্ত মন॥
মণিকর্ণিকার ঘাট অতি গূঢ়তর।
বাঞ্ছাপূর্ণকারী সর্ব্বতীর্থের ঈশ্বর॥
শ্রীরাধারমণ প্রভু রূপ প্রেমময়।
আপনে প্রকাশ হইল ভক্তের ইচ্ছায়॥
শ্রীনিধুবন তার মহিমা অধিকা।
রাজধানী স্থানে রাজা হন শ্রীরাধিকা॥
শ্রীআঁধারিয়া বট করি দরশন।
শ্রীবংশীবটে গিয়া করিব প্রার্থন॥
শ্রীগোপেশ্বর জগতের হিতকারী।
বৃন্দাবনে বাস যেহ দেন কৃপা করি।
দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র করিলেন লীলা।
কৃষ্ণদাসে কৃপা করি প্রকট হইলা॥
অপূর্ব্ব মন্দিরশোভা সুশ্বেতপ্রস্তরে।
এমন মন্দির নাহি ব্রহ্মাণ্ডভিতরে॥
মন্দিরের নাট্যশালা জগমনোহারী।
একমুখে সেই শোভা বলিতে না পারি॥
কিশোর বয়সে প্রকট রত্নবেদি'পরি।
দক্ষিণে ললিতা শোভে বামে শ্রীকিশোরী॥

শ্রীপুলিন গোপেশ্বর শ্রীব্রহ্মকুণ্ডে বেড়া।
মধ্যে শ্রীমন্দির যেন সুমেরুর চূড়া॥
শ্রীশ্রী সেবা পরিপাটী সদাই আনন্দ।
প্রেমসেবারবশহইয়াপ্রকট কৃষ্ণচন্দ্র॥
শ্রীব্রহ্মকুণ্ড করেন সর্ব্বজীবহিত।
দর্শন স্পর্শন স্নানে জগত পবিত্র॥
ব্রহ্মকুণ্ডবাসী হন যত সাধুজন।
পরম বৈরাগ্য সব নিত্যসিদ্ধ হন॥
শ্রীগোপীনাথের বাগে হন যতেক বৈষ্ণব।
বৈরাগ্যতা পার হন নিত্যসিদ্ধ সব॥
শ্রীমদনমোহনের বৈষ্ণব আছে যত।
শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী সব পরম পণ্ডিত॥
পুলিন গভীর বন রাধাবাগ নাম।
যাহাতে বিরাজ করেন শ্রীরাধাশ্যাম॥
শ্রীগোবিন্দকুণ্ড আর কেয়ারিকা কুণ্ড।
তথায় থাকেন বৈষ্ণব প্রতাপ প্রচণ্ড॥
নির্ম্মৎসর নিরপেক্ষ বৈরাগ্যের সীমা।
অন্তর্মনা প্রেমসেবা অতুল মহিমা॥
শ্রীগিরিধারী আর শ্রীগোপাল দেব।
শ্রীচিকনিয়া শ্রীবনখণ্ডী মহাদেব॥
নিভৃত নিকুঞ্জবন কৃষ্ণের বিলাস।
নিশীথসময়ে সেই স্থানে নিত্য রাস॥
শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু সদা সীতার সহিতে।
বিরাজ করেন সদা জীব উদ্ধারিতে॥
পূর্ণমাসী ঠাকুরাণী হন সেই থানে।
রাধাকৃষ্ণ লীলা সহকারী রাত্রি দিনে॥
শ্রীরাধা দামোদর শ্রীশ্যামসুন্দর।
গোকুলানন্দ রাধাবিনোদ ব্রজ মনোহর॥
শ্রীকুঞ্জবিহারী বঙ্কবিহারী রাধাশ্যাম।
বৃন্দাবনচন্দ্র হরি দেব সুখধাম॥
বলরামচন্দ্র শ্রীমুরলী মনোহর।
শ্রীরাধামোহন নন্দকিশোর নটবর॥
কেশব রাধামাধব জানকীরমণ।
সজল চিকণ রাধাবল্লভমোহন॥
গোবিন্দ গোপাল আর নিত্য গোপাল।
চতুর শিরোমণি আর গৌর গোপাল॥
পুলীন বিহারী আর অনন্ত বিহারী।
ললিত মাধব নৃসিংহদেব মনোহারী॥
কালীয় দমন আর নর্ত্তন গোবিন্দ।
রাধা ব্রজানন্দ শৃঙ্গার বিহারী নন্দ॥
বৃন্দাবনে রাসলীলা সদাই আনন্দ।
চৌদিকে যুগল মাঝে শ্রীরাধা গোবিন্দ॥
শ্রীযমুনা পাটরাণী আছেন বেষ্টিত।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলায় সর্ব্বদাই প্রীত॥
বৃন্দাবনে কত ভক্ত আছেন নির্জ্জনে।
রাধাকৃষ্ণের লীলাতে থাকেন রাত্র দিনে॥
ব্রজধামে বাস কিম্বা বৃন্দাবনে মরণ।
বহু পুণ্যে ঘটে তাহা, অনন্ত জীবন॥

সমাপ্ত।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

প্রাণতত্ত্ব।

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

ফলতঃ পরম করুণাময় মহাপ্রাণরূপ পরমব্রহ্ম অন্নপ্রাণ জীবকে তাহার সেই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহটিকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ভাণ্ডারে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। পরন্তু সিদ্ধ মহাপুরুষ বা ব্রহ্মজ্ঞানীর নিকট সেই মহাপ্রাণ বা পরব্রহ্ম ও অন্নপ্রাণ বা জীবে কোন পার্থক্য নাই। সাধকের পক্ষে বা সাধনা কালে উহা অন্তরূপ।

সাধনা কালে জীবের সেই পরম মহাতত্ত্বে যতদিন সমাধি না হয় ততদিন "যত্র হিদ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি, তদিতর ইতরমভিবদতি, তদিতর ইতরং বিজানাতি, যত্র বা অস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং শৃণুয়াৎ, কেনকমভিবদেৎ, কেনকং মন্বীৎ, তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিতি।

জীবের ব্রহ্মে বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত না হইলে একজন ঘ্রাণ কর্ত্তা অপরে ঘ্রাণের বিষয় একজন শ্রবণ কর্ত্তা অপর শ্রবণীয় বিষয়, একজন দ্রষ্টা অপর দর্শনীয় বিষয়, একজন মনন কর্ত্তা ও অপর মননীয় বিষয়, একজন জ্ঞাতা অপর জ্ঞানের বিষয় ইত্যাদি প্রকারে ভিন্নভিন্ন বৃত্তি ও ভিন্নভিন্ন বোধই থাকে। কিন্তু ব্রহ্মে বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইলে এক জ্ঞানহেতু কে কাহার ঘ্রাণ লইবে, কে কাহাকে দর্শন করিবে কে কাহার বিষয় শ্রবণ করিবে কে কাহার বিষয়ে বলিবে বা কে কাহার বিষয় আলোচনা করিবে। যাঁহাকে জানিলে সমস্তই জানা যায় তাঁহাকে জানিতে হইলে জীব আর কাহার সাহায্য গ্রহণ করিবে। যিনি সর্ব্বজ্ঞ তাঁহার আবার বিজ্ঞাতা কে? সেই জন্যই শ্রুতি উপদেশ দিয়া থাকেন "আত্মনা আত্মানং পশ্যেৎ।"

শ্রুতি প্রণবকে উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া থাকেন এইজন্য প্রণবের অপর একটি নাম উদ্গীথ। এই উদ্গীথই আদিত্য স্বরূপ। পুনরপি আদিত্য ও প্রাণে কোন পার্থক্য নাই। যিনি আদিত্য রূপী উদগীথের উপাসনা করেন তিনি জন্ম মরণাদি লক্ষণ আত্মভয় ও তাহার কারণ অজ্ঞান হইতে উত্তীর্ণ হ'ন। গুণাগুণ বিবেচনা করিলে প্রাণ ও আদিত্যের তুল্য আদিত্যদেব আবার প্রাণের তুল্য। কেন উভয়ে উষ্ণ গুণ ধর্ম্মাবলম্বী। শরীর মৃত হইলে "প্রাণ" আর ফিরিয়া আসেন না এইজন্য প্রাণকে স্বর বলে কিন্তু আদিত্যদেব প্রত্যহ প্রত্যাগমন করেন বলিয়া আদিত্যদেবকে স্বর ও প্রত্যাস্বর বলে। গুণ ও নাম বিবেচনা করিলে প্রাণ ও আদিত্য তুল্যরূপ তত্ত্বতঃ উহাতে কোন ভেদ নাই। সেই হেতু প্রাণ ও আদিত্যদেবকে উদ্গীথ জ্ঞানে উপাসনা করিবে। শ্রুতি আরও বলিয়াছেন "প্রাণের" বৃত্তি বিশেষ ব্যানাদি, ও উদ্গীথ জ্ঞানে উপাসনা করিবে। মুখ ও নাসিকা দ্বারা যখন বায়ু বহির্দ্দেশে নিঃসারিত হয় তখন তাহাকে "প্রাণ" বলে। মুখ ও নাসিকা দ্বারা বায়ু যখন অন্তরে আকৃষ্ট হয় তখন তাহাকে অপান বলে। প্রাণ ও অপানের সন্ধিস্থ বৃত্তিই ব্যান। প্রাণ, অপান ও ব্যানের পরিভাষা নির্ণয়ে দার্শনিক পণ্ডিতগণ ও ক্রিয়াশীল যোগীদিগের মধ্যে একটু মতভেদ দৃষ্ট হয় কিন্তু উহা কাল্পনিক। তত্ত্বতঃ উহাতে কোন প্রভেদ নাই। অপান, ব্যানাদি সমস্ত বায়ু একই প্রাণের বৃত্তি বিশেষ। সাম-শ্রুতি প্রভৃতি উচ্চারণ আদি বাক্যরূপ কার্য্য, উহা ব্যানের ব্যাপার। ব্যান বায়ু বীর্য্যবৎ কর্ম্মহেতু। যাহা ব্যান তাহাই বাক্য স্বরূপ। বাক্যেই কার্য্যত্ব ব্যান বায়ুর

উপর নির্ভর করে। সুতরাং প্রাণ ও অপান-এর ব্যাপার অপেক্ষা না করিয়াও ব্যানের কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে। ব্যানের কার্য্য প্রবাহ কালে, উপাসনা শ্রুতি মন্ত্রউচ্চারণ প্রভৃতি কার্য্য ভিন্ন অন্য কোন কার্য্য হইতে পারে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে প্রাণ ও অপান বায়ু সংযত হইলে বৃত্তি বা প্রবাহ বিশেষ জ্ঞাপক বায়ুই ব্যান বায়ু। এইজন্য ব্যানের কার্য্য বিশেষ বীর্য্যবান্। তদ্ধেতু ঋষিগণ গান করিয়া থাকেন।

"সমান উ এবায়ঞ্চাসৌ চোষ্ণোঽয়মুষ্ণোঽসৌ স্বর ইতীম মাচক্ষতে স্বর ইতি প্রত্যাস্বর ইত্যমুং তস্মাদ্বা এতমি মমমুদ্গীথ মুপাসীত।"

"অথ খলু ব্যান 'মবোদ্গীথ মুপাসীত যদ্বৈ প্রাণিতি স প্রাণোযদপানিতি সোঽপানঃ। অথ যঃ প্রাণাপানয়োঃ সন্ধিঃ স ব্যানো যো ব্যানঃ সাবাক্। তস্মাদপ্রাণন্নপানন্ সাম গায়তি যৎ সাম স উদ্গীথ স্তস্মাদপ্রাণন্নপানন্নুদ্গায়তি॥"

"অতো যান্যন্যানি বীর্য্যবন্তি কর্ম্মাণি যথাগ্নের্ম্মন্থনমাজেঃ সরণং দৃঢ়স্য ধনুষ আয়মনম প্রাণন্নপানংস্তানি করোত্যে তস্য হেতোর্ব্ব্যানমেবোদ্গীথ মুপাসীত॥"

আরও কথিত আছে প্রাণ ও অপানে রজ্জুবদ্ধ শ্যেনের ন্যায় একটি সম্বন্ধ আছে "অপানঃ কর্ষতি প্রাণং প্রণোঽপানঞ্চ কর্ষতি। রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ। তথা চৈতৌ বিষম্বাদে সম্বাদে সন্ত্যজেদিমম্॥" অপান ও প্রাণ বায়ু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। যেমন শ্যেন পক্ষী রজ্জুবদ্ধ হইয়া উড্ডীন হইলেও তাহাকে যেমন প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইতে হয় সেইরূপ প্রাণ বায়ু ও দেহ হইতে নির্গত হইয়া অপান কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার দেহমধ্যে প্রবেশ করে। এই দুই বায়ুর বিসম্বাদে অর্থাৎ প্রাণবায়ুর ঊর্দ্ধ ও অপান বায়ুর অধঃগমনে জীবের দেহরক্ষা হইয়া থাকে। প্রাণ ও অপানের ত্রিতয় গ্রন্থি ভেদ পূর্ব্বক সম্মিলন এর নাম সমাধি বা মৃত্যু। সমাধি অবস্থায় গ্রন্থি ভেদ ইচ্ছা পূর্ব্বক হইয়া থাকে। কিন্তু মৃত্যুকালে উহা ইচ্ছার অনধীনে প্রাণ ও অপান বায়ু গ্রন্থি ভেদ পূর্ব্বক সম্মিলিত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করে। সমাধি ও মৃত্যুর ইহাই বিশেষ প্রভেদ। সুতরাং প্রাণও আপন সংযোগ কৌশলএর নামই প্রাণায়াম -এবং এই প্রাণায়ামই সমাধি সুখ সম্ভাবের একমাত্র সেতু।

প্রাণবৃত্তি ও মনোবৃত্তি মাত্রে সম্বন্ধ আছে বলিয়া ভগবদ্ভাবমুখ শুদ্ধ সাত্ত্বিক বৃত্তি গুলিই কেবল প্রাণায়াম উপযোগী। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বভাব একমাত্র সৎই নিত্য, অন্য যাহা কিছু সমস্তই অনিত্য; এবংবিধ নিত্যানিত্য বস্তু জ্ঞান ও তদনুকুল যে সমস্ত ক্রিয়া তাহা প্রাণায়ামের উপযোগী। মনের রাজসিক তামসিক বৃত্তি লইয়া প্রাণায়াম হইতে পারে না। দিবারাত্রি অর্থ চিন্তায় জীর্ণ ঘট প্রাণায়ামের উপযোগী নহে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীসতীশচন্দ্র দত্ত।

কবির-চরিত। *

সাক্ষী—

বরিষাইত দিন প্রগটে তাল পুরইন
কে পাত।
বালকরূপ হলষৎ রহেঁ, জোল্‌হা গয়েন
কিয়ে যাত্‌॥ ১

(একদা) বর্ষান্তে দিন প্রকটিত হইয়াছে, (কবির) বালক রূপে সরোবরস্থ পদ্ম-পত্রোপরি হরষিত চিত্তে বসিয়া আছেন, (এমন সময়ে) জনৈক জোল্‌হা "গওনা" করিয়া যাইতেছিলেন।১

* হিন্দীভাষায় হস্তলিখিত পুঁথি হইতে অনুবাদিত "কবির" নামে বঙ্গ-ভাষায় যে সকল গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে তাঁহার কথিত দোঁহা ও উপদেশ ভিন্ন তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় না। অনেক অনুসন্ধানের পর দ্বারভাঙ্গার ৮।১০ ক্রোশ দূরে এক গ্রামে জনৈক কবিরপন্থীর নিকট উক্ত গ্রন্থ দেখিতে পাই। তিনি প্রত্যহ স্নানান্তে ঐ গ্রন্থ পূজা ও পাঠ করিতেন। আমার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া, তিনি ঐ পুঁথির কিয়দংশ নিজে নকল করিয়া দেন। কবিরের জন্মস্থান ও জনক-জননীর নাম এ পর্য্যন্ত জানিতে পারি নাই। যদি কোন পাঠক তাহা অবগত থাকেন, তাহা জানাইলে, অত্যন্ত অনুগৃহীত হইব।

(বিনীত লেখক।)

প্রগট=প্রকট (প্রকাশ) শব্দের অপভ্রংশ।
তাল=হ্রদ।
পুরইন=পদ্ম।
হলষৎ=হরষিত। "র" এর স্থানে "ল" ও "ল" এর স্থানে "র" তদনুরূপ "ভ" এর স্থানে "ল" ও "ন" এর পরিবর্ত্তে "ভ" হিন্দীতে প্রায়ই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।
জোল্‌হা=নিম্নশ্রেণীস্থ মুসলমান। বস্ত্র-বয়ন তাহাদের ব্যবসায়।
গওনা=সাধারণতঃ দ্বিরাগমনকে বলা যাইতে পারে; কিন্তু আমাদের বাঙ্গলাদেশে যেরূপ দ্বিরাগমনপ্রথা প্রচলিত, গওনা ঠিক তদনুরূপ নহে।

চৌপাই।

নীরু জোল্‌হা, মুমা তেঁহি নারী।
জোলহিনীকো জল তৃথা লগারি॥২

সাক্ষী—

নীর পিয়নে কারণে, মুমা জলতটে আও।
বালক দেখি তাসুমন বিসারা জলকি
যাও॥৩
জলমে ধায় ধরী পুনি লেনহেসী মোহি
উঠায়ে।
তেঁহি কি হিয়া হরখ অতি যেসা রঙ্ক
পরধন পায়ে॥৪

জোল্‌হার নাম নীরু এবং তাঁহার স্ত্রীর নাম মুমা। মুমার জলতৃষ্ণা লাগিয়াছিল।২

জলপানের জন্য মুমা জলতটে আসিলেন, কিন্তু বালক দর্শনে জল-পিপাসা বিস্মৃত হইলেন।৩

(মুমা) জলে নামিলেন এবং সন্তরণ দিয়া আমাকে উঠাইয়া লইলেন। অতি দরিদ্র ব্যক্তি পরধন পাইলে যেরূপ আনন্দিত হয়, আমাকে পাইয়া মুমার হৃদয় সেইরূপ উৎফুল্ল হইল।৪

লে মোহি গই স্বামী ঢিগ, স্বামী পুছে তাহি।
কহো তুমারি গোদ মে দেখত দে মোহি তাহি ॥৫

চৌপাই।

নুমা রহেঁ মৌন ভ্যায়ে ডাই।
কহে ন কুছু বোলত সকুচাই ॥৬
জোল্‌হা পুছে বহুত্ রিষাই।
তব্ নুমা মোহি দিন্‌হ দেখাই ॥৭
দেখত জোল্‌হা বহুত রিষানা।

নুমা আমাকে লইয়া* স্বামীর নিকট আসিলে, স্বামী তাহাতে জিজ্ঞাসা করিলেন "নুমা! তোমার কোলে কি আছে, আমাকে দেখাও।"৫

নুমা মৌন হইয়া রহিলেন, সঙ্কুচিত (লজ্জিত) হইয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না।৬

(কিন্তু যখন) জোল্‌হা অত্যন্ত কুপিত হইলেন, তখন নুমা আমাকে দেখাইলেন।৭

তাসু=তাহার। বিসারা=বিস্মৃত হওয়া।
ধসী=সাঁতার দেওয়া। পুনি=পুনরায়।
মোহি=আমাকে।
রঙ্ক=অতি দরিদ্র ব্যক্তি।
ঢিগ=নিকট। গোদ=কোল।

* "সাক্ষী" শব্দটী অনেক গ্রন্থে বঙ্গানুবাদে "প্রত্যক্ষ" লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের এই আলোচ্য গ্রন্থে কবির সাহেব নিজেই নিজের জীবনী বর্ণনা করিতেছেন এবং "সাক্ষী" ও "চৌপাই" ইহাতে যেরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে "সাক্ষী"কে ছন্দ বিশেষ বলিয়াই অনুমিত হয়। সুতরাং বঙ্গানুবাদে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল।
(লেখক।)

কেকর তো বালক হরি আনা ॥৮
বালক ডারি দেশীরে নারী।
ভাই বন্ধু মোহি পারিহে গারি ॥৯
দিহেঁ লোক তোহি দেখে লগাই।
গওনে নারী বালক লিয়ে আই ॥১০

সাক্ষী—

বাল বেগী তু ডারিদে কহঁা মানু তু মোর।
যব্ বিধি হইয়েঁ দাহিনা, তব্ বালক লিহ কৈার ॥১১

আমাকে দেখিয়া জোল্‌হা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "রে নারী! তুই কাহার বালক হরিয়া আনিলি?* শীঘ্র ইহাকে পরিত্যাগ কর্। ভাই বন্ধু সব আমাকে ভর্ৎসনা করিবে; তোর প্রতিও কলঙ্কারোপ করিবে যে, বালক সহিত গওনা করিয়া আসিয়াছে।"৮–১০

আমার কথা মান (পালন কর); এই বালককে শীঘ্র ত্যাগকর। যখন বিধি সদয় হইবেন, তখন (আপন) বালক কোলে করিবে।"১১

সকুচাই=সঙ্কুচিত।
রিষাই=রোষ করিয়া।

* গওনার পূর্ব্বে পুরুষ বা স্ত্রী কেহ কখন শ্বশুর-ভবনে যাইতে পান না। এমন কি, সেই গ্রামে যাইতেও নিষেধ আছে। বিবাহের পর পুরুষ স্ত্রীকে নিজ ভবনে লইয়া যান না, বালিকা পিত্রালয়েই থাকেন। বালিকা যখন যৌবনপ্রাপ্তা হন, তখন "দ্বিরাগমন" ন্যায় প্রথানুযায়ী জামাতা শ্বশুর-বাড়ী আসিয়া বালিকাকে লইয়া যান। সুতরাং গওনার পূর্ব্বে স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর সন্দর্শন একেবারে অসম্ভব। এইজন্যই নীরু ঐরূপ কলঙ্কের আশঙ্কা করিয়াছিল।
(লেখক।)

সুমা কহেঁ বিলখী মন, বালক ডারব নাহি।
ঐসা সুন্দর বালক, নহি দেখি জগ মাহি ॥১২

চৌপাই।

জোল্‌হা কোপি ধরা শির ঝোটী।
অবহি করেঁা তোঁহি বুটী বুটী ॥১৩

সাক্ষী—

স্বামী ত্রাস জোল্‌হিণী দিনহেসী মোহি
তব ডারি।
তব্ হম্ জোল্‌হাসে কহা, পূরবিল কথা
বিচারি ॥১৪

পূরবিল জনম ব্রাহ্মণহত্যা চুকা ভক্তি মঞ্ঝার।
তাতে তুম্‌হ জোল্‌হা ভ্যায়ে, ধরে আনি
অবতার ॥১৫

আব্ তোহরে তারণ কহ আয়ে।
লে চলু গৃহি কা মোহি উঠায়ে ॥১৬

চৌপাই।

জোল্‌হা প্রেম বশাচিত নারীহিঁ আজ্ঞা
দিন্‌হ।
স্বামী আজ্ঞা পায়কে, হুনয়ী গোদ
কয়ে লিন্‌হ ॥১৭

(ক্রমশঃ)

শ্রীযদুনাথ দে।

জাতীয় আদর্শ।

এ সংসারে সকল সভ্য জাতিরই একটি জাতীয় আদর্শ আছে। জাতি বা সম্প্রদায়ের জন-সাধারণ সেই আদর্শ লক্ষ্য করিয়া জীবনবর্ত্মে অগ্রসর হইতে প্রয়াস পায়। আদর্শের প্রাধান্যেই জাতীয় প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। বীরগর্ব্বস্ফুরিত রোম যখন স্বকীয় মহিমালোকে সভ্য জগৎ সুদীপ্ত করিতেছিল, যখন প্রকৃত ন্যায়দণ্ড-ধারী ভূলোক-প্রথিত রোম-সম্রাট্ ব্রুটাস্ অবিকৃত-চিত্তে কৃতাপরাধ পুত্রের প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে পারিয়াছিলেন; বিশ্রুত-কীর্ত্তি গ্রীস যখন বীরত্ব ও ধীরত্বে জাতি-সাধারণকে চমৎকৃত করিয়াছিল,

---

* সুমা বিরসবদনে উত্তর করিলেন "আমি এই বালককে পরিত্যাগ করিব না। এমন সুন্দর বালক আমি এ জগতে কখনও দেখিতে পাই নাই।"১২

জোল্‌হা কুপিত হইয়া সুমার কবরী ধারণ করিয়া কহিল "যদি তুমি ইহাকে পরিত্যাগ না কর, তবে তোমাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিব।"১৩

স্বামীর ত্রাসে সুমা আমাকে কোল হইতে নামাইয়া দিলেন। তখন আমি পূর্ব্বকথা বিচার করিয়া কহিলাম "জোল্‌হা! পূর্ব্ব জন্মে ব্রহ্মহত্যা নিবন্ধন তোমার ভক্তিতে দোষ ঘটিয়াছে, সেইজন্য তোমার জোল্‌হার কুলে জন্মগ্রহণ হইয়াছে; তোমার উদ্ধার জন্যই আমার অবতার গ্রহণ। আমাকে তোমার গৃহে লইয়া চল।"১৪—১৬

জোল্‌হা (তখন) প্রেমাবিষ্ট চিত্তে আমাকে উঠাইয়া লইতে স্ত্রীকে অনুমতি দিলেন এবং স্বামী আজ্ঞা পাইয়া সুমা অত্যন্ত হরষিতা হইয়া আমাকে কোলে লইলেন।১৭

বাল = বালক। বেগী = শীঘ্র। কঁহা = কথা।
দাহিনা = সদয়। বিলখী = বিরস শব্দের অপভ্রংশ।
মাহি = মধ্যে। বুটী বুটী = টুকরা টুকরা।

চুকা = ভ্রম, দোষ। মঞ্ঝার = তে।

তখন ঐ সকল জাতির জাতীয়-জীবনে "জুলিয়াস্ সিজর" "অ্যাকিলিস্" বা "য়্যুলিসিসের" ন্যায় মহাত্মাদিগের আদর্শ-জ্যোতিঃ দৃঢ়-অনুপ্রবিষ্ট ছিল বলিয়াই, তাঁহারা ঐ সকল মহৎকার্য্যে প্রণোদিত ও সফলকাম হইতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ খ্রিষ্টীয়ানের আদর্শ যিশু, মুসলমানের আদর্শ মহম্মদ, ইত্যাদি। এই আদর্শ থাকে বলিয়াই জাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, বা হইতে পারে। প্রত্যুতঃ এই আদর্শের সমীপস্থ হইবার প্রয়াসই জাতীয়-জীবনের সার্থকতা। আর এই আদর্শ, যে জাতির যত উৎকৃষ্ট, যত উন্নত ও মহান্, সেই জাতি সভ্যতার তত উচ্চতর স্তরে সমারূঢ়। ফলতঃ উন্নত আদর্শ ব্যতীত, জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

প্রাচীন হিন্দুজাতির এই আদর্শ ছিলেন "নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ"। সে আদর্শ কত উৎকৃষ্ট!—ভীষ্মের মত সর্ব্ব-গুণধাম রাজর্ষি ও ব্যাসের মত সর্ব্বগুণাধার ব্রহ্মর্ষি যাঁহার অনুসরণ করিতেন! স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন, এরূপ উচ্চ আদর্শ আর কোন জাতিরই নাই। এ আদর্শের সহিত তুলনায় অন্য সকল আদর্শ খর্ব্ব হইয়া পড়ে। কারণ, শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বধর্ম্মবেত্তা, সর্ব্ববলাধার, সর্ব্বপ্রেমময়। একাধারে শাক্যসিংহ, মহম্মদ ও রামচন্দ্র।

আদর্শকে চিরস্থায়ী করিয়া জাতি-সাধারণ্যে প্রচারের জন্য লোকায়ত কাব্য গ্রন্থের আবশ্যক। নিপুণ ভাস্কর যেমন প্রস্তরে কাটিয়া আকৃতির স্থায়িত্ব-সাধনে সফলকাম হয়েন, লোকহৃদয়াভিজ্ঞ বিচিত্র-কর্ম্মা কবিও সেইরূপ অক্ষরে লিখিয়া কাব্যাকারে প্রকৃতির স্থায়িত্ব বিধান করেন। এইরূপে মহাপুরুষের আদর্শ-চরিত-মহিমা তাঁহার নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহের সহিত ধ্বংস-প্রাপ্ত না হইয়া, সুকবির কাব্যালোকে অনন্তকালের জন্য জাগ্রত ও সমুদ্ভাসিত রহিয়া, জাতি-সাধারণকে জলদ-গম্ভীর-স্বরে প্রতিনিয়ত উপনিষদের বাক্যে উদ্‌বোধিত করে—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ
কবয়ো বদন্তি॥"

[কঠোপনিষদ্, তৃতীয়বল্লী, ১৪]

এইরূপে আদর্শ চিরস্থায়ী হয়। কিন্তু লোককে আদর্শের অনুগামী করিতে হইলে, আদর্শ প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই বলা হইয়াছে, লোকায়ত কাব্য গ্রন্থের আবশ্যকতা। যে কাব্য সকলেই পড়ে বা পড়িতে পারে, যাহা সাধারণের সম্পত্তি, যাহা দ্বারা জাতীয় জীবন সংগঠিত হয়, এরূপ লক্ষণাক্রান্ত কাব্য হওয়া চাই। আমাদের 'মহাভারত' এইরূপই এক খানি বিরাট কাব্য গ্রন্থ বটে এবং ঐ গ্রন্থ আর্য্যসন্তানগণের সাধারণ সম্পত্তি ছিল বটে; দেবভাষা সংস্কৃত যখন ব্যবহারিক ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত; সে পবিত্র পুণ্য-যুগ আমাদের গিয়াছে। তৎকালে ঐ গ্রন্থের কৃষ্ণকথা গীত হইয়া ভারতীয় জনগণকে কৃষ্ণভক্ত করিয়া, সেই মহাদর্শেরই অনুগামী করিত। তাহাতেই জাতীয়উন্নতি সংসাধিত হইত।

কিন্তু কালচক্রের অনুল্লঙ্ঘনীয় আবর্ত্তনে

জাতীয়-হৃদয়-বিকৃতির সহিত জাতীয় আদর্শও ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে! মহাকবি বেদব্যাসের সে বিরাট কাব্য মহাভারত, প্রক্ষিপ্ত-সঙ্কুল ও সাধারণের বোধাতীত এক অতীন্দ্রিয় পদার্থে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভারত-ভূমির সে পবিত্র জ্যোতিঃ ম্লান-মৌনতায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। রজতপ্লাবিত নীল আকাশ, জ্যোৎস্নাব-গুণ্ঠিতা নীল নিশীথিনী, অন্তরীক্ষচারী অগণিত জ্যোতিষ্ক-পুঞ্জ আর পূর্ব্বের ন্যায় হিন্দু-সন্তানের হৃদয়ে প্রমুক্ত স্বাধীনতা-স্পৃহার লহরী লীলা ঢালিয়া দেয় না! আত্মবিস্মৃতির গর্ভে লীনোন্মুখ হিন্দু জাতির সেই কৃষ্ণপ্রেমাকাঙ্ক্ষী হৃদয়ে সঙ্কীর্ণতা তাহার মসীময়ী মূর্ত্তির অবতারণা করিয়াছে। আর্য্য-সন্ততি ধ্রুবতারা-ভ্রষ্ট বিপন্ন তরণীর ন্যায় সঙ্কট অবস্থায় উপনীত হইয়া সুসভ্য বিংশ শতাব্দীর চক্ষে, ধর্ম্মহীন, কর্ম্মহীন, উদ্দেশ্যহীন, উদ্যমশূন্য নগণ্য হেয় জাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ অধুনা প্রচলিত শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় গ্রন্থাদির আলোচনা করিলে এবং আধুনিক হিন্দু সাধারণের শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কতকগুলি কাল্পনিক অথবা সংস্কারের বিষয় চিন্তা করিলে, বিষম সমস্যায় পতিত হইতে হয়। * এই কি সেই শ্রীকৃষ্ণ, যাঁহার অবতারত্ব-স্থাপনের জন্য মহামনাঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস লক্ষ লক্ষ সারগর্ভ শ্লোক বিরচন করিয়াও, পরিশেষে শ্রান্ত-কলেবরে সেই ভগবান্ নরনারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে করযোড়ে বলিয়াছেন;——

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতম্।
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাখিলগুরোর্দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্‌বিকলতা দোষত্রয়ং মৎকৃতম্॥"

যাঁহার পদরেণু শিরে ধারণ করিবার জন্য দেবব্রত ভীষ্ম শরশয্যার সেই সুতীব্র যন্ত্রণাও তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন, হায়! আমাদের সে জাতীয়-নিধি আমরা অনেক দিন হইতে হারাইয়া মণিহারা ফণীর ন্যায় নিষ্প্রভ ও হতোদ্যম হইয়া পড়িয়াছি। সে ত্রিদিবের সুমহান্ দ্যুতি আমাদিগের জাতীয় হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

এই জাতীয় দুর্দ্দিনে ভারতমাতার কৃতী সন্তান মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্রের কল্যাণে কৃষ্ণ-চরিত্রের আবর্জ্জনা বহুল পরিষ্কৃত হইয়াছে। অতঃপর পূর্ব্ববঙ্গের পরম ভাগবত কবি নবীনচন্দ্রের রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস, হিন্দু-হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে! অধুনা এ জাতীয় লোকায়ত কাব্য গ্রন্থ যাহাতে ভূরিপ্রচারিত হয়, তদ্বিষয়ে হিন্দু মাত্রেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত।

মহামহিম ভাগবত-ক্রমের সুধাময় ফল আস্বাদন করিয়া প্রেমিকপ্রবর জয়দেব

* বলা বাহুল্য আমরা প্রকৃত কৃষ্ণতত্ত্বাভিজ্ঞ কবি জয়দেব-প্রমুখ মহাত্মাগণের কাব্যে অনাস্থাবান্ নহি। তবে সাধারণের এতৎ গ্রন্থবর্ণিত বিষয়-সম্বন্ধীয় ধারণাই আমাদের লক্ষ্যস্থল। লেখক।

ভারত-বক্ষে যে 'মধুর কোমল-কান্ত-পদাবলী' ছড়াইয়া গিয়াছেন,—বঙ্গভাষার আদি কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের সরস-হৃদয়-নিঃসৃত তরল-প্রেম-ধারা তৎসহ সম্মিলিত হইয়া, যে প্রমত্ত প্রীতি-প্রবাহের অবতারণা করিয়াছে, যাহাতে প্রত্যেক হিন্দু-নর-নারী আবার সেই দিব্য ভাবে অনুপ্রাণিত ও দিব্য-প্রেম-মন্ত্রে সুদৃঢ়-দীক্ষিত হয়, তাহার উপায় বিধান করা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। অহো! পবিত্র ভাগবত, কি মধুর ভাবে বিশুষ্ক-হৃদয় হিন্দু-নর-নারীগণকে সম্ভাষণ করিতেছেন ;——

"নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলম্।
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ম্।
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥"

[ভাগবত, প্রথম স্কন্ধ]

যাহা হউক, কালক্রমে অন্তর্লক্ষ্যের সূচনা হওয়ায়, এখন ক্রমশঃ আমরা বুঝিতেছি, কেন ভারত এক দিন কৃষ্ণপ্রেমে মাতিয়াছিল! কেন গৃহে গৃহে কৃষ্ণমূর্ত্তি! মুখে মুখে ভব-ভয়-হর কৃষ্ণনাম! কেন আসিন্ধু হিমাচলব্যাপী কৃষ্ণপূজা! কেন ভীষ্মের ন্যায় রাজর্ষি, ব্যাসের ন্যায় ব্রহ্মর্ষি তাঁহাকে আদর্শ করিয়াছিলেন। কেন শুক-মুখ-গলিত সেই মধুর ফল আস্বাদন করিতে, বীর-ধর্ম্মাবতার ধনঞ্জয় প্রমুখ পাণ্ডবগণ লালায়িত হইতেন।

ভাই বঙ্গবাসি, এমন মহামহিমময় বিরাট আদর্শ যাহাদের সম্মুখে সমুদ্ভাসিত, তাহারা কি জ্ঞানের জন্য, শক্তির জন্য, ভক্তির জন্য, অকুতোভয়তার জন্য ইতস্ততঃ ভিখারীর বেশে বিচরণ করে? সেই আদর্শ সদা সম্মুখে রাখিলে কি আর্য্য-সন্তানের মহান্ হৃদয়ে সঙ্কীর্ণতার ছায়াপাত হইতে পারে?—জ্ঞানালোকের পবিত্র-জ্যোতিঃ মোহান্ধকারে নির্ব্বাপিত হইতে পারে? অতঃপর সম্মিলিত হৃদয়ে সেই বিরাট্-বিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, সেই মহাদর্শের নিকট শান্তি-মঙ্গল-বরাভয় প্রার্থনা করে! হীনতার নির্ম্মোক্ পরিহার করিয়া, এই অন্ধতম গহ্বর হইতে গাত্রোত্থান করিয়া একবার দিব্য জ্যোতির অনুসরণ করে। অর্জ্জুনের হৃদয় লইয়া আর্য্যসন্তানের মত একবার সেই সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী সরসিজাসন-সন্নিবিষ্ট কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডল-ধারী কিরীটিহারী হিরন্ময়বপুঃ শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী মুরারি মহাদর্শের সম্মুখে উপস্থিত হও। তুমি যতই হীন দীন শক্তিশূন্য ভীরু, কাপুরুষ হওনা কেন, শুনিবে, সেই বিরাট-বিগ্রহের মুখে বিরাট স্বরে ধ্বনিত হইতেছে, "মা ক্লৈব্যং গচ্ছ কৌন্তেয়" আবার শুন, "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ।" কি বিশ্বময়মূর্ত্তি! উহা আদ্যন্ত-রহিত! শশিসূর্য্যনেত্র দীপ্তহুতাশবক্ত্র শরীর প্রভায় দিগন্তপ্রকাশী নারায়ণ পৃথিবী ও আকাশের সমস্ত মধ্যস্থল সমাচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছেন! প্রতি লোমকূপে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড নিলীন রহিয়াছে! এস, ঐ বিরাট স্বরের সহিত আমাদের জাতীয় ক্ষীণ কণ্ঠ মিলাইয়া, পূর্ণোৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া আমরাও গাই—

"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ"

দেখিবে, ঐ সর্ব্বশক্তিময়ের কৃপা-কটাক্ষে হৃদয়ে বীরধর্ম্মের দৃপ্ততেজ প্রজ্বলিত হইয়া,

আবার আমাদের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইতেছে, আবার আমাদের মরু-হৃদয় অভিষিক্ত হইয়া কৃষ্ণভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে! উচ্চাদর্শের অনুসরণে আবার আমরা গরীয়ান্, মহীয়ান্ হইতেছি! হা করুণাময় দেব শ্রীকৃষ্ণ! আবার কবে আমাদের সেইদিন আসিবে? যে দিন আমরা হৃদয়ে তোমার মহিমা উপলব্ধি করিয়া ভূমানন্দে মনোপ্রাণ প্লাবিত করিয়া গাইব,—

বায়ুর্যমোগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ।
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ;
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥

শ্রীগোপালচন্দ্র কবিকুসুম।

সহস্সবগ্‌গো অট্ঠমো।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

সহস্সপি চে বাচা অনত্থপদসংহিতা।
একং অত্থপদং সেয্যো যং সুত্বা উপসম্মতি॥

অনুবাদ।—নিরর্থশব্দসমন্বিত বাক্য সহস্রসংখ্যক হইলেও, একটী অর্থপূর্ণ বাক্য তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহা শুনিলে লোকে শান্ত হইয়া যায়।

সহস্সমপি চে গাথা অনত্থপদসংহিতা।
একং গাথাপদং সেয্যো যং সুত্বা উপসম্মতি॥২॥

অনুবাদ।—নিরর্থপদসংযুক্ত গাথা সহস্রসংখ্যক হইলেও একটী গাথাপদ, যাহা শুনিলে লোকে শান্ত হইয়া যায়, শ্রেয়ঃ।

যো চ গাথা সতং ভাসে অনত্থপদসংহিতা।
একং ধম্মপদং সেয্যো যং সুত্বা উপসম্মতি॥৩

অনুবাদ।—যে অনর্থপদসংযুক্ত শত গাথা (শ্লোক) বলে, তাহার পক্ষে একটী ধর্ম্মপদ, যাহা শুনিলে লোকের চিত্ত শান্ত হয়, তাহা শ্রেয়ঃ।

যো সহস্সং সহস্সেন সঙ্গামে মানুসে জিনে।
একঞ্চ জেয্যমত্তানং সবে সঙ্গামজুত্তমো॥৪॥

অনুবাদ।—যদি কেহ যুদ্ধে সহস্রগুণ সহস্র ব্যক্তিকে জয় করে, এবং অপর কেহ কেবল আপনাকে জয় করেন, তবে শেষোক্ত ব্যক্তিই প্রশস্ততর যোদ্ধা।

অত্তা হবে জিতং সেয্যো যা চায়ং ইতরা পজা।
অত্তদন্তস্স পোসস্স নিচ্চং সঞ্ঞতচারিনো॥৫॥

নেব দেবো ন গন্ধব্বো ন মারো সহ ব্রহ্মুনা।
জিতং অপজিতং কয়িরা তথারূপসস্ জন্তুনো॥৬॥ *

অনুবাদ।—সাধারণ লোককে জয় করা অপেক্ষা আপনাকে জয় করা শ্রেষ্ঠ; যিনি আপনাকে জয় করিয়াছেন, এবং সর্ব্বদা সংযতভাবে বিচরণ করেন, সেই পুরুষের জয়কে পরাজয়ে পরিণত করিতে দেবতাও পারেন না, গন্ধর্ব্বও পারেন না, ব্রহ্মাও পারেন না, মারও পারে না।

মাসে মাসে সহস্সেন যো যজেথ সতং সমং।
একঞ্চ ভাবিতত্তানং মুহুত্তমপি পূজয়ে।
সা যেব পূজনা সেয্যো যঞ্চে বসসসতং হুতং॥৭॥

* তথারূপসস্ জন্তুনো—এই দুইটী অসংলগ্নভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

অনুবাদ।—যদি কেহ শত বৎসর ধরিয়া সহস্র পদার্থ দ্বারা মাসে মাসে যজ্ঞ করে, এবং অন্য সেই ব্যক্তিই যদি একজন ধর্ম্মপরায়ণ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে মুহূর্ত্তমাত্রও পূজা করে; তবে শতবর্ষের হোম অপেক্ষা সেই পূজাই শ্রেষ্ঠ।

যো চ বস্‌সসতং জন্তু * অগ্‌গিং পরিচরে বনে।
একঞ্চ ভাবিতত্তানং মুহুত্তমপি পূজয়ে।
সা যেব পূজনা সেয্যো যঞ্চে বস্‌সসতং হুতং॥৮

অনুবাদ।—যদি কেহ শত বৎসর ধরিয়া বনে অগ্নিদেবের পরিচর্য্যা করেন, এবং অপরদিকে সেই ব্যক্তিই যদি কোন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজনকেও মুহূর্ত্তমাত্র পূজা করেন, তবে শতবর্ষের হোম অপেক্ষা সেই পূজাই শ্রেষ্ঠ।

যং কিঞ্চি য়িট্‌ঠং ব হুতং ব লোকে
সংবচ্ছরং যজেথ পুঞ্ঞপেক্‌খো।*
সব্বম্পি তং ন চতুভাগমেতি অভিবাদনা উজ্জুগতেসু সেয্যো॥৯।

অনুবাদ।—পুণ্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ইহলোকে সংবৎসর ধরিয়া যাহা কিছু যাগ কিম্বা হোম করেন, সে সকলের মূল্য চতুর্থাংশও নহে, সরলপ্রকৃতি সাধুগণের অভিবাদনা অনেক শ্রেয়সী।

অভিবাদনসীলিস্‌স † নিচ্চং বদ্ধাপচায়িনো।
চত্তারো ধম্মা বড্ঢন্তি, আয়ু বণ্ণো সুখং বলং॥১০॥

অনুবাদ।—যিনি সর্ব্বদা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে অভিবাদন ও সম্মান করেন, তাঁহার আয়ুঃ সম্পদ, বর্ণ, সুখ এবং বল এই চারিটী বর্দ্ধিত হয়।

যো চ বস্‌সসতং জীবে দুস্‌সীলো অসমাহিতো।
একাহং জীবিতং সেয্যো সীলবন্তস্‌স ঝায়িনো॥১১॥

অনুবাদ।—যে, দুশ্চরিত্র ও অসমাহিত হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা চরিত্রবান্ ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির এক দিনের জীবনও শ্রেয়ঃ।

যো চ বস্‌সসতং জীবে দুপ্পঞ্ঞো অসমাহিতো।
একাহং জীবিতং সেয্যো* পঞ্ঞাবন্তস্‌স ঝায়িনো॥১২॥

অনুবাদ।—যে প্রজ্ঞাহীন ও অসমাহিত হইয়া শত বর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা, প্রজ্ঞাবান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির এক দিবসের জীবনও শ্রেয়ঃ।

* কোন কোন স্থলে "জন্তুন্" পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

* ফসবুল সাহেব কৃত ধর্ম্মপদ পুস্তকে "য়িট্‌ঠং চ হুতঞ্চ চ" পাঠ ব্যবহৃত হইয়াছে। কোন কোন সিংহল-পুস্তকে "পুঞ্ঞপেখো" শব্দ দেখা যায়।

† মনুসংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা এই প্রকার একটী শ্লোক দেখিতে পাই:

"অভিবাদনশীলস্য নিত্যং বৃদ্ধোপসেবিনঃ।
চত্বারি সংপ্রবর্দ্ধন্তে আয়ুর্ব্বিদ্যাযশো বলম্॥১২১॥"

* শ্যাম দেশীয় পুস্তকে 'পঞ্ঞবন্তসস' পদ দেখা যায়।

যো চ বস্‌সসতং জীবে কুসীতো হীনবীরিযো।
একাহং জীবিতং সেয্যো বীরিয়মারভতো দল্‌হং ॥১৩॥

অনুবাদ।—যে অলস ও হীনবীর্য্য হইয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা দৃঢ়বীর্য্য ব্যক্তির এক দিবসের জীবনও শ্রেয়ঃ।

যো চ বস্‌সসতং জীবে অপস্‌সং উদয়-ব্যয়ং। *
একাহং জীবিতং সেয্যো পস্‌সতো উদয়-ব্যয়ং ॥১৪॥

অনুবাদ।—যে আদি ও অন্ত (জন্ম ও মৃত্যু) না দেখিয়া শতবর্ষ জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা আদ্যন্তদর্শী পুরুষের এক দিনের জীবনও শ্রেয়ঃ।

যো চ বস্‌সসতং জীবে অপস্‌সং অমতং পদং।
একাহং জীবিতং সেয্যো পস্‌সতো অমতং পদং ॥১৫॥

অনুবাদ।—যে অমৃতপদ (নির্ব্বাণপদ) না দেখিয়া শত বৎসর জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা অমৃতপদ-দর্শনকারী পুরুষের এক দিবসের জীবনও শ্রেয়ঃ।

যো চ বস্‌সসতং জীবে অপস্‌সং ধম্মমুত্তমং।
একাহং জীবিতং সেয্যো পস্‌সতো ধম্ম-মুত্তমং ॥১৬॥

অনুবাদ।—যে ব্যক্তি উত্তম ধর্ম্ম না বুঝিয়া শত বৎসর জীবিত থাকে, তাহার জীবন অপেক্ষা যিনি উত্তম ধর্ম্ম বুঝিয়াছেন, তাঁহার এক দিবসের জীবনও শ্রেয়ঃ।

শ্রীচারুচন্দ্র বসু।

* 'উদয়ব্যয়ং'—'উদয়' অর্থে 'জন্ম' 'আরম্ভ'; এবং 'ব্যয়' অর্থে 'মৃত্যু' 'শেষ'। ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশীয় পুস্তকে "উদয়ব্বয়ং" পদ দেখা যায়।

নরকগুলজার।

অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হইল; ঋষিরা কহিলেন, এক "রাম" নামে কোটী ব্রহ্মবধ পাপ ক্ষয় হইবে। এ সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ধর্ম্মরাজ চিন্তাকুল হইলেন, বুঝি এইবার চাকরিটী গেল। পরের মন্দে দুর্গোৎসবের আনন্দ অনুভব নারদের স্বভাব, নারদ ভাবিলেন, পরীক্ষা করিয়া দেখাই যাক্, ঋষিবাক্য সত্য কি না, এই বলিয়া ধর্ম্মরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

নারদ আসিয়া গেটের বাহির হইতে বলিলেন "ভায়া, ভাবছ কি?"

ধর্ম্মরাজ। এমন কিছুই নয়, এস বস।

নারদ। না, এজন্মে আর তোমার রাজ্যে যেতে হচ্ছে না, বলি খবর শুনেছ? রামচন্দ্র জন্মেছেন।

এই কথা বলিবামাত্র মধুচক্রে দণ্ডঘট্টন করিলে যেরূপ মক্ষিকাগণের যুগপৎ ব্যস্ততা ও ক্ষিপ্রতা লক্ষিত হয়, এবং দূরস্থ মানব সমাজের কোলাহলবৎ অস্পষ্ট ধ্বনি শ্রুত হয়, সেইরূপ শত সহস্র গুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়া প্রেত রাজ্যের নীল অস্পষ্ট আলোকের মধ্য দিয়া জনসাগরের উর্ম্মিমালা লক্ষিত

ও শ্রুত হইল। "রাম" নাম নারদের মুখ হইতে শুনিবা মাত্রই মাঙ্কাতার আমল হইতে লক্ষ লক্ষ লোক গেটের কাছে উপস্থিত হইতে লাগিল। কবাট খুলিল, কাহার সাধ্য বন্ধ রাখে। নারদের অন্তর্দ্ধান হইল।

জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চিত্রগুপ্ত নির্দ্ধারিত সংখ্যার অতিরিক্ত কয়েদী বলিয়া কয়েক বৎসর হইতে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক (extra allowance) পাইতেছিলেন। তাহা পরদিন হইতে বন্ধ হইল। প্রধান যমদূতের (Head Warder) বেতনের হ্রাস হইল। সাধারণ কর্ম্মচারীবর্গের (general establishment) সংখ্যাহ্রাস (reduction) হইল। ধর্ম্মরাজ চিন্তায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে নারদের পুনরাবির্ভাব হইল। ধর্ম্মরাজ ভীতহইলেন, বিট্‌লে সে দিন এক কাণ্ড করে গেছে, আবার আজ কি মনে করে আস্‌ছে।

নারদ। ভায়া, ভেবনা, আমি দাদামশাই (ব্রহ্মা) এর কাছে তোমার জন্য সুপারিশ কর্ত্তে গিয়েছিলাম। তিনি বল্লেন, "দূর বোকা, দেবজন্মা চাকরের কি রিডক্‌সন্ হয়? নেহাৎ কড়াকড়ি হলে অন্ততঃ এক যুগত (personal allowance) ব্যক্তিগত পারিশ্রমিকেই কেটে যায়। তারপর বেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে বল্‌বে, ব'লো চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই"। ভেবনা, ভায়া, নিজ কাজ কর, চল্লাম।

পাপীদের সঙ্গে যাহারা আজীবন কারবার করিয়া আসিয়াছে, তাহারা খুব চালাক লোক। চুপকরিয়া থাকিবার পাত্র নয়। ধর্ম্মরাজ নানা কার্য্যব্যপদেশে ওয়ার্ডারদের পৃথিবীর নানা স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। যমদূত নং ১ ধর্ম্মধ্বজী হইয়া ধর্ম্মসংস্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যমদূত নং ২ সভ্যতা বিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দূত নং ৩ সাম্রাজ্য নীতি বিস্তার করিতে লাগিলেন। নং ৪ দেশহিতৈষিতা প্রচার করিতে লাগিলেন—ইত্যাদি ২৭।

প্রায় একযুগ অতীত হইল। ধর্ম্মরাজের কাজ আজ কাল বড় কম। দুপ্রহরে চেয়ারে বসিলে নেয়াপাতি রকমের নিদ্রা আসে, তথাপি চাকরী দাসত্ব, অনেক দিনে তাতে মায়াও জন্মিয়াছে। বাড়ীতে জমিদারী চালে শয্যায় নিদ্রা যাইতে পারেন না। এমন সময় দূত নং ১ আসিয়া প্রণাম করিল।

ধর্ম্মরাজ। কি খবর ?

দূত নং ১। আজ্ঞে, আমি পৃথিবীতে ধর্ম্ম সংস্থাপন করে এসেছি।

ধ। সর্ব্বনাশ! সেকি? লোকে ধার্ম্মিক হলে ত আর যমের চাকরী থাকেনা, পাপী হইলেই ভাল, তা বোঝ নাই!

দূ। আজ্ঞে, ধর্ম্মেই ত লোকে পাপী হয়—অন্ধ হয়।

ধ। পরিষ্কার করে বল।

দূ। আজ্ঞে আমি গিয়ে দেখি, পৃথিবীতে লোকেরা বেশ সুখে আছে। অনেকেই এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, কিন্তু কেহ বলে ঈশ, কেহ বলে যীশু, কেহ কৃষ্ণ, কেহ খৃষ্ট। আমি সকলকেই বুঝাইলাম, এই আংশিক পার্থক্যই আসল জিনিষ।

তারা অমনি তাহাই বুঝিল। আমি বুঝিলাম, এ যাত্রা আমাদের রক্ষা হইল। এই সকল ভুল প্রভেদের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া, ধর্ম্মধ্বজিগণ নিজেকে অভ্রান্ত এবং অপরকে ভ্রান্ত বিবেচনা করিতে লাগিল, পরে পরস্পরে গালাগালি, হাতাহাতি, মারামারি, কাটাকাটি হইল। কত জীবন্ত মনুষ্যকে মনুষ্যে দগ্ধ করিল, কত মনুষ্যকে একহস্তে কৃপাণ একহস্তে ধর্ম্মপুস্তক দেখান হইল। সাকার নিরাকারে, শাক্তে বৈষ্ণবে, বৌদ্ধ ব্রাহ্মণে অহিনকুলত্বের ভাব উপস্থিত হইল।

ধর্ম্মরাজ অস্থির হইয়া কহিলেন তবে সাম্যবাদের কি হইল?

দূ। কেন? এক গল্প শুনিয়াছি, এক-রাক্ষস একদিন একমুনির পুত্রকে খাইতে যায়। মুনি নিজ পুত্রকে একটী সর্ষপের রূপ ধারণ করান, রাক্ষস অমনি একটী পারাবত হইল এবং সর্ষপটীকে খাইবার উপক্রম করিল। এমন সময়ে মুনি সর্ষপটীর উপর একরাশী সর্ষপ নিক্ষেপ করিলেন পারাবতরূপী রাক্ষস রাশিকৃত সর্ষপ উদারসাৎ করিতে পারিল না, অভীষ্ট সর্ষপটীও বাহির করিতে পারিল না। এই গল্পের সর্ষপের মত পৃথিবীতে রাশি রাশি ধর্ম্মগ্রন্থ ও ধর্ম্মমত আছে। সাম্যবাদ নানা ভাবে নানা ধর্ম্মপুস্তকে বিদ্যমান আছে, পৃথিবীর লোক কিন্তু এই সামান্য সাম্যবাদের কথাটুকু রাশীকৃত অবান্তর ধর্ম্মতত্ত্বের মধ্যে নিহিত করিয়া রাখিয়াছে। ফলতঃ সকলে ঐ সকল ধর্ম্মতত্ত্বগুলি স্বীকারও করে না, এবং কোন্‌টীতে মনুষ্যের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তাহাও জানে না! তাহারা বলে "নানা মুনির নানা মত" "ধর্ম্মতত্ত্ব গূহায় নিহিত" ইত্যাদি—

ধ। শেষ কি বল?

দূ। আজ্ঞে, দাস পৃথিবীতে এইরূপ ধর্ম্মসংস্থাপন করায়, পাপের রাজ্য পূর্ব্ববৎ দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত আছে। কামের রাজ্য কমে নাই। ক্রোধের রাজ্য হত্যা প্রভৃতি পূর্ব্ববৎ। লোভের রাজ্যে চৌর্য্যাদি বেশ চলিতেছে ও পশ্চিমদিকে বেশ বিস্তৃত হইতেছে। মোহ মদ মাৎসর্য্য পূর্ব্বদিকে বিস্তার লাভ করিয়াছে।

ধ। বাহবা! বাহবা!

উপস্থিত পারিষদবর্গ সকলে—বাহবা! বাহবা!

এই কোলাহল ধ্বনি সংযত হইলে, যমদূত নং ২ আসিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল।

ধ। কি খবর?

দূ। আজ্ঞে, পৃথিবীতে উন্নত সভ্যতা বিস্তার করে এলেম।

ধ। সর্ব্বনাশ! তবেইত! লোকে উন্নত ও সভ্য হইলে পাপ কমিবে। তাহ'লে ত আমাদেরই ক্ষতি।

দূ। আজ্ঞে, যে সভ্যতা চালিয়েছি, ও মাকাল ফল। বাহিরে চাকচিক্যময়, ভিতরে মার্জ্জার বিষ্ঠা। "আত্মানং সততং রক্ষেৎ" এই মূল মন্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা বুঝাইয়া দিয়াছি। আত্মরক্ষার ব্যপদেশে উন্নত সভ্যতার উদ্দেশ্য হইয়াছে, কি উপায়ে স্বল্পায়াসে অত্যধিক নরহত্যা সাধিত হয়। আধুনিক সভ্যতম দেশের উন্নতজ্ঞান বিজ্ঞান এতদুদ্দেশ্যে নানা প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র অর্ণব ও ব্যোমযান প্রস্তুত করিতেছে।

এই সভ্যতার প্রভাবে সভ্যতম দেশের দশটী লোক বিলাসে লালিত, লক্ষ লক্ষপতি সাক্ষাৎ যক্ষাবতার হইতেছে। আর কোটী২ লোক দিবারাত্র পরিশ্রমান্তেও অনাহারে বা অর্দ্ধাহারে কুটীরে কোটরে, মাঠে পথে দারুণ শীতে ও অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় রাত্রির পর রাত্রি অতিবাহিত করিতেছে। এই সভ্য লোকগণের জীবনে মাদক সেবন অঙ্গীভূত, আত্ম সুখ কেন্দ্রীভূত, পশু প্রবৃত্তি নিচয় অসংযত। সুতরাং আমাদের পক্ষে শুভদায়ক।

ধর্ম্মরাজ ও দূত নং১ ও পারিষদবর্গ। বাহবা! বাহবা!

এমন সময় দূত নং৩ আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া দণ্ডায়মান রহিল।

ধ। তোমার কি খবর?

দূত নং৩। আজ্ঞে, আমি পৃথিবীতে দেশহিতৈষিতার বিস্তার করিয়া এলেম।

ধ। সর্ব্বনাশ, করেছ কি!

দূ। আজ্ঞে ভয় নাই। পৃথিবীতে দেশ অনেক. ভিন্ন২ দেশের দেশহিতৈষিগণ একদেশদর্শী, নিজ২ দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী, কখন বা নিজ হিতাকাঙ্ক্ষী। এ ওর বিরুদ্ধবাদী ও বিরুদ্ধাচারী, ফল যা আপনি ভয় কচ্ছেন, তার বিপরীত। প্রত্যেক দেশে দলাদলির ও গালাগালির স্রোত বহিতেছে। আর যাহাদের দেশের দৈন্য দশায় যথার্থ দেশহিতৈষীর অভাব, সেথানে "ভাগের মা গঙ্গা পান না"।

ধর্ম্মরাজ, দূত নং১, ২ ও পারিষদ্‌বর্গ,

বাহবা! বাহবা!

এমন সময় দূত নং৪ আসিয়া অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া দণ্ডায়মান হইল।

ধ। তোমার কি খবর?

দূত নং৪। আজ্ঞে, পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ প্রচলন করিয়া আসিয়াছি।

ধ। সর্ব্বনাশ, অরাজকতা দূর হইল, সকলে একের অধীন হইল, ঐক্যের গুণেইত তুমি অপর তিনজন দূতের কাজ একা মাটী করেছ।

দূ। আজ্ঞে তা নয়। সাম্রাজ্য যখন ছিল না, তখন অরাজকতা ছিল, ছোট২ চোর ডাকাইতের বড় উপদ্রব ছিল। এখন সম্রাটগণের উপর তাহাদের সকলের কার্য্যের ভার পড়িয়াছে। ধন অপহরণ, তজ্জন্য উৎপীড়ন, ধনের অপব্যয়, সম্রাটদিগের একচেটিয়া হইয়াছে। আগে বে-আইনী সাজা ছিল, এখন সব সাজা—বেত্রাঘাত হইতে প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত—আইন সঙ্গত, সম্রাটগণের কৃত। আবার সাম্রাজ্যের বিস্তার সকল জাতিরই ইচ্ছা। সকলেই ভাবে, আমরা ঈশ্বরের অনুগৃহীত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং পৃথিবীর অদ্বিতীয় উত্তরাধিকারী, এই উত্তরাধিকার লাভে সকলেই সচেষ্ট। সকলেই পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও সন্দেহ করে। সকলেই যুদ্ধার্থ সসজ্জ।

ধর্ম্মরাজ, দূত, ১, ২, ৩. ও পারিষদবর্গ।

বাহবা! বাহবা!

এমন সময় আরও ৪।৫ জন দূত দেখা দিল। একটু গোলও হইতে লাগিল।

ধ। তোমরা কে? কি করেছ?

দূত ৫	আমি স্বায়ত্ত্বশাসন বা স্বহত্যাসাধন প্রচলিত করিয়াছি।
৬।৭	আমি চৌকীদারী বা চৌর্য্যদাবী প্রচলন করিয়াছি।
প্রায় একত্রে	আমি শিক্ষা সংস্কার বা শিক্ষাসংহার প্রবর্ত্তিত করিয়াছি।

এমন সময় আরও অনেক দূত আসিতে লাগিল।

ধ। তোমরা কে?

দূত ৮। আমি সংবাদপত্র—এই পর্য্যন্ত বলিতে২, কতকগুলি "আমি নীতি সংস্কার," "আমি বিচার সংস্কার," "আমি আয়ুর্ব্বেদ সংস্কার" বলিয়া গোল করিয়া উঠিল।

ক্রমশঃ আরও দূত আসিতে লাগিল ও উচ্চৈঃস্বরে যাহা কহিতে লাগিল, তাহার

প্রথম ভাগ গোলমালে শুনা গেল না, কেবল সংস্কারঃ কোলাহল শুনা যাইতে লাগিল।

ধর্ম্মরাজ, ও পারিষদবর্গ ও প্রধান দূতগণ তখন সমস্বরে কহিলেন "সাবাস! সাবাস! নরকগুলজার হইবে!

শ্রীশরচ্চন্দ্র সেনগুপ্ত।

হিন্দুরাজা সীতারাম রায়।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

দীঘাপতিয়া রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ দয়ারাম রায়, নাটোর রাজবংশের এক জন বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধিতে সর্ব্বত্র পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। নবাব, রঘুনন্দনের পরামর্শানুসারে, সংগ্রাম সিংহকে সুবাদারী সিপাহীদিগের অধিনায়ক ও দয়ারাম রায়কে জমিদারীফৌজের অধ্যক্ষ করিয়া যুগপৎ ভূষণা আক্রমণের আদেশ দেন। তাঁহারা ভূষণা আক্রমণ করেন। সীতারামের সৈন্যাদি ভূষণায় ছিল; অল্পসংখ্যক সৈন্য মহম্মদপুরে রাজধানী রক্ষার্থ নিযুক্ত ছিল। ভূষণায়, নবাবসৈন্যগণ, সীতরাম ও মেনাহাতীর যুদ্ধকৌশলে কয়েক যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। মেনাহাতী জীবিত থাকিতে, নবাবের জয় আশা নাই বিবেচনায়, রঘুনন্দনের পরামর্শে দয়ারাম, মেনাহাতীকে গোপনে হত্যা করিতে মহম্মদপুরে তাঁহার অধীনস্থ কয়েকটী লোককে ছদ্মবেশে পাঠাইয়া দেন। তাহারাই ভীরু কাপুরুষের ন্যায় মেনাহাতীকে গোপনে হত্যা করে। মেনাহাতীর হত্যা সম্বন্ধে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে বিস্তারিত বর্ণিত হইয়াছে। J. westland সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন যে, ছদ্মবেশী সৈনিকেরা মেনাহাতীর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিয়া লইয়া যায়; পরে সেই মস্তক নবাবের নিকট প্রেরিত হয়। নবাব, ভীমের মস্তকের ন্যায় প্রকাণ্ড বীর মস্তক দেখিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলেন যে, এরূপ বীরকে হত্যা না করিয়া বন্দী করা কর্ত্তব্য ছিল। পরে সেই মস্তক সীতারাম সমীপে পাঠাইয়া দেন। সীতারাম সেই মস্তক সমাধিক্ষেত্রে প্রোথিত করেন। ৺বঙ্কিম বাবুও তাঁহার উপন্যাসে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা কতদূর সত্য জানা যায় না। এইরূপ প্রবাদ অনেকের নিকট শুনিতে পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ গুপ্তচরে মেনাহাতীর শরীরে অস্ত্র বিদ্ধ করিয়াই পলায়ন করে, তাহারা মস্তক ছেদনের অবকাশ পায় নাই। ছদ্মবেশী সৈনিক মেনাহাতীর শরীরে অস্ত্র বিদ্ধ করিয়া পলায়ন করিলে, সীতারামের অন্য অন্য লোকে তথায় আগমন পূর্ব্বক মেনাহাতীর বাহুবদ্ধ শিকড় ফেলাইয়া দিলে তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটে। এ অবস্থায় মেনাহাতীর মস্তক ছেদন পূর্ব্বক নবাব দরবারে প্রেরণ করা সম্পূর্ণ অমূলক, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে আরও দেখা যায় যে, মেনাহাতীর মৃত্যুর পরেই সীতারাম, বর্ত্তমান মহম্মদপুরের বাজারের উত্তর পূর্ব্বকোণে উদয়গঞ্জের হাটখোলার ধারে অতি সমারোহের সহিত তাহার মৃতদেহের সমাধি ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। পরে অল্পদিনের মধ্যেই সীতারামের সর্ব্বনাশ ঘটে। এত সামান্য সময়ের মধ্যে সে সময়ে মুরসিদাবাদে মস্তক লইয়া গমন ও প্রত্যাবর্ত্তন করা সহজ নহে এবং পরে সমাধিমন্দির পুনর্ব্বার ভগ্ন করিয়া উক্ত মস্তক তন্মধ্যে নিহিত করাও বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না। যদি প্রকৃত এরূপ ঘটনা ঘটিত, তাহা হইলে জন সাধারণের নিকট এই প্রবাদটী শুনিতে পাওয়া যাইত। এই জনশ্রুতি সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলিয়া প্রতীতি জন্মে। সীতা-

রামের জীবন চরিত সম্বন্ধে, অনেকে তাঁহাদের ইচ্ছানুসারে, নানা কারণে স্বকপোল-কল্পিত গল্প অতিরঞ্জিত করিয়া বলিয়া থাকেন। বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক অনেকের নিকট শুনিয়া, তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে না পারিলে, সেই সমস্ত লোকের আত্মগরিমা পূর্ণ এবং অলীক কথা গুলি বিশ্বাস করিতে হয়। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব. ব্যক্তিবিশেষের নিকট শুনিয়াই এরূপ লিখিয়াছেন। তিনি বিশেষ অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। তাঁহার লিখিত বিষয়ের মধ্যে অনেকস্থলে সন্দেহ আছে।

মেনাহাতী মহম্মদপুরে গোপনে মোগল-সৈন্য কর্ত্তৃক রঘুনন্দনের পাপ মন্ত্রণায় নিহত হইল। মেনাহাতী সীতারামের দক্ষিণ হস্ত ছিল, প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরূপ নিঃস্বার্থ প্রভুভক্ত বীর পুরুষ প্রায়শঃ নয়নপথে পতিত হয় না। মেনাহাতী সীতারামের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, সর্ব্বদা সীতারামের উন্নতির দিকেই তাহার চেষ্টা ছিল; রাত্রিতে সীতারামের রাজবাটীর সিংহদ্বারে শয়ন করিয়া থাকিত। নিঃস্বার্থ ভাবে প্রাণপণে সীতারামের উপকার সাধন করিত। সাধারণ লোকে তাহাকে "অমর" বলিয়া বিবেচনা করিত। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, এরূপ মহাবীরের কুল শীল ইত্যাদি কিছুই জানিতে পারা যায় না। কেবল তাহার বীরত্ব গৌরব অদ্যাপি অনেকের নিকট সুপরিচিত। মেনাহাতী নিহত হইলে, সীতারামের মহম্মদপুরের রাজ দুর্গ অবরোধ ইত্যাদি যাহা ঘটে, তাহা পূর্ব্ব প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে। সীতারাম বন্দী হইয়া মুরসিদাবাদে নীত হইলে. তাঁহার রাজ্য ছত্র ভঙ্গ হইল। বিজয়োন্মত্ত মুসলমান-সৈন্য ও জমিদারী ফৌজগণ মহম্মদপুর রাজধানী লুণ্ঠন করিয়া লইল।

দয়ারাম রায়ের উপর নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "রায় রহিয়ান" উপাধি প্রদান করিলেন। (Rajas of Rajshaha)

১৭১৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট ফেরকৃসিয়ের সময় সীতারামের রাজ্য যবন-কর্ত্তৃক বিজিত হয়। সীতারামও যবনের অধীনতা স্বীকার অপেক্ষা মৃত্যুই সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়া, স্বীয় হস্তের অঙ্গুলিস্থিত হীরকের অঙ্গুরীয় চুষিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। সীতারামের স্বাধীন স্বহস্তশাসিত রাজ্য," নাটোরের রাজা রামজীবনের হস্তগত হইল।

(বিস্তারিত পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

মহম্মদপুর মুসলমানদিগের অধিকৃত হইলে, দয়ারাম সত্বরই দিঘাপতিয়ার বাটীতে গমন করেন। অনেকে তখন অনুমান করেন যে, মহম্মদপুর লুণ্ঠনের অনেক দ্রব্যাদি দয়ারাম রায় তাঁহার বাটীতে লইয়া গিয়াছেন। দয়ারাম ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি সীতারামের রাজধানী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু লুণ্ঠিত দ্রব্য কিছুই গ্রহণ করিয়াছিলেন না। কেবল সীতারাম প্রতিষ্ঠিত "কৃষ্ণজী" বিগ্রহটী বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া যত্ন সহকারে লইয়া গিয়া, কিছুদিন পরে নিজ বাটীতে স্থাপনা করেন। অদ্যাপি দীঘাপতিয়ার রাজ বাটীতে উক্ত "কৃষ্ণজী" বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন; তাঁহার রীতিমত নিত্য পূজাদি চলিতেছে। শুনিতে পাওয়া যায় যে উক্ত বিগ্রহের পাদপদ্মে খোদিত আছে "দয়ারাম বাহাদুর।"

এতদ্দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, মহম্মদপুরে সীতারাম প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান দেববিগ্রহ ব্যতীত—তাঁহার আর একটী প্রিয়তম বিগ্রহ "কৃষ্ণজী" ছিলেন। সীতারামের রাজধানী মহম্মদপুর ত্যাগের সঙ্গে, বিগ্রহটীও মহম্মদপুর পরিত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই দীঘাপতিয়ার সদর-কাছারী মহম্মদপুরে থাকা কালীন, দিঘাপতিয়ার তদানীন্তন রাজা বাহাদুর মহম্মদপুরে ৺কৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহ স্থাপনা করেন; অবশেষে কিছুদিন হইল, উক্ত বিগ্রহ রাজধানীতে লইয়া গিয়াছেন।

সীতারামের আত্মহত্যা, তাঁহার পরিবার-

বর্গ ও বংশাবলীর অবস্থা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

সীতারামের জীবন বায়ু কালের অনন্ত-স্রোতে মিশিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার নাম অদ্যাপি বাঙ্গালীর হৃদয়ে জাগরুক রহিয়াছে। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ—তাঁহার বীরত্ব, স্বাধীনতা, মহত্ত্ব, পরোপকারিতা, ন্যায়পরায়ণতা, অসীম প্রতিভা, স্বধর্ম্ম-পরায়ণতা ও উন্নত মনের পরিচয় দিতেছে। কালে যদিও সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইবে, তথাপি আরও দীর্ঘকাল তাঁহার গৌরব প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকিবে। অদ্যাপি তাঁহার যশঃ-সৌরভে দক্ষিণ বঙ্গ আমোদিত, তাঁহার জীবন-চরিত শুনিতে সকলেই উৎকণ্ঠিত ও তাঁহার রাজ্যনাশে প্রত্যেকেই দুঃখিত। তাঁহার রাজধানী মহম্মদপুরও সুপরিচিত। সুরপুরী সম মহম্মদপুর আজ শ্মশানে পরিণত! ভীষণ জঙ্গলে আবৃত! অনেক জলাশয় বিশুষ্ক প্রায়! রাজবাটীর ভগ্নাবশেষ মাত্র বিদ্যমান!! মহম্মদপুর বাজারের পূর্ব্ব-দিগ্বর্ত্তী সমতল প্রায় চিহ্নমাত্র রহিয়াছে। যদি কোন মহাত্মার কৃপা দৃষ্টিতে নগরটীর উন্নতি সাধন না হয়, তাহা হইলে ক্রমে সমস্তই বিনষ্ট হইবে। রাজবাটীতে প্রতিষ্ঠিত দেব বিগ্রহ দুইটীর যথা রীতি পূজাদি হওয়ায় অদ্যাপি রাজবাটীর গৌরব রক্ষা পাইতেছে। নশ্বর জগতে চিরস্থায়ী কিছুই নহে, চিরদিন কখনও সমান যায় না, সুখ দুঃখ, উন্নতি অবনতি জগতের চিরপ্রসিদ্ধ কাল চক্র নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। কালের কুটীল চক্রের আবর্ত্তনে আজ মহম্মদপুরের এরূপ অবস্থা!

মহম্মদপুর কোটাবাড়ীর ভট্টাচার্য্য-মহাশয়েরা, সীতারামের পুরোহিত বংশ। পূর্ব্বে গোকুল নগরের ভট্টাচার্য্য লেখা হইয়াছে, তাঁহারা ও কোটা বাড়ীর ভট্টাচার্য্য-দের জ্ঞাতি। পুরোহিতেরা কোটাবাড়ীর ভট্টাচার্য্যদিগের পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন।

আমরা মহানুভব রাজা সীতারাম রায়ের বংশাবলীর উল্লেখ করিয়াই এ প্রবন্ধের পরিসমাপ্তি করিব।

পূর্ব্বপুরুষ রাম দাস (গজদানী) তাঁহার তিন পুত্র, অনন্ত দাস, ধনন্ত দাস, শিবরাম দাস। অনন্ত দাসের পুত্র ধরাধর দাস। তাহার পুত্র সুধাকর দাস। তাহার পুত্র নীলাম্বর দাস। তৎপুত্র রত্নাকর দাস। তৎপুত্র হিমকর দাস। তাহার পুত্র রামরাম দাস। (বিশ্বাস খাস) তাহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র রায়। (রায় রাঁয়া) তৎপুত্র উদয়নারায়ণ রায়। (রায় রাঁয়া) তাহার দুই পুত্র,—রাজা সীতারাম রায় ও লক্ষ্মীনারায়ণ রায়।

সীতারামের চারি পুত্র, শ্যামসুন্দর, সুরনারায়ণ, রামদেব, জয়দেব। শ্যামসুন্দরের পুত্র আনন্দরাম রায়। সুরনারায়ণের পুত্র প্রেমনারায়ণ। আনন্দরামের পুত্র নিমাই রায়। প্রেমনারায়ণের পুত্র রাধাকান্ত রায়। তাহার নবকুমার নামক একটী পুত্র ও অলকমণি নামে একটী কন্যা হয়। অলক-মণির পুত্র গিরীশচন্দ্র দাস। তৎপুত্র উমাচরন দাস। (ইনি বর্ত্তমান আছেন।)

লক্ষ্মীনারায়ণ রায়ের যদুনাথ, নবনারায়ণ জয়নারায়ণ, বিজয়নারায়ণ নামে চারি পুত্র হয়। নবনারায়ণের মনসুখচাঁদ, ও নেহালচাঁদ নামক দুই পুত্র,। মনসুখচাঁদের তিন পুত্র, রঘুনাথ, রমানাথ, প্রাণনাথ। নেহালচাঁদের দত্তক পুত্র কৃষ্ণকান্ত রায়। রমানাথের দুই—পুত্র কমলাকান্ত, মাধব। কৃষ্ণকান্তের দুই—পুত্র চৈতন্যচরণ, গুরুদয়াল। চৈতন্য চরণের দুই পুত্র, সূর্য্যনাথ, ও দেবনাথ রায়। (বর্ত্তমান।) পরিশেষে বঙ্গের শিক্ষিত সন্তানগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে চাই—ভ্রাতৃগণ! সীতারাম গিয়াছেন, আমরা কি তাঁহার স্মৃতিও বিসর্জ্জন দিব? শিবাজী বা প্রতাপের ন্যায় সীতারামের সম্বন্ধেও কি আমাদের কিছু কর্ত্তব্য নাই? যদি থাকে, আর ঔদাসীন্য কেন? ওঁ শান্তিঃ।

সমাপ্ত।

শ্রীবিরদাকান্ত দে।